ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

DHURJATIPRASAD RACHANAVALI

SECOND VOLUME



শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৭

শ্রীসুধাংশুশেখর দে কর্তৃক দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত। শ্রীসনাতন হাজরা, ৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা ৭০০০০৬, শ্রীদুলালচন্দ্র ঘোষ, নিউ লোকনাথ প্রেস, ৮/এ, কাশী বোস লেন, কলকাতা ৭০০০০৬, শ্রীগৌতম ভট্টাচার্য, উমা প্রিন্টিং হাউস, ৪, ফকিরডাইস লেন, কলকাতা ৭০০০১৪ কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচি

সা হি ত্যি কা

দে শ ও প্র গ তি

বক্তব্য

স মা জ চি ন্তা

সং স্কৃ তি চি ন্তা

[মুদ্রণ-প্রমাদের জন্য 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়', 'প্রমথ চৌধুরীর গল্প' 'রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি' এবং 'গান্ধী-স্মৃতি' প্রবন্ধ তিনটির পৃষ্ঠা সংখ্যা গ্রন্থে যথাক্রমে ২৩৭, ২৪১, ২৪৬ এবং ২৫০ ছাপা হয়েছে।]

নিবেদন

তৃতীয় খণ্ডের গোড়ায় নিবেদনে আমার বক্তব্য জানিয়েছি। এই খণ্ডের বিষয়বস্তু ও আয়তন অনেকটা সুনির্দিষ্ট থাকায় মুদ্রণ-প্রকাশনের কাজ ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। অবশ্য এখন কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই দ্বিতীয় ও তৃতীয়, দুটি খণ্ডই কিছু আগে পরে প্রকাশ করা সম্ভব হল। দ্বিতীয় খণ্ড তৈরি করতে গিয়ে দুটি সমস্যা দেখা গেল। ধূর্জটিপ্রসাদের যে তিনটি প্রবন্ধের বই এখানে অন্তর্ভুক্ত হল তাদের মূল গ্রন্থের কপি প্রায় দুর্লভ। সেগুলি সংগ্রহ ও সমাবেশ করতে অনিবার্যভাবে দেরি হল। তারপর ধূর্জটিপ্রসাদের নানা জাতীয় প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়েছিল। সেগুলি সন্ধান করে তাই থেকে নকল করে একত্র সন্নিবিষ্ট করা বেশ সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এই-ভাবে তাঁর বহু অগ্রন্থিত প্রবন্ধ সংকলিত করতে হয়েছে। আগ্রহী পাঠকসমাজ এই দুরূহ সম্পাদনার সমস্যা বুঝে আনুষঙ্গিক ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। অগ্রন্থিত প্রবন্ধগুলি দেখলে পাঠকরা বুঝবেন, অধুনা দুষ্প্রাপ্য কতগুলি পত্র-পত্রিকা থেকে এই অগ্রন্থিত প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করতে হয়েছে, যাদের সাহিত্যিক-মূল্য এখনও অক্ষুণ্ণ। কত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছেন, যেমন আধুনিক কাব্য-সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, বর্তমান কালের কিছু কিছু বড় লেখকদের নিয়ে আলোচনা এবং সর্বোপরি অধুনা লুপ্ত 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত কয়েকটি মূল্যবান প্রসঙ্গ। এই সূত্রে বলে রাখি, ধূর্জটিপ্রসাদের কলমে 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ একটি বিশিষ্ট রূপশৈলী অর্জন করেছিল, হাল আমলের তথাকথিত রম্য রচনার আবির্ভাবের অনেক আগে। দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবে এই জাতীয় রচনার মাত্র দু-একটি নমুনা সংকলন করা গেল— যেমন "বৈঠকখানা ও সমাজ" এবং "শুভচিহ্ন"। আর একটি তথ্য হল— তাঁর একদা বিখ্যাত "আমরা ও তাঁহারা" বইটি বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ একশত বাংলা বই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন দু'জন নামকরা পণ্ডিত ব্যক্তি।

সংগ্রহ ও সম্পাদনার ব্যাপারে শ্রীসুবীর ভট্টাচার্য এবং প্রকাশনের বিষয়ে শ্রীসুধাংশুশেখর দে অকৃপণ সহযোগিতা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ করেছেন। আর সুচিন্তিত ভূমিকাটি লিখে অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাঁর অধীত বিদ্যা, বিচারবোধ এবং চিন্তাশীলতার উজ্জ্বল নমুনা

রেখেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদের প্রবন্ধ-সাহিত্যে অবদান, তার বৈশিষ্ট্য এবং মনস্বিতার ব্যাপকতা প্রভৃতি আলোচনায় তিনি যোগ্যতার স্বাক্ষর প্রমাণ করেছেন। তাঁকে মৌখিক ধন্যবাদ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

মুখ্যত গভীর মননশীল প্রবন্ধকার হিসেবেই ধূর্জটিপ্রসাদের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। এখানে তাঁর অনুরাগী পাঠকরা অনেক চিন্তার খোরাক পাবেন এবং তাঁর উপলব্ধি ও প্রত্যয় থেকে একদিকে তাঁর বাক্‌বৈদগ্ধ্য অপরদিকে উষ্ণ প্রাণোজ্জ্বলতার পরিচয় পাবেন।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

ধূর্জটিপ্রসাদের 'আমরা ও তাঁহারা' 'চিন্তয়সি' 'বক্তব্য' এই তিনটি গ্রন্থ এবং একত্রিশটি অগ্রন্থিত দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধ নিয়ে রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। বেশ কিছু প্রবন্ধ, রম্যরচনা, আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। ফলে রচনাবলীকে সমগ্র রচনাবলীর রূপ দিতে না পারার জন্ত দুঃখিত। এই কাজ সর্ব অর্থে এতই বিরাট, যা আমার পক্ষে সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। অনেকের উপদেশ, পরামর্শ, সাহায্য পেয়েছি— কিন্তু রচনাবলীর ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্ত তাঁরা আদৌ দায়ী নন।

গ্রন্থ-পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে রবীন্দ্রভবন-কর্তৃপক্ষ বাধিত করেছেন। ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাতটি দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধের কপি দিয়ে ও অন্যান্য নানাভাবে সাহায্য করেছেন। শ্রীকমলা কাঞ্জিলাল প্রয়াত আশুতোষ বাগ্‌চির ব্যক্তিগত সংগ্রহের 'সবুজ পত্র' ব্যবহার করতে দিয়ে সাহায্য করেছেন। এ-ছাড়াও নানা সময়ে শ্রীঅশোক মিত্র, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীসুবীর রায়চৌধুরী, শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপিকানাথ রায়চৌধুরীর সাহায্য পেয়েছি। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীপ্রতিভা বসু, শ্রীঅভিজিৎ মিত্র এবং শ্রীদেবেশ রায়ের কাছেও অন্যভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রীঅলোক রায়ের 'ধূর্জটিপ্রসাদ' এবং ১৩৮০-র সাহিত্য সংখ্যা 'দেশ' ব্যবহার করা হয়েছে। এই সুযোগে এঁদের প্রত্যেককেই আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

রচনাবলী প্রকাশের প্রত্যেক পর্যায়ে এবং বই, দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধ সংগ্রহে ও পরিশিষ্ট সংকলনে আমাকে সহযোগিতা করেছেন শ্রীসুবীর ভট্টাচার্য।

আশা করি ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী সমাদৃত হবে।

বিনীত

সুধাংশুশেখর দে

ভূমিকা

বিদেশী অনেক লেখক আছেন যাঁদের বহুবিদ্যায় পারদর্শিতা এবং ক্ষুরধার বুদ্ধি তাঁদের চিন্তামূলক গদ্য রচনাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি তাঁদের গল্প-উপন্যাস সাহিত্যকেও যথেষ্ট পরিমাণে বৈচিত্র্য দিয়েছে। গভীরতাকেও হয়তো এই বৈচিত্র্যের একটা অঙ্গ বলতে পারি। তবে তাতে অনেক গল্প-উপন্যাসের লেখক ও সমালোচক ভুরু কুঁচকাবেন। কেননা সাধারণভাবে একথাই সত্যি যে, নিছক ক্ষুরধার বুদ্ধি উঁচুদরের ঔপন্যাসিকের বৈশিষ্ট্য নয়। জীবনের প্রতি গভীর মমতা এবং খুব ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা না থাকলে নিছক বিশ্লেষণী প্রতিভা নিয়ে বড় ঔপন্যাসিক হওয়া যায় না। ডিকেন্স্, হুগো, বালজাক, টলস্টয়, টুর্গেনিভ কিংবা গোর্কি যে গভীর বোধ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার জোরে উপন্যাসের পরিধি ও গভীরতা বাড়িয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর যেভাবে উপন্যাসের গভীরতা এনেছেন, প্রুস্ত, ভার্জিনিয়া উল্ফ, হাক্সলি কিংবা সি এস লুইস ঠিক সেই জাতীয় গভীরতা ও ব্যাপকতার স্বাদ দিতে পারেন নি, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কিংবা সন্তোষকুমার ঘোষও ঠিক এই জাতীয় গভীরতা ও ব্যাপকতার স্বাদ দেন নি। আসলে বুদ্ধিদীপ্ত ঔপন্যাসিকের রচনায় গভীরতার স্বাদটা আলাদা। কাহিনীর বিন্যাসে, বিশ্লেষণে ও আত্মসচেতনতায় এমন একটা জীবনের পরিপ্রেক্ষিত ও বোধ তাঁরা তৈরি করেন যার সমস্ত আবহাওয়াটাই শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষের; সেখানে মানুষের বুদ্ধি ও আবেগের দ্বন্দ্বের পরিমাপ করাটাই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের খোলস ভাঙা আদিম চেহারাটা এই জাতীয় উপন্যাসে পাওয়া যায় না। এই অভাবটা কিন্তু বুদ্ধিবাদী উপন্যাসের ত্রুটি নয়, এইটেই তার স্বভাব-চরিত্র।

অনেক সময়েই এই জাতীয় বুদ্ধিদীপ্ত লেখক উপন্যাসে যেমন চরিত্রের স্বভাবে ও সংলাপে ব্যাপক কৌতূহলের পরিচয় দেন তেমনি সাহিত্যের অন্য শাখার চর্চাতেও খানিকটা গল্পের ছাঁদ এনে নানা ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটান। এবং এই প্রকাশ স্বাভাবিকভাবেই একমুখী হতে পারে না। একাধিক চরিত্রের মুখে তা প্রকাশ পায় বলেই মতামতের পার্থক্যে ভাবনা-চিন্তার বহু-কৌণিক প্রকাশ ঘটে। যে-কোনো লেখকের পক্ষেই নিজের মতামত প্রকাশের একপেশে সাধারণ বক্তৃতাসর্বস্ব ভঙ্গির চেয়ে নানা দিক

থেকে একটি বিষয়ের উপর আলো ফেলা অনেক শক্ত ব্যাপার। কিন্তু মত-পার্থক্যে স্বভাব-চরিত্রে তার্কিক চরিত্রগুলি পৃথক ও জীবন্ত হলে বিষয়ের আলোচনা অনেক বেশি গতিশীল হয়। সিদ্ধান্ত না হলেও সমস্যা অনেক স্পষ্ট হয়। হয়তো সমস্যা স্পষ্ট হলে সিদ্ধান্তের নির্দেশ পাওয়া যায়। সেই নির্দেশ থেকে পাঠক নিজের একটি দৃষ্টিভঙ্গিও তৈরি করে নিতে পারে।

যে লেখক বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর পক্ষে এমন বহু কৌণিক উপস্থাপনার ব্যাপারটা কঠিন নয়। লোকরহস্য ও কমলাকান্তের বঙ্কিমচন্দ্র, পঞ্চভূতের রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আরও কিছু গদ্য লেখক আছেন যাঁরা একাধিক চরিত্রের ডায়লগ ছাড়াও প্রায় স্বগত সংলাপের ভঙ্গিতে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের উপস্থাপনার ভঙ্গি খুবই অন্তরঙ্গ। কেবল উপস্থাপনা-ভঙ্গি নয়, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এবং তর্কনীতিও লক্ষ্য করবার মতো।

ধূর্জটিপ্রসাদের প্রবন্ধাবলির ভূমিকা করার জন্যে এই যে ভণিতা করছি তার কারণ এবার বলি। ধূর্জটিপ্রসাদের মানসিকতা বিশেষ একটি কোনো খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে নেই। তার অনেক খুঁটির একটি খুঁটি হলো বিজ্ঞান। তখনকার সিলেবাসে কলা ও বিজ্ঞানের মধ্যে এখনকার মতো প্রায় অহিনকুল সম্পর্ক ছিল না। এমনিতেই বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে তিনি ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেন। বি. এ তেও ছিল কেমিস্ট্রি এবং অঙ্ক। তার চেয়ে দরকারি কথা, তিনি রিপন কলেজে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ছাত্র ছিলেন। এ ছাড়াও অনেক খ্যাতনামা অধ্যাপক তখন এই ছাত্রটিকে পড়িয়েছেন। সেইজন্যেই বিজ্ঞানের ডিগ্রির চেয়েও বৈজ্ঞানিক মানসিকতাকে তিনি অনেক বেশি যত্নে তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন।

এই বৈজ্ঞানিক মানসিকতার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বিচিত্রবিদ্যার প্রতি কৌতূহল। এই কৌতূহলের উৎসও ছিল তখনকার রিপন কলেজে। ধূর্জটি-প্রসাদের ছাত্রজীবনে নতুন বাড়িতে কলেজ শুরু হলে প্রচুর আধুনিক বই কেনা শুরু হয়। কলেজে রামেন্দ্রসুন্দরের ঘরেই অধ্যাপকদের আড্ডা বসতো। তুলনামূলক দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা, প্রাচীন ইতিহাস সে আড্ডার বিষয় ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের ঘরের এই আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন প্রবীণ অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। ছাত্র হিসেবে অধ্যাপকদের কাছে গিয়ে 'এই আড্ডার নীরব শ্রোতা' হয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ নিশ্চয় উপকৃত হয়েছেন। কেননা তাঁর যাবতীয় রচনার মধ্যেই নানা বিদ্যার ঝোঁক, নানা বিদ্যাকে

মিলিয়ে-মিশিয়ে মানুষের সামাজিক অবস্থানকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা আছে। বিশেষ করে, সমাজ-সংশ্লিষ্ট যা কিছু শাস্ত্র তাই দিয়ে মানুষ ও পরিবেশকে বুঝবার চেষ্টা, প্রথম মহাযুদ্ধের ও পরবর্তীকালের বিদেশী সমাজবিপ্লব (বিশেষ করে রুশ বিপ্লব সংক্রান্ত) ও স্বদেশী সমাজ-পরিবর্তনের নানা তাত্ত্বিক ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ রচনা এবং সব মিলিয়ে বিচিত্র সামাজিক পরিবর্তনে নতুন প্রজন্মের চাল-চলনের গভীর প্রভাব রয়েছে। রয়েছে নানা শাস্ত্রের সম্পর্কে কৌতূহল, কিছুটা উল্লম্ফনী মনোবৃত্তি, একটা বিশেষ ক্ষেত্র ধরে বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে সংক্ষেপে মন্তব্য ক'রে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যাওয়ার প্রবণতা। তার ফলে মাঝে-মাঝে চমৎকার বিশ্লেষণ পাই, কিন্তু 'সামাজিকে'র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সেই অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া পথের নির্দেশ, বাধা কিংবা সীমাবদ্ধতার হদিশ পাই না। সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও অনেকখানি ইতস্তত-ভাব আছে। কারণ বুদ্ধি দিয়ে যতটা বিশ্লেষণ হয় ততটা পথ-নির্দেশ পাওয়া যায় না। একটু যেন দূরদৃষ্টির অভাব বোধ করি। বুদ্ধিবাদী ও সামাজিক কর্মীর তফাতটা ধূর্জটিপ্রসাদের নন-ফিকৃশন লেখা থেকে বুঝতে পারি। হয়তো এটাও বুঝি, বুদ্ধি ও কর্মের যোগসাজস না হলে শুধু চিন্তার বহুমুখিতায় চমকেই উঠতে হয়। তার বেশি কিছু নয়।

তবে এ কথাও ঠিক, ধূর্জটিপ্রসাদ বুদ্ধির ভূমিকা মেনেও বুদ্ধি-সর্বস্বতাকে পছন্দ করেন না। এজন্যে নিজের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বও হয়। ধূর্জটিপ্রসাদ ভাবেন, বুদ্ধির প্রাধান্য, তার স্বাধীন অস্তিত্ব ও সার্বজনীন আইনকানুন, বুদ্ধিমানের বিশেষ অধিকার এসব কোনো কিছুই মানা চলে না। তার বদলে স্বীকার করতে হয়, ইচ্ছাশক্তিকে, কর্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যকে, ঘটনার বিশেষত্বকে, তার পারম্পর্যের অনিবার্যতাকে, বস্তুজগতের অস্তিত্বকে, তার প্রাথমিকতাকে। এগুলিকে মনে হয় পরবর্তীকালের যুবমানসের প্রতিজ্ঞা। প্রত্যক্ষ অনুভূতির ওপর পরবর্তী যুবসমাজের যতটা নির্ভর তাতেও কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ শান্তি পাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে, বুদ্ধিটা সর্বস্ব না হলেও ঘটনার বিশ্লেষণের জন্যে অন্য কোনো শক্তি কার্যকর হবে না। ব্রজেন্দ্র শীল কিংবা নব্য নৈয়ায়িক না হলেও চলে, কিন্তু ইতিহাসের কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করে কোথায় পৌঁছেছি এবং কোন্ ছাঁচের সমাজগঠন আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হবে তা বুঝতে গেলে একটু বিশ্লেষণী শক্তি দরকার বৈকি। তাই তিনি ভাবছেন, 'আমার সন্দেহ হয়েছে যতটা inductive, historyminded ও বৈজ্ঞানিক নতুনত্ব তাঁদের কাছে দাবি করি, ততটা তাঁরা মেটাতে পারছেন না। এটা

ইচ্ছে করলেই পারা যায়। আমরা পারি নি, আমাদের দৃষ্টি ওধারে যায় নি, এঁরা পারছেন না, দৃষ্টিভঙ্গি আছে, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ নয়। চোখ ভালো হলে যে চরিত্রহানি হয় তা বোধ হয় ঠিক নয়।'

এই বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা, এই এক বিশেষ জাতের চিন্তার ধরন-ধারন ও সর্বসাধারণ, এই 'আমাদের' ও 'তাঁহাদের' ভেতরকার টানা-পোড়েনই ধূর্জটিপ্রসাদের নন্-ফিকশন গদ্য রচনার মূল টেনশন। এবং, বোধ হয়, তাঁর ফিক্‌শনেরও অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

ছাত্রজীবনে নানা বিষয়ের পণ্ডিত অধ্যাপকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যেমন ধূর্জটিপ্রসাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী মানসিকতাকে তৈরি করতে সাহায্য করেছে, নানা বিদ্যার কৌতূহল বাড়িয়েছে তেমনি পারিবারিক আবহাওয়াও তাঁকে ভক্তিমার্গ থেকে জ্ঞানমার্গের দিকেই টেনে নিয়ে গেছে। তার ওপর ছাত্রজীবন শেষ হতে না হতেই প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রের দলে চলে যান তিনি। প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্রের লেখক গোষ্ঠীর যে 'মন' তৈরি করেন তার মূল কথা ছিল বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। বুদ্ধির প্রাধান্য, তর্ক প্রবণতা, তর্কনীতি মেনে চলা, বুদ্ধির স্বাধীন অস্তিত্ব মেনে মুক্ত সমালোচনার মন তৈরি করা। তার ফলে বাস্তব পলিটিক্যাল পরিবেশ সম্পর্কে আগ্রহ খুব একটা ছিল না, কিন্তু পলিটিক্যাল, ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মুক্ত চিন্তা সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। এই জন্যেই খোলামেলা সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুতি ঘটে। তাঁরই নিজেরই ভাষায় 'বুদ্ধির চর্চায় আমরা বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ি। বুদ্ধিবাদের সর্বনাশ ঐ করেই ঘটে, আমরাও বাদ পড়ি নি।'

বুঝতে অসুবিধে হয় না, বুদ্ধিবাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদ সচেতন হয়েও বুদ্ধিবাদের পথ তিনি ছাড়েন নি। হয়তো ছাড়তে পারেন নি। কারণ, যে ইচ্ছাশক্তি নির্ভর এবং নিছক অভিজ্ঞতা-নির্ভর কর্মবাদী যুবশক্তিকে তিনি দেখতে পেয়েছেন তার মধ্যে চিন্তা ও বিশ্লেষণের দৈন্য দেখে তিনি বুদ্ধির বিশ্লেষণী বৃত্তিকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট বুঝতে এবং পরবর্তী পদক্ষেপটিকে সুচিন্তিত ও দৃঢ় করে তুলতে কাজে লাগানো উচিত বলে মনে করেছেন। এক কথায় বুদ্ধির দৈন্যের সংকটে বুদ্ধিবাদকে তিনি একেবারেই ঠেলতে পারেন নি। তার ওপর, প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রের আবহাওয়ায় গড়ে-ওঠা তাঁর চিন্তা-ভাবনার স্পষ্টতা ও ঋজুতা এবং উপস্থাপনার অন্তরঙ্গ সহজ ও সংলাপধর্মী গতিশীল গদ্য যে কোনো প্রাবন্ধিকের ঈর্ষার বিষয়।

সংলাপ কখনো আত্মগত, কখনো নৈর্ব্যক্তিক। কখনো নৈর্ব্যক্তিক না হলেও একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনা বিষয়কে অনেকখানি স্পষ্ট করে। সঙ্গে সঙ্গে কথা বলার একটা সরস বুদ্ধিদীপ্ত আর্টও প্রমথ চৌধুরীর সান্নিধ্য থেকে অবধারিত ভাবেই পাওয়া। একটু অতীতে গেলে হয়তো লোকেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিতর্ক এবং রামেন্দ্রসুন্দরের বহুবিত্তাপটু সরস সজীব ভঙ্গির মধ্যেও ধূর্জটিপ্রসাদের সামগ্রিক লেখক ব্যক্তিত্বের জড় খুঁজে পাওয়া যাবে।

ধূর্জটিপ্রসাদের 'আমরা ও তাঁহারা' প্রকাশিত হয়েছে তিরিশের দশকের গোড়ায়। এই বইএর কিছু অংশ পত্রিকায় বেরিয়েছিল আরো দু-তিন বছর আগে। অর্থাৎ বিশ-তিরিশের দশকের সন্ধিক্ষণে লেখা এই বই-এর প্রস্তাবগুলি একটি বিশেষ সামাজিক দৃষ্টিকোণে লেখা। ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার ফলে আমাদের পুরোনো জন্মগত, জাতিগত ও সমাজ-ধর্মগত শ্রেণী-বিভাগগুলো পাল্টাতে পাল্টাতে এই শতকের প্রথমদিকে অনেক বদলে গেছে। বিশেষ করে, শহরে ও শিল্পাঞ্চলে অর্থের ভিত্তিতে ধনী-মধ্যবিত্ত-শ্রমিক এই তিন শ্রেণীর পার্থক্য ও বিরোধ তো ধনতান্ত্রিক কাঠামোতেই ফুটে উঠছে। চিন্তার আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান ঘটছে। ব্যবধানটা শুধু অর্থোপার্জনের ভিত্তিতেই হচ্ছে না, মানসিক দ্বন্দ্বও ফুটছে অর্থো-পার্জনের ভিত্তিতে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে যারা মধ্যবিত্ত তারা আরো একটু সূক্ষ্মভাবে নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন। এই ব্যবধান শিক্ষাদীক্ষার এবং শ্রমগত প্রকারভেদের ব্যবধান। মধ্যবিত্তের ভেতরকার উচ্চশিক্ষা ও পরশ্রমনির্ভর বুদ্ধিজীবীসত্তার সঙ্গে সাধারণ অল্পশিক্ষিত কেরানীকুলের নিশ্চয় ব্যবধান আছে। সংস্কৃতিগত ধারণার ক্ষেত্রে এই দু-জাতের মধ্যবিত্তের মানসিক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকতে বাধ্য। কিন্তু মধ্যবিত্ত, আর যাই হোক, সমাজের সামগ্রিক চেহারা নয়। পুরো সমাজের তারা প্রতিনিধিত্ব করে না। স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সবচেয়ে এগিয়ে ছিল, কিন্তু এদের শ্রেণীগত আত্মাভিমান দম্ভ ও স্বার্থ সমাজের পুরোপুরি উন্নতির পথে বাধাই হয়েছে। যতক্ষণ না আর্থিক ও মানসিক আত্মাভিমান ঘুচিয়ে সাধারণ মানুষকে দলে টানা গেছে ততক্ষণ সমগ্র সমাজের প্রতিবাদের ধারাটা বিদেশী শাসক বুঝতে পারে নি। কিন্তু পুরো সমাজটিকে বাগে আনা যে কত কঠিন ও জটিল ব্যাপার তা স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় ধাপে অর্থাৎ অসহযোগের ব্যর্থতার পর থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি। শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ও বৈজ্ঞানিক

দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধাই সমাজের শ্রেণীগত ব্যবধান কমাতে পারে, যুক্তিবাদী মানুষই সব রকম পার্থক্য ও সংস্কার দূর করতে পারে। আপাতত সে দূরত্ব থেকেই গেছে। বিষয় ধরে চিন্তা ভাবনার প্রকাশেই বিভিন্ন শ্রেণীর ভেতরকার এই দূরত্ব বা মানসিক এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব বুঝতে পারা যায়। মূর্খ ধনী বা মূর্খ দরিদ্রের সঙ্গে শিক্ষিত বুদ্ধিমানের আদান-প্রদান হয় না। কাজেই কোনো বিষয় ধরে আদান-প্রদান কিছুটা সম্ভব এমন দুই শ্রেণীর বিরোধকে প্রকাশ করা স্বাভাবিকভাবেই ধূর্জটিপ্রসাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে শিক্ষাভিমানী বুদ্ধিজীবী অন্যদিকে অন্য শ্রেণী অর্থাৎ সাধারণ অল্পশিক্ষিত কেরানীকুল। প্রথমটি আমরা, দ্বিতীয়টি তাঁহারা। সংলাপে এই আমরাই বুদ্ধিজীবীর আত্মাভিমানে 'আমি'। প্রথম স্তবকে বুদ্ধিজীবীর শিক্ষার অভিমান, সংকীর্ণতা ও রুচির আভিজাত্যের সঙ্গে অন্যদের অর্থাৎ 'তাঁহাদের' সহজ হৃদয়াবৃত্তির অধিকার ও সহজ ভালোবাসায় সব কিছুকে গ্রহণ করার চেষ্টা। বুদ্ধিজীবী ও অভিজ্ঞতাজীবী এই দুয়ের দ্বন্দ্ব শ্লেষ বিদ্রূপ ভালোই জমেছে, তবে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, 'তাঁহারা' 'আমরা'র চেয়ে কোনো অংশে কম যান না, কথার কৌতুক সৃষ্টিতে এবং বুদ্ধিদীপ্ত বচনে। এবং তখনই মনে হয়, এই দুটি শ্রেণীর স্বভাবগত পার্থক্য সব সময় রক্ষা করা যায়নি, লেখক 'আমরা'র বৈদগ্ধ্যকে মাঝে মাঝে 'তাঁহাদের' চরিত্রেও এনে ফেলেছেন। তাতে নাটক জমেছে ঠিকই, তবে লেখকের যা উদ্দেশ্য, দুটি শ্রেণীর স্বভাবগত পার্থক্য ফোটানো, তা বোধহয় সব সময় সম্ভব হয় নি। তবে 'তাঁহাদের' প্র্যাগম্যাটিক চিন্তা-ভাবনার ধাক্কায় বুদ্ধিজীবীর ভেতরকার 'সাধারণ' মানুষটি যেন 'পোজ'ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। অনেক সময় মনে হবে, লেখকেরই দুটি সত্তা, মুখোশ ও মুখশ্রীর মধ্যে লড়াই চলছে। যে কোনো স্তবক বা প্রস্তাবেই এই লড়াই লক্ষণীয়, তবে 'মনের কথা' প্রস্তাবে এই লড়াই বোধ হয় সবচেয়ে উপভোগ্য। প্রথম স্তবক 'বিরোধের কথা'য় দুটি শ্রেণীর যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, সুর, সঙ্গীত, মন, দেশ এবং সাধারণভাবে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে যে তর্ক হয়েছে, সবগুলিতেই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিভূমি বজায় আছে, মাঝে মধ্যে মিলে মিশে গেলেও। 'আমি' বিশুদ্ধ সুখের ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হয়, রাগ-রাগিনীর নানা পর্দার বিচিত্র মাধুর্যে তৃপ্তি পায়। এবং এই মুগ্ধ করবার ক্ষমতাকেই আর্টিস্টের পার্সোনালিটি বলে 'আমি' মনে করে। 'তাঁহারা' প্রকাশ বা একস্‌প্রেশন বলতে হয়তো মুখভঙ্গি বা গলার ভল্যুম বোঝেন। সেটা 'ব্যক্তিত্ব' নয়। মন, বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণ এবং ইচ্ছাশক্তি— সব মিলিয়ে স্রষ্টা এবং হয়তো

উপভোক্তারও পার্সোন্যালিটি গড়ে ওঠে। 'তাঁহারা'র সঙ্গে তর্কে 'আমি' এই সিদ্ধান্তে আসে। 'সঙ্গীতের কথা'য় 'তাঁহারা' 'আমি'র মুখে শুনেছে সঙ্গীতের ইতিহাস, ওস্তাদ ও সমজদারের কথা। এসেছে নানা সুরের মিশ্রণের কথা। এক লহমায় 'আমি' দেখিয়ে দিয়েছে রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিচিত্র সুরমিশ্রণের জাদু। পুরোনো সুরের শ্রেণীগত ছককে ভেঙে ফেলে, পুরনো চাল ভেঙে, সঙ্গীতের বাহ্যিক মাধুর্যের নতুন মাত্রা এনে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ একাধারে ওস্তাদ কবি ও আর্টিস্ট হয়ে বসেছেন। এই রহস্য কথা 'তাঁহারা' প্রায় শেষ অবধি শুনে গেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে নানা আপত্তি তুলে 'আমি' নিজেই সে আপত্তি খণ্ডন করেছেন। হয়তো এও এক এক ধরনের বুদ্ধির কসরত দেখানো· দাম্ভিকতার প্রমাণ। তাই তর্কের পর মুড়ি খাওয়া শুরু হলে 'তাঁহারা' দাম্ভিক বুদ্ধিজীবীর কাছে খানি লঙ্কা চেয়েছেন। খাদ্যরসেও যাতে দাম্ভিকতার স্বাদটুকু থেকে যায়।

'মনের কথা'য় অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রে কর্মচাঞ্চল্যের মূলে যে মানসিকতা রয়েছে তার থেকে কাজ ও মানসিক গতি-প্রকৃতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন 'আমি'। উদ্দেশ্য· অসহযোগ আন্দোলনের প্রকাশকে ক্ষণস্থায়ী চাঞ্চল্য বলে প্রমাণ করা, উত্তেজনার পেছনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অভাবকে দেখানো, আন্দোলনকে ধর্মীয়সংস্কারের মতো কোনো কিছু আবেগ বলে বোঝানো। সেই-সূত্রে 'তাঁহারা'র সঙ্গে বুদ্ধিজীবী 'আমি'র তর্ক শুরু হয়েছে। নিছক বুদ্ধিজীবীর হৃদয়হীন গণসম্পর্কহীন চিন্তা-ভাবনা কোনো বড় আন্দোলন আনতে পারে না। সব মানুষকে এক করতে গেলে, একটি উদ্দেশ্যের সামনে সংহত করতে গেলে কেবল বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়, গোটা সমাজকেই এক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই সূত্রেই পার্সোন্যালিটি এবং ইনডিভিজুয়ালিটির পার্থক্য নিয়ে কথা উঠেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং দেশাত্মবোধ দুটিই এক সঙ্গে চলতে পারে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানচর্চার মতো স্বদেশ চর্চাতেও নিজের স্বার্থ ভুলতে হয়। এই সূত্রে 'তাঁহারা' যেমন যুক্তিসঙ্গত তর্ক তুলেছেন, বুদ্ধিজীবী 'আমি'ও তেমনি নিজেদের ভীরু, লোভী, অপদার্থ সাবধানী বলে আত্মসমালোচনা করতে ছাড়েন নি। এবং 'তাঁহাদের' এইটেই বিশেষত্ব যে 'সময় গেলেই আসব' বলতে দ্বিধা করেন না, দুপক্ষের র‍্যাপোর্টেই যে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে তা 'তাঁহারা' বুঝতে পারছেন। 'দেশের কথা'য় বিচিত্র জাতের বাসস্থান এই ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমরা আছি তাকে বোধ-বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করেই যে

স্বাদেশিকতার অধিকার অর্জন করতে হয় সে সম্পর্কে 'আমি' সজ্ঞান করে দিয়েছে 'তাঁহাদের'। অন্যদিকে 'তাঁহারা' নিছক মূল্যবোধ-চিন্তা না ক'রে কাজে-কর্মে কাপুরুষতা ও পরনির্ভরশীলতা ভাঙতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী নিজের সীমা বুঝে 'তাঁহাদের' সঙ্গে আবার মিলতে চেয়েছেন। 'স্ত্রী-পুরুষের কথা'-তে 'তাঁহাদের' প্রাধান্য কম, তবে 'আমি' যেভাবে স্ত্রী-পুরুষের মোহমুক্ত সম্বন্ধের কথা নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছেন তাতে অন্য পক্ষের প্রশ্নগুলোই শুধু 'আমি'কে উস্‌কে দিয়েছে এবং মেয়েদের আইডেন্‌টিটিকে বুঝে তাদের শিক্ষাদীক্ষায় বড়ো করে স্ত্রী-হিসেবে তাদের উপযুক্ত হতেই 'আমি' তার বিদ্যে-বুদ্ধি উজার করেছে। মোহমুক্ত স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে 'তাঁহারা' ঠাট্টা করেছে 'বাড়ী গিয়ে একটু মোহমুক্ত হইগে' বলে, এবং 'তাঁহারা' বুদ্ধিজীবীর আড্ডাখানা একেবারে ছাড়ছেন বলাতে বুদ্ধিজীবী 'আমি'কে বলতে শোনা গেছে, 'তাই কি হয়। নিজেকে অসাধারণ ভাববো কি দিয়ে।'

এই ঠাট্টায় বুদ্ধিজীবীর আত্মম্ভরিতার সকৌতুক প্রকাশ যতই হোক না কেন, সব কটি প্রস্তাবেই বোঝা গেছে বুদ্ধিজীবীর আমিত্ব 'তাঁহারা' ছাড়া থাকতে পারে না। 'তাঁহারা'ও অবধারিতভাবে 'আমি'র কাছে হাজির হয়ে যান তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সহজবুদ্ধিকে শানিয়ে নিতে। দুয়ে মিলেই সমগ্র মানবতা। সম্পূর্ণ আমরা কিংবা সম্পূর্ণ তাঁহারা। তীক্ষ্ণ কৌতুকে ধূর্জটিপ্রসাদ বুদ্ধিজীবীর সংকীর্ণতা এবং অভিজ্ঞতাজীবীর অনৈতিহাসিকতা ও অবৈজ্ঞানিকতাকে পরস্পরসাপেক্ষ একটি সমগ্র সত্তা হিসাবেই দেখাতে চেয়েছেন। ঠিক এ জাতীয় সমাজবিদের নাটকীয় প্রস্তাব বা প্রবন্ধ আগে বাঙলায় লেখা হয় নি। ভাবে ভঙ্গিতে উপভোগ্যতার দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্যের সঙ্গে দূরাগত একটা সাদৃশ্য হয়তো টানা যায়— উপস্থাপনার ক্ষেত্রে যতই পার্থক্য থাক না কেন।

'চিন্তয়সি' প্রবন্ধের সংকলন। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৩ সালে। এর কিছু আগেই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় বেরিয়েছিল। সুতরাং এই প্রবন্ধগুলিও 'আমরা ও তাঁহারা'র মতো বিশ-তিরিশের দশকের সন্ধিতে লেখা বলে ধরে নিতে পারি। প্রথম প্রবন্ধ 'কস্মৈ দেবায়' জীবনের বিকাশে কোন্‌ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্ভরযোগ্য সেই নিয়ে জল্পনা। খুব সহজ ভঙ্গিতে জীবন-ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নানা পরস্পর-বিরোধী বৈচিত্র্য দেখিয়ে যুক্তির অবিচ্ছিন্নতাতেই ধূর্জটিপ্রসাদ আস্থা রাখতে পেরেছেন। নানা মত ও

পথের গোলকধাঁধায় পড়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে হয়েছে, যে কোনো মত প্রতিষ্ঠার পেছনে সেই সময়কার ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থরক্ষার চেষ্টা কখনো প্রকাশ্যে কখনো অপ্রকাশ্যে কাজ করে। কি বিজ্ঞানে, কি দর্শনে, কি সমাজতত্ত্বে। সেইজন্যে এখনো সত্য প্রকাশিত হয় নি, মানুষের কাছে এখনো যুক্তির অকাট্যতা পরিষ্কার হয় নি। কাজেই পদ্ধতিতে খুঁত রয়েছে বলেই সিদ্ধান্ত করা এখনো হঠকারিতা। কিন্তু 'নর্মাল' প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাভারেজকে ব্যঙ্গ করে লেখা একটি অসাধারণ রম্যরচনা। ব্যবহারিক ও প্রাকৃতিক জগতের স্বভাব-নির্ণয়ে আমরা গড়পড়তা স্বাভাবিক একটা আদর্শ বার করি সংখ্যার আশ্রয়ে। বহু প্রমাণে কিছু কিছু এ্যাবনর্ম্যালিটি পেলে সেগুলি বাদ দিয়ে গড়পড়তা নর্ম্যালসি পেয়ে আমরা নিশ্চিত হই। বাজারের দাম থেকে আবহাওয়ার গতিবিধি সবই গড়পড়তা হিসেব বা নর্ম্যাল আবিষ্কারের মাধ্যমে ঘটে থাকে। কিন্তু বাস্তব জগতে কাজের সুবিধার জন্যে সংখ্যার হিসেবে যে নর্ম্যাল-কে আমরা শ্রদ্ধা করি, রাজনীতিতে যখন আমরা সোস্যালিস্ট হই তখন একটি সামাজিক নর্ম্যালের কাছে আমরা নিজেদের বিকিয়ে দিই তাকে সমাজ-মনেরই আয়না বলে ধরে নিয়ে। প্রচণ্ড চাপা বিদ্রূপে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, এই আত্মবলির নাম জার্মান ড্রিল। এই মন্ত্র জপে জপে ব্যক্তিমন ঘুমিয়ে পড়বে। একদলতন্ত্রের কিংবা সাধারণভাবে দলতন্ত্রের প্রতি এমন তির্যক বিদ্রূপ জর্জ অরওয়েলের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।

তেমনি আরেকটি চমৎকার প্রবন্ধ 'যোগধর্মের যুক্তি'। অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে কোনো যুক্তি না পেয়ে লেখক সাধারণ বিচারবুদ্ধির শক্তি ও সম্ভাবনাকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। প্রতিভার মধ্যে যে অসাধারণত্ব দেখি তা মার্জিত বুদ্ধিরই অভিজ্ঞতা। মানুষের সমস্ত ধারণা ও কর্মশক্তিকে যদি একটি কোনো যোগশক্তি বা লিবিডো বা ঐশীশক্তি বা ওই জাতীয় কিছুরই একপেশে প্রকাশ বলে ধরি, তাহলে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা বলে কিছু থাকে না। ধূর্জটিপ্রসাদ ব্যক্তির সেই স্বকীয় আমিত্বেই আস্থা রেখেছেন, রামেন্দ্রসুন্দর যেমন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সত্যতায় পরিবর্তনশীলতা লক্ষ্য করে এই অনিশ্চয়তার জগতে একমাত্র আমিত্বেই বিশ্বাস রেখেছিলেন ('জিজ্ঞাসা' বইয়ের শেষ প্রবন্ধটি স্মরণীয়)। ধূর্জটিপ্রসাদ রামেন্দ্রসুন্দরের ছাত্র বলেই হঠাৎ এই সাদৃশ্য তাৎপর্যপূর্ণ মনে হলো। 'যুগধর্মের অন্যদিক' প্রবন্ধে যুগধর্মের সঙ্গে দ্রষ্টার সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ বিশেষ কালের ভঙ্গিমা বা ফ্যাশান বাদ দিয়ে সেইকালে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য ও দার্শনিক উপলব্ধির

সঙ্গে 'যথাসম্ভব' যুক্ত একটি পার্সোন্যালিটিকে ধরতে চেয়েছেন। এই পার্সোন্যালিটি যে বিজ্ঞান বা দর্শন বা অন্য শাস্ত্রের সবটাই বোঝে তা নয়, কিন্তু মূল উদ্দেশ্যটা বুঝে তাকে সজীব রেখে মূল্যবোধ বা অন্য ভাষায় 'ধর্ম'-কে অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। এই মূল্যবোধ রাখতে গিয়ে হয়তো তথাকথিত সব 'আধুনিক'কে নেওয়া যায় না, তথাকথিত প্রাচীনকেও পুরোপুরি ফেলা যায় না। অর্থাৎ পার্সোন্যালিটির সঙ্গে যুগের সম্পর্ক স্থাপনে একটা বাছ-বিচারের প্রশ্ন আসে। কিন্তু অনেক ছড়ানো কথার মধ্যে প্রবন্ধের এই সারাংশটুকু খুঁজে নিতে একটু যেন কষ্টই হয়।

বিশ-তিরিশ দশকের সন্ধিতে বাঙলা সাহিত্যের লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আদর্শবাদ বনাম বস্তুতন্ত্র নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল তার একটি জবাব হলো 'সাহিত্যিকের যুক্তি তথা সাহিত্যে মিথ্যাবাদ'। কল্পিত সত্য বা আনুমানিক সত্য আদর্শবাদী বা বস্তুবাদী সাহিত্যিকের কাছে আদরের জিনিস হতে পারে, কিন্তু যথার্থ আর্টিস্ট এই দুটির একটিকেও যথার্থ সত্য মনে করেন না। এইজন্যেই যথার্থ সত্য ফোটাতে গিয়ে শরৎচন্দ্র নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন যা ব্রাহ্ম-আদর্শেরই অনুকূল, উদার হিন্দু পরিবারের তো বটেই। কিন্তু এই ধারণা বেশি রুচিবাগীশ হিন্দু-ব্রাহ্ম কারুরই পছন্দ না হতে পারে। কারণ আর্টিস্টের যথার্থ সত্যবোধ থেকে তাঁরা বাইরে রয়েছেন, সেই অর্থে তাঁরা মিথ্যাবাদী। আবার রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, পোস্টমাস্টার কি বোষ্টমীতে যথার্থ বস্তুতান্ত্রিকতার প্রমাণও আছে, কিন্তু সত্য সন্ধানও আছে। কাজেই যথার্থ আর্টিস্ট সম্পূর্ণ ও সংহত দৃষ্টিতেই দেখেন, একপেশে মিথ্যাবাদকে তাঁরা প্রশ্রয় দেন না। এই রকম একটি আর্টিস্টিক সত্যদৃষ্টিকে খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। 'সমাজধর্ম ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি খুবই মূল্যবান। আধুনিক বাঙলা সাহিত্য-সমালোচকরা যে পরিবর্তনশীল সমাজ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে গভীর আলোচনায় আগ্রহী নন তা বিশ-তিরিশ দশকের সন্ধিতে মোটামুটি স্পষ্ট। নতুন চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে তখনকার কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকেরা যেটুকু আগ্রহী হয়েছেন তাতে হয়তো পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক মনোভাব ছিল না, হয়তো তাঁদের গণতান্ত্রিক চেতনা, সোস্যালিস্ট চিন্তা-ভঙ্গি বা মার্কসীয় শ্রেণীতত্ত্ব নির্ভর চিন্তায় গভীর মনোনিবেশের বদলে ভাবপ্রবণ আগ্রহই ছিল বেশি, তবু তাঁদের নতুন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে শনিবারের চিঠির লেখকগোষ্ঠী কোনো নতুনত্বই যে দেখেন নি এটাই ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে আশ্চর্য ঠেকছে। অথচ শুধু গালিগালাজ নয়,

পুরোনো সংস্কৃতির মূল্যকে নতুন আদর্শে যাচাই করে নেওয়া এবং ভবিষ্যৎ ভব্যতা ও বৈদগ্ধ্যের আদর্শ সৃষ্টি করাই তো তাঁদের উচিত কাজ। সামাজিক ধর্ম যদি মার্কসের মত অনুযায়ী শ্রেণীগত ধর্মও হয় তবে সে শ্রেণীগত ধর্ম বদলাচ্ছে, ব্যক্তিগত ধর্মও বদলাচ্ছে, যৌন সম্পর্ক বদলাচ্ছে, সাধারণভাবে মানবিক সম্পর্কই অনেকটা বদলে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে যে সমাজ বদলাচ্ছে তাতে মানুষও বদলাচ্ছে, কিন্তু সাহিত্য সেই পরিমাণে এই নতুন মানুষগুলিকে আনতে পারছে না। সাধারণভাবে একটা পরিবারের মধ্যে ও বাইরে যে পরিবর্তন চোখে পড়ছে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে, চাকর-বাকর সম্পর্কে, মুটে-মজুর সম্পর্কে তার ইঙ্গিতগুলো সাহিত্য তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে সামগ্রিক ভারসাম্য থাকছে না বলে অবহেলিত শ্রেণীর জীবন নিয়ে রচিত গল্পে-উপন্যাসে আন্তরিকতার অভাব থেকেই যাচ্ছে। শিক্ষাদীক্ষার অভাবে দরিদ্র তার যথার্থ অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে পারছে না, নেতৃত্ব দিতে পারছে না। অন্যদিকে অধ্যাপক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মজুর-সাহিত্য লিখছেন। অবহেলিত মানুষের দুঃখ বুঝবার মতো অভিজ্ঞতা এই শ্রেণীর নেই। সহানুভূতি ছাড়াও, লেখকের মতে, কার্ল মার্কসের বই পড়তে হয়, বুঝতে হয় তাঁর মত এদেশে কতখানি খাটে বা খাটে না। এই অভিজ্ঞতা ও বোধ-বুদ্ধির অভাবেই মধ্যবিত্তের সমাজচেতনা অনেকটাই ভাববাদী, তার লেখাও তাই। বিশের দশকের শেষে লেখা এই প্রবন্ধে অনেকটাই নতুন চিন্তার খোরাক ছিল একথা মানতেই হবে। 'বিশ্বকবি' কথাটির গভীর তাৎপর্য ফুটেছে 'বিশ্বকবি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবি-ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যায়। 'ব্যক্তি' তাঁর সৃষ্টির প্রেরণায় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সর্বজনের সঙ্গে মৈত্রীভাব স্থাপন করেছে বলেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। সৃষ্টির ধারা তাঁর ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় ক'রে ভবিষ্যৎ গতি নির্ধারণ করে বলেই তিনি বিশ্বকবি। শুধু আমাদের বা অন্যের ঐতিহ্য-আশ্রিত নন তিনি, তিনি আমাদের ও অন্যের সৃষ্টি-ধারার প্রধান প্রধান পর্যায়গুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পর্যায়গুলির ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতির ইঙ্গিত দিচ্ছেন। এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে এই তাৎপর্যময় বিশ্বকবিত্ব নিশ্চয় নতুনভাবে দেখা।

'দেশের কথা' ও 'প্রগতি' দুটিই ক্ষুরধার দৃষ্টিভঙ্গির প্রবন্ধ। প্রথমটিতে আমাদের দেশের স্বদেশী আন্দোলনে অন্য অনেক ত্রুটির মধ্যে ধর্মভাব আর রাজনীতি মিশে গিয়ে একটা অবাস্তব পন্থা যে তৈরী হয়েছে মূলত গান্ধীজীর জন্যে, এটা ধূর্জটিপ্রসাদকে পীড়া দিয়েছে সেই তিরিশের দশকের সূচনায়।

এটাকে ধূর্জটিপ্রসাদ আদিমতা বলেই মনে করেন। ভাবাবেগ-মুক্ত হয়ে দেশকে না জানতে পারলে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও বাস্তববুদ্ধি-সম্পন্ন না হলে আমাদের পূর্বগৃহীত পন্থা-পদ্ধতির দোষ-ত্রুটি বুঝতে পারবো না। ভবিষ্যতের রাস্তাও পরিষ্কার হবে না। স্বাধীনতা পাবার ষোলো সতেরো বছর আগেকার এই চিন্তা-ভাবনা যে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিরই প্রমাণ তা স্বাধীনতার মুহূর্তে ধর্মোন্মাদনাতেই প্রমাণ হয়েছে। একই উন্মাদনাতে ভারতবর্ষ দুভাগ হয়েছে এবং অতি সম্প্রতি খালিস্তান-ভাবনা এবং ওই জাতীয় আরও কিছু ভাবনাও চলছে। 'প্রগতি' রচনাটি ঠিক প্রবন্ধ নয়, কতকগুলি চিন্তা-কণিকা এবং সে কণিকাগুলি প্রগতি-কেন্দ্রিক। ব্যক্তি, সমাজ এবং মনুষ্যত্বকেন্দ্রিক কতকগুলি অভিজ্ঞতার সারমর্ম। উন্নতি বলতে লেখক এখানে সমাজবদ্ধ ব্যক্তির আত্মিক বিকাশের কথাই বলেছেন। আত্মার বিকাশেই মানুষ একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, তাকে নিয়মে বেঁধে যে সভ্যতা তাতে মানুষ বড় জোর ভর্তা ও রক্ষক। এই আত্মিক বিকাশের সুযোগ যে সমাজে যতো বেশি সে সমাজ ততো উন্নত। সংখ্যা দিয়ে বা তুলনা করে এই আত্মবিকাশকে মাপা যায় না। এই আত্মবিকাশকে ধূর্জটিপ্রসাদ 'বৈদগ্ধ্য' বলেছেন।

বুদ্ধির সঙ্গে দৃষ্টির সমগ্রতাই বৈদগ্ধ্য। মনে হয়, বিজ্ঞান হোক, মনুষ্যত্ব হোক, সাহিত্য হোক বা দেশের প্রগতির কথাই হোক, সর্বত্রই ধূর্জটিপ্রসাদ একই সঙ্গে এক বৈজ্ঞানিক মন ও দৃষ্টির সমগ্রতাকেই খুঁজেছেন।

'চিন্তয়সি'র "দেশের কথা" প্রবন্ধে যে ধর্মবিশ্বাসের কথা তুলেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ প্রায় পঁচিশ বছর বাদে 'বক্তব্য' বইয়ের অন্তর্গত নব্য সমাজদর্শনের ভূমিকায় সেই ধর্মবোধভিত্তিক ভারতবর্ষ (লক্ষ্য যার রামরাজ্য) এবং পাকিস্তানের প্রসঙ্গই এসেছে। কিন্তু আসল রাষ্ট্র যে ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্রের টানাপোড়েনে তৈরী এই নব্য সমাজদর্শন আমরা বুঝি নি বলে ধূর্জটিপ্রসাদের যথেষ্ট দুঃখ ছিল। ব্যক্তি যেমন দুঃসাহসের অভিলাষী, জাতি তেমনি শক্তি-প্রসারে। ন্যাশানাল স্টেট তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকে সংযত হতে হয়। তখন ব্যক্তির স্বাধীনতা বনাম রাষ্ট্রের ব্যক্তিদমনের লড়াই চলে। দুয়ের স্বার্থরক্ষার একটা প্রয়োজনীয় পরস্পর-সাপেক্ষ নীতি নির্ধারণ করাটা সমাজদর্শনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ধর্মীয় বিশ্বাসের ভণ্ডামি এখন সবাই বোঝে। মানুষের ইনেট গুডনেস যা আছে তার ওপর বিশ্বাস রেখে কিছু করতে গেলে কালো বাজারই সাদা বাজার হয়ে যায়, হয়ে গেছেও। নতুন

সমাজে মানুষ নিছক ব্যক্তিসত্তা নয়, ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ববোধও রয়েছে। দুয়ের ভারসাম্যেই সমাজবাদী রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে। সমাজের সঙ্গে সংযোগবোধকেই ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধ 'নব্য সমাজদর্শনের প্রতিজ্ঞা'তে 'পুরুষ' শব্দটি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। 'ব্যক্তি'কে তিনি সমাজ-বিচ্ছিন্ন একাকিত্বের অভিমুখী বলে মনে করেছেন। জাতপাতের শ্রেণীগত পার্থক্যের পাশাপাশি আর্থিক শ্রেণী গড়ে উঠেছে, যার হাত থেকে মুক্ত হতে গেলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজের কথাই ভাবতে হয়, যেখানে সব ব্যক্তিই সমগ্রতার বোধে 'পুরুষ'। এই ব্যক্তি বনাম সমাজের টানাপোড়েনের সূত্রেই তৃতীয় প্রবন্ধ 'মার্কসবাদ ও মনুষ্যধর্ম' রচিত। এখানেও নিছক ব্যক্তিত্বের ওপর জোর না দিয়ে গোষ্ঠী বা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যোগেই যে পুরুষত্ব তাকেই মেনে মার্কসবাদ ও মনুষ্যত্ববিকাশের সম্পর্কটিকে বোঝাতে চেয়েছেন। হয়তো ভেবেছেন ওই পথেই ব্যক্তির যথার্থ বিকাশ সম্ভব। সমাজে নিছক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কোনো স্থান নেই। তেমনি স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের বিভেদ বা মতপার্থক্য ধূর্জটিপ্রসাদকে ভাবিয়ে তুলেছে। হয়তো বামপন্থীদের সঙ্গে দেশের সাধারণ শ্রমিক-কৃষকদের যথোচিত যোগাযোগ ঘটছে না, হয়তো বা শ্রমিক-কৃষকেরা নিজেরাই পরিণত নয়। পার্থক্যের কারণ নির্ণয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ খানিকটা সন্দিহান কিন্তু শ্রমিক-কৃষকদের পরিণত করার দায়িত্ব যে থেকেই যাচ্ছে সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই। শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া ছাড়াও বোঝাপড়ার অভাব যে বামপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করেছে সে কথা ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন নি। তবু একটা মন্তব্য করেছেন মতপার্থক্য সম্পর্কে—প্রশ্নের আকারে—বামপন্থীদের অন্তর্বিবাদের কারণ কি ব্যক্তি-হিংসা? মনে হয়, অনেকটা তাই। ব্যক্তিহিংসা এবং ব্যক্তিস্বার্থরক্ষার আকাঙ্ক্ষা। দলের প্রতীক গ্রহণ করার পেছনে এই প্রবৃত্তিই মূলত কাজ করে। এইজন্যেই তাদের অন্তর্বিবাদ এখনও ঘোচে নি, দল-নিরপেক্ষরাও তাদের সম্পর্কে মোহ কাটিয়ে দূরে রয়েছে।

সমাজবাদী দৃষ্টি থেকেই ইতিহাসের মূল ধারাটির ইঙ্গিত করা হয়েছে 'ইতিহাস' বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধে। মানুষ যে উপায়ে বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করছে কিংবা জয় করতে চেষ্টা করছে তারই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকবে তার ইতিহাসে, শুধু দেশভেদে তার পারিপার্শ্বিক বদল হবে। ইতিহাস বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধে অন্যান্য দেশের কথা থাকলেও মূলত ইংল্যাণ্ডের ঐতিহাসিক রূপরেখাটিকে ধরা হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দেশের পারিপার্শ্বিক

অবস্থার ব্যাপারে আমাদের অজ্ঞতা আমাদের বিচিত্র জ্ঞানান্বেষণকে যে অর্থহীন ক'রে আমাদের সমাজ-ইতিহাসকে অস্পষ্ট করে রাখছে সে সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের কঠিন সত্যোপলব্ধি। ইতিহাস বিষয়ক তৃতীয় প্রবন্ধটিতে সামাজিক শ্রেণীর উৎপত্তির কারণ ও ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। অতি পরিচ্ছন্ন ভঙ্গিতে, বিরোধের অবসান ঘটিয়ে কীভাবে শ্রেণীর আধিপত্য ঘটতে পারে তারও ইঙ্গিত আছে। তিরিশ-চল্লিশের দশকের লেখা এই প্রবন্ধগুলি বাঙলায় লেখা মার্কসবাদী রচনার খুবই তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল সূচনা এবং আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় এই সমাজ-চিন্তা-ভাবনার ফসলগুলিকে এখনও অনাদৃত রাখা হয়েছে ভাবলে খুবই দুঃখ হয়।

সংস্কৃতি-চিন্তা পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই প্রাধান্য পেয়েছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে, তাঁর মৃত্যুর অব্যহিত পরে বা কিছু পরেই এইসব প্রবন্ধগুলি লেখা। এই লেখাগুলির পরবর্তী তিরিশ-চল্লিশ বছরে অনেক কিছু লেখা হয়েছে তুলনা ক'রে বিশ্লেষণ ক'রে, রূপ-রীতির নানা রহস্য আবিষ্কার ক'রে কিংবা নানা দৃষ্টিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের আবরণ উন্মোচন ক'রে। তবু এমন পরিচ্ছন্ন কাটা-ছাঁটা পরিমিত প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তগুলি এখনও অম্লান। ভাবোচ্ছ্বাসের আবেগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়োরোপীয় কোনো মনীষীর তুলনা করা প্রায় প্রথাগত এবং হাস্যকর হয়ে পড়েছে। ইয়োরোপ সম্পর্কে আমাদের দাসমনোভাব আমাদের প্রতিভাকে যথার্থ বিচারে বাধা দেয়। তাই উচ্ছ্বাস ও হীনমন্যতা বাদ দিয়ে গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের তুলনায় দুজনেরই সীমাবদ্ধতা ও অদ্বিতীয়ত্বের কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। তুলনার ক্ষেত্রে তুলনীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও পরিপ্রেক্ষিত-চেতনা যে অপরিহার্য সে সম্পর্কে সজাগ করে দিয়েছেন পাঠককে। কীভাবে রবীন্দ্রনাথ নামক একটি ব্যক্তির সৃষ্টি যে সমগ্র জাতির বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত তা 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি' প্রবন্ধে যতখানি সংহত ও তীক্ষ্ণভাবে বলেছেন তার তুলনা পঁয়তাল্লিশ বছর বাদেও তেমন পাই নি। রবীন্দ্র-সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতে সমগ্রতাবোধের অভাব কোথায়, সাহিত্যিক ও সামাজিক আলোচনার সীমাবদ্ধতা কোথায় তার চমৎকার বিশ্লেষণ আছে 'রবীন্দ্র-সমালোচনার পদ্ধতি'তে। রবীন্দ্রনাথের ছবি আপাতদৃষ্টিতে খাপছাড়া মনে হলেও যে একই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এ মত এখন প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রথম সূচনা বোধ হয় ধূর্জটিপ্রসাদেরই 'রবীন্দ্রনাথের চিত্র' প্রবন্ধে। কিন্তু 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ও গায়ন-পদ্ধতি' প্রবন্ধে গায়ন-পদ্ধতি সম্পর্কে তখন কেউ ভাবেননি এমন সব কথা, এবং সঠিক কথা থাকলেও রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে

অনেক মন্তব্য বেশি সংক্ষিপ্ত বলেই সংশয়মুক্ত নয়। বিশেষ রাগরূপকে ভেঙে কবিতার ভাবকে মূর্তি দিয়েছেন তিনি ঠিকই। তবু, রবীন্দ্র-সঙ্গীত কেন বর্ণসঙ্কর নয়, তা অব্যাখ্যাত থেকে গেছে। বিশেষ রাগরূপে ভাবকে প্রকাশ করতে না পেরে যদি তিনি রাগভ্রষ্ট হয়েই থাকেন তবু কেন যে তিনি 'রীতি বিগর্হিত কাজ করেন নি' তা একটু উদাহরণ বিচারের অপেক্ষায় রাখে। কিন্তু সঙ্গীতের বৈচিত্র্য যে রবীন্দ্রনাথের পার্সোন্যালিটির সঙ্গে কতোখানি যুক্ত তার খুবই দক্ষ ইঙ্গিত আছে এখানে। কিন্তু specific মনোভাব ব্যক্ত করে বলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধারণ সভায় নির্জীব ধূর্জটিপ্রসাদের এই সিদ্ধান্ত বোধ হয় তর্কসাপেক্ষ। সাধারণ সভার চরিত্রের ওপর গানের তারিফ নির্ভর করে। বিশুদ্ধ রাগ-রাগিনীর শ্রোতা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রোতা, ফিল্‌মের গানের শ্রোতা এক জাতীয় হতে পারে না। ব্যতিক্রম থাকতে পারে, তবে সাধারণত এক জাতীয় হয় না। রবীন্দ্র-জন্মতিথি উৎসব সম্পর্কে কিছু স্পষ্ট কথা আছে একটি প্রবন্ধে যাতে রবীন্দ্রনাথকে দলে টানা, তাঁকে বিশ্লেষণ না করে উচ্ছ্বাস করা, রবীন্দ্রনাথের নাটক, গান ও কবিতা পরিবেশনের দৈন্য, বিষয়ভিত্তিক রবীন্দ্র-রচনা সম্পাদনের অভাব ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা আছে যা ছত্রিশ বছর পরেও মূল্যবান। 'কবির নির্দেশ' প্রবন্ধটিও সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার স্বরূপ, তাঁর বহু বিচিত্র-মুখী ব্যক্তিত্বের সামগ্রিকতা, রাজনীতি আর কালচারের একাত্মতা, তাঁর ঐতিহাসিক চেতনার গণমুখিতা ইত্যাদিকে এক লহমায় ধরে দিয়েছে। একই সূত্রে 'রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি' প্রবন্ধটি রাখা যায়। কারণ রবীন্দ্রনাথের একই ব্যক্তিত্ব থেকে তাঁর কবি-প্রতিভা ও সমাজ-রাজনীতি চিন্তার বিকাশ ঘটেছে, কবিতায় যে মহামানব কল্পনা, চিন্তায় সেই মহামানবেরই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তাঁর জীবনে কীভাবে বিবর্তিত ও বিচিত্রিত হয়েছে তা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জীবনের সারমর্মটি তিনি তুলে ধরেছেন কবিতায়, নাটকে, গানে, সমাজ ও রাজনীতি চিন্তায়— এই অর্থেই তাঁকে জেনে বিশ্ববোধে উদ্বুদ্ধ হতে হয়— 'বিশ্ব' সম্বোধনটির মধ্যে তার রচনার অন্তর্গত সেই চিরন্তন লক্ষণটির ইঙ্গিত আছে। অন্য স্রষ্টার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারেও ওই লক্ষণটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলেই তাঁর বৈশ্বিক সত্তাটি মর্যাদা পায়। রবীন্দ্র-বিষয়ক সব কটি প্রবন্ধের মূল দৃষ্টিভঙ্গিটি হলো সংযম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার ক'রে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সত্তার অন্তর্নিহিত পার্সোন্যালি-টিকে বুঝতে চেষ্টা করা— যে চেষ্টাটি রবীন্দ্র-সমকালে এবং একটু পরবর্তীকালেও ভাবোচ্ছ্বাসে কখনোই ঘটে ওঠেনি। পরে ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে।

পরবর্তী প্রবন্ধগুলির প্রথমটি 'প্রগতি'। এক এক যুগে এক এক দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতির লক্ষণ হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু পরিবর্তনশীল সমাজের কারণগুলো সাহিত্যের বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে না পারলে শুধু অভাববোধের দুঃখ প্রকাশ করলে রোম্যান্টিকতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তাই লেখকের মতে, পরিবর্তনের কারণগুলো কাহিনী বা নাট্যরূপের মধ্যে বোঝাতে না পারলে শুধু আঙ্গিকের নতুনত্বে প্রগতির সার্থকতা ফুটে ওঠে না। 'বর্তমান সাহিত্যের মূলকথা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী কালের সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা আছে। বিশেষ করে চল্লিশের দশকের শেষ দিকে রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের ইমেজ ব্যবহারের পার্থক্য সম্পর্কে যে সচেতনতা এখানে স্পষ্ট, তা ওই সময়ে কারো লেখায় তেমন দেখি না। বিশেষ করে আধুনিক কবিতায় ইমেজের ভিড় যে অনেক সময়েই দুর্বোধ্যতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ আছে। আরো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সময় যে এসেছে তার ইঙ্গিতও আছে।

তেমনি 'গদ্য-কবিতা' প্রবন্ধে গদ্য কবিতার পেছনে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে তার আলোচনা। খানিকটা অ্যান্টি-রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি, বহির্মুখিতা ও বস্তুজগতের প্রতি একটু সশ্রদ্ধ মনোভাব এগুলিই গদ্যকবিতা প্রচলনের প্রথম যুগে চলতো। মিল বর্জনের কারণ হিসেবে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন সংস্কৃত সাহিত্যের শব্দ সম্পদের সঙ্গে অপরিচয়, কঠিন শব্দের প্রতি ভয়, কবিতাকে গণ্ডিবদ্ধ করে ফেলার ভয় ইত্যাদি। তাছাড়া ভাবনার নতুনত্ব এবং কবিতার বাক্যে বিশেষণ প্রয়োগের অপ্রয়োজনীয়তাও অনেক সময় কবিতাকে গদ্যের দিকে নিয়ে যায়। যদিও বিশেষণহীন হন সহজ গভীর কবিতার কিছু অভাব নেই বলেই মনে হয়। আসলে কন্টেন্টের তাগিদে গদ্য কবিতাই অপরিহার্য কিনা তা দেখতে হবে— ধূর্জটিপ্রসাদের এই মন্তব্যের পরেও বলতে হয়, প্রতিভায় সবই inevitable হয়ে আসে— তা সে গদ্যেই আসুক বা পদ্যেই আসুক।

'আষাঢ়ে' প্রবন্ধটি একটু ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে শুরু হলেও মূলত খুবই গভীর দৃষ্টিতে বাঙালী জাতির আত্ম-সমালোচনা। অবাঙালীর দৃষ্টিকে সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে। অবশেষে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের একটি ছক করেছেন লেখক। ভৌগোলিক সংস্থান, রক্তের মিশ্রতা, কৃষিকাজ ও ভূমিস্বত্বের বৈশিষ্ট্য— এক কথায় তার উৎপাদনশক্তির ব্যবহার, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য— ভাবগত, মনোগত, বুদ্ধিবৃত্তিগত ও চারুকলাগত বৈশিষ্ট্যের ধারা ইত্যাদি মিলে যে সামাজিক ইতিহাসের বিস্তার তার একটা মোটামুটি ধারণা দিয়েছেন

সেই পথেই পরবর্তী ঐতিহাসিকরা ধীরে ধীরে এগিয়েছেন। 'সঙ্গীত সমালোচনা' প্রবন্ধে সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য ও পরিবর্তনকে সংক্ষেপে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং সাঙ্গীতিক সমালোচনার অভাবের কারণগুলিকে যে তীক্ষ্ণতার সঙ্গে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে এখনও পর্যন্ত তার তুলনা বিরল। মূল্যবোধের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মনোভাব মিলিয়ে সুরের সৌন্দর্যতত্ত্ব তৈরি করতে হবে। সে তত্ত্বের ভিত্তিতেই সুরজ্ঞানী উদার-গম্ভীর অথচ রসিক সঙ্গীত সমালোচক এগিয়ে আসবেন সংস্কৃতির একটি বড় দিকের বিচারকের অভাব পূরণ করতে। 'অথ কাব্যজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটিতে খুবই বিস্তৃতভাবে সমাজসত্তার সঙ্গে সাহিত্য-শিল্পের যোগ দেখিয়েছেন ধূর্জটিপ্রসাদ। সেই সূত্রে সমাজসত্তার বিশ্লেষণে শ্রেণী বিরোধের অপরিহার্য ভূমিকা, সমাজসত্তাকে অবহেলা করা সাহিত্যের ঠুন্‌কো বেলোয়ারী ভঙ্গি, যে জমির সঙ্গে আমাদের সমাজসত্তার নাড়ীর যোগ সাহিত্যের স্রষ্টা ও বিষয় হিসেবে সেই জমি-নির্ভর মানুষগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং ইতিহাস-সচেতন হয়ে নতুন সমাজ গড়ার সঙ্গে যুক্ত থেকে সৃষ্টি করতে পারলেই যে সেই সৃষ্টির সার্থকতা— এই সব বিষয়ে তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এমন বিস্তৃত বিশ্লেষণ বড় একটা চোখে পড়ে না। তবে একথা ঠিক, এবং হয়তো এখনও অনেকাংশে ঠিক যে, তিরিশের দশক থেকে সমাজবাদী দৃষ্টিকোণে সাহিত্যের বস্তুবিচারই বেশি হয়েছে। তার প্রকাশের শিল্পরূপ নিয়ে তুলনায় আলোচনা হয়েছে কমই। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ বুঝেছি ঠিকই, তার শেকড়ের গভীরতা সম্পর্কেও আমরা নিঃসন্দেহ, কিন্তু কাহিনীর যৌক্তিকতা, চরিত্রের স্বাভাবিকতা, ভাষার সূক্ষ্ম কারুকাজ কীভাবে পাঠকের মনে ফলশ্রুতি ঘটাচ্ছে, স্রষ্টায় পাঠকে এবং পাঠকে পাঠকে যোগ ঘটাচ্ছে সে সম্পর্কে ভালো আলোচনা খুব কমই হয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদেরা যে কাজ শুরু করেছিলেন সে কাজ এখনও অনেক বাকি আছে। শেকড় চিনেছি, কিন্তু শাখা-প্রশাখার ঝুলন্ত ফুল-ফলের রঙ-বাহার ও গড়নের রহস্যভেদের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক রোমাঞ্চময় আগ্রহী মন এখনও পুরোপুরি তৈরি হয় নি। কিন্তু শুরু যে হয়েছিল তার প্রমাণ ধূর্জটিপ্রসাদেরই 'রবীন্দ্র-সমালোচনা-পদ্ধতি' বা 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও গায়ন পদ্ধতি'র মতো প্রবন্ধ।

শেষ প্রবন্ধ 'নতুন ও পুরাতন' খুবই মূল্যবান। শুধু ধূর্জটিপ্রসাদের নিরপেক্ষ আত্মবিচার নয়, তাঁর যুগের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর নিরপেক্ষ আত্মবিচার বলেও বটে। ছাত্রজীবনে নামজাদা অধ্যাপকদের সঙ্গ ও বহুবিদ্যার চর্চা, পরে প্রমথ চৌধুরীকে কেন্দ্র করে বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নির্ভর করে বিদেশী

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সামাজিক আদর্শকে আত্মসাৎ করে 'এগিয়ে' চলা, ইতিহাসের ব্যাপক গতিবিধি না বুঝে, স্বদেশী কর্মের ত্রুটিগুলির দিকে না তাকিয়ে বাস্তব অবস্থাকে বিচার না করা, নতুন সমাজ সংহতি গড়ার ক্ষেত্রে চিরন্তন সংগ্রামকে মেনে না নিয়ে স্বার্থান্ধের মতো শান্তির জন্যে লালায়িত হওয়া, এক কথায়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর না করে নিছক বুদ্ধিতে, তর্কে ও কল্পনায় আত্মকেন্দ্রিক হওয়া— এসব কিছুই তাঁদের 'যুগ'কে পেছনে ফেলে দিয়েছে।

তবু শুধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও উপস্থিত-বুদ্ধিতে তো কাজ হয় না। নিজেদের ধাত বুঝেই তো সমাজ গঠনের ভবিষ্যৎ পথ ঠিক করতে হবে। সেইজন্যে বুদ্ধিসর্বস্ব হবার দরকার নেই কিন্তু ধাত বোঝার জন্যে inductive, history minded এবং scientific পদ্ধতি তো নিতে হবে। নিইনি বলেই আমাদের স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারের নামান্তর হতে চলেছে বলে যুদ্ধের সময় ধূর্জটিপ্রসাদ মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন, সুধীন্দ্র দত্ত ও বিষ্ণু দে পরাধীনতার জ্বালাতেই মৈত্রীবন্ধনে অধীর হয়ে কড়াপাকের অভিমানী কবিতা লেখেন। স্বাধীনতার পরেও আমরা স্বাধীনতার অর্থ বুঝি নি, তাই স্বাধীনতার পরেও বহুদিন ওই দুই কবিকে কড়াপাকের অভিমানী কবিতা লিখতে হয়েছে, অনাচারের মাঝখানে মৈত্রী ও সংহতির স্বপ্ন দেখেই তাঁদের জীবন কেটে গেছে। বিশ-তিরিশ-চল্লিশের দশকে ধূর্জটিপ্রসাদেরা নিজেদের 'বুদ্ধিসর্বস্ব' 'জীবনচ্যুত' বলে আক্ষেপ করেছেন, ভেবেছেন 'আমরা বাধা সৃষ্টি করছি এবং তাঁরাই বাধা বোধ করছেন।' নিজেদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'আমাদের দৃষ্টি ওধারে যায় নি, এঁরা পারছেন না, দৃষ্টিভঙ্গী আছে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ নয়। চোখ ভালো হলে যে চরিত্রহানি হয় তা বোধ হয় ঠিক নয়।' এ মন্তব্য খুবই ভদ্র ও বিনয়ী। ধূর্জটিপ্রসাদেরা এই রকমই ছিলেন। এখন বেঁচে থাকলে হয়তো তীব্র ভাষায় বলতেন, দৃষ্টিভঙ্গি নেই, দলীয় আবেগ ও স্বার্থবুদ্ধি আছে। চোখ যদি ভালো না হয় তো চরিত্রহানি হবেই।

তাই মনে হয়, ধূর্জটিপ্রসাদ এমন এক ভদ্র বিনয়ী সামাজিক সত্তা, বহু-কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বহুমুখী কৌতূহলের এমন এক সমগ্রিক ব্যক্তিত্ব যাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়া মানেই এই মূল্যবোধহীন সমাজের সুপ্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলা।

ধূর্জটিপ্রসাদের বেশ কিছু অগ্রন্থিত প্রবন্ধ আছে যেগুলি সবুজপত্র, উত্তরা, কল্লোল, পরিচয়, দেশ, পূর্বাশা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া

উত্তরসূরী পত্রিকার সুধীন্দ্রনাথ স্মৃতিসংখ্যায় সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। এটি চতুরঙ্গে প্রকাশিত প্রবন্ধেরই পুনর্মুদ্রণ। ১৩২৩ থেকে ১৩৫৩ সালের মধ্যে রচনাগুলি লেখা। সব লেখাগুলি প্রবন্ধের সাধারণ চিন্তা ও যুক্তির জাল বিস্তারের ভঙ্গিতে লেখা নয়। কতগুলি লেখা 'ফ্যামিলিয়ার এসে' বা বাঙলায় যাকে বলি রম্যরচনা। কতকগুলি চিঠির ভঙ্গিতে লেখা, যেমন উত্তরার লেখাগুলি, একটি 'ডায়ারীর পাতা' নামে লেখা, কিন্তু ডায়ারির চেয়ে সমালোচকের ভঙ্গিটাই যেন বড়।

ডায়ারির পাতা, একখানি পত্র নামে উত্তরার সম্পাদককে লেখা চিঠিগুলি এবং বর্তমান গদ্য সাহিত্যে তিনখানি ভাল বই— সবই সমকালীন বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস নিয়ে আলোচনা। আলোচনাগুলি বয়সের তুলনায় খুবই পরিপক্ব এবং আমরা ও তাঁহারা ও চিন্তয়সি-র লেখকের ব্যক্তিত্বটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। বিষয় শৈলজানন্দের 'ষোল আনা' গল্প বা কেদারনাথের ভ্রমণকাহিনী 'চীনযাত্রী' হোক, কিংবা পরশুরামের 'গড্ডলিকা' বা শৈলজানন্দের 'অতসী'ই হোক, প্রাসঙ্গিক কথায় সাহিত্যের নানা রূপ-ভেদ সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা, আলোচ্য বইটি ভালো লাগা বা না লাগার কারণ সন্ধান এবং ব্যক্তিমনের, বিশেষ করে শিল্পীর মনের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কোথায় ও কতটুকু আছে, বা থাকা উচিত, এসব নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা তাঁর লেখার শুরু থেকেই খুব পরিষ্কার। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের যোগকে তিনি মেনে নেন, তেমনি যে ব্যক্তি স্রষ্টা তার স্বাধীনতাকেও তিনি মানেন। সমাজ থেকেই সেই শিল্পী-ব্যক্তিত্ব স্বাধীন প্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় বেরিয়ে আসে। ব্যক্তি বনাম সমাজের দ্বন্দ্বে শিল্পী-ব্যক্তিত্ব বিদ্রোহী নেতৃত্ব দেয়। একই সঙ্গে তিনি সামাজিক সত্তাকে খোঁজেন এবং শিল্পীর স্বাধীন মন কীভাবে সামাজিক প্রথা কেটে বেরিয়ে আসে তার প্রতিও লক্ষ্য রাখেন। আর একটি তত্ত্ব তাঁর এই সব সমকালীন সাহিত্য আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসে। তিনি সাহিত্যের মধ্যে স্রষ্টার ব্যক্তিত্বকে যেমন খোঁজেন তেমনি সৃষ্টির মধ্যে অখণ্ড মানুষকে খোঁজেন। এই উপলব্ধিটি পরশুরামের 'গড্ডলিকা' এবং শৈলজানন্দের 'অতসী'-র আলোচনায় চমৎকার ফুটে উঠেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, যুবনাশ্ব ইত্যাদি কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের হিউমার বোধ নেই বলে ধূর্জটিপ্রসাদ যে আক্রমণ করেছেন তা তাঁর এই অখণ্ড মানবিকবোধ থেকেই।

অন্য যে সব প্রবন্ধ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যগুলি হলো 'সমাজ ও সন্ন্যাসগ্রহণ, 'বৈঠকখানা ও সমাজ', 'প্রমথ চৌধুরীর গল্প', 'রবীন্দ্র-

নাথের রাজনীতি,' 'গান্ধী-স্মৃতি' এবং 'বাংলা কাব্য ও সুধীন্দ্রনাথ'। প্রথম দুটি লেখা চমৎকার সমাজ-বিশ্লেষণ। দিলীপকুমার রায়ের সন্ন্যাস গ্রহণ উপলক্ষে লেখা প্রথম প্রবন্ধটিতে আশ্রম জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে যে দূরদর্শিতার পরিচয় পাই তাতে এই মুহূর্তে যে-কোনো পাঠককে পড়াতে ইচ্ছে করে। পরের প্রবন্ধটি আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিশ্লেষণ, বৈঠকখানাকে কেন্দ্র করে। মেলামেশার একটি কেন্দ্র নিয়ে আমাদের সমাজের এই বিশ্লেষণ এখনও আমাদের চোখে পড়ে না। বরং ক্রিকেট মাঠের দর্শকের আসন-বিন্যাস থেকে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এক ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের লেখকের লেখায় দেখে বিস্মিত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি যে গান্ধীর দেওয়া উপাধি Sentinel-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই তা যে সামগ্রিক, সদর্থক, আত্ম-উদ্বোধন এবং সংস্কৃতি-প্রধান একথাও এখন কেউ বলে না। বলে শুধু তিনি গান্ধীর মতো প্র্যাকটিকাল নন। কিন্তু আমরা গান্ধীকেও যে আনপ্র্যাকটিকাল বলে কার্যত দূরে ঠেলে দিয়েছি আমাদের ভীরুতা ও কপটতার জন্যে, সেকথাও ধূর্জটিপ্রসাদেরই গান্ধী-স্মৃতির মধ্যে বড় বেদনার সঙ্গেই স্পষ্ট করে বলা আছে। সমাজ-সত্তাকে অতিক্রম করে যে শিল্পী তার স্বাধীন জগৎ তৈরী করে, তার সমাজবোধ কীভাবে কতটুকু তার রচনায় থাকে, তার প্রকাশের দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতা কোথায়,তারও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ পাই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য, প্রমথ চৌধুরীর গল্প এবং সুধীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনায়।

কিন্তু দাদার ডায়ারী, ধরতাই বুলির মতো লেখাও উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। কেবল পরিবেশনের ভঙ্গিটা আরও অন্তরঙ্গ।

সব মিলিয়ে প্রাবন্ধিক ধূর্জটিপ্রসাদ পরিবর্তনশীল সমাজ-সত্তা কিংবা আরও ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, সংস্কৃতি-সত্তার বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষক, নিছক ব্যক্তি নন, 'নব্য সমাজদর্শনের প্রতিজ্ঞা'য় যে 'পুরুষ'কে তিনি ব্যক্তি ও সমাজ-সংস্কৃতির যোগে সমগ্র ব্যক্তিত্ব বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি নিজেই সেই 'পুরুষ'।

বিভিন্ন সংকলনে ও দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা প্রবন্ধগুলি একত্র করে ধূর্জটিপ্রসাদের রচনাবলি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে দে'জ পাবলিশিং-এর কর্তৃপক্ষ দুর্লভ সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন করেছেন। সেজন্য শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর দে এবং শ্রীযুক্ত সুবীর ভট্টাচার্যকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সুবীর ভট্টাচার্য গবেষকের মতো বহু পরিশ্রম করে ধূর্জটিপ্রসাদের অগ্রন্থিত প্রবন্ধগুলিকে একত্র করেছেন। তাঁর আন্তরিকতাকে শ্রদ্ধা জানাই।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

কেন লিখি

আমার মতে প্রশ্নটি এতই অবিশেষ যে ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিকের কাছ থেকে তার বিভিন্ন উত্তর থেকে লেখা সম্বন্ধে কোনো মূল্যবান সিদ্ধান্তে আসা যায় না। যখন উদ্দেশ্যটা নিশ্চয়ই সাহিত্যিক ব্যক্তিগত জীবনের গোপন খবর জানা নয়, তখন প্রশ্নের রূপ অন্যপ্রকারের হওয়াই ভাল ছিল; এই যেমন, ঐ রচনাটি অন্যভাবে না সাজিয়ে কেন এইভাবেই সাজালেন, কিংবা কেমন করে আপনার বক্তব্যটি এই বিশেষ রূপটি পেল? অর্থাৎ, আমার মতে why-এর বদলে how এর দিকে ঝোঁক দিলেই সমালোচনার পক্ষে সুবিধা হত। আর প্রশ্নটির অন্তরালে একটা দার্শনিক মন উঁকি দিচ্ছে— সেটা বোধহয় ঠিক প্রগতিশীল সাহিত্যের উপযোগী নয়। কেন, কেন, কেন, কেন এই জীবন ধারণ, কেন এই সাহিত্যের নেশা ··? নিতান্ত ভারতীয়, নিতান্ত মধ্যযুগীয়, নিতান্ত হিন্দু ··নয় কি? তার চেয়ে কোন্ মানসিক প্রক্রিয়ায় বিষ্ণু দে 'জন্মাষ্টমী' লেখেন, প্রেমেন মিত্র গল্প খাড়া করেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পের কাঠামো গড়ে তোলেন যদি জিজ্ঞাসা করা হত, এবং তাঁরা ভেবে চিন্তে উত্তর দিতেন তবে আমার মতন শিক্ষার্থী সাহিত্যিকের কল্যাণ হত।

তাছাড়া, এই প্রশ্নের উত্তর কখনও honest হতে পারে না। তার কারণ এই যে ঐ কেনর গোটাকয়েক বাঁধা উত্তর আছে যে সব উত্তর আবার তার সুপরিচিত সাহিত্যিক মতবাদের সঙ্গে নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমরা এ মতবাদগুলি ছাত্রাবস্থা থেকেই জানি, অতএব সেগুলি আমাদের মনে এক প্রকার সংস্কারে পরিণত হয়েছে, এবং তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া শক্ত। আমরা নানা কারণে লোকের কাছে প্রমাণিত হতে চাই যে আমরা এই দলের না ঐ দলের, অতএব না তলিয়ে দেখেই আমরা প্রশ্নটির বিশিষ্ট দলের সহজ বিশ্বাসপ্রসূত উত্তরই দিয়ে থাকি, এবং দিতেই থাকব। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমরা পড়েছি যে সাহিত্যে তিনটি স্কুল আছে, ক্লাসিজিম, 'রোম্যান্টি-সিজম, রিয়ালিজম। ক্লাসিসিজিমে 'কেন লিখি'র উত্তর শৃঙ্খলার আবিষ্কার, রোম্যান্টিসিজিমের হল প্রেরণা, ভাব ইত্যাদি এবং রিয়ালিজিমের উত্তর-পর্যবেক্ষণ, পূর্ণ দৃষ্টি ইত্যাদি! তা ছাড়া সোশিয়ালিষ্ট স্কুল উঠেছে যার বর্তমান ঝোঁক রিয়ালিজিমের দিকে। এখন কোনো লেখক যদি নিজেকে সোশিয়ালিষ্ট প্রতিপন্ন করতে চান তবে তাঁর উত্তর কি হবে ভাবা খুব শক্ত নয়, তিনি

বলবেন যে তিনি লেখেন সব চোখটা খুলে যাতে দুঃখ দৈন ধরা পড়ে, তার কারণ সুস্পষ্ট হয়, সেই কারণ, সেই রীতি নীতি বুঝে যেন সর্বসাধারণের (অর্থাৎ পাঠক পাঠিকা যাঁরা জনগণ) যেন দুঃখ দৈন্যের নাগপাশ থেকে নিষ্কৃতি পায়, শ্রেণীর অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায়। হয়ত তাঁদের ভাষা অন্য হবে কিন্তু দাঁড়ায় তাই। কেন'র উত্তর সর্বত্রই বাঁধা বুলিতে জড়িয়ে পড়ে। একধারে তৈরী থিওরী, অন্যধারে pose— দুটোর মাঝে কেন, কেন, কেন বন্দিনী সুরে কাঁদতে থাকে।

তবে অবশ্য একটা কথা উঠতে পারে। কেনই বা প্রশ্নটি ব্যক্তিগত হবে না? সাহিত্য ত' সাহিত্যিকেরই একপ্রকার ব্যবহার। কেনই বা সাহিত্য সমালোচনা একপ্রকার ডিটেকৃটিভগিরি হবে না? মহা মহারথীরা সাহিত্যের নামে ঐ কাজই ত করছেন। এডমণ্ড উইলসন-এর ডিকেনসের আলোচনা এক প্রকারের ক্রিমিন্যাল ইনভেষ্টিগেশন। আমি এর উত্তর দিতে আপাতত অক্ষম। সেইজন্য বাক্য ব্যয় না করে খোলাখুলি লিখছি, কেন লিখি?

ইংরেজী বই ও প্রবন্ধ লিখেছি তার প্রধান কারণ চাকরী বজায় রাখা। বাবা যে টাকা রেখেছিলেন সেটা তিন পার্সেন্টের বদলে ছয় পার্সেন্ট থাকলে ইংরেজীতে কোনো বই লেখার প্রয়োজন হত বলে মনে হয় না। প্রথম ইংরেজী বই লেখার উৎস ছিল কর্তৃপক্ষের শ্লেষ— ধূর্জটি সংগীত আর সাহিত্য নিয়েই (অর্থাৎ ফাজলামী করেই) কাটালে কাজের মত কাজ করলে না। শ্লেষের উত্তরে শ' দুই তিন বই ঘেঁটে এবং তাদের উল্লেখ দিয়ে বই লিখলাম। এবং লিখে পৃথিবীর জন দশেক মাথাওয়ালা লোকের কাছে পাঠালাম। তাঁদের চিঠিতে আত্মবিশ্বাস এল। চিঠিগুলো কর্তৃপক্ষকে গোপনে দেখিয়েছিলাম। তখন বয়স ছিল কম, তাই ঔদ্ধত্য একটু বেশীই ছিল। [দ্র. ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, ২য় সংস্কার, পৃ. ১৬২] কিন্তু খবরের কাগজে ছাপাবার লোভ সম্বরণ করবার মত ব্রাহ্মণ্যও ছিল এইজন্য এখনও আত্মপ্রসন্ন। দ্বিতীয় ইংরেজী বই-এরও মূলে প্রায় একই মনোভাব, তবে শ্লেষ ছিল অন্য ধরণের— ধূর্জটি পড়েই গেল, লিখল না কিছু। তৃতীয় ইংরেজী বই-এর আদিতে ছিল একজন বিশিষ্ট বন্ধুর বিশ্বাস যে বর্তমান ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তবু প্রেরণাটি নিতান্ত সৎ ছিল না, কারণ লক্ষ্য করছিলাম যে আমার টুকরো প্রবন্ধ ভাঙিয়ে একাধিক ব্যক্তি করে খাচ্ছে, এবং তাদের মুখ বন্ধ করবার জন্য লেখবার প্রয়োজন জেগেছিল। শেষ বইখানি মুখ্যত অর্থকরী, গৌণত আত্মবিশ্বাসপ্রসূত।

বাঙলা প্রবন্ধ, গল্প, নভেলের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগ লিখেছি পরের তাগিদে। টাকার জন্য যা সব লিখেছি তার মধ্যে অধিকাংশই বাজে। বন্ধুদের অনুরোধই আমার কাছে বেশী মূল্যবান। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে যখনই আমি চটে লিখেছি তখনই আমার লেখা সুখপাঠ্য হয়েছে! প্রেরণায় আমি বিশ্বাস করিনা। মাস দুই তিন একটা বিষয় নিয়ে মেতে রইলাম, একটা কি দুটো ছোট্ট ভাব মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করতে লাগল, ছাত্র ও বন্ধুদের সঙ্গে কথা কয়ে সেগুলোকে স্পষ্ট করলাম, এমন সময় কোনো সম্পাদক জরুরী চিঠি পাঠালেন, লেখা চাই এখনই, একটা প্রবন্ধ লিখলাম। গল্প ও নভেলের পিছনে রাগটাই প্রধান। অনুরাগের লেশ নেই।

মোটামুটি দাঁড়ায় এই: লিখি দম্ভের জন্য, আত্মসম্মানের জন্য, রাগ প্রকাশের জন্য প্রধানত। কখনও কখনও নিতান্ত অল্প ক্ষেত্রে লিখি নিজের মনোভাব সাজাতে, বাকিটা ব্রিজ না খেলে সময় কাটানই উদ্দেশ্য। প্রকাশক ও সম্পাদক যদি আজ আমার বিপক্ষে ধর্মঘট করেন, তবে নিশ্চয়ই নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে বই ছাপাব না। পরের উপকারের জন্যও লিখিনি, প্রেরণার জন্যও নয়, এটাই সত্য উত্তর। আমি অন্তত জানি যে আমি তৃতীয় শ্রেণীর লেখক, প্রাণপণে চেষ্টা করি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠতে। সেইজন্যেই বোধহয়, কেন'র চেয়ে কেমন-এর দিকে আমার পক্ষপাত। বলা বাহুল্য এটা আমার বিনয় নয়, কারণ চতুর্থ শ্রেণীর লেখক সম্প্রদায় আজও নির্মূল হয়নি বাঙলা দেশ থেকে।

আমরা ও তাঁহারা

উৎসর্গ

পিতৃদেবের

স্মরণে

মুখবন্ধ

বইখানির প্রথম তিনটি স্তবক বছর কয়েক পূর্বে মাসিক 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়, বাকি তিনটি নতুন লেখা। কেবল আত্মতৃপ্তি ছাড়া রচনাগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার অন্য কৈফিয়ত আছে। আমাদের সমাজে আমূল পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। প্রবাসী-সমাজের বন্ধন স্বভাবত একটু শিথিল হয় ব'লেই প্রবাসে লক্ষণগুলো বেশি পরিস্ফুট হয়েছে। জন্মগত দায়িত্ব ও অধিকার, জাতিগত বৃত্তি ও সামাজিক ধর্ম— এই তিন প্রকার সংস্কারের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ আজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। ইংরেজী সভ্যতা ও শিক্ষাই এই পরিবর্তন ও গঠনের অন্যতম প্রধান কারণ। সেইজন্যে বর্তমান সমাজে ইংরেজী শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের বিভাগ প্রথমেই চোখে পড়ে। উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারীরা নতুন সমাজের ব্রাহ্মণ হয়েছেন। যাঁরা ইংরেজী ভাষা জানেন না, ইংরেজী সভ্যতাকে জীবনের নিত্যকর্মে গ্রহণ কিংবা ব্যবহার করেন নি, তাঁরা, ব্রাহ্মণেতর জাতির মতনই, নতুন আদর্শের সুখশান্তি, উন্নতি, আশাভরসা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। নব-ব্রাহ্মণের দল বিদেশী রাজার অনুচর ও গুপ্তচর। তাঁরা বিজাতীয় সভ্যতার পৌরোহিত্য করে অর্থ ও সাংসারিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তাঁদেরকে বুদ্ধিজীবী বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা পরিশ্রমজীবী— কী বিদ্যার, কী অর্থের, কী প্রতিষ্ঠার। এতদিন অশিক্ষিতের সামাজিক স্থান নির্ভর করত কৃষিকার্য ও ব্যবসার ওপর। কিন্তু কৃষিকার্য ও গ্রাম্যশিল্পে কোন মুনাফা নেই, সম্মান নেই, তাই বৈশ্য ও শূদ্রেরা নব্যব্রাহ্মণের অনুকরণে মধ্যবিত্তের পংক্তিতে উঠতে ব্যগ্র। একধারে আত্মরক্ষা ও অন্যধারে প্রসারশীলতার ঘাত-প্রতিঘাতে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বকালের বিরোধ সমাজধর্মের দ্বারা আবৃত ছিল। সে আবরণের অভাবে বিরোধের স্বরূপ এখন প্রকট হচ্ছে ; নতুন শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কারের দ্বারা রচিত শ্রেণীগুলো নিতান্তই স্বার্থমূলক হয়ে পড়েছে। যখন উচ্চশিক্ষিতের দায়িত্বজ্ঞান লোপ পায়, অথচ শীর্ষস্থানে স্থায়িভাবে নেতৃত্ব করবার দাবিদাওয়া বেড়েই চলে,

যখন তাঁরা স্বার্থের গণ্ডিকেই সমাজের সমগ্রতা বলে ভুল করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁদের স্বাভাবিক নেতৃত্বের দাবি স্বীকার করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। কার্ল মার্কসের প্রত্যেক বাক্য বেদবাক্য না মেনেও সত্যের খাতিরে মানতে হয় যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে বর্তমান সমাজের মেরুদণ্ড কিংবা উত্তমাঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। ইংরেজ রাজা অবশ্য তাদেরকেই দেশের নেতা ভাবছেন—তাই ভাবাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যা স্বাভাবিক তাই সত্য নয়। সকলেরই মনে সন্দেহ উঠেছে যে একটি শ্রেণীর স্বার্থ সমাজের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে। আমাদের দেশে যে ভাবে আন্দোলন চলেছে তাতে মনে হয় যে মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় সামাজিক উন্নতির পথে অন্তরায় হয়েছেন। অথচ শিক্ষা চাই, অবসর চাই, ভদ্রতা চাই। সমস্যা যদি এই হয়, তা হলে কর্তব্য হচ্ছে, দূরকে নিকট করে, পৃথককে যোগসূত্রে বেঁধে, বিরোধকে সৃষ্টির কাজে এনে নতুন সমাজ গড়ে তোলা। একটি উপায় শিক্ষা, তবে সে শিক্ষার মানে সাহিত্যের অনার্স নয়। সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচারে, এবং শিক্ষিতের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রসারের দ্বারা বিরোধের আংশিক অবসান হবে আশা করি। কারণ সৃষ্টির প্রধান কথা জ্ঞান, ভাবের আবেগ নয়, এবং সে জ্ঞান যত ইহজগতের হয় ততই ইহজগতের মঙ্গল। বিজ্ঞানই ইহজগতের জ্ঞানের মধ্যে একমাত্র পদ্ধতি যাকে বিশ্বাস ও নির্ভর করা যায়। বিস্তর দোষ থাকা সত্ত্বেও, এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই সাহায্যে কুসংস্কার ও স্বার্থপরতা দূর হয়, অন্যায়ের বোঝা কমে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় ও বহুদূর পর্যন্ত চলে। বিরোধের সম্পূর্ণ অবসান বাঞ্ছনীয় কি না জানি না, সম্ভব কি না জানি না, যদি বাঞ্ছনীয় ও সম্ভব হয়, তা হলে হয়তো অন্য উপায় আছে। কিন্তু সে উপায় উদ্ভাবন করা আমার ধর্ম নয়।

'আমরা ও তাঁহারা'তে একদিকের বক্তা আমি, অন্যদিকের বক্তা তাঁহারা। নিজের মধ্যে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতের দোষগুলো লক্ষ করেছি বলেই একবচন ব্যবহার করেছি। সাধারণের বেলা আমার সে স্বাধীনতা নেই। বিরোধের প্রকৃত মূর্তিটি প্রকট করবার জন্যে দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতীক নিলেই ভাল হতো। কিন্তু সে ধরনের বৈপরীত্য একেবারেই অস্বাভাবিক। উচ্চশিক্ষিত এবং মূর্খের সঙ্গে কোন প্রকার কথোপকথন কী ভাবের বিনিময় সম্ভব নয়। সেইজন্যে শিক্ষাভিমানী বুদ্ধিজীবীকে এবং শহরের অন্যশ্রেণীর বন্ধুদেরকে প্রতীক হিসেবে নিতে হয়েছে। লেখ-

বিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে দুই শ্রেণীরই দোষ-গুণের ইঙ্গিত করেছি। আমার নিজের বক্তব্য এই যে, শিক্ষার মূল্য চিরন্তন হলেও উচ্চশিক্ষাভিমানী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বুদ্ধিজীবীর সে-স্থান এই পরিবর্তনশীল ভারতের সমাজে আর নেই। ভবিষ্যতে সে-স্থান যে আরো সংকীর্ণ হবে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষা যখন স্বার্থে পরিণত হয়, তখন আত্মরক্ষার জন্যে বিদ্যার অভিমান, দম্ভ ও অভিনয়ের প্রয়োজন হয়। পৌরুষের অন্য প্রকাশ আমাদের পক্ষে যে অসম্ভব।

আমার বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি গোটাকয়েক সাধারণ বিষয়ের প্রতি আমাদের ও তাঁহাদের মনোভাবের সাহায্যে। বিষয়-গুলোর সঙ্গে সকলেই পরিচিত। আর্ট, বিজ্ঞান, স্বদেশ ও সামাজিক জীবন সর্বসাধারণের সম্পত্তি। আর্টের মধ্যে সঙ্গীত এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটি বেছে নিয়েছি। সঙ্গীত-প্রীতি, দেশাত্ম-বোধ এবং প্রেম সাধারণের সম্পত্তি হলেও শ্রেণী অনুসারে প্রত্যেক মনোভাবের তারতম্য আছে। অর্থ উপার্জনের ভিতর দিয়ে সামাজিক দ্বন্দ্ব যতটুকু প্রকাশিত হচ্ছে তার পরিচয় অন্যত্র পাওয়া যাবে। যখন মানসিক দ্বন্দ্ব অর্থোপার্জনের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠবে, তখনই আমরা শ্রেণীগত পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন হব।

যদি তর্ক-বিতর্কে সর্বসাধারণের, অর্থাৎ তাঁহাদের প্রতি অন্যায় করে থাকি তা হলে তাঁহাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব বেশি, সহানুভূতি খুব গভীর, কখনোই হতে পারে না— এইটাই দুঃখ। ভাষাও সেই জন্যে হয়তো সহজ হয়নি। অধ্যাপকদের ভাষা দুর্বোধ্য ও ইংরেজীবহুল হতে বাধ্য। যে ভাষায় আমরা কথো-পকথন ও বক্তৃতা করি, সেটি আমাদেরই আবিষ্কৃত ইংরেজী ভাষার অনুবাদ। অতএব বইখানিকে সামাজিক পরিবর্তনের ও শ্রেণীগত বিরোধের চিহ্নস্বরূপ বিবেচনা করলেই আমার উদ্দেশ্য খানিকটা সফল হবে। বইখানির মধ্যে অন্যান্য দার্শনিক ও সাহিত্যিক গলদ, আশা করি, সমালোচকরা দেখিয়ে দেবেন। তাঁদের কাছে একটিমাত্র অনুরোধ যে আমার মুখ দিয়ে ব্যক্ত মতামতগুলো ঠিক আমার নয়, আমার দলের এই কথাটি যেন তাঁরা স্মরণ রাখেন।

আমার শেষ ও প্রধান বক্তব্য এই যে বইখানির মূল্য আমার নিজের কাছে খুব বেশি হলেও বন্ধুদের কাছে মাত্র দেড় টাকা। আমার বন্ধুরা ছাড়া অন্যে আমার লেখা পড়েন না, কারণ উপকৃত হবার প্রবৃত্তি

সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই কম। আমার বন্ধুরা, প্রত্যেকেই এক-এক কাপি উপহার প্রত্যাশা করেন, এবং আমার কর্তব্যও প্রত্যেককেই উপহার দেওয়া। কিন্তু ঠিকুজি ও বর্ষপ্রবেশ, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কিংবা কর্তাদের চা-পার্টির জন্যে তাঁদেরকে বিস্তর টাকা খরচ করতে দেখেছি, তাই থেকে মাত্র দেড় টাকা বাঁচিয়ে আমার বইখানা কিনে না পড়লেও আমি কৃতজ্ঞ হব। না পড়ে বিরুদ্ধে সমালোচনার ত্রুটি বুঝে এবং ঋণের মাত্রা কমছে দেখে যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় অন্তত সেটুকু আমার প্রাপ্য। আশা করি, বন্ধুরা ওটুকু আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

পয়লা জুলাই, ১৯৩১ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা

নূতন সংস্করণের ভূমিকা

আজ পঁচিশ বছর পরে বইখানির নতুন সংস্করণ বেরুচ্ছে। সংস্করণ পরিমার্জিত কিনা পাঠক বুঝবেন, তবে পরিবর্ধিত নিশ্চয়। এতদিনে পাঠকের আগ্রহের বিষয়, রুচি-রীতি ও আমারও মতামত অনেক বদলেছে। তবু যেন কোথায় সাতত্য রয়েছে সন্দেহ হয়। সেই সন্দেহের বশেই নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণের প্রকাশনে সম্মতি দিলাম। একদা বাংলার রসজ্ঞ সমাজের কাছে এ বই কিছু সমাদর পেয়েছিল। সে কথা স্মরণ করে আবার তাকে উজ্জীবিত করবার জন্য উৎসাহী হয়েছেন স্নেহভাজন জিতেন্দ্রনাথ। সেজন্য আমি সত্যই তার কাছে কৃতজ্ঞ।

এই প্রসঙ্গে এখানে একটি সাহিত্যিক প্রশ্ন তুলতে চাই: কথোপকথনের রূপে বিষয়ের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য কতটা ধরা পড়ে?

অনেকের ধারণা, ধরা পড়ে না। কারণ কথাবার্তা ব্যাপারটা হল স্বাভাবিক, আর স্বভাবতই ভদ্রজনেরা গুরুগম্ভীর বিষয় এড়িয়ে চলেন। ভদ্রলোকের কথোপকথন সামাজিকতার প্রকাশ, আলাপচারী মাত্র। অতএব তার ওপরে গুরুতর ওজন না চাপানোই সঙ্গত। এতদিন ধরে

আমাদের সামাজিক আদর্শ ছিল ইংরেজী আর ইংরেজী সমাজে বড় বড় কথা খামোকা টেনে আনলে অথবা ভারী বিষয়বস্তু নিয়ে বেশিক্ষণ আলোচনা চালালেই 'bore' উপাধি অর্জন করতে হয়।

সান্ধ্য পার্টিতে, মজলিশে আর ক্লাব ঘরে প্রাথমিক সমস্যা— Oh it is just not done! অনুজ্ঞাটির মধ্যে শক্তিসঞ্চয়ের ইঙ্গিত আছে। এও একপ্রকার সোশ্যাল ইকনমি। অবশ্য এই যুগের। কারণ সারাদিন রোজগারের ধান্ধায় ঘুরে সন্ধ্যাবেলা কোথায় একটু হালকা কথাবার্তা, একটু আধুনিক গীত, একটু পরনিন্দা কিংবা একটু পলিটিকস্ চর্চা করব, তা নয় মাথা ধরানো আলোচনা, বিতর্ক, চুলচেরা বিশ্লেষণ, নিকৃত্তিতে ওজন-করা যুক্তির অবতারণা! তাও যদি আবার কোনো লাভ হতে, কোনো কূলকিনারা পাওয়া যেত।

অতএব যদি সমস্যা বিচারের প্রয়োজনই থাকে, তবে সহজ, স্বচ্ছ ও স্বল্প ভাষায় প্রবন্ধ লিখলেই চলে। কথাবর্তার রূপটি নেব অথচ 'ডায়লগ'-এর স্বভাবিকত্বটুকু বাদ দেব, এটা অন্যায়। বর্জন করতে হলে রূপটিকেই বর্জন করা ভালো। সমস্যামূলক নাটক-নভেলে নায়ক-নায়িকারা ভারী ভারী বিষয় নিয়ে সিরিয়স কথা বলেন, তর্ক করেন বটে। কিন্তু বড় জোর দু-এক পৃষ্ঠার জন্য। তাও একটু আলগোছে, ভাসা-ভাসা। বেশি দূর তর্ক গড়ালে কিংবা আলোচনা চালালে মন ঝিমিয়ে পড়ে। কারণ পাঠক-পাঠিকা সাধারণত গল্প চান এবং লেখকও ক্রমশ সমস্যার খাতিরে ঘটনা আর চরিত্রের ওপর প্রভুত্ব হারিয়ে ফেলেন। প্লেটো, ল্যাণ্ডর এবং রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গম্ভীর বিষয়ের ওপর কথোপকথন রচনা করেছেন এবং সেগুলি নিশ্চয়ই ক্ল্যাসিক। কিন্তু ঐ ক্ল্যাসিকই রয়ে গেল বইগুলি। তাদের পুনরাবৃত্তি হলনা, হয়ও না এ যুগে। ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্য আর পরীক্ষার প্রয়োজন ছাড়া আর কোনো তাগিদে তাদের ছোঁয় না।

'আমরা ও তাঁহারা'র ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত যুক্তি কতটা খাটে? আমি ক্ল্যাসিক লিখিনি, লিখতে পারি না এবং পারবও না। এ যুগ হল লঘু বিষয়, লঘু স্পর্শ, অবসর-বিনোদন, সময় কাটানোর যুগ। তাছাড়া, আমার বই পাঠ্যপুস্তক যে কখনও হবে না, একথা জানি ও মানি। কেবল তাই নয়, আমি কথ্য ভাষায় আলোচনা রিপোর্ট করে থাকি। আমার স্টাইল বা বা রচনাভঙ্গি কথিত ভাষার অনুকরণ, অনুলিপিও বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ, ল্যাণ্ডর এবং প্লেটোর স্টাইল হচ্ছে লিখিত ভাষা। আর সে কি ভাষা!

অতএব ক্ল্যাসিক্‌স্‌-এর দৃষ্টান্ত না তোলাই ভালো। তাছাড়া ইংরেজী ছাঁচে ঢালাই সমাজের Small talk-এর সঙ্গে ভাটপাড়া-নবদ্বীপের পণ্ডিতদের অহোরাত্র দার্শনিক বিচারের তুলনাও আজ অচল। আমার একজন ইংরেজ বন্ধু একদিন বলেছিলেন বটে যে, 'India is the only country in the world where you can still talk about God and Soul before people for hours and not be pelted by stones'. ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকদের সঙ্গে ঈশ্বর আর আত্মা নিয়ে ক্রমাগত কথা বলা চলে, অথচ কেউ গায়ে ঢিল মারে না। কিন্তু তিনি বোধহয় জানেন না যে, ইংরেজ আমাদের কতটা বদলে দিয়েছে, আমাদের সমাজের ওপর ধনিকতন্ত্রের কতটা প্রভাব পড়েছে। ভিখারী ডাল-ভাতকে পোলাও ভাবে।

তবু আমার সন্দেহ হয় যে, যুক্তিটির মধ্যে কোথাও কোন গলদ আছে। প্রবন্ধ যে লিখিনি তা নয়। তবু 'ডায়লগ' ভালো লাগে কেন, কথোপকথনের রূপ নিলাম কেন? আদিম কারণ অবশ্য অভ্যাস। আমি যে দলে মানুষ হয়েছি, তাকে Pramathean কিংবা সবুজপত্রের দল বললেই বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। কারণ আমাদের বই পড়ার অভ্যাস ও বড় বড় ব্যাপার নিয়ে তর্ক প্রবৃত্তির জন্যই প্রমথবাবু নিজের কাছে আমাদের টেনে নেন ও শিক্ষা দিয়ে সবুজপত্রের দল তৈরি করেন। সেখানে অভিব্যক্তিবাদ, নতুন ফিজিক্‌স্‌, নতুন অর্থনীতি আর নব্য দর্শন নিয়ে আলোচনা অসামাজিক বিবেচিত হত না। বের্গসঁ, ম্যাকস্‌ প্ল্যাঙ্ক, বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর মতামত, সংস্কৃত কী আধুনিক কবির ছন্দোবিচারের ফলে তখনকার দিনে আমরা একঘরে হইনি। অবশ্য ঠাট্টাম‌স্করা কিছু কিছু শুনতে হত বৈকি। কিন্তু তার কারণ রবীন্দ্রনাথের স্নেহ বেশি পাবার জন্য রেষারেষি। অতএব আমার সাহিত্যিক রূপ নির্বাচনে অভ্যাসের রেশ যথেষ্ট।

অপর কারণ হচ্ছে' 'ডায়লগ'-এর অনায়াস গতি, কথোপকথনের আপেক্ষিক স্বাধীনতা। এই ছকে অনেক সুতোর বুনন চলতে পারে। এই কাঠামোর মধ্যে নড়বার চড়বার স্থান একটু বেশি। এতে দায়িত্ববোধ থাকলেও তেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়না। এতে মোড় ঘোরানো সহজ। এর ভেতর প্রবেশলাভ করা যেমন সহজ, এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া তেমনই সহজ। অর্থাৎ এর প্রবেশপথ আর নিষ্ক্রমণ পথ— দুটোই উন্মুক্ত ও ঋজু। আলাপে আবার যুক্তির সাতত্য এবং অনিবার্য সিদ্ধান্ত কি? তাই বলে কথোপকথনের স্বাধীনতা মানে যথেচ্ছাচার নয়, তার নমনীয়তাও নিয়ম

বহির্ভূত ব্যবহার নয়। তার রীতি মাটিতে পাতা, গাঁথা রেল লাইন নয়; ট্রাম ট্রলি। বৈদ্যুতিক যোগ না থাকলে গাড়ি নড়বে না, ঘুরবে না। কিন্তু থাকলে এক ছোট্ট গলি ছাড়া সর্বত্রই যাওয়া সম্ভব। বিদ্যুৎ জোগান দেয় মন। অতএব কথোপকথন-রূপের সদ্‌ব্যবহার তখনই সম্ভব, যখন আলাপীদের মন বস্তুটি থাকে অর্থাৎ যখন আলাপন হয় চার্জড্‌, বিদ্যুতে ভরা। মননশীলতার বাতাবরণই হ'ল এখানকার যোগ্যতার প্রথম প্রতিজ্ঞা। আমার রচনায় এই ধরনের আবহাওয়ার যদি কোনো চিহ্ন না মেলে তাহলে তার কোনো সাহিত্যিক মূল্য নেই।

এই গুণের সন্ধান ছাড়া, ডায়লগ সত্যিকারের রসোত্তীর্ণ হতে হলে অন্য দু'-একটি গুণের অপেক্ষা রাখে। একটি গুণ **flexibility** নমনীয়তা যার উল্লেখ আগেই করেছি। মোড় ঘোরানো সত্যই বাহাদুরি। আজকালকার ভাবের ভিড়ে কাজটা কঠিন, কিন্তু মোড় যতই ফেরানো যাক না কেন, একটা গন্তব্য ঠিক রাখতেই হয়। দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে, মাঝপথে আটকে না গিয়ে, সুতোগুলোর জট না পাকিয়ে, ঘড়ির কাঁটা ধরে না চললেও আন্দাজি সময়মত গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার জন্য সজাগ কৌশল আর হুঁশিয়ার দৃষ্টির প্রয়োজন। সেজন্য প্রতিটি চিন্তাধারার সম্ভাব্যতা, অন্যান্য ধারার সঙ্গে লিপ্ততা ও যোগাযোগ, তার দূরতর তাৎপর্য— সব কটি জিনিসের ওপর নজর চাই। কিন্তু নজরবন্দী করে। ব্যঞ্জনার সঙ্গে মূল চিন্তাকে অবসর দিতে হবে। এইখানে ডায়লগ হয় মোনোলগ্‌। কিন্তু খোলাখুলি লিখলেই রচনাটি প্রবন্ধ হয়ে পড়বে। বলা বাহুল্য, চিন্তা ও যুক্তির বিবক্ষা জানা অথচ তার প্রকাশ মানা— এ মানসিক অবস্থাটি সংযম ও দায়িত্বে পূর্ণ। কথোপকথন রূপের স্বাধীনতায় এই সূক্ষ্ম সীমাটি থাকা চাই এবং এরই চারপাশে টেন্‌শন জমে।

কোথায় ও কখন চিন্তা সীমার কাছাকাছি আসছে, অথচ স্ব-ইচ্ছায় পার হচ্ছে না যদি বোঝা যায়, তবেই রসসৃষ্টি ও রসবিচার সার্থক হতে পারে। প্রতিপক্ষের কাজই তাই। তাঁরা বুঝবেন সীমা কোথায়, তাঁরাই ধরবেন সীমা পার হচ্ছে কিনা এবং যদি হয়ে থাকে, তবে কীভাবে হচ্ছে, স্ব-ইচ্ছায় কিংবা অপারগতার জন্য। সাধারণ মানুষের সাধারণ জ্ঞান নিমিত্তমাত্র নয়। সেটি সীমার লক্ষণ ও সীমাহীনতার ইশারা। এই কারণেই 'তাঁহারা' মধ্যে মধ্যে 'আমাদের' ওপর বিরক্ত হন, আবার কখনও 'আমাদের' মতে মত দেন। 'তাঁহারা' মাটির সন্তান নন, ওয়ালেস সাহেবের **'Common man'**ও নন। তাঁরা একত্রে সীমার ও সীমার

বাইরের জীব। তাঁরা আমাদের বিপরীত বাচক কাউন্টারফয়েল নন। তাঁরা আমাদের প্রহরী ও মানদণ্ড। কথোপকথনে যদি এই প্রকার শ্রদ্ধা দেখানো না হয়, অন্তত উষ্ম না থাকে, তবে সেটি কিছুতেই রসগ্রাহ্য হতে পারে না। আমার বিশ্বাস, আমি অপর পক্ষকে এই শ্রদ্ধা দিয়েছি এবং স্বপক্ষের বক্তব্য ও মনোভাব নিয়ে বিদ্রূপ করতে পেরেছি।

কথোপকথনে ভাষার বিচার ঐরূপ বিচারের অঙ্গ। শুধু ভাষার বিচার খানিকটা অবান্তর; বিচার্য কেবল স্টাইল। কেন না সেখানে স্টাইলটাই মুখ্য, শুদ্ধতা গৌণ। স্টাইল মানুষের মানসিক চরিত্র। মন থাকলে স্টাইল, না থাকলে ফেনা। কিন্তু একা রচয়িতার মন নয়— লেন-দেনের মনই হল আসল মন। তাই লেখার রঙ ও ঢঙকে ঠিক একার সম্পত্তি বলা যায় কি? অপরের সংস্পর্শেই নিজের মনে রঙের ছোপ ধরে, লেখার বা কথা বলার ঢঙ জন্মে।

বিষয়বস্তু এবং বক্তব্য সম্বন্ধে কিছু না বলে পারছিনা। 'আমরা ও তাঁহারা' যখন প্রথম আরম্ভ করি, তখন অর্থশাস্ত্রে ও সমাজতত্ত্বে Social distance প্রত্যয়টির আলোচনা সবে শুরু হয়েছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তখনই বুঝতে পেরেছেন যে সমাজ ভেঙেছে এবং টুক্‌রো টুক্‌রো ছোট-খাটো দল বা উপদল তৈরি হচ্ছে। কেন এমন হল, জানবার জন্য তাঁরা উৎসুক হলেন। এই সময় থেকেই মার্কস্‌বাদের চলন হয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। তাঁরা শ্রেণী-বিভাগের উপর সেই দ্বন্দ্ব ও ভাঙনের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। আর যাঁরা মার্কস্‌বাদ গ্রহণ করলেন না, অতটা সরলীকরণে যাঁদের আপত্তি ছিল, তাঁরাও সামাজিক দূরত্ব মানতে বাধ্য হলেন। এবং সেই দূরত্বের কারণ খুঁজতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-স্তরের আচার-ব্যবহার মনোভাব (folk ways, moves) প্রভৃতির পার্থক্যে এসে পৌঁছলেন।

আমিও এই চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হই। কেননা আমাদের সমাজও বিখণ্ডিত। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিয়েছে। তারপর সেই চিন্তাধারা আজ Sociology of Knowledge নামে এক ক্রম-বর্ধমান জ্ঞানে পরিণত। স্কেলার, ম্যানহাইম্‌ প্রভৃতি লেখকের রচনার সঙ্গে আজ অনেকেই পরিচিত। তাঁরা এই মনোভাবের পার্থক্যটা বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন, যে-সামাজিক স্তরে মানুষ জন্মেছে ও মানুষ হয়ে বিচরণ করছে, সেই স্তরের গোটা কয়েক মনোভঙ্গি অর্থাৎ attitudes হল ব্যক্তিগত চিন্তার ভূমিকা। 'আমরা ও তাঁহারা' উভয়েই তথাকথিত মধ্য শ্রেণীর জীব, সেইজন্য গোড়ায় তাঁদের মিল আছে। পার্থক্য এইটুকু; আমরা অর্থাৎ সমাজ-সচেতন ব্যক্তিরা

জানেন যে এ শ্রেণীর দম, জান্ এবং শাঁস ফুরিয়েছে আর তাঁহারা বুদ্ধিমান ভদ্রজন হলেও ঠিক সচেতন নন। তাই উভয়ের সম্বন্ধ ঠিক গুরু-শিষ্যের নয় কিংবা বৈঠকখানায় বাবু-মোসায়েবেরও নয়। আমরা মাতব্বর নই, সচেতন দল মাত্র এবং তার প্রয়োজন এখনও পর্যন্ত যায় নি। তাই বিষয়বস্তু হল সামাজিক দূরত্ব; এর শাস্ত্রাংশ হল জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তাধারার সমাজতত্ত্ব। দুর্ভিক্ষ, কালোবাজার, দেশ-বিচ্ছেদ আর সমাজভঙ্গ প্রভৃতি অমানুষিক জৈব দুর্দশার পর বিষয়ের বিপক্ষে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। সাহিত্য সম্পর্কে যে দুটি স্তবক রয়েছে তার বিষয় **Standard** হলেও, উদ্দেশ্য একই।

এ কথাগুলি লেখবার সময় আমার মন খুঁৎ খুঁৎ করছে। কারণ এগুলো পাঠকের ও সমালোচকের কর্তব্য, আমার নয়। কিন্তু লেখক হয়েছি বলে রচনার মানদণ্ড কি হওয়া উচিত, সেটা ভাববার অধিকার কি নেই? আমি যখন অন্যের রচনা পড়ি, তখন গম্ভীরভাবেই শ্রদ্ধা সহকারে পড়ি এবং গোটাকতক প্রিন্সিপ্‌ল্-এর পার্শ্বিকেই তাকে রাখতে চেষ্টা করি। তাই যদি আমার বিষয়বস্তু, বক্তব্য এবং অভ্যস্ত প্রকাশভঙ্গির আলোচনা অথবা বিশ্লেষণ করি, সেটা আমার চিন্তার ভূমিকা অথবা মনোভাবের মুখবন্ধই হবে, কৈফিয়ত হবে না। নিজের কথা লেখা ও বলা দোষের নয়, যদি তাকে পরের রচনা হিসেবে দেখতে ও বিচার করতে পারা যায়।

আরেকটি কথা। সব চিন্তাই তো ডায়লগ, হয় 'আমি'-'তুমি'-র না হয় **ego-super-ego**-র মধ্যে। সমগ্র ইতিহাস না হোক, তার বিপ্লবী অংশটুকু অন্তত এই নিজের সঙ্গে নিজের, নিজের সঙ্গে তোমার, নিজের সঙ্গে পরের বাক্যালাপ, তর্ক-বিতর্ক, অর্থাৎ, কথোপকথন। আমার বাক্যালাপে 'তুমি', অর্থাৎ ভগবান নেই। সুমতি-কুমতি ঠাকুরুণেরও কানাকানি শুনেছি বলে মনে হয় না। আমার আড্ডার বাক্যালাপের অংশীদার আমরা ও তাঁহারা।

গ্রন্থকার

প্রথম স্তবক : বিরোধের কথা

শহর ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত বাঙ্‌লোতে আসার জন্যে বড় বদনাম হয়েছে শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু কী করি? ধুলোর মধ্যে থেকে শরীর অত্যন্ত খারাপ হতে লাগল, এবং একই গণ্ডির মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করলে চিন্তার ধারাগুলোও অভ্যাসে পরিণত হবে ভেবে শহর ছাড়তে বাধ্য হলাম। এধারে বয়সও বেড়ে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূলে জীবনযাত্রা চালাবার লোভ ও ক্ষমতা কমে আসছে। তাই নিরালায় নীড় বাঁধতে চলে এলাম। আমার নতুন বাড়ি শহর থেকে অনেক দূরে, নদী পাড় হয়ে আসতে হয়। শহরের খবর তিন-চারদিন পরে খবরের কাগজ মারফৎ পাই। অবশ্য সে জন্যে আর আমি দুঃখিত হই না; নেহাৎ আধুনিক হবার মোহটা ক্রমেই কেটে যাচ্ছে। এ নির্জন স্থানে আরও দু'চার বছর থাকলে আমি পুরোপুরি অধ্যাপক হয়ে যাব। সাধনার পক্ষে বর্তমানের সংসর্গ ও কোলাহল অত্যন্ত ক্ষতিকর, বিশেষত যখন ব্রত আমার অধ্যাপনা। ছাত্রদের কিছু বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের সংবাদ দিতে পারি না, কেন না সে সংবাদের কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। মূল্য আছে এক অতীতের, কারণ অতীত চিরস্থায়ী, এবং যে জিনিসের স্থায়িত্ব নেই, তার আইন-কানুনও নেই। আর আইন-কানুন ছাড়া অন্য কিছু পড়ানো যায় না। অন্য ধরনের শিক্ষা দিলে ছাত্রদের ঔচিত্যানৌচিত্য-জ্ঞান বাড়ানো যায় না। বর্তমানে কি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কি হবে বলতে গেলেই পৃথিবীতে যা হয়েছে কিংবা যা হচ্ছে তাই ঠিক হচ্ছে, এ কথা ছাত্রেরা আর বিশ্বাস করবে না। এরকম বিশ্বাস হারালেই ছেলেরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠবে, নিজেদের মতে কাজ করতে শিখবে— চাকরি পাবে না, এবং আমার চাকরি যাবে। অতএব অতীতের জয় হোক! বর্তমান জাহান্নামে যাক! আমি এই শহর ছেড়ে নদী পার হয়ে এসে জীবনের বদলে উপজীবিকার সাধনা করি।

কাল রাত ন'টার সময় আরাম-কেদারায় শুয়ে শহুরে বন্ধুদের কথা

স্মরণ করছিলাম। দেহটা ক্লান্ত হ'লে মানুষ বড় ভাবপ্রবণ হয়ে যায়। অত্যন্ত ক্লান্ত হ'লে অবশ্য বিদ্বেষ আসে, কিন্তু মাস্টারের ক্লান্তি কিছু মুটে-মজুরদের মতন নয়। অত্যধিক ক্লান্তিতে কলের মুটে-মজুরেরা হাত-পা কেটে ফেলে কিংবা মদ খায়। এই স্বল্প ক্লান্তিতেই কিন্তু মানুষ অনেক বোকামি করে ফেলে। প্রেমপত্র লেখা এই কর্ম-অন্তে, বিরামসাগরে নিমজ্জিত হবার সময়েই সম্ভব হয়। হাতে একখানা বই ছিল, কিন্তু মন ছিল শহরে, বই-এর বাইরে। শহরে থাকতে শহরের বন্ধুরা কেমন অযাচিতভাবেই আসতেন, গল্প করতেন, অনেক রাতে হাসতে হাসতে চলে যেতেন। এখন আর কেউ আসেন না। মনটা কেমন বিষাদে ভরে উঠল। একটু চুপ করে শুয়ে রইলাম। কী আশ্চর্য! কিছুক্ষণ পরেই দেখি আমার শহরের বন্ধুরা এসে উপস্থিত। আমি তো হতভম্ব! তাঁদের সমাদর করতেই ভুলে গেলাম তারা নিজেরাই আসন টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। তারপর কথাবার্তা চলল।

আমি: এইমাত্র ভাবছিলাম যে কাল ছুটি, সকালেই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাব। আপনারা যে দয়া করে উপস্থিত হয়েছেন সেজন্যে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে।

তাঁহারা: জ্যোৎস্না কেরানিদের জন্যে নয়। চাঁদের কিরণ, মলয় প্রভৃতি কাব্যবস্তু আপনাদেরই উপভোগ শোভা পায়। কাজ করতে হয় না, বসে বসে মাইনে নিচ্ছেন— মোটা মাইনে, বছরে সাত মাস ছুটি। কাল রবিবার, অনেক সংসারের কাজ করতে হবে— তাই আজ অসময়ে উদয় হলাম। সেজন্যে আপনি ইংরেজী কায়দায় ধন্যবাদ দেবেন না— বরং আমাদেরই আপনার কাছে মাপ চাওয়া উচিত। ওসব ইংরেজী কায়দা এ পারার ভদ্রমহোদয়দের জন্যেই তুলে রাখুন। আমাদের জন্যে একটু আন্তরিকতা থাকলেই আমরা কৃতার্থ হব। নতুন পাড়ায় এসে শরীরের কোন উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না তো; এ পাড়ায় গানের চর্চা হয় না?

আমি: আজ্ঞে না, গান একেবারে ভুলে গেছি, গান শুনতেও পাই না, গাইতেও চাই না। কতদিন গান শুনি নি, গান গাই নি ভাবলেও কষ্ট হয়। আমি বোধহয় বেশিদিন ভালো গান না শুনলে বাঁচতেই পারি না। এক-এক সময় মনের যে, এ পাড়ায় এসে বোধহয় ভালো করি নি— শরীরের দিক দিয়ে কোন লাভ হলো না—

তাঁহারা: মনের দিক দিয়ে কিছু হয়েছে কি?

আমি : সেখানে লাভালাভের হিসেব এখনও খতিয়ে দেখি নি।

তাঁহারা : আপনারাও যদি হিসেব করেন তা হলে আমরা কি করব ?

আমি : কী জানেন, অধ্যাপকের কাজ হিসেব করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনারা করেন অঙ্কের হিসেব— আমরা করি মনের। আমরা দু'দলই কেরানি। এখানে এসে আর্থিক উন্নতি কিছু হয় না, কেন না বাজার অনেক দূর। তবে মানসিক উন্নতি হয় কি না সে বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

তাঁহারা : কী রকম মনে মনে আলোচনা করছেন বলুন না শুনি, যদি বুঝতে পারি।

আমি : আচ্ছা, আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের আপত্তি কি ? ইংরেজীতে যাকে **town** আর **gown**-এর ঝগড়া বলে, আপনাদের আপত্তি কি সেই ধরনের ?

তাঁহারা : সোজা করে বলুন না— ঝগড়া করব, তাও বিলিতী ঝগড়ার অনুকরণ না-ই করলাম।

আমি : এখানে আবার বিলিতী গন্ধ পেলেন কোথায় ? এর মধ্যে শক্ত কথা পেলেন কোথায় যে বুঝতে পারছেন না ? যা কিছু বোঝা যায় না, তাই বোধহয় বিদেশী, নয় ?

তাঁহারা : আজ্ঞে হ্যাঁ, বোঝা যায়, যা প্রকৃতই বাস্তব তাই দেশী।

আমি : আমরা কি এতই অ-বাস্তব কথা কই যে সব কথা ধোঁয়া হয়ে যায় ?

তাঁহারা : আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি দেখছি নিজেদের দোষটি ঠিক ধরেছেন !

আমি : একটু চুপি চুপি কথা বলুন। নিজের দোষ ধরা অধ্যাপকের পক্ষে আত্মহত্যার মতনই পাপাকার্য। যাক, এই, এই কি আপনাদের আপত্তি ?

তাঁহারা ; অন্তত একটা বটে।

আমি : অর্থাৎ ?

তাঁহারা : এ সোজা কথাটি বুঝতে পারছেন না ? কোন দুর্বোধ্য কথা ব্যবহার করি নি তো !

আমি : এ বড় কঠিন সমস্যা ! আপনারা আমাদের কথা বোঝেন না, আর আমরা আপনাদের কথা বুঝি না, অথচ প্রত্যেকেরই ধারণা যে কোন দুর্বোধ্য ভাষা প্রয়োগ করা হয় নি।

তাঁহারা : কঠিন সমস্যা বটে, তবে আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া চা-ই চাই। আপনারা কষ্ট করে বিদ্যা অর্জন করেছেন, তার সুফল ভোগ করবার অধিকার এবং ঈপ্সা আমাদের যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। এবং আপনাদের মধ্যে পরকে উন্নত করবার ইচ্ছা সর্বদা বলবতী রয়েছে বলেই সন্দেহ করি।

আমি : বাস্তবিক পক্ষে আমরা শিক্ষা দিতে ভালোবাসি বলেই আমরা শিক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করেছি। শিক্ষা দেবার প্রবৃত্তি সব মানুষের মধ্যেই আছে। আপনারা কি ছুতো পেলেই শিক্ষা দিতে কসুর করেন ?

তাঁহারা : তবে শিক্ষা দেবার প্রবৃত্তিকে আমরা বৃত্তিতে পরিণত করি নি। একটা কোন প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাতেই আমাদের দ্বিতীয় আপত্তি।

আমি : দ্বিতীয় আপত্তির কথা পরে শুনব। প্রথম আপত্তির কথাই আলোচনা করা যাক। আমাদের ভাষার দোষ কি ?

তাঁহারা : দোষ অনেক। প্রথমত আমরা মনে করি যে, প্রত্যেক জিনিসেরই এক একটি স্বতন্ত্র ভাষা আছে, যেমন ফুলের, শিশুর, যুবকের। কিন্তু আপনাদের মুখে তাদের বর্ণনা শুনলে মনে হয় যেন ভগবান তাদের মূক করেছেন আপনাদের মুখর করবার জন্যে। হয়তো তাদের ভাষা নীরব, আর সে ভাষা ব্যতীত অন্যের ভাষায় তাদের গোপন কথা তারা ব্যক্ত করে না। কিন্তু আপনারা সে ভাষা আয়ত্ত করেন নি।

আমি : এ দেখছি আপনারা আমাদেরও হারালেন। ভাষা বিভিন্ন মানতেই হবে, তবে ফুলের ভাষা আছে, এবং সে ভাষা নীরব একথা কি করে মানব ? ভাষা একমাত্র মনের, যার মন আছে, তারই ভাষা আছে। ফুলের মন আছে, এ রকম আবিষ্কার জগদীশ বাবু পর্যন্ত করেননি। শিশুর মন হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু রবিবাবু শিশুমনের পরিচয় দিতে গিয়ে আধো আধো ভাষা প্রয়োগ করেন নি বলেই স্মরণ হচ্ছে। শিশুর ভাষা শিশুর পিতামাতারই ভালো লাগতে পারে, আপনার আমার লাগবে কেন ? আর যুবকের ভাষাই তো আমরা ব্যবহার করি। যুবকের মুখে কখনও সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হতে শুনেছেন ? বৈয়াকরণিককে জিজ্ঞাসা করুন, ভাষা কার ? তিনি নিশ্চয় উত্তর দেবেন, ভাষা সর্বসাধারণের, অর্থাৎ কারুর নিজস্ব নয়।

তাঁহারা : অতএব সর্বসাধারণের সম্পত্তি থেকে আমরা বঞ্চিত হব কেন ? শুধু তাই নয়, আপনি বোধহয় নিজের উত্তর পরের মুখে চাপিয়েছেন। বৈয়াকরণিক যদি সত্যি কথা কন তা হলে নিশ্চয়ই

উত্তর দেবেন, 'ভাষা আমার'। আমরা বৈয়াকরণিকের হাতে ভাষা সমর্পণ করতে ইচ্ছুক নই।

আমি : আর্টিস্টের কাছে রাখতে ভয় পান তো?

তাঁহারা : নিশ্চয় না। তবে দুঃখ এই যে, আপনারা কেউ আর্টিস্ট নন। যদি হতেন, তা হলে গোলই থাকত না। প্রত্যেক বস্তুর বিভিন্ন সত্তা উপলব্ধি করা পণ্ডিতের কাছে সহজ হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর বিশিষ্ট রস গ্রহণ করা আর্টিস্টের কাজ, আপনাদের কর্ম নয়।

আমি : আপনারা ভিন্ন ভিন্ন রস গ্রহণ করতে পারেন? রস কি প্রত্যেক বস্তুর গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে? রস তো যে ভোগ করে তার মনের সম্পত্তি। যাই হোক, আপনারা যে রস গ্রহণ করতে সমর্থ তার প্রমাণ?

তাঁহারা : এই যেমন আমরা ফুল ভালোবাসি, শিশুর অত্যাচার সহ্য করি, এবং গান শুনে আপনার মতন ঘোরতরভাবে মস্তক সঞ্চালন না করেও বেশ আনন্দ পাই। আমরা কীর্তন শুনতে বড় ভালোবাসি, কিন্তু আপনি ধ্রুপদ-খেয়াল ছাড়া অন্য কোন প্রকার গান শোনাকে সময়ের অপব্যবহার বলে মনে করেন।

আমি : আপনারা যখন বলছেন যে আনন্দ পান তখন স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমি ধ্রুপদ-খেয়াল শুনে যে আনন্দ পাই, তার চেয়ে কীর্তন শুনে আপনাদের আনন্দের মাত্রা যে বেশি হয় তার প্রমাণ কি?

তাঁহারা : প্রমাণ এই যে, আমাদের আনন্দ বেশিসংখ্যক লোক উপভোগ করতে পারে, এবং আপনাদের আনন্দ আপনাদের দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রমাণ এই যে, ভালো জায়গায় এসেও আপনার শরীর খারাপ হতে চলেছে, আর আমরা ধুলোর মধ্যেও বেশ আছি।

আমি : আনন্দের মাত্রা তা হলে ভোটে ঠিক হবে? আপনারা তা হলে আনন্দে আছেন ধুলোর রস গ্রহণ করে? আজকাল রাস্তায় জল দিচ্ছে না নাকি? যাই হোক, এবার দ্বিতীয় আপত্তি পেশ করতে পারেন।

তাঁহারা : আপনারা অত শিক্ষা দিতে ভালোবাসেন কেন? না হয় পুঁথিগত বিদ্যা আপনাদের চেয়ে আমরা কম জানি, কিন্তু শিক্ষকত্বের দাম্ভিকতা অন্যান্য প্রভুভাবের মতোই কি ঘৃণ্য নয়?

আমি : যথা—?

তাঁহারা : এই ধরুন, প্রজার প্রতি রাজার মনোভাব, এবং বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষিতা স্ত্রীদের ভাষায় স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনোভাব ?

আমি : এ সব মনোভাব কি অত্যন্ত খারাপ ? শক্তির অধিকার নেই কি দুর্বলতার ওপর প্রভুত্ব করার ? শক্তিশালী ব্যক্তি যে প্রভুত্ব না করে থাকতেই পারে না, আর দুর্বলরা সে প্রভুত্ব বরণ করবেই করবে। এই চলে আসছে চিরকাল ধরে : সেইজন্যে অধিকার জন্মেছে।

তাঁহারা : অতএব আপনার মতে আমরা চিরকালই পরাধীন থাকব, মেয়েরা চিরকালই পরাধীন থাকবে ? কেন না এই রকমই হয়ে আসছে ?

আমি : যতদিন আমরা দুর্বল থাকব, (স্ত্রীলোকদের কথা স্বতন্ত্র) ততদিন আমরা পরাধীন থাকতে বাধ্য। এ বেশ সোজা কথা। সবল হয়েও আমাদের পরাধীন থাকা উচিত বলছি না তো। কেননা তা হয় না।

তাঁহারা : আপনার মুখে শক্তির অধিকার শুনে আশ্চর্য হলাম। আমরা শক্তির অধিকার জানি না ; জানি শুধু প্রেমের অধিকার।

আমি : আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে যে আপনারা প্রেমের অধিকারও জানেন না। জানেন শুধু সংখ্যার অধিকার।

তাঁহারা : সংখ্যায় প্রেম আছে প্রমাণ করতে পারি।

আমি : প্রমাণ করুন। কিন্তু আপনাদের স্ত্রীরা শুনলে রাগ করবেন না ?

তাঁহারা : আপনার মুখে স্বামীর প্রভুত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য শুনে আপনার স্ত্রী যতটুকু রাগ করবেন, তার বেশি নয়।

আমি : বলে যান।

তাঁহারা : স্বাধীনতার এবং পরাধীনতার তফাৎ এই প্রেমেই। আমরা স্বরাজ পেলেও আমাদের মধ্যে জনকয়েক শাসন করবেন, বাকি কয়জন শাসিত হবেন। শাসনকর্তারা অধিকসংখ্যক লোকদের মত নিয়ে শাসন করতে বাধ্য হবেন, এবং সেই জন্যে সে শাসন শক্তির চেয়ে প্রেমের ওপরই স্থাপিত হবে। স্বামীর প্রভুত্ব শুধু পুরুষের পৌরুষ নয়।

আমি : কথাগুলোতে খুব আদর্শবাদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ জ্ঞানে বলছে, শাসন গায়ের জোরের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। আপনারা নেহাৎ সাধারণ মানুষ বলে বলে মনেই হচ্ছে না।

তাঁহারা : আমরা যে একেবারেই সাধারণ এবং সর্বসময়ে নিতান্তই সাধারণ, এ কথা দয়া করে মনে করবেন না। আমাদেরও মনের মধ্যে একজন দার্শনিক আছেন, যেমন আপনাদের মনের মধ্যে একটি অত্যন্ত

সাধারণ ব্যক্তি লুকিয়ে থাকেন, এবং সেই অ-দার্শনিক ব্যক্তি প্রায়ই উঁকিঝুঁকি মারেন তবে লেখার মধ্যে নয়, এই যা দুঃখ।

আমি : তা হলে আমরা আপনাদের সাধারণ হলে গণ্য করি, এই হচ্ছে আপনাদের সত্যিকারের আপত্তি ও বিরক্তির কারণ? যাই হোক আমার মধ্যে কখন সাধারণ মানুষের সন্ধান পান বলুন তো? আলাপটা ঘনিয়ে আসছে।

তাঁহারা : আপত্তির স্বরূপ নির্ণয় করেছেন বলতে হবে! আমাদের সাধারণ গণ্য করার নামই আপনাদের দাম্ভিকতা। কিন্তু আপনাদের দাম্ভিকতার কোন মূল্য নেই, কেন না তার ভিত্তি হচ্ছে একজন আমাদেরই মতন সাধারণ মানুষের মনোভাব।

আমি : এই বললেন সাধারণ মানুষটি কেবলমাত্র উঁকিঝুঁকি মারে— আবার বলছেন সেই সাধারণ মানুষই আদত! প্রথম কথাটি মানি, দ্বিতীয়টি মানি না।

তাঁহারা : প্রথমটি মানলেই আমরা কৃতার্থ হব। যাই হোক, কখন সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎ পাই বলছি। এই যখন আপনাদের মুখে পরস্পরের নিন্দা শুনি, যখন আপনাদের প্রচারিত মতের সঙ্গে আপনাদের আচারের বৈষম্য দেখি। সত্যি কথা বলুন তো, নিজেরাই কি নিজেদের মতগুলোকে সন্দেহ করেন না?

আমি : যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে আমার কর্মকর্তাদের বলে দেবেন না, তা হলে বলি। আমি আমার নিজের প্রচারিত মতগুলোকে সন্দেহ করি, তবে গভীর রাত্রে, আলো নিভিয়ে দিয়ে মশারির ভেতর শুয়ে। সম্ভবত আমাদের মধ্যে অন্যেও সন্দেহ করে থাকেন। তবে তাঁরা এখনও আমার মতো কাঁচা রয়েছেন। যখন পাকা হয়ে যাব, অর্থাৎ যখন আমার মতটি চালাতে পারব, অর্থাৎ যখন আমার **system**-কে সর্বসাধারণে গ্রাহ্য করবে, তখন আর সন্দেহ থাকবে না। খ্রীস্টানধর্ম প্রচারের পর যদি যীশুখ্রীস্ট সশরীরে সেণ্ট পলের সামনে এসে বলতেন, 'ওহে আমি মরি নি, আমাকে নিয়ে অত বাড়াবাড়ি করছ কেন? আমি অতি সাধারণ মানুষ ছিলাম', তা হলে সেণ্ট পল যীশুকে কি আবার ক্রুশে ঝুলিয়ে দিয়ে চিরকালের মতন নিজের সন্দেহ দূর করতেন না?

তাঁহারা : আপনারও ধর্মপ্রচারের লোভ আছে না কি? কী ধর্ম প্রচার করবেন, শুনতে পাব কি?

আমি : আমার ধর্ম এই যে, প্রত্যেক মানুষ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকভাবে সকল

প্রশ্ন এবং সমস্তার সমাধান করবে— তা হলেই জগতে জ্ঞানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই বিজ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে জগতের এবং জীবনের যাবতীয় প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কৃত হলেই প্রত্যেক মানুষ সংস্কৃত হয়ে উঠবে। কেন না তখন আর খেয়ালি হৃদয়বৃত্তিগুলো থাকবে না, এবং মানুষ প্রকৃতির বদলে বৈজ্ঞানিক পুরুষের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মগুলোর দ্বারাই চালিত হবে।

তাঁহারা : হৃদয়বৃত্তিগুলোর ওপর এত রাগ কেন? আপনি কি তাদের দ্বারা অত্যন্ত বিধ্বস্ত হন? আর আপনি যদিও না হন, অন্যে তাদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন না কি? সত্যি কথা স্বীকার করতে বৈজ্ঞানিক মনের কুণ্ঠা বোধ করা উচিত নয়।

আমি : আদিম বৃত্তিগুলো সম্বন্ধে দেখছি আপনাদের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। সেগুলোর অস্তিত্ব আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু বহুদিন যাবৎ জীবজগতের সঙ্গে জড়জগতের যে যুদ্ধ হচ্ছে, বৃত্তিগুলো কি যুদ্ধান্তের সন্ধিশর্ত নয়? সন্ধিশর্তগুলো শুধু সুবিধার নামান্তরমাত্র। সন্ধিশর্তকে চিরন্তন ভাবলে, কিংবা জোর করে ব্যবহারিক জগতে চালাতে গেলে জীবনের মূল্য কমে যাবে। সুবিধাকে সত্য গণ্য করলে জীবনকে জড়ে পরিণত করা হয়। স্বীকার করছি, মানুষ অন্য মানুষের ওপর ক্ষমতা বিস্তার করবার চেষ্টা করে এক আদিম প্রবৃত্তির বশে। সেই ক্ষমতা বিস্তারের একটি প্রধান উপায় শিক্ষা দেওয়া। আবার এও ঠিক যে, একজন মানুষ অন্য মানুষের কথা শোনে নিজেকে নিচু করে দিয়ে। বিনয় শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, ওটাও মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। এই ক্ষমতা বিস্তারের ইচ্ছা, এই অধম বিনয়ী ভাব ও জ্ঞান-পিপাসা মিলে-মিশে শিক্ষার সৃষ্টি করেছে। তার ওপর সমাজ আবার তার সামাজিক মূল্য চাপিয়েছে। অতএব পরকে শিক্ষা দেবার দাম্ভিকতা শুধু আমাদের দোষ নয়, ওটা যারা শিক্ষিত হবার অভিলাষী তাদের এবং সমাজের দোষও বটে। সব ক্ষেত্রেই সুবিধা। তবে সুবিধাই একমাত্র সত্য নয়, এ কথাও মানতে হবে। তা হ'লে আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, আপনি সত্য কাকে বলেন? যা আছে তাই, না যা হওয়া উচিত তাই? আমি বলি, Aristotle যা বলেছিলেন, যা হওয়া উচিত তাই সত্য, কিংবা বিজ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা চালিত হলে যা হবে তার স্বরূপই হচ্ছে সত্য।

তাঁহারা : সাহেবের কথা তোলেন কেন? ভয় দেখাবার জন্যে?

আমি : না, সে জন্যে নয়। তবে কি জানেন, যখন Aristotle আমার

মতাবলম্বী হন, তখন সে মতের কিছু মূল্য আছেই আছে। অতএব সাহেবের কথা বাদ দিয়েই বলা যাক, সত্য দুই রকমের— এক যা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, আর এক যা সত্যিকারের সত্য।

তাঁহারা : আচ্ছা, সত্যের এত মিথ্যা সাজাবার প্রয়োজন কি ? সত্যের কী ইচ্ছা হয় না যে, আমরা তাকে সত্য বলেই গ্রহণ করি ? তা যদি না হয়, তা হলে বলতে হবে, এই লীলা অস্বাভাবিক এবং অনর্থক।

আমি : আপনারা যাকে লীলা বলছেন দর্শনেও তাকে লীলা বলা হয়েছে। এই লীলা কিংবা মায়ার কারণ, উৎপত্তি কিংবা উদ্দেশ্য কি, কেউ বলতে পারে না। তবে আমাদের কাজ বিচার করে যাওয়া মাত্র। এখানেও দেখুন না সেই বিচারবুদ্ধির কতখানি প্রয়োজন! বিচারের পর যদি কিছু পরিমাণে সত্যের আভাস পাওয়া যায়, তা হলেও বলতে পারেন যে কোন লাভ নাই। কেন না একবার আভাস পেলে আর কেউ সে জায়গা থেকে ফিরে আমাদের বলতে আসে না, সেই সত্যের মধ্যেই ডুবে থাকতে চায়।

তাঁহারা : তবে আপনারা যে আভাস দিচ্ছেন সেটি সত্যের নয় তা হলে? আর যদি বিচার করে কিছু না বলতে পেলাম, তবে বিচার করায় লাভ কি ?

আমি : কিছু পেলেই তার সম্বন্ধে বলতে যাওয়া কি আমাদের দাম্ভিকতারই সস্তা সংস্করণ নয় ?

তাঁহারা : অত গোলমালে কাজ কী ? আমরা দু'টি সত্য নিয়ে মাথা ঘামাই বা কেন ? আমরা কেন সেই সত্যকে গ্রহণ করব না, যেটি জ্ঞানের মধ্যে খানিকটা এবং বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে রয়েছে ? আমরা যদি বলি যে, আপনাদের আবিষ্কৃত সত্যটিই মায়া আর আমাদের অভিজ্ঞতা ঠিক সত্য,— তা হ'লে কি বলবেন ?

আমি : না, আমার বলবার বড় কিছুই নেই, যদিও Pragmatism-এর বিপক্ষে অনেক কথা পড়েছি।

তাঁহারা : সব কথা ছেড়ে দিন। অতএব দুই সত্যের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত, তা আপনি জানেন না ? অতএব আমাদের জ্ঞান-আঁখি খুললেই যে সব ভুল ধুয়ে-মুছে যাবে, এ রকম বলা যায় না। তা হলে আপনার মতন শিক্ষার দরকার কি ?

আমি : কী জানেন, সত্য পাওয়া না-পাওয়া অনুভূতিসাপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু সত্য সন্ধানের জন্যে বিজ্ঞান-সাধনার নিতান্ত প্রয়োজন আছে। আমি

কিন্তু দুই-এর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য পাই না।

তাঁহারা : অনুভূতি কি কেবল জ্ঞান-সঞ্চয় ? আপনি বলেন, 'কেবল ধ্রুপদ শুনে যাও, তা হলেই দেখবে যে বাঙলা গান কত নিচু স্তরের, আর ধ্রুপদে কত মজা।' আমরা যদি বলি যে, সে মজা পাওয়া কেবলমাত্র অভ্যাসের দোষ এবং আপনিও কীর্তন শুনতে শুনতে ভাবে বিভোর হয়ে যাবেন এবং কীর্তনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বলতে কুণ্ঠিত হবেন না ? জ্ঞান-সঞ্চয় মানে অভ্যাস-সঞ্চয় করা, আর অভ্যাস মানে গোটাকয়েক সংস্কার মাত্র। শুধু সংস্কারের সাহায্যে ভালোমন্দের সত্য রূপ কিংবা মূল্য নিরূপণ করা যায় না। সংস্কার মায়া নয় কি ?

আমি : এ প্রশ্নের উত্তর দর্শনে পাবেন, দার্শনিকে দিতে পারে না।

তাঁহাবা : অর্থাৎ শিক্ষায় পারে, শিক্ষকে পারে না।

আমি : কতকটা। তা হলে আপনাদের আপত্তি ব্যক্তিগত মাত্র। আপনারা শিক্ষার বিরোধী নন শুনে সুখী হলাম। যা হোক, আমাদের বিপক্ষে আপনাদের অন্য কিছু অভিযোগ আছে কি ?

তাঁহারা : অভিযোগ কী দু'একটা ? আচ্ছা, আমরা সব কিছু সমস্যা হিসাবে ধরব কেন ? পৃথিবী কি একটা পরীক্ষা-কেন্দ্র ?

আমি : সে কী ! আপনারাই তো বলেন জীবন একটি পরীক্ষাস্থল !

তাঁহারা : বলি বটে, তবে আপনাদের মুখের ঝাল খেয়ে। আমাদের পরীক্ষাগারে অনেক লতাপাতা, ফুলফল, ছেলেপুলে, প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া অন্য দুঃখকষ্ট, এবং পাস করার আশা ছাড়া অন্যান্য আশাভরসা আছে। সে পরীক্ষাস্থলের প্রশ্ন অন্য একজন করেন না, প্রশ্ন আমরা নিজেরাই করি এবং নিজেরাই উত্তর দিই, বই পড়ে নয়, অভিজ্ঞতা দিয়ে। এবং উত্তরও সে জন্যে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আপনারা কিন্তু ছাত্রদের কাছ থেকে ঠিক একই উত্তর প্রত্যাশা করেন। শুধু তাই নয়— আমরা পাস-ফেল করা যে অন্য ফললাভের আশা করি, তার নাম আনন্দ। সে ফললাভের আনন্দ কত গভীর, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। আমাদের পরীক্ষাগারে শুধু সমস্যারই সমাধান হয় তা নয়, সেখানে বেশিরভাগ সময় খেলাই করি; গান গাই, নাটকের আখড়া দিই, আবার সেখানে দেখাদেখিও চলে যে অন্যে কতখানি এগিয়ে গেল।

আমি : সব পরীক্ষাগারেই শেষোক্ত ঘটনাগুলো ঘটে, তফাৎ যা ঐ আনন্দে।

তাঁহারা : আর এক তফাৎ আছে। আমরা উত্তরগুলো মাতৃভাষায়

দিয়ে থাকি— আমরা বেশিরভাগ সময় উত্তর লিখি না, হিজিবিজি কাটি, এবং শিক্ষক-পরীক্ষকের ব্যঙ্গচিত্রও এঁকে থাকি।

আমি: বেশ করেন। ও-রকম ইচ্ছা আমারও নাস্তিক-মুহূর্তে উদয় হয়।

তাঁহারা: যাক, আপনি তা হলে একেবারে পুরোপুরি শিক্ষক হয়ে পড়েন নি।

আমি: তবে যদি আপনারা এ রকমভাবে এসে প্রাণ খুলে কথাবার্তা কন, তা হলে শিক্ষকতার কার্যে বাধা পড়ার ভয় আছে।

তাঁহারা: অনেক রাত হয়ে গেল। আপনার মূল্যবান সময়ের অপব্যবহার হলো আমরা এখন উঠি।

আমি: না, না, মশাই। আপনারা আমার সোজা কথাটি যে রকম ভুল বুঝলেন, তাতে আপনারাই দার্শনিক আর আমিই অত্যন্ত সাধারণ বলে মনে হচ্ছে।

তাঁহারা: না, অনেক রাত হয়ে গেল। আপনার মুখের নল পড়ে যাচ্ছে। আমরা উঠি নমস্কার।

* * *

হঠাৎ জেগে উঠে দেখি কেউ কোথাও নেই। রাতের অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম তা হলে! হাতে সেই **Jacks**-এর **Alchemy of Thought**! বাবাঃ, আবার বই!

দ্বিতীয় স্তবক : সুরের কথা

আমার বন্ধুরা এ বৎসর আমার প্রতি সদয় হয়েছেন। তাঁরা আর অতটা আমাকে দূরে পরিহার করেন না। আমাদের দেখাসাক্ষাৎ ঘনঘনই হচ্ছে। ঘনিষ্ঠতার ফল কি হবে জানি না— 'মা ফলেষু কদাচন' মনে করেই নিশ্চিন্ত আছি। এখন দেখছি যে, শহরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে গণ্ডির .ভেতর থাকলে মন বড়ই অনুদার হয়ে যায়। অধ্যাপকদের মনে পাণ্ডিত্য এবং পয়সার অভিমান আশ্রয় করেছে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তাই বলে যে একধারে শহরের সাধারণ মনোভাবের সাহায্যে, এবং

অন্যধারে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া ও কুঁড়েমি বাদ দিয়েই অদূর-ভবিষ্যতে সামাজিক কোন বিপ্লব সাধিত হবে তাও মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেও snobbishness এবং বাইরেও তাই, তফাৎ এইটুকু যে প্রথমটি কু-শিক্ষার দাম্ভিকতা, এবং অন্যটি অ-শিক্ষার হিংসা। দুঃখের বিষয় এই, কুঁড়েমি যে মহাপাপ তা আজকালকার অধ্যাপকেরাও স্বীকার করে নিয়েছে — তাঁরা সব বই লিখতে ও বই পড়াতে ব্যস্ত, লেখাপড়া করবার ফুরসৎ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সুবিধা এই— সেখানে লোকসমক্ষে অন্তত গনেশ ঠাকুরের স্থান নেই। বোধহয় স্থান থাকা উচিতও নয়, কেন না ঠাকুরটি সাক্ষাৎ ভগবান নন, তবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তাঁকে অলক্ষ্যে রেখে পূজো করা, কাঁসরঘণ্টা বাজানো ধূপধুনো জ্বালানো, তাঁর নামে বলি দেওয়া চলতে পারে। আর চলছেও তাই। কারুর কারুর সেই বাজনার আওয়াজে কান কালা হয়ে যায়, সেই পূজোর ছোঁয়ায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আমাদের মধ্যে চালাক যে, সেই চোখকান বুঁজিয়ে পূজারী হয়, যে বোকা সেই পূজো দেয় না। আমি পূজারী হতে চাই না, পূজো দিতেও চাই না। আমি চাই মন্দিরের পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং মজা দেখতে। আমার কাছে ও-দেবতা মিথ্যা, তবে জগতে বোধহয় মিথ্যার অনেক প্রয়োজন আছে। জয় Jerome Coignard!

যা মিথ্যা বলে জানি তা নিয়ে মারামারি হয় না, কিন্তু যে মিথ্যাকে সত্যের আকার দিয়েছি তাই নিয়ে ঝগড়া, মন-কষাকষি, মারামারি। যখন সত্যের আকারকে সত্য বলে মনে করি, তখন অন্যে যদি সেই আকারকে পূজো না করে, তখন আমরা ব্যক্তিগতভাবেই আহত হই। কিন্তু মিথ্যাঠাকুরের সেবকবৃন্দ মনটিই যে হারিয়ে ফেলেছেন, তা তাঁদের মনেও থাকে না। থাকবেই বা কী করে? মন বলে পদার্থটিই যে বলি দেওয়া হয়েছে! এই হচ্ছে আমার 'আমাদের এবং তাঁহাদের' উভয়ের বিপক্ষে আপত্তি। আমার অন্তত মনকে বাঁচাবার বড় দরকার হয়েছে। মনকে জীবন্ত রাখবার চেষ্টার ফলে আমি কোনো নৌকায় পা দিতে পারি না। শেষকালে মাঝ-দরিয়ায় প্রাণ খোয়াতে হবে দেখছি!

* * *

সন্ধ্যার সময় বন্ধুরা এসে উপস্থিত। বেহারা এসে চা দিয়ে গেল। চা পানের সঙ্গেসঙ্গেই কথাবার্তা চলল।

তাঁহারা: আচ্ছা, চায়ের সঙ্গে আপনারা এত কম চিনি খান কেন? আমরা চা মানে অন্তত চার চামচ চিনি বুঝি।

আমি : এই যে সেদিন আপনারা বলেছিলেন যে, প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নিজস্ব ভাষা আছে— যেটা আমরা, অধ্যাপকেরা সর্বদাই নষ্ট করতে চেষ্টা করি— সে কথাটি প্রাণে লেগেছে। চায়ের লিকারের সঙ্গে দুধ-চিনি মেশালে সেটি আর চা রইল না। প্রত্যেক পদার্থের শুদ্ধ সত্তা মানতে চেষ্টা করছি।

তাঁহারা : তা হোক, মশাই। আরও একটু দুধ ও চিনি নিলুম— কিছু মনে করবেন না।

আমি : নিশ্চয়ই নেবেন। মানুষ তর্কের খাতিরে যা বলে তাই কি সব সত্যি ? কিন্তু তা হলেও আমি অন্তত মনে করি যে বে-চিনি চা ভালো গাইয়ের মুখে হিন্দুস্থানী খেয়াল কিংবা ধ্রুপদ শোনার মতন।

তাঁহারা : আর চিনি-দুধ-মেশানো চা হচ্ছে বাঙলা দেশের কীর্তন, এই বলছেন তো ?

আমি : আজ্ঞে হ্যাঁ, অন্তত আমি যে রকম কীর্তন শুনেছি। তবে খগেন মিত্র মশায় লিখেছেন যে, কীর্তন অনেক পাকা সুরে গাওয়া হতো, এবং এখনও হতে পারে। এখন বেশিরভাগ লোকে যা কীর্তন গায়, তাতে কথার তান এবং ভক্তির প্রাধান্যই বেশি— অর্থাৎ কেবল দুধ-চিনি। যাক ও সব কথা। এখনই আবার তর্ক উঠবে। আজকাল তর্ককে বড় ভয় করি।

তাঁহারা : এ রকম মতিগতি হল কবে থেকে ?

আমি : যেদিন থেকে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর সঙ্গে মেশবার সুবিধা পেয়েছি সেই দিন থেকে আর গান সম্বন্ধে তর্ক করি না। আমার শুধু এইটুকু বলবার আছে যে, আমার অজ্ঞতা সম্বন্ধে আমি খুবই সচেতন। আমি কেবল গান সম্বন্ধে ভেবেই গেলাম, জীবনে করিৎকর্মা হয়ে উঠব, এ দুরাশা আমার নেই। যে নিজে হাতে কিছু করেছে তার সে সম্বন্ধে বলবার অধিকার আমাদের মতন শুধু তার্কিকের চেয়ে অনেক বেশি আছে স্বীকার করি। অবশ্য অধিকার থাকলেই যে তার সদ্ব্যবহার সর্বদাই হবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। সেই জন্যেই তো ওস্তাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখা পড়তে চাই, কিন্তু পড়তে পারি না।

তাঁহারা : তাঁদের মতামত আর উল্লেখ করবেন না। তাঁরা বাঙলা গান অবজ্ঞার চোখে দেখেন।

আমি : শুধু দেখেন না, অবজ্ঞার সুরে গেয়েও থাকেন। আশ্চর্যের কথা ! যাঁরা ব্যবহারিক জগতে এত **democrat**, তাঁরা সুরের জগতে এত **aristocratic** হন কী করে আমি বুঝতেই পারি না।

তাঁহারা : কী জানি, মশাই! আমরা মূর্খ মানুষ গানের সম্বন্ধে। তবে এইটুকু নিজেদের মনের কথা আপনাকে বলতে পারি যে, গানের যদি কথাই না বুঝতে পারি, তা হলে গান হল না। হয়তো সুর হলো, কিন্তু সে সুরে চিঁড়ে ভেজে না, প্রাণে আরাম পাই না।

আমি : ভালো কথা। এতে আর তর্ক কোথায় বাধছে? আপনাদের শুধু সুর ভালো লাগে না, কারুর ভালো লাগে, ব্যস্। আমার সবই ভালো লাগে, গাইতে পারলে। আপনাদের কী গান ভালো লাগে?

তাঁহারা : ভালো লাগে কীর্তন, বাউল, সেন মশাইয়ের গান, রজনী সেনের গান, রবিবাবুর গান, এমন কী আপনাকে বলতে আর লজ্জা কী— থিয়েটারের গান, ফিল্‌মী গানা পর্যন্ত, তবে ঐ ওস্তাদী গান কিছুতেই নয়। সবচেয়ে খারাপ লাগে ওস্তাদের মুখে বাঙলা গান।

আমি : আমার কাছে যে নির্লজ্জভাবে কথা কইলেন এর জন্যে ধন্যবাদ। বাকি সব গান আপনাদের ভালো লাগে বুঝতে পারি, ওস্তাদী ভালো লাগে না বুঝতে পারি, কিন্তু রবিবাবুর গান ভালো লাগে স্বীকার করা অত্যন্ত দুঃসাহসের কথা বলে মনে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস রবিবাবুর গান, যাঁদের আপনারা **cultured snobs** বলেন, কেবল তাঁদেরই ভালো লাগতে পারে— এই ধরুন, যাঁরা পর্দা মানেন না, যাঁদের মোটর আছে, যাঁরা মেয়েলি ভাবে কথা কন, এবং সুর সম্বন্ধে কিছুই না ভেবে গান ভালোবাসেন বলে থাকেন।

তাঁহারা : দেখুন, ঠাট্টা জিনিসটা তর্ক নয়।

আমি : তর্ক নয় সে কথা মানি, কিন্তু গালাগালির চেয়ে ঠাট্টার জোরে তর্কে বেশি জেতা যায়।

তাঁহারা : সে যাই হোক, আমাদের মনে হয় যে, গানের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবিতাকে ফুটিয়ে তোলা। এই যেমন, 'সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই' যদি আপনি অত্যন্ত চিৎকার করে গান তা হলে আমাদের কখনও ভালো লাগবে না। রজনীকান্তের 'ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে' গাইবার সময় বোমা ফাটার আওয়াজ কানে আপনারই কি ভালো লাগে, তা সুর যতই শুদ্ধ হোক না? আবার দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' গানটি বেশ জোরে তেজের সহিত গাইতে হবে— তা না গেয়ে, যদি কবিতার অন্তর্নিহিত রস কিংবা ভাবটিকে অগ্রাহ্য করে কেবল সুরের কেরদানী দেখান, তা হলে আমাদের মর্মস্পর্শ তো করবেই না, সঙ্গীতও হবে না। আমরা সাধারণ লোক, আপনার সঙ্গে গানের আলোচনা করতে ভয় হয়।

আমি : লজ্জা, ভয়— এ দুই-ই হয় ! বাকিটা পড়ে থাকে কেন ? ঘৃণাটাও প্রকাশ করুন না, তা হলেই ষোলকলা পূর্ণ হবে ! যাই হোক, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়— এ তিন থাকতে নয়। অতএব সেগুলো অবহেলে দূরে ফেলে আসুন, বুদ্ধির সাহায্যে তর্ক করা যাক। যতক্ষণ আমার 'ভালো লাগে' এবং 'আপনার ভালো লাগে না' সঙ্গীতের কষ্টিপাথর হবে, ততক্ষণ কোন মীমাংসাই হতে পারে না। কেন না আমার ভালো লাগে অতএব সেটি ভালো বলবার দাম্ভিকতা আমার নেই, এবং কেবল আপনাদের ভালো লাগে বলেই যে সেটি আমার আদরের সামগ্রী হবে, এ রকম বিনয় আমার ধাতে নেই। তর্কবুদ্ধি দিয়ে উপভোগ করা যায় না জানি, কিন্তু কেবলমাত্র ঐ যন্ত্রের সাহায্যেই কোন্‌টি ভালো লাগা উচিত এবং কেন ভালো লাগল ঠিক করা যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত অবশ্য আমরা মানুষ রয়েছি,— তারপর যদি থিয়সফিস্টদের আশা অনুযায়ী সকলেই অতিমানুষ হয়ে যাই, তখন না হয় intuition-এর সাহায্য নেওয়া যাবে। কী বলেন ?

তাঁহারা : এক হিসাবে আপনি ঠিক কথাই বলেছেন কিন্তু গান শোনবার সময় তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তগুলো ভুলেই যাব। এখন যখন আপনি গান গাইছেন না, তখন তর্কই করা যাক,—সময় কাটানো চাই তো !

আমি : বেশ। গোলমাল বাধে সুর এবং কথা নিয়ে। ওস্তাদেরা বলেন সুর প্রধান, আপনারা বলেন কথা প্রধান। অর্থাৎ, তাঁদের মতে কথা সুরের দাসীগিরি করবে, এবং আপনাদের মতে সুরই কবিতার দাসীগিরি করবে। প্রথমে আপনাদের মতই আলোচনা করা যাক। এই মতের স্বপক্ষে আপনারা আর কী বলেন শুনি ?

তাঁহারা : আমাদের গানে সুরও রয়েছে, কথাও রয়েছে, অতএব যে গানে শুধু সুর আছে তার চেয়ে আমাদের গানে একটি বেশি অলঙ্কার রয়েছে, যার দ্বারা আমরা গানের ভাবকে বেশি উপলব্ধি করতে পারি।

আমি : এ দেখছি বরকর্তার কথা। একটি বেশি গয়না দিলে কি আপনাদের পুত্রবধূটি 'সুন্দরীতর' হয়ে উঠবে ? যদি গয়নাটি বে-মানান হয় ?

তাঁহারা : সে তো পূর্বেই বলেছি— গয়নাটি মানানসই হওয়া চাই।

আমি : আর যদি কচি মেয়েটি শুধু গয়না না পরতে চায় ?

তাঁহারা : কোন্ মেয়ে গয়না চায় না দেখিয়ে দিন !

আমি : এই যাঁরা গয়নার সঙ্গে বেনারসী চান। উপমা ছেড়ে দিলেই বুঝতে পারবেন যে, কবিতার গায়ে সুরের গয়না খাপ খাওয়ানো বড় জহুরীর কাজ। কেন না সাহিত্যের রস সুরের রস থেকে বিভিন্ন, সাহিত্যের বিষয়

বিভিন্ন, সাহিত্যের পদ্ধতি বিভিন্ন।

তাঁহারা : বুঝলাম না।

আমি : না-বুঝে বড় আনন্দ দিলেন। গানও ভাষা, কবিতাও ভাষা। তবে রাগ, লোভ, মোহ, প্রেম প্রভৃতি মনোভাবকে প্রকাশ করতে গান মোটেই ব্যস্ত নয়। সাহিত্যের কারবার ঐ সব নিয়ে। সুর অত্যন্ত অ-বাস্তব জিনিস, সুরের রাজত্বে 'মন হার মেনে যে কাঁদে'। মন সেখানে একটি ইন্দ্রিয় মাত্র, অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরই মতন। ওস্তাদেরা চোখ বুঁজে, কানে আঙুল দিয়ে গান গেয়ে থাকেন, দেখেন নি কি? সাহিত্য কিন্তু মনোভাবের পর্যায়ই প্রকাশ করে আসছে, সেই জন্যে গদ্য কিংবা পদ্য ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যও যে অ-বাস্তব হয় না তা বলছি না, তবে সাহিত্যের স্তর সুরের স্তর থেকে ভিন্ন।

তাঁহারা : বীণা শুনে আলেকজান্দারের মনে কত রকম ভাবের উদয় হয়েছিল পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি।

আমি : আমাকেও পড়তে হয়েছিল, কিন্তু সে কবিতার লেখক ড্রাইডেন, যাঁর কবিতা লেখা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না, কবিত্বই যাঁর একমাত্র ব্যবসা ছিল। যাক, আমি তো Sir Oracle-এর মতন্ পার্থক্যের কথা কেবল জোর করে, ঘন গলায় বলেই গেলাম— এখন বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই ধরুন, লক্ষ্ণৌ-এর এক টাঙ্গাওয়ালা 'বেচ্‌নে যাতি দহিরি' গান গাইতে গাইতে এই শীতের রাতে টাঙ্গা হাঁকাচ্ছে। অর্থার্থ এই যে, গোয়ালিনী দই বেচতে যাচ্ছেন, কানহাইয়া তাঁর ওড়না ধরেছেন, কিছুতেই ছাড়বেন না, শেষকালে গোয়ালিনী শ্যামের গালে একটি ছোট্ট অথচ জোরালো ঠোনা মেরে দই বেচতে গেলেন। শ্যাম-পিয়ারীর মনে কি কি ভাবনা উঠেছিল আপনারা সকলেই বুঝতে পারেন এবং টাঙ্গাওয়ালাও বুঝতে পেরেছিল— সেই জন্যে সে কখনও ত্রস্ত, ভীত, শঙ্কিত, কখনও রাগান্বিত, কম্পিত, কখনও অনুশোচনাপূর্ণ হৃদয়ে গানটি গাইছে। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে।

তাঁহারা : লক্ষ্ণৌ-এর টাঙ্গাওয়ালার মধ্যে এখনও ভালো গাইয়ে আছে।

আমি : নিশ্চয়। শুনুন তারপর কি হলো। হঠাৎ সে 'দহিরি' কথাটির 'ই'কারের ওপর তান ধরলো। তখন আর তার গলায় ওসব বস্তুগত ভাব পাচ্ছি না, যা পাচ্ছি তার নাম জানি না, সেটি একটি গতি মাত্র, অথচ আপনাতে আপনি পূর্ণ, একটি সাবলীল ক্রীড়া, যার রীতিনীতি বাইরের জগতের নয়, নিজের জগতের, যেখানে স্বার্থের লেশমাত্র নেই।

তাঁহারা : স্বার্থ কেন আসবে?

আমি : এই তো এতক্ষণ ছিল, দই-এর হাঁড়ি বাজারে নিয়ে না বেচতে পারলে গোয়ালিনী বাড়িতে এসে মুখ দেখাবে কি করে ? সেই জন্যেই তো সে কানহাইয়াকে ঠোনা মেরে চলে যেতে চেয়েছিল, হঠাৎ টাঙ্গাওয়ালা তান তুললে, তাই না সে থেমে গেল ?

তাঁহারা : তারপর ?

আমি : তারপর আর কী ? তান ফুরিয়ে এল, টাঙ্গাওয়ালা বাস্তব জগতে ফিরে এলেন— এবং ঠোনা খাওয়ার প্রতিশোধ নিলেন, ঘোড়ার পৃষ্ঠে চাবুক মেরে। গানও থেমে গেল, কবিতাও চুকে গেল, টাঙ্গাওয়ালা পিয়ারীর মতনই নিজের কাজে গেলেন— অর্থাৎ সোয়ারি খুঁজতে।

তাঁহারা : এর থেকে কি প্রমাণ হলো ?

আমি : প্রমাণ আর কী হবে ? আর্টিস্ট ব্যবহারিক জগতের ধার ধারেন না। সাহিত্যিক একথা জেনেও জানেন না, কেন না, জানলে তাঁর চলে না, তাঁর লেখা লোককে বোঝাতেই হবে, সেই জন্যে ব্যবহারিক জগতকে তাঁর একটু খোশামোদ করতে হয়। আর গায়ক— সে যখন তান তোলে তখন তার কাউকে সে তানের মানে বোঝাতে হয় না, সে জানেও না যে জগৎ আছে কি না, বোধহয় জগৎ তাকে বড় অবহেলা করেছে, এই জন্যেই সে জগতের কথা ভুলে গিয়েছে। সে যাই হোক, এঁরা দু'জনেই আর্টিস্ট, আমাদের পৃথিবীতে তাঁরা অন্য লোক থেকে দূত হয়ে এসেছেন— সেইজন্য তাঁদের বাসস্থান আমাদের জমিতে হলেও তাঁদের নিয়ম-কানুন সবই আলাদা। আইন অনুসারে তাঁদের কার্যাবলীর ওপর আমাদের কোন হাত নেই। চাই কী, আমরা কেউ কেউ তাঁদের মুখোশ পরে রাস্তায় অন্য লোককে খুন করে, তাঁদের বেনামে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারি—যেমন আমি করছি। ও সব কথা ছেড়ে দিন— প্রত্যেক আর্টিস্টই এই ব্যবহারিক জগতের উৎপন্ন মানসিক অবস্থাকে spring-board-এর মতন ব্যবহার করেন— তাকে ঠেলেই 'জয় মা' বলে আকাশে ঝাঁপ দেন। সাহিত্যিক বেশিক্ষণ আকাশে থাকতে না পেরে জলে পড়ে যান— ধরণীর সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ কিঞ্চিৎ বেশি, এবং গায়ক আকাশের স্বাধীনতা পেয়ে আরও উঁচুতে উড়তে চান। তাঁর পাখাতেও মোম আছে, তাঁকেও পড়তে হয়। পাখিরা উড়তে পারে, আমি মানুষ— আমি কেন পারব না— এ রকম ন্যায় মাথায় আসে এক প্রকার অবস্থায়। সেইজন্যেই বোধহয় সুর এবং সুরার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

তাঁহারা : সেই জন্তে অন্তত সুর গাওয়া উচিত নয়।

আমি : ঠিক বলেছেন। পুসিক্কুট্ট ও-কথা বলতে পারতেন।

তাঁহারা : দেখুন, মাথায় গোটাকয়েক আপত্তি গজ্‌গজ্‌ করছে। বলে ফেলি, গ্যাস বার করাই ভালো, কী বলেন ? আপনি বললেন সুর নিজের নীতিতে চলবে— অর্থাৎ আমরা যাকে বলি নিজের খেয়ালে। বেশ, তা হলে সুরের রাজ্যে ব্যক্তির স্থান কোথায় ? সুরের কি তা হলে expression থাকবে না ? আপনি যাই বলুন, ওসব কথা বড় high-brow বলে মনে হচ্ছে।

আমি : প্রথম দুটি প্রশ্ন একই আপত্তির দুইরূপ— আমি তার জবাব পরে দিচ্ছি। শেষ আপত্তিটা বড় মজার। একটু বিশদ করে বলুন।

তাঁহারা : যখন কোন আর্টিস্ট বলেন 'আমাদের জগৎ বিভিন্ন, তোমরা আমাদের মনের খোঁজ পাবে না,' তখন কি আমরা তাঁকে এই উত্তর দিতে পারি না, 'বাপু হে, তা হলে তোমার আর্টেরই দোষ' ? আর্ট মানে কোন গুপ্তমন্ত্র নয় যে অন্যে বুঝতে পারলেই তার শক্তি লোপ পাবে। কিন্তু এই আর্টিস্টরাই এবং আপনার মতন সমালোচকবৃন্দই আর্টকে একটি esoteric ব্যাপার করে তুলেছেন— যার গুপ্তমন্ত্রের দ্রষ্টা আপনারাই, সাধক আপনারাই। আপনিই কতবার গণপূজার বিপক্ষে আপত্তি তুলেছেন এই বলে যে হট্টমন একটি মিথ্যামন্ত্র, এবং সেই মিথ্যামন্ত্রের প্রচার করেন তাঁরাই যাঁরা এই মন্ত্রের ওপর একটি cult খাড়া করে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে চান। যদি গুপ্তমন্ত্রের বিপক্ষে হন, তা হলে এই রকম গুপ্ত cult-এর বিপক্ষেও অস্ত্র ধরুন।

আমি : কিন্তু আর্টের কার্যকলাপ গুপ্ত কে বললে ? নিজে আর্টিস্ট হয়ে দেখুন না, তখন বুঝবেন যে আর্টের প্রকৃতি অত্যন্ত সরল, সহজ, এবং প্রকাশ্য।

তাঁহারা : তাই যদি হয় তাহলে ছবিতে লম্বা আঙুল কেন হয় বুঝি না কেন, সুরের ওস্তাদি বুঝি না কেন, আপনার কাছে impressionist, expressionist প্রভৃতি কত দলের ছবি রয়েছে, তার মধ্যে একটাও ভালো লাগে না কেন ?

আমি : কারণ অবশ্য রয়েছে, তবে যদি আহত না হন তা হলে বলি। আপনারা ভয় পান বলে। বেশ সহানুভূতি দিয়ে বুঝুন দেখি, পারেন কি না ? ভয়ে ঈর্ষা আসে।

তাঁহারা : এখানে ঈর্ষা কোথায় এল ?

আমি : ঈর্ষা এল যখন আপনাদের political আত্মমর্যাদায় ঘা পড়ল।

কিছুদিন থেকে মানুষ বড় অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। যদি কেউ কাউকে বলে 'তুমি আমার চেয়ে ছোট', সে কথাটা না তলিয়ে দেখেই তার নাকে ঘুঁষি মারবে, তারপর প্রশ্ন তুলবে 'আমি তোমার চেয়ে কিসে কম? আমিও ভালোবাসি, আমিও ইংরেজী জানি, আমিও বার্ক-মিল পড়েছি, আমারও ভোট আছে— আমি কিসে কম?' মণ্টেগু সাহেব এদেশে আসবার পর থেকে কেউ যে আমাদের চেয়ে বড়, এমন কী ভিন্ন হতে পারে তার ইঙ্গিত পর্যন্ত আমরা সহ্য করি না। কোন লোক দেখলেই আমরা তাকে এই বলে প্রথম সম্ভাষণ করি 'দেখবেন, যেন চাল দেবেন না, তা হলে ঘুঁষি মারব।' আমি বলি, এ রকম অবস্থা সুস্থ মনের চিহ্ন নয়। আর্ট ও আর্টিস্টের প্রতি অনাদরের কারণ political। অথচ আর্টিস্ট বেচারিরা তো প্রাণপণে আপনাদেরই সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছেন। যখন ওস্তাদকে বাড়িতে মুজরা দেন, তখন সে কী প্রাণপণে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে না? তবে তার সন্তোষদানের বিধানটি আপনার কাছে কটু ঠেকতে পারে। একবার ওস্তাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখবেন, দেখতে পাবেন সে বেচারি কত প্রাণপণে চেষ্টা করছে বাহবা নেবার জন্যে, একটু হেসেছেন তো বেচারি সেলাম করতে করতে অস্থির, একটু অন্যমনস্ক হয়ে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করেছেন কী বেচারি বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে। অনবরত এই রকম অপমান সহ্য করলে তারাও যে দাম্ভিক হবে না এ রকম আশা করাই অন্যায়। ওস্তাদ যখন গায় তখন সে থাকে নিজের রাজত্বে, সেটি আপনার নয়, আমার নয়। সে আপনাকে ব্যক্ত করেছে তার সুরের ভাষায়, যতদূর সে পারে ততদূর। আপনি এই ব্যবহারিক জগতে রইলেন, সে যে অন্য জগতের ভাষায় কথা বলছে তা জানলেন না। সে ভাষা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করা দূরে থাক, তার কাছে প্রত্যাশা করলেন যে সে অন্য জগতের খবর দিক আপনাদের বোধগম্য ভাষায়। এমন কী, তার কাছে চেয়ে বসলেন এই জগতেরই একটি রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব। সে বেচারি আপনার এই প্রকার সদিচ্ছা পালন করতে পারলে না, তার ক্ষমতা নেই বলেই। আপনাদের আবদার মেটাতে পারলে না বলেই না তাকে দাম্ভিক বলছেন! আমায় একটা প্রশ্নের উত্তর দিন— কেন তার কাছে এই সব চেয়েছিলেন? পৃথিবীতে আপনার গণ্ডিই কি একমাত্র গণ্ডি? আপনাদের আপত্তি এককথায় আর্ট সংক্রান্তই নয়, পলিটিক্স্ সংক্রান্ত। ডিমক্রাসীই আপনাদের সর্বনাশ করেছে। ঐ জিনিসটা আপনাদের সাম্যের বদলে স্বাধীনতা শিখিয়ে দাম্ভিক করেছে, ঈর্ষাপরায়ণ করেছে। যে আর্টিস্ট সে দেবতার বাচ্চা।

তাঁহারা : আপনার বক্তৃতা শুনে বড়ই উপকৃত হলাম। আপনার বিনয়ের সীমা নেই। আমরা জানি আপনি একজন ওদেরই দলের।

আমি : বাপ তোলেন কেন, মশাই ? আমার বাবা মানুষ ছিলেন, এবং আপনাদের মতো নেহাৎ ভালোমানুষটি ছিলেন না। আমি আর্টিস্ট নই, artistic—

তাঁহারা : আপনি যাই হোন, তর্কটা অন্য পথে নিয়ে যাবার আপনার কোন অধিকার নেই।

আমি : আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে— একটি জন্মগত অধিকার আছে, বাপ-দাদা দেবতা নন, সব উকিল-মাস্টার। যাই হোক, এবার সেই মৌলিকতা, expression সংক্রান্ত আপত্তির জবাব দেব। একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে— বক্তৃতা দিতে বেড়ে লাগছে, আপনারা এই রকম মাঝে মাঝে আসবেন। হ্যাঁ, মৌলিকতা আর expression একই জিনিস।

তাঁহারা : রাবণের দশটা মাথাকে একটা করলে রামের পক্ষে সুবিধা হয় কিন্তু রাবণের তাতে হয়তো অসুবিধা হতে পারে।

আমি : যতটা অসুবিধা ভাবছেন ততটা নয়, দশটা মাথা নিয়ে শীতের রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় স্ত্রীর দিকে পাশ ফেরার কথা মনে করুন। আপনাদের এবং আমাদের সকলেরই ধারণা এই যে, আমাদের রাগিণীর যেকালে পর্দা বাঁধা তখন একমাত্র ব্যক্তিগত মৌলিকত্বের স্থান expression-এ, অর্থাৎ হয় মুখভঙ্গিতে, নয় গলার আওয়াজে। যেমন, রজনী সেনের 'ফুটিতে পারিত গো' গানটিতে একটি পদ আছে 'দু' দিন ভেসেছিল সুখবিলাসে'। সেই সময় গলার আওয়াজটি ভাসিয়ে দিতে হবে, মুখটি করুণ করতে হবে, তবেই আপনারা বুঝবেন যে প্রাণ দিয়ে গাইছে, তবেই সুরে expression খুঁজে পাবেন। বেশ কথা, তা হলে গানের অন্য পদেও প্রাণ প্রত্যাশা করুন, যেমন 'দু'দিন হেসেছিল, দু'দিন কেঁদেছিল' গাইবার সময় গায়কের একবার হো হো করে হাসা উচিত, একবার ভেউ ভেউ করে কাঁদা উচিত। একবার থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম—

তাঁহারা : জানি সে গল্প, রিজিয়া প্লে হচ্ছিল তো ?

আমি : হুঁ, আর একবার হালিশহরে ঐ রকম ঘটনা ঘটেছিল। একটি ছেলে প্রফুল্ল সাজে। ছোট ছেলেটি— গোপাল বুঝি তার নাম— তার মরবার সময় প্রফুল্ল এমনি মড়াকান্না তুললে যে, লোকেরা হেসে অস্থির। আমি সাজঘরের ভেতরে গিয়ে দেখলাম যে প্রফুল্ল অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, লোকে তার মাথায় জল দিচ্ছে, তবু তার কান্না থামে না। অবশ্য ও রকম

expression আপনারা চান না, অত বাড়াবাড়ি নয়, তবে ঐ ধরনের একটা কিছু। অর্থাৎ গান গাইবার সময় গাইয়েকে ভাও বাতাতে বলেন, নাচতে বলেন, অ্যাক্‌টিং করতে বলেন। সে বেচারি অত কাজ একসঙ্গে পারবে কেন ? সে যে সুর নিয়েই ব্যস্ত।

তাঁহারা : তা হলে গাইয়ে শুধু তোতাপাখির মতন স্বরসাধন করে যাবে— শুধু সরগমই গেয়ে যাবে ? **expression** এবং **individuality** আপনি মানেন না ?

আমি : লাখ বার মানি। মানি বলেই তো যার-তার গান ভালো লাগে না। প্রথমে কী মানি না তাই বলি। **Expression** হচ্ছে বিলিতী বুলি। ক্রোচে সাহেব এই কথাটা আজকাল বাজারে চালিয়েছেন। তাঁর ভাবের ঘরে কোথায় চুরি তা সমালোচকেরা ধরে দিয়েছেন। আর্টের মানে ভাবের অভিব্যক্তি নয়, কেন না কোন কোন ভাবের অভিব্যক্তি একটি কমা, ফুলস্টপেও খোলে। আর্ট ভাবের অভিব্যক্তি যদি হতো, এক আর্টের সঙ্গে অন্য আর্টের পার্থক্য তখন কোথায় থাকত ? প্রত্যেক আর্টের বিষয় বিভিন্ন, উপায় বিভিন্ন, যে ভাব ব্যক্ত হচ্ছে তার স্বরূপ এবং প্রকৃতি বিভিন্ন, এবং প্রকাশের রীতিও বিভিন্ন। **Expression** বলতে প্রত্যেক আর্টের যে ল. সা. গু. বোঝা যায় সেটি ওজন-জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়। ভাবের কতটা প্রকাশ করলে— কথার, রঙের, লাইনের, স্বরের, পাথরের আঁশের অন্তর্নিহিত স্বরূপটি প্রকাশিত হবে, এই বুঝতে পারলেই আর্টিস্ট হওয়া যায়। এই প্রকাশ করার নামই ওজন-জ্ঞান, যে প্রকাশ করতে পারে সে ব্যক্তিই **person, original** এবং তারই **expression** আছে, অন্যের নেই। যাকে **feeling for the medium** বলে তার নামই **expression**। এ নয় যে আমি একটি ব্যক্তি, অতএব আমার অভিজ্ঞতা একপ্রকার, তুমি আর একটি ব্যক্তি অতএব তোমার অভিজ্ঞতা অন্যপ্রকার, অতএব আমার কানাড়া তোমার কানাড়া থেকে বিভিন্ন হতে বাধ্য। যে ব্যক্তি কানাড়ার কোমল গান্ধার, কোমল ধৈবত ও কোমল নিখাদের মজা দেখাতে পারে, যে রেখাবের মহিমা বোঝাতে পারে, যে মধ্যমকে আদর করে ঘোমটা তুলে দেখাতে পারে, সেই ব্যক্তিই আর্টিস্ট। আর্টে আবার এ ছাড়া ব্যক্তিত্ব কোথায় ? সঙ্গীত-স্রষ্টা অর্থাৎ **composer**-দের কথা কিংবা বড় ওস্তাদের কথা আমি বলছি না— তাঁরা যেখানে নিজেদের **style** গড়ে তুলেছেন সেখানে ব্যক্তিত্ব বজায় রয়েছে। কিন্তু সাধারণ গায়কের পক্ষে প্রত্যেক **note**-এর শক্তি, **potentiality** দেখানোই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সেই জন্যে মাছিমারা কেরানির

আমরা·

মতন ভালো ভালো গান মুখস্থ করা উচিত, ভালো আর্টিস্টের কাছে থেকে যখন স্বর ও সুরের স্বরূপ বুঝব তখন সৃষ্টি করতে পারব, এ বাঁধাধরা নিয়মের ভেতরেও।

তাঁহারা : এ একটা কাজের কথা বললেন এতক্ষণের পর, কিন্তু আর্টিস্ট কই ?

আমি : দেখুন, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, সেইজন্যে বোধহয় চোখ জুড়ে আসছে। এখনি চেয়ার ছেড়ে উঠে খুঁজতে পারছি না, কাল পেলে হবে না ? আশা করি অত তাড়াতাড়ি নেই।

তাঁহারা : অত ঠাট্টা করবেন না। বুঝেছি, আপনার খাবার দেরি হয়েছে। আচ্ছা, আসছে শনিবার এসে আপনার মুখে রবিবাবুর গান সম্বন্ধে মন্তব্য শোনা যাবে। রবিবাবুর গান আপনার মতে না সুর, না কবিতা, অর্থাৎ সঙ্গীত। কোথায় সঙ্গীতকে বসান দেখা যাবে !

আমি : মাথার ওপর, মশাই, মাথার ওপর। এই যেখানে আপনাদের ইচ্ছা করে।

তাঁহারা : তা হলে হৃদয়ে নয় ?

আমি : **Two things cannot occupy the same space** ; কী করব, ইযুক্লিডের দোষ !

* * *

বন্ধুরা বিদায় নিলেন। এ সব কী কথা হলো ? তর্ক করতে গিয়ে বুদ্ধিতে শান পড়ে, কিন্তু অন্যকে শানের পাথর ভাবতেও তো ভালো লাগে না। মনকে বাঁচাতে গিয়ে হৃদয়কে হারাতে হয়। বুদ্ধি দিয়ে রসভোগ হয়, রসভোগের জন্যে আর একটা আস্ত, বড় জিনিসের দরকার— সেটা বুদ্ধিরও বড়, প্রাণেরও বড়। এমন কী উপভোগ করবার ইচ্ছাশক্তির চেয়েও বড়, অথচ সব মিলিয়ে একটা। সেটা আমার মধ্যে রয়েছে, অথচ আমাকে নিয়েও রয়েছে। তার নামই কি **Personality** ?

তৃতীয় স্তবক ঃ সঙ্গীতের কথা

এক সপ্তাহ না যেতে যেতে তাঁহারা এসে উপস্থিত। দেশের লোক যখন গানের আলোচনা করতে নদী পার হয়ে আমাদের মতন snob-দের বাড়ি অত ঘন ঘন আসতে পারেন তখন তাঁদের অন্তত সঙ্গীতপ্রিয় না বলে থাকতে পারা যায় না। আমি যদি গাইতে পারতাম তা হলে দেখছি তাঁরা সাগর পর্যন্ত পার হতে দ্বিধা করতেন না। সাধে কী ওস্তাদেরা বলে যে বাঙালীর মতন কদরদান আর কেউ নয়। বাঙালীর সঙ্গীতপ্রিয়তা এ অঞ্চলের এক সুপরিচিত প্রবাদ। আমার কিন্তু এই ধরনের প্রবাদবাক্যের সাহায্যে আত্মসম্মান বাড়ানো ভালো লাগে না। ইংরেজ-জাতি গানবাজনা ভালোই বাসেন না, এবং তাঁরা, তাঁদের মেয়েরা পর্যন্ত, পলিটিক্স্ আলোচনা গান শোনার চেয়ে বেশি পছন্দ করেন, তাই বীক্হম্ সাহেব অভিমানভরে ফরাসীদেশে চলে যেতে চান। ফরাসী দেশে যাঁরাই গিয়েছেন তাঁরাই বলেন যে ফরাসীজাতি অত্যন্ত সুরপ্রিয় এবং প্যারিস সব বড় ওস্তাদেরই কাশীধাম। অন্যদিকে আনাতোল ফ্রান্স একজন ফরাসী, এবং তাঁর চেয়ে অন্য কেউ প্যারিস বেশি ভালোবাসত না কিংবা চিনত না, তিনি কিন্তু নিজে লিখেছেন, **"We French are not a musical nation and do not readily sing."** মোদ্দা কথা এই যে কোন্ জাতি কী-প্রিয় বলা সাহিত্যের কথা— অর্থাৎ বাজে কথা। সমাজতত্ত্ববিদ্ অবশ্য জাতীয় ভাবধারা নির্দেশ করতে লোকের মাথা গোনেন। তিন প্রকারের মিথ্যা কথা আছে, **lies, d-d lies, and statistics**— মাথা গুণে দেশের জন্মমৃত্যুর তালিকা, আমদানি-রপ্তানির হার, মুসলমান এবং অমুসলমানের সংখ্যা ঠিক করা যেতে পারে, কিন্তু একটা গোটা জাতির মনের গতি কী তা বলা যায় না। বলা যাবে না কেন? ভুল হবে এই মাত্র! অবশ্য ভুল বিশ্বাস সমাজের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। সকলে যদি সত্য খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে তা হলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে, জগৎ আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়, দেবদ্বিজ-সম্প্রদায়ের— অর্থাৎ যাঁরা সমাজের রক্ষক, তাঁদের খানাপিনা মারা যায়! আমি ব্রাহ্মণ, বাড়ি আমার ভট্টপল্লীর কাছে, ব্রত আমার অধ্যাপনা, সাধনা

আমার অধ্যয়ন, অতএব সত্যানুসন্ধান আমারই ধর্ম। আমার ধর্ম আমাকে বলছে এই, যেকালে বর্তমানে রবিবাবু এবং অতুলপ্রসাদ বেঁচে রয়েছেন, তখন বাঙালী, সুর ভালোবাসুক আর না বাসুক, কবিতাকে ঘৃণা করুক আর না করুক, সঙ্গীত যে ভালোবাসে তার ভুল নেই। পিঁপড়ের যেমন শুঁয়ো, জাতির তেমনই প্রতিভা। সেই প্রতিভার প্রভাব যতদূর পৌঁছায় ততখানি পর্যন্ত দেশ সভ্য হয়। সভ্যতার ধারা প্রতিভাই কেটে চলে।

* * * *

তাঁহারা : আজ আপনার মুখে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে এসেছি। সেদিন সুর থেকে সঙ্গীত পৃথক করেছিলেন মনে রাখবেন।

আমি : বেশি পৃথক থাকার পক্ষপাতী আমি কখনও নই, জোর একমাস— তার মধ্যে চারিটি মধু শনিবার। সে যাই হোক— আলোচনা শোনে না, বক্তৃতা শোনে, এবং আলোচনা করে।

তাঁহারা : সাধারণত যখন দুটি বিরোধী মতে কিছু সত্য আছে লোকে স্বীকার করে, তখনই লোকে আলোচনা করে। আমরা রবিবাবুর গান— বিশেষত তাঁর পুরাতন গান— এই যেমনই 'যামিনী না যেতে', 'অলি বারবার ফিরে আসে', 'সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি'— অত্যন্ত ভালোবাসি। অতুল-প্রসাদের সব গানই প্রাণস্পর্শী। কিন্তু রবিবাবুর অনেক গান বিশেষত তাঁর নোবেল প্রাইজ পাবার পর রচিত গানগুলো আমাদের মোটেই ভালো লাগে না, তার চেয়ে থিয়েটারের গান ভালো লাগে, রজনী সেনের গান ভালো লাগে। রবিবাবু বড় কবি, তাঁর দেওয়া সুর ভালোও লাগে, অথচ ভালো লাগে না। আপনি কী ভাবে বলেন রবিবাবু সুরের রাজ্যেও মহারাজা ?

আমি : মহারাজা নন কেবল, রাজচক্রবর্তী, মহারাজাধিরাজ।

তাঁহারা : বর্ধমান একেবারে! আপনি দেখছি sun-struck by রবিবাবু! আপনি মশায় অত্যন্ত গোঁড়া!

আমি : গোঁড়ামি অনেক সময় দৃঢ়বিশ্বাসের লক্ষণ। ভট্টপল্লীতে এখনও দু'একটি দৃঢ়মনের পরিচয় পাওয়া যায়, যেটির সন্ধান শহরে পাওয়া যায় না— বিশেষত অ-সহযোগ আন্দোলনের পর।

তাঁহারা : গোঁড়ামি ভালো কী মন্দ তর্ক করতে আসি নি, তবে যা বুঝেছি তা এই যে, ঐ রকম অন্ধবিশ্বাস এবং গোঁড়ামি নিয়ে তর্ক হয় না, আলোচনা হয় না, সাধু বক্তৃতা হয়। আপনি মঞ্চে উঠুন, আমরা হাঁ করে শুনি।

আমি : বক্তৃতা দেওয়া আমার ভালো লাগে। যারা কথা কইতে জানে না তারা যখন **art of conversation** সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখে তখনই জিহ্বার

চেয়ে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ওপর পড়ে ঝোঁক। এই সব বোবার দলই বলে যে ভালো কইয়ে হতে গেলে মধ্যে মধ্যে চুপ করে অন্যের কথা শুনতে হয়! আরে মশাই, সারারাতই তো চুপ করে শুনি, তার ক্ষতিপূরণ করব না? আর যদি দাম্ভিক না ভাবেন তা হলে বলি, আমি যত আমার বক্তব্যের বিষয়ে ভেবেছি, অন্যে কী তা ভেবেছে? ঐ সব হিংসুটে বোবাদের পরামর্শ নিতে গেলে স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে কথাই কওয়া যায় না। আপনারা যখন বন্ধু, অন্য কিছু নন, তখন অবশ্য আপনাদের মধ্যে মধ্যে চুপ থাকতেই হবে। আপনারা যদি তর্কই করেন, তা হলে বক্তব্যটি বিপথগামী হয়ে পড়বে। বক্তৃতার সুবিধা দেখুন, হাতে রইল নোট, মাথায় রইল পয়েণ্ট, পয়েণ্ট ঠিক থাকলে বক্তব্যটি নিজের লাইন ধরে স্টেশনে এসে পৌঁছবে, রাস্তায় মালগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগবে না। সত্য কথা বলতে কী, তর্ক জিনিসটা বড়ই তামসিক, বুদ্ধির অহঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই জন্যেই স্ত্রীজাতি, যে জাতি অত আত্মবিস্মৃত, অত পরার্থপর, অত ভক্তিমতী, অত— অর্থাৎ যে জাতি অত সাত্ত্বিক— সেই জাতি কখনও তর্ক করেন না, শুধু বক্তৃতা দেন, এবং পুরুষজাতি কেবলই নিজেদের মধ্যে, এবং স্ত্রীজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে তর্কই করেন। এই দম্ভের জন্যেই পুরুষের আজ পতন হয়েছে— কেউই পরীক্ষায় প্রথম হতে পারছেন না। আরও দেখুন—

তাঁহারা: দেখছি যা তা অনেক আগেই বুঝেছি— সিদ্ধান্তের পক্ষে তর্ক ও বক্তৃতা দুই-ই সমান।

আমি: না, না, তা কেন? বক্তৃতাতে একটু বিশ্বাস দরকার। বক্তার নিজের ওপর আস্থা থাকবে, এবং শ্রোতা বক্তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হবেন, তবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে। আমার সিদ্ধান্তটি মেনে নিলেই সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা— থুড়ি, বক্তৃতা শুরু করি। সেটি এই যে, প্রকৃত কথোপকথন হচ্ছে সেই দলেই সম্ভব যেখানে একজন মাত্র বক্তা, অন্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ, বিশ্বাসপূর্ণ, অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত শ্রোতা। গোছানো কথা শুনতে না ভালো লাগে, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবেন না। বক্তৃতার মধ্যে গোছানো কথা শুনতে গেলে শুদ্ধচিত্ত হওয়া চাই।

তাঁহারা: শুদ্ধচিত্ত কেন?

আমি: শুদ্ধচিত্ত মানে **tabula rasa**— মনটি পরিষ্কার শ্লেটের মতন হওয়া চাই, অথাৎ বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে পূর্বে থেকে কোনো মতামত থাকবে না, মনে ভরে থাকবে শুধু বক্তার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস, ও শ্রদ্ধা। চিত্তশুদ্ধির পক্ষে ওগুলোর একান্ত আবশ্যক, শাস্ত্রেও লিখেছে।

তাঁহারা : বুঝেছি, **seance attend** করবার সময় যে মনোভাবের প্রয়োজন, আপনি তাই চান। অর্থাৎ রবিবাবুর গান সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার ও ধারণাগুলো ধুয়ে ফেললেই আপনার বক্তব্য, অর্থাৎ সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বটি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হব ?

আমি : ঠিক কথা। তবে অত সহজে পূর্ব-ধারণাগুলোকে দূর করা যায় না, নিজেকে সংস্কৃত করা বড় শক্ত।

তাঁহারা : অর্থাৎ, আমাদের সংস্কারের জন্যে আপনার বক্তৃতার দরকার। এত ভণিতাও আপনি জানেন! বাজে কথা কয়ে রাত কাটালেন! প্রমাণ হল কী ? না, কাউকে শ্রদ্ধা করতে হলে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে হবে! একেবারে **begging the question** !

আমি : এই নিরন্ন বুভুক্ষু জাতি, যার— **Digby** পড়েছেন ? রাধাকমলের দরিদ্রনারায়ণ পড়েছেন ? পড়বেন, মশায়, বইখানা— ওটা তাঁর আপেক্ষিক হিসাবে দরিদ্র অবস্থায়ই লেখা— এক কথায়, এই ভিখারী জাতি, যার নেতারাও ভিখারী, তার একটি নগণ্য ব্যক্তি, যদি স্বরাজ কিংবা অন্ন ভিক্ষা না করে, সামান্য একটি প্রশ্ন ভিক্ষা করে তা হলে কি জাতির মানহানি হয় ? বাস্তবিক পক্ষে আমি প্রশ্ন ভিক্ষা করছি না ; রবিবাবুর সঙ্গীত সম্বন্ধে পূর্ব হতেই প্রশ্ন ভিক্ষার দ্বারা সঞ্চিত মতামত পোষণ করে আপনারা যে মনের থলি ভরিয়েছেন, সেই থলি উজাড় করুন, তবেই থলির ভেতর সোনাদানা পাবেন— আমার শুধু এই বক্তব্য। রবিবাবু সম্বন্ধে, তাঁর কবিতা, গল্প, জীবন নিয়ে আপনারা অনেক কুসংস্কার পোষণ করেন, সেগুলোকে দূর না করলে তাঁর সঙ্গীতের যথার্থমূল্য দেওয়া আপনাদের পক্ষে অসম্ভব।

তাঁহারা : আমাদের অত কৃপণ ভাববেন না। আমরা প্রস্তুত, কেন না এতক্ষণ পরে বিষয়টি পরিষ্কার হলো। সেজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। মুখবন্ধ করতে আপনি আপনার গুরু বীরবলের মতোই কালক্ষেপণ করেন। গুরু-নিন্দা শুনে রাগ করবেন না— আপনার উত্তর আমরা জানি, প্রথমে তর্কের বিষয় সম্বন্ধে মনোভাব ঠিক করে নেওয়াই ভালো, এবং সেই মনোভাব পরিষ্কৃত হলে সব গোলমালই চুকে যায়। তারপর, আপনার বক্তৃতা শুরু করুন।

আমি : আপনারা ধন্য! একটু ইতিহাস শুনতে হবে।

তাঁহারা : ইতিহাসের জন্যেই বিজ্ঞানের ছাত্র হলুম, আবার সেই ইতিহাস! বাড়িতে জননী বলেন, আগে লক্ষ্মীমন্ত ছিলাম, ঘরে লক্ষ্মী এসে

লক্ষ্মীছাড়া হয়েছি. নেতাদের মুখেও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি, আগে সোনার ভারত ছিল, এখন লোহার ভারত হয়েছে ! যাই হোক, বলুন শুনি— 'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে !'

আমি : আমি ওরকম ভাবপ্রবণ ইতিহাস শোনাব না। আপনারা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, আপনাদের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসই শোনাব, এবং মোগলাই ইতিহাস— খানা দিতে পারব না। আমার বর্ণিত ইতিহাস শুনে কিন্তু মনে হবে না, 'হা ভগবান ! ভারতবর্ষের কী ইতিহাস ছাড়া আর কিছু নেই ?' শুনুন, আমি ধার্মিক—

তাঁহারা : তাতে ভারতবর্ষের কী আসে যায় ?

আমি : তাতে সবই আসে যায়, ভারতবর্ষের যাক আর না যাক। সব কলাবিদ্যারই গোড়ায় আছে একটি ধর্ম। গোড়াতে ধর্মজ্ঞান ও সৌন্দর্যজ্ঞান এক— জ্ঞান মানে আমি এখন প্রবৃত্তিমূলক উপলব্ধি বলছি। ধর্মভাবেই সব আর্টের বীজ নিহিত রয়েছে, প্রত্যেক ধর্ম মানুষের মনকে স্বাধীন করে দেয়, প্রথম অবস্থায়। যখন ধর্ম 'ধম্মে' পর্যবসিত হয়, তখন 'শূন্য' আঁকা আর ভাবা ছাড়া মানুষের অন্য কিছু কর্তব্য থাকে না। দেশে যখন বৌদ্ধধর্ম শূন্যবাদে এসে উপস্থিত হলো, তখন অজন্তার চিত্রকর গুহা ছেড়ে মা কালীর শরণাপন্ন হলেন, ছুটে কালীঘাটে উপস্থিত, পট আঁকতে আরম্ভ করলেন। প্রমাণ এই যে হাতের কাছেই রয়েছে— **Indian Art and Letters, Vol. II, No. 2.**— অজিত ঘোষের প্রবন্ধটি পড়ে দেখবেন, খাসা লেখা। আর্টের গোড়ায় ধর্ম এ কথা নাস্তিকেও গ্রাহ্য করে— **Clive Bell** হচ্ছেন ইংরেজ, এবং **Osvld Siren** হচ্ছেন সুইডিশ— আমাদের ইব্‌সেনের জাত। তাঁরাও—

তাঁহারা : দয়া করে পাণ্ডিত্য দেখাবেন না, আপনি যা বলবেন বিশ্বাস করব। আপনার অনুরোধ সত্ত্বেও যখন ঐ সব কেতাব পড়ছি না, তখন ঐ সব কেতাবে কী কী আছে আপনি যা বলবেন তাই শিরোধার্য করে নেব।

আমি : আপনাদের বিশ্বাসকে ধন্যবাদ। এখন, শূন্য যেমন ফাঁকা, শূন্যবাদও তেমনি ফাঁকা। **Nature abhors a vacuum,** অর্থাৎ প্রথম-পক্ষ মারা গেলেই দ্বিতীয়-পক্ষের আবশ্যক। সেইজন্যে শূন্যস্থানে কেষ্ট, বিষ্টু, রামচন্দ্র প্রভৃতি জ্যান্ত নরনারায়ণ এসে অধিষ্ঠিত হলেন। দক্ষিণ দেশে আলোয়ার এবং ভক্ত-সম্প্রদায় তামিল গান গেয়ে লোক ক্ষেপাতে লাগল— দশম শতাব্দী থেকে মাদ্রাজী ক্ষেপল। উত্তর-ভারতে এই ভক্তির বান এসে

হাজির হলো প্রায় তিন শ' বছর পরে। বানের পর যে পলিমাটি পড়ে তাইতে জমি উর্বর হয়,— সেইজন্যে শিখ, দাদুপন্থী, রাধাবল্লভী (যাদের নাম নিমন্ত্রণ-বাড়িতে কৃতজ্ঞতা-ভরে স্মরণ করি), বল্লভাচারী, চরণদাসী সম্প্রদায় দেশ ছেয়ে ফেললে। বাঙলাদেশে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চৈতন্য, চণ্ডীদাস এবং তাঁদের দাসানুদাস সকলে মিলে সাহিত্য-সৃষ্টি করলেন, নানক পাঞ্জাবে, কবীর এই দেশে, নর্সীমেটা গুজরাটে, মীরাবাই রাজপুতানায়, তুকারাম মারহাট্টাদেশে, সব ভক্তিরসাত্মক গান রচনা শুরু করে দিলেন। শুধু রচনাই হলো না, সেই গান সকলে মিলে তারস্বরে গাইতে লাগল। সেই সব গানের সুর ছিল দেশী, মার্গ নয়,— অর্থাৎ বাঙালী গাইতেন কীর্তন-বাউল, এ দেশের লোকেরা গাইতেন ভজন, মারহাট্টারা গাইতেন আভঙ্গ। অন্যধারে আমীর খুস্রু হিন্দু মার্গ-সঙ্গীতের জাত মেরে দিলেন, ফার্সী 'মাকাম' দিয়ে। প্রবন্ধ-সঙ্গীত খাপ খেয়ে গেল ফার্সী গোরার camp song-এর সঙ্গে। একধারে নেড়ানেড়ীর, অন্যধারে যবনের স্পর্শে মার্গ-সঙ্গীত একেবারে জগন্নাথের খিচুড়িভোগ হয়ে গেল। এমন সময় এলেন রাজা মান তানোয়ার, গোয়ালিয়র নগরে— তিনি ঐ শহরের রাজা, অর্থাৎ কিল্লাদার হলেন ১৪৮৬ সালে। Willard সাহেব, আবুল ফজল, অধ্যাপক যোশী, Ouseley, ভাতখাণ্ডেজী এঁকেই ধ্রুপদের জন্মদাতা বলেছেন। এঁর স্ত্রী একজন গুর্জরী রাজপুত্রী। দেখতে পরী, এই টানাটানা চোখ, আবার সেই চোখের কালো পাতা যেন দেবী চৌধুরাণীর বজরার দাঁড়, ঝপ্ ঝপ্ করে পড়ে, ভুরুদু'টি উড়ন্ত চিল, গালে টোল, ঠোঁট টুকটুকে লাল— যেন কাগে ছোপানো ডবল ব্র্যাকেট, আর কপালে চুল— যেন ছোট ছোট গোখরো সাপ ফণা তুলে রয়েছে। গোয়ালিয়রের গরম, কপালে এবং কপোলে স্বেদবিন্দু—

তাঁহারা : মশাই—

আমি : চুপ। নাম আবার মৃগনয়না— একেবারে রাজযোটক, রূপের সঙ্গে নামের চটক! রাজা হয়ে পড়লেন স্ত্রৈণ, রাজাও তো মানুষ! রাজা মান একমাত্র স্ত্রীকে ভালোবেসে সঙ্কীর্ণ সুর তারিফ করতে লাগলেন। কানিংহাম সাহেব বলেছেন যে, রানী রচনাও করতেন, গানও গাইতেন, আর একজন বলেছেন যে তিনি শুধু রচনা করতেন। সে যাই হোক, রাজা রানীর নামে সঙ্কীর্ণ সুরের নাম বসালেন বাহুল গুজরী, মাল্‌গুজরী, মঙ্গলগুজরী প্রভৃতি। কানিংহাম সাহেবের মত গ্রাহ্য করতে বলছি না।

তাঁহারা : তাঁর মত নিশ্চয়ই গ্রাহ্য করব। মশাই, আর যে থাকতে

পারছি না! আপনি শুধু তর্কের খাতিরে ইতিহাসের মধ্যে এক সুন্দরী রমণীর অবতারণা করলেন, ইতিহাসে তাঁর চেহারা কী রকম ছিল লেখা নেই; আর যদি তাঁকে আনলেনই, তাঁকে গান গাইতে দিচ্ছেন না, অমন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। কানিংহাম সাহেব মেয়েদের খাতির জানতেন, মৃগনয়না নিশ্চয়ই কোকিলকণ্ঠী ছিলেন। আপনি অত্যন্ত অভদ্র ও নিষ্ঠুর।

আমি: নিষ্ঠুর আমি, না সাহেব? ঐ সুন্দরী যদি গান রচনা করার ওপর আবার গাইতে পারতেন, তা হলে আপনাদের কী দশা হতো ভাবুন দেখি! অবশ্য ইতিহাসে তাঁর কোন রূপবর্ণনা নেই। কিন্তু ইতিহাসে কী সুন্দরী রমণীর স্থান থাকবে না, তাঁদের স্থান কি কেবল আপনাদের বাড়িতেই? এ তো বড় আশ্চর্য কথা। তাঁরা ব্যতীত ইংলণ্ডের ইতিহাসে কেবল **Wars of the Roses**, ক্রমওয়েলের যুদ্ধ, আর রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব— না আছে স্কটিশ মেরী, না আছে দ্বিতীয় চার্লস, না আছে চতুর্থ জর্জ! আচ্ছা, এবার থেকে কেবল বৈজ্ঞানিক ইতিহাসই বলে যাব।

তাঁহারা: না, না, তা কেন? যখন সৌন্দর্য ঐতিহাসিক ঘটনা, আর বিজ্ঞান ঘটনাকে গ্রাহ্য করতে বাধ্য, তখন অবশ্য মৃগনয়নাকে শ্রদ্ধা করতে হবে।

আমি: বেশ, হেলেনের বয়স ১০৮ বছর হয়েছিল প্রমাণিত হয়েছে ঠিক যে সময় প্যারিস ঐ কাণ্ড করলেন। **Duchess du Barry** খাঁদা ছিলেন, **Madame Maintenon** অত্যন্ত মোটা ছিলেন, ক্লিওপ্যাট্রার রঙ তামাটে এবং আণ্টনির সঙ্গে দেখা হবার সময় বয়স হয়েছিল অন্তত পঁয়ত্রিশ। এ সব বৈজ্ঞানিক সত্য, অর্থাৎ ঘটনা।

তাঁহারা: ধুৎ তোর বিজ্ঞান, ধুৎ তোর ঘটনা! তারপর কি হলো বলুন।

আমি: রানী মৃগনয়নার নয়ন মুদ্রিত হবার পর রাজা মান দেখলেন কিছু কাজ চাই। তিনি বুঝলেন যে একধারে ফার্সী সুর এবং অন্যধারে দেশী ভক্তিরসাত্মক সুরের আক্রমণে মার্গ-সঙ্গীত কৌলিন্য হারিয়ে ফেলেছে। রাজা নিজে ছিলেন মিশ্র ও সঙ্কীর্ণ সুরের ভক্ত। তাই এক সভা ডাকলেন। সেই সভায় ঐ প্রকার মিশ্র সুরের রীতিনীতি ঠিক করা হলো। রাজার হাতে তবু সময় থাকে। রানী বেঁচে থাকতে যে কাজ করতে ইচ্ছা হয় নি, সময় পান নি, এবং ইচ্ছা হলেও যে কাজে মন বসে নি, আজ তাই করবেন মনস্থ করলেন। তিনি একটা আস্ত বই লিখে ফেললেন। ভগবানের কৃপায় এই বইখানির ফার্সী তর্জমা রামপুরের নবাব সাহেবের লাইব্রেরিতে আছে— কেউ

দেখতে পায় না! রাজা মান বই লিখেই মারা গেলেন। ঠিক এই সময় বড় বড় গাইয়ে দেশে জন্ম নিলেন। সকলেই গোয়ালিয়রে থাকতে চান— নায়ক বকস্থ, মাপু, ভান্নু সরয়ু, ভগবান, খোঁন্দি, ডালু। প্রথম দু'জন ওস্তাদ অবশেষে গুজরাটে সুলতান বাহাদুরের কাছে আশ্রয় নিলেন। এধারে অল্পদিন পরে স্থরবংশ বাদশা হয়ে বসলেন— সেই বংশের অবতংস ইসলাম শা' গান শুনতে গোয়ালিয়রে রাজধানী তুলে নিয়ে যান। আদিল শাহের সময় স্থরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো— নিজে বড় ওস্তাদ, তিনি বাজ্ বাহাদুর—'সেই বিখ্যাত গায়িকা রূপমতির বাজ্ বাহাদুরকে— এবং তানসেনকে গান শিখিয়েছিলেন। তিনি একটি ছোট ছেলের মধুর গলা শুনে দশহাজারী মনসবদার করে দেন— অনবরত শিষ্যের বাজথাঁই গলা শুনে বোধহয়! আদিল স্থরের ছিল সুরেলা দিল, তাই ওয়াজিদ আলির মতো রাজ্য হারালেন। রামদাস, স্থরদাস, বৈজু, এমন কী তানসেন পর্যন্ত এই সময়ের লোক। তাঁরা সব ধ্রুপদ গাইতেন, অর্থাৎ গোয়ালিয়রের চালে সঙ্কীর্ণ সুর গাইতেন— যে সুর দেশী ও ভ্রষ্ট। রাজা মান যে চাল বেঁধে দিয়ে গেলেন এবং আদিল শা ও সমসাময়িক ওস্তাদরা যে চালকে প্রচলিত করলেন তারই নাম ধ্রুপদ।

তাঁহারা : কি প্রমাণিত হলো?

আমি : সবই প্রমাণিত হলো। প্রমাণিত হলো এই যে, ধ্রুপদ নারদের মুখ থেকে বার হয় নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় যে সঙ্কীর্ণ সুরকে নিয়মাবদ্ধ করা হয়েছিল তারই নাম ধ্রুপদ— যে ধ্রুপদকে এখন শুদ্ধ সুরের খনি মনে করা হয়, এবং যে ধ্রুপদের দোহাই দিয়ে রবিবাবুর গানকে অশুদ্ধ বলা হয়। চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে ভক্তি অর্থাৎ বৈষ্ণবী ভাব সকলের মনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, ধ্রুপদ সেই ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত-রচনা, এবং সেই 'সঙ্গীত' সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যেই 'গীত হইত'। কোথায় পড়েছি যে ধ্রুপদ-হোরী গয়লানীরা গাইতেন এবং আবুল ফজল সাহেব তাদের **'suited to popular tastes'** বলেছেন। এই সময়কার সব ধ্রুপদ-রচনা প্রায়ই ভক্তিরসাত্মক। তারপর যখন রাজা-রাজোয়াড়া, শা-বাদশার দরবারে ধ্রুপদের চলন হলো তখন-রাজাবাদশাই কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠলেন। তখন ভগবানের কাছে পেট্রনের, অর্থাৎ মুরুব্বির 'ক্রোর বরষ' পরমায়ু এবং যোজনব্যাপী রাজত্বের পরিধিবৃদ্ধি ভিক্ষা করা, কিংবা সুরের লক্ষণ নিরূপণ করাই ধ্রুপদ-রচনার বিষয় হলো।

তাঁহারা : তা হ'লে মোগলদের আমলে কি কি হলো?

আমি: তাঁদের সময় ফার্সী সুর এবং দেশী ও মার্গ সুরের মিশ্রণে এক নতুন ঢঙের সৃষ্টি হলো। গোটাকয়েক মল্লার, গোটাকয়েক টোড়ি, এক-আধটা সারঙ, এক-আধটা কানাড়া তৈরি হলো। দরবারী টোড়ি কিংবা দরবারী কানাড়া নয়, সেগুলো শুদ্ধ টোড়ি এবং শুদ্ধ কানাড়া, অর্থাৎ সনাতনী টোড়ি এবং কানাড়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। তবে চাল আলাদা নিশ্চয়। এককথায় বলতে গেলে, স্বরের ক্ষেত্রে কোমল গান্ধারের ওপর খানিকটা ঝোঁক দেওয়া হলো। তখনও সুরের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল—এক-এক ওস্তাদ গলার জোরে স্বকৃতভঙ্গ সুর চালাতে লাগলেন, যেমন বিলাস খাঁ চালালেন বিলাস খাঁনী টোড়ি, তীব্র মধ্যমের ওপর কোমল মধ্যম চাপিয়ে। মার্গ অর্থাৎ পুরাতন দেবতাদের সুর দক্ষিণে আটক পড়ল, এবং উত্তর-ভারতে ধ্রুপদের সঙ্গে অন্য চালও চলতে লাগল, তবে ধ্রুপদ হলো primus inter pares— রাজাদের মধ্যে নলরাজা। আবুল ফজল সাহেব এই কয়টি প্রচলিত চালের উল্লেখ করেছেন, সব মনে নেই, তবে ধ্রুপদ আগ্রা-গোয়ালিয়রে, সিন্ধু সিন্ধুদেশে, ধ্রুব তেলিঙ্গানায়, বাঙ্গালী বাঙলাদেশে, জৌনপুরে চ্যুতকলা, বিষ্ণুপদ মথুরায়, লচ্ছারী দ্বারভাঙ্গায়। গান্ধারী উত্তর-পশ্চিমে, সৌরাষ্ট্রী সুরাটে, মারোয়ামন্দ রাজপুতানায়, এবং গুর্জরী গুজরাটে তো আগে থাকতেই ছিল। শাবেরীর নাম শুনেছেন? সেটা শবরদের, অর্থাৎ জিপসীদের গান গাইবার ঢঙ। এর থেকে কি প্রমাণ হয় না, যেমন জাতিতত্ত্বে-সমাজতত্ত্বে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, যে যখন মানবের একটি কোনো জীবনধারা লুপ্ত হতে বসে, তখন বিদেশী কিংবা দেশের মাটির শক্তি এসে সেই সনাতন ধারাকে প্রাণবন্ত করে? এখন যে ধ্রুপদকে আমরা শুদ্ধ সঙ্গীত বলি সেটি একটি জঙ্‌লা সুর, গোয়ালিয়র-আগ্রা অঞ্চলের লোকসঙ্গীত, না হয় বিদেশী ফার্সী সুরের সঙ্গে দেশী মাটির সুরের মিশ্রণের ফল; তার কাঠামো হয়তো মার্গ-সঙ্গীতের, তাও সম্ভবত নয়, মার্গ-সঙ্গীতের কনকাঙ্গী ঠাট কিছু আগেই বদলে গিয়েছিল। আগেকারের ওস্তাদরা যে দেশী সুরকে ঘৃণা করতেন না তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, দুপুরবেলায় 'দেশী' সুরের ধ্রুপদ এখনও গাওয়া হয়, এবং দেশী টোড়িতে আমি অনেক পাকা ধ্রুপদ শুনেছি। ঠাট পরিবর্তনের পর মোগলদের আমলে সময় অনুসারে সুরের ভাগ হলো, এবং প্রত্যেক রাগরাগিণীর ছবি তৈরি আরম্ভ হলো। পুণ্ডরীক নামে এক দক্ষিণী পণ্ডিত কালভেদে সুর ভাগ করলেন। এই ঘটনা থেকে সন্দেহ হয় যে তাঁর পূর্ব হতেই লোকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সুর গাইত। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন যে, মোগল আমলের পণ্ডিতেরা কেউ শ্রুতি

মানতেন না, কেবল বারোটি স্বরই স্বীকার করতেন।

তাঁহারা : মোগলের পর কি হলো ?

আমি : পরবর্তী সঙ্গীতের ইতিহাস, উত্তর-ভারতে অবশ্য অহিন্দু ও অশাস্ত্রীয়। ধ্রুপদের পূর্ব হতেই খেয়ালের আদর ছিল। প্রমথ চৌধুরীর 'খেয়ালের জন্ম' ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু মহম্মদ শা' রঙ্গীলের সময় সদারঙ্গ এবং অধারঙ্গ খেয়ালকে রাজদরবারে এনে হাজির করলেন। সেই খেয়াল দুই রকম হয়ে গেল, যেমন এ দেশে এবং বিলাতে লিবারেল পন্থীদের অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, কেউ হচ্ছেন পুরাতন-পন্থী, আর কেউ চরম-পন্থী— বিপ্লববাদী, অর্থাৎ এক রকম খেয়াল ধ্রুপদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করলে, যেমন হদ্দু খাঁ, তাজ খাঁ, আলি বক্সের ঘরোয়ানা— বেহালার বামাচরণবাবু যেমন ভাবে খেয়াল গান ; অন্য রকম খেয়াল টপ্পাঠুংরিতে পরিণত হলো, কিংবা মিশে গেল, এই যেমন সুরেন মজুমদারের গান। টপ্পা পাঞ্জাবে এবং ঠুংরি লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে প্রচলিত হলো। আজকাল সে ঠাট পর্যন্ত বদলে গিয়েছে। কাফিঠাট এখন বেলাওল ঠাটে এসে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ সব শুদ্ধস্বরই এখন ব্যবহৃত হচ্ছে মূল ঠাট হিসাবে। এই হলো উত্তর-ভারতীয় দরবারী সুরের ধারা। এখন যদি শুদ্ধ সুরে গাইতে হয়, তা হলে ধ্রুপদ-খেয়ালকে বর্জন করতে হবে, শ্রুতির ব্যবহার করতে হবে, শুদ্ধস্বর পরিত্যাগ করতে হবে, এবং মাদ্রাজীদের মতন কনকাঙ্গী কিংবা কাফি ঠাটেই গাইতে হবে।

তাঁহারা : মশাই, হিসাব-বিভাগে মাদ্রাজীদের পাল্লায় পড়ে উত্যক্ত হয়েছি, গান শুনে একটু আনন্দ পাই, তাও মাদ্রাজী ওস্তাদ এনে আমাদের আনন্দ নষ্ট করতে চান না কি ? গান সুর হতে পারে, কবিতা হতে পারে, কিন্তু কান্না নয় আমরা হলফ করে বলতে পারি। মাদ্রাজী ঠাট শুদ্ধ হোক আর না হোক, আমরা বাঙালী, আমাদের অশুদ্ধ ঠাটেই কাজ চলবে। শুনেছি জাতি হিসাবেও আমরা খিচুড়ি, না হয় সুরও আমাদের জঙ্‌লা হোক !

আমি : লক্ষ্মী ছেলেটির মতন এই কথা গোড়ায় মেনে নিলেই হতো !

তাঁহারা : তা হলে বক্তৃতা দিতেন কি নিয়ে ?

আমি : আমার কাছে বক্তৃতা দেবার অনেক বিষয় আছে। এইবার আমার বক্তব্য শেষ করি। রাজা মানের সময় থেকে শাজাহানের সময় পর্যন্ত, দু'শ বছর ধরে যে সুরসৃষ্টির ধারা— গায়কী-ধারা নয়— জাতির নিরানন্দের মধ্যে আত্মগোপন করে ছিল, সেই ধারা আজ গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে বাঙলাদেশে স্রোতস্বিনী হয়ে উঠেছে। ওয়াজিদ আলি শা'

মেটেবুরুজে যখন গেলেন তখন লক্ষ্ণৌ-এর প্রজা হাহাকার করেছিল, কিন্তু বাঙালী তাঁকে বুকে করে নিলে। তাঁর পূর্বেও বিষ্ণুপুর, বেথিয়া, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা অঞ্চলে গানের আদর ছিল বটে, কিন্তু মেটেবুরুজ থেকেই বর্তমান বাঙলাদেশে হিন্দুস্থানী অর্থাৎ মুসলমান ওস্তাদের গায়কী চাল প্রচলিত হয়। বিষ্ণুপুরী চাল ঠিক মুসলমানী চাল নয়, ও চালটি বেহারের। পঞ্চাশ বছর পূর্বে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজের বাড়িতে বড় বড় মুসলমান ও হিন্দু গাইয়ে-বাজিয়ে এনে পুষতেন। ক্ষেত্র গোস্বামী, যদু ভট্ট, মুলো গোপাল, কালীপ্রসন্ন— এঁরা প্রত্যেকেই ঠাকুরবাড়ির মুসলমান ওস্তাদদের কাছে ঋণী। রাধিকা গোস্বামী, অঘোর চক্রবর্তীও ঠিক বিষ্ণুপুরী চালে গাইতেন না। রবিবাবু যখন ছেলেমানুষ, তখন বাঙলাদেশে দরবারী সঙ্গীতের মধ্যে কেবল ধ্রুপদ এবং তাজ খানী খেয়াল কিংবা আলীবক্সী খেয়াল গাওয়া হতো, সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরী ঘরেরও আদর ছিল। এই সব ঘরোয়ানায় সুর ভেঙে কিংবা হিন্দুস্থানী কথার বদলে বাঙলা কথা বসিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত ও যাত্রা-সঙ্গীত গাওয়া হতো। পাখোয়াজে গোলাম আব্বাসের ঘরের শিষ্য ছিলেন নিতাই ও নিমাই চক্রবর্তী, তাঁদের শিষ্য হলেন মুরারী গুপ্ত ও সার রমেশ মিত্রের ভাই কেশব মিত্র। লোকে বলে ঢাকা শহরের বরাবরই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু আমার মনে হয় সেটা ঠিক বৈশিষ্ট্য নয়। পূর্বাঞ্চলের জমিদার-সম্প্রদায় বরাবরই বড় বড় মুসলমান গাইয়ে-বাজিয়ে মাইনে দিয়ে রাখতেন। হিন্দুস্থানী গায়কী পদ্ধতিতে তাঁরা বেশ পোক্ত হয়ে ওঠেন। ও-ধারে আবার ত্রিপুরার মহারাজাও এই পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতের শেষ রবাবী কাসেম আলি খাঁ ত্রিপুরায় ছিলেন। মোটকথা এই যে, সবে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় হিন্দুস্থানী চালকে, বিশেষত ধ্রুপদকে, লোকে বরণ করে নিয়েছিল। একধারে তানপুরা অন্যধারে পাখোয়াজ, অতএব রবিবাবুর বাল্যকালে ধ্রুপদ-প্রীতি খুবই স্বাভাবিক। রবিবাবু ছেলেবেলায় যদু ভট্টের কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন জানেন বোধহয়? তারপর গোঁসাইজী আদি ব্রাহ্ম-সমাজের গায়ক নিযুক্ত হলেন। এইজন্যে রবিবাবুর আগেকার অনেক গানে মুসলমানী চালের আমেজ আছে। অতুলপ্রসাদের গানে খুব বেশি, তবে সে আমেজ ঠিক ধ্রুপদের নয়, কারণ ছেলেবেলায় তিনি ঢাকায় ছিলেন, সেখানে মুসলমান গায়ক অনেক ছিল, তবে পাখোয়াজের চেয়ে তবলারই আদর সেখানে ছিল বেশি। আগ্রার অধিবাসী 'কত কাল পরে বল ভারত রে' প্রভৃতি ঠুংরি গানের রচয়িতা গোবিন্দ রায় এবং তাঁর পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রদের

মুখ থেকে ভালো মুসলমানী চালের গান, বিশেষ করে ঠুংরি গান শুনে অতুলপ্রসাদ ছেলেবেলা থেকেই ঠুংরি গানের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। রবিবাবু যেমন গ্রামে গ্রামে বাউল কীর্তন শুনতেন, অতুলপ্রসাদও ছেলেবেলায় বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্তন শুনতে ভালোবাসতেন। তারপর অতুলপ্রসাদের লক্ষ্নৌ-প্রবাস আজ বিশ বৎসর অতিক্রম করেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল—

তাঁহারা : আজ ওঁদের কথা ছেড়ে দিয়ে কেবল রবিবাবুর সঙ্গীত সম্বন্ধে বলুন।

আমি : ঠিক বলেছেন, রবিবাবুকেই ধরা যাক। এক পেলে বহুর সাধ মেটে। রবিবাবুর গানে তিন-চারটি স্তর আছে। প্রথম ব্রাহ্মসঙ্গীতের যুগ, এখন যদু ভট্ট, রাধিকাবাবুর মুখে ভালো ধ্রুপদ শুনে হিন্দুস্থানী কথার বদলে বাঙলা কথা বসানোই তাঁর কাজ, যেমন— 'সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি', 'মন্দিরে মম কে' ; এই সব গান হিন্দুস্থানী সুরের তর্জমা। দ্বিতীয় যুগে তিনি কথায় ভালো ভালো সুর বসাচ্ছেন, যেমন— 'ঝরঝর বরিষে বারিধারা,' 'রিম ঝিম ঘন ঘন রে' প্রভৃতি গান ; এখন তিনি হিন্দুস্থানী সুরের কাঠামোটি বজায় রেখে experiment করছেন, সুরগুলো মিশ্র হয়ে যাচ্ছে ; এই সময়ের গানগুলো সকলেরই ভালো লাগে। তৃতীয় যুগে তিনি সঙ্গীত রচনা করলেন, এই সময় আপনাদের মতে বেখাপ্পা মিশ্র জঙ্‌লা সুর তৈরি হলো— বাহারের সঙ্গে মল্লার মিশল, ভৈরবীর সঙ্গে মিশল খাম্বাজ, বেহাগের সঙ্গে কেদারা। এর পরের যুগ এখনও চলছে, সেটি বাউল-কীর্তনের যুগ ; এর প্রথম স্তরে শুধু বাউল, দ্বিতীয় স্তরে হিন্দুস্থানী কাঠামোর ভেতর বাউলের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা , তৃতীয় স্তরে একেবারে নতুন সৃষ্টি ! এখন মিশ্রণকে আপনারা যদি পাপ বিবেচনা না করেন, অর্থাৎ ইতিহাসকে যদি খাতির করেন, যা আপনারা আমার ওপর নিতান্ত কৃপাপরবশ হয়ে করেছেন, তা হলে এই শেষের যুগের সঙ্গীতকে শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করতেই হবে। মিশ্রণই হচ্ছে সঙ্গীতের ধারা এবং **genius compresses the accomplishment of years into an hour-glass**। রবিবাবুর সঙ্গীত-প্রতিভা না মেনে শুধু তাঁর সঙ্গীতকেই যদি ধরেন তা হলেও জীবতত্ত্বের বচন মানতে হবে যে, **ontogenesis** হচ্ছে **phylogenesis**-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ; অর্থাৎ বানর থেকে মানুষের ইতিহাসও যা, বীজ হতে ব্যক্তির ইতিহাসও তা, তবে অল্পকালের মধ্যে। অবশ্য গান পুরোপুরি দেহের কথা নয় মানি, কিন্তু দেহতত্ত্বের তুলনা দিলাম মনস্তত্ত্ব বোঝার সুবিধার জন্যে। একটি প্রধানত

জড় কিংবা প্রাণময় জগতের তথ্য, অন্যটি প্রধানত আনন্দময় জগতের সৃষ্টির বর্ণনা।

তাঁহারা : মিশ্রণ হয় মানি, রবিবাবুর প্রতিভা স্বীকার করি, আমরা ওস্তাদ নই তাও জানি, কিন্তু যা হচ্ছে তাই হওয়া উচিত বলি কি করে ?

আমি : আপনাদের কে বলতে অনুরোধ করছে ? যা হচ্ছে তাই হওয়া উচিত মানতে গেলে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জগৎ এবং একটি মতলব-বাজ ভগবান মানতে হয়। পৃথিবীটা দাবার ছক নয়, আবার কেবলমাত্র জীবন-শক্তির অবাধ গতিও নয় যে, ভগবানের মতলবে কিংবা জীবনশক্তির দুর্বার গতির জোরে যা হচ্ছে তাই হওয়া একান্ত কর্তব্য মানতে হবে। মতলব আপনার, আমার, প্রত্যেকের, এবং অন্ধ জীবনীশক্তিকে পরিচালিত করি, সচেতন করি আপনি ও আমি, প্রত্যেকটি সচেতন ব্যক্তি। অতএব মিশ্রণ হওয়া উচিত কি না, কিংবা কতটা মিশ্রণ হলে আমাদের ভালো লাগবে ও ভালো লাগা উচিত, এসব ঠিক করবে আপনার-আমার কান। সেই কান সুরে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হওয়া চাই।

তাঁহারা : শিক্ষিত মানে কি ?

আমি : দশ বছর ওস্তাদী গান শিখলে, কী শুনলে কান শিক্ষিত হতে পারে, না-ও পারে। গোড়া থেকে মনকে সজাগ ও সচেতন না রাখলে সঙ্গীত-শিক্ষা **pedantry** হয়ে যায়। মনকে সজাগ রাখতে হয় কান ও স্বরের ওপর চৌকিদারি করবার জন্যে। প্রাণ কিংবা দরদের কথা এখানে ওঠে না। কানের শিক্ষা প্রাণের শিক্ষা নয়, প্রাণের আবার শিক্ষা কি ?

তাঁহারা : তা হলে !

আমি : তা হলে আবার কী ? সে দিন তো দরদ কথাটির মানে যা বুঝি তা বলেছি। রবিবাবুর সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য এ নয় যে, সে সঙ্গীতে দরদ আছে। দরদ দেখাবেন গায়ক। রচয়িতা স্বরের মালা গেঁথে সুরই সৃষ্টি করেছেন। সুরসৃষ্টির তরফে রবিবাবুর বিপক্ষে আপত্তি এই যে, তিনি সুরকে বিকৃত করেছেন বাদী স্বরকে শ্রদ্ধা না করে, এবং বিবাদী স্বরকে প্রকট করে। আরও আপত্তি আছে : এই যেমন ভৈরবীতে তিনি শুদ্ধ রে ও কোমল রে দুইই ব্যবহার করেন, কোমল গান্ধার শুদ্ধ গান্ধার, কোমল ও শুদ্ধ ধৈবত, কোমল ও শুদ্ধ নিখাদ সবই লাগান। এতে আপত্তি কী ? ঠুংরিতে সবই লাগে, অনেক ওস্তাদও তানের সময় সব কার্যই করে থাকেন। ও আপত্তি হচ্ছে **begging the question** মাত্র। রবিবাবু ঐ সব বেপর্দা ব্যবহার করেছেন বলবার কী অধিকার আছে আপনাদের ? তিনি কি

গানের মাথায় স্বাক্ষর দিয়ে লিখে দিয়েছেন 'ভৈরবী' ? আর যদি দিতেনও, তা হলে প্রমাণ হতো যে তিনি সুরের নাম জানেন না—সে ভুলে সঙ্গীতের কী ক্ষতি হতো ? তবে যদি আপনারা বলেন, 'ঐ সুরে ভৈরবীর ছায়া রয়েছে, অতএব ভৈরবীর কান্নাকে প্রত্যাশা করছিলাম,' তার উত্তর আমি দেব—আমাদের অনেক সুরেই অন্য সুরের ছায়া পড়ে। মেঘমঞ্জরী শুনেছেন ? বুঝতেই পারবেন না ললিত, কি বসন্ত, কি বাঙালী। আপনারা করবেন ভুল প্রত্যাশা, আর সেটি পূরণ না হলেই আর্টিস্টের ঘাড়ে দোষ চাপাবেন ! আপনারা যদি রাজকন্যা চেয়ে বসেন ? এ রকম আবদার ছাত্রবয়সেই শোভা পায়, এই যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বড় অপিসের বড় চাকরি, নেহাৎ না হয় বড়লোক শ্বশুর চাওয়া ! পরিচিত কিংবা প্রত্যাশিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া দূতীর কাজ হতে পারে, আর্টিস্টের নয়। গানে realism হয় না, যদি হতো তা হলে পাখির ডাক এবং সমুদ্র-গর্জনের অনুকরণই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত হতো।

রবিবাবুর গানের বিপক্ষে সুর হিসাবে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, তিনি সঞ্চারীতে surprise note বসান, যেটি এমন একটি সুরের বাদী কিংবা অনুবাদী স্বর, যার সঙ্গে আস্থায়ীর সুরের মিশ খায় না— এই যেমন 'একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে' গানটির কেদারা সুর, হঠাৎ দ্বিতীয় পদে তিনি বাউল এনে ফেললেন। 'তুমি কোন পথে যে এলে' গানটি বাউল, হঠাৎ আভোগীতে কোমল ধৈবত এবং অন্তরায় তারার কোমল গান্ধার এল। 'কবে তুমি আসবে' গানটিও বাউল। 'শুকনো ফুলের পাতা দুটি পড়তেছে খসে' লাইনটিতে পঞ্চম ও কোমল ধৈবতের মজা রয়েছে, তারপর 'আ…আ…র সময় নাহি রে' লাইনটি বাউল রইল না, হয়ে গেল কালাংড়া কিংবা রামকেলির মা পা ধ্ব পা মা গা ঋ ধ্ব পা—কী মজা হলো ভাবুন দেখি ! 'ধীরে বন্ধু ধীরে' গানটিতে প্রায় ১২টি স্বরই লাগছে—ওস্তাদের ভাষায় সুরটি মূলতান ও টোড়ি মেশানো, মূলতানের কোমল রে, কোমল গান্ধার, তীব্র মধ্যম, কোমল ধৈবত, তার ওপর বাঙলা টোড়ির কোমল নিখাদ। হায়, হায়, কী কাণ্ড হলো ভাবুন। ফাল্গুনীতে যদি কবির মুখে ঐ গানটি শুনে থাকেন, কিংবা দিনুবাবুর মুখে যদি গানটি শুনে থাকেন, তা হলে এই মিশ্র সুরটিকে ভক্তি না করে থাকতেই পারবেন না। শুদ্ধ টোড়ির সঙ্গে ললিতের শুদ্ধ মধ্যম মিশিয়ে যদি বিলাস খানী টোড়ি হয়, তা হলে 'ধীরে বন্ধু ধীরে' কেন ঠাকুরী টোড়ি হবে না ? আমার স্থির বিশ্বাস যে কবি এমন কোন সুরের সঙ্গে এমন কোন প্রতিকূল অর্থাৎ বেখাপ্পা সুর

মেশান নি, যার ফলে সঙ্গীত অশ্রাব্য হয়ে উঠেছে। বেহাগের সঙ্গে কেদারা খাপ খায়, কেন না তুই সুরেই শুদ্ধ এবং তীব্র মধ্যমের কাজ রয়েছে, এবং বাকি স্বরগুলো বিকৃত নয়। মুলতানের সঙ্গে টোড়ির মিল খুবই রয়েছে— তফাৎ আরোহী-অবরোহীতে, এবং বাঙালী ওস্তাদের মতে কোমল নিখাদে। শাস্ত্রমতো মুলতান গাইবার সময় অবরোহীতে শুদ্ধ নিখাদ থেকে কোমল ধৈবতে নামতে হয়, কিন্তু সে সময় বড় বড় ওস্তাদও এমন একটি নিখাদ ব্যবহার করেন যেটি না শুদ্ধ না কোমল। ওস্তাদে সব কার্যই করে থাকেন— তাঁদের সাতখুন মাপ,— কেন না তাঁরা বিশ বছর ধরে সরগমই সেধেছেন! রবিবাবু ওস্তাদ নন, কিন্তু কবি ও আর্টিস্ট, অনেক ভালো গাইয়ে-বাজিয়ের কাছে কান ও মন সজাগ রেখেই গান-বাজনা শুনেছেন, এবং গান-বাজনা সত্যই ভালোবাসেন বোধহয় স্বীকার করবেন। তিনি যে ইমনের সঙ্গে ভৈরবী মিশিয়ে কিংবা পর পর শুদ্ধ ও কোমল পর্দা লাগিয়ে sin against taste করবেন তা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি অ-সাধারণ, তার মানে সাধারণের কান তো তাঁর আছেই, উপরন্তু আরও কিছু তার আছে।

তৃতীয় আপত্তি তাঁর গানের চালে। তাঁর গানের চাল হদ্দু খাঁর চাল নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু স্বর-সঙ্গীত ছেড়ে দিয়ে অর্থ-সঙ্গীতের চাল কী প্রকার হয়েছে স্মরণ রাখলেই দেখা যাবে যে রবিবাবুর গানের চাল অত্যন্ত মধুর। স্বর-সঙ্গীতের style নির্ভর করে গায়কের ওপর, উচ্চারণের ওপর, তানের ওপর, ধরবার ও ছাড়বার ওপর। আপনারা স্বীকার করবেন কি না জানি না, কথা হিসাবে রবিবাবু শোরী মিঞার চেয়ে অন্তত কিছু বড়। রবিবাবুর চাল বুঝতে হলে তাঁর নিজের মুখে কিংবা দিনেন্দ্রবাবু, সাহানা দেবী, চিত্রলেখা দেবী এবং রমা দেবীর মুখেই শুনতে হয়। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা যে তাঁর গানের সর্বনাশ করে, এ কথা বলাই বাহুল্য। সাধারণ ওস্তাদ, হদ্দু খাঁর ঘরোয়ানা style নিয়েও যে সর্বনাশ করে না বলতে পারেন? অপকর্ম করবার স্বাধীনতা এ যুগে আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু এই যুগ কি আমাদের এমন কোন অধিকার দিয়েছে যে, ভক্তের গলার দোষ গুরুর লেখার ঘাড়েই ফেলতে হবে? গান গাওয়া চৌরিচওরা নয়। যতদিন অবশ্য পুরুষেরা মেয়েদের নাকি সুরের ন্যাকামি পছন্দ করতে থাকবেন, ততদিন রবিবাবুর গান গাইবার অক্ষমতা মেয়েদের রূপ এবং রৌপ্যের ক্ষতিপূরণই করতে থাকবে। কোন্ আর্ট আগে কী ছিল জানি না, তবে কোনো আর্ট যদি পুরুষ ও স্ত্রীর মনোহরণের অস্ত্র হয়, তা হলে সেটি আর্ট

থাকে না জানি— কেন না আর্টের কোনপ্রকার দুরভিসন্ধি নেই।

রবিবাবুর গানের বিপক্ষে সাধারণের আর এক ভীষণ আপত্তি এই যে, তাঁর সঙ্গীতে তাল নেই। কথাটা তলিয়ে দেখুন। তালে গাওয়া হয়, আর ছন্দে গান রচিত হয়। অতএব সঙ্গীতে তাল নেই বলা মূর্খতা। আমাদের দেশের কথা বলছি। অন্য দেশের রচয়িতা গানের স্বরলিপি করে থাকেন, যাঁরা গানের কবিতা লেখেন তাঁরা সাধারণত স্বরলিপি তৈরি করেন না, আর যাঁরা স্বরলিপি লেখেন তাঁরা সাধারণত অন্যের লেখা কবিতাই ব্যবহার করেন। যন্ত্র-সঙ্গীতে অবশ্য কবিতার আবশ্যক নেই। রবিবাবুর কবিতায় ছন্দপতন দেখেছেন না কি? দিনুবাবুর স্বরলিপিতে তালের অভাব লক্ষ করেছেন না কি? তাল সম্বন্ধে অন্য কথা এই যে, সাধারণত রবিবাবুর গান জলদ একতালা, ঝাঁপতাল, তেওরা, কিংবা কাওয়ালী, ঢিমে তেতালাতেই গাওয়া হয়। ধরা যাক, রবিবাবু ব্রহ্মতাল ও রুদ্রতাল জানেন না, ধামার, আড়া চৌতাল তাঁর গানে নেই, তাঁর ভক্তবৃন্দও ঐ সব তাল সম্বন্ধে মূর্খ। আপনারা তো সব ঐ তাল সম্বন্ধে পণ্ডিত! অতএব আপনারাই শুদ্ধ করে তাঁর প্রদত্ত সোজা তালেই গান না! আপত্তি কী? সুরে তাল নেই, কিন্তু গায়কের গলায় তো আছে। অতএব রবিবাবু যদি ভুল করেন, আপনারাই ঠিক করে গান না! অবশ্য এ কথা মানতেই হবে যে, তাল সম্বন্ধে আপনাদের স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, কেন না সেটি সঙ্গীতের ছন্দের ওপরই নির্ভর করছে। কী জানেন, অত বড় ছন্দের ওস্তাদ সাধারণের চেয়ে লয় ও তাল বেশি বোঝেন স্বীকার করাই ভালো। আমার আর একটি বক্তব্য আছে— ধরুন তাঁর সঙ্গীতে, দিনুবাবুর গলাতেও তালভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন যে সুরের তাল এক রকম, কবিতার ছন্দ অন্য প্রকার। সুরকে যে কোন তালেই গাওয়া যায়, তার নিজস্ব কোন তাল নেই, কিন্তু সঙ্গীত তার কথার ভাব অনুসারে ছন্দে বাঁধা। সঙ্গীতে তালের চেয়ে লয়ই বেশি প্রয়োজনীয়। তাও ধ্রুপদে আভোগীর লয় অন্তরার লয়ের চেয়ে দ্রুততর হয়, চতুরঙ্গে তো হয়ই। রবিবাবুর সঙ্গীত লয়ভ্রষ্ট হয় না, কেন না তাঁর সঙ্গীত কবিতা হিসাবেও খুব বড়। সঙ্গীতে তালভ্রষ্টতার সীমা লয়ই নির্ধার্য করে। কী জানেন— তাল, লয়, ছন্দের গোড়ার কথা দম, নিশ্বাস-প্রশ্বাস। কণ্ঠনালীর নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই কণ্ঠসঙ্গীতের সর্বনাশ হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে ঐ ধরনের ব্যতিক্রম যে হয় নি তার প্রমাণ পাবেন যদি তার গানের শুধু আবৃত্তিই শোনেন।

তাঁহারা : তর্কটি ক্রমেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। আমাদের মাথা গুলিয়ে দিয়ে জেতা খুব শক্ত কথা নয়।

আমি : আমার দুর্ভাগ্য যে আপনারা এত সহজ জিনিসটি বুঝতে পারছেন না। 'উত্তরা'র পাতায় দিলীপকুমার গোটাকয়েক দামি কথা বলেছিল, পড়ে দেখবেন, তা হলেই বুঝবেন। এক কথায় আমার বক্তব্য এই যে, সুরে বসানো কবিতা, যেমন **dramatized music**, স্বর-সঙ্গীত অর্থাৎ সুর, এবং অর্থ সঙ্গীত অর্থাৎ সঙ্গীতকে যখন আলাদা আলাদা করেছেন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্যে তালও বিভিন্ন হওয়া উচিত মানতে হবে, যদিও লয়ভ্রষ্ট হওয়া সবক্ষেত্রেই **sin against the Holy Ghost**। কীর্তনে এমন তাল আছে যেগুলো ধ্রুপদে ব্যবহৃত হয় না, বাউলে গোটাকয়েক সোজা তালই প্রশস্ত, ঠুংরি গানে সাধারণত ঠুংরি দাদরা তালই প্রযোজ্য, খেমটা গানে খেমটা তালই প্রসিদ্ধ, কাজরী গানে সাধারণত দাদরা কিংবা কাহারোয়াই চলে,— যেমন হোরিতে ধামার এবং ধ্রুপদে চৌতাল। কীর্তন কি বাঙলা দেশে কি মাদ্রাজে, ঠুংরি কি দিল্লীতে কি লক্ষ্ণৌএ, কাজরী কি মির্জাপুরে কি কাশীতে সর্বক্ষেত্রেই অর্থসঙ্গীত; এবং সেই অর্থসঙ্গীতে যখন কথার তান তোলা হয় তখন বাঁয়াতবলা চুপ করে থাকে। অতএব রবিবাবুর গানে যদি তবল্‌চিকে একটু চুপ করতে অনুরোধ করা হয়, তা হলে তাঁকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে— এ রকম অভিযোগের কি অভিমানের কারণ নেই। অবশ্য কোন অভিমানেরই কারণ থাকে না। কী জানেন— যার যা তার তা, মুড়ির সঙ্গে সরষের তেলই ভালো লাগে, গোটাই ভালো লাগে, ঘিও নয়, আর **sauce**ও নয়।

তাঁহারা : মশাই মুড়ি খাওয়াতে পারেন ? তর্ক অনেক দূর গড়িয়েছে। রাত যে ঢলে পড়ল ! কিছু জলযোগ !

আমি : নিশ্চয়ই। কাশী থেকে মুড়ি এসেছে। বিশুদ্ধ মুড়ি। তবে গোটা নেই।

তাঁহারা : তা আর কী করা যাবে ! মধুর অভাবে গুড়, অর্থাৎ একটু **sauce** দিন, আপনারা সাহেব হয়ে পড়েছেন এই দুঃখ ! যাই হোক, রবিবাবুর বিপক্ষে এমন আপত্তি নিজেই তুললেন যার উত্তর নিজেই দিতে পারেন। বাহাদুরি আছে !

আমি : তর্কের রীতিই তাই। শঙ্করাচার্যও তাঁর বেদান্তভাষ্যে আমার রীতি অবলম্বন করেছেন। অতএব আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আপত্তি খণ্ডনের পর ও-কথা শোভা পায় না। আপনারাই পূর্ব হতে আপত্তি

তুললেন না কেন?

তাঁহারা: দেখুন, আপনি অত্যন্ত দাম্ভিক! এখন একটু খানি লংকা আনতে বলুন।

আমি: শেষকথা আপনারাই বলেছেন। বক্তৃতা দিই বটে, কিন্তু মজা এই যে আমি বরাবরই অন্যকে শেষকথা কইতে দিই।

চতুর্থ স্তবক : মনের কথা

তাঁরা আজ অনেক দিন পরে এসেছেন। তাঁদের কি দিয়ে তুষিব, পুজিব, ভেবে উঠতে পারছি না। গায়ে খদ্দরের কোর্তা, পরনে খদ্দরের আটহাতি ধুতি, পায়ে চাপ্‌লি, মাথায় গান্ধী টুপি, তার ওপর আবার স্বরাজপতাকা অঙ্কিত রয়েছে। সিগারেট দেওয়া দূরে থাকুক, চা, কোকো, কফি, লেমনেড দিতেও সংকোচ বোধ হচ্ছে। চেয়ার-টেবিলের কাপড় সেই পুরাতন বিদেশী ছিটের। আমার গায়েও খদ্দর নেই। গা হাত পা চুলকোয় বলে খদ্দর পরা হলো না। তাঁরাই কৃপা করে আমার লজ্জা দূর করলেন চা চেয়ে। খানিক পরে চা এল, সঙ্গে নিমকি ও পাঁপরভাজা। স্টোভ ও নুন বিলিতী সে কথা বলি নি। বললে তাঁরা নিশ্চয় খেতেন না— তখন আবার তাঁকে কাঠকয়লার উনুন ধরাতে হতো! তবুও অনেকের মন ওঠে না!

চা পানের পরও কথা জমছিল না। অতিথিদের সঙ্গে কিছু জেলখানার কথা কওয়া যায় না। তাঁরা অনেকেই জেলখানার ফেরৎ, এবং জেলখানায় গিয়ে তাঁরা আমাদের ওপর টেক্কা মেরেছেন বলে তাঁদের বিশ্বাস। কী জানি কেন, আমার মনটাও যেন কেমন খচ্ খচ্ করে, দেশের জন্যে কিছুই করি নি ভেবে। গলায় মাছের কাঁটা ফুটলে মন যেমন সেখানেই পড়ে থাকে, আমাদের মনও তেমনি জেলখানায় পড়ে রয়েছে। অথচ জেলখানায় কষ্ট পাওয়ার বিপক্ষে আন্দোলন কিংবা ঘোঁট করাও নিতান্ত ছেলেমানুষী আবদার মনে হয়। কেন না অত্যাচার আমরা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছি। দেশের এই দুর্দিনে সঙ্গীতালোচনা কিংবা সাহিত্যচর্চা করতেও মন চায় না। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নেতাদের মতে যখন স্কুলকলেজের পড়াশুনা করেও

দেশের মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নয়, তখন খোশগল্প করলে আত্মা আমার জাহান্নমে যাবে। চিরকালটা মহাপাপই করে এসেছি। আত্মার সদ্‌গতি করতে বাসনা হয়েছে। আবার সংস্কার বলে একটা জিনিস তো আছে! হঠাৎ সাধু হই বা কি করে? মহাত্মাজীর শরণাপন্ন হলাম।

আমি : অবতারবাদে বিশ্বাস হচ্ছে।

তাঁহারা : ভারতবর্ষে জন্মেছেন, তাও আবার ব্রাহ্মণকুলে, সেই ঘুরে আসতেই হবে!

আমি : ধর্ম সম্বন্ধে বলছি না। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে রক্ত ঠাণ্ডা হলে অবতার মানতে হয়। আমি সমাজধর্মের, রাজনীতির কথা বলছি। আমি মহাত্মাজীকে যুগাবতার মনে করি, কারণ আমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। আগে তাঁকে শুধু একজন নেতাই ভাবতাম। আমার রক্ত বলক্ তোলে দেরিতে।

তাঁহারা : সভ্যতার, শিক্ষার শিখরে আছেন কিনা তাই!

আমি : ঠাট্টা করবেন না। যদি বা গম্ভীর হলাম···

তাঁহারা : দেশের সৌভাগ্য! একটু গম্ভীর হলেই দেখবেন যে, রক্ত ঠাণ্ডা রাখা কত শক্ত! আজ যদি মহাত্মাজী না থাকতেন তা হলে দেশের নদী সব লাল হতো! তিনিই ঐরাবতের মতন এই রক্ত-গঙ্গার স্রোত রোধ করেছেন।

আমি : তুলনাটি ঠিক হোল না। যে কাজ ঐরাবত পারে নি মহাত্মাজী তাই পেরেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি একাধারে সাফল্যমণ্ডিত ঐরাবত এবং ভগীরথ।

তাঁহারা : আপনার কথায় সর্বদাই একটু শ্লেষ থাকে। আজ ধরে নিলাম যে আপনি সোজা কথা বলছেন। আপনি যাই বলুন না কেন, তাঁর নেতৃত্ব বাদ দিয়ে গত দশ বৎসরের ভারতের ইতিহাস আমরা কল্পনাই করতে পারি না।

আমি : ও মন্তব্যে আমার আপত্তি আছে। তাঁকে বাদ দিয়ে আপনারা যেমন গত কয়েক বৎসরের ইতিহাস কল্পনা করতে পারেন না, তেমনি আমিও গত চল্লিশ বৎসরের ভারতের ইতিহাস, ইংরেজী-শিক্ষার ইতিহাস, আমাদের দারিদ্র্যের ইতিহাস, এমন কী ইংরেজ সাম্রাজ্যের ইতিহাস প্রভৃতি বাদ দিয়ে তাঁকেও বুঝতে পারি না। এ জগতে সবেরই প্রয়োজন আছে। আমরা মানুষ বলে মানবত্বের মূল্য বেশি দিয়ে থাকি। কিন্তু তার মানে কি এই যে, ব্যক্তিই ইতিহাসের একমাত্র শক্তি? বড়লোকে

অন্যান্য শক্তিকে ব্যবহার করেন, এবং সেই ব্যবহারের ফলে নতুন শক্তির সৃষ্টি হয়। এই নতুন শক্তি না মানুষের, না ঘটনার। তবে এ কথা ঠিক যে, এই দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের জন্যে তাঁর অবতারত্বে সাধারণের বিশ্বাস অনেকটা দায়ী। তাঁর প্রতি বিশ্বাসের জন্যে সরকারের প্রতি অবিশ্বাস জন্মেছে। আগে রানী ভিক্‌টোরিয়ার প্রতি আমাদের দেশের লোকের কী প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল মনে আছে? আজ নানা কারণে রাজভক্তি কমেছে, কিন্তু ভক্তির বহর কমে নি। তাই লোকে impersonal rule ছেড়ে personal rule-এর প্রতি ভক্তিমান হয়েছে। আমিও তাই অবতারবাদে বিশ্বাস করছি। এ যেন বেদান্ত ছেড়ে বৈষ্ণব গ্রন্থপাঠ! মধ্যাহ্নসূর্যের তীক্ষ্ণ আলো সহ্য করতে না পারলে গোধূলির ধূলামিশ্রিত আভাকেই ভালোবাসতে হয়। কেষ্টবিষ্টুকে না মানলে প্রাণটা খাঁ খাঁ করে যে!

তাঁহারা: আপনি মশাই কোন দলের?

আমি: নিজের দলের। আমি আমার, আপনারা যদি আমার দলের হন, আমি তখন হয়ত খানিকটা আপনাদের দলের হতে পারি। আমার মতামত ছেড়ে দিন। তার মূল্য আমারই কাছে, আপনাদের কাছে হয়তো কিছুই নেই, আর কিছু হওয়াও উচিত নয়। আমার মতামতের পেছনে যে fact-টি আছে, সেটিকেই নিন। দু'মত না থাকলেই যে কোন ভাব কী আদর্শ fact হয়ে যায় তা বলছি না। Fact-টি হচ্ছে— দেশব্যাপী চাঞ্চল্য।

তাঁহারা: দেশের আন্দোলনকে চাঞ্চল্য বলে দেশের পিঠ ঠুকবেন না, কিংবা দেশের গালে থাপ্পড় মারবেন না, মশাই। এ শুধু চাঞ্চল্য নয়, এ জাগরণ। চাঞ্চল্য একটা স্নায়বিক ব্যাপার, জাগরণ মনের। চাঞ্চল্য ক্ষণস্থায়ী, জাগরণ চিরদিনের। চাঞ্চল্য আসে উত্তেজনায়, জাগরণ সম্ভব হয় প্রেরণায়।

আমি: দেশের সুদিন এসেছে। আপনারা শুধু দেশভক্ত নন, আপনারা খাটি সাহিত্যিক। দোষ নেবেন না। প্রেমের কবিতা না পড়লে প্রেম যেমন শুধু অধিকারতত্ত্বই থেকে যায়, তেমনি সাহিত্য হিসাবে না ধরলে আন্দোলন শুধু দোলনই থেকে যায়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে যে গান, কবিতা, প্রবন্ধ, নবেল, নাটক, আজ পর্যন্ত লেখা হয়েছে তার একমাত্র সম্পদ হচ্ছে— ভাবালুতা, ভাবের মত্ততা, অর্থাৎ ছন্দের দোলা। সেই সব গান, কবিতা ও প্রবন্ধ আজ পর্যন্ত শুধু উত্তেজনারই সৃষ্টি করেছে, ভাবালুতারই প্রশ্রয় দিয়েছে। আজ যদি এই ১৯৩০ সালে, ঐ রকম

চমৎকার ভাষার সাহায্যে, আপনারা চাঞ্চল্যকে জাগরণ, এবং উত্তেজনাকে প্রেরণায় পরিণত করতে পারেন, তা হলে দেশের উন্নতিকামী হিসাবে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞই থাকব। একটু আলোচনা করলে আশা করি স্বাধীনতা পাবার তারিখটা পিছিয়ে যাবে না। কত বোটানিস্টও তো রয়েছেন, ফুলও যথাকালে ফুটছে।

তাঁহারা : আলোচনা করুন না, কিন্তু লোকের কাছে যেন…

আমি ' নিশ্চিত থাকুন সে বিষয়ে— আমি কাউকে বলব না। আজই তো জেলে যাচ্ছেন না! আমি মানছি যে এটা তর্কের সময় নয়, কেবলই কাজের সময়। সভ্যতার প্রথম যুগে হতো কাজ, মাঝে এল তর্ক, শেষে এল আবার সেই কাজ। চক্রবৎ সবই ঘুরে আসবে। গতকাল ছিলেন জেলে, আসছে কাল যাবেন জেলে। সভ্যতার নিয়মানুসারে আজ সন্ধ্যায় একটু কথাই কয়ে যান। তাতে যখন আপত্তি রয়েছে, তখন কথাই শুনে যান— মনের কাছে নিষ্পাপ থাকুন। আমাকে ধন্যবাদ দিন, পাপের গুরুভার লঘু করছি বলে।

তাঁহারা : বাজে কথা ছাড়ুন।

আমি : ছাড়লাম। আমি স্নায়বিক ও মানসিক ব্যাপারের মধ্যে কোন বৈরভাব দেখি না। মনের পিছনে ও মধ্যে স্নায়ুর কাজ চলছে, মনের প্রকাশও হচ্ছে স্নায়ু দিয়ে।

তাঁহার : সাধে কি আপনাদের মতামতকে জড়বাদ বলে লোকে ঘৃণা করে ?

আমি : একটু ভুল করেছেন। মন = স্নায়ু, যদি বলতাম তা হলেই জড়বাদ হতো। দেহকে স্বীকার করলেই জড়বাদী হয় না। দেখুন, আমি খাঁটি জড়বাদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। খাঁটি জড়বাদের মধ্যে বুদ্ধির এমন একটি সততা আছে, যেটি অন্য কোন বাদে লক্ষ করি নি। এর মধ্যে বুদ্ধির কোন জড়ত্ব নেই, বুদ্ধি এখানে উজ্জ্বল, শ্বেতশুভ্র, নিজের সীমা সম্বন্ধে অজ্ঞান হলেও মধ্যে কঠিন, দুর্নিবার। কিন্তু জড়বাদের বিপক্ষে আমার আপত্তি এই যে, তার সাহায্যে আমি যেভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে চাই, সেভাবে করতে পারছি না।

তাঁহারা : আপনি যে জড়বাদকে শ্রদ্ধা করেন সেটি বৈজ্ঞানিক জড়বাদ।

আমি : ঠিক ধরেছেন। স্নায়ুর সাহায্যে মনের কাজ বোঝা, কাজ ছাড়া মনের অন্য কোন একান্ত বিশিষ্ট অস্তিত্ব ও প্রকৃতি না মানা মনোবিজ্ঞানের কথা। এ ছাড়া অবশ্য অন্য ধরনের জড়বাদ আছে। যাদের

বুদ্ধি জড়ের সামিল, যেমন আদিম অসভ্য জাতির, তারা ভূত-প্রেত প্রভৃতি অশরীরী শক্তির দ্বারা সবই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিশ্বাস করলেও তাদেরকে জড়বাদী বলতে পারেন। তাদের ভিন্ন রকমের মানসিক ক্রিয়াকলাপ, রীতি, ন্যায়, আছে বলে অনেকেই স্বীকার করেন। সে ক্রিয়াকলাপ যে আমাদের ক্রিয়াকলাপেরই আদি হাওড়া স্টেশন বলা যায় না। বর্তমান জগতে, অর্থাৎ সভ্যযুগে কিন্তু অন্য এক শ্রেণীর জড়বাদী আছেন। তাঁদেরকে চেনা যায় না বলে তাঁদের ক্ষতি করবার ক্ষমতা বেশি।

তাঁহারা : কারা এই শত্রু ?

আমি : যাঁরা মেঘের আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করেন। ভাবপ্রবণ ও কর্মবীর দলই ইন্দ্রজিতের বংশধর। সভ্যযুগে ভাবপ্রবণতা ও কর্মপ্রাণতাই বুদ্ধির জড়কে উজাড় করতে পারে। ও দুটো জিনিস বস্তুত একেরই এ-পিঠ ও-পিঠ। কর্মবাদীরা স্বীকার করুন আর না করুন যুদ্ধের পূর্বে লেখা মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে কেতাবে দেখবেন যে, কর্মের পেছনে রয়েছে শুধু emction, ভাবের আবেগ। Syndicalist-রা Direct Action-এ বিশ্বাসী, তাদের দর্শন বের্গসঁর কাছ থেকে ধার নেওয়া— আর বের্গসঁ বুদ্ধিকে কোথায় নামিয়ে দিয়েছেন শুনেছেন তো ? উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে যাঁরা সমাজের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বড় কেতাব লিখেছেন তাঁরাও সামাজিক ব্যবহারের পেছনে ভাবশক্তিরই কাজ চলছে দেখিয়েছেন। অবশ্য আজকালকার অনেক বড় কর্মবাদী দার্শনিক বিপরীত কথা কইছেন, কিন্তু তাঁদের গুরু জেম্‌স্‌ ও লান্‌জ্‌ মনে রাখবেন। দেশের অনেক অতিসভ্য ব্যক্তি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতন বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইস্কুল-পাঠশালায় বৈশ্যবৃত্তি শেখাবার পক্ষপাতী হয়েছেন। আপনারাও ঐ দলের। নচেৎ চরকা ঘুরিয়ে, টাকলী চালিয়ে, কী তালগাছ কেটে দেশ স্বাধীন হবে বিশ্বাস করেন ? ভাবপ্রবণতা ও কর্মপ্রাণতাই সভ্য মানুষকে জড় ও নির্বোধ করতে পারে। আমরা বাঙালী, আমরা ভাবপ্রবণ জাতি, এই কথাই শুনে এসেছি, বিশেষ করে গান্ধীযুগের পর থেকে আমরা আবার কর্মগতপ্রাণ হয়েছি। সোনায় সোহাগা হয়েছে! ফলে, আমরা না হতে পারছি আদিম অসভ্য জাতির মতন, না হতে পারছি য়ুরোপীয়ানদের মতন। আমাদের জড়বাদ না অসভ্য, না বৈজ্ঞানিক। এ শুধু ধোঁয়া, ভাবের ও দুরাশার। এ শুধু কুয়াশা, দুর্ভেদ্য কুয়াশা। নভেম্বর মাসে লণ্ডনে যে কয়লার কুয়াশা নামে, তার ভেতরে মানুষ, গাড়ি, ঘোড়া, মুটেমজুর যেমন Dantesque hell-এর অভিশপ্ত জীবনের মতন কিলবিল করে, এ যেন তাই।

এ অবস্থা অতি ভীষণ, এ অবস্থা কল্পনা করতে পারতেন এক ব্লেক, নয় ভোর। আমি পারি না। শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার, সব কৃমির মতন আমরা নড়ছি!

তাঁহারা: আপনি নিতান্তই **morbid**!

আমি: **Morbid** আমি, না আপনারা? ঐ রকম অন্ধকার ছেড়ে পালিয়ে আসতে না চাওয়া কি সুস্থ মনের লক্ষণ? আপনাদের মস্তিষ্কের স্নায়ু সব অসুস্থ, নচেৎ সেখানে স্নায়ু আছে স্বীকার করতে ভয় পান!

তাঁহারা: বেশ, না হয় স্বীকার করলাম। তারপর?

আমি: তারপর নয়, তা হলে, এই আন্দোলনটাকে স্নায়বিক চাঞ্চল্য বললে কোন দোষ হয় না। চঞ্চলতা একটা পাপ নয়, ওটা বুদ্ধির গোড়ার কথা। চঞ্চলতা ক্ষণস্থায়ী বলেই তাকে অশ্রদ্ধা করা যায় না, যেমন অচঞ্চলকে সনাতন ও চিরস্থায়ী বলেই তাকে কিছু শ্রদ্ধা করা হয় না।

তাঁহারা: যেটা চলে আসছে তার এতদিন ধরে চলে আসবার শক্তিই কি তার সত্যের একটা অঙ্গ নয়?

আমি: আপনাদের আন্দোলন কি চিরকালই চলেছে? তা হলে এতদিনে খুব কাজ করেছেন তো! আমাদের তর্কটা ঠিক ঘরোয়া নয়, তাই একটি নতুন প্রশ্ন করছি। চলবার শক্তি বলতে কি বোঝেন? এক, চলবার পেছনে এই শক্তি থাকতে পারে, আর এক চলতে চলতে এই শক্তি তৈরি হচ্ছে, হতে পারে। এ দুটি ব্যাখ্যা ছাড়া আর এক ব্যাখ্যা এই হয় যে, দূরদেশী বাইরের এক শক্তিকেন্দ্র চলার সমগ্র ব্যবহারকে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে। তৃতীয় ব্যাখ্যাটি মোটেই অসঙ্গত নয়, তবে কী জানেন, **explanation of a thing always lies outside the thing** মানতে হলে ন্যায়ের ধারাবাহিকতা ভেঙে যায়। সাহিত্যে আজকাল **discontinuit**y-র ছড়াছড়ি, পদার্থবিজ্ঞানেও তাই বলছে শুনছি, সমাজ ও রাজ্য আজকাল ছোট ছোট গণ্ডিতে ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু ন্যায়ের লাইন এখনও ভাঙেনি— তার পারম্পর্য এখনও নিরবচ্ছিন্ন রয়েছে। সাধারণত তাই থাকতে বাধ্য— যতদিন বাক্য সাধারণের জন্যে স্থূল অর্থ বহন করতে পারবে। **Symbol st** কবিতায় বাক্য অন্য একটি সুরগত অর্থের ইঙ্গিত করে বটে, কিন্তু সাধারণ কথাবার্তায় ও ব্যবহারে **symbolism** অর্থাৎ **musical value**-র দাম কম। **Symbolic logic** আমার মাথায় প্রবেশ করে না— সাধারণের মাথাতেও যে প্রবেশ করে বলতে পারি না। যদিও ধরা যায় যে **explanation is outside the**

thing, তা হলেও বলতে পারি যে, ভেতরের ও বাইরের কারণের মধ্যে তফাৎ রয়েছে আমাদেরই অজ্ঞানতার জন্যে। দু'দিন পরে হয়তো link-টি আর missing থাকবে না। বাইরের কারণ হয়তো জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের কারণ কিংবা কার্য বলেই গণ্য হবে; যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমান থাকলে আজকের acquired trait দু'-দশ লাখ বৎসর পরে heriditary trait-এর সামিল বলে গণ্য হতে পারে। অতএব চলবার শক্তি বাইরের কী ভবিষ্যতের আকর্ষণ নয় বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, চলতে চলতেই চলার শক্তি অর্জিত হয়। ভেবে দেখলে বুঝবেন যে এটি শুধু বাক্য মাত্র। 'এ জগতে সবই চলছে'— এটি একটি statement, তার ব্যাখ্যা, অর্থাৎ বিশ্লেষণ করে কারণ বার করতে গিয়ে শুধু যদি আর একটি statement করি, তা হলে কোন লাভ হলো না। হলো পুনরুক্তি মাত্র। একটি বাক্যনিহিত সম্বন্ধ আর তার ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পর্কটা কী ধরনের? ব্যাখ্যা হবে সম্বন্ধটির পূর্ববর্তী বিষয় বা পদের প্রকৃত বিবরণ নিয়ে (including conditioning relations), যার জন্যে সম্বন্ধটি ঘটছে। শুধু তাই নয়, ব্যাখ্যার মধ্যে যে subject ও predicate থাকবে তারা প্রত্যেকটি স্বাধীন, একটি অন্যটির ওপর নির্ভর করবে না, কিংবা অন্যের দ্বারা সূচিত হবে না। ব্যাখ্যাটি নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ হওয়া চাই। এই ব্যাখ্যার সাহায্যে আবার নতুন তথ্য, নতুন অর্থ পাওয়া চাই। প্রকৃত ব্যাখ্যার এই কয়টি চিহ্ন। আপনার 'চলবার পথেই চলার শক্তি অর্জিত হয়,' ব্যাখ্যার মধ্যে এই কয়টি লক্ষণ পেয়েছেন? আমি পাই নি। সেইজন্যে একে ব্যাখ্যাই বলি না। এটি বলবার চমৎকার ভঙ্গি— বের্গসঁর ভাষায় ও কবিতায় শোভা পায়। কিন্তু তর্কবুদ্ধিতে এ ব্যাখ্যা টেঁকে না। বের্গসঁ যত বড় লেখক তত বড় দার্শনিক নন। বের্গসঁর উত্তর বহুপূর্বেই ম'লেয়ার দিয়েছেন— 'আফিমে ঘুম আসে কেন? আফিমের মধ্যেই ঘুম আনবার শক্তি রয়েছে বলে।' সে যাক, তৃতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে— চলবার পেছনে এই শক্তি থাকতে পারে। Elan vital-এর কথা ছেড়ে দিচ্ছি। এই তৃতীয় ব্যাখ্যার পেছনে কি presupposition রয়েছে বুঝেছেন? একটা জার্মান ভূত, a Frankenstein monster of Time-God। এই ভূত মহাকালের অনুচর নয়, স্বয়ং মহাকাল— নিজে। জনকয়েক জার্মান দার্শনিকদের মতে 'কাল' একটি অখণ্ড, স্বাধীন দিব্যবস্তু কিংবা শক্তি যার তাড়নায় আমরা সবাই এক কদমে চলেছি। কালের বিশ্লেষণে কিন্তু বের্গসঁ খুব বাহাদুরি দেখিয়েছেন। আজকাল সময় নিয়ে অনেক পরীক্ষা চলছে। সে পরীক্ষার

ফল গ্রহণ করলে কাল বলে স্বতন্ত্র একটা কিছুর ওপর বিশ্বাস রাখা যায় না। মনের দিক থেকে সময়বোধ নিতান্ত আপনার, আমার। আমাদের সমবেত চেষ্টায় সমাজ গড়ে উঠেছে, আমরা সেই সমাজের মধ্যে বাস করি, অতএব সামাজিক সুবিধার জন্যে, আমরা নিজেদের স্বার্থের দ্বারা গঠিত সময়কে স্থগিত রেখে একটা গড়পড়তা সাধারণ সময় ঠিক করে নিয়েছি। এ যেন শ্রুতি-scale-এর বদলে হারমনিয়মের **tempered scale**-এ গলা সাধার মতন। যখন নেহাৎ নিজের স্বার্থ জোর দেয়, তখন অবশ্য সামাজিক গড়পড়তা সময়কে বর্জন করি। এই দেখুন, আমার দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে আপনারা ব্যস্ত হয়েছেন— আমার কিন্তু নিজের কথা নিজের শুনতে ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে এইমাত্র আরম্ভ করেছি। আপনাদের গৃহিণীরা বাপের বাড়ি গেলে মনে হয় যেন যুগযুগান্তর অতীত হয়েছে, তাঁদের চলে আসবার জন্যে চিঠি দিলে তাঁরা লেখেন— 'এই তো মোটে একমাস মা-বাপের কাছে আছি, আসছে মাস পড়লেই যাব ; লক্ষ্মীটি, রাগ করো না।' আবার ভিন্ন সমাজে স্বার্থের জন্যে সময় সম্বন্ধে ভিন্ন রকমের ধারণা। ইংরেজরা বলছেন, 'হে ভারতবাসী, তোমরা বড় তাড়াতাড়ি **Dominion Status** চাইছ, সব জিনিসেরই অভিব্যক্তি আছে, এবং অভিব্যক্তি চলে কচ্ছপের চালে।' আমরা উত্তর দিচ্ছি, 'কিছুই তাড়াতাড়ি নয়, সময় এসেছে— সময় এসেছে কেন, সময় গিয়েছে, আর এ অবস্থা সহ্য করতে পারছি না। বার্কের সেই **broad slow march from precedent to precedent** আজকাল খাটে না। জীব-বিজ্ঞানেও বলছে যে **mutation** হয়, ব্যাঙের মতন অনেক সময় জীব লাফিয়ে চলে। অতএব দেখছেন যে একই বিষয়, অর্থাৎ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মত ভিন্ন। সাইমন সাহেবের এক ঘড়ি, আমাদের ঘড়ি অন্য। তার ওপর **Greenwich time** রয়েছে, তারও বাইরে রয়েছে **Geological time**। আরও বাইরে যেতে চান তো ব্রহ্মার মুহূর্ত রয়েছে, মহাদেবের 'তপোভঙ্গ' রয়েছে। আমি চাই না অতদূর যেতে— আপনারা যেতে চান নাকি? আপনার-আমার ঘড়িই বলুন, স্বদেশী-বিদেশী ঘড়ির ঘড়িই বলুন, আর বিশ্ব-ঘড়িই কল্পনা করুন, দরকারের সময় কি সংকটকালে কোনো ঘড়িই অন্যের ঘড়ির সঙ্গে এক লয়ে চলে না— সব চাল বিগড়ে যায়। **League of Nations**-কে কেউ মনে করেন **fact achieved**, কেউ মনে করেন **idea yet to be realized**— তফাৎ কোথায়? তফাৎ এই কাল সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে, কালের গতির হার নিয়ে, উদ্দেশ্য নিয়ে, যে ধারণা, যে হার, যে উদ্দেশ্য

মূলত নির্ভর করছে আপনাদের, আমাদের স্বার্থের দ্বারা গঠিত একটি বিশেষ সমাজের ভয়, ভাবনা, রুচি, শিক্ষা, দীক্ষা, সুবিধার ওপর। আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা যখন বলেন, 'যেটা এতদিন ধরে চলে আসছে, তার এতদিন ধরে চলে আসবার শক্তিই তার সত্যের একটি অঙ্গ', তখন আপনারা কাল-বস্তুকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বনিয়ন্ত্রিত শক্তি ভাবছেন, জার্মান পণ্ডিতদেরই মতন। তাই যদি হয়, তা হলে দেশ আজ স্বাধীন হলেও যা, না হলেও তা, আবার দশ লাখ বছর পরে স্বাধীন হলেও তাই— কেন না ব্রহ্মা কিংবা মহাকালের কাছে দু'-দশ লাখ বছর সার্থকতাশূন্য একটি নিমেষ মাত্র। এই দেখুন না, বড় বড় জাঁদরেল সভ্যতা লোপ পেয়েছে; তার ফলে মহাকালের মুখে স্মিতহাস্যই ফুটে উঠেছে। কালকে যদি চক্রও ভাবেন, তা হলেও অধীর হলে চলবে না— শুধু ধীর হয়ে Sp.ngler, Petrie ও পুরাণ পড়লেই চলবে। 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে' মন্ত্র জপ করলেই ব্যস, সব হয়ে গেল— !

তাঁহারা: দাঁড়ান, মশাই, একটু থিতিয়ে নিই। স্নায়বিক চাঞ্চল্য দোষের নয়, এবং ক্ষণস্থায়ী চাঞ্চল্যও পাপ নয়, বুঝলাম। অর্থাৎ…

আমি: অর্থাৎ যে কাজ দেশে হচ্ছে তা নিয়ে খুশী, কিংবা তার সম্বন্ধে অত কুণ্ঠিত হবার প্রয়োজন নেই। আপনাদের এই সলজ্জভাব কেন জানেন? একটা মাত্র কারণ বলি, বিচারবুদ্ধির ওপর, বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতির ওপর স্থির বিশ্বাসের অভাব। আপনাদের মনে গোটাকয়েক ধর্মের গাঁট আছে, সেগুলো ছাড়াতে পারছেন না, সেই জন্যে। আপনারা নিতান্তই ধর্মপ্রাণ!

তাঁহারা: ঠিক জানি না, মশাই। আচ্ছা, নয় তাই হলো। এখন দেশ স্বাধীন হয় কি করে?

আমি: সে আমি কী জানি? আমি ও-সব নিয়ে গা ও মাথা ঘামাই না।

তাঁহারা: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে যখন চাঞ্চল্য ও ক্ষণস্থায়িত্বকে দোষের কিছু নয় প্রমাণ করলেন, তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে, আপনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে চিন্তা করার একান্ত পক্ষপাতী।

আমি: আমি যখন চিন্তাশীলতারই পক্ষপাতী, তখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়া আর কোন পদ্ধতিতে আস্থাবান হতেই পারি না। দেশের স্বাধীনতা বলতে মনের স্বাধীনতা বোঝাই আমাদের মতো বুদ্ধিজীবীর পক্ষে স্বাভাবিক। আর যখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অন্য যে কোনো পদ্ধতি অপেক্ষা

ন্যায়সঙ্গত, তখন দেশ স্বাধীন হবার জন্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে বিচার-বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করা, এই একমাত্র দাওয়াই বাৎলাতে পারি— যদি অবশ্য শিক্ষিত ব্যক্তিকে এই আন্দোলন থেকে বহিষ্কৃত না করেন।

তাঁহারা: আমরা আপনাদের চাই, মানুষ হিসাবে, শিক্ষিত ব্যক্তি কিংবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী জীব হিসাবে নয়। আপনাদের শিক্ষা, বিশ্বাস ও বিচার-পদ্ধতি আমাদের ভালো লাগে না। খোশামোদ করছি না— আপনাদের মধ্যে অনেকেই অ-শিক্ষিত, কু-শিক্ষিত, আত্মাভিমানী; আপনাদের বিশ্বাস, intellectual conviction-গুলো স্বার্থেরই ভিন্নরূপ, আপনাদের পদ্ধতি নিতান্তই নৈর্ব্যক্তিক, অতএব নিষ্ঠুর। হবে না কেন? আপনাদের একটা Trade Union আছে, সেই দলকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে! আপনাদের দোষেই তো সব আন্দোলন anti-intellectual হতে বাধ্য! আপনাদের জন্যেই তো প্রেরণার উৎস শুকিয়ে যায়। বুদ্ধির তাপে হৃদয় আপনাদের মরুভূমি হয়েছে, আর তারই পাশে আপনারা আমাদের সব প্রেরণাকে, সব হৃদয়াবেগকে শুকিয়ে দেন, কিংবা সেগুলো শুকিয়ে যাক বাঞ্ছা করেন। নিজেদের সম্পত্তি নেই বলে আর কারুর সম্পত্তি পর্যন্ত থাকবে না! আপনারা কী ভীষণ হিংসুক!

আমি: আপনাদের মধ্যে যাঁরা সোশ্যালিস্ট তাঁদের মনোভাব খানিকটা আমাদের মতন নয় কি? সে কথা যাক— থান ইঁট ছুঁড়ে মারতে একটু মায়া হয় না আপনাদের? তবুও আপনারা জেলে গিয়েছেন, আমি যখন যাই নি, তখন আপনাদের ওপর অভিমান পর্যন্ত করব না। আমি আপনাদের চেয়ে আরও বেশিদূর পর্যন্ত যেতে চাই। আপনাদের সব কথাই মানি। কী জানেন, আমরা ভারী সাবধানী লোক, আমরা স্থিতির পক্ষপাতী, আমরা রক্ষণশীল, সেই জন্যেই তো প্রেরণা, হৃদয়াবেগকে অত সন্দেহের চক্ষে দেখি। বন্যার মতন কোন প্রেরণা এসে আমাদেরকে কখনও স্থানচ্যুত করতে পারে না। আমরা প্রেমে পর্যন্ত কখনও পড়ি না। কোনো বুদ্ধিমান, থুড়ি বুদ্ধিজীবীকে প্রেমে পড়তে দেখি নি। হয়তো ভুল বলছি। বুদ্ধিজীবীরা যে ধরনের প্রেমে পড়েন, তাকে আপনারা প্রেমই বলবেন না। আমরা কেতাব লিখি— সব 'স্কলার' হবার জন্যে। তাও বোধ হয় নয়— নিজেদের চাকরি বজায় রাখা, না হয় পদোন্নতির জন্যে, এই হলো সত্য কথা। এই তো হাজার হাজার পণ্ডিত রয়েছেন, হাজার হাজার কেতাবও তাঁরা লিখছেন, অনেক কেতাবও পড়তে বাধ্য হয়েছি— আপনারা যাকে প্রেরণা বলেন, সে প্রেরণা কোন কেতাবে লক্ষ করি নি। বিদেশী বুলির

সংক্ষিপ্তসারের মধ্যে, কিংবা পাদটীকার মধ্যে যে সত্যিকারের প্রেরণা আত্মগোপন করে থাকতে পারে বিশ্বাস করি না। প্রেরণা কী আবেগ আমাদের ধাতে নেই। অবশ্য না থাকলেই আমরা যে অপদার্থ তাও মনে করতে পারি না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে…

তাঁহারা : ঐ দেখলেন তো! নিজেদের দোষকে গুণে পরিণত করবার ক্ষমতা আপনাদের আছে— আপনিই তো এই অভ্যাসকে rationalize করা বলেন। আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা তুলবেন না। আপনাকে কতবার বলেছি যে ও পদ্ধতি আমাদের ভালো লাগে না।

আমি : কারণ কি?

তাঁহারা : কারণ এই, পদ্ধতিও একটি মানুষের— বৈজ্ঞানিকের। এইটাই বড় কথা। আর আপনারা সেই মানুষকে বাদ দিয়ে তারই অবলম্বিত পদ্ধতিকে বড় করে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, সেই method-কে আবার মানুষেরই বেলা খাটাচ্ছেন। দেশ স্বাধীন হবার জন্যে লোকের মস্তিষ্ক পরিষ্কৃত হোক, বুদ্ধি খাটিয়ে সকলে কাজ করুক, হাজার বার এ কামনা করি। কিন্তু মাথাটি যখন মানুষের, তখন সেই গোটা বুদ্ধিমান মানুষই, সেই গোটা বৈজ্ঞানিকই আমাদের দেশের লোকের আদর্শ হোক না কেন? আমাদের মনে হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বদলে বৈজ্ঞানিকের সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বই আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহায়ক হবে। তার আদর্শবাদ, তার ত্যাগ, তার শ্রমশীলতা, তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, তার প্রেরণা আমাদের দেশের লোকের ওপর ভর করুক! এমন কী তার দোষ পর্যন্ত এলেও ক্ষতি নেই— কেন না আমাদের জাতিগত অন্যান্য বিপরীত গুণ সে ক্ষতির পূরণ করবে শপথ করে বলতে পারি। পদ্ধতির বদলে মনুষ্যত্বকে গ্রহণ করলে জাতীয়তার পক্ষেও সুবিধা, কেননা পদ্ধতি হচ্ছে বিশ্বজনীন। জার্মান বিজ্ঞান কী ফরাসী বিজ্ঞান বলে দুটো আলাদা বিজ্ঞান নেই। ব্যবসা, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার-বার্তা প্রভৃতির মতনই বিজ্ঞান একটি বিশ্বের বন্ধন, এই শুনেছি।

আমি : রবিবাবুর ওপর আপনাদের অত কৃপা দেখে আমি মুহ্যমান হয়েছি— তাঁকে আজই তার করে রাশিয়া থেকে ডেকে পাঠাচ্ছি। গম্ভীর হচ্ছি, আপনারা দেখি বিশ্বজনীনতাকে দেশাত্মবোধের অন্তরায় ভাবেন। আমার কিন্তু অন্য মত। প্রকৃত দেশাত্মবোধ কখনও বিশ্বজনীনতার বিরোধী হতে পারে না। আজ এ আলোচনা থাক। আপনারা অনেক দামি কথা বলেছেন—তার একটা নিয়ে আলোচনা করলেই রাত কাটানো যায়। আপনারা গোটা মানুষকে গ্রহণ করতে উপদেশ দিচ্ছেন। ভালো

কথা, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের পূর্ণতা তার পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে সম্ভব হয় কি? এখানে আমার একটু সন্দেহ উঠেছে। আগে ভাবতাম যে ব্যক্তিত্ব একটা সত্তা, এখন ভাবছি রূপ ভিন্ন সত্তার কোনো অস্তিত্ব নেই। সত্তা বলতে তার বিকাশ ছাড়া অন্য কিছু আমরা অর্থাৎ ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিরা—ভাবতেই পারি না। বেদান্তের নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মবস্তু আমরা উপলব্ধি করতে পারি না—এই হল মোদ্দা কথা। হয়তো এই অনুপলব্ধি বিদেশী শিক্ষার দ্বারা দুষ্টবুদ্ধির অক্ষমতা মাত্র। কারণ যাই হোক না কেন ব্যক্তিত্ব যখন একটা concrete বস্তু, তখন তার রূপ ও গঠন থাকতে বাধ্য। যখন রূপ ও গঠন থাকবে, তখন তার গঠননীতি ও রূপধর্ম থাকবেই থাকবে। নতুবা আর্টিস্টের ব্যক্তিত্ব বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিত্ব থেকে খানিকটা পৃথক্ হয় কেন? এই হিসেবেই প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের value unique, নচেৎ personality-র কোনো মানে নেই।

তাঁহারা: তা হলেও ও পদ্ধতিকে প্রধান করতে পারছি না। যদি একটি পদ্ধতি থাকত, তা হলেও না হয় পারতাম। কিন্তু আপনারই কথা অনুসারে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকের পদ্ধতি unique হবে তার নিজত্বের রঙ লাগিয়ে। আমরা অতশত জানি না, তবে মনে হয় যে personality is not the same thing as individuality।

আমি: আপনাদের ঠিকই মনে হয়। তবে personality is based on individuality যদি মানেন তা হলেও যথেষ্ট হবে। কেন না আপনাদের এই মানার ওপর আপনাদের ও আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। যদি ব্যক্তিত্বের ওপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে সেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনাই সমাজের একটি প্রধান কাজ হয়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও দেশাত্মবোধ দুটিই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের যন্ত্র, উপায়। উপায় হিসাবেই তাদেরকে গ্রহণ করুণ না!

তাঁহারা: কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ?

আমি: সেটি তাদের কাজ দেখেই বোঝা যাবে। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে দুটি উপায়ের মধ্যে জন্মগত কোন ভীষণ শত্রুতা নেই। সাধারণের সুবিধা, উপকার, সাধারণত্বই দুটি উপায়েরই আদি, মধ্য ও অন্তলীলা। দুটিই আমাদের 'ছোট আমি'কে ডুবিয়ে দিতে শেখায়। বিজ্ঞান-সাধনাতে যেমন নিজের ওপর নজর রাখতে হয়, স্বদেশ-সাধনাতেও তেমনি নিজের স্বার্থ ভুলতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা এই যে কোনটাতেই 'বড় আমি'কে ছাড়তে হয় না— সত্যকারের নিজত্বটুকু বলি দিতে হয় না।

দেশের এমন দুরবস্থা যে 'ছোট আমি'কে ত্যাগ করা শক্ত হয়ে উঠেছে। আপনারা এত বড় আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন— ঝড় তুলেছেন, ঝড়ের মধ্যে শান্তিময় কেন্দ্রটিকে আলাদা না রেখে ধুলোয় ঢেকে রেখেছেন কেন ? সেখানে কাউকে বসতে দেন না কেন, কেউ বসতে গেলে আপত্তি করেন কেন, ধুলো ছুঁড়ে তার চোখে মারেন কেন ? আজ যদি কেউ এই আন্দোলনের দোষগুণ বিচার করেন, কাল কি তাঁকে 'টোডিকা বাচ্চা' বলে গাল দেবেন না ? শুধু তাই নয়, এতদিন কংগ্রেস কাজ করছে তো— কৈ কত statistics যোগাড় হয়েছে যার সাহায্যে আমরা দেশ সম্বন্ধে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে আসতে পারি ? গবর্নমেণ্টের বিপক্ষে আমার এই আপত্তি যে সে কেবলই আমার 'ছোট আমি'কে pander করেছে, আমার personality-র পথে অন্তরায় হয়েছে, কিংবা বাধাসৃষ্টি করছে। সর্বপ্রধান অন্তরায় লোভ অর্থাৎ ভয়। সব ধারেই কেবল জুজুর ভয় দেখাচ্ছে, মশাই, কেবল জুজুর ভয়। আমি অন্য সম্প্রদায়ের কথা জানি না, তবে আমি জোর করে বলতে পারি যে শিক্ষিত অধ্যাপক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইদানীং এমন একটি মানুষ দেখি নি যিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যে সাহস করে সত্যপথ অবলম্বন করেছেন। চাকরি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেবার কথা বলছি না। আমরা প্রত্যেকেই, একজনকেও বাদ দিয়ে বলছি না, অত্যন্ত সাবধান, ভীরু ও অপদার্থ। বই পড়ার ও লেখার মুখে আগুন ! বিদ্যার দোহাই দিয়ে নিজের কাছে অনেক জোচ্চুরি করেছি আমরা। আপনারা যদি ধরতে পেরে থাকেন তবেই দেশের মঙ্গল। নচেৎ দেশ জাহান্নমে যাক ! দেশের যাঁরা ব্রাহ্মণ হবেন, তাঁরা যদি এই হন তা' হলে···

তাঁহারা : যাক, মাথা খারাপ করবেন না, আবার ঘুম আসবে না। আজ যাই আমরা।

আমি : নিতান্তই যাবেন ? আমাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে সরে পড়বেন ? আপনারাই সত্যকারের নেতা হবার যোগ্য ! জেলে গিয়ে আমার আত্মার জন্যে প্রার্থনা করবেন, আমার হাতে একটুও সময় নেই। আপনাদের কাছে যা' শিখলাম, নোটবুকে লিখে রাখতে হবে। পরিহাস করছি না।

তাঁহারা : আপনাকে ও আপনার গুরুকে আমরা চিনি।

আমি : যদি আমার গুরুদেবকে চিনতেন তা' হলেও কিছু কাজ হতো ! আচ্ছা, আজ তা' হলে···

তাঁহারা : যদি জেলে না যাই, তা হলে সময় পেলেই আসব।

আমি : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—

পঞ্চম স্তবক : দেশের কথা

তাঁহারা : আজও রাজার নিমন্ত্রণ-পত্র পাইনি। তাই বিরক্ত হতে এসেছি। সেদিন 'ছোট আমি'-কে তাড়াতে বললেন, তাড়াই কী করে?

আমি : কবে আমি 'ছোট আমি'-কে দূর করতে বললাম? আমি শুধু বলেছি যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে চিন্তা করলে, এবং সেই চিন্তার ফলে প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগ্রত হলে, 'ছোট আমি' অবান্তরিত হবে। পরে যেটি ফুটে উঠবে, তার রূপ অতি মনোহর, তার প্রকৃতি শান্ত, তার আলো উজ্জ্বল, স্থির—নিবাত প্রদীপবৎ। তাতে রেড়ির তেলের গন্ধ, কেরোসিন তেলের ধোঁয়া পর্যন্ত থাকে না। শ্রীঅরবিন্দের কথা স্মরণ করুন, তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পর কবি কী লিখেছিলেন মনে আছে তো? তাঁর 'দেশাত্মবোধ' পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। সেই জন্যেই তো বলি, দেশের স্বাধীনতা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু হলেও স্বাধীনতার প্রেরণা, প্রকাশ ও পরিণতি প্রত্যেক ব্যক্তির personality-তে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বাইরের ঘটনা ও অবস্থা আমাদের মুক্তির সব উপায়কেই, পরিণতির সব পন্থাকেই বেঁধে দিয়েছে। আমার অনুরোধ, খদ্দর ছেড়ে, প্রত্যেকে নিজের উপায় সৃষ্টি করুন, নিজের রাস্তা কেটে নিন, স্বধর্ম তৈরি করুন। তবেই 'ছোট আমি' কর্পূরের মতো উবে যাবে। এই প্রত্যেকের নিজত্বের মধ্যেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রয়েছে, এখন জমি চাষ করে আয় বাড়ান। এইখানকার তাড়নার নাম প্রেরণা, এরই তাগিদের নাম জাগরণ। খদ্দরের দৃষ্টান্ত দিলাম বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সুপরিচিত প্রতীক হিসেবে।

তাঁহারা : আমাদের গোটাকয়েক প্রশ্ন আছে। বিদেশী রাজার বিপক্ষে আপনার আপত্তি কি? ইংরেজরাজের অধীনে ব্যক্তিত্বের কতটুকু বিকাশ সম্ভব হয়েছে বিবেচনা করেন? স্বাধীন ভারতে সে বিকাশ আরও সহজ ও সুন্দর হবে কী মনে করেন?

আমি : এ সব সাংঘাতিক প্রশ্নের জবাব দিতে হলে সিগারেট চাই, খাচ্ছি আমরা বিড়ি। আচ্ছা, বিড়ির পাতায় ভিটামিন পাওয়া গেছে না কি? যদি তাই হয়, তা হলে বিড়ির দৌলতে হিন্দু-মুসলমানের একমাত্র

সমস্যার, অর্থাৎ অন্ন-সমস্যার এবং স্বাস্থ্য-সমস্যার একত্র সমাধান হয়। দেখুন, একত্র সব সমস্যার সমাধান না হলে তাকে ভারতবর্ষীয় সমাধানই বলা যায় না— মানেন তো? এই যেমন চরখা?

তাঁহারা: যথা, আপনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। প্রশ্নের উত্তর দিন, অল্প কথায়।

আমি: আপত্তি কী, এক কথায় বলা যায় না। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, খানিকটা, এবং কয়েক জনের। এটি পার্লামেণ্টারি জবাব। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর, হতে পারে, না হতে পারে, আবার 'হতে পারে না হতে পারে' তাও হতে পারে, তাও নাও হতে পারে। এটি নবদ্বীপের উত্তর। আমার ভেতর এই পূর্ব-পশ্চিমের ইড়া-পিঙ্গলা বইছে।

তাঁহারা: আজ হল কী আপনার?

আমি: রোজই যা হয়। আজ একটু বেশি ভয় হচ্ছে, এই মাত্র। আচ্ছা, বিদেশী কথাটির অর্থ কি? অর্থ হচ্ছে, যা স্বদেশজাত নয়। আর স্বদেশজাত কি? অর্থাৎ যা ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, আমেরিকান, আফ্রিকান নয়, আবার চীনে, জাপানী, আরবী, তুর্কীও নয়। যে সমাজ বা জাতি কিছুকাল ধরে ভারতবর্ষে বসবাস করছেন তাঁদেরকে কী বলবেন? আমাদেরই পূর্বপুরুষেরা বাইরে থেকে এসেছিলেন, ভারতবর্ষকেই তাঁদের জন্মস্থান বলা যায় না, বৈজ্ঞানিক-হিসাবে। তারও পূর্বে কোল, ভীল, ব্রাহুই জাতির আদিপুরুষ শুনছি সুমের-আক্কাড দেশ থেকে এসেছিল। আমি আবার বাঙালী ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বোচ্চ-শ্রেণীর, কুলীন, আমরাও কনৌজ থেকে বাঙলা দেশে যাই বলে প্রবাদ আছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে আর্যভূমি বলা হয়; নিজেকে কনৌজিয়া বলেও পরিচয় দিই না। অতএব কে কোথা থেকে আসছে, কে কোন্ জাতি তার ওপর বিদেশী কথার অর্থ নির্ভর করছে না। জাতিতত্ত্বে জাতের গোঁড়ামি আর নেই। বাঙলা দেশের নিম্নশ্রেণীর জাতিরাই বাঙলার খাঁটি স্বদেশী।

তাঁহারা: কে কবে এসেছে তার ওপরও নয়?

আমি: না। যদি তাই হতো, তা হলে বিহারে বাঙালীর অত অপমান কেন? তা হলে ভারতবর্ষকে কোলভীলস্থান না বলে, হিন্দুস্থান বলা হয় কেন? আদৎ কথা এই যে, স্বদেশিকতার অধিকার অর্জন করতে হয়। যে ব্যক্তি বর্তমান যুগে জন্মগ্রহণ করেও মনে মনে এক অতীত সুবর্ণযুগের কল্পবাসী, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হলেও আপনার আমার স্বদেশবাসী নন। সেই জন্যে যারা বৈদিকযুগে প্রত্যাবর্তন করতে উপদেশ দেন তাঁদের

আমি বিদেশী ভাবি।

তাঁহারা : এক কথায় আপনি দেশের ঋণকে মাথা পেতে নিতে রাজি—এই নয় কি?

আমি : খানিকটা, যখন সে ঋণ কোনো productive purpose-এ ব্যবহৃত হচ্ছে দেখি তখনই আমি কৃতজ্ঞ। মোগল-পাঠান প্রভৃতি মুসলমান বিজেতার ঋণকে আমি বিজেতার জরিমানা হিসাবে দেখতে পারি না। সে ঋণকে আমি তাজমহল, ফতেপুর-সিক্রী, মিঞাকি মল্লারের দিক্ থেকেই দেখি। শুধু তাই নয়, একত্র বসবাস করার ফলে হিন্দু-মুসলমান একটি নিখিল ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। গ্রাম্য ও গোষ্ঠীজীবনের দায়িত্ব, জাতি ও শ্রেণীবিচার, বিধবা-বিবাহ বর্জনের দোষগুণ, এবং অপার্থিব শক্তির প্রতি আস্থা দুটি ভিন্ন সমাজ-ধর্মকে অনেকটা একত্রিত করেছে। এই ভারতবর্ষেরই জমি চাষ করে, হিন্দুস্থানের ভাষাকে অদল-বদল করে, পোশাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা, রান্নাবান্না ও অন্যান্য নানা-রকমের মানসিক ও ধর্ম-সংক্রান্ত সংস্কারকে উল্‌টেপাল্‌টে, অন্য সমাজের প্রপীড়িত মানুষদের বুকে টেনে নিয়ে পাঁচসাত-শ' বছরকার পূর্বের বিজেতার দল ভারতবর্ষের অন্যান্য অধিবাসীদেরই মতন ভারতবাসী বলে গণ্য হবার অধিকার অর্জন করেছেন। মুসলমান-রাজের সঙ্গে ইংরেজ-রাজের অনেক তফাৎ আছে। তা থাকলেও আমি ইংরেজের ঋণ নাকচ করতে পারি না। ইতিহাস পড়ে দেখেছি যে ইংরেজের তথাকথিত দান বেশির ভাগ সময়েই স্বার্থসিদ্ধির এক-একটি মোহন রূপ। তবুও এই ইংরেজের কাছ থেকে আমরা এমন গোটাকয়েক অমূল্য বস্তু পেয়েছি যার জোরেই আমরা নবজীবন লাভ করেছি। এই কী যথেষ্ট নয়? তাঁদের ব্যারাক-স্থাপত্য, গোরার-বাস্তির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু তাঁদের সাহিত্যের, ইতিহাসের ঋণ ভুলি কী করে? যদি সে সাহিত্য, সে ইতিহাস আমাদের চিন্তাধারা ও কার্যাবলীকে কিছুমাত্র পরিবর্তিত করতে পেরে থাকে, তা হলে আজ না হয় দু'দিন পরে সেই ইংরেজকে মনের স্বদেশবাসী বলে গ্রহণ করতেই হবে।

তাঁহারা : ইংলণ্ডের ইংরেজ এক চীজ, আর এখানকার আমলাতন্ত্রের, পল্‌টনের, পাট-কলের সাহেব দুস্‌রা চীজ।

আমি : কবিও তাই বলেছেন। একটু তফাৎ হবেই হবে। বিদেশের ধন লুণ্ঠন করতে হলে হয় কামান, না হয় ভণ্ডামির আশ্রয় নিতে হয়। কামান-বন্দুক আজকাল চলে না, তাই ইংরেজ-রাজ যেটি আমাদের চোখের সামনে ধরে থাকেন তার নাম আমাদেরকে সভ্য, ভদ্র, স্বাবলম্বী করবার

প্রাণপণ প্রয়াস। অবশ্য লাঠি-চার্জের কথা ভুলি নি।

তাঁহারা : দেখুন, ও রকম একটু-আধটু মৃদু তাড়না মাপ করতে হবে। ছোট ছেলে ফাজিল হলে মাস্টারের কাছে ধমক খাওয়াই উচিত।

আমি : অমন হৃদয়-বিদারক ঠাট্টা করলে ইংরেজেরা পর্যন্ত লজ্জিত হবেন— আমার কথা তো ছার!

তাঁহারা : আচ্ছা, আর লজ্জা দেব না। কী জানেন, তাঁরা যদি বলতেন যে তাঁদেরই স্বার্থের জন্যে, অন্যের জন্যে, তাঁরা আমাদেরকে পরাধীন রাখতে চান, তা হলে তাঁদের শাসন-পদ্ধতিকে বুঝতাম। কিন্তু শান্তির জন্যে, সভ্যতার জন্যে, আমাদের উপকারের জন্যে তাঁরা আমাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিচ্ছেন না, অনেক চেষ্টা করছেন, অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, তবু পারছেন না, আমাদের দোষে, আমাদের রক্তগত, সমাজগত অকর্মণ্যতারই দরুণ, এবং না পেরে তাঁদের বুক ফেটে যাচ্ছে— এই সব কথা যখন তাঁরা খোলাখুলিভাবে, কিংবা ছুতোয়-নাতায়, ইঙ্গিতে, ভাবেভঙ্গিতে আমাদের শোনান, তখন রক্ত মাথায় চড়ে যায়। তবু যদি তাঁদের সভ্যতার দৌড় কতদূর বিশ্বসুদ্ধ লোকেরা না জানত!

আমি : গুরুনিন্দা শোনা মহাপাপ! ইংরেজ-জাতি খুব সভ্য।

তাঁহারা : ধরুনই তাঁরা খুব সভ্য। তাই বলে তাঁদের সভ্যতা, তাঁদের অনুষ্ঠান আমাদের ঘাড়ে চাপাবেন কেন? ঠিক তাঁদের ছাঁচে আমাদের ঢালাই করা কেন?

আমি : সীডন্‌হ্যাম্ সাহেবও ঐ কথা বলেন বটে। আমার বিশ্বাস কিন্তু অন্য প্রকারের। তাই কি তাঁরা চেষ্টা করছেন? তাঁদের কি ইচ্ছা যে তাঁদের মতনই আমরা সভ্য হই? তাঁদের প্রচেষ্টায় কিন্তু সে ইচ্ছাটি প্রকট হয় নি।

তাঁহারা : খানিকটা হয়েছে। ভালো চাকরি, যশ, মান, অর্থের লোভ দেখিয়েই তো তাঁরা আমাদেরকে সাহেব করে তুলেছেন! যাঁরাই সরকারী চাকরি করেন, তাঁরাই সাহেবী-ভাবাপন্ন, এবং তাঁরাই সমাজের, দেশের কাছে খাতির পান।

আমি : আচ্ছা, চাকরি পায়, না করে?

তাঁহারা : পায় আর করে যাই হোক না কেন, আমরা সাহেব বনে গিয়ে সার্থক হব না নিশ্চয়ই। সভ্যতা শুধু ভৌগোলিক ঘটনা নয়। সভ্যতা হচ্ছে মানসিক ঘটনা, অর্থাৎ মানসিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের গঠন মাত্র। অতএব গঠন যাই হোক না কেন, প্রত্যেক সভ্যতা সেই জাতির পক্ষে প্রকৃষ্ট।

আমার খাল না হয় নদী নাই হলো, আমার আশপাশের জমিকে উর্বর করতে পারলেই হলো, আমার খালের জল সমুদ্রে পড়লেই হলো— এই আমরা বুঝি।

আমি : একটু ভুল বোঝেন। আপনাদের মন্তব্যের বিপক্ষে আমার তিনটি আপত্তি আছে। প্রথম আপত্তি— যা হচ্ছে, কী হয়ে এসেছে তাই ভালো হচ্ছে স্বীকার করলে বাকিটুকু স্বীকার করতে হয়,— যথা, যা করে হোক আরও শতখানেক বৎসর যদি ইংরেজ আমাদেরকে পদানত রাখতে পারেন, তা হলে পদানত থাকাটাই আমাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণিত হবে। দ্বিতীয় আপত্তি— 'প্রকৃষ্ট' আর 'পক্ষে'র মধ্যে বৈরভাব আছে। কার পক্ষে? আমাদের পক্ষে; আমরাই তো সভ্যতাকে আমাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট করে তুলেছি। একই জিনিসকে একবার তর্কের খাতিরে static ভাবছেন, আবার function ভাবছেন। সভ্যতা কিছু নিশ্চল নয়, যখন সেটি মানসিক ব্যাপার, তখন সেটি বদলাচ্ছে— তা না হলে স্বাধীন হতে চাইছেন কেন? অতএব 'আমাদের পক্ষে আমাদের সভ্যতা প্রকৃষ্ট'— এই বাক্যের কোনো মানে হয় না। যখন প্রকৃষ্টের কোন উন্নতি নেই, তখন আপনাদেরও উন্নতি নেই। তৃতীয় আপত্তি— আপনাদের স্রোতের যদি জোর না থাকে, খাত যদি গভীর ও ঢালু না হয়, জলে যদি শেওলা ভাসে? তা হলে আজ না হয় কাল আপনাদের এই 'প্রকৃষ্ট' সভ্যতাটি মজে যাবে যে!

তাঁহারা : নিশ্চয়ই। কিন্তু সে প্রশ্ন উঠছে না এখানে। প্রশ্ন নয় কোন্ সভ্যতা ভালো ও কোন্ সভ্যতা মন্দ।

আমি : এতক্ষণ তো এই প্রশ্নই, অন্তত এই প্রশ্নের মন-গড়া, মন-খুশি করা উত্তরটি মনের মাঝে উঁকি দিচ্ছিল। আমার মনে হয় একটিমাত্র প্রশ্ন আছে— আমাদের জীবনটি স্রোত, না মজাপুকুরের শেওলা-ধরা জল? আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষ একটি পানাপুকুরের মতো হয়ে উঠেছে, অতএব বেনোজলের একটু প্রয়োজন আছে।

তাঁহারা : ঠিক তা নয়, আজ আমরা সকলে এই শেওলা তুলে ফেলতে বদ্ধপরিকর হয়েছি। বেনোজল ঢোকালে যদি কচুরিপানা চলে আসে?

আমি : স্রোতের জোরে তাও ভেসে যাবে। কাব্য ছাড়ুন। যা বলছেন ভাববার কথা বটে। তুলনার সাহায্যে দেশ স্বাধীন হয় না। যা কথা হচ্ছিল তাই হোক। ইংরেজের ভণ্ডামি দেখে আপনাদের রাগ হয়; রাগ কমাবেন কি করে? রাগ চণ্ডাল— শাস্ত্রে বলছে।

তাঁহারা : তাঁদের ভণ্ডামির মুখোশ খোলাতে হবে। চিত্তরঞ্জনের এই

মত ছিল।

আমি : তাঁর মত নয়, উপায় ছিল, এবং একটি উপায় ছিল। কতদিন তাঁর উপায় তাঁর নাম দিয়ে চালাবেন? নতুন কিছু উপায় বার করুন! তাঁর নাম দিয়ে তাঁর স্মৃতিকে আর অপমান করবেন না।

তাঁহারা : এইখানেই নতুন কংগ্রেসের বাহাদুরি। আমাদের বাহাদুরি আমাদের শান্তিপ্রিয়তায়, কেননা শস্ত্রের উত্তর শস্ত্র হওয়াই স্বাভাবিক।

আমি : মোটে এইটুকু হলেই ভণ্ডামির মুখোশ সরে যেত! আপনারা তো শস্ত্রের বিপক্ষে?

তাঁহারা : নিশ্চয়ই, মনেপ্রাণে বিপক্ষে। কিন্তু এইখানেই মহাত্মাজীর মাহাত্ম্য। আমরা হলাম অহিংস, জৈন। অতএব আমাদের অহিংস অ-সহযোগের উত্তরে যদি তাঁরা শস্ত্রপ্রয়োগ করেন, তা হলে দোষটা তাঁদের ঘাড়েই পড়ল। অহিংসার বিপক্ষে হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করালে তাঁদের প্রকৃত মুখশ্রী টের পাব, এবং তাঁদের মহাজন আমেরিকাও টের পাবে।

আমি : দোষী প্রমাণ হলে তাঁদের কি ক্ষতি হবে? তাঁদের হাতে খবরের কাগজ, তাঁদের হাতে লীগ্ অব নেশন্স্। তাঁরা জীবন্ত জাতি, তেজীয়ান, তেজীয়ানের দোষ হজম করবার ক্ষমতা আছে। যদি তাঁদের ধর্মজ্ঞান না থাকে? আপনারা কি সর্বদাই অহিংস? এই যে বিদেশী পণ্যের বয়কট— এটাও কি অহিংসার লক্ষণ? আচ্ছা, তাঁদের মুখোশ খুললেই কি আপনাদের মুখশ্রী ফুটে উঠবে?

তাঁহারা : ও-সব চুলচেরা তর্ক আপনাদেরই শোভা পায়। অবশ্য এও সত্য যে তাঁদের মুখোশ খুলে গেলেই, তৎক্ষণাৎ আমাদের মুখ লাবণ্যমণ্ডিত হবে না। তবে সকলেই জানে যে মুখোশ-পরা জুজুর ভয়ে আমরা সর্বদাই সশঙ্কিত। তাঁদের মুখোশ যদি সুন্দরও হয়, তা হলেও স্বীকার করা চলে না যে, সে মুখোশের সৌন্দর্য আমাদের মুখশ্রীর আদর্শ হওয়া উচিত। আমরা নিজেদের মুখ খুলে মুক্ত হাওয়াতে বেড়াতে চাই। মুখোশ, তায় বিদেশী, আবার না পরলে চলে না, এতে প্রাণবায়ু আর কতদিন বইবে। এইখানেই ইংরেজ রাজার বিপক্ষে আমাদের আপত্তি।

আমি : আমারও আপত্তি বোধহয় তাই। আপনাদের ভাষাতেই বলি, মুখশ্রী ফোটানোই সবচেয়ে বড় কথা। Personality কথাটি এসেছে persona— অর্থাৎ মুখোশ থেকে। মুখোশ কিন্তু আমাদের একটি নয়, এই যা বিপদ! অতএব আপত্তিও অনেক। এই ধরুন— স্ত্রীপুত্রপরিবারকে

একটি বিশিষ্ট উপায়ে ভালোবাসতে হবে, ভারতের সমাজে এক বিশিষ্ট উপায়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে, এক বিশিষ্ট উপায়েই কুশিক্ষিত পিতা, অশিক্ষিত মাতা এবং অর্ধশিক্ষিত মাস্টারের কাছে শিক্ষিত হতে হবে, ইংরেজ গবর্নমেণ্ট যে বিশিষ্ট উপায়ে অর্থাৎ লক্ষ্মী ছেলেটির মতন আমাদের থাকতে বাধ্য করেছেন— থুড়ি, আমাদের ভালোর জন্যেই উপদেশ দিচ্ছেন, সেই বিশিষ্ট উপায়গুলো অবলম্বন করা ছাড়া আমাদের 'নাস্তি গতিরন্যথা।' এই বাধ্যবাধকতা কিন্তু ধাতে বসে না— কারুরই না। অথচ সাহস নেই, তাই বনিবনাও করে চলতে হয়— এক কথায় মুখোশ পরতে হয়। পৃথিবীতে থাকতে গেলেই বাধ্যবাধকতা মানতে হবে। কিন্তু মানা অনেক প্রকারের। এক প্রকার মানা হচ্ছে ভীরুতার, আলস্যের নামান্তর। অন্য প্রকার মানা হচ্ছে বাইরের বাধাকে হজম করা, অর্থাৎ ভেতরের তাগিদ ও বাইরের চাপকে হার্মনাইজ করা। যার metacentre ও centre of gravity এক রেখায়, তারই ভারসাম্য আছে। অবশ্য সেখানেই চিরকাল থাকলে চলে না। জীবনের পক্ষে স্থিতির নাম মৃত্যু। জীবনের ভেতরে বাইরের নব নব শক্তির কাজ চলে। তাই ভারসাম্য সামলাতে সামলাতে, হার্মনি সৃষ্টি করতে করতে চলার নামই উন্নতি। হার্মনি আছে বলেই সত্যকারের মুক্তপুরুষের মধ্যে কোন খিচ্ নেই— যেমন গোরার পরেশবাবু, ঘরে-বাইরের মাস্টারমশাই, জন্তয়েভস্কির আলিয়শা, ফ্রাঁসের আবে কয়নার্ড, শেক্সপীয়রের প্রস্পেরো প্রভৃতি। বিবাদী সুরকে কয়েদ করা চাই, মশাই, নচেৎ সুর খেলে না। ইংরেজ-রাজ্যে বাইরের বাধাকে হজম করা যাচ্ছে না, হার্মনাইজ করা শক্ত হয়েছে। তাই আমার আপত্তি— দেশকে শুষছে বলে, পরাধীন রেখেছে বলে যতটা হোক আর না হোক।

তাঁহারা : যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি। আমরাও ঐ কথা বলি, তবে একটু সহজভাবে। তবুও একটা সন্দেহ থাকে। আচ্ছা, যা বললেন তাই যদি সত্য হয়, তা হলে এ দেশে বড়লোকের অভ্যুদয় কি করে হয়? আর যে-সে বড়লোক নয়— রামমোহন, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবিবাবু! পৃথিবীর যে কোনো দেশ তাঁদের জন্মভূমি হলে ধন্য হতো। একটু গোলমেলে কথা নয় কি? এক যদি বড়লোকের জন্মগ্রহণ আকস্মিক ঘটনা বলেন, তা হলে অবশ্য বোঝা যায়, অর্থাৎ ব্যাখ্যাকে ভগবানের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু আপনার মতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী লোকের মুখে আকস্মিকতার দোহাই শুনতে রাজি নই।

আমি : যে তারাগুলো আকাশে খুব ঝকঝক করে তারা আকাশের সব কোণেই সমান সংখ্যক থাকে। বাকি সব ছোট অনুজ্জ্বল তারাই ছায়াপথ সৃষ্টি করে আকাশকে দু'ভাগে বিভক্ত করে। মানসিক জগতের ঠিক ঐ ধরনের galactic latitude পাওয়া যায় না। বড় বড় পণ্ডিত চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করেন। অতএব তাঁদের ব্যাখ্যা ছেড়ে দিন। বিজ্ঞানেও আপাতত বিস্তর আকস্মিক ব্যাপার রয়েছে। বিজ্ঞান আপনারা যতদূর জানেন আর নাই জানেন, বিজ্ঞানের বিপক্ষে আপত্তি, ও বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা কোথায় তা আর আপনাদের বলে দিতে হবে না। বড়লোকের এই দেশে অভ্যুদয় ব্যাপারটা মোটেই গোলমেলে কথা নয় কিন্তু। প্রথমে তাঁদের সম্বন্ধে একটা কথা বলি। ইংরেজ-রাজার অধীনে থেকে তাঁদেরও ক্ষতি হয়েছে। রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবিবাবু বিশ্বের প্রধান অধিবাসীদের দলে। কিন্তু তাঁরাও ভারতবাসী; যদিও বিদেশী সভ্যতার মুখোশ খুলিয়ে তাঁরা আপনাদের কাছে সস্তায় বাহাদুরি নিতে প্রস্তুত হন নি। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি অতীব তীক্ষ্ণ। তাই তাঁরা পশ্চিমী সভ্যতার, ইংরেজ-জাতির সভ্যতার মুখশ্রী দেখেছেন— দেখে মোহিত হয়েছেন। এখন সনাতন-পন্থীরা ঐ তিনজনকে ইংরেজী সভ্যতার 'কুফল' বিবেচনা করেন। অস্বীকার করবেন না। তাঁরা আপনাদের মতন খাঁটি স্বদেশী নন বলে আপনারা দুঃখিত। বিবেকানন্দের প্রতি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের আক্রমণ, রবিবাবুর প্রতি নেতার আক্রোশ সত্য ঘটনা। তাঁদের বিপথগামী করতে চেষ্টা করেছেন আপনারা। খ্রীস্টানসম্প্রদায় সম্বন্ধে রামমোহনের মন্তব্যকে, পশ্চিমী সভ্যতাকে বিবেকানন্দের ও কবির চাবুক মারাকে, (এমন কী কবির স্বদেশী গান পর্যন্তকেও) আমি তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলতে পারি না। আমি ভালো করে দেখাতে পারি যে, ইংরেজ-রাজার অধীনে থাকার দরুণ তাঁদের শক্তির কিছু অপচয় হয়েছে, কিছু পরিমাণে তাঁদের ধর্মচ্যুতি ঘটেছে। ইংরেজী ভাষা শিখে তাঁরা ছোট হয়েছেন মহাত্মাজী বলেছিলেন। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়! মহাত্মাজীর মাহাত্ম্যও সে হিসেবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। স্বাধীন দেশে তাঁর মাহাত্ম্যের অত প্রয়োজনই থাকত না। বিরোধে শক্তির অর্জন হয়, শক্তি বৃদ্ধি পায়— কিন্তু শুধু বিরোধে আততায়ীর দোষগুলো পর্যন্ত এসে যায়— কাঁচপোকা-তেলাপোকার মতনই খানিকটা। আজ যদি ইংরেজ-রাজ না থাকত, তা হলে শুধু গান্ধীজীই মহাত্মা হতেন না, আরও দু'-দশ জন হতেন, মহাত্মা না হোন, মানুষের মতন মানুষ হতেন। আজ যদি ইংরেজরা না থাকত, তা হলে

হয়তো তিনি শুধু প্রাদেশিক অবতারই থাকতেন। আজ যদি ইংরেজ আধিপত্যকে পৃথিবীর সব জাতি হিংসা না করত, তা হলে হয়তো আমেরিকান মিশনারি, ফরাসী লেখক, ও বিদেশী শ্রমিকের দল তাঁকে খ্রীস্টের সঙ্গে তুলনা করত না, যুগাবতার মনে করত না। তাতে আমার মতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হতো না— বরঞ্চ দেশের লাভই হতো। ইংরেজ-রাজের আধিপত্য ও আমাদের দেশের অধীনত্ব তাঁর মহত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে— সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও স্বাধীন চিন্তা করবার শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। কিন্তু আমি তাঁকে আরও বড় দেখতে চাই। দেশ স্বাধীন কবে হবে জানি না— যদি তাঁর জীবদ্দশায় হয়, তা হলে ভয় হয় যে হয়ত তাঁকে ভক্তির চোটে ছোট দেখব। যে ব্যক্তি ইংরেজের উপনিবেশে থেকেছেন, যিনি চিরকাল আপত্তিই করে এসেছেন— তিনি স্বাধীন ভারতের অধি-বাসীকে স্বাধীন মুক্তপুরুষ হবার কতখানি positive সুবিধে করে দেবেন জানি না। বিরোধের মধ্যে যতখানি সৃষ্টির বীজ লুকানো আছে, ততটুকুরই অঙ্কুর ফোটাতে তাঁর জীবনের আদর্শ সাহায্য করবে— তার বেশি নয়। মহাত্মাজীর কথা তুললাম এই জন্যে যে তিনি আমাদের, আপনাদের ও আমার আদর্শ পেট্রিয়ট। আমি তাঁকে আদর্শ পুরুষ বলি না। আমার— আমার কেন,— ভারতের আদর্শ একটু আলাদা। তাঁকে আদর্শ পুরুষ হতে না দেবার জন্যে তাঁকে মহাত্মা তৈরি করে আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্যে, মানুষের খোঁজে রবিবাবুকে দেশত্যাগী করার জন্যে, বিবেকানন্দের ঝাঁজের জন্যে, অরবিন্দের পণ্ডিচারী-প্রয়াণের জন্য ইংরেজ-রাজা দায়ী। অন্য অবস্থায় এঁরা প্রত্যেকে first magnitude-এর তারা হয়তো না হতেন, কিন্তু আমরা সকলে nebular অবস্থায় থাকতাম না, আর বড় ঝকঝকে তারাগুলোও অত দূরে সরে যেত না। ইংরেজ-রাজের অধীনে ভারতবর্ষে যে সব মহাপুরুষ জন্মেছেন তাঁরা হাঁড়ে হাড়ে জানতেন যে ইংরেজ সভ্যতার কুহক ভাঙা কত শক্ত। সে কুহক ভাঙতে গিয়ে তাঁদের শক্তির অপচয় হয়েছে। অপচয় না হলে তাঁরা আরও বড় হতেন। তবে যত অপচয় আমাদের হচ্ছে, ততটা তাঁদের হয় নি বলাই বাহুল্য। তাঁদের অসাধারণত্ব সর্ববাদিসম্মত।

তাঁহারা : দেখুন, আপনার সঙ্গে আমরা মহাত্মাজীকে নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। ভূতের মুখে রাম নাম কটু শোনায়। একটা ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারি— গান্ধীজীকে যুগাবতার না মানার জন্যেই আপনাদের এই শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ইংরেজের দাস-সম্প্রদায় শীঘ্রই ভারতবর্ষের সমাজ থেকে

ধুয়ে পুঁছে যাবে। তাঁর স্থান কোথায়, তাঁর কৃতিত্ব কি, তাঁর মাহাত্ম্য কতটুকু, এ সব বিচারের ভার ইতিহাসের ওপর দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকব !

আমি : মহত্ব ও মাহাত্ম্য কী এক কথা ? সে যাক গে, একটি উপদেশ দিই, আপনাদের মতো দূরদর্শী নই— ইতিহাসকে বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, আপনারা যা করবেন তাই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব ঐতিহাসিকের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। যে কথা হচ্ছিল, ইংরেজ রাজত্বেও বড়লোকের জন্মগ্রহণ সম্ভব হবার কারণ ঐ ইতিহাসের মধ্যেই আছে। তাঁরা সব উনবিংশ শতাব্দীর লোক— সে শতাব্দীতে ইংরেজ রাজার শাসন অত 'ভদ্র' ও ভীষণ ছিল না। গোড়ায় ইংরেজ ব্যবসাদার ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে এবং পরে তাঁহাদের রাজ্যশাসন আরম্ভ হলো। তখন শাসনকর্তা ও শাসিতের সম্বন্ধ ছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের। বীটসন্‌বেলের নাম শুনেছেন ? তিনি তখন বাখরগঞ্জের হর্তাকর্তা, তখন একদিন কী একটা নদী পার হচ্ছেন— দেখেন, একটি রুগ্না বালিকা নদী থেকে একটা ভারী কলসীতে জল ভরে নিয়ে যাচ্ছে, ভারী কষ্ট হচ্ছে, সাহেব তখন তাকে মা বলে সম্বোধন করে হাত থেকে কলসী নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেন। বাড়ি গিয়ে দেখেন যে বালিকার যণ্ডামার্কা স্বামীটি দাওয়ায় বসে গুড়ুক টানছেন। অমনি চাবুক !

তাঁহারা : অস্থার্থ ?

আমি : অস্থার্থ— মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করলেই অনুষ্ঠানের অমানুষিকত্ব অনেকটা লোপ পায়। সিপাহী-বিদ্রোহের পর সাহেবরা শাসন করতেন পুরাতন জমিদারের মতন। সেইজন্যে সরকারের খাতিরও ছিল খুব। যেখানে শাসন করতে নিজেরা পারতেন না, সেখানে জমিদার দিয়ে শাসন করাতেন। তখন ইংরেজ-রাজ বলতে, ভদ্রলোকের কাছে ইংলণ্ডের সভ্যতা বোঝাত— সেই শেলী, কীট্‌স, মিল, হার্বার্ট স্পেন্সর, বার্ক, ব্রাইট, গ্ল্যাডস্টোন, ডারুইন, হাক্‌স্‌লি, ফ্যারাডে। তখন ইংরেজ ছিল ইংলিশম্যান। ইংলণ্ডের রাজনীতি ছিল Little Englander-এর। তা সত্ত্বেও নয়, তারই জন্যে ইংরেজ ছিল সত্যিকারের great, মহৎ। ইংরেজের মতনই রাজ্য চালাত। বুয়ার যুদ্ধের পর থেকে অর্থাৎ গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইংরেজের শাসনপন্থা বদলেছে। ইংরেজ আবার ব্যবসাদার হয়েছে, তবে তাকে ভয়ে ভয়ে ব্যবসা চালাতে হয়— জার্মান, আমেরিকান, জাপানী ব্যবসাদারের ভয়ে, পাছে তাদের ভালো কিংবা সস্তা মাল ইংরেজী মালকে তাড়িয়ে দেয়। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি বড় হয়ে গেল,

ইংরেজের একচ্ছত্র বাণিজ্য-সাম্রাজ্য টলটলায়মান হলো। ফলে ইংরেজ হলো Imperialist, কিন্তু উপনিবেশের মধ্যে। ওধারে উপনিবেশগুলোও মাথা নাড়া দিয়ে উঠল, সেখানেও দেশাত্মবোধ জাগল, সেখানেও লোক-সংখ্যা বেড়ে গেল, আত্মরক্ষা ও নিজের নিজের আর্থিক উন্নতির জন্যে বিদেশী ও ব্রিটিশ পণ্যের ওপর শুল্ক বসাতে লাগল। ব্রিটিশ পণ্যের ওপর শুল্কের হার কিছু কম। আদৎ কথা, খোলাখুলি ব্যবসা সর্বত্রই গেল উঠে। বাকি রইল ভারতবর্ষ— ইংলণ্ডের কারখানায় কাঁচামাল জোগাবার জন্যে। ওধারে নতুন ধরনের রাজ্য চালাবার জন্যে যে শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, তারও একান্ত অভাব ঘটল। 'এমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়!' ভারতবর্ষ হয়ে উঠল 'সবে ধন নীলমণি।' তার আদর কত! নীলমণি হয়ে উঠল sacred trust! যে রক্ষক সে-ই হলো ভক্ষক। তাই এখন রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, মানুষের সম্বন্ধ নেই। এ সম্বন্ধ শুধু অর্থলোভের, মুসলমানী যুগের ভোগের কিংবা রাজমহিমালোলুপ ব্যক্তি ও গোষ্ঠিবিশেষের নয়। এ যেন শুধু কলের সঙ্গে, কল-কর্তার সঙ্গে মজুরের সম্পর্ক। সেই জন্যেই তো যুবকদলের আন্দোলন একটু socialistic হয়ে উঠেছে। তাতে লাভ বৈ ক্ষতি নেই। এখনকার শাসন-প্রণালী দেখলে Robot-এর হাত-পা নাড়ার কথা মনে হয়। কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহজে নড়ছে না, সব যেন ঝাঁকানি দিচ্ছে। এর মুখের হাসি মুখেরই নয়, মুখোশের। এ হাসির অর্থ ও বীভৎসতা আজকালকার যুবক মনে মনে বুঝেছে ও ঘৃণা করতে শিখেছে। যারা বিংশ শতাব্দীতে জন্মেছে তাদের পক্ষে, এই কলের সম্পর্কে, কলের অধীনে বাস করে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব হয়েছে। তাই তো সোনার চাঁদ ছেলেরা সব বিগড়েছে— কেউ ছুঁড়ছে পিস্তল, কেউ শিখছে যোগবল। ও দুটো কাজই সুস্থ, স্বাধীন মনের চিহ্ন নয়। ও দুটো কাজই নৈরাশ্যের, inferiority-complex-এর পরিচায়ক। ছেলেবেলা ভয় কিংবা অন্য কোন ধাক্কা পেলেই মন মুষড়ে যায়। অথচ মানুষের একটা ego-felling রয়েছে, যাকে অহংকার বলতে পারেন। অহংকারের সঙ্গে ধাক্কা-খাওয়া, টোল-খাওয়া মনের চলল লড়াই। হয় ইংরেজ, না হয় ভেতরের কোন রিপু দুর্বলতার প্রতীক হলো। তাই তাদের নির্মূল করবার প্রবৃত্তি জন্মাল। বোমা-ছোঁড়ার দলের কিংবা যোগীর দলের অনেকেরই চিত্তের গঠন নিতান্ত দুর্বল। 'স্বদেশী ছোকরা'দের অনেকেরই মধ্যে subnormal, arrested growth কিংবা feebel-mindedness-এর চিহ্ন আছে। Point and Counter-point-এ একটা বৈজ্ঞানিকের চরিত্র আছে, ছেলেবেলায় তার স্বাভাবিক

বিকাশের গতিরোধের জন্যে সে সোশ্যালিস্ট হয়, পরে খুন পর্যন্ত করে। বই-খানা পড়বেন— অনেক মজার কথা আছে।

তাঁহারা : নায়াগ্রার জলপ্রপাতে আমাদের তর্কবুদ্ধি ভেসে গিয়েছে। বইএর কথা যদি তুলেছেন তো আমরা উঠেছি। কি কারণে কী হচ্ছে জানি না— তবে যা হচ্ছে তা চোখের সামনেই দেখছি। সব কাঁটা হয়ে গেল, মশাই,— ফলে, ফুলে পাতায় পাতায় কেউ ফুটে উঠল না। এ কী কম দুর্ভাগ্যের কথা ?

আমি : আরও দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, আপনারা ফুল না হয়ে কাঁটা হবার কারণ খুঁজছেন না, সেই জন্যে ফুল ফোটাবার সুযোগও হচ্ছে না। শুধু 'সকল কাঁটা ধন্য করে কবে গো ফুল ফুটবে ?' বলে আক্ষেপ করলে চলবে না তো !

তাঁহারা : দেখুন আপনাকে প্রশ্ন করতে ভয় করে, আবার লম্বা বক্তৃতা দেবেন !

আমি : দেশ স্বাধীন হবে, আপনারা সব মানুষ হয়ে উঠবেন— আর ঐটুকুতে ভয় ? ভয়েতেই খেয়েছে আপনাদের। সত্য আচার, সত্যনিষ্ঠা, সত্যকথন, সত্যচিন্তা, সত্যজীবন আমাদের যুবকদের পক্ষে অসম্ভব হয়েছে কেন ? ঐ ভয়ের জন্যে। কেবল ভয়, কেবল ভয়, কেবল ভয়— নিজেকে ভয়, পরকে ভয়। হয়তো জুজু নেই,— হয়তো কেন, নিশ্চয়ই নেই, নিজেরই মধ্যে উন্নতির বীজ রয়েছে, তবু ভয়,— আগতকে ভয়, অনাগতকে ভয়। আদিম জাতি যেমন ভয় পেয়ে থাকে, এ তেমনই ভয়, একেবারে elemental primitive fear। আমরা মানুষ হিসেবে আদিম, বর্বর। অথচ জাতি হিসেবে আমরা অসভ্য নই, বহু পুরাতন ; অথচ ভয় নিয়ে কোনো মানুষ জন্মায় না— ওটা রক্তের সঙ্গে আসে না।

তাঁহারা : আমাদের বিশ্বাস কিন্তু বিপরীত। সব মানুষই ভীতু হয়ে জন্মায়।

আমি : আপনাদের বিশ্বাস ভুল ! ভয় একটা instinct নয়— nervous হয়ে জন্মায় বটে। যে সব শিশু হাসপাতালে জন্মেছে তাদের নিয়ে পরীক্ষা করার ফলে দেখা গিয়েছে যে, হঠাৎ কোনো জোর শব্দের জন্যে, কিংবা হঠাৎ কোনো অবলম্বন সরিয়ে নেওয়ার জন্যে তারা আঁৎকে ওঠে। এ ছাড়া অন্য কিছুতে শিশুরা বড় ভয় পায় না। ভয় পরে শেখে, ঐ দুই প্রকার শারীরিক প্রক্রিয়াকে আশ্রয় করে— যাকে conditioned reflex বলা হয়। ভয় ছেলেমেয়েদের শেখানো হয়। সে শিক্ষার জন্যে বাপ-মা'ই

দায়ী, শৈশবাবস্থায় মা ও ঠাকুরমার দল, যৌবনাবস্থায় পিতা ও পিতৃস্থানীয়েরা, অর্থাৎ শিক্ষক, অভিভাবকের দল। তাঁরা জীবিত থাকতে দেশের কোনো আশাভরসা নেই। Non-co-operation should begin at home। সত্যকথন, সত্য আচরণ অন্যায়, অবশ্য এ কথা তাঁরা শেখান না। মুখে, কিংবা বিদ্যাসাগর মশাই-এর মুখ দিয়ে তাঁরা সত্যের মাহাত্ম্যই প্রচার করেন। কিন্তু শিশুরা, বালক-বালিকারা ভারী চালাক— তারা ঘোরতর realist! বাপ-মায়ের জুয়োচুরি ধরতে তারা ওস্তাদ। বাপ-মায়ের মনের কথাটি তারা তাঁদের আচরণের এক আঁচড়েই বুঝে নেয়। 'বিপদের সময় মুখ বন্ধ করাই সমীচীন, গা ঢাকা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ'— এ ধরনের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা তাঁরা সদাসর্বদাই দিয়ে থাকেন। 'ওহে বাপু, নিজের কাজ বুঝে নাও, ধীর হও, শান্ত হও, লক্ষ্মী ছেলে হও'— এ উপদেশ সব বাপ-মায়েই দিয়ে থাকেন, নিজেদের অভিজ্ঞতার নজির দেখিয়ে। অবশ্য সবই স্নেহভরে, আমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই, আমাদের উপকারের জন্যে! আমরা রিসার্চ ছাত্রদের বলি, 'যদি অবশ্য চাকরি পাও, তা হলে কথাই নেই।' আমরা এতদূর অপদার্থ যে বশীকরণ ও মতের বমিকরণ তো দূরের কথা ছাত্রদের কাছে নিজেদের চরিত্রহীনতার অনুকরণ পর্যন্ত প্রত্যাশা করি! সদুপদেশের মানে কি? মানে, 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা।'

তাঁহারা: আচ্ছা, আপনার বিশ্লেষণ খানিকটা মেনে নিচ্ছি। যে সব মহাপুরুষদের নাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে আপনার বিশ্লেষণ ঠিক কি?

আমি: মোটেই না। সেই জন্যেই তো তাঁদের আবির্ভাব এই পরাধীন জাতির মধ্যেও সম্ভব হয়েছিল। একে মূলধন বেশি, তায় খাটানো হয়েছিল ভালো করে, বেশি হারে। তাঁদের শিক্ষা একটু ভিন্ন প্রকারের হয়েছিল। রামমোহন, তিলক, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবিবাবু, গান্ধী, সব বাঘের বাচ্চা। এঁদের চরিত্রে ভয়ের কোন লক্ষণ আছে? তাঁদের কথা ছেড়ে দিন। ভবিষ্যতের জন্যে তাঁরা দৃষ্টান্তস্থল মাত্র, তাঁরা বড় হলেই আমরা বড় হব না। দেশের সমস্যা হচ্ছে সাধারণকে বড় করা— উঁচু স্তরে তোলা। বড়লোকের নাম নিয়ে আত্মপ্রসন্ন হতে ভালো লাগে না। সাধারণ-স্তরটি অত নিচু কেন প্রশ্ন করুন, আলোচনা করি। আমার বক্তব্য শুনুন।

তাঁহারা: শুধু তাইই তো শুনছি।

আমি: কিছু ক্ষতি হচ্ছে কি? আমার বক্তব্য হচ্ছে এই— শৈশব অবস্থায় ভীরু, যৌবনাবস্থায় কাজ-বাগানো ছেলে, প্রৌঢ়াবস্থায় successful man হওয়া সাধনার, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলে, সত্য কথা কওয়া, সত্য আচরণ

করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। যৌবনাবস্থা শেষ হলেই গবর্নমেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক শুরু হল। গবর্নমেন্ট হচ্ছে বড় সংস্করণের মা-বাপ। তার হাতেই জীবন, তার হাতেই চাকরি, চাকরি ছাড়া গতি নেই, সে চাকরির মতন খাতির নেই, সুবিধে নেই। অন্য ধারে হাঁড়িতে ভাত নেই, চাষবাস করবার মতো ধৈর্য নেই, ব্যবসা করার মতো শিক্ষা, সুবিধে, মূলধন নেই, অন্য কোথাও অর্থসমাগমের সহজ ও সুনিশ্চিত উপায় নেই। তখন মা-বাপ, গুরুজন, শিক্ষক ও পিতৃতুল্য গবর্নমেন্টের শিক্ষা, পরামর্শ ও চাপের বশে সুনিশ্চিতকে বরণ করাই নিরাপদ ও বুদ্ধির চিহ্ন বিবেচনা করাই স্বাভাবিক। নেহাৎ না কী পিতৃমাতৃবৎসল বুদ্ধিমান সন্তান আমরা, তাই পিতামাতা ও পিতৃতুল্য গবর্নমেন্টের শিক্ষা, উপদেশ ও প্রভাবের বিপক্ষে আমরা মাথা তুলতে চাই না। আমাদের তাতে স্বার্থ ও বুদ্ধিতে ঘা পড়ে যে! কবে আমরা putative এবং political মা-বাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব কে জানে! যতদিন আমাদের দেশের পিতামাতারা জীবিত আছেন, যতদিন তাঁদের আত্মম্ভরিতার জন্যে তাঁদের ছাঁচে আমাদেরকে তাঁরা ঢালাই করবেনই করবেন, যতদিন আমাদের শিক্ষক-সম্প্রদায় আমাদের বুদ্ধিমান করে তুলবেনই তুলবেন, যতদিন সাংসারিক সিদ্ধিলাভ অভিভাবকদের চরম লক্ষ্য থাকবে, ততদিন আমাদের কোনো ভরসা নেই, ততদিন ইংরেজ ভারতবর্ষে সুখে ঘরকন্না করতে থাকবে। আমাদের গুরুজনেরাই বিদেশী রাজার গুপ্তচর।

তাঁহারা: আপনার মতো সমাজদ্রোহী লোক বিরল— অথচ আপনি নিজেকে হিন্দু বলেন!

আমি: আমাদের গোষ্ঠিজীবনেই নোক্তা পড়েছে, তাই এত গোলমাল। সে গোলমালকে বাড়িয়ে তুলছে বাইরের লোকে। গোষ্ঠিজীবন ভাল কী মন্দ জানি না, কিন্তু আমাদের সমাজে যা দেখেছি তাতে আর শ্রদ্ধা থাকে না। অন্য সমাজে কী আছে, কী নেই, তাতে আমার-আপনার কিছুই আসে যায় না। আমার এক-এক সময় ইচ্ছে হয় যে সব উলটেপালটে যাক, তা হলে নতুন শ্লেটে আঁচড় কাটি। সে আঁচড় বাঁদুরে আঁচড় হোক না কেন, ঋষিদের হস্তাক্ষর হবে না এই যথেষ্ট, আমাদের শ্রীহস্তেরই লিখন হবে। স্বাধীনতার এক অর্থ বুঝি— সেটি হচ্ছে ভুল করবার স্বাধীনতা।

তাঁহারা: ঋষিদের হস্তাক্ষরের জোরেই বর্তমান হিন্দুসমাজ টিঁকে আছে, যেমন গুরুজনের আশীর্বাদে আপনি এখনও করে খাচ্ছেন। আর

সে জন্যেই আপনার বক্তৃতা শুনতে আমরা সমাগত হয়েছি। আজ যদি তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা, কৃপা না থাকত তা হলে আপনাকে অন্য জনসাধারণের মতনই কেরানি হতে হতো— বই পড়বার, চিন্তা করবার অবকাশ আপনি পেতেন না। আপনার জীবন খানিকটা successful বলেই আপনার বাজে বক্তৃতা লোকে সহ্য করে।

আমি : মনের অনেক গোপন কথা বলে ফেললেন। কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ আমিও একটি গোপন কথা বলি। আমার মনে কে যেন সর্বদাই খোঁচায়, কে যেন বলে successful হওয়াই চরম কথা নয়, কে যেন বলে জীবনের সিদ্ধান্ত কিছু অঙ্কের সিদ্ধান্তর মতন নয় যে উত্তরের পৃষ্ঠা খুলে মিলিয়ে দেখে ঠিক হলেই পুরো নম্বর পেলাম, কে যেন বলে অনিশ্চিতের আহ্বান শোনো, কে যেন বলে সাধারণের দুঃখের ভাগী হও। অবশ্য এ সব গোপন চিন্তার মাথায় লাঠি মারি— তারাও দেবে যায়।

তাঁহারা : বলেন কী! আপনার মতন ব্যক্তিতন্ত্রবাদী কী পরের কথা ভাবতে পারে, অন্যের দুঃখের ভাগী হতে পারে?

আমি : আমাকে একটা শিশির ভেতর পুরে, তার ওপর টিকিট লাগিয়ে তাকের ওপর তুলে রাখবেন না। কোনো মানুষকেই একটা শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। সুবিধে, বিশেষত বৈজ্ঞানিক সুবিধের জন্যে মানুষের শ্রেণীভাগ করা হয়, যেমন জার্মান পণ্ডিতরা করেন। আমার বিশ্বাস যে মানুষের স্বভাব বলে কোনো অপরিবর্তনীয় বস্তু নেই। সে স্বভাব কোথায় যেন বদলাচ্ছে। কোন্ রন্ধ্র দিয়ে হাওয়া প্রবেশ করে 'ছোট আমি'র বন্ধ-ঘরের বদ্-হাওয়াকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। জনসাধারণের শোকতাপ, আশা-ভরসা 'ছোট আমি'কে অতিষ্ঠ করে তুলেছে! মানুষের পক্ষে স্বার্থপর থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। জগৎজোড়া করুণা এসেছে, করুণা— মশাই, কৃপা নয়, sacred trusteeship নয়। এতদিন মানুষের ক্রিয়াকলাপ ব্যক্তিগত স্বার্থের ধারায় চলছিল। বিপরীত প্রতিক্রিয়ার বশে চেষ্টা হলো সব মানুষকে সমান ভাবে দেখতে। অনেকে ভোট পেলে। আরে! তাতে কী হয়! শিক্ষাপদ্ধতি রইল সেই মধ্যযুগের, রক্ত ও বীজ রইল আদিম যুগের। পরে চেষ্টা হলো স্বাধীন হবার। পরিণাম— দেশাত্মবোধ। কেন না সে স্বাধীনতা মানুষের নয়, দেশের— অর্থাৎ শক্তিশালী দেশের দুর্বল দেশকে গ্রাস করবার অবাধ স্বাধীনতা আর গরীবের ওপর দেশের বড়লোক-দের অত্যাচার করবার অবাধ সুবিধে। তারপর চেষ্টা হলো মৈত্রীভাব আনবার, ইদানীং লীগ অব নেশন্স্ জগতে মৈত্রীভাব আনবার জন্যে চেষ্টা

করছে। কিন্তু আমেরিকা ও বিশেষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের Idea of Commonwealth of Nations মৈত্রীভাবের প্রতিকূল হয়ে উঠল। ঘরের ভিতর ঘর তৈরি হল। মৈত্রীসাধন শক্ত কাজ, যতদিন পর্যন্ত শিক্ষার আমূল পরিবর্তন না হয়। কিছু পরিবর্তন হয়েছে—না হ'লে স্বভাব বদলাতে সন্দেহ হয় কেন? Liberty, Equality, Fraternity সব বরবাদ হয়ে গেল, শিক্ষার দোষে, এখন বসে আছি personality-র আশায়। কখনো দেখছি মরীচিকা, কখনও দেখছি বিভীষিকা। একবার মনে হচ্ছে, কার্ল মার্কসের বাণী মর্মে আঘাত করেছে, যদিও আর্থিক স্বার্থের ভেতর দিয়ে আবার দেখছি অত্যাচারী ও প্রপীড়িত দুই-এ মিলে অন্যের ওপর অত্যাচার করছে, সকলকে একছাঁচে ঢালাই করতে চেষ্টা করছে, ব্যক্তিত্বকে ও বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা না করে। একবার আশা হচ্ছে রাশিয়ার নব্য-শিক্ষাতন্ত্রের ফলে যেমন দশ-পনের বছরের মধ্যেই চাষাভূষোরা মাথা উচু করে হাঁটতে আরম্ভ করেছে, সাধারণ মানুষ যেমন হাসতে হাসতে মাঠে-ঘাটে, কলকারখানায়, সভা-সমিতিতে কাজ করছে, স্বার্থকে বলি দিয়েই কাজ করছে, ভবিষ্যৎ উন্নতির মোহে মোহাচ্ছন্নের মতনই কাজ করছে, আমরাও তেমনই হয়তো শিক্ষার সাহায্যে মাথা তুলব, শিরদাঁড়া সোজা করে হাঁটব, ঋজু হব, আমাদের রক্ত ধমনীতে জোরে বইবে, কেঁচোর মতন শুধু মাটি খুঁড়েই সার্থক হব না—আমরাও মাটি ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াব, আমাদেরও মুখশ্রী ফুটে উঠবে। এ সব মাস্টারি কথাবার্তা শুধু নয়, কাজেরও কথা। আবার বুক কাঁপে এই ভেবে, যে উপায়ে রাশিয়ার মুখশ্রী ফুটে উঠেছে সে উপায়ের ফ্যাসাদ অনেক, দাম অনেক, সে উপায় আমাদের ধাতে বসবে না, সে উপায় অবলম্বন করতে আমরা পারব না।

তাঁহারা: এইবার মাস্টারি কথা কইলেন! নিজেই বলেছেন যে আপনারা সাবধানী পথিক। কমিউনিজম্-এ দেশে সম্ভব নয় কেন?

আমি: অনেক কারণে। আমি জ্যোতিষী নই। কে জানে আমাদের দেশে কী হবে না হবে? কে জানত রাশিয়ায় ঐ কাণ্ড হবে? কার্ল মার্ক্‌সের এক চিঠিতে আছে যে কৃষিপ্রধান রাশিয়ায় সোশ্যালিজমের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ইংলণ্ডে ছিল, যেখানে কৃষিকার্যও টাকার জোরে capitalistic হয়েছে, যেখানে জমিগুলো টাকার জোরে large estate-এ পরিণত হয়েছে, যেখানে খুব কম চাষীরই নিজের জমি আছে, যেখানে real property এবং national income অত অসমভাবে বিভক্ত, যেখানে ব্যবসা high finance-এর মুঠোর ভেতর, যেখানকার মজুরদল অত ভালো করে সঙ্ঘবদ্ধ, যেখানে

unemployed-এর সংখ্যা অত বেশি। তবু ইংলণ্ড **Marxism** হজম করলে, ঐতিহাসিক ও ভবিষ্যৎবক্তাকে অপমান করেই। তাই কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করতে নারাজ। কোথা থেকে যুদ্ধ বাধল, কোথা থেকে লেনিন এল, কোথা থেকে Czar-এর গোষ্ঠীর ওপর লোক চটে গেল, কোথা থেকে পুরাতন ইতিহাসের রেকর্ডের ওপর অনাগত অভাবনীয় অপূর্বের ছুঁচ পড়ল কে জানে? সে দেশে লোকের হাতে পিস্তল ছিল, প্রপীড়িত হলেও তারা স্ববশ ছিল, তাই কর্তাদের হাত থেকে রাজ্য জোর করে তারা নিজেরা কেড়ে নিলে। কমিউনিজমের প্রধান কথা— **revolutionary transference of power** মনে রাখবেন। এইখানেই ভিন্ন রূপের সোশ্যালিজমের সঙ্গে এর তফাত। আমাদের দেশে না আছে **industrialism**, না আছে **class-conscious proletariat**, না আছে টাকাকড়ির সম্পত্তির ঐ ধরনের অসম বিভাগ। আমাদের কৃষিকার্য চালায় **peasant-proprietors**-রা, তারা আবার গোঁড়া ধার্মিক। অবশ্য প্রত্যেক কারণটি আলাদা করে দেখলে কিছুই নয়, কিন্তু মবলগ দেখলে কারণগুলোকে গ্রাহ্য করতে হবে। আমাদের দেশের গ্রামে **co-operative spirit**-এর ধারা এখনও আছে লোকে বলে, পাঞ্জাবের ভাইচারা গ্রামের কথাও শুনেছি, কর্মীরা সঙ্ঘবদ্ধও হচ্ছে, দেশও গরীব, ইংলণ্ডও বিপদে পড়েছে, লোকেও উত্তেজিত হয়েছে— সব জানি, কিন্তু **revolutionary transference of power** কী করে সম্ভব? হাতে তো কিছুই নেই— সব নিধিরাম সর্দার! এ আপত্তিগুলো আমার আদত আপত্তি নয়। আদত আপত্তি হচ্ছে এই— মৈত্রীর নামে, সাম্যের নামে, স্বাধীনতার নামেও আমার **personality**-কে আমি বলি দিতে চাই না। জোর আমাদের দেশে পূর্ব-য়ুরোপের **Green Rising**-এর মতন একটা কিছু হতে পারে, বোধহয় তাই প্রথম হবে, কিন্তু তাকে রুশ ছাঁচের **communism** বলতেই পারেন না।

তাঁহারা: আমরা শুনেছি যে, রাশিয়ায় যে-অত্যাচার চলেছিল তার একান্ত প্রয়োজন ছিল। রাশিয়ার চারধারে শত্রু, এমন কী ওপরেও, ভেতরেও। পাদরী ও শিক্ষকসম্প্রদায় তো চিরকালই সনাতনের দেহরক্ষী! অতএব যে স্বাধীনতার বলি সেখানে হয়েছে, সেটি ঝুটো স্বাধীনতা, **vested interest**-এর স্বার্থসিদ্ধির সুবিধে মাত্র। মানুষ কিছু একলা একলা ফুটে ওঠে না, সমাজের মধ্যে বাস করতেই হবে তাকে, তারই মধ্যে থেকে তাকে ফুটে উঠতে হবে। সমাজের মধ্যে দিয়ে ফোটাই হলো আদত কথা। অ-সামাজিক ব্যক্তি পশুর সমান। যখন পুরাতন সমাজ-বন্ধন ভেঙে যায়—

যেমন বিপ্লবের সময়— তখন মানুষ পশু হয়ে যায়। পশুকে ভদ্র করতে কড়া চাবুক চাই।

আমি: লাখ কথার এককথা বলেছেন। ম্যাক্‌সিম্‌ গর্কিও বলেছেন যে সোভিয়েটতন্ত্রেই **personality**-র যথার্থ বিকাশ সম্ভব হয় ও হয়েছে। সমাজ না হলে চলে না। সভ্য, অসভ্য মেয়েরাও সাজ-গোজ করেন অন্য মেয়েদের চটাবার, কিংবা পুরুষের মন ভোলাবার, অর্থাৎ সমাজের জন্যে। কিন্তু কিছু রূপ, কিছু যৌবন থাকা চাই তো? তা' দিয়ে ডিম ফোটানো যায় মানি, কিন্তু ডিম যদি না থাকে তা হলে পণ্ডশ্রম হয় না কি? তা' দেওয়াও চাই, ডিমও চাই। ব্যক্তিও চাই, সমষ্টিও চাই। দু'এর কোনোটিকে বাদ দিলে চলবে না। সেই জন্যে খাঁটি ব্যক্তিতন্ত্র কিংবা খাঁটি সমষ্টিতন্ত্রের দোষ একই। একটি কারণকে একমাত্র কারণ বিবেচনা করা হচ্ছে বুদ্ধির ভট্টপল্লী মার্কা সতীত্ব।

তাঁহারা: কর্মক্ষেত্রে নামলে অবশ্য একটি কারণের দিকে ঝোঁক দিতে হয়, যেমন আমরা দিচ্ছি। সেটা খানিকটা প্রতিক্রিয়ার জন্যে। আমরা সকলেই জানি যে প্রত্যেক কাজের, প্রত্যেক বিষয়ের, প্রত্যেক সমস্যার দু'টো দিক আছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নামতে গেলেই চোখে ঠুলি পরতে হয়, কেন না শক্তির অপচয় হতে দেওয়া বোকামি। ব্যবহারিক জগতে মানুষের শক্তিকে একটা **constant quantity** ভাবতে আমরা বাধ্য।

আমি: একটু একপেশে, একটু একগুঁয়ে হতে হয় মানি— না হলে কাজ করা যায় না, ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়া যায়। এইখানেই বোধহয় চিন্তার সঙ্গে কর্মের ধর্মগত পার্থক্য। চোখ খুলে দেখলেই টের পাবেন যে চিন্তা-বীররা তাঁদের কর্মবীর শিষ্যবৃন্দের অপেক্ষা সমদর্শী ও সর্বদর্শী। খ্রীস্ট ঝোঁক দিলেন ওপারের দিকে, সেই সঙ্গে বললেন, সীজারের প্রতি কর্তব্য কোরো, সেণ্ট পল ও পোপের দল সব উলটে দিলেন, এপারের অর্থ, কাম সব অবহেলিত হলো। কার্ল মার্কস্‌ ঝোঁক দিলেন অর্থের ওপর, কিন্তু সেই সঙ্গে বলে রাখলেন— 'আমার তর্কপদ্ধতিটা হচ্ছে হেগেলের, 'অতএব হে **classical economist**-এর দল, সামাজিক ইতিহাসের তোমাদেরই ব্যাখ্যানুসারে যে অভিব্যক্তি হয়েছে তারই মধ্যে তার ধ্বংসের বীজ লুকিয়ে আছে, তাই তো আমাকে **dialectic** তর্কপদ্ধতির খাতিরে ইতিহাসের ইকনমিক্‌ ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে, **labour theory of value** গ্রহণ করতে হয়েছে, যদিও তার গলদ কোথায় জানি, যদিও মনে করি যে সে ব্যাখ্যার সঙ্গে ধর্ম ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যা মেলালেই ভালো হয়।' তারপর আর সময়

হলো না। সমাজ বদলাতে লাগল, কার্ল মার্কস্‌ না খেতে পেয়ে গেলেন মারা। মহাত্মাজীকে আমি চিন্তাবীর বলি না, তবু মহাত্মাজীর উপদেশেরই কতটুকুই বা আমরা গ্রহণ করেছি ?

তাঁহারা : মহাত্মাদের কথা ছেড়ে দিন। বৈজ্ঞানিকরা কী করেন ?

আমি : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে সাধারণের মনোভাব নিয়ে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে একটি কারণকে স্থিত করে অন্য কার্যকে, সুবিধার জন্যে, উক্ত কারণের **function thereof** ভাবা যায়, ভাবতে হয়। কিন্তু এইখানেই কার্যকারণ-সম্বন্ধ শেষ হয় না। তারপর প্রত্যেক কার্যটিকে কারণ ভেবে বাকি কার্যকে **functions thereof** ভাবলেই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয়। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসারে, ব্যক্তিকে ধরে সামাজিক আচার-ব্যবহার বোঝাও যা, আর সমাজকে ধরে ব্যক্তিকে বোঝাও তাই। প্রথমে যাকে হোক ধরলেই হলো, শেষে কিন্তু সব কার্য-কারণকেই পরস্পরের দ্বারা বোঝানো চাই। জীবন কিন্তু কতটুকু ! তাই মানুষ খাটতে চায় না।

তাঁহারা : আচ্ছা, ব্যক্তিতন্ত্রের ও সমাজতন্ত্রের দোষগুলো বাদ দিয়ে, শুধু তাদের গুণগুলো নিয়ে সমাজ গড়া চলে না কি ?

আমি : সে কী মশাই ! এতক্ষণ কী বলছি ! মনের কথা ধরতেই পারলেন না ? ও দুটো হচ্ছে তন্ত্র, বাদ, মত,— **ism** মাত্র। মানুষেরই দোষগুণ থাকে। যখন কোনো মতকে মানবগঠিত সমাজে খাটানো হয়, তখনই সে মতে দোষগুণ বর্তায়। নচেৎ মতের আবার দোষগুণ কী ? তবে দোষটি বাদ দিয়ে গুণটি নিয়ে আমরা ক্লাসে এবং কেতাবে নতুন আদর্শ-সমাজের পত্তন করি বটে ! না হলে আমাদের মোটরগাড়ি জোটে না। বেঁচে থাক সোনা বাঁধানো মধ্যপথ, তারই ওপর দিয়ে মোটর চালাই। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই, কোন্‌ পরীক্ষকের কী খেয়াল জানা নেই, ছেলেরাও জানে না, অথচ নতুন কিছু খাড়া করা চাই। একটি বিশিষ্ট মতের ওপর জোর দেওয়া, তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা, তার সংক্রান্ত সব বই পড়া হচ্ছে নিতান্তই মামুলি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। আগেকার অধ্যাপকেরা তাই করতেন, কেউ ছিলেন মিলের গোঁড়া, কেউ কোম্‌তের, কেউ হ্যামিল্‌টনের। নতুন ঢেউ-এ গোঁড়ামি চলে গিয়েছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ হতে বলছে। কী করা যায় ? ছেলেরা ফেল করলে, নতুন সমাজ না গড়লে চাকরি যাবে না বটে, কিন্তু বদনাম হবে, বেশি ছেলে আমার বিষয়টি নির্বাচন করবে না। তাই মধ্যপথ ! স্যাড্‌লার রিপোর্টের আশীর্বাদে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় জন্মেছে তার সুফল,

কুফল আপনাদের অবিদিত নেই। নিজের ঢাক নিজেকেই পিটুতে হচ্ছে, এক-একটি ডিপার্টমেণ্ট অন্যের সতীন বললেও অত্যুক্তি হয় না! দুঃখের কথা ছেড়ে দিন! তাই যখন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরি তখনই মানুষ হই। যখন মানুষ হই, তখন একলা একলা অনেক কথা ভাবি!

তাঁহারা: কী ভাবেন জানতে পারি কি?

আমি: সে অতি গোপন কথা। অনেক কেতাবেই লেখা আছে, আমি যা বলতে পারব তার চেয়ে ভাল করেই বলা আছে। নিজেও লিখেছি একটা কেতাবে। দেখুন, সকলেই ব্যক্তি বলতে ভেতরের বস্তু, সমাজ বলতে বাইরের বস্তু বোঝেন। এই তথাকথিত ভেতর ও বাইরের মধ্যে, বাইরে, পেছনে, সামনে, ওপরে, নিচে একটা **continuum** ওতপ্রোত হয়ে আছে, যেটি ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে **concrete,** কিন্তু যার স্বভাব হচ্ছে **universal**— বুঝলেন কি না জানি না। যতদিন না বুঝবেন ততদিন স্বরাজ-সাধনার কোনো অর্থ নেই। **Continuum**-কে বৈজ্ঞানিক ভাবে ধরবেন না। বিজ্ঞানের সব রেখাই বিচ্ছিন্ন। পদার্থ-বিজ্ঞানের ঘটনা, আর মানসিক ঘটনা এক জাতের নয়, শেষের ঘটনা পূর্বোক্ত ঘটনার তুলনায় অবিচ্ছিন্ন। সে অনেক কথা! এই **continuum**-কেই **personality** বলা হয়। স্বরাজ-সাধনা মানে একে ব্যক্ত করা, ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়া, অর্থাৎ প্রত্যেকের মুখশ্রী ফুটিয়ে তোলা। যদি আপনাদের মতে কিংবা উপায়ে স্বরাজ পেলে এর কোনো সুবিধে হয়, তবেই সে মত ও উপায়ের মূল্য আছে। নচেৎ ইংরেজের অধীনে নেহাৎ মন্দ নেই।

তাঁহারা: মানুষ হয়ে এই কথা ভাবেন না কি? আচ্ছা, কী করে **personality** স্বাধীন ভারতে ফুটে উঠবে?

আমি: তা জানি না। যে উপায়ে সাধন করবেন তারই ওপর খানিকটা নির্ভর করে না কি? তবে এ কথাও ঠিক যে স্বাধীন ভারতে, অভিজাত-সম্প্রদায়ের, না জনসাধারণের প্রভুত্ব, ধনীর না শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রভুত্ব চলবে— এই সব ভেবে-চিন্তে, অঙ্ক কষে যদি স্বরাজ সাধনা শুরু করেন, তা হলে আপনাদের ইচ্ছা হয়তো ফলবতী হবে, কিন্তু আপনাদের মুখশ্রী ফুটবে না। যদি এই মনে করে কাজ করেন যে, একটা বড় গোছের নির্দোষ **system** গড়ে তুলবেন যেটি আপনাদের ঐতিহ্যের কাঠামোর ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে কিংবা পশ্চিমী-সভ্যতার অনুকৃতি হবে, তা হলে কিছুতেই **personality**-র সুবিধে হবে না। বলা বাহুল্য, আমার কোনো বিশেষ **system**-এর বিপক্ষে আপত্তি নেই— কেন না বুদ্ধি দিয়ে ইমারত

খাড়া করাই আমার পেশা। তবে কী জানেন, **What are the merits and demerits of unitary and federal governments** ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষকরাই করে থাকেন, পরীক্ষার্থীরাই উত্তর দেন। পরীক্ষক-পরীক্ষার্থীর সম্বন্ধটি অমানুষিক সম্বন্ধ। মণ্টেগু রিপোর্টের ওপর কবি গোটাকয়েক মন্তব্য করেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল যে, এই রিপোর্টের ফলে সমগ্র ইংরেজ-জাতি হলো পরীক্ষক এবং সমগ্র ভারতবাসী হলো পরীক্ষার্থী, পরীক্ষা হবে দশ বছর পর, অতএব এর মতন অপমানসূচক সম্বন্ধ মানুষের পক্ষে দুটি নেই। আজ আপনাদের নেতারা সকলে কবির কথাই কপচাচ্ছেন। আপনাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আরও মধুর— তাই, কী করে, কোন্ বিশিষ্ট উপায় গ্রহণ করলে মুখশ্রী ফুটে উঠবে, এ সব ছেলে-ঠকানো প্রশ্নের কোনো জবাব দেব না। দেখুন, প্রশ্ন করা আমাদেরই অভ্যাস, জবাব দেওয়া নয়। তা ছাড়া আপনারা মানুষ, আপনাদের মনুষ্যত্বকে অপমান করতে চাই না। অবশ্য আগে থাকতে ভেবে, অঙ্ক কষে ভবিষ্যৎ গতি নিরূপণ করা বুদ্ধির বিজ্ঞান-সম্মত কাজ বটে, কেননা বিজ্ঞানের একটি কাজই ভবিষ্যদ্বাণী করা। কিন্তু সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কারা বই লেখেন? যাঁদের টাকার দরকার এবং যাঁরা বৈজ্ঞানিক নন— যেমন **Lord Birkenhead**। কিন্তু আমরা স্কলার, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ! আমাদের চারণভূমি অতীত, আমাদের রোমন্থন একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জোর বলা যায়— এতদিন সমাজ এমনিভাবে চলে এসেছে, নতুন ঘটনা ঘটছে না— অতএব আশা করা যায় যে, আরও কয়েকদিন এমনিভাবে সমাজ চলবে। বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে, বর্তমানকালে, এক আশা করা ছাড়া সামাজিক ভবিষ্যতের জন্যে অন্য কিছু কাজ করতে পারেন না— অবশ্য অবৈজ্ঞানিক উপায়ে পারেন বটে।

তাঁহারা: আমাদের স্মরণ হয় যে, আপনি একদিন বলেছিলেন 'বুদ্ধিকে খাটানোই সভ্যতার প্রধান কাজ।'

আমি: উলটো কথা বলা আমার অভ্যাস। অনেক সময় ডিগ্‌বাজি খেয়ে পৃথিবীকে দেখতে হয়। লোকে যখন মনে করে এবং বলে যে সে চিন্তা করেই কিছু করছে, তখন দেখি সে চিন্তা ভাবালুতারই নামান্তর, হয় কেবল **unconscious cerebration**, আর না হয় ধরতাই বুলি আওড়ানো। সব চিন্তার মধ্যেই ভাবের খাদ মেশানো থাকবে, ভাবের রীতিই হলো **suffuse** করা— কিন্তু শুদ্ধচিন্তার মধ্যে অবচেতনা কিংবা ভাবপ্রবৃত্তির স্থান সংকীর্ণ, তাড়না সংযত— নেই বললেই হয়। খাঁটি চিন্তার জন্যে একটু

নিষ্কাম হওয়া দরকার— যেমন পাঁকাল মাছ! কাদার মধ্যেও একটু আলাদা থাকতে হয়। কবিদের তো ভাবপ্রবণ বলেন আপনারা— কিন্তু খাঁটি কবি কতখানি আলাদা থাকেন দেখলে তাঁকে নিষ্ঠুর বলবেন। 'জয় মা' বলে কর্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়লে জীবনকে আর্ট হিসেবে দেখা যায় না। মহাত্মাজী সোমবার কথা কন না, মধ্যে মধ্যে জেলে যান বলে তিনি নেতাদের মধ্যে একজন ভাল আর্টিস্ট। আমি যে ঝুলে পড়ি নি তার কারণ অবশ্য আমি শুদ্ধভাবে চিন্তা করি তা নয়। আমার দোষ হলো— ভয়, অক্ষমতা, অধৈর্য, রাগ।

তাঁহারা : তা হলে চিন্তা না করাই ভালো?

আমি : তা নয়। চিন্তা না করে বাঁচাই যায় না। তবে কিছু আগে থাকতে চিন্তা করাই ভালো। কিন্তু মাথা গজাবার আগেই মাথার ব্যথা হচ্ছে যে আপনাদের! চিন্তার কাজ elaboration of a topic। কোনো বিষয়, কী ঘটনা ঘনীভূত হয়ে topic হবার পূর্বেই তাকে বিশদ করা যায় না, কেননা চোর পালাবার পরই চিন্তার ক্রীড়া সম্ভব, যথা পুলিশ ও ঐতিহাসিক। আমরা কেউই পুলিশের চেয়ে বুদ্ধিমান নই। যদি হই, তবে কাজের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা চলা চাই, এবং সেজন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয়, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া কিংবা খেলোয়াড়ের মতন। অর্থাৎ কিনা, আলোচনার দ্বারা মস্তিষ্ক পরিষ্কার রাখতে হবে, কর্মের ধারা ইচ্ছাশক্তিকে উন্মুখ, সজাগ, সবল রাখতে হবে, কল্পনাকে সদভ্যাসের দ্বারা তীক্ষ্ণ রাখতে হবে। এই হলো আমার মতে বুদ্ধিজীবীর একমাত্র স্বরাজ-সাধনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে সজাগ হয়ে থাকলে বাকি সবই সম্ভব হয়, হয় না শুধু ইচ্ছাশক্তির বিকাশ, চরিত্রের গঠন।

তাঁহারা : কৈ আমরা তো কখনও শুনিনি যে দেশ স্বাধীন হচ্ছে, আর বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধিকে শুধু শানই দিচ্ছেন! সত্যি কথা বলুন না, আপনারা কাপুরুষ?

আমি : তা হলে মিল্‌টনও কাপুরুষ ছিলেন, Masaryk Padereweski-ও কাপুরুষ! মিল্‌টনের সে লাইনটা মনে আছে? They also serve who only stand and wait. অপেক্ষা করলেও সেবা করা যায়, তাতে মানুষ একেবারে অকর্মণ্য হয় না। যাঁর কর্তব্যজ্ঞান অত প্রবল ছিল, যিনি নিজেকে Taskmaster-এর সামনে সর্বদাই রাখতেন, তিনিও প্রথমে কবিতা লিখতেন। পরে, বিবাহ-জীবনের আস্বাদ পেয়ে, কিংবা দেশের দুরবস্থা দেখে কর্মস্রোতে ঝাঁপ দিলেন। কেরানিগিরি, pamphleteering সবই

তাঁকে করতে হয়েছিল। আপনারা বলবেন শুধুই দেশের ডাক— আমি বলব, একধারে দেশের প্রতি কর্তব্যজ্ঞান, অন্যধারে ঘরের বিকর্ষণ, একেবারে নিউটনের তৃতীয় নিয়ম! শেষে আবার সেই কবিতা, এমন কি অন্ধ হ'য়েও। তবে হাত আর জমল না। এ যুগের **Padereweski** পিয়ানো বাজাতেন, পরে প্রেসিডেন্ট হলেন, শেষে আবার পিয়ানোর ডালা খুললেন, তাঁরও হাত আর জমল না। উইল্‌সন, ম্যাসারিক্‌, বেনেস্‌ অধ্যাপক ছিলেন। এঁদের গার্হস্থ্য-জীবনের ইতিহাস আমার জানা নেই। এ সব ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্য বুঝলেন? তাৎপর্য হলো— দেশের ডাক কবে আসবে তাই শোনবার জন্যে সব ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করার দরকার নেই; গোড়া থেকেই, সাহিত্য, সঙ্গীত, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি বাজে কাজ বন্ধ করা অন্যায়; বরঞ্চ ঐ সব বাজে কাজ করে মস্তিষ্ক, হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তি তৈরি রাখাই বুদ্ধিমান দেশ-সেবকের একান্ত কর্তব্য। দেশের কাজ এল, ডাক এল, সেই তৈরি মাথা, হৃদয়, ইচ্ছাশক্তিকে দেশের কাজে লাগানো গেল। দেশের কাজ বন্ধ হলো, কিংবা সাধনা অন্য ধারায় প্রবাহিত হলো, নিজেকে সরিয়ে নিলাম, নিজের কাজের জন্যে। নিজের **personality**-কে ক্ষুণ্ণ হতে না দেওয়াই পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার যথার্থ তাৎপর্য।

তাঁহারা: আর তাৎপর্য শুনে কী হবে? সবই তো আপনার ব্যাখ্যা!

আমি: আমার ছাড়া নোট্‌মেকারের হবে নাকি? তাৎপর্যের অর্থ সরলভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি— তাৎপর্য হচ্ছে **always in relation to my personality, which is unique and concrete with reference to my individuality, and universal with reference to the potentiality of my creative impulse or self, working itself through and out of the given environment, physical, mental and social,**— এইবার বুঝলেন তো?

তাঁহারা: জলের মতন! ইংরেজের অধীনে থাকার সঙ্গে এ সব মন্তব্যের কতটুকু কুটুম্বিতা?

আমি: ভাষার কুটুম্বিতা, ভাবের নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে— ইংরেজ রাজার অধীনে আমার জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য মোটেই ফুটছে না। এক কথায়, আমার মূল্যজ্ঞানের ব্যাস বেঁকে গিয়েছে, যেমন পৃথিবীর অক্ষ ও ব্যাস বেঁকে গিয়েছিল আদম-ঈভের পাপে। ইংরেজ রাজার অধীনে, বর্তমানে, আমাদের জীবনের একমাত্র মূল্য— আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সিদ্ধি ও

সার্থকতা। দিব্যি খাবদাব, আপনাদেরও মাঝে মাঝে, বক্তৃতা শোনাবার পর, খাওয়াব দাওয়াব, মোটর চড়ব, স্ত্রীকে উপহার দেব, আপনাদের স্ত্রীরা যদি হত-কুৎসিত না হন, কিংবা চায়ের নিমন্ত্রণ করে আমাকে গান কী এস্রাজ বাজানো না শোনান, কবিতা ও গল্প না লেখেন তা হলে তাঁদেরও গোপনে উপহার দেব, ছেলে-জামাই, ভাই-ভাইপো, আত্মীয়-স্বজন সব বড়লোক হবে, বড় চাকরি করে দেব কিংবা করবে— এই আমরা চাই। অতএব এখন কর্তব্য হচ্ছে মূল্যজ্ঞানকে সোজা ঋজু করা। তার ফলে টাকা কমবে না, টাকার সদ্ব্যবহারই হবে।

তাঁহারা : ঠিক ঐ জন্যেই মনের কুড়েমি ও ভয় ভাঙতে হবে, পর-নির্ভরশীলতা ভাঙতে হবে, কাপুরুষতা ঘোচাতে হবে। আমরা জেলে গিয়ে ঐসব দুর্বলতা ভাঙব।

আমি : বহুৎ আচ্ছা! কিন্তু আমি জেলে যেতে পারব না। আপনারা শুধু নেতির দিকেই দেখছেন। আমি একটু ইতিবাদী, কথার বেলা নয় অবশ্য।

তাঁহারা : নেতি-ইতির মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই।

আমি : ব্যবধান নিশ্চয়ই আছে। সে ব্যবধানকে **no-man's land** বলবেন না— কেন না সেই স্থানটিই প্রকৃত **base of operations**। সেই-খানেই সিদ্ধান্ত সব আটকে রয়েছে, যাকে **suspended belief** কিংবা **judgement** বলতে পারেন— দানা বেঁধে মিছরি হচ্ছে না। এইখানেই শুদ্ধসত্তা ও শুদ্ধচিন্তা সম্ভব, একমাত্র যার দ্বারা স্বদেশী লোক স্বাধীন হবে, পরের মুখোশ খসে যাবে, নিজের মুখশ্রী ফুটে উঠবে।

তাঁহারা : ঐ **no-man's land**-য়েই তো সৈনিকরা মুখোশ পরত!

আমি : না, এইখানেই গোরা তার প্রকৃত পশুস্বভাব দেখাত, সভ্যতার মুখোশ খুলত।

তাঁহারা : সে যাই হোক, শুদ্ধসত্তা অর্জন ও শুদ্ধচিন্তা করার উপদেশ আপনার মুখে শোভা পায় না। আপনার ভাবগুলো বড়ই এলোমেলো, আপনার সত্তার মধ্যে সত্বগুণের নিতান্ত অভাব। আপনার মধ্যে আছে তমোগুণ ও রজোগুণ কয়েকটা, যাদেরকে আমরা অহংকার বলি।

আমি : বাঙলা মাসিক-সাহিত্যের জন্যে কিছু রেখে দিন! 'বোঝে প্রাণ আছে যার।' ধনুকের জ্যা হয়ে থাকুন, টঙ্ করে বাজুন, শিকার পেলেই, অনুকূল হাওয়া বইলেই, বাঁই করে ছুটে যাবেন। তবে ঋষি-বালকদিগকে মারবেন না, এইটুকু দেখবেন। কেন না আত্মশক্তির অপচয়

শুধু পাপ নয়, মস্ত গোস্তাকি।

তাঁহারা : আপনার কথামৃত পান করে আমরা কৃতকৃতার্থ হলাম, অনেক শক্তি সঞ্চিত হলো। কিন্তু প্রশ্নের জবাব পেলাম না।

আমি : 'বিশ্বাসে মিলিবে উত্তর, তর্কে বহুদূর।'

তাঁহারা : কোন্ বৈজ্ঞানিকের উক্তি ?

আমি : একা অলিভার লজের নয়। দেখুন, সকলের সঙ্গে আমি কথোপকথন ঠিক পারি না। আমি কইব উপকথা, আর আপনারা কইবেন কথা, এ কর্মবিভাগের বন্দোবস্তে আমি রাজি নই। আপনাদের সঙ্গে আমি পারি কথকতা করতে। দেশোদ্ধার জ্যামিতির problem নয় যে, Q. E. D. লিখে সমাপ্ত করব।

তাঁহারা : এবার নিজের কথা আরম্ভ করেছেন, উঠি।

আমি : গোড়াতেই বলেছি প্রত্যেকে নিজ নিজ হোন। আপনারা নিজের মতো হতে পারলেন না, তাই তো আমাকে নিজের কথা কইতে হচ্ছে। Thought is repressed action জানেন তো ? আর নিজের কথা কইব না তো পরের ধার-করা ধরতাই বুলি আওড়াব না কি ? আপনারা তো ছাত্র নন।

তাঁহারা : তবু যদি নিজের কথা হতো !

আমি : ঐ যাঃ, সব জুয়োচুরি ধরে ফেললেন ! আমার মুখোশ খোলালেন ! আজ তা হলে নমস্কার ! কাল যদি পদধূলি দেন !

তাঁহারা : আবার !

ষষ্ঠ স্তবক : বিপ্লবের কথা (১)

মধ্যে কয়েক বৎসর কংগ্রেস সরকারের চাকরি করলাম। তাকে অবশ্য ঠিক চাকরি বলে না, তবে কিনা বাঙালী, তাই কথাটা কলমের মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে গেল। আমার কাছে ঐ তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার মূল্য আধ্যাত্মিক। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কর্মের স্পৃহা সুপ্ত থাকে, এবং যারা সুযোগ পেল তাকে জাগাতে তারা গেল বেঁচে। মাস্টারদের ঐ বিপদ, তাঁদের কপালে সুযোগ জোটে না। অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, দুটোই নিবৃত্তি-

মার্গের অভ্যাস, সেই জন্মে তাঁদের কর্মপ্রবৃত্তিটা ফুটে ওঠে ছাত্র ও স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে ব্যবহারে। এমন মাস্টার দেখি নি যিনি ক্লাশে ও বাড়িতে ডিক্‌টেটার নন— একমাত্র যাঁর গৃহিণী ডিক্‌টেটার তিনি ছাড়া। তাই স্বভাবের ভারসাম্য খুঁজে পেলাম যখন হাতে যৎসামান্য হলেও প্রকৃত কর্তৃত্ব এল।

ব্যক্তিগত দায়িত্বজ্ঞান মিশেছিল স্বাধীনতার প্রথম আস্বাদের সঙ্গে। সে মিশ্রণের তুলনা নেই। তার মোহে নবাব হয় পরিশ্রমী, বোকা হয় বুদ্ধিমান, মেয়েলি মানুষ হয় পুরুষ, কোলকুঁজো দাঁড়ায় খাড়া হয়ে, কাঁধের পেশী মাথাটাকে তুলে ধরে, আর মুমূর্ষুর চোখে আসে দীপ্তি। খানিকটা প্রথম যৌবনে প্রেমে পড়ার মতো। আফশোষ এই, বাঙলা দেশে জনসাধারণের মধ্যে এ অবস্থা আসে নি। এই অব্যক্ত আনন্দের আভাস যখন তারা পাবে তখন যে-সাহিত্য, যে-সঙ্গীত, যে-চিত্র তারা রচনা করবে তার তুলনায় গত এক-শ বছরের গড়পড়তা কৃতিত্বটা ছেলেমানুষি ঠেকবে। আমার একান্ত বিশ্বাস যে ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষে বহু মহামান্য ব্যক্তি জন্মালেও ঐ স্বাধীনতার আস্বাদের অভাবে তাঁদের প্রতিভার যথোচিত স্ফূরণ হয় নি। কল্পিত স্বাধীনতা দিয়ে কতটাই বা সম্ভব? দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? সেই কারণেই আবার আমাদের অনেক মহারথী এমন সব প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন যেখানে তাঁরাই সর্বেসর্বা, তাঁদের ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাটাও অর্ডিন্যানস্। আমাদের যুগেই তার দৃষ্টান্ত একাধিক— রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও আশুবাবু যাঁর আশ্রম ছিল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁদের একাধিপত্য স্বভাবের তাগিদে নয়, স্বাধীনতারই অভাবে। আমি মজ্জায় মজ্জায় কথাটা বুঝলাম গত কয়েক বৎসরে। ষাট টাকা মাইনের কেরানি সুবিধে ও সাহস পেলে যোগ্যতার সঙ্গেই বড় অফিসারের কাজ করতে পারে। কংগ্রেসের চাকরি করে মানুষের ওপর আমার বিশ্বাস এসেছে। পোড়া বাঙলাদেশ কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই রইল। কবে তার ভাগ্য ফিরবে কে জানে! একটা আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন সেখানে, কেবল মন্ত্রিচক্রের ওলটপালটে চলবে না। প্রায় পঁচিশ বৎসর প্রবাসে কাটালাম, তবু যেন বাঙলার কথা ভুলেও ভুলতে পারি না। বেঙ্গলি ক্লাবে দুর্গাপূজার দিনগুলোতে বহু বাঙালীর সমাগম হয়, কিন্তু ঠাকুরের সামনে যেতে আর ভালো লাগে না। গত বৎসর বিজয়া-সম্মিলনীতে যাই একবার। পুরাতন বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নেওয়া গেল। ছুটিছাটার দিন আজকাল তাদের সঙ্গে দেখা হয়। বোধহয় আড়ষ্টতা একটু ভেঙেছে। গত রবিবার সন্ধ্যার সময় তাঁরা এসেছিলেন,

নানা কথাবার্তা চলেছিল। কফিটা মন্দ হয় নি।

তাঁহারা : ঘুম নষ্ট হয় না অত কফি খেলে ?

আমি : অত কোথায় দেখলেন ? য়ুনিভার্সিটির সবই প্রচুর মনে হয় আপনাদের কাছে, জানি। তলব, সম্মান, ছুটি, থাকবার আরাম, সবই আমাদের বেশি, কফিও খাই বেশি। পেয়ালা বড় অবশ্য। কিন্তু বৃহৎ সংস্করণে আপত্তি থাকা উচিত নয় আপনাদের মতন দেশপ্রেমিকের পক্ষে। ভারতবর্ষে সবই বৃহৎ ; ভূমার রাজত্বে অল্পে সুখ নেই ; উপনিষদ থেকে পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মাঠ, ইতিহাস, পোকামাকড়, মায় সাপ পর্যন্ত। আমি পাঁচহাত গোখরো দেখেছি।

তাঁহারা : কিন্তু অন্নের বেলা ? অত কমে মানুষ বাঁচে ?

আমি : আরেকটি বৃহৎ সভ্যতাকে বাদ দিন। চীনদেশে ঘাস খেয়ে বহুলোক বেঁচে আসছে। কিন্তু কম ভাতই বা ভাবছেন কেন ? কতদিন ধরে দেশ কম ভাতে চালাচ্ছে দেখুন না ! মুঠো কম, দম কচ্ছপের। ভূমা, ভূমা, ভূমা, তাই স্বাধীনতা আসতে প্রায় শতখানেক বছর লাগল, সেই সন সাতাওয়ান আর আজ ছেচাল্লিশ ! ব্রহ্মার মুহূর্ত। বুড়ি ঠাকুমা শ্বাসই টানতে লাগলেন তিন দিন ধরে। ওধারে মহেঞ্জদারো, হারাপ্পা ইতিহাসকে টেনে ফেললে তিনচার হাজার বছরের ওধারে। তাতেও আমরা অনেকে আবার খুশী নই। লক্ষ শ্লোকের মহাকাব্য আমাদের, দেবীদের আবার এক-এক ডজন মূর্তি, এক-একটির হাতই বা কতো, সেনা অক্ষৌহিণী, হাতি লক্ষ-লক্ষ, রাজা, মহারাজা, মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক ! মেয়েদের গয়না সংখ্যাতীত, চুল পড়ে তো পড়ে গোড়ালিতে, আর নিতম্ব, বক্ষ সব যক্ষিণীর, মানুষের নয়, মশাই। এটা বলবেন অনার্য সভ্যতার দান ? বেশ, আমাদের সংস্কৃতির কোন্ অংশটা আর্য ? সংস্কৃত সাহিত্য ? এক মৃচ্ছকটিক, কিংবা ঐ রকম দু'একটা প্রাকৃত-ঘেঁষা বই ছাড়া কোন্ কেতাবে অতিশয়োক্তি নেই ? আমাদের সবই সাতিশয়— বক্তৃতা, কফির পেয়ালাটাও।

তাঁহারা : দেশও মহাদেশ।

আমি : সাধারণ মৃত্যুহারও মহামারীর।

তাঁহারা : তা বটে। এই সেদিন ঐ কাণ্ড হলো বাংলা দেশে ! কত, মশাই ?

আমি : কেউ বলে পনের লাখ, কেউ বলে ত্রিশ লাখ। কিন্তু আমি বলি এমন কী বাহাদুরি ? দেশে অনেকবার দুর্ভিক্ষ এসেছে, লোক মরেছে,

জন্মেছেও আবার। গড়পড়তা বেড়েই চলেছে। কিন্তু মহামারীর কথা তুলবেন না, ঘুম হয় না।

তাঁহারা : তাই শুনছিলাম বটে। 'মাগো মাগো' কান্না যার কানে গেছে তার পক্ষে ঘুমোনো শক্ত, আমার কলকাতার শালাজ বলছিলেন।

আমি : সে আওয়াজ আমি শুনি নি।

তাঁহারা : তবু ঘুম হয় না, নিশ্চয়ই কফি।

আমি : আরে কফি নয়, কফি নয়। আমার ঘুম হয় না দুর্ভিক্ষের কবিতা, গল্প, নভেল পড়ে আর তার ছবি দেখে।

তাঁহারা : আপনি অত্যন্ত **sensitive !**

আমি : তা একটু বটে ; কিন্তু থাকতে দিলে কোথায় ? শিরা উপ-শিরার ওপর অমন উপর্যুপরি আঘাত পড়লে আর কী বাঁচব ?

তাঁহারা : যাই বলুন না কেন, আমারা একটা মস্ত সুযোগ হারিয়েছি।

আমি : তাও এমন আর নতুন কী ? কিন্তু ক্রীপ্‌স্‌ অফার-এ গলদ ছিল অনেক। লোকটা বড় ধূর্ত, কেবল খাঁটি জল আর ফলমূল খায়, অথচ মস্ত ব্যারিস্টার ! আরে ব্যারিস্টারের কী অন্ন পেয়, অন্য খাদ্য নেই ! আমাদের ব্যবহারজীবীদের দৃষ্টান্ত…

তাঁহারা : ক্রীপ্‌স্‌ অফার নয়। এই বলছিলাম কী, ঐ দুর্ভিক্ষের সময় ভীষণ রকমের, কিছু একটা…

আমি : জলপ্লাবন ? সেটা গোড়াতেই এসেছিল না ?

তাঁহারা : এই ধরুন, ওলটপালট গোছের, একটা প্রকাণ্ড আভ্যন্তরীণ…

আমি : ওঃ বিপ্লব…

তাঁহারা : যাই নাম দিন না কেন, একটা কিছু আমূল পরিবর্তন…

আমি : বিপ্লব কথাটা গলায় আটকাচ্ছে ? ইংরেজদেরও আটকায় অমন **independence** কথাটিতে, অতএব লজ্জা পাবেন না। আপনারা বলছেন দুর্ভিক্ষের সময় লোক ক্ষেপল না কেন ? কারণ সোজা, যাঁরা ক্ষেপাবেন তাঁরা ছিলেন জেলে ! অবশ্য খবর যে পাননি জেলে বসে তা ঠিক নয়। কিন্তু ত্রিশ লক্ষ লোকের জীবনের চেয়ে জাতীয় ইজ্জতের দাম অনেক বেশি। দেশ তখন নেতৃবিহীন। আমাদের দেশের ঐতিহ্যই এই, রাজহস্তীর ওপর যখনই রাজাকে সৈন্যেরা দেখতে পায় নি তখনই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভেগেছে।

তাঁহারা : কম্যুনিস্টরা তো তখন বাইরে ছিল।

আমি : তারা ছোকরার দল, নতুন কাজে নেমেছে, এই সেদিন পর্যন্ত

তারা ছিল লুকিয়ে। তবু চমৎকার কাজ করেছে মানতেই হবে। মরেছে হয়তো যত বাঁচিয়েছে তার প্রায় অর্ধেক। স্বেচ্ছাসেবীরা অবশ্য কম্যুনিস্ট ছিল না সকলে, কিন্তু কেন্দ্রে কম্যুনিস্টদের উৎসাহ, পরিশ্রম, সংযম না থাকলে চাকা ঘুরত না। বাঙালী হয়ে কম্যুনিস্ট পার্টিকে ঘৃণা করতে পারেন না, মশাই; কৃতঘ্ন লোকের কুষ্ঠ হয়। অবশ্য আরও দু'দশ লাখ গেলেই বা কী হতো কিংবা দেশের উপকার হতো যদি ভাবেন তো ভিন্ন কথা। তা হলে নিশ্চয় বাপান্ত করতে পারেন।

তাঁহারা: ছোঁড়াগুলো খাটতে পারে বটে, কিন্তু বিপ্লবী নয় মোটেই, নইলে অমন সুবিধে ছাড়ে!

আমি: আচ্ছা, একটা প্রশ্নের জবাব দিন। মড়া নিয়ে রেভলিউশন হয়? কখনও কোথাও হয়েছে জানেন?

তাঁহারা: কেন ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ান বিপ্লব?

আমি: ঘোড়ার ডিম জানেন! ফরাসী বিপ্লবের সূচনায় bread-riots হয় নি, সেগুলো হয় সূচনার পর, নিদর্শন হিসেবে। সেগুলো বোমা নয়, বারুদও নয়, মাত্র বিস্ফোরণ। জোর আওয়াজে নাবালকেরাই মজা পায়, যেমন কালীপুজোর রাতে আমরা সকলেই এককালে পেয়েছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীরও বয়স বেড়েছে। নয় কি? আরেকটি খবর দিচ্ছি, মাপ করবেন। রুটি নিয়ে দাঙ্গা শুরু হবার বছর দুই আগে পর্যন্ত ফরাসী সাধারণ লোক ভালো রুটিই খেত। আর রুশ বিপ্লবের গোড়ার কথা কি আটার মহার্ঘতা? কী জানেন, মানুষ বে-পরোয়া হয় ভালো খাবারের হঠাৎ কমতি হলে। যারা চিরটা কাল একমুঠো ভাতে দু'বেলা চালালে, হাত থেকে সে মুঠোটাও উবে গেলে তাদের চিত্তকে যে বস্তু অধিকার করে তাকে তুরীয় অবস্থা বলতে পারেন। দীর্ঘ উপবাসে ঝিমুনি আসে। মহাত্মাজীর এতগুলো অনশন-ব্রত দেখলেন, তবু এটুকু জানলেন না? বাঙলার বাইরে বহু অ-বাঙালীর মুখে শুনেছি, যে-ঘটনা বাঙলায় ঘটল সেটা বাঙলা ছাড়া অন্যত্র অসম্ভব হতো এ ধরনের কথায় আমার গা জলে ওঠে। ছ'হাত লম্বা পাঞ্জাবি আর সত্তর ইঞ্চি ভুঁড়িদার শেঠ্‌জীর মুখে দুর্ভিক্ষের নাম পর্যন্ত শোভা পায় না। তারা কী বুঝবে বাঙালীর দুঃখের কথা! বিপ্লব, বিপ্লব, বিপ্লব চাই! খাচ্ছেন ভালো, লুটছেন মজায় আর কপচাচ্ছেন রেভলিউশন। বিপ্লব বুঝি আকাশ থেকে ঝরে পড়বে আলোর ঝর্নাধারার মতন?

তাঁহারা: আকাশ থেকে কেন? অন্তর থেকে উৎসারিত হতে পারে

না? যদি বুকের ভেতরে জ্বলতে থাকে তবে সে-আগুন সবখানে ছড়িয়ে পড়বেই পড়বে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা প্রয়োগ করছি বলে হাসবেন না…

আমি: না, না, তা হাসব কেন? তাঁর ভাষায় যেমন মনের ভাব ব্যক্ত হতে পারে অমনটি আর কী দিয়ে সম্ভব বলুন?

তাঁহারা: তাই, আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে বিপ্লবী মনোভাব যদি বাঙলাদেশের মানুষের হৃদয়ে থাকত তবে লুটতরাজটা হতো অন্তত। তার খবর পাই নি।

আমি: আপনাদের একটি অঙ্গীকারও স্বীকার করি না। কোনোও মনস্তত্ত্ববিদ্, এমন কী ম্যাক্‌ডুগালের মতো পুরাতনপন্থীও, বিপ্লবী-মনোভাবের উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের রচনায় আছে অবশ্য, কিন্তু তাঁরা বিপ্লবকে রঙিন কাচের ভেতর দিয়ে দেখেছেন। হ্যাঁ, আর পেয়েছি বাকুনিনের জীবনে ও লেখায়। কিন্তু লোকটা কী রকম পাগল ছিল জানেন তো? একবার প্রচার করলেন যে মধ্য-য়ুরোপে একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবী দল তৈরি হয়েছে, সে-দল প্রত্যেক দেশের বিপ্লবীদের সাহায্য করবে দেশীয় রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার জন্যে। এই মর্মে লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠি বিলি হলো। সমিতির সভ্য কত ছিল জানেন? একজন— বাকুনিন নিজে। এই বাকুনিন জেলের ভেতর থেকে জারকে একটা চিঠি লিখেছিলেন ক্ষমা চেয়ে। চিঠিটা পড়বেন? আহমদ্‌নগরের কেল্লা থেকে যদি কেউ ঐ রকম হীন চিঠি প্রত্যাহার করে বড়লাটকে চিঠি পাঠাতেন তবে আপনারা তাঁর কী নাম দিতেন? অথচ এই বাকুনিনের মতামত আপনাদের পেয়ে বসেছে।

তাঁহারা: বাকুনিন কে ছিল জানি না, অথচ দেখুন তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের মিল! অতএব বিপ্লবী মনোভাব চিরন্তন।

আমি: যেটা চিরন্তন সেটা বুড়োখোকাপনা।

তাঁহারা: কিছুতেই মানতে পারব না যে বিপ্লবী মনোভাব বলে কোনো বস্তু নেই।

আমি: নাচার। একটু বোধহয় ভুল বোঝা হলো। বিপ্লবী মনোভাব জন্মায় বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে; এবং শীৎকার প্রভৃতি বৈষ্ণবী ভাব তার চিহ্ন নয়। ব্যাপারটা অত্যন্ত বাস্তব। অনেক ছোটখাট অপ্রিয়, কুৎসিত কাজ তাতে থাকে। আর থাকে আনুষ্ঠানিক সংযম, কর্মকুশলতা, অধ্যবসায়। তাতে মাথার ঘাম পায়ে ঝরে পড়বে, মাথায় চিরুনি-তেল পড়বে

না, স্ত্রী, পুত্র, সংসার, আদর্শ, খাবার, নিদ্রা, স্বাচ্ছন্দ্য জলাঞ্জলি যাবে, হাঁটতে হবে, ছুটতে হবে। আর সব চেয়ে প্রয়োজন কী জানেন?

তাঁহারা : জানি, পড়তে হবে বিস্তর।

আমি : অমন অট্টহাস্য না-ই করলেন।

তাঁহারা : না, অমনি হাসি পেল, রুখতে পারলাম না।

আমি : আপনাদের সবই সহজ, হাসি থেকে বিপ্লব পর্যন্ত! বাঙালী কিনা, তাই ধর্ম আপনাদের সহজিয়া। না, মশাই, গুরুগম্ভীরভাবেই বলছি, ভীষণ পড়তে হবে। এককালে হয়তো না পড়ে, না ভেবে বিপ্লব হতো, কিন্তু মূর্খতার সাহায্যে আজকালকার শক্তিশালী রাষ্ট্র ও সে-রাষ্ট্রের প্রভু ধনিক-সম্প্রদায়কে টলানো যায় একথা মার্কস্-লেনিনের পর বলা দুঃসাহসেরই পরিচয়, বুদ্ধির নয়। হয়তো মার্কস্-এর মতন বৎসরের পর বৎসর প্রতিদিন দশ-বার ঘণ্টা ব্রিটিশ মিউজিয়মে পড়বার দরকার নেই; এঙ্গেলস্-এর মতো সর্বগ্রাসী জ্ঞানপিপাসাও সকলের থাকে না; আবার লেনিনের মতো অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তির চর্চা করাও সকলের ধাতে আসে না। কিন্তু তাঁদের রচনাগুলোও তো দেখতে হবে। প্রত্যেক দেশেই বিপ্লব এসেছে, এবং তার বর্ণনা আছে, ইতিহাস আছে। সেগুলো দেখলেই বুঝবেন যে জীবজগতে যেমন জন্ম, মৃত্যু, উন্নতি, অবনতি, ক্রমবিকাশ এক-একটি ঘটনা, যার গঠন আছে, গতি, বৃদ্ধি, হ্রাস আছে, নিয়ম আছে, তেমনই সমাজ-জীবনেও আছে সংস্থান, রক্ষণ, সৃষ্টি ও ধ্বংস। যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। কখনও ব্রহ্মার রাজত্ব, কখনও বিষ্ণুর, আবার কখনও দেবাদিদেবের। চাইছেন শৈব হতে, অথচ শিবমন্ত্র জানেন না, শিখবেনও না। তুলসীপাতায় আধুনিক আশুতোষও ভোলেন না; তাঁর রুচি বদলেছে। শিবের একটা তন্ত্র আছে, দর্শন আছে, তাঁর পূজোর একটা অনুষ্ঠান আছে। ভাবুন আফিসের সাহেবকে সন্তুষ্ট করতে কত সূক্ষ্ম আরাধনার প্রয়োজন, আর তাকে তাড়াবেন ফুৎকারে? ফুৎকার যত বড় হৃদয় থেকেই উদ্বেলিত হোক না কেন, সেটা ফুৎকারই, দম ফুরোলেই গেল। বিপ্লব-সাধনা হাতুড়ে বিদ্যে নয়, মশাই। ধরুন আপনারা ডাক্তার, আপনাদের রোগীরা ওষুধ খাব না বলে ধর্মঘট করলে, সমবেত হয়ে প্রস্তাব আনলে, স্ব-ইচ্ছায়, প্রাণ-ধর্মের জোরে বাঁচব, অতএব ডাক্তারী বিদ্যের কোনোও প্রয়োজন নেই। আপনারা রোগীদের তখন কী বলবেন?

তাঁহারা : এম. বি. পাশ করতে বলব না।

আমি : নিশ্চয় নয়, নিজেদের অন্ন নিজেরা মারবেন না অবশ্য। তবে

যৎসামান্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান জানা, ডাক্তারের আদেশ মানা, এবং একটু ডাক্তারি বিদ্যায় বিশ্বাস, এগুলো থাকলে দেহের কষ্ট লাঘব হতে পারে এবং একটু তাড়াতাড়িও সারা সম্ভব, এই ধরনের উপদেশ নিশ্চয়ই আপনারা রোগীদের দেবেন। কিন্তু যারা বিপ্লব করবে, অর্থাৎ চাষা মজুর ছেলে ছোকরা, তাদের যৎসামান্য বিপ্লব-বিজ্ঞান শিখতে দেবেন না কেন ?

তাঁহারা : ওটাও বিজ্ঞান ?

আমি : হাজার বার বিজ্ঞান। কম-সে-কম এক ডজন বাঘা বাঘা রেভলিউশন হয়েছে আমাদের চোখের সামনে. তাদের ঘটনা ঘেঁটে কোনোও সাধারণ নিয়ম, কিংবা ঝোঁক আবিষ্কার করা যায় না বলছেন ? লাতিন আমেরিকা ছেড়ে দিয়ে, রাশিয়া, হাঙ্গেরি, চায়না, টার্কি, জার্মানী, ইটালী, স্পেন, যুদ্ধের মধ্যে ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া এগুলো নস্যাৎ করে ভারতবর্ষে আপন মর্জিতে বিপ্লব সাধবেন ? অবশ্য নিজস্বতা বজায় রাখার মোহ আছে, কিন্তু, মশাই, নিরালার ঠেলা সামলাতে পারবেন ? তার চেয়ে বিপ্লবের সাধারণ নক্সাটি নিরীক্ষণ করুন না ? যদি নিজের নিজত্ব থাকে তাকে মারে কে ? যুক্তিটা অন্য ভাষায় প্লেস্ করছি। স্ত্রীশিক্ষা পুরুষশিক্ষার মতোই হোক, অবশেষে মেয়েমানুষ মেয়েই থাকবে।

তাঁহারা : অর্থাৎ, মনুষ্যত্বটা ঝরে যাবে, খসে পড়বে।

আমি : পুরুষালি শিক্ষায় মেয়েদের মনুষ্যত্ব বাড়ে, যদি অবশ্য তাঁদের মধ্যে পদার্থটির অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

তাঁহারা : আপনি বুঝি মানেন না ?

আমি : না, মেয়েদের মানুষ ভাবি না। ওঁরা দেবী। তবে কারুর মধ্যে চামুণ্ডার, কারুর মধ্যে ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি মহাবিদ্যার অংশ বেশি থাকে। তেমনই বিপ্লবের রূপভেদ থাকবেই। কিন্তু মূলে সেই আদ্যাশক্তি, মা কালী, নরমুণ্ডমালিনী, শিবের বুকের ওপর জিহ্বা মেলে মা আমার দাঁড়িয়ে আছেন।

তাঁহারা : এই বললেন আমরা শৈব ?

আমি : আরে শিব কী মরদ ছিলেন ! থুড়ি, শিব-শক্তি=যেন space-time। আমি ওঁদের যুগ্মপ্রত্যয় ভাবি। সে যাই হোক, বেশ একটু পড়াশুনো চাই বৈ কি ? পাসের জন্যে আপনারা পড়েন নি ?

তাঁহারা : নিশ্চয়ই, তবে সেগুলো নোট্।

আমি : বেশ কথা। পাস মানেটা কি ? না, বিশ্ববিদ্যালয় ও গুরু-জনের নাগপাশ থেকে মুক্তি। তার জোরই বা কত ? অথচ সেজন্যে

পরীক্ষার ঠিক আগে দিনে দশ ঘণ্টা খাটুনি। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য কেবল চরকা চালানো! খাসা! আর যদি নোটের কথা তোলেন তো তাও পাবেন। বিপ্লবের ভালো ভালো নোট বেরুচ্ছে, দামও সস্তা।

তাঁহারা : তা আর দেখিনি! রাস্তাঘাটে ছড়াছড়ি যাচ্ছে। সব মার্ক্সিস্ট লিটারেচার! আর কম্যুনিস্ট দলের ছাপা। ঐগুলো পড়ে উচ্ছন্ন গেল ছোঁড়ারা। কেবল কপচাচ্ছে।

আমি : ওগুলো বিপ্লবের ক্ল্যাসিক্স্, যাকে শাস্ত্র বলে তাই। যত হাতে হাতে ঘোরে ততই ভালো আমার মতে। লিট্‌ল্ লেনিন সিরীজ্ দেখেছেন? অবশ্য যদি ওরা পড়ে তবেই মঙ্গল। আমার ধারণা আজকালকার ছেলেমেয়েরা পড়ছে কিছু কিছু। অন্তত আপনারা যতটা উপনিষদ, রবীন্দ্রনাথ পড়ে আইডিয়ালিস্ট, তার চেয়ে কম পড়ে তারা মার্ক্সিস্ট হচ্ছে মনে হয় না।

তাঁহারা : কী করে জানলেন?

আমি : প্রশান্ত মহলানবিশকে জিজ্ঞাসা করবেন। আমার ঐ ধারণা, ব্যস্।

তাঁহারা : তা হলে আপনি বলছেন যে বিদ্যার জোরেই ইংরেজ তাড়াব আমরা?

আমি : অনেকটা তাই দাঁড়ায়।

তাঁহারা : তবেই হয়েছে। ভারতবর্ষে একা আপনারা বিদ্বান নন।

আমি : আমি যে বিদ্যার কথা বলছি সে বিদ্যায় ওয়াকিবহাল ক'জন আপনাদের ভারতমাতা পয়দা করেছেন বলতে পারেন? আপনারা দেখছি চটছেন। তাতে ফল হবে না। একটু সরবৎ দেব? পুরোনো তেঁতুলের সরবৎ। নতুন ফ্যাশান, মশাই, তেঁতুল পুরোনো হলে হয় কী? বোনের ননদ পাঠিয়েছেন।

তাঁহারা : বোনের ননদ?

আমি : আপনাদের কলকাতার শালাজ থাকতে পারে, আর আমার বোনের অন্তত একটা পাড়াগেঁয়ে ননদ থাকতে পারে না?

তাঁহারা : থাক। বিদ্যার অর্থটা কি?

আমি : আমার বিদ্যা সুন্দরের নয়। যেটা জীবন থেকে বিচ্যুত তাকে আমি বিদ্যা বলি না। তার নাম রিসার্চ, স্কলারশিপ, পাণ্ডিত্য, সব কিছু হতে পারে, কিন্তু সেটা বিদ্যা নয়। বিদ্যার জন্যে কর্ম চাই। আবার কর্মের

জন্যে চোখ খুলে দেখা চাই। চোখ খুললে দেখবেন ঘটনার স্রোতে গোটাকয়েক আবর্ত রয়েছে। অন্য ভাষায় বলছি ঘটনার একটি নক্‌শা, ছক আছে। সেই নক্‌শার আবার রীতি আছে, দেখবেন। নানা সুতো, নানা রঙের সুতোয় এই নক্‌শা তৈরি হচ্ছে। তাতে আবার জট পড়ে। জট খোলা যায়। কচি বাচ্চার মতো হাতড়ালে চলবে না। সুতোটার কোন্ দিক্ মুখ ঠিক করা চাই। তারপর ধৈর্য। ঐ দিক্‌নির্ণয়ের শক্তির নাম বিদ্যা। বিদ্যায় ধৈর্য দেবে, কারণ বিদ্যা কৌশল শেখায় জট খুলতে।

তাঁহারা: এবং পাকাতে।

আমি: সেটা তো পাণ্ডিত্য বলেইছি। জট খোলাই বিদ্যার অর্থ, অর্থাৎ উদ্দেশ্য। যদি পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের সীমায় এসে না দাঁড়ান, যদি অন্ধ গলিতে ধাঁধা না লাগে, যদি সেখান থেকে পালাতে প্রাণ আকুলি-বিকুলি না করে, তবে যেমন রিসার্চ হয় না, তেমনই দেশে একটা সংকটময় মুহূর্ত, একটা অসহনীয় পরিস্থিতি এসেছে হাড়ে হাড়ে হাড়ঙ্গম না করা পর্যন্ত বিপ্লবসাধনা বিলাস মাত্র।

তাঁহারা: একটা সাফ্ বাৎ শুনতে পারবেন?

আমি: নিশ্চয়। তবে রাগব না শপথ করছি না; বলুন।

তাঁহারা: আপনারা অত্যন্ত দাম্ভিক।

আমি: এ আর এমন নতুন কথা কী?

তাঁহারা: তদ্‌ব্যতীত আপনারা ভীষণ, ভয়ংকর আইডিয়ালিস্ট।

আমি: দুটি বিশেষণ প্রয়োজন ছিল?

তাঁহারা: ভীষণ, এই জন্যে যে আপনারা আইডিয়ালিস্ট হতে লজ্জা পান, এই যুগের আবহাওয়া উলটো বলে। আর ভয়ংকর তারই ফলে, অর্থাৎ লজ্জিত হয়ে কেবল আত্মরক্ষার জন্যে উলটো কথা কন। আপনাদের দেখলে মনে হয় সকলে আপনারা শীর্ষাসনে আছেন, মাথা মাটিতে, পা'দুটো আকাশে।

আমি: জওহরলাল প্রত্যহ ঐ হঠযোগের ক্রিয়াটি অভ্যাস করেন, এবং তাইতে ভালো আছেন নিজে লিখেছেন।

তাঁহারা: তিনিও কিনা আপনাদের দলের। সে যাই হোক, **inverted idealism** বড় ভয়ংকর অবস্থা।

আমি: মধ্যে মধ্যে মাথা মাটিতে রেখে দেখলে দুনিয়াটা বোঝা সহজ হয়। হেগেল নাকি এভাবেই চিরটা কাল ছিলেন, মার্কস্ এসে মানুষের স্বভাবানুযায়ী দাঁড়াতে শেখাবার আগে। হেগেল মস্ত লোক।

তাঁহারা : এখনও শেষ হয় নি অভিযোগটা। মাত্র দু'টি দফা হয়েছে। তৃতীয় দফা এই যে, আপনারা অপদার্থ। চতুর্থ, আপনারা সমাজের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, জানতে পারেন না, চান না। পঞ্চম, কর্ম করবার প্রবৃত্তি আপনাদের রক্তে নেই। ষষ্ঠ, আপনাদের বিদ্যা, জ্ঞান কেবল অর্থকরী, জনসাধারণের উপকারের জন্যে নয়।

আমি : নালিশের আর্জি লম্বা হলে ভালো জজ প্রথমেই সন্দেহ করেন।

তাঁহারা : মোটকথা, আপনারা সব বুর্জোয়া।

আমি : মোট কথাটা আগেও মেনেছি, এখনও মানছি। কিন্তু আমাদের একটু সদ্ব্যবহার করুন না।

তাঁহারা : আপনাদের সমূলে উৎপাটন করাই বিধেয়।

আমি : এমন কোনো বিপ্লব হয় নি যাতে ইনটেলেক্‌চুয়ালদের স্থান ছিল না। কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও প্রশস্ত। অবশ্য সেই রোমান যুগে স্পার্টাকাস-এর বিদ্রোহ ছাড়া। তবে আমাদের হাতে বিপ্লব পুরোপুরি এলে তাকে বাঁচতে দিই না বটে। কংসের মতো শিশুকৃষ্ণকে মারতে আমরা সর্বদাই ব্যগ্র। তাই বলে আমরা কখনও কিছু করি নি বলা যায় কি?

তাঁহারা : বিপ্লবের সময় আপনাদের কোনো প্রয়োজন নেই। বিপ্লব আনবে জনগণ।

আমি : এই রে! আবার বাকুনিনের ভূত ঘাড়ে চাপল রে! অলক্ষ্যে আবার একটি পেতনীও রয়েছেন। রোজা লাক্‌সেমবুর্গ না? না, না, আপনারা ওঁদের দেখতে পাবেন না। এখন এই জনগণ কী ভাবে রেভলিউশন করবে?

তাঁহারা : আগে থেকে তা কি বলা যায়? জনগণ নিজেরাই তা জানে না।

আমি : না জেনে—

তাঁহারা : এ সব ব্যাপার পুঁথির বাইরে।

আমি : প্ল্যান গোছের একটা কিছু থাকবে না?

তাঁহারা : তা হয়তো থাকবে। কিন্তু ঘটনার চাপে সকালের প্ল্যান বিকালে বদলাবে। আর যদি না বদলায় বিপ্লব যাবে কেঁচে।

আমি : থামবেন না। বিপ্লবের স্রোতে ভাসিয়ে দিন তর্কবুদ্ধিটা।

তাঁহারা : পরপর যুক্তি সাজাবার দরকার দেখি না। মূল ব্যাপারটা এই : জনগণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে আপনি বাধ্য।

আমি : নিশ্চয়ই বাধ্য।

তাঁহারা : এই জনগণ সাধারণত বিপ্লবী।

আমি : নাঃ, বড় গুলিয়ে দিলেন আপনারা। জনগণ,— সাধারণত,— বিপ্লবী— কোনোটারই অর্থ ধরতে পারছি না। জনগণ মানে কি publ.c opinion-এর public, না crowd, জনতা? সাধারণত, তার অর্থ কী শতকরা পঞ্চাশের বেশি? আর বিপ্লবী মানে কি বিদ্রোহী?

তাঁহারা : জনগণ মানে mass, এইতো আজকালকার মানে।

আমি : অভিধানে কিন্তু mass-এর অর্থ অনেক পাচ্ছি। ক্যাথলিকদের mass, কারুশিল্পের পাথরের mass, ছবির mass, আবার আপনাদের mass।

তাঁহারা : এই যারা দলিত, নির্যাতিত, প্রপীড়িত।

আমি : ওঃ, বুঝেছি! যারা oppressed, suppressed, depressed; repressed-দেরও ধরতে পারি? আচ্ছা, স্ত্রীজাতিও কি আপনাদের সংজ্ঞায় mass? কেরানিবাবুরা?

তাঁহারা : কিষাণ মজুর, যারা হাল টানে, এই যাদের কবি 'মহামানব' বলছেন।

আমি : রবীন্দ্রনাথকে রেহাই দিন দয়া করে। কী নিগ্রহই না তাঁকে ভুগতে হয়েছে আপনাদের অনুগ্রহে! তা হলে, আপনাদের মতে কিষাণ মজুররা বিপ্লবী?

তাঁহারা : নিশ্চয়ই, তারা স্বভাবতই পরিবর্তন চায়।

আমি : তাদের স্বভাব সম্বন্ধে আমার খবর একটু ভিন্ন রকমের। কিষাণ চায় একটু ভালো ও বড় জমির মালিক হতে, আর মজুর চায় বেশি মাইনে, ছুটি, ভদ্র ব্যবহার, কাজের ও থাকবার ভালো জায়গা ইত্যাদি। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে অন্তত তাই; এবং ঐ দুটো দেশেই ধনিকতন্ত্র সবচেয়ে শক্তিশালী। জার্মানীতেও social insurance দিয়ে অনেক দিন পর্যন্ত মজুরদের সন্তুষ্ট রাখা হয়েছিল। আজকের ভাষা হলো social security, উদ্দেশ্যও তাই, এবং তার সাধনায় কর্তৃপক্ষ বিফল হবে বলে মনে হচ্ছে না তো।

তাঁহারা : কিষাণ মজুরদের বাদ দিচ্ছেন তবে?

আমি : মোটেই না। তবে তারা নিজেরা বিপ্লব করে না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জোর তারা শাসনসীমা অতিক্রম করে যায়। বেশি দূর গেলে কাজটিকে বিদ্রোহ বলা চলে। নেতা যদি ভালো জোটে তবে না হয় উপপ্লব এল। কিন্তু বিপ্লব অর্থে শ্রমিকের রাজত্ব, অর্থাৎ বর্তমান রাষ্ট্রের

ধ্বংস ও নিজেদের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা। সে অপূর্ব রাষ্ট্রের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। অতএব তার প্রকৃতি সম্বন্ধে নীরব থাকাই ভালো। সেটা অন্য জাতের **administration** হিসেবেই ধরা যাক আপাতত। আপনাদের কী বিশ্বাস যে শ্রমিকরা এই ধরনের প্রলয় আনতে পারে কেবল নিজেদেরই প্রেরণায়? তা হলে আর পৃথিবীতে দুঃখ থাকত না! দাসত্বের ইতিহাস শুরু হয় গুহা থেকে বাইরে আসা মাত্র। নৃতত্ত্বে যে সাম্যের সাক্ষাৎ পাই সেটা উলটে দিয়েছে এই দশ হাজার বছরের সভ্যতা। অতএব সাম্য আনতে গেলে সভ্যতার বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে। পারবে শ্রমিকরা, নিজেরা? তারা জানেই না সভ্যতার বিষ, চক্রান্ত কতদূর গিয়েছে। অথচ, বিপ্লব তাদের জন্যে প্রধানত; তাদের সংখ্যা বেশি বলে তাদের জোর বেশি, এবং ভুগতে হয়েছে বেশি বলে তাদের একটা রাগ, ক্ষোভ, ঈর্ষা থাকে সর্বদা। এগুলো ভাব, এবং ভাবের শক্তি আছে। কিন্তু ভাব ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আবার পিছু হঠাতেও পারে, যেমন নাৎসি বিদ্রোহে হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হলো অগ্রগতির দিক্ নির্ণয় করবে কে?

তাঁহারা: কেন, আপনাদের মতো বুদ্ধিজীবীরা!

আমি: শ্লেষ ছাড়ুন। দিক্ নির্ণয় করবে পার্টি, তার মধ্যে বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিজীবী উভয়েই থাকবে; পরে, অর্থাৎ নতুন দিক্ নির্ণয়ের সময়ে, উঠবে নতুন বুদ্ধিজীবীর দল।

তাঁহারা: রাশিয়ায় শুনছি নতুন শ্রেণী তৈরি হচ্ছে?

আমি: ঐ রাশিয়াটিকে ঐ রবিবাবুর মতনই দরজার বাইরে রাখুন আপাতত। রাশিয়া সম্বন্ধে এর মুখে এককথা, ওর মুখে অন্যকথা, আর তাই নিয়ে কোঁদল। স্টালিন যেন আমাদের বাপের ঠাকুর! একদল ছোক্‌রা দু'দিন পরে শাঁখঘণ্টা বাজিয়ে পূজো করবে ওকে, আর সব বুড়োরা মন্তর ঝেড়ে দেশের স্কন্ধ থেকে ওর ভূত ছাড়াতে যাবে দেখবেন। একটা হুকুম জারি করতে চাই, দশ বছর কেউ আমাদের দেশে রাশিয়ার নাম উচ্চারণ করতে পারবে না। অবশ্য শীঘ্র তাই হবেও। গ্যেবেল্‌স্ মরেও মরে নি, চার্চিল গিয়েও যায় নি। এবং আমাদের একদল নেতা তাঁদের সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত। তখন ছোঁড়ারা খুব জব্দ হবে। সেটা কি চান আপনারা? অতএব আপাতত রাশিয়াকে শিকেয় তুলুন। যদি প্রত্যয় করেন মশাইরা, তবে বলি রাশিয়ার শ্রেণী অর্থাৎ class হয় নি। কিন্তু **vocational** কিংবা **occupational group** হচ্ছে। দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, প্রত্যেক সমাজতাত্ত্বিক জানেন। জানেন না কেবল

আপনারা, আর রাজনীতিবিশারদেরা।

তাঁহারা : শ্রেণীটা কি ?

আমি : শ্রেণী কথাটিতে একাধিক প্রত্যয় দানা বেঁধেছে কিংবা বাঁধছে। প্রথমত, উৎপাদনের যন্ত্র ও কলকব্জার মালিকানা ; দ্বিতীয়ত, সেই অধিকারের জোরে আয়ের অসম বিভাগ ; তৃতীয়ত, সামাজিক শ্রম থেকে উদ্ভূত অতিরিক্ত মূল্যের স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধি ও মূলধনে রূপান্তর ; চতুর্থত, সেই মূলধনে আবার উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় প্রত্যাবর্তন ; এবং পঞ্চমত, পূর্বের সবগুলো পদ্ধতির সমাবেশে একদল পায় মজুরি, অন্যদল লোটে মুনাফা। এই হলো শ্রেণীর ব্যাখ্যা। অতএব দুটি শ্রেণীতে সংঘাত হবেই, যতদিন না লুটনেওয়ালারা গতায়ু হন। শোষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে একদিল্ হয়ে কাজ করতে পারে যারা তারাও mass-এর অন্তর্ভুক্ত। ট্রেনের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে, কিংবা বড়লোকের পার্টিতে ভিড় হয় নিশ্চয়, কিন্তু সেটা mass নয়। আবার দেখুন, আমি থাকি বাদশাবাগের বাঙ্লোতে, আমার বাগানে গোলাপ মরশুমী ফুলের বাহার, আমি সিল্ক পরি, ভিড়ের ভয়ে কোন সভা সমিতিতে যাই না, আমার বাড়িতে আই. সি. এস. থেকে নেতারাও আসেন, তবু আমার বিনীত নিবেদন যে আমি জনগণের একজন। কেবল তাই নয়, আপনাদের বিশাল বপুসত্ত্বেও আপনারা mass নন। অতএব আপনাদের দ্বারা আইন-ভাঙা, বিদ্রোহ, উপপ্লবের উৎপাত সম্ভব ; কিন্তু বিপ্লব ! উঁহু !

তাঁহারা : আপনাদের দ্বারা 'উপ'-টাও হবে না।

আমি : তা না হোক, সেজন্যে আরও ইয়ার লোক আছে। তবে চেষ্টাচরিত্তির করলে হয়তো আমরা বলে দিতে পারব কোন্টা বিপ্লব হলো, কোন্টা হলো না, কোন্টা গেঁজে গেল আর কোন্টার রসে প্রাণ সঞ্জীবিত হলো, কিংবা হতে পারে। এর বেশি বোধহয় আরেকটু পারা যায় ; যেমন, ইতিহাসের কোন্ ধাক্কার জোর বেশি, আর কোন্টার কম, কোন্টার সাহায্যে কাজ সহজ হয়, কোন্টায় বাধা সৃষ্টি করে। অবশ্য আজ আমরা যা সেই আমাদের দ্বারা কাজ পণ্ডই হবে। তবে তখনকার আমরা তো আজকের আমরা থাকব না। হ্যাঁ, আরও কিছু পারি হয় তো। ঠিক ঐ বাঁকের মুখে কী থাকতে পারে সেটার আন্দাজও দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। যদি অবশ্য আমরা সকলে কোমর বেঁধে লেগে যাই। তার বেশি যেটা সেটা আপনারাও পারেন, অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া, অর্থাৎ গর-হজম। আরও বলতে হবে ?

তাঁহারা : না। বিপ্লব সাধনার পর্ব শেষ হলো? এবার অনুমতি দিন।

আমি : উত্তরের অনুমতি আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না।

তাঁহারা : আপনার উত্তর কে দেবে, মশাই? বাড়ি যাবার অনুমতি দিন।

আমি : একান্তই যাবেন? যান, নয়তো আবার বাড়িতে বিপ্লব বাধবে। ফিরে গিয়ে দেখবেন হয়তো ভাত ঠাণ্ডা, মেজাজ গরম। ওটা রবিবাবুর, আমার নয়। সে যাই হোক, কবে আসছেন বলুন!

তাঁহারা : শীঘ্রই আসতে চেষ্টা করব। সেদিন কিন্তু আমাদের বক্তব্য আপনাকে শুনতে হবে।

সে রাতে ঘুম এল না। বিপ্লব-সংক্রান্ত যত বই আমার লাইব্রেরিতে আছে সব ঘাঁটতে লাগলাম। বিপ্লবকে কেউ সমাজের রোগ বলেছেন, আবার কেউ দেখছেন সাহিত্যের দিক্ থেকে, রোম্যান্টিক ভাবে। বিপ্লবের ঐতিহাসিকরাও নিজেদের সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারছেন না। কিন্তু বিপ্লব যদি রোগ হয় তবে সাধারণ অবস্থাটা কি স্বাস্থ্যের? এই দারিদ্র্য, এই নিষ্পেষণ, এই অশিক্ষা, এই অপমান, এই যুদ্ধ, এই বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই উপনিবেশের অত্যাচার, এই বর্ণভেদ, সব সুস্থতার লক্ষণ? অন্যধারে বিপ্লবের সবটাই কি আত্মবলি, সবটাই সাহস আর আদর্শনিষ্ঠা? তা তো নয়। তার মধ্যে নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, নীচতা, এমন কী কালোবাজার, সবই রয়েছে। হঠাৎ চোখে পড়ল রাইট্ নামে এক আমেরিকানের দু' ভল্যুমে মোটা বইটা, যুদ্ধের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। ব্যাপারটা এক ভল্যুমে লেখা যেত। ঐ ধরনের বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে বিপ্লবের বিচার কে করবে? মার্কস্, লেনিনের লেখায় অনেক জিনিস আছে নিশ্চয়। ভারতবর্ষে বহুদিন ধরে একটা আন্দোলন চলেছে। ইদানীং মহাত্মাজী তাকে একটা রূপ দিতে চেষ্টা করছেন। তাকে রাশিয়ার ছকে ফেলা যায় কি? ইতিহাসের মধ্যে যাঁরা ঐক্য পান তাঁরা পারেন। আমি আবার পুরোপুরি তা মানি না। আমার প্রথম প্রতিজ্ঞা ভারতের ইতিহাস। তার একটা নিজস্ব নক্শা তৈরি হয়েছে নানা উপায়ে। সেটাকে বাদ দিতে চাইলেও সেটা যায় না। সারা পৃথিবীতে একাধিক ছক পাচ্ছি। সেগুলোর ওপর একটা বড় ছক নিশ্চয় আছে। সেটা পরে বিবেচ্য। ঐক্য যদি থাকে তো সেখানে। এই তো মনে হয়। কিন্তু নিজের যুক্তিতে কোথায় যেন গলদ রয়ে গেল। সন্দেহ হয় ঐক্য, বৈচিত্র্য, টাইপ নিয়ে মাথা ঘামানো স্বাবু

মনোভাবের চিহ্ন। অবশ্য তাতে বৈজ্ঞানিক বিচারের সুবিধা হয়। কিন্তু ব্যাপারটাকে চলন্ত হিসেবে দেখতে হবে। তাতে অবশ্য গোটা গোটা সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। না হয় নাই বা এলাম। আমার আগ্রহ সিদ্ধান্তে, না সত্যে?

সপ্তম স্তবক : বিপ্লবের কথা (২)

আমি: এই যে! আস্তেজ্ঞে হোক! কী সৌভাগ্য আমার! "...ere the shoes were old..." সেদিনকার আলোচনার রেশ রন্‌রন্‌ করছে এখনও। এই দেখুন আমার জঙ্গল থেকে কিছু শুকনো কাঠ যোগাড় করেছি। এইবার আগুন ধরান।

তাঁহারা: আরে, মশাই, করেছেন কী! এতগুলো বিপ্লবের বই বাড়িতে রেখেছেন, পুলিশে ধরে নি?

আমি: তারা লোক চেনে। টাকা চুরির মামলায় আমাকে তারা ধরবে তবু এই ধরনের বই ঘরে দেখলে তারা আমাকে 'প্রশ্ন' পর্যন্ত করবে না। বই বউ-এর চেয়েও বিপ্লববিরোধী বরাবরই বলে আসছি।

তাঁহারা: যা তা বললেই হলো আর কী! লেনিন শুনেছি খুব পড়িয়ে-লিখিয়ে ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী কখনও তাঁকে বাধা দেন নি।

আমি: মোটেই বিশ্বাস করবেন না মশাই! ইংরেজরা ঐ গুজব রটিয়েছে রাশিয়াকে জব্দ করবার জন্যে। ওরা যখন কারুর মাথা খেতে চায় তখন বলে লোকটা ধুকিশ., গ্রন্থকীট। আর যদি বিশ্বাসও করেন লেনিন বই ঘাঁটত, তবে অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন বিপ্লবের সময় লোকটি ছিল পাঁচ শ' মাইল দূরে। না, না, পড়াশুনো করে বিপ্লব হয় না। মহাত্মাজী কী জিন্না সাহেব, এডওয়ার্ডস্, ব্রিন্‌টন, ম্যালাপার্ট, লেনিন, ট্রট্স্কি, সোরোকিন, হাণ্টার প্রভৃতির বই পড়েছেন বলে তো সন্দেহ হয় না। অথচ কে অস্বীকার করবে যে তাঁদের কৃপায় ভারতে একটা জাগরণ, একটা, একটা, আপনাদের ভাষায়, আমূল পরিবর্তন ও ডি. এল. রায়ের ভাষায়, একটা জলস্তম্ভ, মহামারী, ভূমিকম্প এসেছে! জওহরলালের অবশ্য বই-এর শখ আছে, কিন্তু মহাত্মাজী, কী প্যাটেল, কী জিন্নার তুলনায় তাঁর কৃতিত্ব, আরে,

কিসে আর কিসে ! এই বই তুলে রাখলাম। দেশের ধারণা আমরা বিপ্লব বান্‌চালই করতে পারি, চালু করতে অক্ষম। ছেড়ে দিন আমাদের, মহাত্মাজী, তথা কংগ্রেস, আমাদের জাতকে হ্যানস্থা করেন। তাঁদের কল্পিত পরিস্থিতিতে আমাদের সূচ্যগ্র স্থানও নেই। মাস্টার পাবে পঁচিশ টাকা, আর দেশ হবে স্বাধীন ! নিছক স্বার্থত্যাগের জোরে অবশ্য সবকিছুই সম্ভব হয় শুনেছি। জানি না মশাই !

তাঁহারা : একটু অবিচার হচ্ছে না ? আপাতত আপনাদের স্থান নেই এবং তার কারণ আপনি নিজেই এতক্ষণ বললেন। বিপ্লবের সময় আপনারা একটু বাইরে থাকুন, অর্থাৎ প্রস্তুত হোন আগামী কালের জন্যে। জেলে আপনাদের কষ্ট হবে, লাঠির ঘা-ও আপনাদের সহ্য হবে না এবং আপনাদের মহিলা, মহিষীরাও কেঁদে কেঁদে কেবল সিনেমা দেখে বেড়াবেন। দরকার কী গোলমালে গিয়ে !

আমি : সমালোচনার প্রয়োজন নেই ?

তাঁহারা : এখন মোটেই নেই। শক্তির অপচয় অন্যায়।

আমি : ঘষে ঘষে এক রকম বিদ্যুৎ জন্মায়।

তাঁহারা : আজকাল ও-ধরনের তৈরি বিদ্যুতে চলে না। এখন সব বড় বড় টারবিন।

আমি : পেট্রলের **inner combustion** ?

তাঁহারা : উপমা ছাড়ুন।

আমি : যথা আজ্ঞা। সাফ্‌ বাত্‌ই ভালো। কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড-এর সকলেই অসাধারণ ব্যক্তি মানি, প্রত্যেক বড় ঘটনা তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে রায় দেন, যদিও জওহরলাল ঝোঁকের মাথায় অনেক কথা বলে ফেলেন, অনেক কাজ করে ফেলেন এবং সেইগুলোই আমাদের ভালো লাগে···

তাঁহারা : তবু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি আবার সামলে নেন।

আমি : তাঁর এই সামলানোটা আপনারা পছন্দ করেন ?

তাঁহারা : তা অবশ্য করি না। তা হলে, আপনার মতে···

আমি : প্রথমে শুনুন, তার পর সংক্ষিপ্তসার হবে। কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড-এ সব পাকা পাকা লোক আছেন, কিন্তু সেইজন্যেই সম্ভবত বিপক্ষ মতাবলম্বীদের প্রতি তাঁদের কোনও ধৈর্য নেই। ধীরে ধীরে সব বাম-মার্গীরাই বিতাড়িত হয়েছে, ও হচ্ছে। হ্যাঁ, প্ল্যানিং কমিটির উল্লেখ করতে পারেন বটে।

তাঁহারা : কেন, তাঁদের কমিটির রিপোর্ট তো গরম গরম! ন্যাশন্যা-লিজেশন-এ বুঝি মন ভরে না?

আমি : হক্ কথা, ভরে না। কারণ তাঁদের কল্পিত রাষ্ট্র ইংরেজী আদর্শে, অর্থাৎ এই লেবর গবর্নমেণ্ট পর্যন্ত। স্টেট ক্যাপিটালিজম্ আর সোশ্যালিজম্ সমধর্মী নয়। বম্বে রিপোর্টটা আবার তাও নয় এবং সেইটেই চলতে দেখবেন।

তাঁহারা : ইংরেজী আদর্শ অপছন্দ, অথচ গান্ধীজীর রামরাজ্যকেও বরণ করবেন না। ভারী মজার ব্যাপার!

আমি : মোটেই মজার নয়। রামরাজ্যটা পৃথক, বিপরীতও নিশ্চয়, এবং আরও নিশ্চয়, লেবর গবর্নমেণ্টের বিন্দুও এই ভারত সরকারের তুলনায় সিন্ধু। তবু রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার কিংবা কয়লার খনি ও Power-resources-কে পুরোপুরি দেশী সরকারের অধীনে আনবার চেষ্টাকে বিপ্লব বলতে পারছি না।

তাঁহারা : কেন?

আমি : দেশী সরকার বিদেশী সরকারের চেয়ে একশ' গুণ ভালো, কিন্তু হাজার গুণ নয়। রঙ তফাৎ হলে জাত বদলায় না। দেশী সরকার কি দেশী ধনিক-সম্প্রদায়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে? ভয় হয়, পারবে না। তখন কী অবস্থা হবে ভাবুন! একে দেশপ্রেম, তার ওপর সোশ্যালিজম্-এর মুখোশ— অর্থাৎ ন্যাশন্যালাইজেশন, যেন পনর বছর আগেকার জার্মানী, ইটালীর প্রতিচ্ছবি দেখছি। আসল ব্যাপার কী জানেন? সরকার-ফরকার কিছু নয়— সব সরকারই বড় বাবুদের বাজার-সরকার। অতএব প্ল্যানিং-এর প্রধান উদ্দেশ্য হবে এই বড় কর্তাদের সরানো। আমাদের ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি থেকেই তাঁরা বিতাড়িত নন, তো অন্যত্র কা কথা! তাঁরা নাকি সব বিশেষজ্ঞ! কিসের বিশেষজ্ঞ জানা আছে। থুতুতে চিঁড়ে না হয় ভিজতে পারে, কিন্তু ভেজা চিঁড়েয় মুখ রোচে না। আমি চাই বাঁশমতী চালের ভাত, লুচি মুর্গীর মাংস, কাবাব..।

তাঁহারা : গরহজমে মারা যাবেন।

আমি : ধন্যবাদ। কিন্তু গরহজমের জন্যে দায়ি কে? আপনারা কী ভাবেন মানুষ খুদকুঁড়ো খেতেই জন্মেছে? শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। হজম যায় বেশি খাওয়ার চেয়ে না খেয়ে, এবং খারাপ খেয়ে। অতএব···

তাঁহারা : অতএব পেটরোগা শিশুকে পোলাও-এর পথ্য দেওয়া যাক!

আমি : তা বলছি না। তারাও পোলাও-এর অধিকারী, অতএব এমন ভাবে তাদের হজমশক্তি শিক্ষিত হোক যাতে তারা সেই অধিকার ভোগ করতে পারে।

তাঁহারা : এ আবার নতুন ফ্যাকড়া তুলছেন দেখছি। এতদিন তর্ক হচ্ছিল আপনাদের ও আমাদের মধ্যে, এখন আমাদের ছাড়া অন্য এক 'তাঁদের' দলকে ভেড়ালেন।

আমি : সত্য বলছি, আপনাদের মতো বুদ্ধিমান সম্প্রদায় ভুভারতে নেই। আপনারা ও আমরা পৃথক নই; আমাদের ঝগড়া সাহিত্যিক কলহ মাত্র; এ ঝগড়ার শ্বাস নেই, শাঁষও নেই। এখানকার বিবাদ আমাদের উভয় দলের গোলামের সঙ্গে তাদের। এতদিন ধরে এই কথা বলতে চাইছি, পারি নি, আপনারা নিজগুণে ধরতে পারলেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে বিপ্লব তাদের জন্যে।

তাঁহারা : আরেকটু এগোন, বিপ্লব তারাই করবে।

আমি : অতটা অগ্রসর হতে চাই না। ব্যাপারটা এই ধরনের ঘটে : যে সমাজে বিপ্লব বাঁধছে সেখানে মোটামুটি দুই দল থাকে, নচেৎ পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। ইন্‌টেলেক্‌চুয়েলরা অধিকারীর দলেই এতদিন জন্মেছে। সর্বক্ষেত্রেই যে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম অসন্তোষ ফুটে উঠছে তা নয়, তবু অসন্তোষের বাঙ্‌ময় প্রকাশ, যাকে **speech-reactions** বলতে পারেন, তাঁদের দ্বারাই সম্ভব হয়। অন্যদলের অসন্তোষটাই বাস্তব, কিন্তু ভাষা নেই তাদের। বিপ্লব শুরু হয় যখন অসন্তোষের দুটি ধারা মেশে, বাক্য ও কর্মের সংযোগ ঘটে, এবং তখনই নতুন **myth** তৈরি হয়, সেটা আবার সাধারণে গ্রহণ করে। অবশ্য অত্যাচারের বহর, জনসাধারণের সমবেত হবার শক্তি ও সেই সব অনুষ্ঠানের লড়বার ক্ষমতা, অধিকারীর দুর্বলতা বৃদ্ধি ও নিজেদের প্রতি অবিশ্বাস, আর জীবননির্বাহ পন্থায় নতুনত্বের ভীষণ প্রকোপ— এই সব কারণ ষড়যন্ত্র করে বিপ্লবের পটভূমি তৈরি করে। যারা বাক্যধর্মী তাদের দ্বারা বিপ্লব চালানো সুবিধের নয়। তাঁরা নতুন **symbol** তৈরি করুন, তাঁরা প্রচার করুন, ব্যাখ্যা করুন, বাঁচিয়ে রাখুন। অবশ্য যখন গুলি চলছে তখন তাঁরা বাড়ির মধ্যে থাকলে সকল দিক্ থেকেই নিরাপদ ও মঙ্গল। এখানে আপনাদের সঙ্গে আমি একদিল্।

তাঁহারা : আমরাও তাই অনেক সময় ভাবি বটে। যার কর্ম তারে সাজে।

আমি : আরেকটি বক্তব্য আছে। এঁদের আরও একটি কাজ বিপ্লবটিকে

বাঁচিয়ে রাখা। পৃথিবীতে বিস্তর বিপ্লব ঘটেছে। কিন্তু ক'টা সত্যিকারের বেঁচেছে বলুন তো? কেন? ভাবপ্রবণতার স্বভাবই হলো ফুরিয়ে যাওয়া। তাই তাকে ব্যবহার করতে হলে বুদ্ধি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ঠিক পথে নিয়ে যেতে হবে। সে-কাজ করবে একটা **disciplined party**। অরেল্ প্রভৃতিরা **disciplined minority** কথাটি ব্যবহার করেছেন; কিন্তু **minority** কথাটির মধ্যে অর্থবিপত্তির সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে সংখ্যা কম হওয়াটা প্রধান নয়, যদিও তার প্রয়োজন আছে; প্রধান হলো **minority**-কে **majority**-তে, সমগ্র সমাজে, পরিণত করা। আমি জানি বিপ্লবের আদিযুগের বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় বিপ্লবের পরেও minority থাকতে চান— এটা মানুষের স্বভাব। মিছরি কি চায় মুড়ির সঙ্গে একদর হতে? একবার যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করেছে তার পক্ষে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হওয়া কঠিন। পুরাতন দেবতারাও নতুন দেবতাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন। তাই আজকের বিপ্লবী-নেতৃবৃন্দ কালকের নেতৃবৃন্দকে দেখতে পারেন না, এবং বিপ্লবের অন্তে একপ্রকার স্থাণু, জড়ভরত, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী হয়ে পড়েন। ব্যক্তিগতভাবে এটা তাঁদের অভিমান, কিন্তু ইতিহাসের দিক্ থেকে তাঁদের অভিমান ক্ষতিকর। আমার মনে হয় কী জানেন? ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল সম্প্রদায়ের কাজ যেমন বুদ্ধির সাহায্যে ভাবপ্রবণতার পাষাণভাঙা, তেমনই বিপ্লব ঠিক পথে চলছে কী না নজর রাখার জন্যে, তাকে মধ্যে মধ্যে ধাক্কা দেবার জন্যে, সামাজিক শক্তির বিন্যাস, তার গতির রীতিনীতি বোঝা ও বোঝবার জন্যেও তাদের একান্ত প্রয়োজন। তারপরও তাঁদের অন্য কাজ রয়েছে অবশ্য।

তাঁহারা: **Minority**-কে **majority**-তে পরিণত কে করবে?

আমি: একটু অন্যভাবে দেখলে ব্যাপারটা শক্ত ঠেকবে না। আগেকার বিপ্লবের কথা ছেড়ে দিন— যদিও সেখানেও আমার মন্তব্য চলে— এখানকার বিপ্লবের **majority** তো সামনে রয়েছে।

তাঁহারা: চমৎকার! আপনি বলছেন সামনে, অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি না! যদি তারা অত নিকটে তবে প্রচারবিভাগের দরকার কি মশাই? আপনিই না সরকারের হাজার হাজার পৃষ্ঠা নষ্ট করেছেন?

আমি: আমার কথা তুলবেন না। আবার বলছি, ওরা সামনে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন না এইটাই দুঃখ, এইটাই বিপ্লবের এক প্রধান অন্তরায়। প্রত্যেকবারই তাদের অনুমতিতে সমাজের পরিবর্তন হয়েছে। অবশ্য লিখিত-পড়িত কিছু পারেন না, তারাও জানে না যে তারা অনুমতি

দিয়েছে। সেই সঙ্গে কিন্তু প্রত্যেকবারই দেখছি এই **determined, disciplined, dominant minority**-র শেকড় উঠছে সমাজের এক নতুন শ্রেণী থেকে। এটাকে আপনারা বিপ্লববাদের প্রধান তত্ত্ব বলতে পারেন। যেখানে শেকড় নেই সেখানে জোর মারপিট, খুনোখুনি, রক্তারক্তি ও তারপর নেপোলিয়ন, হিটলার, মিলিটারি ডিক্‌টেটর, অর্থাৎ গর্ভস্রাব, আর সেই-খানেই ঐ অভিমান। যাঁদের বাঙলা দেশে 'দাদার দল' বলে তাঁদের সঙ্গে কথা কয়েছেন? **Elite group**-এর দশা সর্বত্র এই। তাঁদের শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁদের স্থান কাঁচের আলমারিতে, শিকের ওপর, লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে, মন্দিরগাত্রে। এখনকার নতুন শ্রেণী চাষী, মজুর আর নিম্নবিত্ত। তাঁদের সংখ্যা আপনাদের-আমাদের চেয়ে বেশি নয়? অতএব সমস্যাটা কোথায়? হাতের কাছেই **majority** রয়েছে।

তাঁহারা: ওঃ, আপনি বুঝি কম্যুনিস্ট? ঐ যারা দেশের সর্বনাশটা করলে ১৯৪২ সালে, আর এখনও করছে জিন্নাকে নাই দিয়ে? লজ্জা হয় না তাঁদের সঙ্গে একমত হতে?

আমি: ভারী নির্লজ্জ। তারা লুকিয়ে লুকিয়ে কী করেছে জানি না, তবে তারা যদি ১৯৪২ সালের ঘটনাবলীকে বিপ্লব না বলে থাকে তবে তারা নিতান্ত ভুল বোঝে নি। ১৯৪২ সালের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণেরও তাই মত। তিনি নিজে বলেছেন যে ওগুলোর পেছনে কোনো প্ল্যান ছিল না—অর্থাৎ ওগুলো মাত্র insurrection, ওতে বিপ্লবের সূচনা হতে পারত, কিন্তু হয় নি। কেন হয় নি-র উত্তর অবশ্য কেবল প্ল্যানিং-এর অভাব নয়, তার তার উত্তর যে ১৯৪২ সালের বিপ্লবী পার্টির শেকড় তখনও পৌঁছয়নি শ্রমিক-মজুরের বুকের মধ্যে, অর্থাৎ তাঁরা তখনও নতুন শ্রেণীর মাত্র মৌখিক প্রতিভূ ছিলেন।

তাঁহারা: আপনি যদি চান যে নতুন নেতা মজুর চাষীর ঘরে জন্মাবার পর বিপ্লব আসবে তবেই হয়েছে! ফরাসী বিপ্লবের নেতা ছিল কাউন্ট মিরাবোঁ, লা-ফায়েট, আর লেনিনের বাবা ছিলেন স্কুল ইন্‌স্পেক্টার ভুলবেন না। আমেরিকায়ও উকিলের দল বিপ্লবের অগ্রদূত ছিল।

আমি: জন্মপত্রিকার ছক্ কাটাকে ইতিহাস বলে না।

তাঁহারা: তা হলে স্বীকার করুন যে বড়লোকের ছেলে হলেও চলে।

আমি: স্বীকার করেছি, করছি আবার।

তাঁহারা: বাধ্য স্বীকার করতে। একজন রথচাইল্‌ড্ কম্যুনিস্ট হয়েছে কাগজে দেখলাম, লক্ষ্ণৌ-এর বড় ঘরোয়ানার ছেলেরাও নাকি ঐ

দিকে ঝুঁকেছে ?

আমি : গুজব তাই ; এখন অবশ্য আর তারা আসছে না, আজকাল বড়লোকেরা সব হয় লীগে, না হয় কংগ্রেসে ঢুকে পড়েছে ! হা, ভগবান !*

তাঁহারা : ও আবার কী !

আমি : ভগবান ছাড়া পথ নেই। কংগ্রেস আর লীগ বড়ই ধর্মপ্রাণ, তাই নামটুটো মুখে এল।

তাঁহারা : ভূতের মুখে রাম নাম !

আমি : আমরা ভারতবাসী ভুলবেন না। এখানে, অর্থাৎ আমাদের এই অনুন্নত, পরাধীন, লক্ষ্মীছাড়া দেশে ধর্মই একমাত্র সম্বল। এতদিন আমাদের দেশে বিপ্লব হয়েছে ধর্মান্তরতার ভেতর দিয়ে। সেকাল গত। সমাজ ছিল তখন বন্ধ। এখন সমাজ উন্মুক্ত, অন্তত তাই ভাবি, অতএব আশা করছি যে ধর্মের প্রয়োজন আর থাকবে না পরিবর্তনের জন্যে। কিন্তু…

তাঁহারা : সংস্কার যাবে কোথায় ! চাষীমজুরদের, জনসাধারণের একটা তো খোঁটা চাই।

আমি : আচ্ছা, একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন ? ভারতবাসীরা কী অত্যন্ত ধার্মিক ?

তাঁহারা : তা ঠিক বলতে পারছি না, তবে জানি একটা কিছু বিশেষত্ব আছে। কেন জিজ্ঞাসা করছেন ? এই এতক্ষণ বিপ্লবতত্ত্ব আলোচনা হচ্ছিল বেশ, ধর্মতত্ত্বের কি দরকার ছিল ?

আমি : অবান্তর, নিতান্ত অবান্তর। বিশেষত্বটা কি ?

তাঁহারা : এখানে ধর্মের বাঁধনটা খুব বেশি, অন্য দেশের চেয়ে।

আমি : তা হলে দাঁড়ায় এই : আমাদের সমাজই পৃথিবীর একমাত্র **totalitarian** সমাজ।' গর্ভাধান থেকে শুরু, মরেও শান্তি নেই, অন্তত তিন পুরুষ। হিটলারিয়ান সমাজের সঙ্গে পার্থক্য এইটুকু যে এখানে আইন ব্রাহ্মণে তৈরি করেন না, তাঁরা কেবল শ্রুতিস্মৃতি অনুযায়ী বিধান দেন। ফল সেই একই। নয় কি ?

তাঁহারা : তা আর জানি না ! যার বাড়ি একাধিক বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ও তাঁদের জননী, দিদিমা, খুড়িমা আছেন তাঁরাই হাড়ে হাড়ে বুঝছেন।

আমি : তা হলে কর্তব্য কি ?

তাঁহারা : বেঁধে মার খাওয়া।

আমি : একেই বলে ভগবানের মার ! গ্রহণ করা, সহ্য করা, মেনে নেওয়া মাথা পেতে, এই মনোভাবের নাম ধর্মভাব, তা ইংরেজের বেলাই হোক আর অর্থনীতির ক্ষেত্রেই হোক। আপনারা আমরা উভয়েই মেনে নিয়েছি যে নেতৃত্ব আসবে ওপরকার স্তর থেকে। তাই 'হা ভগবান' মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। **Totalitarian** সমাজে জন্মেছি কী না তাই ! স্বীকার করাটা আমাদের পক্ষে ডালভাত। আমাদের সংস্কৃতি স্বীকৃতির বিলম্বিত ইতিহাস। আপনাদের দম বন্ধ হয়ে যায় না ?

তাঁহারা : হয় বলেই তো ছুটে আসি।

আমি : কিন্তু বিপ্লবের মূলে হতাশা নেই, আছে আশা। সে আশার কুসুম আকাশে ফোটে না, মাটির বুক চিরে যে চারা বেরোয় তারই ডালের ডগায় সে-ফুলের কুঁড়ি ধরে। ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালরা এতদিন টবের চারায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁদেরও পরিবর্তন ঘটেছে জেনে রাখবেন। কেন ঘটবে না ? যাই বলুন না কেন, তাঁরাও মানুষ, সামাজিক জীব। সমাজ বদলেছে, হয়তো যতটা বদলেছে ততটা তাঁরা বদলান নি। কিন্তু বুঝছেন—সকলে নয়, অনেকে— যে, তাঁরা পৃথক নন, যে সেকাল আর নেই। কোন্ কাল আসছে তাঁরা অবশ্য সকলে ভাবছেন না ; এখনও সেই দলাদলি চালাচ্ছেন। কিন্তু কেউ কেউ যে স্বপ্ন দেখেন নি তা নয়। কিন্তু তবু স্বপ্নই রয়ে গেল। এটা কী কম আফশোষ, মশাই ! এতে মানুষ সিনিক্ হয়ে যায়। সিনিজ্‌ম্ হলো একপ্রকারের মৃত্যু, তার চেয়েও ভয়ংকর, মনের ধর্মনাশ। মনের ধর্ম এগিয়ে চলা, আর সিনিজ্‌ম্ হলো মনকেই উড়িয়ে দেওয়া। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সিনিক হয়ে পড়েছেন দেখেছি। আমারও মধ্যে মধ্যে ও-রকম অবস্থা হয়। কিন্তু জানি এটা সর্বনাশের পথ। বিপ্লবের জন্ম আশায়, নিরাশায় নয়, নয়, নয়।

তাঁহারা : ও-রকম ধর্মজীবনেও ঘটে, যোগীরা বলেন।

আমি : বলুন গে ! তাতে আমার কী ! কাটিয়ে ওঠাটাই একমাত্র কাজ। আমাদের দেশটাই একটু সিনিক্যাল হয়ে পড়ছে না কি ? কালো-বাজারের টাকা লুটে মাথায় গান্ধীটুপি পরাকে কী বলেন ?

তাঁহারা : এখন কী কর্তব্য মনে হয় ?

আমি : দেশের সমস্যাকে আমার সমস্যার বৃহৎ সংস্করণ যদি ভাবি, তবে কর্তব্য হলো আরও বেশি চিন্তা করা। চিন্তার ফলে বোধহয় নাড়ীর যোগ খুঁজে পাব। আমরা সব মা-হারা সন্তান, তাই মায়ের পেটের ভেতর ঢুকতে ইচ্ছে হয় মধ্যে মধ্যে।

তাঁহারা : চিন্তার ফলে ?

আমি : হ্যাঁ, চিন্তারই ফলে, কারণ চিন্তার মানেই হলো ওপরকার সংস্কারের খোলস ছিঁড়ে ফেলা। সংস্কার খুললেই দেখি যেন অবচেতনার রাজত্ব ধীরে ধীরে, প্রবালদ্বীপের মতন বেড়ে উঠেছে। ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্‌দের প্রবালদ্বীপ জলের একটু ওপরে ঠেলে ওঠে, এই মাত্র। ছেড়ে দিন বাজে কথা। আমরাই বা কে, আপনারাই বা কী ? কেউ কারুর নয়, সবই মায়া, সত্যই হলো এই জীবন, ও তার পরিবর্তন, আমূল পরিবর্তন আপন প্রয়োজনে।

তাঁহারা : কিন্তু কার সাহায্যে ?

আমি : সকলের সাহায্যে নয়। কারুর কারুর সাহায্যে। তারা নতুন সৈন্য। আমরা ক্লান্ত, অর্থাৎ গ্রহণশীল মন আমাদের, সংস্কারের চাপে আমরা মৃতপ্রায়। আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। তাদেরই দ্বারা হবে যাদের মন সংস্কারমুক্ত। আমার বিশ্বাস কী জানেন ? আন্তরিক বিশ্বাস হলো এই যে নতুন শ্রেণীর মন ধর্মাচ্ছন্ন নয় মোটেই, আর বাকি সব আমরা সকলেই ধার্মিক, যদিও পুজো-আচ্চায় বিশ্বাস গেছে আমাদের অনেকেরই। তার বদলে এসেছে দেশাত্মবোধ, দেশপ্রেম, প্যাট্রিয়োটিজম্। আমি জাতীয় আন্দোলনকে ছোট করছি না মোটেই ; এইখানে কম্যুনিস্টরা ১৯৪২ সালে ভুল করেছিলেন। তাঁরা দেশপ্রেমের জোর কত বুঝতে পারেন নি ; মানসিক বৃত্তিকে বিশ্লেষণ করবার, শক্তি পরিমাণ করবার ক্ষমতা তাঁদের কম। হতে বাধ্য ; তাঁরা বুদ্ধিতে বিশ্বাসী, একটু বেশি রকমের। অথচ ভাববৃত্তিকে রোধে কে ? কিন্তু এই সঙ্গে জোর-গলায় বলবার সময় এসেছে যে দেশপ্রেম ধর্মের আকার গ্রহণ করছে আমাদের দেশে। কেবল মুসলিম লীগই পলিটিকস্-এর সঙ্গে ধর্ম মিশিয়েছে বললে চলবে না। সর্বত্রই তাই হচ্ছে। এই মেশানো ব্যাপারটা মনের ওপর, সমাজের ওপর ধর্মের প্রভাব-হ্রাসের চিহ্ন, বৃদ্ধির নয়। প্রভাব এখনও রয়েছে, তাই ঐ রকম মনে হয়। **Patriotism is my religion** সকলেরই মুখে শুনেছি। পূর্বে ছিল ধর্ম আকাশমুখী, এখন এই জগতেরই সীমায় তার দৃষ্টি আবদ্ধ। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির কম-বেশি আছে, চারধারে আবার দেয়াল রয়েছে, তাই দৃষ্টি আমাদের মারমুখী। অর্থাৎ শত্রু চাই, আমাদের, নচেৎ দেশপ্রেম জমে না। অনেকে সোশ্যালিস্ট-কম্যুনিস্ট হন এরই জোরে, এই শত্রু-আবিষ্কারের তাগিদে, ঘৃণার প্রয়োজনে।

তাঁহারা : ঘৃণা কমাবেন কিসে ?

আমি : প্রেমে নয়, কারণ প্রেম ঘৃণার উল্‌টোটা, অন্তত প্রেমের প্রথম

কথা ঘৃণার অভাব। লোকটাকে সাপে কামড়েছে, কিসে বাঁচানো যায়? না, সাপের বিষ না দিয়ে! চমৎকার! ভাবের শত্রু ভাব নয়, ভাবনা। তাই অতটা চিন্তার ওপর ঝোঁক দিচ্ছি। নচেৎ চিন্তার সীমা সম্বন্ধে আমি সচেতন। বয়সের দোষে অবশ্য, কিন্তু সীমাজ্ঞান হয়েছে চিন্তারই কৃপায়।

* * *

রাত বেড়েছিল, তাঁরা চলে গেলেন। মড়ারা বিপ্লব বাধায় না; ওটা জ্যান্তদেরই কাজ। সমাজের ওপরকার স্তর মৃত; কিন্তু তাদের ঠেলে কারা যেন উঠতে চাইছে। তাদের কান্না কানে আসে। রবি ঠাকুর কী এদের জন্যেই কান পেতে বসে ছিলেন সারা জীবন? হ্যাঁ, rescue-partyর একজন হতে চাই, কিন্তু সেই ছুতোয় যেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা না করি, উপকারকের দম্ভ যেন মনকে আচ্ছন্ন না করে। তারা বেরিয়ে এসে নিজেদের জীবন নিজেরা চালাক, সেই সঙ্গে আমাদেরও বদলে দিক। এই জীবনটা অসহ্য, এবং ভাবী জীবন গড়ে তোলায় তৃপ্তি আছে। সৃষ্টির জন্যে বহু জিনিসের দরকার, চিন্তার, পড়াশুনোর প্রয়োজনও সেই সঙ্গে। আজকাল শুনেছি আমাদের এতদিনকার জাতীয় আন্দোলন বন্দরে এল বলে। যদি তাই হয় তবে পাইলট আর পোর্ট ট্রাস্টের কাজ বেড়ে গেল বৈ কমল না।

কার্তিক, ১৩৫৩

অষ্টম স্তবক—সাহিত্যের কথা: মানদণ্ড

এ এক অস্বস্তি! ছিলাম বেশ অর্থনীতির কচ্‌কচানি, সংখ্যাতত্ত্বের গোলকধাঁধা, অধ্যাপনা ও সরকারি কাজের নেশায় ডুবে। বাঙলাদেশ, সাহিত্য, গান, সমাজ, রাজনীতির খবর দৈনিকপত্র ও মাসিক পত্রিকার মারফৎ যা পাওয়া যেত তাতে নেশা ছুটত না। কেনই বা এলাম এই জঘন্য শহরে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে! আমি এখন ভারতবাসী, অতএব পশ্চিমবঙ্গের কী হাল হলো জানবার আমার কোনোও আগ্রহ থাকা উচিত নয়, বিশেষতঃ যখন প্রত্যেক বাঙালী বড়লাটের গদিতে স্থান পাচ্ছেন রাজাজীর

প্রতিনিধিত্বে। মনোভাবটি অস্বাভাবিক নয়। বৃদ্ধা গৃহিণী আপন অপ্রয়োজনীয়তা ঢাকেন নাতবৌ-এর সুখস্বাচ্ছন্দ্য, নতুন ঢঙ দেখে। বাঙলা-দেশ এখন জরাগ্রস্ত; তার সুখ একটু vicarious হতে বাধ্য। তার নিজের অসুবিধা এখন তাকে ভুলতেই হবে, হিংসা-দ্বেষ-অভিমান তাকে ছাড়তেই হবে, খুঁতখুঁতনি আর তার শোভা পায় না, তার খিটখিটেনি এখন অসহ্য। তবু, কী জানি কেন, একটু মায়া হয়। প্রেমেন মিত্রের 'অনাবশ্যক' গল্পটি যখন মনে পড়ে তখন শঙ্করভাষ্য, সমাজতত্ত্ব সবই যেন ভেসে যায়। রক্তের টান যাবে কোথায়! কেন এই পোড়া দেশে রামমোহন, রবিঠাকুর জন্মাল! 'এই হয়', সাহেবে বলে: 'জাত ওঠে পরে।' কিন্তু কেন হয়? 'এই জীবনের রীতি।' কিন্তু কার জীবনের রীতি? জীবন তো তোমার আমার সকলের, আর রীতিও তো আমার তোমার সকলের সৃষ্টি। উত্তর আসে, 'প্রকৃতির নিয়ম।' আরে মশাই, প্রকৃতির নিয়ম তো প্রকৃতির ভেতর আমরাই ঢুকিয়েছি। 'না, না, প্লেটো বলেছেন।' তিনি যাই বলুন না কেন, তাঁর পরে অন্যে অন্য কথা বলেছেন। ধরা যাক, প্রকৃতির নিয়ম প্রকৃতি দেবীর বাপের সম্পত্তি— স্ত্রীধন, তবু মানুষের নিয়ম আলাদা— অনেক দূর পর্যন্ত আলাদা, এবং ততদূর পর্যন্ত ওঠা-পড়ার পরে আবার ওঠার চিন্তা না করে সে থাকতে পারে না। অবশ্য বাঙালী যদি মানুষ হয়। এইখানেই গোলমাল বাধছে। তাইতেই মন গেল বিগড়ে। এসেছিলাম রসের সন্ধানে, মাটিতে জড় খুঁজতে। রস মাথায় থাক, কলে জল নেই, রাস্তার ধুলো কানপুরকে লজ্জা দেয়। আর জড়? মনের জড় আঁস্তাকুড়ে মিলবে এমন আশা কল্লোল-কম্যুনিস্ট সাহিত্যিকদের পক্ষে সম্ভব, আমার পক্ষে নয়।

বন্ধুরা সেদিন এসেছিলেন। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সর্বত্রই স্ট্যাণ্ডার্ড পড়েছে তাঁরা অস্বীকার করতে পারলেন না। আমিও সেটা মেনে নিয়ে একটা ব্যাখ্যা দিলাম। বুঝলেন কি না জানি না; আর না বুঝলেই বা করছি কী? তাঁরা চাইছিলেন গরম গরম কথা শুনতে। পারি নি শোনাতে। ওধারে রাজাজী ঢালছেন গুড়, আমি কী করে নিমপাতা দিই? তা ছাড়া, তখন পর্যন্ত আবহাওয়াটা বুঝতে পারি নি। ইতিমধ্যে সাহিত্যের বাকি-বকেয়া শেষ করলাম। প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের গত দু'বছরের লেখা নতুন জনপ্রিয় বইগুলো কিনে পড়লাম। নাড়ী, মনে হচ্ছে, পেয়েছি। কিন্তু পেয়ে মন গেল আরো খিঁচড়ে।

* * * *

বন্ধুরা যখন এলেন তখন রাস্তার ধুলো, পাশের বাড়ির ধোঁয়া, ঝিদের চেঁচানি ও একটি আধুনিক গানের রেওয়াজ থেকে বাঁচবার জন্যে দোর-জানলা বন্ধ করে বসে আছি।

তাঁহারা : হলো কি ?

আমি : হবে আবার কী ? এমন কিছু নয়, ছোট্ট-খাট্ট অসুবিধে মিলেমিশে বিরাগ পয়দা করেছে। জওহরলালের মতন আমারও বনবাসী হতে প্রাণ চাইছে, নেহাৎ, প্যাটেল সাহেবের মতন মঞ্জুরী।

তাঁহারা : তীর্থস্থানে, কী ঐ অঞ্চলে আপনার কোনো বন্ধুজন আছে কি ?

আমি : আবদুল্লার 'ডান হাত' আমার ছাত্র, আরেক ছাত্র মাড়োয়ার ছেড়ে, কলকাতা না এসে, বোম্বাই শহরে কর্মশীলতার পরিচয় দিচ্ছে। আমাদের অঞ্চলে অধ্যাপনার লাভই ঐ। আমি করাচীতে পর্যন্ত গিয়ে থাকতে পারি।

তাঁহারা : করাচী !

আমি : আজ্ঞে হ্যাঁ, করাচী। আপনাদের 'ডাহা' নয়, সমুদ্রধারের করাচী, সিন্ধ, হীরে-জহরতের দেশ করাচী, পাকিস্তানের রাজধানী করাচী, যেখানে আমার ছাত্র— ছাত্র ঠিক নয়, ছাত্রী, অত্যন্ত প্রভাবশীলা। তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী। আমাদের কাছে ইকনমিক্‌স্‌-এ ফার্স্ট ক্লাস পায়— বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে আমাকে করাচীতে সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ি খুঁজে সহজেই দিতে পারে। দেখুন, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. সি. এস. প্রভৃতি জীব বেরোয় নি বটে, তবে পলিটিশিয়ান বেরিয়েছে বিস্তর। আমার এক ছাত্র যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী, তিনি আবার বাড়ি ঘরদোরের কর্তা। অতএব কলকাতা ছাড়লেই যে জলে পড়ব ভাববেন না।

তাঁহারা : না, না, তা ভাবব কেন ! তবু এলেনই বা কেন ?

আমি : একটি পারিবারিক কারণে। বিবাহ হয়, কারণ বিবাহে আমি যোগ দিই না। আসল কথা, শেকড় খুঁজতে এসেছি, রস সঞ্চার করতে এসেছি। মাতৃভাষা, মাতৃভূমি থেকে বেশি দিন দূরে থেকে মনপ্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে মনে হলো। তা ছাড়া, আপনারা আমার বহুদিনকার বন্ধু, আপনাদের কাছে মনের কথা খুলে বলতে দ্বিধা নেই। বছর দশেক আগে শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্ত দাস আমাকে লেখা বন্ধ করতে পরামর্শ দেন। গ্রহণ করতে দেরি হলো কিছুদিন— inertiaর জন্যে— কিন্তু অন্তত সাত-আট বৎসর নিজের তাগিদে বাঙলায় বড় বেশি কিছু লিখি নি। না লিখে দেশের ক্ষতি হয় নি আমার বিশ্বাস। কিন্তু এই কয় বৎসর

বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে গোটাকয়েক জিনিস লক্ষ করলাম। মধ্যে বাঙলা মাসিকপত্র, নভেল, গল্প, প্রবন্ধ যে পড়ি নি তা নয়, পড়েছি, এবং পড়ে একটা ধারণা হয়েছে এই যে, যে-সব লেখকদের রচনা আজকাল জনপ্রিয় হয়েছে তার মূল্য সবুজ পত্র কিংবা প্রথম দশবছরের পরিচয়ের বহু রচনার চেয়ে কম, কী ভাষার, কী ভঙ্গির, কী ভাবের দিক থেকে। ভাষা আগের চেয়ে ঢিলে, এবং সমাজ সংক্রান্ত চিন্তার বিষয় ও তাগিদ ছেড়ে দিলে ভাববস্তু নেই বললেই চলে, কিংবা পুরাতন ভাববস্তুর পুনরাবৃত্তি মাত্র ; এবং ভঙ্গি একপ্রকারের ভঙ্গিমা। দু'বৎসর পূর্বে কলকাতা থেকে খান দশেক নতুন বিখ্যাত নভেল নিয়ে গেলাম, মন দিয়ে পড়লাম, দাগ মেরে পর্যন্ত। আবার এ ক'দিনে এঁদের নতুন লেখায় ওয়াকিবহাল হলাম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে…যাক্‌ গে, সাহিত্যালোচনায় রুচি চলে গেছে। মোদ্দা কথা এই, যে দেশে তারাশঙ্কর, মানিককে বঙ্কিম-শরৎচন্দ্রের পংক্তিতে ফেলা হয়, আর 'দৃষ্টিপাত' বইটিকে বাঙলা সাহিত্যে প্রথম belles letters-এর বই বলা হয় সে দেশের মূল্যজ্ঞান যা ছিল তাও নেই প্রতিপন্ন হয়। পুরাতন দলের একটা standard ছিল ; আমরা শরৎবাবুকেও প্রথম শ্রেণীর নভেলিস্ট বলি নি ; তাঁকে ঠুকতেও দ্বিধা বোধ করি নি— পরিচয়ের পৃষ্ঠা দেখুন। আরও পূর্বের একটি ঘটনা শুনুন। অজিত চক্রবর্তীর একটা ৩০।৩৫ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ প্রমথ চৌধুরীর কাছে আসে সবুজপত্রের জন্যে। তখন অজিতবাবুর সুনাম যথেষ্ট ; তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধুরন্ধর ; রবীন্দ্রনাথের প্রিয়। যতদূর মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথই লেখাটা পাঠিয়েছিলেন, কিংবা প্রমথবাবুকে হয়তো "দেখতে" বলেছিলেন। যাই হোক, লেখাটা বেরুল বটে, কিন্তু ছয় পৃষ্ঠায়। কেটে-কুটে ঐতে দাঁড় করিয়েছিলেন প্রমথবাবু। পরিচয়ের সম্পাদকও নিতান্ত মনোযোগ সহকারে সম্পাদনা করতেন। প্রমথবাবু এক অতুল গুপ্তের লেখা ছাড়া আর সব লেখার ওপরই কাঁচি ও কলম চালাতেন। এখন দেখছি সম্পাদনার বালাই চলে গেছে। লক্ষ্ণৌ থেকে যে ধারণাটি জন্মেছিল সেটা ভুল কী সত্যি পরখ করতে দেশে এসেছিলাম।

তাঁহারা : আমরাও অনেকটা আপনাদের সঙ্গে একমত ! তবে মনে হয় আপনি বয়োবৃদ্ধের মতনই কথাবার্তা কইছেন। অবশ্য স্বাভাবিক।

আমি : আমার চেয়ে অন্তত পক্ষে আট-দশ বৎসরের বয়সে বড় কেন্দ্রীয় সরকারের দু' দু'জন মহারথী এই সেদিন বিবাহ করলেন। তবে বয়স বাড়ছে নিশ্চয়। কিন্তু কয়েকদিন পূর্বেও নব্য সাহিত্যিক ও যুবকবৃন্দ

তো আমাকে বুড়ো বলে নি! ইতিমধ্যে কেবল স্বাধীনতাই পেয়েছি, যাতে বয়স কমারই কথা।

তাঁহারা : মূল্যজ্ঞান হ্রাসের কারণ কি?

আমি : সেদিন তো বললাম। কারণ— এক গগনের একটি গ্রহ নয়, সব দুষ্টগ্রহ জড়ো হয়েছে আমাদের ভাগ্যে। আপনাদের কি মনে হয়?

তাঁহারা : দেশে মাথা নেই। একে একে সবই গেলেন।

আমি : একে একে নিভিল দেউটি।

তাঁহারা : একটা শূন্যতা, একটা বিরাট হাহাকার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বাঙলা গেল। আমাদের মতে নেতার অভাব ও গত কয় বৎসরের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা, এই দু'য়ের যোগাযোগে আমাদের মূল্যজ্ঞান ধ্বংস হয়েছে।

আমি : নেতা, মাথা, কাঁরা, কাঁদের? চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, সুভাষ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। সেই পরিমাণের দিক্ থেকেও একটা ক্রমহ্রস্বমান ধারা লক্ষ করেন নি কি? সুভাষ যতদিন দেশে ছিলেন তত-দিন বাঙালীরা বলতেন চিত্তরঞ্জন বেঁচে থাকলে দেশের এই ধরনের রাজনৈতিক পতন কখনও হতো না। সুভাষের বিপক্ষে এর চেয়ে অনেক কড়া মন্তব্য স্বকর্ণে শুনেছি। আচ্ছা, আমাদের নেতারা কী কোনো সাহি-ত্যিক মানদণ্ড খাড়া করেছিলেন? সাহিত্যিক জ্ঞান দেশবন্ধুর খুব বেশি ছিল না জেনে রাখুন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝতেন না, হেয় জ্ঞানই করতেন, এবং তাঁর মতে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন জিনিয়াস। তাঁর কবিতা মোটেই উচ্চশ্রেণীর ছিল না। দেশপ্রিয় ছিলেন ভদ্রজন; সাহিত্য-রুচি সম্বন্ধে তিনি কোনোও প্রমাণ রেখে যান নি। আর সুভাষ, তাকে আমি জানতাম তার ছাত্রাবস্থা থেকে। তার প্রাণশক্তি ছিল প্রচুর— অমনটি কারুর দেখি নি। সে যুবাবয়সে ভালো বই পেলেই পড়ত, গিলত! কিন্তু সাহিত্যে দেশের প্রাণবস্তুই সে খুঁজত; সাহিত্যে কেন সর্বত্রই; তার কাছে সর্বাগ্রে প্রাণ, তারপর চিন্তা। বেঁচে থাকলে তার প্রাণস্পর্শে আমাদের সাহিত্য জোরালো হতো নিশ্চয়; সে বহু গরীব সাহিত্যিককে সাহায্য করত টাকা দিয়ে, চাকরি জুটিয়ে, খাতির দিয়ে। বোধহয় সে একটা Academy-ও খাড়া করত। তার অবর্তমানে প্রাণেরই ক্ষতি হয়েছে।

তাঁহারা ; সাহিত্যে প্রাণের অভাব বোধ করেন না?

আমি : নিশ্চয়ই করি। কিন্তু সাহিত্যের প্রাণদান মাত্র নেতার কাজ নয় আমার বদ্ধ ধারণা। যে প্রাণ স্ফুরণে নেতার উৎপত্তি সেটা সমগ্র

জনগণের প্রাণ, ও সেই গণপ্রাণের অন্য প্রকাশ সাহিত্য। একই উৎসের দুটি ধারা। নেতৃবৃন্দের কৃপায় সাহিত্যের, কলার, বিজ্ঞানের, রুচির সর্বনাশ সাধনের বহু দৃষ্টান্ত জগতে রয়েছে।

তাঁহারা: অর্থাৎ আপনার বিশ্বাস যে দেশের পলিটিক্যাল নেতৃত্বের ফলে সাহিত্যের কোনো প্রকার উপকার হয় নি?

আমি: তা ঠিক নয়। আমাদের দেশে 'নেতৃত্বের' জোরে সাহিত্যিক মানদণ্ড উঁচু হয় নি, কিংবা বজায় থাকে নি। জওহরলালের আত্মজীবনী বলবেন? বইটা ইংরেজীতে লেখা। তা ছাড়া জওহরলাল মূলত সাহিত্যিক; কেবল তাই নয়, সজ্ঞান সাহিত্যিক, নাট্যকার বলতে পারেন। তাঁর রচনা নাটকীয়, ব্যবহারও তাই, অর্থাৎ নটের। পৃথিবীকে, ভারতবর্ষকে তিনি নাট্যমঞ্চ হিসেবে দেখেন। এইখানেই তাঁর সততা, তাই তাঁর standard রীতিমতো উঁচু। তারপর......

তাঁহারা: সাহিত্যিকদের ধরুন। আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র গত এবং তাঁদের অবর্তমানে শূন্যতা এসেছে সাহিত্যে।

আমি: নিশ্চয়ই মানি। সেই জন্যে বুঝি শূন্যতা বোঁজাতে ধুলো আর শালপাতা? আচ্ছা, এক নিঃশ্বাসে দু'জনের নাম নিতে বুকে বাধে না? শরৎচন্দ্রের বাধত জানি। দিলীপকুমারও জানে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন।

তাঁহারা: ঐতিহাসিক ধারা হিসেবে......

আমি: ঐতিহাসিক ধারা হিসেবে, হ্যাঁ জানি, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যপাঠের পর রবীন্দ্রনাথের বলাকা। ভগবান ছেড়েছেন, হিন্দুধর্ম, মনুসংহিতা, রঘুনন্দন ছেড়েছেন, ধরা যাক ছেড়ে ভালোই করেছেন, কিন্তু তাদের স্থানে ইতিহাসকে বসাতে বুদ্ধিতে টান পড়ে না? মার্কসিজমের গরহজম! **History says: Offence against History: Our Historical Destiny; Historical forces dictate**...এ সব ভূতুড়ে মন্ত্র। কিন্তু ভূত ছাড়ে না তাতে। যাই হোক...রবীন্দ্রনাথের মূল্যজ্ঞান বিচার করুন। পারবেন, না তার বদলে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি ছিলেন, তাঁর তুল্য প্রতিভা জগতে দুর্লভ বলে, তাঁর গান বেসুরো গেয়ে, তাঁর কবিতা পাকিস্তানী বাঙলায় আবৃত্তি করেই ক্ষান্ত হবেন?

তাঁহারা: তাঁর বিচার আমরা করব এমন ধৃষ্টতা আমাদের নেই— জানি আপনার আছে। না হলে আর অধ্যাপক!

আমি: সাহস নিশ্চয়ই আছে। আপনাদের স্বপক্ষে তাঁরই একটি মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি একবার একজন অখ্যাতনামা

সাহিত্যিকের নভেলের রূঢ় সমালোচনা করেন। অবশ্য তাঁর পক্ষে যতটা রূঢ় হওয়া সম্ভব ছিল তাই ; তবু রূঢ়। আমরা খুশী হই, এবং তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে যাই। গিয়ে কী দেখলাম জানেন ? ভদ্রলোক ভীষণ অনুতপ্ত। বললেন, 'কেন আমি লিখতে গেলাম ! সে ও আমি উভয়েই কালের বিচারালয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।' এই রকম আরও কয়েকটি ঘটনা মনে পড়ছে।

তাঁহারা : তবেই বুঝুন !

আমি : তবু তাঁর সমালোচনার মানদণ্ড উঁচু ছিল। বঙ্কিমকে পর্যন্ত তিনি ছাড়েন নি— এ কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, আপনাদেরও দিচ্ছি। শেষবয়সে তিনি একটু soft, একটু নরম, একটু **tender** হয়েছিলেন। তবু আমাদের একবার উপদেশ দেন, 'তোমরা সমালোচনার মর্যাদা বাড়াও। ভদ্রতা তোমরা রক্ষা করবে আমি জানি। তবে এমন লোককে ধরো যে ভার সইতে পারে।' অর্থাৎ ছুঁচো মেরো না। যা সামান্য কিছু সমালোচনা তিনি রেখে গেছেন তাইতে তাঁকে বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলতে আমি দ্বিধা করি নি। তবু কী জানেন ! প্রধানত তিনি সাহিত্যের রসবস্তুই বিচার করেছেন ; তার প্রকৃতি-বিচারই ছিল তাঁর প্রধান বিষয়। তা ছাড়া তাঁর অন্য বিষয় ছিল না বলছি না, কিন্তু তাঁর আগ্রহ ছিল মূলের প্রতি। একটা মোটা কথা তিনি ধরতেন, এবং তাকে আশ্রয় করে তিনি নিজের জগতে চলে যেতেন। চলে যেতেনও বলতে পারেন, আবার ফিরে আসতেনও ভাবতে পারেন। তাঁর সমালোচনার মারফৎ আমরা বিষয়ের চেয়ে তাঁরই রচনাশৈলী, তাঁরই বক্তব্য উপভোগ করতাম। এর মজা আছে, এতেও উপকার হয়, এতেও ঝাণ্ডা উঁচা রহে, কারণ তাঁর সৃষ্টি ছিল, তিনিই ছিলেন উঁচু, আলোচ্য সাহিত্যিকের অপেক্ষা অনেক উঁচু এবং বিষয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু এই আদর্শবাদী, ভাবাশ্রয়ী, **impressionistic** আলোচনার বিপদ এইখানে। যার **impression** মানবো সে ব্যক্তিটির নিজে বড় হওয়া চাই। রবীন্দ্রনাথ চালিয়ে গেলেন কিন্তু তারপর ? আপনার আমার আলোচনার জন্যে তাঁর 'আদর্শ' ছাড়া কী রইল ? —**Which is an exercise in memory, after all is said and done.**

তাঁহারা : তার বেশি কী চান ? আমরা অন্তত চাই না।

আমি : তার বেশি নয়, তা-ছাড়া। সে-ছাড়া অন্য ধরনের সমালোচনাও আছে। যেমন টেক্‌নিক্যাল সমালোচনা। টেক্‌নিক্ সাধারণে

বোঝে না, এটা মস্ত ভুল। আমরা টেক্‌নিক্‌ই শিখতে পারি; আমরা ভাবব্যঞ্জনা, দর্শন প্রভৃতি বুঝি না। যে ছাত্র বই পড়ে, মন দিয়ে টিউ-টোরিয়াল প্রবন্ধ লেখে, নিজের নোট নিজে তৈরি করে, অর্থাৎ অধ্যয়ন-রীতির টেক্‌নিক্‌ যার করায়ত্ত, সে কখনও তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করে না, প্রথম শ্রেণী হয়তো পায় না, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণী সে পেয়েই যায়। লক্ষ্ণৌ-এর সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা গায়ক হয় নি, কিন্তু কারুর গান অশ্রাব্য নয়, কারণ সকলেই সাধনা করেছেন, সকলেই প্রায় রাগ-তালে পাকা। বিজ্ঞানের গবেষক বিজ্ঞানের আঙ্গিকে পোক্ত হলে একটা কিছু দাঁড় করাতে পারে। এবং এই ধরনের লোকের সংখ্যাধিক্যের ওপরই দেশের মান-পরিমাণ, মূল্যজ্ঞান নির্ভর করে, কারণ সেই **standard**-এর শীর্ষরেখাতেই গৌরীশৃঙ্গ, কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শনলাভ ঘটে। সমতলভূমি থেকে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে একমাত্র জাপানের ফুজিয়ামা, ছয় গোষ্ঠী, এবং তাই জাপানের পতন হলো, তাই জাপানের সামগ্রী 'জাপানী মাল', অর্থাৎ ঠুনকো, একমাসের বিলাস। গৌরীশৃঙ্গ থাকুন, কিন্তু আশেপাশে হাজার দশবারো ফুটের পাহাড় চান না? কোল্‌রিজ ছিলেন বিরাট সমালোচক, তাই বলে সাহিত্যের অধ্যাপক কেউ থাকবেন না বিশ্ববিদ্যালয়ে? রবীন্দ্রনাথ টেক্‌-নিক্যাল সমালোচনা করতে ভালোবাসতেন না— এক ছন্দ ছাড়া, তাও বিশেষ কোনো কবির ছন্দ নয়। অথচ আমাদের এখানকার প্রধান প্রয়োজন তাই, **standard** উঁচু করতে, অন্তত যেটুকু ছিল সেটুকুও বজায় রাখতে।

তাঁহারা : শরৎচন্দ্রের সমালোচনা···

আমি : তাঁর বৈঠকখানায় হয়তো বা দু'একবার তাঁর মুখ থেকে সাহিত্যসংক্রান্ত মন্তব্য শুনেছি, কিন্তু কাগজে কলমে কৈ এমন কী রেখে গেছেন? কথাবার্তায় তিনি সাধারণত দায়িত্বহীন ছিলেন, মজা ঠাট্টাই তিনি করতেন, অন্তত আমার এই অভিজ্ঞতা।

তাঁহারা : চমকে দিলেন মশাই। তাঁর সৃষ্টি···

আমি : হ্যাঁ, তাঁর সৃষ্টি তাঁর চেয়ে মহান মানছি। আমার মতে, তিনি মূলত **derivative** লেখক ছিলেন।

তাঁহারা : আজ আপনার ঘাড়ে ভাঙনের দৈত্য চেপেছে।

আমি : যাই বলুন। তাঁর ভাষা বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সহজ সংস্করণ। তাঁর ভাববস্তুতে চিন্তার অংশ নিতান্ত কম ছিল; যতটুকু ছিল ততটুকু হৃদয়গ্রাহী কিন্তু মামুলি। এক ধরনের মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন, এই ছিল তাঁর শক্তির মূলধন। সহানুভূতি জিনিসটা খুব দামি। কিন্তু সেই

অনুভবের পেছনে কোনো বিশাল সমাজবোধ তাঁর ছিল না। আর সেটি না থাকলে আসে করুণা, কৃপার বন্যা। **O, Humanist, beware a pity!** তাঁর কোন্ চরিত্রগুলো আমাদের পছন্দসই বলুন তো? যারা সমাজ মানল না, যারা সমাজের বাইরে, যারা ভবঘুরে, অকর্মণ্য, সমাজের শাসন না বরদাস্ত করতে পেরে যারা গ্রামের কোণে আশ্রয় নেয়, বর্মা পালায়। তারা ঠিক পলাতক নয়, escapist নয়, তারা সমাজসীমার বাসিন্দা, **marginal beings, fringe creatures!** নয় কি? কেন এটা হয় ভেবে দেখুন। এর কারণ একপ্রকারের **protestantism!** বেশ কথা! সমাজের চাপ সহ্য করতে না পারার মধ্যে মনুষ্যত্বের চিহ্ন আছে নিশ্চয়। কিন্তু ঐ চিহ্ন মাত্র। জ্বরের উত্তাপ জ্বর নয়, জ্বরের কারণ নয়। বিরুদ্ধতা— মনুষ্যত্ব নয় নিশ্চয়। ব্রাহ্মরা বিরুদ্ধাচরণ অনেকদিন থেকে করে আসছেন; কিন্তু তাছাড়াও তাঁরা মানুষ; পুরো না হলেও মানুষ। শরৎবাবু নিজেই অবশ্য নিজের গলদ খানিকটা আন্দাজ করেছিলেন। তাঁর একটা অদ্ভুত সততা ছিল। ত্রুটি ক্ষালনের জন্যে দুটি কাজ তিনি করলেন— (১) **human values**-এর ওপর জোর দিলেন। কিন্তু ফলে কী হলো দেখুন। ফল বক্তৃতা, যেটা 'পথের দাবী'তে, 'শেষ প্রশ্নে' ছড়াছড়ি যাচ্ছে। তাঁর নায়ক-নায়িকা গরম গরম মতামতের সমষ্টি মাত্র। সাহিত্যিককে যেই মতামতের আশ্রয় নিতে হয় অমনই তিনি **derivative** হয়ে যাবেনই যাবেন, যদি তিনি একই সঙ্গে মনস্বী না হন। সে বদনাম শরৎবাবুকে কেউ দিতে পারবে না। সাহিত্যে সীস্টেম চাই বলছি না। গ্যেটে যখন **Wilhelm Meister**-এর প্রথমাংশ লেখেন, যেখানে নায়ক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন গ্যেটের কোনোও পাকা ফিলজফি তৈরি হয় নি, কিন্তু তখনও তাঁর একটা জীবন-দর্শন ছিল, কিংবা তৈরি হচ্ছিল ঐ নায়কের চলন্ত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে। শ্রীকান্তের কোনো অংশকে **Lehrjhare,** কী **Wanderjhare** বলতে পারেন? শ্রীকান্তের পরিবর্তিত ব্যবহার থেকে কোনোও জীবন-দর্শনের নতুন সঞ্চয়, সংজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা, কী ব্যাখ্যা পেয়েছেন, যা **Wilhelm Meister**-এর দ্বিতীয় খণ্ডে পান? শ্রীকান্ত কতটুকু বদলেছে? **Human values are not enough for literature.** (২) দ্বিতীয় কাজ— প্রত্যাবর্তন, যথা বিপ্রদাসে। **Original** আর্টিস্টরা অমন **prodigal son**-এর মতন ফিরে আসেন না। তাঁরা এগিয়ে চলেন। বিলেতে আজকাল বহু লেখক ক্যাথলিক হচ্ছেন জানি। তাঁদের লেখার সঙ্গে আমরা আজ অনেকেই পরিচিত। কিন্তু তাঁরা মনুষ্যত্বের মূল্য বেশি দেবার জন্যে ক্যাথলিক হন নি, তাঁরা ক্যাথলিক হয়েছেন

প্রোটেস্ট্যাণ্ট সভ্যতার, আণবিক বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিত্বের অরাজকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের তাগিদে, এবং হতাশায় একটি পরিচিত নৈর্ব্যক্তিক, অ-মানবিক বাঁধাধরা সমাজ বিন্যাসের সন্ধানে। ধর্ম পরিবর্তনের ফলে, প্রত্যাবর্তনের শক্তিতে তাঁরা **greater humanist** হন নি। পূর্বে শরৎবাবুর যতটুকু মনুষ্যত্বের ওপর মমতা ছিল তার হ্রাস হয়েছে বিপ্রদাসে। হিন্দু পরিবারে জন্মে হিন্দু সমাজে ফিরে আসার মধ্যে মৌলিকতার চিহ্ন নেই, সহানুভূতি কম্‌তিরই নিদর্শন আছে। এ-জন্যেও তিনি **derivative**। তিনি নিশ্চয়ই **humanist** ছিলেন—কিন্তু তাঁর **humanism** বিশাল মানবকে অধিকার করতে পারে নি, তাই তাঁর রচনা থেকে কোনোও উঁচু **standard** প্রত্যাশা আমরা করি নি। এখনও করি না। এবং যখন তিনি ছোট্ট একটি মানুষকে ধরতেন তখনই তিনি সার্থক হতেন ; কিন্তু সেই সঙ্গে কুয়াশার মতন চরিত্রকে ঘিরে থাকত কৃপা, করুণা, দয়া এবং সস্তা, নীরেন রায়ের ‘বস্তাপচা’ কথাটি ব্যবহার করতে চাই না, তবু একটা সস্তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ‘কন্দন্’। বৃহৎ চেতনার অভাবে তাঁর রচনা মিষ্টি হলেও দুর্বল। হয় সমাজ পরিত্যাগ, না হয় কথায় কথায় গুরুজনের পায়ের ধুলো নেওয়া। এই ‘হয়, না-হয়’-এর দ্বন্দ্বে তিনি ছিলেন জর্জরিত। এই প্রকার চেতনা-বিমুখ সাহিত্যিকের কাছ থেকে উঁচু মানদণ্ড আশা করাই অন্যায়। জওহরলালের কী দশা হয়েছে দেখেছেন তো? মহাত্মাজীর তুলনায় তিনি যেমন গৌণ, তেমনই রবীন্দ্রনাথের তুলনায় শরৎচন্দ্র।

তাঁহারা: আজকালকার আধুনিক, প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

আমি: আজ যদি জিজ্ঞাসা করেন তবে কেবল তাঁদের প্রতি নয় আমার প্রতিও অবিচার হবে। তাঁদের অনেক লেখা পড়লাম বটে ; কিন্তু একটু সময় চাই।

তাঁহারা: তবু, মোটামুটি? বলতেই হবে আপনাকে, কারণ আপনার বক্তব্য তাঁদেরই সম্বন্ধে। আমরা টেক্‌নিকাল কিছু চাইছি না।

আমি: মোটামুটি মন্তব্য করা যে যায় না তা নয়। একটা সমাজ-চেতনার সন্ধান চলছে। আমি প্রয়াসটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। পূর্বতন সাহিত্যে সমাজবোধ ছিল না তা নয়, কিন্তু সেটা, ঐ যা বলেছি, করুণা, দয়া, হৃদয়বৃত্তির পরিচালনা। বুদ্ধির দিক্ থেকে বিশেষ কিছু বিচার হয় নি। কাম-প্রবৃত্তির আলোচনায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ তখনকার আধুনিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবু সেটা সমাজ-চেতনা নয়, **romantic revolt** মাত্র।

একটু বৈজ্ঞানিক ভাবে কাজ শুরু হলো প্রগতিশীল মার্কস্‌পন্থী সাহিত্যিকের হাতে। সেটা এখনও চলছে। এরই ভেতর পড়েন তারাশঙ্কর, মানিক, বিষ্ণু ও আরও দু'চারজন। যতদূর জানি এঁরা কেউ কম্যুনিস্ট নন। **Fellow-traveller** বলতেও রাজি নই; অর্থাৎ ফ্যাশানের জন্যে তাঁরা এদিকে অগ্রসর হয়েছেন মনে হয় না। আর ফ্যাশানটাই বা এত ঘৃণ্য কিসের? যতদূর এঁরা প্রয়াসী ততদূর পর্যন্ত এঁদের বুঝতে চেষ্টা করি।

তাঁহারা : সকলকে বুঝতে পারেন?

আমি : না, পারি না। খানিকটা বোধহয় নিজের দোষে, কিন্তু সবটাই তাই ভাবতে আত্মসম্মানে ঘা লাগে। আমার মনে হয় তারাশঙ্করের সমাজবোধ বিষয়-নির্বাচনে এবং মতামতেই প্রায় নিঃশেষিত। এখন পর্যন্ত সেটাকে হজম করে রক্তে ও পেশীতে পরিণত করতে তিনি পারছেন না। তাঁর ভাষায় ও গল্পের কাঠামোয় আমি অন্তত এখনও কোনোও **muscle** পাই নি; যেন সেটি নড়বড় করছে, শিথিল, একটু ভুঁড়ি বেশি, হাত-পা আছে, কিন্তু ল্যাঙপেঙে। **He is an untidy writer.** ভাষা ও ভঙ্গির অপরিচ্ছন্নতা হয় শুচিতার অভাবে। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনারা নিছক অভিজ্ঞতার কী মতামতের বাঁধনকে ধৃতি বলেন কি? অথচ আর্টিস্টের ধর্ম নেই, এ কেমন কথা? ধর্ম মানে যেটা ধরে রাখে। আচারের অংশ এর মধ্যে খুব বেশি। আচার মানে শুচিবাই নয়, মানে **ritual, technique**। কিন্তু এ-যেন কলকাতার পুরুত ঠাকুরের বেলা দশটার মধ্যে পাঁচবাড়ি যাজন দেওয়া। তারাশঙ্করের আচার-ধর্মে শুদ্ধতা পাচ্ছি না, কেননা তাঁর বোধহয় ভাববার সময় নেই, তাঁকে লিখতেই হবে। বাল্‌জাকও অজস্র বই লিখতেন, আবার ট্রলপও লিখতেন। কিন্তু তফাৎ আকাশ-পাতালের। অবশ্য তাগিদে লেখক নষ্ট নয় না,— বাল্‌জাক দেনা শোধ দিতে দিতে মরে গেলেন। বাল্‌জাকের সঙ্গে তুলনা করছি না তারাশঙ্করকে— অতটা পাগল এখনও হইনি। আমি **standard** কিসে যায় ও কিসে যায় না দেখাবার জন্যেই বাল্‌জাকের নাম উচ্চারণ করলাম। সাহিত্যিক নষ্ট হয় তাগিদের সঙ্গে সঙ্গে চেতনাকে সমৃদ্ধ না করতে পারলে, আচারশুদ্ধতা বজায় না রাখতে পারলে। আবার বলছি আচার মানে আঙ্গিক সম্বন্ধে সচেতনতা, অর্থাৎ **standard**। তারাশঙ্করের এখনও পর্যন্ত কোনোও **standard** নেই। বছর কয়েক কলমকে বিরাম দিতে হতে পারে আমার বিশ্বাস। তাঁকে নিয়ে এই হৈ-চৈ তাঁর পক্ষে যেমন অশুভ তেমনই আমাদের পক্ষেও অশোভন, রুচি-ভ্রমের চিহ্ন। অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা এখনও পাকা হয় নি।

তা ছাড়া তিনি ব্যক্তিগত ভাবে বিনয়ী কী দাম্ভিক জানি না। তবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস তিনি একটা বড় জিনিসের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। জীবনের প্রতি আগ্রহ তাঁর সবল; সমাজবোধ তাঁর আছে; সমাজের পতন-উত্থানের কারণ তিনি খানিকটা ধরতে পেরেছেন। তাঁর ধারণায়, ও বিশেষত তাঁর আঙ্গিকে, বিস্তর গলদ আছে, তবু···আর কোনোদিন এই নিয়ে আলোচনা হবে। কেমন?

তাঁহারা: মানিক বাবু?

আমি: আমি বরাবরই মানিকের লেখার ভক্ত, এবং তাকে তার যুবাবয়স থেকে চিনি, তাই প্রাণ খুলে তার দোষগুণ দেখাতে পারি। আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রেমেন মিত্রের পর এমন ভালো গল্প কারুর হাত দিয়ে বেরোয়নি। দু'চারটি হীরের টুকরো। ওর গল্প পড়তে-পড়তে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু সেগুলো ছেড়ে দিলে কী থাকে? তাঁর sense of construction নেই। সে স্টেজে ঢুকতে জানে, বেরুতে জানে না; আর পাদপ্রদীপের সামনে আড়ষ্ট হয়ে সে অস্পষ্ট আবৃত্তি করে, গা চুলকোয়, কোথায় হাতদুটো রাখবে ভেবে পায় না। কিন্তু সে ভাবছে। এখনও তার ফল ফলেনি, তবে ভাবছে। বোধহয়, নিতান্ত ভয়ে-ভয়ে বলছি, ভগবানদত্ত ক্ষমতা তার সবচেয়ে বেশি, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার এখনও পর্যন্ত করে নি। চেষ্টা করছে জানি। এই জন্যে প্রগতিশীল সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা তার পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু তাকে ছেড়ে দিতে হবে ওদের সঙ্গ কিছুদিন পরে। একটা মতের কাঠামোর মধ্যে চিরকাল থাকলে তার সর্বনাশ হবে। হ্যাঁ, বুঝতাম মতামত হজম করবার তার ক্ষমতা আছে, তবে সে বড় আর্টিস্ট হতোই হতো। কিন্তু ওটা তার ধর্ম মোটেই নয়। এমন লোক এমন অবস্থায়, নিজের চেষ্টায়, দেশের standard উঁচু রাখতে পারে না।

তাঁহারা: আর বিষ্ণু দে?

আমি: তার সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করতে আমি গররাজি। সে নিশ্চয় আমার চেয়ে, এবং বোধহয় আরও অনেকের চেয়ে, বেশি পড়েছে, বেশি ভেবেছে, বেশি বুদ্ধিমান, যদিও ভীষণ অভিমানী। সে সত্যিই প্রগতিবাদী, তার বক্তব্য আছে, এবং বোধহয় তারই আছে। বিষ্ণু বয়সে বেশি না হলেও অনেকদিন ধরে লিখছে এবং সত্যিই ভালো কবিতা লিখেছে; কিন্তু এখনও তার standard রক্ষার প্রচেষ্টা পরীক্ষাশীলতা থেকে মুক্ত হয় নি।

তাঁহারা : বাকিরা ?

আমি : বাকি বলছেন কেন তাঁদের ? বুদ্ধদেব, বিভূতি বন্দ্যো-পাধ্যায় বনফুলের standard traditional হলেও standard। বাঁধন আছে তাঁদের রচনায়। এবার আমি গোটাকয়েক প্রশ্ন করি ?

তাঁহারা : প্রশ্ন ? নিশ্চয়ই, আপনার অধিকার আছে। কিন্তু দেরি হচ্ছে না ?

আমি : "We have not yet decided about the existence of God, and you want us to take food !" যতদিন দেশ পরাধীন ছিল ততদিন অধিকার, অধিকার, অধিকার ; এখন আমরা স্বাধীন, এখন দায়িত্ব-বোধ। আমি দায়িত্ববোধেই প্রশ্ন করছি। আচ্ছা, স্বাধীন ভারতে সাহিত্যিক বিচারের মানদণ্ড পরাধীন ভারতের সাহিত্যিক মানদণ্ডের চেয়ে উঁচু হবে, বা নীচু হবে, না সমান থাকবে ?

তাঁহারা : এ আবার একটা প্রশ্ন ! নিশ্চয়ই উঁচু হবে। কিন্তু বললেই চলবে না তো। ধীরে ধীরে উঁচু করতে হবে। উন্নতির, অভিব্যক্তির একটা ক্রম আছে। কার্ল-মার্কস্ যেমন বলেছেন— সেদিন দেখছিলাম ক্রিস্টফার হিলস্-এর একটা বক্তৃতায়, বিলেতী Listener-এর পাতায়।

আমি : Reader's Digest-এ নয় তো ? কী দেখলেন ?

তাঁহারা : কার্ল মার্কস্ বলেছেন যে বুর্জোয়া সমাজ থেকে সোশ্যালিস্ট সমাজে পৌঁছবার ধাপ আছে, ধাপে-ধাপে এগোতে হবে। তবেই দেখুন !

আমি : দেখতে পাচ্ছি না।

তাঁহারা : আগে বুর্জোয়া সাহিত্যই হোক, তারপর…অর্থাৎ…

আমি : বেশ, আপনাদের কথাই মানছি। বাঙলা দেশের standard কী বুর্জোয়া সাহিত্যের সমান ? ডিকেন্স, জর্জ এলিয়টের মতন নভেল লিখেছি আমরা ? এমন কি বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের মতন ? মাইকেলের মতন কবিতা ? দীনবন্ধুর নীলদর্পণের মতন নাটক দেখেছেন ?

তাঁহারা : ওঁরা ছিলেন মহাপুরুষ।

আমি : অর্থাৎ ভগবানের কৃপা ! তা হলে আমার মুখ বন্ধ। তা হলে আর কার্ল মার্কসের নাম তুলবেন না। তিনি ছিলেন শয়তান। ভগবান আর শয়তান, উভয়েরই ওপর নির্ভর করলে বিপদে পড়তে হয়। আপাতত দু'জনকেই শিকেয় তুলে রাখা যাক। কী বলেন ? আরেকটি প্রশ্ন করি ?

তাঁহারা : আজ দেরি হয়ে গেল। আগামী সপ্তাহে আসব। ইতিমধ্যে প্রশ্নগুলো শুনিয়ে রাখুন।

* * * *

বাঙলার আত্মা বহুখণ্ডিত। বাঙলার দেহ নোংরা— এমন নোংরা দেশ, কলকাতার মতো এমন জঘন্য নোঙরা শহর পৃথিবীতে নেই বোধহয়। পাশের বাড়ির ঝি প্রতিদিন অন্যের বাড়ির উঠোনে জঞ্জাল ফেলছে, নিজে পরিষ্কার করছি, জোড়হাতে বাসিন্দা প্রতিবেশীকে অনুরোধ জানাচ্ছি, কর্পোরেশন্‌কে জানাচ্ছি, কিছুই হচ্ছে না। কলেরা, প্লেগ, বসন্ত খাসা চলছে। আর চলছে বাঙলা সাহিত্য, আর্ট সমালোচনা, বিদেশী তৃতীয়-শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার মতামতের অনুবাদ, পাশের বাড়ির ঝিদের আঁস্তাকুড়।

অথচ হরিচরণবাবুর অভিধান শেষ হলো একটি মানুষের ছত্রিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে। অথচ সত্যেন বোস 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে বাঙলা মাসিক পত্রিকার মারফৎ আধুনিক গবেষণার প্রচলন করছে। বাঙলা ভাষায় টেক্‌নিকাল শব্দের অনুবাদ চলছে। বিজ্ঞানে, আইন আদালতে, সরকারী দফ্‌তরে নতুন শব্দের প্রচলন হচ্ছে। তবু এগুলো শব্দতত্ত্বের ব্যাপার, সাহিত্য সৃষ্টি নয়। সত্যেন বলছিলেন কাজ করবার ছেলে পাচ্ছেন না এবং ছেলেরা বলছিল সমাজ-সংক্রান্ত রিসার্চ-এর পথ দেখাবার উপযুক্ত কোনোও অধ্যাপক নেই, সে সম্বন্ধে কারুর আগ্রহ নেই। কী হলো বাঙলা দেশের ? কতদিন রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঙিয়ে এ দেশ চালাবে ? সুভাষকে বাঙলা দেশ ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে না দেখছি। রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি-সভায় যা দেখলাম তাতে মনে হলো ব্যাপারটা হুজুগ। অথচ ধীরে ধীরে বাঙলা লোপ পাবে, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ চলে যাবে, মানভূম, পূর্ণিয়া কিছুই ফিরে আসবে না, থাকল কেবল কলকাতা, পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসার কেন্দ্র ভাবে, মাড়োয়ার মহাপ্রদেশের ঔপনিবেশিক রাজধানী হিসেবে। ভেবেছিলাম, তবু, বাঙলার আত্মা অবিনশ্বর, সে-আত্মা তার সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা ও তার পরীক্ষা-প্রবৃত্তির মধ্যে বেঁচে থাকবে। এখন দেখছি আমার বিশ্বাস আদর্শবাদীর বিলাস মাত্র। আজকালকার দেহতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক জরার একটি কারণ দেখান, low vigilance। বুড়ো কুকুর, ঘোড়ার, পাখির এ রকম হয় দেখেছি। মানুষের বেলাও তাই, জাতির বেলাও তাই নিশ্চয়। গ্রীক সভ্যতার ধ্বংস হয় ঐ কারণে ; গিলবার্ট মারে-র ভাষায় failure of nerves-এর জন্যে। বাঙলারও কি

তাই হলো ! মান বিভ্রম, **fall of standard** কি ঐ **failure of nerves**-এরই চিহ্ন ? কিন্তু **failure of nerves is only a good phrase.** যাই হোক, ভারত স্বাধীন হলো— **Who cares for Bengal and her literature ! Long live de-control !**

আষাঢ়, ১৩৫৫

নবম স্তবক—সাহিত্যের কথা : মানবিভ্রম

কলকাতা আসার পর পরই বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। কথাবার্তায় নিরাশাই ফুটে উঠেছিল। আমিও বোধহয় কড়া কড়া মন্তব্য শুনিয়েছিলাম। অত শীঘ্র আমার গরীবখানায় আবার পদধূলি দিয়েছেন দেখে মন খুশী হলো বেশ। যুক্তপ্রদেশে রাজাতালুকদারের বাড়ি পৌছলে উর্দিধারী নওকর জুতো সাফ্ করে দিত ; বাঙলা দেশের গ্রামে অতিথি এলে প্রথমেই হাত-পা-মুখ ধোবার জন্যে গাড়ু-গামছার বন্দোবস্ত থাকত। কলকাতা শহরে ধূলো কানপুরের চেয়ে কম ; তবু কেন যেন জুতো পরে ঘরে এলে গা কিচ্ কিচ্ করে ওঠে। ভাগ্যিস, ময়লা মাড়িয়ে ভদ্রলোকে চলে না। সেইটাই বাকি আছে কলকাতায় ! খাওয়া-দাওয়ার পাটও উঠে গেছে। সন্দেশ কেনা যায় না, আর সিঙাড়া পানিফলে পরিণত। গজেন ঘোষের আড্ডায় ঘোলের সরবৎ, চা বিলি হতো ; প্রমথবাবুর বাড়ি চিঁড়ে ভাজা, সিঙাড়া, চা, না হয় ফলের সরবৎ আসত ; পরিচয়ের বৈঠকে সুধীন দত্ত খাওয়াত দ্বারিকের সিঙাড়া ও সন্দেশ। সিঙাড়ার সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের কুটুম্বিতা আছে। কলকাতায় বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সরবৎ চলল না। আম-পোড়া, তেঁতুল, ঘোল, ডাব, তরমুজ, মায় কেস্তুরের সরবৎও বাঙালীর প্রাণে ধরল না। বোধহয়, হৃদয়টাই তরল বলে। অবশ্য খাদ্যটা কিছু আত্মার ক্ষতিপূরণ নয় ; যদি তাই হতো, তবে আমাদের সাহিত্য-আসরে আখরোটের বন্দোবস্ত করাই হতো সংগত। এই ক'দিনে দেখলাম বাঙালীরা জলও খায় না। এটা নিশ্চয় ক্যালকাটা কর্পোরেশনের বিপক্ষে প্রতিবাদে। সাবধানের মার নেই। ও অঞ্চলে অতিথিরা চা-এর পূর্বে ঢক্ ঢক্ করে সাদা পানি পিয়ে নেন। বন্ধুরা কেবল চা-ই খেলেন সবুজ রঙের

প্লাস্টিকের বাটিতে। ছিল বেলোয়ারী, হলো প্লাস্টিক! সেই সঙ্গে বাঙালীর plastic senceটা এলে মন্দ হয় না। ও-বস্তুটা বাঙালীর ছিল না, হলো না, হবে না? বাঙালী মেয়েদের স্বাস্থ্য না আসা পর্যন্ত আশা নেই। যাই হোক, আজ সংযমী হব, কেবল শুনব, আর নিরীহভাবে প্রশ্ন করব।

আমি: সেদিন **standard** নিয়ে আলোচনা হলো। কথাটার বাঙলা প্রতিশব্দ কী?

তাঁহারা: মান।

আমি: আর **fall of standard**?

তাঁহারা: মানহ্রাস বলতে পারেন।

আমি: কানে বাজে। মানবিভ্রমটা মন্দ নয়, মানসম্ভ্রমের উল্‌টো, এবং সেই কথাটাই মনে করিয়ে দেয়। রাজি?

তাঁহারা: পরিভাষিকের জন্যে একটা সমিতি বসেছে।

আমি: তাঁদের সঙ্গে **standard**-এর সম্বন্ধ নেই। সমিতিগুলো মান-হ্রাসের লজ্জাবস্ত্র। মানবিভ্রমটাই চালানো যাক। আচ্ছা, আপনারা কী সত্যিই ভাবেন ও-বস্তুটি ঘটেছে?

তাঁহারা: নিশ্চয়ই।

আমি: দিব্যি করতে পারেন, মা কালীর নাম নিয়ে?

তাঁহারা: মা কালীর নাম নিই না।

আমি: বাপুজীর? তাতে তাঁর স্মৃতির অপমান হবে না, বিলেতের বেশ্যারা **Virgin Mary**র নাম নিয়ে শপথ করত, **'By Mary'**। তাই থেকে বাঙালী ভদ্রলোকের ছেলেরা মাইরি করে নিয়েছে। ধরুন, চা-এর দোকানে, ট্রামে, বাসে যুবকবৃন্দ কথায় কথায় বাপজী বলছে; কিংবা **stock-exchange**-এ সজ্জন ব্যক্তিরা 'পাক্‌ড়ো বাপ্‌জী, ছোড়ো বাপ্‌জী' চেঁচাচ্ছে, কেমন লাগে?

তাঁহারা: ঠাট্টা ছাড়ুন।

আমি: একে ঠাট্টা বলেন? যখন কাপড়-কলের মালিক নই, এমন কী যখন কম্যুনিস্ট কী সোশ্যালিস্ট হতে পারছি না তখন উপায় কী ঠাট্টা ছাড়া? দেশের অবস্থা অন্য কোনও মনোভাব **indicate** করছে না। যাই হোক— মান ছিল?

তাঁহারা: নিশ্চয়ই। সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ···

আমি : হেম, নবীন, রঙ্গলাল, গিরীশ, ডি. এল. রায়, অমৃতলাল, ক্ষীরোদ এঁদের ?

তাঁহারা : নিশ্চয়ই।

আমি : এখনও এঁদের রচনা পড়েন ? আজকালকার যুবকরা পড়ে ?

তাঁহারা : বহুদিন থেকে পড়বার সময় পাই নি। আজকালকার ছেলেমেয়েরা অবশ্য কিছুই পড়ে না, না বাধ্য করালে।

আমি : বঙ্গভাষায় এম. এ. পাশ করবার সময় পড়ে বলছেন ?

তাঁহারা : হ্যাঁ। তা ছাড়া তারা পড়ে না মনে হয়।

আমি : বাঙালী যুবকযুবতীর দোষ আছে বহু, কিন্তু তাঁদের হেম, নবীন প্রভৃতি না পড়ার মহাগুণ আমি জীবনে ভুলতে পারব না। আজ আপনারা আশার কথা, মহা আশ্বাসের বাণী শোনালেন। তা হলে, দেশের রুচি এখনো যায় নি। আমি সেদিন যা যা বলেছি তা ফেরৎ নিচ্ছি।

তাঁহারা : ছাত্রদের আপনার মতো উপদেষ্টা জুটলেই চমৎকার! এই ধরনের উপদেশ দেন নাকি ছাত্রদের ?

আমি : দিই, বোঝে না।

তাঁহারা : আমরা বুঝি না, এদেশের ছাত্ররাও বুঝবে না।

আমি : তা হলে, বাঙালী ওদের চেয়ে কিসে বড় ? এতদিন জানতাম বাঙালী সব চেয়ে বড় জাত, অন্তত সাহিত্য, কলা, অর্থাৎ রসবোধে। তা হলে কী সেটাও চলে গেল ? রইল কী ? জানেন তো কোনো বড় সভায়, কোনো বড় কন্‌ফারেন্‌স-এ বাঙালীর স্থান মাচায় নয়, রঙ্গমঞ্চে। যে সভায় ধরুন জওহরলাল উপস্থিত সেখানে বাঙালীরাই প্রথম ও শেষ গানটি গায়, জোর প্যাণ্ডাল সাজায়, না হয় রবিবাবুর নাটক অভিনয় করে। দিল্লীতে বাঙলার খাতির শান্তিনিকেতনের ছবি ও চিত্রাঙ্গদার জন্যে। **Pan Asian** জল্‌সায় রবিঠাকুর যে চায়না, জাপান, জাভা গিয়েছিলেন এবং তাতে কিছু ফল হয়েছিল, তার উল্লেখ পর্যন্ত হয় নি বটে; কিন্তু শান্তিনিকেতনের মেয়েদের নাচ হয়েছিল। এর থেকে প্রমাণ হয় বাঙলার কলাবিদ্যার উৎকর্ষ, কিংবা বাঙালী মেয়েদের প্রতি ভারতবাসীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, যেটায় আজকাল পাঞ্জাবী মেয়েরা ভাগ বসাচ্ছেন। 'কিংবা' না বললেও চলত, কারণ বাঙলার কলা আর বাঙলার মেয়ে, **I mean**, উভয়ের প্রতি আকর্ষণ একই অনাহত, আদিম প্রবৃত্তি থেকেই উৎসারিত।

তাঁহারা : এত অবান্তর কথাও বলতে পারেন!

আমি : আচ্ছা, এবার থেকে কেবল প্রয়োজনীয় কথাই কইব।

আপনাদের যখন রসবোধের এমন অভাব, তখন সোজা ভাষায় জিজ্ঞাসা করছি— মান যদি এতই উঁচু ছিল— আমার বিশ্বাস ছেড়ে দিন— তবে সেটা কমল কেন ?

তাঁহারা : মহামানবের অনস্তিত্বের শূন্যতায়। বাঘা বাঘা লেখক চলে গেলেন একে একে, তাই তাঁদের স্থান…

আমি : অর্থাৎ শূন্যতা ভরাতে নতুন 'মহা' সাহিত্যিকের সৃষ্টি ? একেই বলে **social necessity is the mother of fraud,** থুড়ি, **invention**। খাসা !

তাঁহারা : আপনার কি ধারণা যে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে কোনোও বড় জিনিস তৈরি হয় না ?

আমি : কাঁচা বয়সে তাই ভাবতাম, এখন ও-ধারে ঘেঁষি না ! এই দেখুন না, কাল পাড়ায় কলের জল অত্যন্ত কম এসেছিল, পড়শিরা বললেন, প্রায়ই এমন হয়; অথচ জলের সামাজিক দরকার আছে। এই দেখুন, ট্রামে ভিড় হয়, বেশির ভাগ সময় দেখছি যে সীট রয়েছে তবু যুবকবৃন্দ শার্ট-এর কলার উল্‌টে, মালকোঁচা মেরে, পাঞ্জাবি চাপলি পরে পা-দানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সেদিন একজনকে নিজে সীট থেকে উঠে অনুরোধ জানালাম, বসুন এই সীটে, বসলেন না তিনি, মেয়েরা নামছিলেন, কনুই ছুঁয়ে গেল। আবার অনুরোধ জানালাম। ফল হলো না। একজন মোটা ভদ্রলোক পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন। একটু সোরগোল হলো। ছেলে-টিকে হাত ধরে বসতে বললাম। তিনি কেবল বললেন, 'ওখানে হাওয়া লাগে না।' তার পর ট্যাক্‌সিতে যাওয়ার জন্যেই বোধহয় তিনি নেমে গেলেন। যাবার পর সোয়ারীরা খাপ্পা ! শুনলাম, ওঁদের অনেকেই গাঁট-কাটা, কিংবা স্পর্শাভিলাষী, কিংবা বিনা টিকিটের যাত্রী। নিশ্চয়ই এঁদের প্রতি একটা কিছু কর্তব্যের সামাজিক প্রয়োজন আছে। কিন্তু কৈ ? অন্য-দিকে দেখুন। আমার অনেক বন্ধুদের পঞ্চম কন্যা তাঁদের মতে অপ্রয়োজনীয়, অনিচ্ছাপ্রসূত। পৃথিবীর দিকে চান, সেখানেও শান্তির সামাজিক প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু তার বদলে প্যালেস্টাইন ! না, মশাই, রেহাই দিন, **social need**-এর নাম করবেন না। আর যদি করেন তো তার ব্যাখ্যা দিন। দেশে সাহিত্যের মান এত কম কেন ? না, যাঁরা নাম উঁচু রাখবেন তাঁরা নেই ! এটা **tautology** ছাড়া কী ? আমার মতে এ এক-প্রকার **animism**।

তাঁহারা : যদি আপনি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করেন তবে ল্যাঠা

গেল ঢুকে !

আমি : সমাজতত্ত্ব বলেন একে ! সামাজিক প্রয়োজনের সাহায্যে যদি কিছু ব্যাখ্যা করতে হয় তবে সমাজের কোন্ অংশ চাইছে, এবং সে জোরের ফল কার ওপর পড়ে কতখানি কাজ হচ্ছে দেখতে হবে। কণ্ট্রোল উঠে গেল দেখলেন তো ! সমাজ চেয়েছিল ? আমি যতদূর জানি সমাজের বিস্তর লোক চান নি। চেয়েছিলেন জনকয়েক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ও ব্যবসায়ী, ধনিক সম্প্রদায়। এঁদের মধ্যে চাওয়ার জোর ছিল শেষোক্ত মহোদয়ের। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেদের চোদ্দ-পুরুষের ক্ষমতা ছিল না কণ্ট্রোল উঠিয়ে দেবার। তারপর মহাত্মাজীর মদৎ এল। ফলে সরকার নড়ে উঠলেন, আর কী কী হল জানেন তো ! কালোবাজার উঠে গেল, কারণ তাকেই আইনত সাদা বাজার বলা হলো। হ্যাঁ, একে বলে সামাজিক প্রয়োজন ! কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতিটি কল্পনা করতে পারেন ? প্রকাশকবৃন্দের সাহিত্যিক মান বৃদ্ধিতে আগ্রহ থাকতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতার সংখ্যা অগণিত না হয়। অন্তত পাঁচ দশ হাজার পাঠকের রুচি উন্নত না হলে প্রকাশকদের কোনো লাভ থাকে না। অতএব তাঁরা কেন ভালো বই প্রকাশের ভার নেবেন ? তাঁদের দোষ কী ? বেচারিরা !

তাঁহারা : স্টেটের সাহায্য না পেলে কিছুই হবে না।

আমি : স্টেট আর সমাজ প্রথমে এক হোক, তারপর স্টেট সাহায্য করবে। অবশ্য State help-এর অর্থই তখন থাকবে না। আমি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝি না। এই দেখুন রাশিয়ার বিস্তর ভাল ভাল বই সরকার সস্তায় ছাপিয়ে বিক্রি করছে। কিন্তু সাহিত্যের কিছু উন্নতি হয়েছে বলে তো মনে হয় না। কম্যুনিস্টরা যাই বলুন না কেন স্ট্যালিন প্রাইজ পাওয়া বইগুলো মোটেই উচ্চ শ্রেণীর নয়।

তাঁহারা : আপনি সস্তায়, বিনামূল্যে, ক্ল্যাসিক্‌স্ বিতরণ হোক চান না ?

আমি : নিশ্চয়ই চাই।

তাঁহারা : সে কাজ স্টেটেই করতে পারে।

আমি : হ্যাঁ, বিনামূল্যে বিতরণ স্টেটই পারে। কিন্তু সস্তায় অন্যেরাও বিক্রি করেছে, যেমন আমাদের যুবা বয়সে ডেণ্ট, নেলসন, টক্‌নিংজ্‌ ও আজকাল পেঙ্গুইনের লেন্‌-ভ্রাতাদ্বয়। হলদে মলাটের ফরাসী বই নিতান্ত সস্তা। অমর দত্তও দর্শকদের কেবল বিনামূল্যে বই নয় তার সঙ্গে ছত্রও বিলিয়েছিলেন এই শহরে। বসুমতীর কথাও ভুলবেন না।

তাঁহারা : তাই যদি হয়, তবে ক্ল্যাসিক্‌সের এত প্রচার, দেশে অতটা শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও রাশিয়ায় সাহিত্যিক মানবিভ্রম ঘটল কেন মনে হয় ?

আমি : খানিকটা সময় হয় নি, খানিকটা সুযোগ পায় নি নানান্‌ বিপদের মধ্যে, আর···

তাঁহারা : বাকিটা কম্যুনিজমের গোঁড়ামি মানতে আপনি বাধ্য।

আমি : ব্যাপক ভাবে ধরলে কী সিদ্ধান্ত হয় বলা যায় না। তবে আপাতত তাই মনে হয়।

তাঁহারা : অবশ্য ভিন দেশের কথা জানি না, সেখানে শুনেছি—

আমি : আরাগঁ, ড্রাইসারের কথা বলছেন ? কিন্তু তাঁরা পূর্বেই নামকরা সাহিত্যিক ছিলেন ; এবং কম্যুনিস্ট হবার পর তাঁদের কবিতার ও নভেলের কিছু রূপ পরিবর্তন ঘটলেও তাঁরা যা ছিলেন তার বেশি কিছু হন নি। তা ছাড়া, ম্যালর, আর সিলোনে শুনলাম আর কম্যুনিজম্‌ মানছেন না।

তাঁহারা : আমাদের মতে তা হলে সায় দিলেন ?

আমি : সায় দেওয়া না-দেওয়ার কথা নয়। মনটা খোলা রাখছি মাত্র।

তাঁহারা : যাই বলুন, এ-দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির জন্যে ক্ষতি হয়েছে সাহিত্যের।

আমি : সে ভাবে দেখতে গেলে কংগ্রেস পার্টির জন্যেও হয়েছে, তার কারণ অবশ্য অন্য। আমাদের কংগ্রেসী আন্দোলন ছিল বুদ্ধিবিমুখ, anti-intellectual। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের তত্ত্ব, বুদ্ধি-বিচারসর্বস্ব, rational। তাই কম্যুনিস্টদের জন্যে যতই ক্ষতি হোক না কেন, একটি বিষয়ে উপকার হয়েছে। দুঃখদারিদ্র্যের কারণ এতদিন আমাদের সাহিত্যিকরা বুঝতেন না, এখন তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করছেন।

তাঁহারা : বুঝে ফল কী হলো ? গোটাকয়েক ধরতাই বুলির ভিড়ই জমল।

আমি : এর কারণ কি ?

তাঁহারা : গোঁড়ামিতে সাহিত্য হয় না। মানুষ নিয়ে সাহিত্য, মতামতের গোঁড়ামিতে মানুষ ছোট্ট হয়ে যায়।

আমি : তাই মনে হয়। কিন্তু সেদিন একখানা বই পড়লাম, **Farewell to Europe** ; লেখক **Alfred Weber** ; মনস্বী ; আজকাল

আমেরিকায়। তাঁর বক্তব্য, য়ুরোপের সর্বনাশ হয়েছে dogma থেকে সরে আসার জন্যে। সে dogma ছিল transcendental। কোনো হিন্দু সাহিত্যিক ঐ ধরনের মন্তব্য যদি করেন আমি অন্তত তাঁর সঙ্গে তর্ক করব না। একটা dogma চাই, কারণ মানুষে চায় একটা খুঁটি, নোঙর, একজন দিদিমা…।

তাঁহারা : হ্যাঁ, তা চায় বটে। কিন্তু 'মানুষ চায়'-এর মধ্যে মানুষটাই তো বড়! মানুষ অনেক জিনিসই চায়; বিপরীত জিনিসই একত্রে চাইছে দেখেছি।

আমি : তা ঠিক, মানুষ কিছু demand-schedule নয়; এবং নয় ভাবি বলেই বিশুদ্ধ ইকনমিস্ট হতে পারলাম না। সে যাই হোক, কম্যুনিস্ট সাহিত্যিক মানুষকে শ্রদ্ধা করে না, কী করে ভাবি বলুন?

তাঁহারা : তাঁরা মানুষকে একটা formula-র মধ্যে ফেলে তার বৈচিত্র্যকে অপমান করেন।

আমি : Simplify করতে যাবার বিপদ ঐখানে। অথচ লাভও আছে। কাজের সুবিধা হয়, বিশ্বাস ঘন হয়, কিন্তু সাহিত্য নাও হতে পারে।

তাঁহারা : কেবল ঐটুকু নয়। সাহিত্যের রীতিমতো ক্ষতি হয়। তার প্রমাণ সুভাষ মুখুয্যে, সুকান্ত, এমন কী বিষ্ণু দে-ও।

আমি : মার্কস্ কিন্তু…

তাঁহারা : মার্কস্ কী বলছেন না বলছেন আপনি আমাদের চেয়ে ভালোই জানবেন। আমার যা চোখের সামনে ঘটছে তাই দেখছি।

আমি : কম্যুনিস্ট সাহিত্যিক সাধারণত ভীষণ গোঁড়া হন আমিও দেখছি। তাঁদের সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধি মত-শুদ্ধতার চাপে বিভ্রান্ত হচ্ছে তাও দেখছি। আচ্ছা, আমি যদি এই ঘটনার মার্কসিস্ট ব্যাখ্যা দিই শুনবেন?

তাঁহারা : আপনার মত ও ব্যাখ্যা কতটা মার্কসিস্ট বিচার করবেন অন্যে। আমরা শুনতে রাজি। বলে রাখলাম, স্টালিনিস্ট বিচার না হলে, কিংবা কোনো ১৯৪৮ সালের Official Version না দিলে আপনার মত deviation গণ্য হবে।

আমি : আমার যুক্তিটা এই : সমাজ যতই জটিল হয় ততই মানুষ কর্ম থেকে, ব্যক্তিগত দায়িত্ব থেকে সরে আসে। এই প্রক্রিয়াটিকে হেগেল alienation বলেছেন; এবং মার্কস্‌ও ব্যবহার করলেন শব্দটিকে। কলকব্জা,

জমিজারাৎ, যন্ত্রপাতি থেকে মানুষ কী ভাবে বিচ্যুত হলো তিনি অধিকন্তু তাও দেখালেন। আর সেই সঙ্গে জ্ঞানের রাজ্যেও এই সম্বন্ধচ্যুতির উল্লেখ করলেন। ব্যক্তি সমাজ থেকে, সমাজ জীবন-সম্পর্ক থেকে, জ্ঞান সমাজ থেকে, বিজ্ঞান জ্ঞান থেকে, বিশেষ জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে ক্রমেই পালাচ্ছে। মার্কস্ যোগ-সাধনার প্রয়োজন বুঝলেন, মনুষ্যত্বের জন্যে, ব্যক্তির জন্যে নয়, কারণ ব্যক্তিত্বটাই একটা সর্বনেশে abstraction, এবং এই জন্যেই তিনি liberal individualism-এর বিপক্ষে, এবং personalism-এর স্বপক্ষে। ব্যক্তিত্ববোধে বিরোধভাব, বিয়োগ; পুরুষবোধে সংযোগ। ডায়েলেকটিকের সাহায্যে তিনি alienation-এর বিপরীত অনুষঙ্গ, integration-এর ওপর ঝোঁক দিলেন। তাঁর কাছে বাস্তব ছিল মানুষ, person, যার বিকাশে বাধা দিচ্ছে ধনিকতন্ত্র, এবং যার সহায়ক হবে ধনিকতন্ত্রের অবসানে জনসাধারণের নতুন সমাজ। এটা তাঁর থিওরির দিক্। কাজের বেলা কিন্তু বাস্তব মানুষ রইল না, এল সম্বন্ধের সম্ভাব্যতা। Practical Marxism is a perpetual exercise in social possibilities; ব্যবহারিক মার্কসিজমের ধর্ম রিয়ালিজম্ নয়, possibilism; তার বাস্তব-সত্য, রিয়ালিটি, হলো চলন্ত প্রক্রিয়া, process। এখন, যেই সম্ভাবনীয়তার ক্ষেত্রে আসা গেল, অমনিই কর্মেচ্ছার উৎস খুলল, ধনিকতন্ত্রের বাধা অসহনীয় হয়ে উঠল, তাকে ভাঙবার উপায়ের সন্ধান চলল, একাগ্রতা এল, সফলতার জন্য পার্টি তৈরি হলো, যে-শ্রেণী কর্মশীল হতে পারে তারই ভবিষ্যৎ আছে ভেবে তারই ওপর সম্ভবকে সত্যে পরিণত করবার ভার পড়ল, ইত্যাদি। কিন্তু সৃষ্টির প্রকার বহু—এটা প্রাথমিক সত্য; এবং সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে বহুতে শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়। তাই নির্বাচন না করে উপায় নেই। এখানে সমস্যা জন্মাল এই process, এই possibilities, এই হাজার রকমকে কিভাবে মাত্র একটি পন্থাতে পরিণত করা যায়। ভারী শক্ত কাজ কর্মক্ষেত্রের দিক থেকে; ততটা শক্ত নয় থিওরির বেলা। কর্মক্ষেত্রে নানা বাধা, নানা প্রকারের চাপ, তাগিদ। কিন্তু থিওরিতে তবু একটা সহজ ফরমুলা তৈরি করা অসম্ভব নয়, অন্তত আপেক্ষিকভাবে সোজা। সৃষ্টির অন্তরের এই দ্বন্দ্ব মার্কসিজমে উগ্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, কেন না জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় এর মর্মকথা। এবং এই মৌলিক কারণে কম্যুনিস্টদের ব্যবহার সুবিধাবাদীর মতন, ও মতামত, সাহিত্য-সৃষ্টি নিতান্ত একদেশদর্শী হতে বাধ্য। Dogmatic কেন? অন্যথা শক্তির বিক্ষেপ; opportunist কেন? কারণ reality as a process অনুসারে ব্যবহার আর expedient আচরণের মধ্যে সীমা

অনিশ্চিত, ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানেরই মতন। এরই জন্যে অতটা একাগ্রতা, সততা, কর্মতৎপরতা অতটা কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা, আগ্রহ, সব থাকা সত্ত্বেও কিছু হচ্ছে না কম্যুনিস্ট সাহিত্যে। যে কলায় তবু কর্মের সুযোগ আছে সেখানে তবু আশা থাকে; অন্যত্র, যেমন সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, দর্শনে আমি অন্তত প্রায় হতাশ হয়েছি। এই হিসেবে আমি স্বীকার করছি যে কম্যুনিজম্ আমাদের উপকারে এল না। ভেবেছিলাম যে আমরা সত্যিকারের humanist হব, person-কে মুক্তি দেবার সুযোগ পাব— আমি চিন্তা-জগতের কথাই বলছি,— কিন্তু alienation process-টাকে বিপরীত মুখে চালাতে এঁরা পারলেন না। তারাশঙ্কর, মানিক ও তাঁদের যাঁরা অনুকরণ করেন, সকলেরই রচনায় অপরিণত চরিত্রের হেতু হলো ঐ আভ্যন্তরীণ নিষ্ফলতা-বোধ। শরৎবাবুর কারবার ছিল প্রধানত marginal creatures নিয়ে। এক হিসেবে, তাঁর কাজ ছিল প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে এই সব জীবকে সমাজে বসিয়ে দেওয়া। অবশ্য বলতেন, সমাজ বদলাও। ওটা মনকে চোখ ঠারা। তবু তিনি marginal creatures-দের মানুষ ভাবতেন। তাঁর পরে যাঁর নাম করলেন, আমি অচিন্ত্যকেও ধরছি, তাঁরা ঐ margin থেকে কেন্দ্রে আসতে চাইলেন। এই চাওয়াটা মস্ত কথা। মানুষ আর চরিত্রস্রষ্টা-সাহিত্যিকের মধ্যে দূরত্ব বাইরে থেকে দেখলে খানিকটা কমল বটে, প্রমাণ যেমন তারাশঙ্করের lust for living, অচিন্ত্যর lust for variety, বিষ্ণুর lust for experiment, কিন্তু কর্মপন্থার একাগ্রতা এবং মানুষের বিচিত্র ব্যবহারের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের জন্যে দূরত্ব মাত্র অন্যরূপ ধারণ করল। মতামতের প্রাধান্য, চরিত্রের ওপর তার আরোপ— এ সবই de-alienation যে সফল হয়নি তার প্রমাণ। নিষ্ফলতাটাকে হেয় বিবেচনা করা বুর্জোয়া মনোবৃত্তির চিহ্ন; কিন্তু তাকে অস্বীকার করাও মূর্খতা, অন্ধতা। বেছে নিন, বুর্জোয়া হবেন, না অন্ধ হবেন।

তাঁহারা : স্টেটের সাহায্য না নিলে কিছুই হবে না।

আমি : আর চটাবেন না!

তাঁহারা : একটা Academy হলে তবু খানিকটা সামলানো যায়।

আমি : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সাহিত্যিক গবেষণা করছেন, কিন্তু সমালোচনা? যুক্তপ্রদেশের সাহিত্য-পরিষদ প্রায় নিষ্ক্রিয়। একটু-আধটু যিনি লিখেছেন এমন ধরনের সাধারণ কংগ্রেসম্যানরা যদি academyর সভ্য হন তবে সাহিত্যের মান উঁচুতে উঠবে না, নামবে। ওঁরা রাজ্যশাসন করুন, দেশসেবা করুন, কিন্তু সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, চিন্তার যে-কোনো শাখা যেন

ওদের হাত থেকে বেঁচে থাকে, এই আমার প্রার্থনা। আচ্ছা, আমাদের স্টেট হয়েছে? যেটা দেখছেন সেটা government পরিবর্তন। আমাদের ভাগ্যে যা ঘটেছে তার প্রকৃতি হলো এই: administration-এর হাতে policy তৈরির ভার নেই, এসেছে government-এর ওপর; সেই গবর্নমেণ্ট আমাদের দেশের লোকের হাতে, যদিও administrators-রা পুরনো; আমাদের দেশের গবর্নমেণ্ট স্টেট হতে চাইছে প্রধানত inter-state-এর সম্বন্ধসূত্রে জড়িয়ে পড়েছে বলে। কিন্তু state-এর ভূমি সমাজ, social contract-ওয়ালাদের এই পুরনো কথাটা এখনও এ-দেশে খাটে নি। খাটে খানিকটা কার্ল মার্কস্-এর state-এর ব্যাখ্যা। অবশ্য মার্কসীয় ব্যাখ্যার পিছনেও social contract-এর মূল বক্তব্যটি রয়েছে, কিন্তু সেটা শ্রেণী-সংঘর্ষে ঢাকা। যতদিন ঐ সংঘর্ষ থাকবে ততদিন আমি State Academy-র বিপক্ষে! এখন যদি state-action চান তবে I. N. T. U. C.-তে যা হচ্ছে সাহিত্যেও তাই হবে। State Unionism আর Company unionism-এর তফাৎ যতটুকু— সোজা ভাষায় নেই, কারণ State আর Company এখন হরিহর— ঠিক ততটুকুই পার্থক্য থাকবে Congress manned State Academy আর প্রকাশকবৃন্দের অগঠিত, অ-নামী, অস্পষ্ট, অথচ কার্যকরী গোষ্ঠীর মধ্যে। না, মশাই, ওতে চলবে না। আমার ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয় যে রোজ সকালে রামধুন শুনছি; ওস্তাদে রামধুন গেয়ে আলাপ শুরু করছে, সকলে ভজন শিখছে; কিংবা কোনো কংগ্রেস-মন্ত্রীর জেলখানার জীবন বর্ণনা, কিংবা সাহিত্য রচনা, কিংবা দর্শন, কিংবা সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ শিশুরা মুখস্থ করছে, বালকে পড়ছে, যুবক-যুবতী তাদের ওপর নোট নিয়ে বি. এ, এম. এ. পাশ করছে। অথচ তাই হবেই হবে, যতদিন জেল যাওয়াটাই সর্বকর্মের নিরিখ থাকবে। এক-এক সময় মনের কোণে একটা প্রশ্ন জাগে। আপনারাই তার উত্তর দিন। সাধারণ কংগ্রেসকর্মীরা সব সময় দাবি জানান যে তাঁরা স্বার্থত্যাগ করেছেন, তাই তাঁদের প্রাপ্য দেওয়া হোক। কিন্তু তাঁদের স্ব-টা কী যেটা ত্যাগ করেছিলেন, এবং না ত্যাগ করলে তাঁদের স্ব-টা কতটা সমৃদ্ধ হতো, কত বড় পণ্ডিত, কত বড় বৈজ্ঞানিক, এঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, চিন্তাবীর কর্মবীর তাঁরা হতেন? জেল যাওয়ার ভয় খাওয়াটা moral ব্যাপার, এবং রুচির ভিত্তি morality হলেও moralityর ভিত্তি রুচি নয়। এমন কী দক্ষতাও নয়। আমাদের গৃহিণীরা অত্যন্ত moral, কিন্তু তাঁদের সকলের মধ্যেই রুচি বা দক্ষতার চিহ্ন পেয়েছেন? ধরা যাক, সব কংগ্রেসকর্মীই অত্যন্ত moral, কিন্তু রুচি? দক্ষতা?

State academy মানে Congressmen's academy, and a Congressman per se-র কোনোও অধিকার নেই সাহিত্যের মানদণ্ড হাতে নিতে। বরঞ্চ non-Congressman, পুরনো লিবারেলকে বিশ্বাস করা যায়, এমন কী কংগ্রেস-বিরোধীদেরকেও। কিন্তু প্রকৃত কংগ্রেস-বিরোধী পাচ্ছেন কোথায় সাহিত্যের জন্যে ?

তাঁহারা : অতএব ?

আমি : অতএব, যা হচ্ছে তাই হোক বলব না। বাঙলা দেশের কোনোও ভবিষ্যৎ নেই, তার সাহিত্যেরও নেই, জেনে কচ্ছপের বৃত্তি অবলম্বন করুন। মহাবিপদের সময় দেশ, জাতি নিজের কেন্দ্রে ফিরে আসে, টয়েনবি দেখিয়েছেন। আমাদের শাস্ত্রেও এই কথা বলেছে। তাই আমারও বিশ্বাস, মানবিভ্রম থেকে বাঁচবার একটি উপায় বিচার, আত্মবিশ্লেষণ, আর একটু বিরাম, বিনয়, এবং একটু pessimism, দুঃখবাদ।

তাঁহারা : বলেন কী ! আপনাকে সকলে মার্কসিস্ট বলে জানে, আর আপনি বলছেন দুঃখবাদের প্রয়োজন, আপনি দেখাচ্ছেন প্রাদেশিকতা !

আমি : আমাকে মার্কসিস্ট না বলে marxologist বলতে পারেন। এবং সেই অধিকারের জোরেই কইছি শোনেন : মার্কসিজমের millenial ভাবটা, Popper-এর ভাষায় তার prophetic অংশটার ভাব ও কার্যগত উপকারিতা প্রচুর হলেও থিওরির দিক্ থেকে তার মূল্য নেই। Popper অবশ্য বলেন social engineering-এর দিক্ থেকেও বড় বেশি নেই। আমি অতদূর যাই না। এই millenialism-এর সঙ্গে আবার উনবিংশ শতাব্দীর প্রিয় religion of progress মিশে গেছে। ফলে মার্কসিস্টরা কত miscalculation করছে দেখলেন তো ? একটা চমৎকার বই পড়লাম, Moulin-এর Socialism of the West। তিনি বলেছেন, One of the postulates of Socialist Humanism is pessimism। লাখ কথার এক কথা। কারণ রুশো প্রবর্তিত noble savage, the good man, অত্যন্ত অবাস্তব। Gandhism-টাতেও ঐ ভুল, তার মানুষও ঐ noble savage, the innate good man। আমিও আগে তাই ভাবতাম ; কিন্তু This Final Crisis যখন আমার জীবনে এল না তখন বাকি বয়সটা বোকা থাকি কেন ? আর প্রাদেশিকতা ? বস্তুটি আমার ধাতে নেই। তবে কী জানেন আমরা রবিঠাকুর, চিত্তরঞ্জন, আশু মুখুয্যে, অশ্বিনী দত্ত— নামটা মনে আছে ?— শরৎবাবু, প্রমথ চৌধুরী, নাটোরের মহারাজাকে দেখেছি, অবনীবাবু, গগনবাবু, নন্দলাল, অসিত হালদারের তুলি চালানো স্বচক্ষে

দেখেছি, অঘোর চক্রবর্তী, রাধিকা গোঁসাই-এর গান শুনেছি, ব্রজেন শীল, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশবাবু, প্রফুল্ল রায় প্রভৃতির লেকচার শুনেছি, শিবে-বীজে গোষ্ঠ-কুমার, সামাদের খেলা দেখেছি, অর্দ্ধেনবাবু, গিরীশ, অমৃত মিত্র, অমৃত বোস, দানিবাবু, অমর দত্ত, তারা, তিনকড়ি, নরসুন্দরী, আর শিশিরবাবু, নরেশ মিত্রের অভিনয় দেখেছি কিনা, তাই একটু, যৎসামান্য, কোথায় যেন একটা···বুঝেছেন কি না— তাই একটু লজ্জা হয়। প্রাদেশিক মনোভাব আমার নেই বাপ্‌জী বলছি।

তাঁহারা : আবার দিব্যি গালছেন!

আমি : যীশুখ্রীস্টের দেহে ক'টা পেরেক য়িহুদীরা ও আর ক'টা পেরেক রোমান সৈনিকরা পুঁতেছিল জানি না, কিন্তু বাপুজীর মৃত দেহে আরও ক'টা গুলি পুঁজিপতির দল লাগালেন তার হিসেব পাওয়া যাবে ৩০শে জানুয়ারী থেকে আজ পর্যন্ত কাপড়ের দাম যত পয়েণ্ট উঠেছে তারই সংখ্যায়। এঁরা শুনছি স্মৃতিরক্ষার জন্যে বিস্তর টাকা দিচ্ছেন। কার টাকা, কার জন্যে? এই ভাবেই খ্রীস্টানরা গির্জা তুলেছিল? সাহিত্যের মানবিভ্রম জাতীয় জচ্চুরির একটা দিক্। Our moral collapse is complete; এটা ধ্রুব সত্য। কিন্তু ঠিক এই সময়ই হলো গড়বার সময়। অ-সভ্য থাকা, পিছিয়ে পড়া, অনুন্নত হওয়াটা জাতির পক্ষে একটা বিশেষ অধিকার হতে পারে, যদি একটু ভেবে দেখেন! প্রায় একশ' বছর আগে একজন রুশ লেখক নিজের দেশ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন বাঙলা দেশ সম্বন্ধে আমার তাই বলতে ইচ্ছে হচ্ছে আজ: **Bengal has no past, Bengal has no present, therefore, Bengal has, must have a future.**

দশম স্তবক : স্ত্রী-পুরুষের কথা

কিছুদিন পরেই তাঁরা এলেন। গল্প শুরু হলো।

তাঁহারা : দোহাই আপনার, আজ একটু হাল্‌কা, বাজে কথাবার্তা হবে।

আমি : তথাস্তু। কিন্তু 'অন্ন জুটিবে কেমনে'? কুচ্‌পরোয়া নেই— আপনারা অত স্বার্থত্যাগ করছেন, আর আমি এতটুকু পারব না! আচ্ছা,

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ আলোচনা করলে কী হয়? বাড়ি খালি।

তাঁহারা: চমৎকার বিষয়! কিন্তু বিষয়-নির্বাচন করে কি কথাবার্তা হয়? ভদ্রলোকে যখন স্ত্রীজাতির সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ নিরূপণ করেন, তখন নিতান্ত গম্ভীর হয়ে যান— তাই একটু ভয় হচ্ছে।

আমি: অভয় দিচ্ছি। কিন্তু গোড়াতেই ভুল করেন কেন? স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, আর স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, এ দুটি হলো আলাদা বিষয় প্রথমটি নিয়ে, সাধারণত দুই পার্টিই দায়িত্বশূন্য হয়ে ঠাট্টা তামাসা করে থাকেন, কিন্তু দ্বিতীয়টি নিয়ে অনেকেই কথা কন না, কিংবা যখন কথা কন, তখন সমাজের ভয়ে, লোকনিন্দার ভয়ে, কিংবা ভদ্রতার খাতিরে দু' পার্টিই নিতান্ত গম্ভীর হয়ে যান। প্রবন্ধের বেলা আলাদা।

তাঁহারা: যা বলেছেন! প্রবন্ধ নিয়েই বলছি। স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে নলিনী গুপ্তের লেখাই বলুন আর আশালতা দেবীর লেখাই বলুন, সবই খুব শক্ত ও গুরুগম্ভীর।

আমি: নলিনীবাবু সব জিনিসই একটু গম্ভীরভাবে দেখে থাকেন। মেয়েদের দোষ দিই না। স্ত্রী-সাহিত্য পুরুষ-সাহিত্যের অনুকরণ হতে বাধ্য, যতদিন স্ত্রী-শিক্ষা, পুরুষ-শিক্ষা, অর্থাৎ পুরুষের অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অনুকরণ হ'য়ে থাকবে— এবং যতদিন সাহিত্য 'শিক্ষা'র ওপর নির্ভর করবে। মেয়েদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজী জানেন না, ফরাসী জানেন না, সংস্কৃতের ধার ধারেন না, এমন কী বাঙলা পর্যন্ত যাঁরা শেখবার মতো শেখেন নি, তাঁদেরই লেখায় কদাচ কখনও মেয়েলি ছাঁচ ও ছাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, নচেৎ সবেরই এক ঢালাই। অতএব স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে লেখিকাদের আলোচনা যে নেহাৎ পুরুষালি হবে সে আর বিচিত্র কী? আশালতা দেবীর লেখার মধ্যে অবশ্য সাহিত্য-রস আছে।

তাঁহারা: স্ত্রী-সাহিত্য ও পুরুষ-সাহিত্য দুটো আলাদা বস্তু নয় কি?

আমি: বস্তু হয়ত একই। কিন্তু মানুষে যখন লেখে— জীবন-দেবতা কিংবা dæmon-এ যখন লেখে না, তখন লেখার রূপ ভিন্ন হতে বাধ্য। সাহিত্যে রূপের ভাগটাই বেশি চোখে পড়ে, তাই পার্থক্যটাই বড় মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তবে পাঠকের ওপর প্রভাবের দিক্ থেকে পার্থক্যটাই প্রধান কথা হয়তো সব সময়ে নয়। আমাদের দেশের মেয়েদের লেখা নিয়ে পুরুষদের মন্তব্য পড়লে জন্‌সনের dancing dog-এর ওপর মন্তব্যের কথা স্মরণ হয়। মেয়েরা আমাদেরকে গম্ভীরভাবে নিচ্ছেন, এই দেখলেই হৃদয় আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় এতটাই পরিপ্লুত হয় যে, প্রকাশভঙ্গি এবং বক্তব্য

নিয়ে বিচার করাই অমানুষিকতা ও অসভ্যতা বলে ঠেকে।

তাঁহারা : সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিলে ?

আমি : স্ত্রীজাতির স্ত্রী হবার যোগ্যতা নিয়ে পুরুষেরা যা কথা কন, তা কইবার ও শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে ; কিন্তু পুরুষের স্বামী হবার যোগ্যতা নিয়ে স্ত্রীরা যা কথা কন তা শোনাবার ভাগ্য ঘটলেও তা নিয়ে তর্ক করার সুবিধা কখনও হয় নি। আজকালের ছেলেদের মুখে দু'টি বিষয়ের আলোচনা শুনি— এক অর্থশাস্ত্রের, অন্যটি কামশাস্ত্রের। তাঁদের কথাবার্তা শুনে তাঁদের মনোভাব যতদূর বোঝা যায়, তাইতে মনে হয় যে ব্যাপারখানা ঘনিয়ে উঠেছে। কেউ আর হালকাভাবে কিছু দেখতে পারছে না। মেয়েরা আমাদের শুধু জীবন-সঙ্গিনী নন, তাঁরা আমাদের জীবন্ত সমস্যা— live problems। বিরোধ বেশ জমে উঠেছে। অথচ এ কথা ঠিক যে, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ সহজ ও সরল হলেই স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সুন্দর হয়। বিরোধই বোধহয় সকল সম্বন্ধেরই রীতি— এই ভেবে জড়ভরত হয়ে আছি।

তাঁহারা : বিশ্বাস করি না। আপনি দেখছি একেবারে খ্রীস্টান,— original sin না মানলে আপনি দেখছি কিছুতেই শান্তি পান না! বিরোধই যদি সব সম্বন্ধের মূলকথা হতো, তা হলে জীবনটা কত একঘেয়ে হতো বলুন তো ?

আমি : আমাদের বোঝবার, ও তার চেয়ে দরকারি কাজ আপনাদের বোঝাবার কত সুবিধা হতো বলুন দেখি! আর সেই জন্যেই তো Freud-এর অন্তত একটি শিষ্যের জয়গান করি। আমাদের সমাজতত্ত্ববিদেরাও ঐ ধরনের অনেক মন্ত্র দিয়ে গেছেন, একটি মন্ত্র জপ করুন— ব্যস, মোক্ষলাভ হাতে হাতে! এটি পছন্দ না হয় উল্‌টোটা নিন!

তাঁহারা : বিরোধ সব ক্ষেত্রে থাকলে তার প্রতিকারও এতদিনে আবিষ্কৃত হতো।

আমি : আবার নেই নেই করে সাপের বিষও উড়িয়ে দেওয়া যায়।

তাঁহারা : বিরোধের সঙ্গে মিলন মিশ্রিত আছে।

আমি : অসহযোগ আন্দোলন প্রেমের কলহ বলে সবই প্রেমের ঝগড়া নয়। লরেন্সের নায়কবৃন্দ···

তাঁহারা : নাম না করে থাকতে পারেন না ?

আমি : পারি না। শুনুন,— লরেন্সের নভেলে প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া থাকে— কিন্তু সে ঝগড়ার পরিধি বড় ব্যাপক— সেখানে প্রথমে দেখবেন একটি জোড়, অর্থাৎ একটি স্বামী, অন্যটি স্ত্রী। সম্বন্ধটি নিতান্তই

ঘরোয়া। পরে এই ঘরোয়া সম্বন্ধ বড়ই আটপৌরে হয়ে উঠছে দেখতে পাবেন। কারণ আর কিছুই নয়— নায়ক স্বামী-স্ত্রীকে আর স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধের prism-এ দেখছেন না— দেখছেন স্ত্রীপুরুষের সাধারণ, বৃহৎ ও নৈর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের সাদা কাচের মধ্য দিয়ে। আগে ছিল ঝগড়া, ঝটাপটি এবং তার পরেই দৈহিক মিলন ; এখন আর তা নয়— একজন গেলেন পালিয়ে, আর একজন থেকেই গেলেন। যদি বা একত্র বসবাস করতে লাগলেন তাও বিদ্যুৎভরা দুটো কাছাকাছি মেঘের মতন। Atmosphere নিতান্ত sullen হয়ে উঠল।

তাঁহারা : ঐ রকম abstract ভাবে দেখলেই তো বিপদের আশঙ্কা! আমরা জোর করে বলতে পারি যে লরেন্স ঠিক ঐ জন্যেই বড় আর্টিস্ট নন— নিশ্চয়ই তাঁর কেতাবের আবহাওয়াতে পাঠকের দম বন্ধ হয়ে যায়। আমরা লরেন্স পড়ি নি, গলস্‌ওয়ার্দি পড়েছি— তিনি খাসা লেখেন।

আমি : নিশ্চয়ই। তিনিও আইরিনী ও সোম্‌স্‌ সৃষ্টি করেছেন! তবে তিনি খাঁটি ইংরেজ কিনা, তাই খানিকটা সেন্টিমেণ্টাল্‌। সে যাক গে! আপনাদের কথা খানিকটা মানি। মানুষ হিসাবে দেখলে খানিকটা অশান্তি লোপ পায়, অন্তত পেতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসেবে দেখবার জন্যে বিস্তর সাধনার প্রয়োজন ; সর্বভূতে নারায়ণ দেখবার সাধনার চেয়েও কষ্টকর। তান্ত্রিক সাধনার একটি অঙ্গ স্ত্রীজাতিকে শক্তি হিসেবে দেখা। সেটাও abstract নয় কী? অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন-মাধুর্য আছে। কিন্তু যতটুকু মিলন, যতটুকু তর্ক ও আলোচনার বাইরে। সেটা মফঃস্বল, অর্থাৎ প্রাইভেট। যতটুকু বৈপরীত্য ততটুকুই সমস্যা, এবং সেই সমস্যার সমাধানের জন্যেই আলোচনা।

তাঁহারা : ও রকম ভাবে ভাগ করেন কেন?

আমি : বাস্তব-জীবনে ভাগ রয়েছে বলে। ভাগ না করলে মানে হয় না, অন্তত সে মানে বুঝি না।

তাঁহারা : জীবনের সমগ্র ব্যবহারকে যদি সমস্যা হিসেবে ধরেন, তা হ'লে মনে হবে যে সবই বিরুদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে— সমস্যা তা না হলে হয় না। কিন্তু তাই বলে সত্যি সত্যিই ব্যবহারের মধ্যে বিরোধ রয়েছে ধরেন কী করে? বিরোধ রয়েছে আপনার বুদ্ধিতে। বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু বুদ্ধি একত্রে ও একসূত্রে সব ব্যবহারকে যে সাজাতে পারছে না নিজেই অনুভব করছেন— যেটা বাদ পড়ছে তাকে সাজানোর অন্তরায় ভাবছেন। অবশ্য এ কথা একশ' বার মানি যে এই উপায়েই বুদ্ধি

মার্জিত হয় এবং তার ফলে মিলনমন্ত্রের দর্শন লাভ হয়।

আমি : আপনারা কি বলতে চান যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটি কারুর কাছে সমস্যা আর কারুর কাছে নয়? তা হলে দাঁড়ায় এই যে, যার কাছে সমস্যা তার কাছে, অর্থাৎ বুদ্ধিমানের কাছেই সম্বন্ধটি বিরোধের।

তাঁহারা : না, তা বলছি না; আত্মাভিমানে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছি। আমরা বলি বুদ্ধিমান হয়েও পুরুষ স্বামী হিসেবে সুখী হতে পারে, এবং স্ত্রী বুদ্ধিমতী হয়েও নিজে সুখী হতে পারে এবং স্বামীকে সুখী করতে পারে।

আমি : তা যদি বলেন, তা হলে সাফ কথা কইতে হয়! আমি এমন কোনো বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী পুরুষ ও স্ত্রী দেখি নি যারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সম্পূর্ণ সুখী হয়ে দিন গুজরান করছে।

তাঁহারা : আমরা এমন কোনো নির্বোধকে দেখি নি যে মজাসে দিন কাটিয়ে গেল। সংসার দুঃখময়।

আমি : খ্রীস্টান কে?

তাঁহারা : সংসারে সুখদুঃখ থাকবেই থাকবে। তবে মাত্রা নিয়ে কথা, কারুর ভাগ্যে সুখ বেশি, কারুর ভাগ্যে দুঃখ বেশি।

আমি : মানে হয় না ও কথার। কথাটার তখনই মানে হয় যখন সুখদুঃখকে মানুষের সম্পর্কে আনা হয়। কী দিয়ে সুখদুঃখকে মাপবেন? মাপার যন্ত্র না থাকার দরুন নিজের ওপর ঘাত-প্রতিঘাত দিয়েই সুখদুঃখ ওজন করতে হয়, নিজের বিচারশক্তি, অর্থাৎ সূক্ষ্ম-দৃষ্টিকেই বিশ্বাস করতে হয়। আমার নিজের ওপর আঘাতটাই নিজের কাছে বড়, আমার সুখ-দুঃখের বেলা আমার বিচারশক্তিই প্রধান, আমার আপদবিপদে, আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যে আমার দৃষ্টিই সূক্ষ্মতর।

তাঁহারা : নিশ্চয়ই! আজ তা হলে গ্রামোফোনের রেকর্ড শোনান। তর্ক আর চলে না।

আমি : তর্ক না চলুক, কথাবার্তা চলতে পারে।

তাঁহারা : তাও হয় না। শুধু দীক্ষা হতে পারে— আমরা দীক্ষিত হতে আসি নি।

আমি : গুরু একের বেশি হয় না বুঝি?

তাঁহারা : ধর্মে বাধে।

আমি : ঠিক কথা। আচ্ছা, তর্ক ছেড়ে দিন! সত্যিই কি আপনারা এমন স্বামী দেখেছেন যে স্ত্রীকে নিয়ে খুব সুখী অথচ মানুষ হিসেবে

বুদ্ধিমান ?

তাঁহারা : দেখেছি কি দেখি নি বলতে চাই না। তবে অসম্ভব নয় বলতে পারি।

আমি : তা শুনব না। বলতেই হবে।

তাঁহারা দেখেছি।

আমি : আরশি নিয়ে ?

তাঁহারা : আত্মজীবনী বলতে আসি নি।

আমি : ছিঃ! আমিও শুনতে চাই না! আমিও বলছি না। আপনাদের হলো কী ? দয়া করে বলুন না— আমি একজনকেও দেখি নি। যে সত্যি কথা কয়, অন্তত সত্য আচরণ করে, সেই বলেছে কিংবা ভাবগতিকে প্রকাশ করেছে যে, সে অসুখী ।

তাঁহারা : আপনার মতে এর কারণ কী ?

আমি : কারণ কী একটা! গোটাকয়েক বাইরের— গোটাকয়েক একেবারে ভিতরের। আবার বাইরের কারণকে সময় সময় ভেতরের মনে হয়। সেদিন ক্লাসে Familyর ইতিহাস বলছিলাম, ছেলেরা প্রশ্ন করলে, ভবিষ্যৎ কী বলুন। আমি উত্তর দিলাম,— 'আমি astrologer নই, ভবিষ্যৎ কালের কোলে নয়, তোমরা যা করবে তাই হবে, তোমরা কী করবে আমি কি জানব ?' একটি ছেলে বললে, 'আমাদের হাত-পা বাঁধা, বাপ-মায়ের কৃপায় আমরা কিছুই করতে পারি না।' ঠোঁটের ডগায় উত্তর এল, ''তবে বেঁধে মার খাও!' ছাত্রের দল সাধারণত মিথ্যা কথা কয় না। তারা বাপ-মা-এর দোষ দেয়। অর্থাৎ সমাজেরই অনেকটা দোষ।

তাঁহারা : বেচারা সমাজ! আজ কত বৎসর ধরে এই সমাজ কত দোষই না বহন করে আসছে!

আমি : সেই জন্যে সমাজের প্রতি আমার যে কৃপা হয় না তা নয়। অবশ্য দোষ শুধু সমাজের নয়। সমাজের দোষের জন্যে মানুষ দায়ী। সে দোষ খণ্ডনের জন্যে সমবেত চেষ্টার আবশ্যক। আমাদের সমাজের মধ্যে শক্তিকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে না। সব সমাজেই দোষ আছে, কিন্তু অন্য সমাজে এমন সব শক্তিকেন্দ্র, **power-house** আছে, যেখান থেকে শক্তি অর্জন করে যুবক-যুবতীর দল সমাজকে সচল করে তোলে। আমাদের সমাজের ভেতরে ও ধরনের কেন্দ্র আর নেই। কেন্দ্র বললে কোনো অনুষ্ঠান বুঝবেন না। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই এ দেশে। শক্তির **nucleus** অশরীরীও হতে পারে, এবং তাই হলেই ভালো। **Tradition** বলতেও ভয় হয়, কোকিলের মতো

wandering voice গোছের। আমাদের দেশে যদি কিছু করতে চান তা হলে বিপ্লবের সাহায্য নিতে হবে। তার কুফল-সুফল দুইই আছে— কোন্ ফল ফলবে, আগে থাকতে বলা যায় না, কেন না সুফল ফলাবার জন্যে একসঙ্গে শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান লোকের দরকার। সেটি দুর্লভ। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বুদ্ধিমান, কিন্তু মানুষ হিসেবে তাঁরা অপদার্থ। আর কংগ্রেসের নেতারা শক্তিশালী, কিন্তু বুদ্ধির ধার তাঁরা ধারেন না। আর আশ্রমের দোষ এই যে যেখানে গেলে অন্তত লজ্জার খাতিরে তার থেকে আর বেরোনো যায় না। অতএব সমাজ অচলায়তনই রয়ে যায়, যতক্ষণ না state কিছু করে। আমাদের আবার state কোথায়? আমাদের আছে গবর্নমেণ্ট, তাও নয়, আছে **administration**, তাও শান্তি রক্ষার জন্যে, আর অর্থশোষণের জন্যে। Administration-এর খেয়ে দেয়ে কী কাজ নেই যে সমাজকে ভদ্রলোকের বাসোপযোগী করে তুলবে? তার স্বার্থ কি? এক যদি যুগধর্ম বলেন, তা হলে নাচার। কেন না ও বস্তুটি কখনও আপনার আমার ধর্ম নিয়ে তৈরি নয়, আর আপনার আমার ধর্ম যেকালে আচার পালন ছাড়া অন্য কিছু নয়, তখন যুগধর্মের অপেক্ষায় বসে থাকলে চিরকালই বসে থাকতে হবে। অতএব বেঁধে মার খাওয়াই ভালো নয় কী? ওতে একটা ভারী আত্মতৃপ্তি আসে— সেটি ত্যাগের। উপনিষদের উক্তিও আওড়ানো যায়। অর্থাৎ সুখ ত্যাগ করাই যদি ভোগের চরম কথা হয়, তা হলে সব গোলমালই মিটে গেল।

তাঁহারা: এই বার আপনাদের গলদ কোথায় বুঝেছি। সুখী হতে গেলে ত্যাগ করতেই হয়, এবং আপনারা তাতে রাজি নন। অতএব আপনাদের সমস্যা খুব উঁচু ধরনের নয়। সমস্যাটি হচ্ছে— স্বার্থপর ব্যক্তির স্বার্থপরতার সঙ্গে অন্যকে জোর করে খাপ খাওয়ানো।

আমি: অন্যকে ঠিক নয়, অন্যের স্বার্থকে। কিন্তু স্বার্থের আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। আমার বিশ্বাস আমার স্বার্থ অন্যের স্বার্থ অপেক্ষা অনেক মূল্যবান। তবে সে স্বার্থটুকু সার্থক করবার জন্যে অন্যের আবশ্যক। অন্যে রাজি হচ্ছে না, কেন না অন্যের কাজই হচ্ছে বাধা দেওয়া। বিশেষত সে যদি ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন গঠনের, ভিন্ন ধরনের হয়, তা হলে বিপদ আরও বাড়ে।

তাঁহারা: আচ্ছা, একটু অন্যভাবেই দেখুন না! যদি স্ত্রী বলেন যে, তিনিও মানুষ— এবং তাঁর প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের পথে আপনিই বাধা দিচ্ছেন?

আমি : তা হলে ব্যাপার অনেকটা সোজা হয়ে যায়। অর্থাৎ ইব্‌সেন ও তাঁর চেলাদের নাটক-নভেলের শেষ পাতা খুলে সমস্যার নিরাকরণ করা যায়। ব্যাপার কিন্তু অত সোজা নয়। ওঁদের আপত্তি একেবারে জড়ের আপত্তি— যেখানে আপত্তি মুখর, সেখানে বুলিগুলো ধরতাই ও ধার করা। শেকড়ে শেকড়ে কী রকম লড়াই হয় জানেন তো? এ খানিকটা সে ধরনের। আমার ধারনা হয়েছে যে স্ত্রীর একমাত্র কাজ স্বামীকে ঐ-ভাবে slowly strangle করা।

তাঁহারা : ছিঃ, আপনার গলায় দড়ি!

আমি : লজ্জা দেবেন না, দড়ি ছিঁড়ে যাবে আমার কপালে।

তাঁহারা : আপনি হচ্ছেন 'অসম্ভব' লোক।

আমি : সাধারণ বললে কী মুখে ছাই পড়ত?

তাঁহারা : নিজের দিকে চেয়ে যে কথা কয়, কাজ করে, তারই কপালে অশান্তি।

আমি : সেকি, 'সোঽহং' মন্ত্রের কথা ভুলে গেলেন?

তাঁহারা : সে 'অহং' আর আপনার অহংকার এক নয়।

আমি : আর আমি যদি বলি অহংকারের ভিত্তি খুঁড়তে গেলেই তার ওপরের 'অহং'-এর ইমারত ভেঙে পড়বে, তা হলে দাঁড়াবেন কোথায়?

তাঁহারা : ভিত্তি খুঁড়তে খুঁড়তে দেখবেন সব সুখস্বাচ্ছন্দ্য উবে গিয়েছে।

আমি : আমি অহংকার সহজে ত্যাগ করতে পারব না।

তাঁহারা : বেশ, বাইরের কোনো বড় কাজ গ্রহণ করুন। দু'জনে মিলে এক কাজ করলে শান্তি পাওয়া যায়।

আমি : কাজ বাইরের হয় না; যদি হয় তা হলে তাকে সাদরে গ্রহণ করা যায় না, যদিও বা নিজে করা যায়, পরকে গ্রহণ করানো যায় না। যদিও তা করানো যায়, তাতে শান্তি আসে না।

তাঁহারা : তা হলে যোগ নিন।

আমি : যদি স্ত্রীরা রাজি না হন?

তাঁহারা : তা হলে বেঁধে মার খান!

আমি : কোনো উপায় নেই? শান্তি উপভোগ করবার শক্তি বোধহয় glands-এর উপর নির্ভর করে।

তাঁহারা : অন্তত একটার ওপর।

আমি : আবার ফ্রয়েড! খানিকটা সত্যি, বাকিটা?

তাঁহারা : মোদ্দা কথা, কারুর বিবাহ করা উচিত, কারুর নয়।

আমি : আশা করি, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কাউকে বাদ দিচ্ছেন না?

তাঁহারা : না, তা বলছি না; মেয়েরা সকলেই বিবাহ করবার জন্যে প্রস্তুত।

আমি : বিবাহিত হবার জন্যে যদি বলতেন, তা হলে সায় দিতাম। আপনাদের কথাই ঠিক। আমার বিশ্বাস, সকলে স্ত্রী হবার যোগ্য নয়, যেমন সব পুরুষ স্বামী হবার যোগ্য নয়। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। ছেলেদেরই ভাল স্বাস্থ্য খোঁজে মেয়ের বাপেরা এবং সমাজ-সংস্কারকেরা। স্বাস্থ্যের জন্য কর্তাদের ব্যগ্রতার কারণ খুঁজলে দেখবেন যে সমাজ-সংস্কারকদের সন্তানদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যাই বেশি, এবং মেয়ের বাপেরা নিত্যন্ত sentimental লোক। এই যে মেয়েদের সম্বন্ধে তাদের sentimentality, তাতে যে দেশের কত ক্ষতি হচ্ছে তা তাঁরা জানেন না। অনুগ্রহ করে যদি তারা সংস্কারকার্য ও কন্যা-উৎপাদন কার্য থেকে বিরত হন তা হলে দেশের জন্যে কিছু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তারা বড় ধার্মিক ও দীর্ঘজীবী।

তাঁহারা : মেয়েদের কি পরীক্ষা করে নিতে চান?

আমি : হ্যাঁ।

তাঁহারা : কে করবে? কীভাবে হবে?

আমি : যখন শ্বশুর ভাল জামাই চান, তখন কী হাতে পরীক্ষার প্রশ্নলিপি থাকে? তা থাকে না, আর থাকলেই যে পরীক্ষার ফল ভাল হতো তা নয়। এর মধ্যে দামী কথা এই যে আজকালের শ্বশুররা মেয়েকে যার-তার হাতে সঁপে না দিয়ে অপেক্ষা করতে পারেন— শুধু first class দেখেই ক্ষান্ত হন না, যাচিয়ে নেন। কিন্তু তাঁরা নিজেদের মেয়েদের যাচাতে দেন না, তাঁদের bourgeois sense of respectability-তে বাধে। ছেলের বাপেরাও লোভী ও সৌন্দর্যের উপাসক— রং ফরসা, দেখতে ভাল, ইংরাজী জানে, গান জানে, সেলাই জানে, তার ওপর বড়লোকের মেয়ে হলে তো ব্যস্! তা সে যত রোগের কুটিই হোক না, ইংরেজীতে তার যত বানান ভুলই থাক না কেন! কিছুতেই আসে যায় না— কেন না মেয়ের স্বভাবটি ছেলের কপাল! আমার সব চেয়ে রাগ হয় এই ধরনের sentimentality-র ওপর। আজকালকার বাপেরা মেয়ের প্রতি নজর দিচ্ছেন, লেখাপড়া গানবাজনা শেখাচ্ছেন। তাকে শিক্ষা বলা যায় না, সে বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যার চেয়েও নিম্নস্তরের। খানিকটা শিখিয়ে তাঁরা মেয়েকে

জামাইবাড়ি ছেড়ে দিলেন— চরে খা গে— তাঁদের কর্তব্যের সমাপ্তি হলো! একবার যদি শ্বশুরেরা নেপথ্য থেকে দেখতে পেতেন যে, তাঁদের আদুরি কন্যার দল স্বামীর ঘরে গিয়ে কী করেন, তাঁদের অস্তিত্ব, তাঁদের প্রেম, তাঁদের সতীত্ব, তাঁদের স্ত্রীত্ব, স্নেহ, মমতা দিয়ে, কী মধুর ভাবে, ময়ালসাপের মতন গেলবার আগে স্বামী-হরিণের গায়ে লালা ঢালেন, তা হলে নিশ্চয়ই তাঁরা আঁৎকে উঠতেন। কিন্তু তাঁদের দেখানো অসম্ভব, কেন না তাঁরা অন্ধ— স্নেহে ও দাম্ভিকতায়। তাঁদেরও দোষ দেওয়া যায় না। বাপ-মাকে ঠকানো মেয়েদের পক্ষে নিতান্ত সহজ কাজ। তাঁরা ঠকুন যত পারেন তাতে আপত্তি নেই, আপত্তি হচ্ছে আরও ভয়ংকর।

তাঁহারা : এর চেয়ে আরও ভয়ংকর কিছু আছে নাকি ?

আমি : আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, পিতৃভক্ত কন্যা কখনও স্ত্রী হবার উপযুক্ত নয়। এই কথা প্রত্যেক স্বামী জানে— কোনো পিতাই জানেন না। তা হলে সমাজের দিক থেকে দোষ হলো কন্যার প্রতি প্রত্যেক পিতার ও মাতার **sentimental attitude**। একটা উপদেশ দিতে পারি— যদি আপনারা আপনাদের ছেলের জন্যে মেয়ে দেখতে যান, তা হলে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'মা, তুমি তোমার বাবাকে ও কাকাকে কি বলে ডাক ?' যদি উত্তর পান 'তুমি', তখনই ছাঁচিপান না খেয়েই পালিয়ে আসবেন— এক মুহূর্ত বসবেন না সেখানে।

তাঁহারা : আরও দু'-চারটে প্রশ্ন তৈরি করে দিতে পারেন ? দেশের ও দশের মঙ্গল হয়।

আমি : প্রশ্ন তৈরি করার জন্যে **Expert committee** বসানো দরকার। সভাপতি **Experimental Psychology**-র কোনো বিজ্ঞ অধ্যাপক, অন্যান্য সভ্য— গিরীন্দ্রশেখর, **Berkley-Hill** কিংবা কোনো বাঙালী **alienist**, একজন **Eugenist**, একজন **Gland-expert, and the hon'ble mover**। পরীক্ষার জন্যে আজকাল প্রশ্নকারকেরই খাটুনি বেশি, পরীক্ষার্থীর কাজ দশ মিনিটে ক্ষান্ত। আর তার বেশি কিছু করাও যায় না।

তাঁহারা : পরীক্ষা তো হলো, পরীক্ষোত্তীর্ণার সঙ্গে প্রেম হবে কী করে জানবেন ?

আমি : একেবারেই হবে না। ঠিক সেই জন্যেই তাকে বিবাহোপ-যোগ্যা বিবেচনা করি।

তাঁহারা : তা হলে প্রেমটা—

আমি : হ্যাঁ, ঠিক তাই হলে সর্বনাশ! গলতি ঐখানে। সব ছেলেরা

গোড়ায় গোড়ায় বৌয়েদের সঙ্গে প্রেমে পড়ে যায়। নিজেকে ধরা দেয় বলতে চাই না, কেন না এদেশে যখন বিবাহ হয়, তখন নিজ বলতে নিজের দুর্বলতা ও ভাবপ্রবণতাই বোঝায়। যখন দুর্বলতা ঝরে যায়, তখনই বিবাহ করা উচিত— দুই পক্ষের। তবে মেয়েদের sentimentality বোধহয় কখনও যায় না, সেই জন্যে স্বামীর চরিত্র এমন classically composed হওয়া চাই যে মেয়েরা তার 'বন্দেশ্'কে কিছুতেই, কোনো ছলনার দ্বারাই ভাঙতে সক্ষম হবে না। স্ত্রীরা সব যুযুৎসু জানেন, দুর্বল কী না, তাই শিখতে হয়েছে। আমাদের ও কাটান প্যাঁচ, মারণ-মন্ত্র শিখতে হবে।

তাঁহারা: প্রেমে পড়া তা হলে পাপ!

আমি: দেখুন, 'তা হলে', 'তা হলে' করবেন না। প্রেমে পড়া পাপ কি না জানি না, তবে স্ত্রীর সঙ্গে গোড়া থেকেই প্রেমে পড়লে একটা ভীষণ দোষ হয় এই যে, স্ত্রীকে ভিন্ন না ভেবে অন্তত সমান সমান ভাবতে হয়। মেয়েরা যে আলাদা জীব, এবং সমান নয়, এই না ভেবে জীবনযাত্রা শুরু করলেই সর্বনাশ হয় দেখেছি। প্রকৃতিকে এক ছাঁচে ঢাললে সে প্রতিশোধ নেবেই। আমার বিশ্বাস আমাদের এই বিদেশী ধারণা of sex-equality পারিবারিক অসুখের একটি মূল কারণ। শুধু ধারণাটি ধারণ করলে আপত্তি নেই, কিন্তু জীবনে তাকে প্রয়োগ করতে গেলেই সমূহ বিপদ। ইংরেজী-শিক্ষিতের মতন ভাবপ্রবণ ও ধরতাই বুলির দাস সমাজের আর কোনো শ্রেণীতে আছে কী না জানি না। ঐ ধরনের ধার-করা বুলি খাটাতে গিয়ে সংসার ছারেখারে যাওয়াই উচিত। তার দরুণ অশান্তিটা আপনার-আমার পক্ষে কষ্টদায়ক হলেও সমাজের উন্নতির পক্ষে ততটা নয়। তাতে অবশ্য সান্ত্বনা নেই।

তাঁহারা: আপনি যে বললেন বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই অসুখী হয়। এটা যে একেবারে উল্‌টো কথা মনে হচ্ছে।

আমি: আমাদের দেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তির মানে বুদ্ধিজীবী। তবে তাদের বুদ্ধির মার্জন-মর্দন খানিকটা যাও হয়েছে, হৃদয়বৃত্তির তাও হয় নি।

তাঁহারা: হৃদয়বৃত্তির শিক্ষা হলে তো লোকে আরও প্রেমে পড়বে! বিশেষত আপনারা, কেন না, আপনাদের হৃদয় ক্ষুধিত!

আমি: তা নয়। আপনারা যাকে প্রেম বলেন, সেটা শিক্ষার দরুণ লোপ পায়। শিক্ষা বলতে আমি অভ্যাস বলি। বিবাহের পূর্বে বার তিন-চার প্রেমে পড়লে খানিকটা শিক্ষালাভ হয়। একটু পোড় খেয়ে বিবাহ করলে চরিত্রের দৃঢ়তা আসে, অর্থাৎ বুদ্ধির মেরুদণ্ড একটু শক্ত হয়।

একধারে বিদেশী বুলির চাপ, অন্যধারে হৃদয়বৃত্তি-চর্চার অসুবিধা— এই দুইয়ে মিলে আমাদের দেশের বুদ্ধিমান যুবক প্রথমেই স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খায়, তারপর যখন চোখ খোলে তখন দেখতে পায় যে জীবনটা বরবাদ. হয়ে গিয়েছে। নতুন করে প্রেমে পড়বার সুযোগ নেই, থাকলেও ধর্মে বাধে— কেন না স্ত্রী হলেন ধর্মপত্নী। পুরুষদের বেলায় যদি একথা একগুণ সত্যি, মেয়েদের বেলায় হাজার গুণ। বুদ্ধিমান লোকে অসুখী হয় বলেছিলাম এই ভেবে যে, তাদের চোখ একবার না একবার খোলে। অন্য সম্প্রদায়ের চোখ কখনও খোলে না, এবং তাঁরাই সুখী, তাঁরাই সমাজের স্তম্ভস্বরূপ!

তাঁহারা: আচ্ছা, বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতীরা সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা স্মরণ করে একটু সুখী তো হতে পারেন?

আমি: তাঁরাও মানুষ ভুলছেন কেন? মানুষ হলেই শান্তি ভালোবাসতে হবে। আশা, ভবিষ্যতের আশা, মরে গেলেও অনাগত বংশধরদের উন্নতির আশা পোষণ করে অশান্তিকে দৈনন্দিন জীবন থেকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একটু practical ভাবে দেখুন না! আপনাদের জীবনে শান্তি রইল না, কেবল মনোমালিন্যই রইল— এই আবহাওয়ার মধ্যে আপনাদের সন্তানাদি কী করে সহজ ও সরলভাবে বেড়ে উঠবে। বাপ-মায়ের মধ্যে যদি ভাব না থাকে, তাদের জীবনের প্রত্যেক আচার-ব্যবহারে সহানুভূতি, সমবেদনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় যদি সন্তানে না পায়, তা হলে, বড হলে, সন্তানরা যখন সামাজিক জীব হবে, তখন তাদের বুদ্ধিতে, প্রবৃত্তিতে সেই অশান্তির ফলে গোটাকয়েক সাংঘাতিক জট পাকানো থাকবেই থাকবে। সে জট ছাড়ানো কত শক্ত তা কী বলব! সমাজের মধ্যে যে হাজার কুৎসিত ব্যাপার ঘটছে তার গূঢ় কারণ ঐ। অতএব আপনাদের মধ্যে মনোমালিন্য ও অশান্তি থাকার দরুণ আপনাদের বংশধরদের জীবনও নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্যেই বলি, ভবিষ্যতের আশায় বসে থাকলে চলে না। ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে আমাদেরই হাতে— অতএব আমাদের জট আমাদেরই ছাড়ানো উচিত। অশান্তি হচ্ছে রক্তবীজের জাতভাই। যদি কেউ পরে কী হবে ভেবে নিজেকে সুখী করতে চেষ্টা করে, সে করুক! আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু মনে হয়, তাতে বেশি কাজ হয় না— **rationalizing** ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তাঁহারা: আপনি ঠিক কী বলতে চান?

আমি: সেটা যদি এখনও বুঝতে না পেরে থাকেন তা হলে নাচার।

আমার বক্তব্য সোজা, ভাষাও সাদাসিধে। মোদ্দা কথা এই যে, স্ত্রীজাতির প্রতি মোহ কাটাতে হবে। শক্ত কাজ।

তাঁহারা : একটা সোজা উপায় বলুন।

আমি : স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মোহ কাটাতে হবে। এইটাই বিবাহের startegy, ক্রয়েড শুধু tactician of marriage।

তাঁহারা : স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মোহ কাটাতেও বলেন ?

আমি : তাঁরা ভিন্ন জাতি, তাঁদের কথা অন্য, বিবাহে তাঁদের যুদ্ধরীতি ভিন্ন, উদ্দেশ্য পৃথক্। তাঁদের কথা তাঁরা বলুন। অনুরোধ এই, সকলে, তাঁরা না পারেন, আপনারা একটু সত্য কথা বলুন— প্রাণ খুলে। ধার-করা বুলি নয়, খাঁটি কথা, সাহিত্যের বুলি নয়, প্রাণের কথা, আধো-আধো ভাঙা ভাঙা বুলি নয়, সোজা সাফ কথা। মোহ কাটানো চাই আমাদের, আমি এইটুকু জানি।

তাঁহারা : মোহ নিতান্তই স্বাভাবিক যে কালে, তখন কাটাবেন কী করে ? মোহ কাটালে আবার যদি জট পড়ে ? যদি অপকার হয় ? প্রকৃতি যদি প্রতিশোধ নেয় ?

আমি : আপনাদের প্রশ্নে অনেক ফাঁকি রয়েছে। প্রবৃত্তি আর মোহ এক নয়, ম্যাক্‌ডুগাল্ সাহেব জুড়তে গিয়ে বিপদে পড়েছেন। প্রবৃত্তিটাও সব সময়ে প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। তাও যদি হয়, তা হলে প্রকৃতি যে একটা কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে নীরবে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, আপনার-আমার জনান্তিকে কাজ করে যাচ্ছে ভাববার কোনো অর্থ নেই। বুদ্ধিটা অবশ্য মানুষের, প্রকৃতি নয়। আমার এই বিশ্বাস, যদি সত্য হয়, তা হলে বলতে হবে যে, বুদ্ধির দ্বারা মোহ কাটানো যায়; মোহকে জোর করে দাবিয়ে হয়তো নয়। মোহের স্বভাবই হচ্ছে ধীরে ধীরে লোপ পাওয়া; সেই লোভ পাওয়ার পন্থাকে একটু ঢালু করতে হবে, তার গতিকে দ্রুত করতে হবে— তার স্বভাবকে জানতে হবে, তাকে একটু canalize, একটু sublimate করতে হবে। দুঃখের কথা যে, psycho-analysis এখনও biology, বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর biology-তে আটক রয়েছে। দেহ থেকে মনের আংশিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেহবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের হাত থেকেও মনোবিজ্ঞানের আংশিক মুক্তি প্রার্থনীয়। আপনাদের দোষ হয়েছে যে, আপনারা সেই ম্যাক্‌ডুগালের মতের দাস হয়েই রইলেন। সমগ্র স্ত্রীজাতির প্রতি সমগ্র পুরুষজাতির attitude-কে যদি instinctive বলেন তা হলে আমার আপত্তি নেই।

তাঁহারা : কেন ?

আমি : কারণ সে attitude-টা instinct-এর মতনই abstract। সমগ্র পুরুষজাতি এবং সমগ্র স্ত্রীজাতি বলতে বুঝি একটা average পুরুষ, আর একটি average মেয়ে। যেই average পুরুষ ধরলাম, অমনি, সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ছেঁটে ফেললাম, তাকে প্রতীক, প্রতিনিধি ও আদর্শ ঠিক করলাম। সেইখানেই ক্ষান্ত হলে তবু বিজ্ঞানের সুবিধা হতো— কিন্তু 'থাম' বললেই মনের কাজ থামে না— তাই তার ভিতরে পুরলাম আমাদের আদরের বিশ্বাসগুলোকে— ম্যাকৃডুগালের রচিত, খবরের কাগজ মারফত আমাদের পরিচিত মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে গোটাকয়েক গড়পড়তা ধারণাকে। কেউ ভেবে দেখলাম না যে, মানব-প্রকৃতি একটা homogeneous পদার্থ নয়, ও তার সম্বন্ধে ঐ ধরনের abstract generalization করা যায় না, কেউ ভাবলুম না যে প্রতীকত্বে, প্রতিনিধিত্বে, ব্যক্তিগতসত্তা— বস্তুর একমাত্র সত্তা— ঠাঁই পেল না। এ রকমের জুয়োচুরি করলে আর কেন মনে হবে না যে, বুদ্ধির দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা প্রকৃতিকে বশ করা যায় না! প্রকৃতি সম্বন্ধে আপনাদের কথা শুনলে আমার আদিম অসভ্যজাতির কথা মনে হয়। আর কী মনে হয় জানেন? জোর করে behaviourism পড়াই। অনুগ্রহ করে ভুল বুঝবেন না। প্রবৃত্তি নেই বলছি না, মোহ নেই বলছি না। অভ্যাসই সব। তবে বলি যে, অভ্যাস ভাঙা যায়। অতএব যদি শান্তি চান তা হলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অভ্যস্ত ও সংস্কারগত মনোভাবকে বদলাতে হবে, এবং তার সঙ্গে নতুন ব্যবহারের ও অভ্যাসের পত্তন করতে হবে। ভরসা এইটুকু যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্ত্রীকে উর্বশী হিসেবে দেখেন না, এবং প্রায় সকলেই মোহমুক্ত হব' হব' হয়ে আছেন— শুধু গোটাকয়েক censorship-এর ভয়ে মোহমুক্ত হতে পারছেন না। সত্যিকারের শান্তিময় বিবাহিত জীবনে, অর্থাৎ rational basis of marriage-এ মোহের গন্ধ পর্যন্ত থাকে না।

তাঁহারা : যতটুকু বুঝলাম তাতে মনে হচ্ছে যে আপনি প্রত্যেক স্বামীকে rational হওয়া দূরে থাকুক, caveman হতেই উপদেশ দিচ্ছেন।

আমি : ছাই বুঝেছেন! সেখানেও মোহ ছিল। গুহার মধ্যে ভীষণ অন্ধকার, এবং অন্ধকারেই মোহ খোলে। আদিম মানবের মোহ ছিল না জানলেন কী করে? খুব গোড়ায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কী ছিল জানা নেই। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই ছিল, কী ছিল না, তাই জোর করে বলা যায় না। যাদের কথা জানি তারা ছিল শিকারী— বনের ও সমুদ্রের। তাদের মধ্যে মেয়েদের

স্থান বেশ উঁচুতেই ছিল। যাযাবর অবস্থাতেও তাদের স্থান বিশেষ কিছু নাবে নি। চাষবাস যখন পাকা হলো তখন থেকে পুরুষদের আর বাড়ি ছেড়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবার তত প্রয়োজন রইল না। অল্প পরিসরের মধ্যে খাদ্য জুটে গেল, একেবারে বাড়ির চারপাশে। চাষের কাজ ও পশুপালন বাড়ি বসেই চলে। পুরুষরা বাড়ির ঘাঁটি আগলাতে আরম্ভ করলে, সেখানে তারা মাথা কাড়া দিতে শুরু করলে। ঘরের কাজ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভাগ হলো, মেয়েদের কাজ সংকীর্ণ হতে লাগল, স্থানও ধীরে ধীরে নেমে গেল। তবে তাদের অন্য প্রয়োজন কমল না। সংসারের দৈনন্দিন কাজের খাতিরেই তাদের ছিল খাতির। গ্রামে বসবাস করে, চাষবাসের দীর্ঘ অবসরে, সকলে মিলে গৃহশিল্প ও সাহিত্যচর্চা শুরু করলে। আমরা প্রায় এই সময় থেকেই মেয়েদের ঠকাতে শুরু করলাম। তারা হলো তাঁরা। তাঁদেরকে বললাম, 'ওগো, তোমরা আমাদের ঘরণী, গৃহিণী, মা, বোন, প্রেয়সীর জাত, তোমাদের দায়িত্ব এখন কিছু কমেছে, অতএব ঘরকে তোমরা সুন্দর করে তোলো।' ঐ হাড়ভাঙা ছোট কাজের মধ্যে মিষ্টি কথা শুনলে কার না মন ভেজে! এই মিষ্টি কথার রেশ চলল কয়েক হাজার বৎসর ধরে। তারপরে জন-কয়েক লোক গোটাকয়েক কলকব্জা আবিষ্কার করলে। তারই ফলে সব গেল বদলে। কোথায় রইল বন্যজন্তু শিকার, কোথায় রইল ছ'মাস সমুদ্রের বুকে ভাসা, কোথায় রইল গোচারণ, অশ্বপালন, কোথায় রইল মাটি আঁচড়ানো ও কোদ্‌লানো, কোথায় রইল আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকা, কোথায় রইল জমিদারের কৃপায় জীবনযাপন? সব গেল বদলে, উল্‌টে-পাল্‌টে। জীবনযাত্রার ভীষণতা, অনিশ্চয়তা, আপদবিপদ সব গেল কমে। অন্তত সকলের এই মনে হলো। আরে তাই কী হবার যো আছে! কোথা থেকে শকুনির ঝাঁক ঝেঁপে পড়ল! গ্রাম ও জমি থেকে সব বিতাড়িত হয়ে স্ত্রী-পুরুষে শহরে এল, কারখানায় রোজগার করতে। টাকা চাই, কর্তার মাইনে কম। শিশু ও শিশুর মা'রা পর্যন্ত রোজগার আরম্ভ করে দিলে। মেয়েদের প্রয়োজনীয়তা পুরুষে এতই উপলব্ধি করলে যে, স্বামীর দল legislative protection of woman labour-এ আপত্তি পর্যন্ত করতে ছাড়ে নি। প্রয়োজনীয়তা বাড়ার সঙ্গে মেয়েদের খাতিরও বাড়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হলো না। ঘরের বিস্বাদে ও pin-money-র মোহে মেয়েরা তখন মুহ্যমান। তাও ঠিক নয়। সব কাঁচিয়ে দিলে ঐ কারখানার আবহাওয়া। ঐ হাড়ভাঙা কাজ মন দিল ভেঙে। দিনের ভেতর বারো-চোদ্দ ঘণ্টা খাটলে, পুরুষমানুষে মদের দোকানে ও কুস্থানেই ছুটবে, মেয়েরাও

বাড়ি এসে সুখী হবে না, এই স্বাভাবিক। বাড়িতেও মেয়েদের কাজের বিরাম নেই— রান্নাবান্না, ছেলেপিলে মানুষ করা তো রয়েইছে। আর কী এক-আধটা ছেলে-পিলে! এ সময়ের, এমন কী এখানকারের differential birth-rate ও death-rate দেখলেই বুঝবেন। যার কাজ যত বেশি তার ওপরই ষষ্ঠী ঠাকরুণের তত কৃপা। লক্ষ্মী ও ষষ্ঠী ঠাকরুণের শত্রুতা চিরন্তন। মেয়েদের অবস্থা মধ্যযুগের দাসীর চেয়েও খারাপ হলো। তারা বেঁকে দাঁড়াল। দাঁড়াবেই না বা কেন? বড়লোকের মেয়েরা মোটর চড়ে বেড়াবে— আর তারা বইবে ছেলে, ঠেলবে কয়লাগাড়ি, আর পাকাবে সুতো? ম্যাডাম বোভারি সমাজের সব শ্রেণীতেই আছে। যতদিন ভিক্টোরিয়ার জয়-জয়কার ছিল ততদিন বেশি কিছু হয় নি। এমন সময় প্রকাশিত হলো Fruits of Philosophy, এই পঞ্চাশ বৎসর আগে। পুরুষরা দেখলেন— সব শ্রেণীর মেয়েরাই লেখাপড়া শিখছে, দেরিতে বিবাহ করছে, সুবিধে পেয়ে কৃতিত্ব দেখাচ্ছে, সব ধারেই ঘর ভাঙতে আরম্ভ হয়েছে। অমনি আমরা আর একটি মন্ত্র ঝাড়লাম— 'ওগো, তোমরা বাইরে এসেছ ভালোই করেছ, তবুও তোমরা অবলা— মনে নয়, আত্মায় নয়, দেহে। তোমরা তেলাপোকা গিরগিটি দেখলে এখনও অজ্ঞান হও, তোমরা ঐ রকম পোষাক পরে ছুটতে পার না, তোমাদের কথায় কথায় মাথা ধরে। কিন্তু তাতে দুঃখিত হও কেন? তোমরা আমাদের চেয়ে স্নেহে, মমতায়, দয়া-দাক্ষিণ্যে, অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তিতে অনেক বড়। দু'এক বিষয়ে ছোট হতে পার— কিন্তু never mind— গড়পড়তায় তোমরা আমাদের সমান, কেন না তোমাদেরও মন আছে, আত্মা আছে।' মধ্যযুগের chivalry মিশলো age of reason-এর equality-র সঙ্গে। রাজযোটক মিল হলো! মেয়েদেরও ছিল inferiority-complex, তারই বশে তাঁরা এতদিন চেঁচাচ্ছিলেন। তাঁরাও বললেন, 'নিশ্চয়ই আমরা সমান, সমান শুধু নয়, একেবারে এক।' আমাদের মিথ্যাদান তাঁদের রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলে গেল। ফলে আমাদের বশীকরণ মন্ত্র হয়ে গেল natural law of equality! কেউ দেখলে না কোথায় ফাঁকি রয়ে গেল! কেউ এই নব-আবিষ্কৃত natural law-এর সঙ্গে সেই পুরাতন natural law of fundamental difference খাপ খাওয়ালে না!

তাঁহারা: এ তো গেল বিদেশের কথা। আপনার এক মস্ত দোষ যে, সভ্যতা বলতে য়ুরোপের সভ্যতাই বোঝেন।

আমি: না, তা বুঝি না। বৈজ্ঞানিক হিসেবে দেখতে গেলে, objec-

tively বুঝতে গেলে, আমরা এখনও য়ুরোপের মধ্যযুগের অর্থাৎ mid-Victorian যুগের লোক। তাও নয়, agricultural stage আমরা ছাড়ি নি। ছাড়লেই বা কী হতো! এ দেশের আবার নতুন ইতিহাস আছে নাকি? আমাদের সবই তো ধার করা! য়ুরোপে যা হয়েছিল, আমাদের নির্বুদ্ধিতার জন্যে এখানেও তাই হবে— না হলে মনে হবে কিছুই হলো না। আমি আদিম অবস্থাতেও যেতে চাই না, য়ুরোপের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হোক তাও চাই না। আদিম অবস্থায় ফিরে যাওয়া যাবে না; ও বিদেশী সভ্যতার ইতিহাসে যা' ঘটেছে তাই এদেশে ঘটুক, কেন না যা হয়েছে, তাই ভালো হয়েছে, এ রকম আশা ও বিশ্বাস করতে নারাজ। আমি জুয়োচুরি বরদাস্ত করতে পারি না। দেখছি, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে একটা জুয়োচুরি রয়েছে। জুয়োচুরিটা খুব পুরাতন, ঐতিহাসিক ও শাশ্বত বলতে পারেন। সনাতন-প্রথা এবং ইতিহাসই জুয়োচুরিকে মোহতে পরিণত করতে পারে। ঐতিহাসিক জুয়োচুরির গোষ্ঠী-সংস্করণের নামই স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ সম্বন্ধ, ও তার ব্যক্তিগত-সংস্করণের নামই প্রেম ও মোহ— প্রেম কী মোহের মধ্যে প্রকৃতিদেবীর কারচুপি নেই।

তাঁহারা: সভ্যতা খানিকটা কৃত্রিম হবেই হবে— সভ্যতার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি, খানিকটা খাদ থাকবেই থাকবে। আপনি দেখছি মানুষকে perfect না করে ছাড়বেন না!

আমি: বুদ্ধির লক্ষণই তাই। Age of reason-এর প্রধান কথা তাই ছিল— perfectability of human nature-এ প্রগাঢ় বিশ্বাস। বুদ্ধিবাদীরা, encyclopaedist-রা বিপ্লববাদী হতে পারেন, বুদ্ধির সাহায্যে, reason দিয়ে মানুষে দেবতা হতে পারে, এই বিশ্বাসের দিক্ থেকে। বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে রুশো, টলস্টয়, থোরো, গান্ধীর মতন বিপ্লববাদী হওয়া যায়, কিন্তু আমাদের আদর্শ ভল্‌টেয়ার, ডিডেরো, রাসেলের, কিন্তু ভদ্রতার মধ্যে খাদ থাকলে চলে না। জার্মান পণ্ডিত যাই বলুন না কেন, ভদ্রতা না হলে সভ্যতা হয় না। ভারতবাসী সভ্যতা ও ভদ্রতাকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারে না। ভদ্রতার মধ্যে জুয়োচুরি কপটতা থাকবে না। সেই জন্যেই বলছি, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মোহ কাটান, তবেই স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ সহজ, সরল ও সুন্দর হবে। বিদেশী বুলির মোহ কাটানো ভারি দরকার।

তাঁহারা: তা হলে দাঁড়াল এই...

আমি: বাড়ি গিয়ে ভাববেন ও নোট লিখবেন।

তাঁহারা: নোটে কাজ নেই। ফল কী হবে ভেবেছেন?

আমি : মা ফলেষু কদাচন। একেবারে নিষ্কাম কাম। জেলে যাওয়া আমার কাজ নয়, আমার কাজ বীজ ছড়ানো।

তাঁহারা : পুরুষেরই কাজ! বীজ না বিষ?

আমি : যা ভাবেন!

তাঁহারা : একটা practical suggestion দিন না!

আমি : To summarize, gentlemen—মেয়েদের পিতারা বিবাহের পূর্বে ছেলেমেয়েকে সমান ভেবে কিংবা 'কদিন আর আমার ঘরে থাকবি' ভেবে, অর্থাৎ করুণাপরবশ হয়ে উচ্ছন্ন না দিয়ে, মেয়েদেরকে পৃথক ভেবে, ভিন্ন শিক্ষা এবং অন্য ঘরের উপযুক্ত হওয়ার শিক্ষা যেন দেন। এই হলো first point—। My second point which follows from the first, as night follows the day—

তাঁহারা : অপমান করবেন না! আজ এই পর্যন্ত। বাড়ি গিয়ে একটু মোহযুক্ত হই গে।

অমি : নিজেরা উচ্ছন্ন গেলে আমি আর কী করব! আমার কর্তব্য আমি করলাম— তারপর— তারপর— তারপর যা' ইচ্ছে তাই করুন! নমস্কার! তবে, ডি. এল. রায়ের নায়কেরা যেমন বলেন, যাবার সময় এক কথা বলে যাই,— মনে রাখবেন, হৈমন্তী গল্পের আর একটা দিক্ আছে, কুমুর সম্বন্ধে মধুসূদনের কথাও বিপ্রদাসকে শুনতে হবে। শুধু বাপের, কী দাদার, কী মেয়ের আর্‌জির ওপর একতরাফা ডিক্রী দেওয়া আইনসঙ্গত নয়। আপনারা দেশভক্ত, ও কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের পোকা, তাই আপনাদের অন্তত লরেন্সের বদলে শরৎ চাটুয্যের 'সতী' গল্পটা পড়তে অনুরোধ করছি।

তাঁহারা : ঐ করেই আপনার সর্বনাশ হলো! আমরা পালাই! শুধুই ঠাট্টা, গম্ভীর কথাতেও ইয়ার্কি।

আমি : তবে ইয়ার্কির বেলা গম্ভীর নই, এইখানেই দল থেকে তফাৎ। কবে আসছেন?

তাঁহারা : আর কথ্‌খনো নয়!

আমি : তাই কী হয়! নিজেকে অসাধারণ ভাবব কী দিয়ে?

নির্ঘণ্ট

চ

জ

ট

ড

ত

থ

দ

ন

চিন্তয়সি

উৎসর্গ

প্রমথ চৌধুরী

ভূমিকা

এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি নানা মাসিক পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। তাদের বর্তমান আকারে পরিবর্তন ঘটেছে। পত্রিকার সম্পাদকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সূক্ষ্ম-সমালোচনার দৃষ্টিতে আমার মতামতের মধ্যে একাধিক বৈষম্য ধরা পড়বে নিশ্চয়। কিন্তু সেজন্য আমার চিত্তবৃত্তির গতিকে দায়ি করাই ভাল। মনের প্রকৃতি স্থিতিপ্রবণতার প্রতিকূল।

কিন্তু মতামতের ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে কোথায় যেন একটা নিভৃত ও নিশ্চিত, প্রশান্ত ও অবিচল কেন্দ্র রয়েছে। তাকে আবিষ্কার করাই আমার প্রতি সুবিচার, আমার শ্রেষ্ঠ উপকার। আমার কাছে আমার মনই সব চেয়ে বড় সত্য। সে সত্যের অপেক্ষা গম্ভীর ও ব্যাপক সত্যের সন্ধানে আমার চিত্ত বিক্ষুব্ধ। বিক্ষোভের অবসানে আমি অন্য স্তরে আরোহণ করব,— এই আমার দুরাশা! দুরাশা-পোষণেই পাঠকবৃন্দের সঙ্গে লেখকের আন্তরিক সম্বন্ধ। মতামতে গরমিল থাকবেই।

ভাষার জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তবে বোধ হয় প্রবন্ধের বিষয়-গুলিকেও দুর্বোধ্যতার জন্য আংশিকভাবে দায়ি করা চলে। সম্পূর্ণভাবে নয়, কারণ পাথরকেও রূপায়িত করা যায়, এবং রূপান্বিত হলেই শিলা হয়ে ওঠে শিল্প।

মনের কাজে অবসর মিলল না। পটভূমি চরিত্র ও ঘটনাবহুল হলে অবকাশ পাওয়া দুর্লভ। অথচ, অবকাশের সলজ্জ-সকাশেই শ্রী ফুটে ওঠে। চিরকাল আবাদ করলে প্রাচুর্যের অভাব হয় না, অভাব হয় লক্ষ্মীশ্রীর। জমি পতিত রাখার প্রয়োজন স্বীকার করি। মনে মনে, প্রাণে প্রাণে নয়।

আমার মন গন্তব্যস্থানে এখনও উপস্থিত হয়নি। অতএব কোন বিষয়েই আমার মন্তব্য আমার কাছেই শেষ কথা নয়। পরের কাছে ত' দূরের কথা।

অনিশ্চিতের অনুধ্যানে যাঁদের শংকা নেই তাঁরাই আমার সমগোত্র।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

২০শে ডিসেম্বর,

১৯৩৩

কস্মৈ দেবায়

কিছুদিন পূর্বে এডিংটন্, জীন্স্ ও মিলিক্যান্ পড়ে একটা তথ্য আবিষ্কার করি— বৈজ্ঞানিকেরা মানুষ ছাড়া অতিমানুষ নন। তাঁরাও মানুষের মতন নিজেদের পাতিহাঁসকে রাজহংস বিবেচনা করেন, এবং মানুষের মতনই নিজেদের বিশেষ-জ্ঞানের বহির্ভূত বিষয় নিয়ে বকতে গেলেই বোকামি করে বসেন। তাঁদের এই 'মানুষিক' ব্যবহার দেখে ভারী আনন্দ হয়েছিল। ভেতরে ভেতরে তাঁদের উপর রাগ ছিল। অঙ্কশাস্ত্রে তাদের ব্যুৎপত্তিকে হিংসা করতাম, মনে হতো সূত্রগুলো মন্ত্রের মতনই লোক ঠকাবার যন্ত্র মাত্র। প্রায়ই ভাবতাম, অঙ্কের হাত থেকে কী পরিত্রাণ নেই? নানান রকমের বিজ্ঞান রয়েছে, নতুন নতুন বিজ্ঞান তৈরি হচ্ছে, সেখানে অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ কোনো জবরদস্তি নেই, তাদের বিষয়বস্তু শিশি-বোতলের মধ্যে, বাগানে চিড়িয়াখানায়, বনজঙ্গলে আত্মগোপন করে রয়েছে, তারা সংখ্যার কবলে পড়েনি, ধ্যান-রসিকদের মস্তিষ্কের মধ্যে বন্দী হয়ে তাদের পূর্ণসত্তা এখনও বিধ্বস্ত ও বিখণ্ডিত হয়নি, ভাবতাম কবে সেগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ হবে, কবে পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি সুসজ্জিত হয়ে ভদ্রলোকের পাঠোপযোগী হবে? কবে সেই পরীক্ষক-বৈজ্ঞানিকের সাধনা সম্পূর্ণ হবে, কবে তাঁরা প্রয়োগাগার থেকে বেরিয়ে, মুক্ত হাওয়াতে দাঁড়িয়ে, জগতের সম্মুখে নিজেদের বক্তব্য প্রচার করবেন? তাঁদের ওপরই সমাজতাত্ত্বিকের ভরসা, কেননা, আমরা না পারি পরীক্ষা ও প্রয়োগ করতে, না পারি সাংখ্যিক সূত্র ঘটাতে, অথচ জ্ঞানের অভাবে সমাজ রয়েছে অনেক পেছনে পড়ে। আমি জানতাম যে, এই সব বিজ্ঞান বয়সে শিশু, তাদের সাধনা অসম্পূর্ণ, যতটুকু হয়েছে তার প্রচারও ভাল রকম হয়নি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতির তুলনায়। আমি জানতাম যে, সাধনার প্রথম স্তরে মন্ত্রগুপ্তির নিতান্ত প্রয়োজন থাকে। আমাদের শিক্ষাও এত একপেশে হয়েছে যে,

নব্যবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত জানবার শক্তি ও ঔৎসুক্য নেই। · কিন্তু মনে মনে আমার ভয় ঘোচেনি, একটা সন্দেহ বরাবরই ছিল যে, আজ না হয় কাল এ-সব বিদ্যাও সংখ্যাতত্ত্বের অধীনে আসবেই আসবে। কারণ, ভবিষ্যদ্বাণী করাই যদি বিজ্ঞানের চরম সামাজিক সার্থকতা হয়, সমাজের মঙ্গল বিধানই যদি বিজ্ঞানের চরম :উদ্দেশ্য, বিশেষত এইসব নতুন বিজ্ঞানের অব্যবহিত লক্ষ্য হয়, তাহলে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সঠিক করার জন্যে সংখ্যা ছাড়া আর কী উপায় আছে? সংখ্যার দৌত্যেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যের সখ্যলাভ করে। কিন্তু আবার ঐ পদার্থ-বৈজ্ঞানিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিকেরাই আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সংখ্যামূলক সামান্য গুণের একটা স্বাতন্ত্র্য ও বড় রকমের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, সত্তার সঙ্গে তার কোনো সাম্য কী সাদৃশ্য, সালোক্য কী সাযুজ্য, সাজাত্য কী স্বারূপ্য কিছু নেই, আছে শুধু সার্ষ্টি, অর্থাৎ সত্তার সমান ঐশ্বর্য, ও সারথ্য। কিন্তু কায়া বাদ দিয়ে ছায়া নিয়ে পড়ে থাকলে মানুষের চলে না। আমার কারবার মানুষ নিয়ে, মানুষের সমাজ নিয়ে, যেখানে মানুষ বিচিত্র ও খেয়ালি, বিশেষ করে যেখানে একটা গড়পড়তা গতির বিবরণ ও ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া নিয়মের অন্য অর্থ ও মূল্য নেই। আমার ব্যবসা সমাজতত্ত্ব নিয়ে, যার তত্ত্বকথা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক সম্বন্ধের ভেতরে ও অন্তরালে, সংস্কারের ব্যাপ্তিতে যে ব্যক্তিস্বরূপ থাকে তাকে বোঝা ও ফুটিয়ে তোলা। অথচ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবিশ্বাস করবার মতন যৌগিক দুঃসাহস আমার ছিল না। আমার জানা ছিল যে, পদ্ধতি জিনিসটাই একটা সামাজিক ব্যবস্থা, অতএব ইতিহাসে তার একটা স্থান ও কর্তব্য আছে। যেমন পূর্বে ম্যাজিক ছিল, এখন তেমনি লজিক হয়েছে। সমাজের বর্তমান অবস্থায়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে নানা রকমের সুবিধা ও অধিকতর সমস্যার নিরাকরণ সম্ভব হয়েছে, অতএব তার প্রতিপত্তি অমান্য করার স্পৃহা ও স্পর্ধা আমার কখনই ছিল না। এ-যুগে জন্মে, এ-যুগের পদ্ধতিতে বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক। বোধ হয়, বিশ্বাসের মাত্রাধিক্যটুকু যুক্তিতর্কের দ্বারা মার্জনাও করেছি। যে-পদ্ধতিতে নানা কারণে বিশ্বাস করতাম, সেই পদ্ধতির মূলে সংখ্যা থাকার জন্য পূর্বে কোনো সন্দেহই উঠত না। যখন সংখ্যার কারচুপিতে সংশয় এল, তখন ঘটল বিপদ। এখনও সন্দেহের দোলাতেই দুলছি। এক-একবার ইচ্ছে হয়, এডিংটন্, জীন্সের বৈজ্ঞানিক মন্তব্যগুলি যাচিয়ে নিই, অথচ সে বিদ্যা নেই। তাই মনে হলো, যে-বিজ্ঞান সংখ্যার ওপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত নয় তারই সিদ্ধান্ত নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। জীবতত্ত্বকে বেছে নিলাম প্রধানত ঐ কারণে! তা ছাড়া আমার ধারণা ছিল এই, যে-কালে তত্ত্বটির গোড়ায় জীব কথাটি রয়েছে, আর আমরা

যখন জীববিশেষ, অর্থাৎ আমাদের যখন অন্যান্য জীবের মতন জীবন রয়েছে, তখন পদার্থবিজ্ঞানের চেয়ে জীবতত্ত্বের কাছে জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধান প্রত্যাশা করাই সঙ্গত হবে। সেইজন্য খানকয়েক নামজাদা জীবতাত্ত্বিকের নতুন বই পড়লাম।* বলা বাহুল্য, সমস্যার বিশেষ কোনো সমাধান হলো না। জীবতত্ত্বের বই পড়ে ভাল করে জীবন চালাবার বিশেষ কোনো সুবিধা হয়নি। কেন হলো না তাই লিখছি। গোটাকয়েক কারণ মাত্র নির্দেশ করতে পারব।

প্রধান কারণ এই যে, বর্তমান জীবতত্ত্ব সংখ্যার নাগপাশে জড়িয়ে পড়েছে দেখলাম। এতদিন ধরে জীববিজ্ঞান একটা না একটা মতের আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছিল, এবং সেই মতের যুক্তি খোঁজবার ভার নিয়েছিলেন অ্যামেচারের দল। সেইজন্য অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব এত বিস্তীর্ণ হয়েছিল। ডারুইন সাহেবের প্রধান কাজ ছিল জীবের শ্রেণীভাগ ও শ্রেণীর ভৌগোলিক বিভাগ করা। শ্রেণীর উৎপত্তির ইতিহাসটা তাঁর অব্যবহিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সীমার বাইরে ছিল। তাঁর শিষ্যবৃন্দ যখন তাঁর মতটা উৎপত্তির ইতিহাসে খাটাতে লাগলেন, তাঁর বই-এর নামের দোহাই দিয়ে, তখন নানা বাধা-বিঘ্ন এসে হাজির হলো। একটি মত সত্য কী মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না, অন্য একটি মতের দ্বারা। সেইজন্য যে লামার্কিয়ান মতের খানিকটা ডারুইন নিজেই গ্রহণ করেছিলেন সেটার উজ্জীবনে জীববিজ্ঞানের বিশেষ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হলো না। অ-বৈজ্ঞানিকের হাত থেকে জীবের মুক্তি বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠল। এই সময় আবিষ্কৃত হলো মেণ্ডেলের বইটা। তারই সহায়তায় জীবতত্ত্ব প্রয়োগাগারে প্রবেশ লাভ করলে। "ত্যজ আশা প্রবেশি এ দ্বারে।" কিন্তু বারব্যাঙ্কের মতো প্রয়োগশিল্পীর দল ভারী ছিল না, তাই জীবতত্ত্ব পড়লো অধ্যাপকের হাতে

---

*Philosophy of Biologist—Sir Leonard Hill. F. R. S., (Edward Arnold & Co.), The Nature of Living Matter—L. Hogben, Professor of Social Biology, London University (Kegan Paul), Mind at the Crossway—C. Lloyd Morgan (Williams Norgate), The Biological Basis of Human Nature—H. S. Jennings (Faber & Faber), Science and Religion—B. B. C. Talks (Howe, 1931), The Making of Man : An outline of Anthropology—Edited by V. F. Calverton. (The Modern Library), Life : Outlines of General Biology—Sir J. A. Thomson & Prof. Patrick Geddes (2 Vols., Williams Norgate), Causes of Evolution—J. B. S. Haldane.

এসে। সে হাতে এলে আর রক্ষা নেই। মেণ্ডেলের পাটিগণিত হয়ে উঠল বীজগণিত— টম্‌সন্ ও গেডিস্ বলছেন আইনস্টাইনের পাল্লায় পড়বার সম্ভাবনা জীবতত্ত্বের যথেষ্ট রয়েছে। লিওনার্ড হিল্ বিশদভাবে দেখালেন যে, পরমাণুর সঙ্গে জীবকোষের গঠন-সাদৃশ্য খুব বেশি। অন্যধারে আবার, পদার্থবিজ্ঞানের দিক থেকে, হোয়াইট্‌হেড্ চাইছেন যে পরমাণুর আন্তর্জাতিক সম্বন্ধটি বীজ-কোষের পরস্পর ব্যবহারের সঙ্গে তুলনা করা হোক। হগ্‌বেন্ বলেন, জীব-তত্ত্বে physico-chemical reaction-এর দ্বারা যতদূর ব্যাখ্যা চলে তার মধ্যে প্রাণবাদ আনবার কোনো দরকার নেই। তাঁর মতে, বাঙ্‌ময় জগতে, সামাজিক আলোচনার আসরে, mechanistic পদ্ধতিই একমাত্র উপায়; সাধারণের আদান-প্রদানের হাটে, ব্যক্তিগত গোপন কথা, গোপন ব্যথা প্রকাশ করা, আগে যেমন ছিল অভদ্ররুচির চিহ্ন, এখন তেমনি হয়ে উঠেছে অবৈজ্ঞানিক, অযুক্তি-সঙ্গত। নব্য-নৈয়ায়িকদের মতো এতদূর পর্যন্ত বলতে তিনি রাজি নন যে, যা প্রকাশ্য নয় তার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু অব্যক্তের আপেক্ষিক মূল্য নিশ্চয়ই কম মনে হয়— বিশেষত ধর্ম ও আর্টের আবেদনের আলোচনা পড়ে। যদি জীবতত্ত্বকে প্রয়োগাগারের পরীক্ষায় ওপর দাঁড় করান যায় তাহলেও mathematical physicist-এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনো উপায় রয়েছে মনে হয় না। পরীক্ষা করতে গিয়েই জে· বি· এস· হল্‌ডেনের মতন অধ্যাপকেরা জীবতত্ত্বকে উচ্চাঙ্গের অঙ্কে এনে ফেলেছেন। এখন জীবের সৃষ্টিকর্তাকে অঙ্কশাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক বলেই মানতে হবে। সব বিজ্ঞানই কি শেষে আইনস্টাইনের দাসত্ব করবে, যেমন উনবিংশ শতাব্দীতে ডারুইনের এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিউটনের দাসত্ব করেছিল? আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর জগৎ কিছু পিছু হটবে না। Corpuscular theory-তে ফিরে যাবার কথা শুনলে দুষ্টু ঘোড়ার দৌড়বার সময় চাট মারার কথা মনে হয়। ওটা বিজ্ঞানের retroactive action, back-kick, ক্লাজের কথা নয়, কাজের কাজ হচ্ছে এগিয়ে চলা।

দ্বিতীয় কারণ এই,— একদল বৈজ্ঞানিক বলছেন, বিশ্বটা হলো ধ্বংসাভিমুখী, সাবানের বুদ্‌বুদের মতন বাড়তে বাড়তে কোনদিন ফেটে যাবে। এক সাহেব অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন যে, বিশ্বটা ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে, আবার আর একজন অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন যে, কড়াভাজা রুটির মতন তার ধারগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে। আবার একজন 'বিশ্ব-রশ্মি'র সন্ধান পেয়ে অভয় দিচ্ছেন যে, বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষতিপূরণ চলছে। আবার জীন্‌স্ অঙ্ক কষে দেখাচ্ছেন ক্ষতিপূরণ হতেই পারে না। এই ঝগড়ার মিটমাটের উপর জীববিজ্ঞানের প্রতি আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস অনেকটা নির্ভর করছে। যদি বিশ্বই যায় নষ্ট হয়ে তাহলে

অভিব্যক্তি নিরর্থক হলো, যদি-না মানুষে গীতার ধর্মানুসারে নিষ্কাম হয়ে 'মা ফলেষু কদাচন' মন্ত্র জপ করে। ও মন্ত্রে আশ্বস্ত হওয়া আমাদের মতন দূরদর্শী লোকের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের ঘুম হয় না, রাবণ দশটা মাথা নিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় পাশ ফিরতেন কি করে, তাই ভেবে। যদি বিকীর্ণ শক্তির পুনঃসঞ্চয় সম্ভব হয়, তাহলে জীবতাত্ত্বিক উল্লসিত হয়ে অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসীকে জেলে দিতে পারবেন, এই এক আশা ও সান্ত্বনা রয়েছে। কিন্তু আজ তারিখ পর্যন্ত ঝগড়া মিটল না, অবিশ্বাসীরাও বেঁচে রইলেন। যে-ছেলের অল্পবয়সে ফাঁড়া আছে, গণৎকার ঠাকুর ঠিকুজি দেখে বলেছেন, তাকে স্কুল-পাঠশালে পাঠাতে ইচ্ছা না হওয়াই বাপ-মার পক্ষে স্বাভাবিক। সেইজন্যই মাদুলি শান্তিস্বস্ত্যয়ন মানতে হয়।

তৃতীয় কারণ,— দেখতে পাচ্ছি যে, জীবতাত্ত্বিকের মধ্যে দু'টি দল পাকিয়ে উঠেছে। তাঁরা নিজেদের অন্য আখ্যা দিলেও তাঁদেরকে যন্ত্রবাদী **mechanist** ও **vitalist** অর্থাৎ প্রাণবাদী বলা যেতে পারে। আজকালকার বাজারে বিশুদ্ধ যন্ত্রবাদ ও বিশুদ্ধ প্রাণবাদের খাতির কমছে। হগ্‌বেন্ নিজেকে বলছেন **mechanist publicist**, লয়েড্ মর্গ্যান্ নিজেকে **emergent evolutionist** পূর্ব থেকেই বলেছেন, সেই মতের একটু অদল-বদল করে সেনাপতি স্মাট্স নিজেকে হোলিস্ট (**Holist**) বললেন, জে. বি. এস্. হল্‌ডেন্ ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এসে, **respiratory pigment**-এর রিসার্চ ছেড়ে দিয়ে, বেতারের মারফৎ জগৎকে জানালেন যে, হোলিজম্ মানা ছাড়া জীবতাত্ত্বিকের কোনো উপায় নেই। জেনিংস্, যে জেনিংস নিতান্ত মাথা-ঠাণ্ডা লোক, তিনিও উদ্‌গতিবাদের তরফদারি করে তাঁর পুস্তক সমাপ্ত করলেন। মোদ্দা কথা এই দাঁড়িয়েছে, লয়েড্ মর্গ্যানের মত নেবো, না নেবো না? তাঁর প্রধান বক্তব্য পূর্বেই প্রকাশ করেছেন, এবার মনোজগতে সে মতটি প্রয়োগ করেছেন একটু বিস্তারিতভাবে। তিনি বলছেন, দেখা যাচ্ছে যে জগতে গোটাকয়েক পরিষ্কার স্তর কিংবা কোষ রয়েছে, অজীব, জীব, মন প্রত্যেকটির মধ্যে ব্যবধান, সান্তরতা রয়েছে যেটা পার হতে গেলে লাফাতে হয়, প্রত্যেক স্তরে এমন একটি আগন্তুক নতুন গুণের আবির্ভাব হচ্ছে যার সম্বন্ধে পূর্বের ধাপ থেকে কোনো প্রকার ভবিষ্যদ্বাণীই করা যায় না। এখন মজা হলো এই যে, এ-ধরনের উদ্‌গতিবাদে বিশ্বাস করলে অনেক সুবিধা হয়। অজীব, জীব, মন— বিবর্তনের এই মোটা ধারাটি মানলেই আত্মতৃপ্তি আসে— কেননা, যেটি শেষে প্রকাশিত সেইটিই সব চেয়ে উন্নত, আর যেটি উন্নত, অনুন্নতের উপর একটা স্বাভাবিক দাবি তার থেকেই যায়। এবং দাবি ও 'স্বাভাবিক' দাবিটা যে দাবি করে ও সে দাবি

আদায় করতে যে জানে তার পক্ষে কত সুবিধা তা প্রত্যেক ইংরাজ জানে ভারতবাসী সম্বন্ধে, পুরুষ জানে স্ত্রীর, পিতা জানে পুত্রকন্যার, ব্রাহ্মণ জানে শূদ্রের, মানুষ জানে জীবজন্তু ও বনজঙ্গল সম্বন্ধে। তারপর, ধর্মরক্ষাও হয়। যদি মন পর্যন্ত এসে থাকে তাহলে মনের ওপারে যাবে না কেন? আর ওপারে গেলেই ধর্ম, আত্মা, ভগবান প্রভৃতির মধ্যে একটা কিছুতে পৌঁছতেই হবে। দার্শনিকের সেরা দার্শনিক আলেকজাণ্ডার এই বিশ্বাসই করেন। আমরা ত' বিশ্বাস করবই, তাঁর মাত্র একটা deity, আমাদের তেত্রিশ কোটি, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার চেয়ে মাত্র কিছু কম, অহিন্দুদের দেবতা নেই কিনা। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের লয়েড্ মর্গ্যান্ ভারী সুবিধা করে দিয়েছেন। শুধু কী তাই? যাঁরা মানুষ নিয়ে কারবার করেন; যেমন কবি ও সমাজতাত্ত্বিক, তিনি তাঁদেরও পূজার্হ। মানুষ আগে ছিল বীজ, এখন হয়ে উঠল এক আজব চীজ। তার মনুষ্যত্বই হলো তার নতুনত্ব, তার বৈশিষ্ট্য, তার খেয়ালই হলো তার সব, তার কোনো নিয়ম-কানুন নেই অতএব আর অঙ্ক কষতে হবে না, শুধু তার ব্যবহারের মজার মজার বিবরণ দিলেই চলবে; তার ভয় ভাবনা, আশা ভরসা, আদর্শ অভিলাষ যখন তাকে জীবজগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবেই পৃথক্ করেছে, তখন আর তাকে পায় কে? আর একটি লাফ, আর দেবত্ব হাতে হাতে! সেইজন্য বলি, এই নতুনত্বের ওপর জোর দিতে গিয়ে, এই বড় বড় ফাঁকগুলো আরো বড় করে দেখাতে গিয়ে, স্থিতি ও গতি থেকে মতির পার্থক্য ফোটাতে গিয়ে, মানুষের দাম্ভিকতা লয়েড্ মর্গ্যান্ বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু যৌক্তিকতার সাতত্য রক্ষা করতে পারেননি। এ-সব মত শুনলে মানুষের মতিগতি ফিরে আসে, আত্মার দিকে। লেমায়তারকে পরিত্যাগ করে চণ্ডীদাসের বুলি আওড়ান যায়; মানুষই হয়ে ওঠে মানুষের একমাত্র আলোচ্য বিষয়, অর্থাৎ খোশগল্প চলে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি school for scandal-এ প্রকাশ্য ভাবেই পরিণত হয়; এতদিন পরে mechanistic ও vitalistic ব্যাখ্যার প্রকৃত সমন্বয় হয়। যে প্রাকৃতিক সমাবেশে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে, যে দুর্ঘটনায় মানুষের মতো মানুষের 'সহসা উদয়' হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তির যখন তিলমাত্র সম্ভাবনাও নেই, যখন মানুষের মনটা একেবারে আজব চীজ, যখন প্রত্যেক স্তরে নতুন গুণ, নতুন ব্যবহার তৈরি হতে চলেছে, তখন বিজ্ঞান ও ধর্মের সব গোলমাল চুকে গেল, প্রকৃতিদেবীর পূর্ব হতেই রচিত সিংহাসনে মানুষ স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হলো। তার পর শুধু 'জয় মা' বলে লাফ দেওয়া! Mind is an emergent বলাও যা, মানুষকে দেবতা বলাও তা।

কিন্তু কেমন যেন ভয় হয়, কোথায় যেন খটকা লাগে। ধরলাম লেমায়তার,

এডিংটন্ জীন্স্ ভুল বলেছেন। তবু খটকা থেকেই যায়। অবশ্য লয়েড্ মর্গ্যানের মত গ্রহণ করলে বিজ্ঞানকে বাদ দিতে হয় না। বরঞ্চ বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের ওপর আস্থাবান হতেই তিনি বলছেন। শুধু নতুন অবস্থান, নতুন গঠন, নতুন শৃঙ্খলা, নতুন গুণ, নতুন ব্যবহার সৃষ্টি হচ্ছে মানলেই যে পূর্বাবস্থার ঘটনা ও নিয়মাবলীর উপর পরের অবস্থার নির্ভরশীলতা অস্বীকার করতে হবে, তাও নয়। জেনিংস্ এই কথা বলছেন। বলছেন খুবই ভাল করে, কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে।

প্রথম প্রশ্ন ওঠে 'নতুন' কথাটির মানে নিয়ে! যেটা আগে ছিল অথচ জানতাম না তাকে নতুন বলা হয়। বলা বাহুল্য, লয়েড্ মর্গ্যান্ এ অর্থে কথাটি ব্যবহার করেননি। অন্য অর্থ হচ্ছে, আগে ছিল না এখন হয়েছে। হয়েছে, অর্থাৎ ফুটে উঠেছে, নতুন গঠনে, নতুন সজ্জায়, নতুন শৃঙ্খলায়। এ-রকম আকছার হয়। কিন্তু কি হয়, নতুন fact হয়, নতুন ঘটনা হয়, নতুন সম্বন্ধ হয়? নতুন সম্বন্ধই হয়। লয়েড্ মর্গ্যান্ বলছেন, সবকিছুই নতুন হয়। সবকিছুই নতুন হয়, স্বীকার করা চলতে পারে, যদি সম্বন্ধকেই fact ও ঘটনা গণ্য করা হয়। কিন্তু সম্বন্ধ ও 'সম্বন্ধীর' (relata) মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে সন্দেহ হয়। মনে কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে ওঠে, তা নিয়ে অনেক তর্ক উঠতে পারে। এই সন্দেহ ও তর্কের অবসান সম্ভব যদি সঙ্গে সঙ্গে মানা হয় যে, fact কিংবা ঘটনারূপী সম্বন্ধটারও, অন্যান্য fact ও ঘটনার মতনই, একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা ব্যাখ্যা সম্ভব; অর্থাৎ যদি সেই সঙ্গে মানা হয়, জীবজগতের নতুনত্বটা, অজীবজগতের নতুন ঘটনার মতনই, সেই একই উপায়ে বুঝতে হবে, অন্য উপায়ের প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে একই উপায়ে বোঝা হচ্ছে না। লয়েড্ মর্গ্যান্ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হতে পারেন, কিন্তু সে পদ্ধতির ধারাবাহিকতা তিনি মানেন না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা ছেড়ে দিলেও বলা যায় যে, তাঁর হাতে যুক্তির মালা ছিঁড়ে গিয়েছে। নতুনত্ব ও নতুন যদি এক না হয়, যদি 'নতুনত্ব' হয় এক প্রকারের সম্বন্ধ, আর 'নতুন' হয় ঘটনা কী 'সম্বন্ধী', তাহলেও ন্যায়ের ধারাবাহিকতা মানতে হবে। তাও তিনি মানছেন না। বিজ্ঞান যুক্তির বাইরে নয়, যুক্তিতর্ক পূর্বাপর পরম্পরা মেনে চলে—তাও অতিপূর্ব নয়, জোর দু'টি আগের ধাপ, যার থেকে 'নতুন' হঠাৎ আবির্ভূত হচ্ছে; এবং যুক্তির প্রত্যেক ধাপটি অন্যের সঙ্গে সিমেণ্ট দিয়ে গাঁথা। অতএব সেই ধাপের ফাঁকে অশ্বত্থগাছ জন্মাচ্ছে শুনলে সিমেণ্টেরই দোষ মনে হয়। যে সিমেণ্ট ফেটে গিয়েছে, সেই ফাটলের মধ্যে অশ্বত্থগাছের বীজই পড়েছে, রেক্তার গাঁথুনি হলে বীজ হঠাৎ পড়লেও গাছ বেরুত না।

অন্ত প্রশ্ন ওঠে। নতুন কি হিসাবে পুরাতনের চেয়ে বড়? নতুনত্বই কি তার একমাত্র দাবি? এক যদি নতুন পুরাতনের অপেক্ষা বহুলাঙ্গ হয় তাহলে দাবি খাটে। কিন্তু গঠনচাতুর্যের দিক থেকে অণুপরমাণু জীবকোষের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই, এই ত' শুনছি। যত নতুন তত মূল্যবান, লয়েড্‌ মর্গ্যানের মনস্তত্ত্বে নীতিশাস্ত্রের এই বীজ রয়েছে। সেটা কতদূর বাঞ্ছনীয় বুঝতে পারি না।

সন্দেহ আবার ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যদি physico-chemical method মনের রাজ্যে এতই অসম্পূর্ণ হয়, তাহলে হল্‌ডেন্‌-স্মাট্‌স্‌-সংবাদের পুর্বে কোন্‌ পদ্ধতির সাহায্যে হল্‌ডেনের রিসার্চের এত নাম হলো, যার খাতিরেই তিনি গিফোর্ড লেকচারার, বেতার-বক্তা হলেন? তিনি কি কখনও ফিজিয়লজিতে physico-chemical method অবলম্বন করেননি? তাঁর চোখের সামনে কি প্রত্যেক সমগ্রতাটি ল্যাবরেটরিতে যাবার পুর্বেই ফুটে উঠত? জগদীশবাবুর ঐ রকম ফুটে ওঠে শুনেছি, বক্তৃতামঞ্চে ও লেখাতে তাই বলেছেন, কিন্তু তাঁর ল্যাবরেটরিতে গেলে তাঁর চোখ দেখে ত' তা মনে হয় না। তাঁর দৃষ্টি reagent ও তার প্রতিক্রিয়ার ওপরই নিবদ্ধ থাকে। ফিজিয়লজির প্রথম উপদেশ, ভাল করে খেয়ে আত্মরক্ষা করা— সেটাও তিনি পালন করেন না। আবার মজা এই যে, হল্‌ডেন্‌সাহেব লয়েড্‌ মর্গ্যানের মতকে অশ্রদ্ধা করেন। তিনি হোলিজম্‌-এর প্রতি নিতান্তই আস্থাবান। কিন্তু whole-টাই যদি একটা emergent quality হয়? হওয়া খুবই সম্ভব, তাঁর তর্কপদ্ধতি অনুসারে, যদিও রিসার্চপদ্ধতি অনুসারে নয়। ব্যাপারখানা এই, হল্‌ডেন্‌ ও মর্গ্যান্‌ দু'জনেই সাধারণ যুক্তির ধারাবাহিকতা মানেন না।

আবার যাঁরা মানেন তাঁদের সব কথা বুঝি না, সব মতামত মানতে পারি না। ইতিপূর্বে পাভ্‌লভ্‌ পড়ি, বুঝতে পারিনি সব কথা, শেষে তার সম্বন্ধে দু'-একখানি বই পড়লাম। ওয়াট্‌সন্‌ বোঝা যায়। অবশ্য, তাঁদের লেখা পড়ে আমার লয়েড্‌ মর্গ্যান্‌ ও হল্‌ডেনের বিপক্ষে আপত্তি জোর পেয়েছে। পাভ্‌লভ্‌ হচ্ছেন ফিজিয়লজিস্ট, অতএব মানুষ জীবজন্তু থেকে কোথায় ও কতটুকু পৃথক ও এক, এইটা আবিষ্কার করাই হলো তাঁর কাজ। মানুষের আছে forebrain, যার জন্তই সে অন্যান্য জন্তুর মতন জড়প্রকৃতির ক্রীতদাস নয়, স্বাধীন। মস্তিষ্কের এই সামনের অংশটাই হচ্ছে conditioned behaviour-এর কাঠামো: অতএব মানুষ পৃথক হলো এই হিসাবে যে, সে অন্যান্য জন্তুর চেয়ে বেশি সংখ্যক conditioned behaviour গ্রহণ করে অভ্যাসে পরিণত করতে পারে। কিন্তু তিনি মানুষ নিয়ে পরীক্ষা করেন নি— পরীক্ষা করেছেন কুকুর

নিয়ে। তাতে তাঁর সিদ্ধান্তের কিছুই আসে যায় না, বরঞ্চ ভালই হয়— জুলিয়ান্ হাক্‌স্‌লি ও ওয়েল্‌স্ অকাট্য যুক্তির দ্বারা দেখিয়েছেন। পাভ্‌লভের পরীক্ষায় কুকুরটা প্রধান কথা নয়, প্রধান কথা এই যে, ব্যবহারের কার্যকারণ ঠিক হচ্ছে physico-chemical process-এর দ্বারা, এবং পরীক্ষাগারে কুকুরে মানুষে তফাৎ নেই। পরীক্ষার ভেতর তাঁর কোন অসাবধানতা আছে, কেউ বলেছেন শুনিনি। কিন্তু গোল বাঁধে তাঁর সিদ্ধান্তকে সমাজতত্ত্বে খাটাতে গিয়ে। পাভ্‌লভের মতে শিক্ষিত হবার ক্ষমতাই যখন মানুষকে পৃথক করে, তখন সমাজের অনেক কর্তব্য জুটল, আমাদের উন্নতিতে আমাদের অনেক হাত আছে ভাবাই আমাদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল। ওয়াট্‌সন্ একবার বলেছিলেন— আমি যে কোনো শিশুকে জোয়াকিমের মতো বাজিয়ে করে তুলতে পারি। লক্ষ্ণৌ-এর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অন্য কথা বলেন। আমেরিকায় কি হচ্ছে জানি না, তবে ভারতবর্ষের কোনো শিক্ষক condition-ing-এ এতটা বিশ্বাসী হতে পারেন না। পাকা idiot-কে ওয়াট্‌সনের মতন অধ্যাপকও করা যায় না। মোদ্দা কথা, জীবের উত্তরাধিকার মানতেই হবে। হাসপাতালের শিশু মা-বাপের কোলের খোকাও নয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত আমরা করবই করব, তবে আমাদের ভুল বৈজ্ঞানিকদের ঘাড়ে না চাপালেই হলো। ওয়াট্‌সনের কথা ছেড়ে দিচ্ছি— তাঁর রিসার্চ-এর একটা news-value আছে। ভাগ্যিস পাভ্‌লভ্ রাশিয়ায় জন্মেছিলেন— যে দেশের সবই খারাপ, তাই রক্ষে! সেইজন্য তাঁর কাজে খাদ মিশতে পারেনি, তাঁকে Gifford Lectures দিতেও ইংরেজ ডাকেনি। তাঁর কৃতিত্ব হলো এই যে, জীবজগতের ব্যবহার অনুসন্ধানে তিনি যে পুরাতন mechanistic রীতিনীতি-পদ্ধতি ছাড়েননি, মস্তিষ্কের বিচিত্র ব্যবহারের ব্যাখ্যাতে physcio-chemical reaction-এর ওপর নির্ভর করেন, কোন emergent value তিনি লক্ষ করেননি, অতএব মানেননি, জীবের আর অজীবের মধ্যে ব্যবধান আছে স্বীকার করেও নতুন পদ্ধতি, নতুন যুক্তি গ্রহণ করেননি, সব যেন একসূত্রে বাঁধা এই ভেবেই তিনি কাজ করে আসছেন। সেইজন্য, যদিও তাঁর কুকুর পোষা, ল্যাজ নাড়ে, মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে, তবুও তাঁর পরীক্ষায় কোন গলদ কেউ পায়নি, এবং তাঁর মতের একটা সামাজিক মূল্য আছে। কী করে তাঁর মত সমাজে খাটাব, সে কথা হচ্ছে না, তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, অন্য বিদ্যা এখনও পেছিয়ে রয়েছে। জীবতাত্ত্বিকের প্রকৃতি-ভঙ্গিকে তিনি নাড়া দিয়েছেন, কিংবা ভাইসম্যানের genetic determinism-কে তিনি খণ্ডন করেছেন বলে তিনি মস্তলোক না-ও হতে পারেন। আমার তরফ থেকে তাঁর মহান কীর্তি হলো

এই যে, তিনি, ডারুইনের মতনই, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের মধ্যের নালাটির ওপর সেতু তৈরি করেছেন। ডারুইন যা করবার সুযোগ পাননি, তিনি এ যুগে বেঁচে তাই পেয়েছেন— তাঁর সেতুটি নিতান্তই mechanistic method-এ তৈরি। এ সেতুর ওপর জোর করে হাঁটা যায়, তার ওপর দিয়ে সৈন্য চালিয়ে অজ্ঞানতার রাজ্য আক্রমণ করা যায়, অর্থাৎ জ্ঞানের ভৌগোলিক সীমা বাড়ান যায়। আমার দিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব হলো এই যে, ব্যবহারের mechanistic ব্যাখ্যা করে তার জন্য physico-chemical পদ্ধতি অবলম্বন করে, লয়েড্ মর্গ্যান্, হল্‌ডেন্ ও স্মাট্‌সের ইমারত তিনি ধূলিসাৎ করেছেন।

এ ত' গেল প্রাণবাদীর বিপক্ষে আপত্তি। পুরাতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্বপক্ষের উক্তিও আছে। ধরা যাক, ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে, প্রত্যেক স্তরের বিশেষ গুণ প্রকাশিত হচ্ছে টের পাচ্ছি, কিন্তু তাই বলে নিম্নস্তরের পদ্ধতি (physico-chemical, mechanistic method) উচ্চস্তরে খাটবে না প্রমাণিত হয় কি করে? Mechanistic ব্যাখ্যাতে কী বলে, নতুন কিছু হতেই পারে না, কিংবা যখন নতুন কিছু হয় তখন তাকে সে ব্যাখ্যা ফুঁয়ে উড়িয়ে দেয়, নেই নেই করে, সাপের বিষের মতন? রসায়নশাস্ত্রে যখন কার্বনের ক্রিয়া বোঝা যায়নি, তখন অর্গানিক কেমিষ্ট্রির জন্য কী ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল? Urea-র ব্যবহারও কী তখন emergent মনে হয়নি? হেন্‌রী সাহেবের মনে হয়েছিল তাই, তবু Wohler তাকে synthesise করবার সময় তার প্রত্যেক উপাদানটি বিশ্লেষণ করেছিলেন সেই পুরাতন উপায়েই, নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজনও অনুভব করেননি।

শুধু তাই নয়, স্তরই যদি মানতে হয়, তাহলে ভাল করেই মানা যাক। অণু ও পরমাণুকেও দুই স্তরে ভাগ করা যায়, প্রত্যেকটি নিয়ে বিশেষ বিজ্ঞান রয়েছে। আবার পরমাণুর মধ্যেও ইলেক্‌ট্রোন, তার মধ্যে প্রোটোন পদার্থ ও তার কক্ষ রয়েছে— প্রত্যেকের খেয়াল আলাদা আলাদা সকলে বলছে। প্রত্যেকটাই নতুন বলে প্রত্যেকটির ব্যাখ্যার জন্য কী বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে? তা করা হচ্ছে না। না করেও পদার্থবিজ্ঞান এত এগিয়ে গিয়েছে। তাহলে দাঁড়ায় এই যে, প্রত্যেক জিনিসেরই একটা বিশেষত্ব আছে, —কে এ কথা অস্বীকার করছে? কেননা, স্বীকার করলে কারুর বুদ্ধিতে টান পড়ছে না। এর মানে, প্রত্যেকের প্রত্যেকত্ব আছে। কথাটা খুব দামী নয়— tautology মাত্র। এই সব কারণেই মনে হয় emergent evolution, holism প্রভৃতি গালভরা নাম নিজেদের অজ্ঞানতা ঢাকবার আবরণ মাত্র। অজ্ঞানতা একটা মানসিক অবস্থা, যেটি fact, ব্যাখ্যা নয়। বিজ্ঞান ব্যাখ্যার

একটা পদ্ধতি মাত্র, এ যুগের সব চেয়ে ভাল ও ব্যাপক পদ্ধতি। সেটা অন্ত কিছু নয়। সৌজাত্য বিদ্যার বই খুলে সুপ্রজনন সম্ভব নয়, সোনার চাঁদ ছেলে কোলে আসে না—এলে পরে তার দ্বারা গুণের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হয় মাত্র।

যদি ব্যাখ্যার বেলা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিতান্তই অসম্পূর্ণ হয়, প্রত্যেক স্তরে নতুন নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, (পদার্থের বেলায় এক রকম, আর মানুষের বেলায়, মর্গ্যানের মতে, dramatic, যেটা বস্তুত animistic ছাড়া অন্য কিছু নয়) তাহলে এতদিন mechanistic ব্যাখ্যার দ্বারা এতগুলি ভিন্ন ধরনের ও গঠনের ব্যাখ্যা হলো কি করে— এ-প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক যদি তোলেন, তাহলে ভাল উত্তর বোধ হয় এই বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকদের কাছে পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানের আদত কথা logical continuity, পদ্ধতির সাতত্য, অবিচ্ছিন্নতা। দর্শনের গূঢ় কথা প্রত্যেক বাক্যের অঙ্গীকারগুলি যুক্তিতে টেঁকে কিনা তাই দেখা। আরো ভাল করে দেখতে গেলে হয়ত নব্যন্যায়ের দরকার হবে, হয়েওছে। কিন্তু তার পদ্ধতিও কি বিচ্ছিন্ন, বিরত, সান্তর? তাও নয়। Mechanistic ব্যাখ্যার জয়-জয়কার যুক্তির সাতত্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানে সান্তরতার ছড়াছড়ি হয়েছিল, কয়েকদিন পূর্বে, এখন উল্‌টো সুরও গাওয়া হচ্ছে। সে যাই হোক, ব্যাখ্যার মধ্যে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের জগতে সাতত্য রাখতেই হবে। আমার এই ধারণা যদি সত্য হয়, তাহলে লয়েড্‌ মর্গ্যান্‌ ও হল্‌ডেনের মতের ওপর 'অক্কামের ক্ষুর' চালাবার প্রয়োজন রয়েছে।

মোদ্দা কথা এই যে, তর্কের দ্বারা mechanistic ব্যাখ্যাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আবার vitalistic, holistic কী emergent evolution-এর ব্যাখ্যাকেও গ্রহণ করা যায় না। Mechanistic ব্যাখ্যা, আর দর্শনের জড়ত্ব কী দেহাত্মবাদ এক নয় মানতে হয়, এবং মানলেই আপাতত বাকিটা বেশ চলে যায়। সমাজতত্ত্বে কিন্তু ঐ প্রকার physico-chemical, কী mechanistic পদ্ধতি খাটাতে পারি না! অন্যে যে কারণে খাটাতে রাজি হন না, আমি হয়ত ঠিক সে কারণে গররাজি নই। আমার গোলমাল বাঁধে অজ্ঞানতা, সাধনার অসম্পূর্ণতায়। পরে হয়ত সে ব্যাখ্যা সামাজিক ব্যবহারেও চলবে, কিন্তু ততদিন হয়ত বিশ্ব ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে। ততদিন কি করা যায়? এক উপায় আছে— ডি· এল· রায়ের বুড়োবুড়ির ঝগড়ার মতন বিজ্ঞান ও ধর্মের কলহকে লঘুক্রিয়া বলে ছেড়ে দেওয়া। বই পড়ে তাও পারি না, সব কিছুকেই গম্ভীরভাবে নিতে হয়, এমন কী বৈজ্ঞানিকের দার্শনিক মতকেও। এ-সব বই-এর একপ্রকার সমালোচনা হচ্ছে চুপ করে রিসার্চ করে

যাওয়া ; তাতেও কিন্তু ঘাম ঝরে। সেইজন্য সন্দেহ-দোলাতেই দুলতে হয়।

পাকা মাতালরা সকাল বেলা আর এক চুমুক টেনে গত রজনীর উচ্ছৃঙ্খলতার খোঁয়াড়ি ভাঙে। মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করে, ক্যালভারটনের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। মতটাকে রীতি-নীতি ও মতির মতনই দরকারি মনে করা সমাজতাত্ত্বিকের নেশা ও পেশা। লোকে কেন একটি মত ছেড়ে অন্য মত বরণ করে আমাদের দেখতে হয়। তাই দেখাতে গিয়ে ভদ্রলোক বলছেন, **cultural complex**-এর পেছনে যে শক্তি কাজ করে সেটা শ্রেণীগত স্বার্থের। **"It is not what has usually been called the truth of their doctrine which makes them so powerful, but their adaptability to other interests, class-intersts in the main, which they subserve. It is these other, these more basic, interests that turn these ideas into cultural compulsives." "The cultural compulsive represents the group-interest in its psychological form"**। এ মন্তব্যে অনেকটা সত্য নিহিত রয়েছে। বিবাহের উৎপত্তি সম্বন্ধে ওয়েস্টার-মার্কের মতামত ভিক্টোরীয়ান যুগের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনোমত হয়েছিল বলেই তার বহুল প্রচার হলো, আবার ঐ সম্বন্ধে মর্গ্যানের মত সোশিয়ালিস্টরা গ্রহণ করলো নিজেদের শ্রেণীর আশানুযায়ী সম্পত্তিবিভাগের সমর্থন হয় বলে। আজ যদি পৃথিবীতে অর্থকষ্ট না থাকত, তাহলে কার্ল মার্কসের ইকনমিক ব্যাখ্যা কেউ গ্রহণ করত কি? মনঃকষ্ট পেলে লোকে ধার্মিক হয়, সে মনঃকষ্টের প্রকৃতির উপর ভগবান সাকার হবেন কী নিরাকার হবেন নির্ভর করে। তার উপর আবার মানুষের স্বভাবে চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। বহির্মুখী না হলে হগ্‌বেনের **publicist point of view** গ্রহণ করা যায়? আমেরিকাতেই ওয়াট্‌সন্, মিলিক্যানের আশার বাণী, বেলজিয়মেই লেমায়তার-এর দুঃখবাদ, যুদ্ধক্লান্ত ও অর্থক্লিষ্ট পৃথিবীতেই এডিংটন্, জীন্‌সের মত খাপ খায়, আর ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষের মধ্যবিত্তর মধ্যে তাঁদের মতের প্রচলন হওয়াই স্বাভাবিক মনে হয়। যে কোন মতের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মতৃপ্তি, ভয়ভাবনা, আশাভরসা প্রভৃতি বাজে জিনিসের খাদ এত মেশান থাকে যে, তার কতটুকু সত্য, আর কতটুকুই বা মিথ্যা বলা একরকম অসম্ভব। হগ্‌বেনের ভাষায় বলতে গেলে, কাঠগড়ায় এখনও মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে, বিচার এখনও চলছে, রায় বেরোবাবার আগে ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা নিয়ে অসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করলে **Contempt of Reason** হবে। ইতোমধ্যে সিদ্ধান্তে না আসা ভদ্রমনের চিহ্ন মনে করে আত্মতৃপ্ত হওয়া যাক।

১৩৩৮

নর্মাল

মাস্টারি করতে গেলেও অনেক বিপদে পড়তে হয়। সব চেয়ে ভয়ংকর বিপদ হচ্ছে, পরের মুখে ঝাল খেয়ে আপ্ রুচির সর্বনাশ করা। অথচ এ কাজ করতেই হয়, না করলে চাকরি থাকে না। ভাগ্যিস আমার বাংলা লেখা আমার কর্তারা পড়েন না তাই এ প্রবন্ধ লিখতে সাহসী হচ্ছি। মাতৃভাষার সাহায্যে আমি আত্মরক্ষা করতে প্রয়াসী হয়েছি। আগে সাহেব-লোক যা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতেন তাই প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে পড়তুম এবং তাই বিশ্বাস করতুম। তাই পূর্বে হট্টমনের ওপর আস্থা ছিল, এখন আর নেই।

আমার বর্তমান রুচিবিকারের একটি ইতিহাস আছে। যখন সেকেণ্ড ক্লাসে হেয়ার স্কুলে পড়ি, তখন হঠাৎ সাহিত্যিক হয়ে উঠি। রসজ্ঞানের বিকাশ হলো কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে কম নম্বরে। অমনি আমরা জনকয়েক রসিক মিলে এমন কয়জন মহাজনের তালিকা প্রস্তুত করলুম, যাঁদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন অঙ্কশাস্ত্রে কাঁচা হয়েও জগতের মহৎ উপকার সাধন করে গিয়েছেন। অঙ্কের মাস্টারমশায়কে ঐ তালিকাটি দেখাবার পরের দিনই তিনি আর একটি তালিকা প্রস্তুত করে এনে দেখালেন, যার মধ্যে শতকরা একশ' জন মহারথীই অঙ্কের জন্যই মহৎ হতে পেরে ছিলেন। আমার বেশ মনে পড়ে যে, আমাদের সাহিত্যিকবৃন্দ তালিকাটি দেখে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন, এমন কী ঐ দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত মহারথীদের জীবন-রচয়িতার সাক্ষ্য সন্দেহ করবার সাহস পর্যন্ত কারো হয়নি। কিন্তু তখন থেকে মনে এই একটা প্রশ্ন উঠল যে, একটি তালিকার সিদ্ধান্ত অন্য তালিকার সিদ্ধান্ত হতে পৃথক কেন, এবং আমার ইচ্ছার প্রতিকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার বাধ্যবাধকতা কোথায়?

যখন স্কুল ছেড়ে কলেজে প্রবেশ করি, তখন ভেবেছিলাম যে, বড় বড় পণ্ডিতের কাছে আমার ছেলেমানুষী সন্দেহের নিরাকরণ হবে। অঙ্কে কাঁচা হয়েও বিজ্ঞান পড়তে উদ্যত হই, যেমন সকলে করে। প্রথম দিনই বিজ্ঞানের

অধ্যাপক বল্লেন, "বিজ্ঞান পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মনোভাব সৃষ্টি করা। বাঙ্গালী জাতি বড় ভাবপ্রবণ। প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবকই সাহিত্য, দর্শনের দোহাই দিয়ে মিথ্যাকল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে। তাই তাদের মুখে তত্ত্বকথাই শোনা যায়। সেইজন্য, এই জাতীয় দুর্বলতার উচ্ছেদকল্পে বিজ্ঞানের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় কথা এই যে, সাহিত্যে, দর্শনে, একটি এমন বৈজ্ঞানিক মান নেই, যার দণ্ডে ভালমন্দের ওজন হতে পারে। রবিবাবু ভাল কিংবা মন্দ কবিতা লেখেন, তা নির্ণয়ের মানদণ্ড কোথায়? আর সেইটি না থাকার দরুণই সাহিত্যিক-তর্কের মেরুদণ্ড থাকে না। ফলে জাতিও দুর্বল এবং কল্পনাশীল হয়ে পড়েছে। আমাদের বিজ্ঞান কিন্তু এলোমেলো তর্কের প্রশ্রয় দেয় না।" তারপর শিক্ষক মহাশয় বল্লেন, "এই দণ্ডকেই আমরা নর্মাল বলি। রসায়নশাস্ত্রে, এতখানি আয়তনের বস্তুতে জল মিশিয়ে হাজার C. C. আয়তনে পরিণত করলে সেই জলীয় পদার্থকে নর্মাল সলিউসন বলা যায়। যখন তোমরা হাতে কাজ করতে আরম্ভ করবে, তখন সব দ্রব পদার্থকেই তার নর্মালের সঙ্গে তুলনা করতে হবে।" বক্তৃতা শুনে, বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক-মোচনে তৎপর হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু পরীক্ষক-সম্প্রদায় দেশাত্মবোধের কদর করলেন না। সেইজন্য বোধ হয় এখনও বুঝতে পারিনি কোন্ খেয়ালে বৈজ্ঞানিক-নর্মালের স্বজন হলো।

তারপর কিঞ্চিৎ দণ্ড দিয়ে বি. এ. ক্লাসে অর্থনীতি এবং রাজনীতি নিলাম। অর্থশাস্ত্রের প্রথম কথাই আবার সেই নর্মাল-মূল্য। কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখলাম যে, নর্মাল-মূল্যের অস্তিত্ব শুধু মার্শাল সাহেবের মাথায়, নচেৎ দর কষাকষিতেই দাম ধার্য হয়, এবং সেই কার্যে অনেকখানি মনের ক্রিয়া আছে। রসায়নশাস্ত্রে যখন প্রত্যেক বস্তুর নিজের নর্মাল আছে, তখন বাজারে কেন প্রত্যেক মানুষের নিজের নর্মাল থাকবে না? মার্শাল সাহেব উত্তর দিলেন যে, 'সাধারণভাবে দেখতে গেলে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেরই অভাব আছে, সে অভাব পূর্ণ করার চেষ্টায় সে সর্বদা ব্যস্ত। এই অভাবগুলিকে এবং অভাব-পূরণের পন্থাগুলিকে থরে থরে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকভাবে সাজালে একটি ল. সা. গু. পাওয়া যাবে, সেটি একটি স্বার্থপর জীবের স্বার্থাভিসন্ধি। এই জীবটির সাধারণ এবং স্বাভাবিক ব্যবহার আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, তিনি সর্বদা নর্মাল-মূল্যে পণ্যদ্রব্য কিনছেন এবং বেচছেন।' অর্থাৎ নর্মাল-মূল্য নর্মাল জীবেরই মূল্যনির্ধারণ, রক্তমাংসের জীবের নয়।

নর্মাল কথাটির মানে কি? এর খানিকটা গড়পড়তা, খানিকটা স্বাভাবিক এবং খানিকটা আদর্শ। প্রথমেই প্রত্যেকের বিশিষ্ট অ-স্বাভাবিকত্বটুকু বর্জন

করতে হবে। তারপর প্রত্যেকের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিকে একত্রে সাজাতে হবে। তখন অবস্থাভেদে ব্যবহার ভিন্ন হবে বটে, কিন্তু সে বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যেও একটি কার্যগত সামঞ্জস্য টের পাওয়া যাবে। অতএব এর ভিতর ধর্ম নেই, নীতি নেই; আছে শুধু ক্ষেত্রকর্মানুসারে বিধান এবং নিয়ম। এই হলো বৈজ্ঞানিকের প্রথম নির্বাচনের ফল। এখন, অনেকগুলি নর্মাল আছে। পরে, বহু নর্মালের সামাণ্যীকরণে 'একটি' বৃহৎ নর্মালের সৃজন হবে, যার পরে আর কোনো কথা নেই। কিন্তু যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আলোচনা নিবদ্ধ থাকবে, তখন সেই অবস্থার নর্মালই সেই অবস্থার ব্রহ্ম।

যথা, অ্যানাটমিতে রোগা মোটা হাড়ের অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু 'হাড়ের'; অর্থশাস্ত্রে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী ভিন্ন বন্ধুর স্থান নেই; ডাক্তারিতে যেমন কেবল রোগী আছেন, সুস্থসবল কেউ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র হাড়, কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং কেবলমাত্র অসুস্থ ব্যক্তি চোখে পড়ে না। চোখে যা পড়ে সেটি হয় রোগা নয় মোটা হাড, এবং একই ব্যক্তি কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী, কখনও সহায়, কখনও রুগ্ন, কখনও সবল। বাস্তব জগতে নর্মালের অস্তিত্ব নেই। 'মাথা নেই তার মাথা ব্যথা' বলে আমরা নর্মালকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করছি শুনে বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন 'নেই তাই পাচ্ছ, থাকলে কোথা পেতে?' অবশ্য নর্মালের আবশ্যক আছে, যদিও সেটি বৈজ্ঞানিক-প্রয়োজন। এ না হলে জ্ঞানের দানা বাঁধে না। প্রত্যক্ষ অস্তিত্বই শেষ কথা নয়, পরোক্ষ উদ্দেশ্যকেও মানতে হবে।

জ্ঞানই শক্তি। সে শক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে চিরজীবী হয়ে থাকা। জ্ঞানের দ্বারা যদি ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, তাহলেই জ্ঞান সার্থক হলো। মাঝিমাল্লারা জোয়ারভাটা, মেঘ ঝড় রোজ লক্ষ করে করে বলতে পারে কখন জোয়ারভাটা আসবে এবং কখন নৌকা ছাড়লে ঝড়ের আগেই নদীর ওপারে পৌছতে পারা যাবে। দৈবজ্ঞ রাজার হাত গণনা করে বলে দিলেন যুদ্ধে জয়লাভ নিশ্চিত; জয়লাভ যদি হলো, ব্রাহ্মণ হলেন মন্ত্রী; যদি হার হলো, ব্রাহ্মণ টুলো পণ্ডিতই রয়ে গেলেন। আজকালকার বৈজ্ঞানিক সেই পুরাতন দৈবজ্ঞেরই বংশধর, তাই কত বৎসর পরে কোন মুহূর্তে ধূমকেতু আসবে, এখন থেকেই অঙ্ক কষে বলে দিতে পারেন। সোনারূপোর দাম বাড়বে কি পড়বে, অর্থশাস্ত্রীর দল এক বছর আগেই তা কাগজে ছাপিয়ে দিতে পারেন। আবার জনকয়েক সমাজতত্ত্ববিশারদ কোনো বিশেষ সমাজের লোকসংখ্যাবৃদ্ধি এবং হ্রাসের হার দেখে সেই সমাজের পতন, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত বাৎলে দিতে পারেন। তবে এঁদের কথাগুলি ঠিক ফলছে না, তাই খাঁটি বৈজ্ঞানিক এখনও

সমাজতত্ত্ববিদকে বিজ্ঞানের আসরে রূপার আসনেই বসিয়ে রেখেছেন সোনার সিংহাসন দেননি।

প্রকৃতিকে বশ করাই হচ্ছে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সেই বশীকরণের মন্ত্র হলো নর্মাল। জোয়ারভাটার গতি যে মোটে একশ' বার লক্ষ করেছে তার ভবিষ্যদ্বাণী অপেক্ষা যে হাজার বার লক্ষ করেছে তার বাণীই সফল হবার সম্ভাবনা বেশি। যে আবার আরো বেশি বার লক্ষ করেছে, সে-ই জোয়ার-ভাটার স্বাভাবিক, সাধারণ গতি বলে দিতে পারে, কেননা সে-ই জোয়ারভাটার অসাধারণ, অস্বাভাবিক আচরণগুলি স্বচ্ছন্দে বাদ দিতে পারে। তারপর যে নিয়মটি নির্ণীত হলো, সেইটি নর্মাল গতি। অতএব নর্মাল সৃষ্টির পূর্বে একটি হিশাবনবিসকে ডাকতে হবে ষট্‌কে পড়বার জন্য, যোগবিয়োগ করবার জন্য। নর্মাল সৃষ্টির পরও তাঁর কাজ আছে। তাঁকে গুণতে হবে কয়টি বস্তু কিংবা কার্য নর্মালের সঙ্গে মিলছে। কতখানি গরমিল হলো ওজন করা, কিংবা গরমিলকে খাতির করায় তাঁর কাজ। যে বিজ্ঞান যত উৎকৃষ্ট, সেটি তত সংখ্যামূলক, তার গরমিল তত কম। সমাজতত্ত্বে এই গরমিল বেশি।

কিন্তু নর্মাল সৃজনে এবং সংখ্যাগণনে কতখানি যে বাদ পড়ে গেল, তা বৈজ্ঞানিক না বুঝলেও প্রত্যেক মানুষেই বোঝে। এক ছাঁচে গলতে গিয়ে প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্য হারালো। 'প্রত্যেক' হচ্ছে খামখেয়ালি, অবিবাহিত যুবকের মতন। খেয়ালও গেল। অথচ বৈচিত্র্য এবং খেয়াল, সৃষ্টির এক একটি প্রধান উপকরণ। বৈচিত্র্যকে বাদ দিয়ে হয়ত সনাতনকে পাওয়া যায় কখনো কখনো। কিন্তু সনাতনের সন্ধানে সত্যের আভাস হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা সর্বদাই রয়েছে। সনাতনের খাতিরে সত্যের অঙ্গহানি করবার অধিকার বৈজ্ঞানিকের নেই। তারপর, এই সাধারণ ও সনাতন আদর্শ মানতে গিয়ে, প্রত্যেকের কক্ষের ভিতর, জীবনের পরতে পরতে যে আদর্শ ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে, তাকে কি অবমাননা করা হলো না? বৈজ্ঞানিকের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হয়ত প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অন্তর্নিহিত আদর্শের পরিপন্থী না-ও হতে পারে। কিন্তু শেষে তাই দাঁড়ায়। তখন সেই নর্মাল পদার্থটি কেবল বৈজ্ঞানিকেরই দেবতা হবার উপযুক্ত, কিন্তু সত্য উপলব্ধির পক্ষে অপদেবতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সংখ্যার আধিক্য দেবত্বের দিকে নর্মালকে, সাধারণকে, এগিয়ে দেয়, এবং ব্যক্তিগত মোটা মোটা পার্থক্যকে মিহিন করে দেয়।

যে সব বিজ্ঞান কেবলমাত্র সংখ্যামূলক এবং নিরালম্ব, সংখ্যাই তাদের নর্মাল, বিশেষ করে একক এবং শূন্য। কিন্তু বস্তুবাচক বিজ্ঞানে, যেমন পদার্থবিদ্যা কিংবা রসায়নশাস্ত্রে, একটি নর্মাল বস্তুর প্রয়োজন হয়, যদিও সেটির

সৃজন এবং উদ্দেশ্য সংখ্যার উপর নির্ভর করে— সংখ্যাই তার শৃঙ্খল। এই দুই প্রকার বিজ্ঞানেই নর্মাল কেবলমাত্র ক্রিয়াসাধক যন্ত্র মাত্র। এ ইন্দ্রিয়রহিত অজীব জগতের কথা। কিন্তু ইন্দ্রিয়রাজ্যে ওঠবার মুখেই যে সব বিদ্যার প্রয়োজন হয়, যেমন প্রাণিতত্ত্ব, তখনই গোলমাল বাধে। এখানে অন্তত দুটি ভিন্ন প্রকৃতির নর্মাল চাই। কেননা জীববিদ্যা রসায়নশাস্ত্র এবং দেহতত্ত্বের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। বিপদ আরো ঘনিয়ে ওঠে সেই সব বিদ্যায়, যেখানে ব্যক্তি নিয়ে, প্রাণ নিয়ে কারবার। ব্যক্তির ক্রিয়াপদ্ধতি প্রথমে তার মনের এবং দেহের ওপর, দ্বিতীয়ত তার দেশ এবং দেশস্থ জীবজন্তু, মাটি, আবহাওয়ার ওপর, এবং তৃতীয়ত তার কালের এবং ইতিহাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দেশ কালের প্রাণ নেই, সেইজন্য সমাজতত্ত্ববিদ, অর্থশাস্ত্রী ও রাজনৈতিক এই জড়ের নর্মাল তৈরি করতে তত গোলে পড়েন না, যত গোলে পড়েন একটি নর্মাল মানুষ গড়তে। আমরা অর্থনৈতিক জীবটির সঙ্গে পরিচিত। রাজনৈতিক জীবটিও ঠিক একই উপায়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে এ জীবটি পৃথক, কেননা অন্যান্য ব্যক্তি ভোট দেওয়া ছাড়াও অন্য কাজ করে; কিন্তু রাজকীয় ব্যক্তির একমাত্র ক্রিয়া ভোট দেওয়া এবং নেওয়া। রাজকীয় জীবটি তাহলে রাজকীয় কার্যের পক্ষে নির্গুণ; অন্তত বৈশিষ্ট্য, উন্নতিশীলতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত গুণের ধার এ জীবটি ধারে না। এর বুদ্ধি-বিবেচনার লক্ষণ শুধু প্রতিনিধি নির্বাচনে, তবে অনেক বুদ্ধিমানের দেশেও এ কাজটি টিকিট দিয়েই সম্পন্ন হয়। এই নির্গুণ জীবটির সঙ্গে যাচিয়ে নিতে হবে রক্তমাংসের জীবকে। এই সাংঘাতিক পরীক্ষায় যত সংখ্যক ব্যক্তি পাস হলেন, তাদের একটি দল হলো; সঙ্গে সঙ্গে ফেল করার দলও আর একটি হলো। যদি পূর্বোক্ত দলের সংখ্যা পরোক্ত দলের সংখ্যা অপেক্ষা বেশি হয়, তবে কেবলমাত্র সেই নর্মাল-নির্বাচিত সংখ্যার আধিক্যই দেশের ভবিষ্যৎ কাজের উপযুক্ত কে হবেন ঠিক করলেন। এখন নর্মাল কি করে দল বাঁধতে পারে, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। নর্মাল ত' নির্গুণ এবং অবাস্তব। কিন্তু দল একটি খাঁটি বাস্তব জিনিস, এবং দলের গুণের বালাই নিয়ে আমরা সকলেই মরে আছি। নর্মালের প্রাণ চাই। এখনও ন্যায়ত, ধর্মত, বৈজ্ঞানিক নিরহঙ্কার হতে বাধ্য, কেননা তাঁর অহংকার সংখ্যার ক্ষুরে পেতে দিয়েছেন। তাই তিনি বল্লেন, এই যে নর্মালে আবদ্ধ দলটি, এটি আমার রচনা নয়, এর নিজের প্রাণ মন সব কিছুই আছে। সবই সংঘমনের সৃষ্টি, তবে সাধারণ মানুষ নিজের গর্বে স্ফীত হয়ে সংখ্যাকে তাচ্ছিল্য করে, এবং সংঘমনকে বুঝতে না পেরে নিজের মনকেই প্রধান করে দেখে। কিন্তু বস্তুত সংঘমন টালার চৌবাচ্চার মতন, ব্যক্তি এক

একটি কলতলার নল বইত নয়। অবশ্য এ সব সমাজতত্ত্ববিদের কথা, বাস্তব জগতে তিনি হয়ত অতখানি বিনয়ী না-ও হতে পারেন। মন প্রাণ যখন পাওয়া গেল, তখন সেই নর্মাল-হট্টমনের নর্মাল-পদ্ধতি পাওয়া শক্ত কথা নয়। সমস্ত বিজ্ঞানের নর্মাল-বস্তু এবং নর্মাল কার্যগত সম্বন্ধগুলিকে একত্র করে তার ল সা গু করে নিলেই সংঘমনের কার্যপদ্ধতি টের পাওয়া যাবে। সেই পদ্ধতিই হবে আদর্শ, এবং তার থেকে বিচ্যুত হবে শুধু পাষণ্ডের দল।

আমাদের সমাজে আমরা এতদিন নর্মাল মন্ত্রটি জপ করে এসেছি। আমাদের ঋষিরা ছিলেন একাধারে পণ্ডিত এবং বৈজ্ঞানিক। তাঁদের রচিত সমাজ 'জার্মান পসন্দ্'। সে বন্দোবস্ত একটি নর্মালের ওপরই স্থাপিত। কিন্তু আজ কয়েক বৎসর থেকে আমরা— অর্থাৎ B. Sc., M. Sc.-র দল এবং সেই পুরাতন আর্য-বৈজ্ঞানিকদের বংশধর,— সকলে অতি গম্ভীরভাবে রাজনীতির ছাত্র হয়ে উঠেছি। এতদিন পরে আমরা একটি রাজকীয় নর্মাল আবিষ্কার করেছি। এর পূর্বে আমরা শুধু মানুষের মাথাই গুণে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আজ দল পাকা হলো, কেননা সেই দলের একটি মনও আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই দলের একটি নেতা বলছেন, এই সংঘমনের কাছে আত্মসমর্পণ কর— দু'দিন পরে অবশ্য বলবেন যে, সংযমনই একমাত্র মন। কিন্তু সে সাহস এখনও হয়নি। এখন তিনি উপায়মাত্র বলে দিচ্ছেন যে কী করে আত্মবলি দিতে হবে। তার নাম discipline, অর্থাৎ জার্মান-ড্রিল।

আমার মনে হয় যে, হট্টমন-রূপ নতুন একটি মন্ত্র জপ করার ফল অন্যান্য নামজপের মতন সুখের হবে—অর্থাৎ সেই নাম জপ্‌তে জপ্‌তে আমরা ঘুমিয়ে পড়ব।

১৩৩২

যোগধর্মের যুক্তি

সকলেই স্বীকার করেন যে আশ্রম সমাজের বীজক্ষেত্র। সকলের কিন্তু মনে থাকে না যে আশ্রম সমাজের শক্তিকেন্দ্র এবং সংস্কার-গৃহ হওয়াও উচিত। নানা কারণে মানুষের শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়। শক্তির ক্ষতিপূরণার্থ প্রত্যেক মানুষকে কিছুকালের জন্য অবসর নিতে হয়, দৈনন্দিন কর্ম থেকে নিরস্ত হতে হয়। কিন্তু চিরকালের জন্য অবসর গ্রহণ করাও যা, আর সামাজিক মৃত্যুও তা। বলা যেতে পারে যে, সামাজিক মৃত্যু সত্যকারের ধর্মের পক্ষে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মোক্ষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু যাঁরা এই তর্ক তোলেন যদি তাঁদের আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায় অন্য ধরনের, কিন্তু মূলত সেই মামুলি সমাজ-প্রতিষ্ঠানের. চেষ্টা থাকে, তাহলে সেই আচার-ব্যবহারের সামাজিক ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত নয় ; যদি দেখি তাঁদের ব্যবহারে বৈরাগ্যের পার্থিব হেতু ও সমাজের প্রতি ঘৃণার সামাজিক কারণগুলি বিষাক্ত জীবাণুর মতন গোপনে প্রবেশ করেছে তাহলে তাঁদের অসঙ্গতি দেখাবার অধিকার আমাদের আছে ; যদি সন্ন্যাসীদের সামাজিক মৃত্যু কোনো নবজীবনের প্রবেশপত্র প্রমাণিত না হয়ে থাকে, তাহলে আশ্রমকে সন্দেহের চক্ষে দেখলে পাপ হবে না নিশ্চয়। যাঁরা সংসারের প্রতি বিরক্ত হয়ে বনবাসী হলেন, তাঁদের কথা একেবারে ভিন্ন হলেও খানিকটা বোঝা যায়— অর্থাৎ তাঁদের নিকট আমরা কিছুই প্রত্যাশা করি না। এই ধরনের সন্ন্যাসী নিজের জপতপ, নিজের মুক্তি নিয়েই ব্যস্ত— কোনো আশ্রম স্থাপনই করেন না— যেমন পওহারী বাবা ও ত্রৈলঙ্গস্বামী। সকলে মিলে যোগ করবো, জপতপ করবো, আশ্রমের প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য চেষ্টা করবো, ভিন্ন আশ্রমের প্রতি কটাক্ষপাত করবো,সমালোচনায় বিচলিত হবো— অর্থাৎ পুরাতন পরিত্যক্ত সমাজের নিতান্ত সাধারণ মনোভাবগুলি লুপ্ত হবে না—তাহলে সমাজ পরিত্যাগ করে বেশি কি লাভ হলো ! যে লাভটুকু হলো সেটি পয়সা দিয়ে কেনা যায়। পওহারী বাবা, ত্রৈলঙ্গস্বামীর ব্যবহার আলোচনা করবার ধৃষ্টতা আমার নেই,

কিন্তু সাধারণ আশ্রমবাসীদের ব্যবহার সকলেরই আলোচ্য হতে পারে।

এ-ত গেল আশ্রমবাসের বিপদ, যেটি পরে চোখে পড়ে। আদিতে যে প্রবৃত্তি থাকে তার সামাজিক ব্যাখ্যা অনেকে করেছেন। তাঁদের মতে, সমাজের বিপক্ষে যখন আর মানুষ যুদ্ধ চালাতে পারে না, তখন আত্মরক্ষার জন্য মানুষ আশ্রমে প্রবেশ করে। আশ্রমবাসের পিছনে একটা না একটা নৈরাশ্য থাকা চাই। পরে অবশ্য সেই নৈরাশ্যকে একটা গালভরা নাম দিয়ে মনকে ঠকান হয়। সমাজকে মনের মতন করে গঠন করবার শক্তি না থাকার জন্য নতুন আদর্শ-সমাজ গড়ে তোলবার প্রবৃত্তি আসে। সামাজিক ব্যাখ্যা ছেড়ে দিয়ে, এই প্রবন্ধে আমি একটি তথাকথিত শুদ্ধ ধর্মভাবের আলোচনা করবো। ন্যায়ত, শুদ্ধভাবের কোনো নাম দেওয়া যায় না। যে প্রেরণা অনুভূতিসাপেক্ষ তার কি নাম হতে পারে? যে ভাব সাধারণের গোচরাতীত তাকে ভাষার গণ্ডিতে আবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। তাকে গোড়া থেকেই অব্যক্ত বলা ভাল। ইংরাজী শিক্ষিতেরা এই প্রেরণামূলক দর্শনকে মিষ্টিসিজম্ বলেন। একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক আমাকে বলেছেন যে, মিষ্টিসিজমের কোনো যথার্থ সংস্কৃত প্রতিশব্দ না থাকার কারণ এই যে, উক্ত দর্শন হিন্দুশাস্ত্র-না-জানা ইংরাজী শিক্ষিতের দ্বারাই আবিষ্কৃত। আর একজন পণ্ডিত একে যোগধর্ম কিংবা যোগজ প্রত্যক্ষবাদ বললেই চলবে বলেছেন। সেইজন্য প্রবন্ধের নাম 'যোগধর্মের যুক্তি' দিয়েছি। যোগ যুক্তির অতিরিক্ত হতে পারে, কিন্তু যোগধর্ম অযৌক্তিক হলে লোকে গ্রহণ করবে কেন? ধর্মের তত্ত্ব যেকালে গুহায় নিহিত, তখন মিষ্টিসিজম্‌কে গুহ্য-ধর্ম এবং যোগধর্মের প্রেরণাকে গুহ্য-বৃত্তি বলা যেতেও পারে। এখন দেখা যাক মিষ্টিক্ কী বলেন।

ভিন্ন দেশের ভিন্ন মিষ্টিক্‌দের ভাষা ভিন্ন হলেও তাঁদের মূল বক্তব্যে বোধ হয় বেশি পার্থক্য নেই। বলা বাহুল্য মিষ্টিসিজম্ বলতে ভৌতিক শক্তিতে বিশ্বাস, কিংবা মরমী কবির রচনা-পদ্ধতি, কিংবা মানব-মনের স্বাভাবিক গহনা-গতি নির্দেশ করছি না। তবে এ কথা ঠিক যে, গুহ্য-ধর্মে কিংবা যোগধর্মে পূর্বোক্ত মনোবৃত্তি প্রায়ই মিশ্রিত থাকে। এই কয়টি বোধ হয় মিষ্টিক্‌দের মোট কথা।

(১) এই ব্যবহারিক, সাধারণ ইন্দ্রিয়গম্য, পরিমেয় জগৎ, এবং অনুমান, উপমান ও শব্দসিদ্ধ নিশ্চয়ের হেতু ভিন্ন অন্য একটি প্রত্যক্ষ, প্রমাণসাপেক্ষ জগৎ ও নিশ্চয়ের হেতু আছে।

(২) সেই জগতই একমাত্র সত্য এবং সেই প্রমাণই সুনিশ্চিত; অন্য জগৎ অ-সত্য, অন্য প্রমাণ অবান্তর।

(৩) সেই জগতের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য, অর্থাৎ সত্য উপলব্ধির জন্য, একটি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিতে হবে। ইন্দ্রিয়টির একটি নাম বোধি।

আমি পূর্বোক্ত মন্তব্যের পর পর আলোচনা করছি।

(১) এমন কেউ মূর্খ নেই যে পরিমাণের সংখ্যাকে, pointer-readings-কে, মাপকাঠিকে, প্রমেয় বস্তু মনে করে। চাঁদের আলোকে candle-power-এ মাপা এক তাঁদের দ্বারাই সম্ভব যাঁরা ঘরের বাতিকে চাঁদ মনে করেন। গোটাকয়েক জিনিস আছে যার মাপ সংখ্যার দ্বারা অসম্ভব, যেমন সৌন্দর্যজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান। এই জ্ঞান কিংবা অনুভূতিকে নিয়ে সংখ্যামূলক বিজ্ঞান তৈরি করা বোধ হয় যায়না। কিন্তু এই কথা বললেই শেষ কথা বলা হলো না। কোনো একটি গান শুনে আমাদের বড় ভাল লাগল। কতখানি ভাল লাগল মাপবার উপায় নেই; কিন্তু এ কথা ঠিক যে, যদি গায়কের স্বরগুলি শ্রুতি থেকে ভেসে ভেসে বেড়াত তাহলে ভাল লাগত না। শ্রুতি শুধু সংখ্যা নয় জানি, শ্রুতির সংখ্যা হয়তো মিষ্ট গলা থেকেই নেওয়া, কিংবা তারের শব্দ থেকে নেওয়া। যে গলা কিংবা তারের আওয়াজ থেকে শ্রুতি নেওয়া হয়েছিল সে আওয়াজ যখন শুনতে পাচ্ছি না, আপাতত নতুন গলার আওয়াজ শুনেই ভাল লাগছে, তখন এই আনন্দ-উপভোগের একটি স্থির সমর্থন রয়েছে। এ সমর্থন প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা সুনিশ্চিত। কেননা শ্রুতির সমর্থনে ব্যক্তিগত ভুলের সম্ভাবনা কম। স্বরের মতো, জীবনকে মাপা যায় না, কিন্তু যাঁরা এ কথা ভাল রকমই জানেন তাঁরাও জীবন শেষ হবার সম্ভাবনা আছে সন্দেহ করলেই ডাক্তার ডেকে হৃদয়ের স্পন্দন ও নাড়ীর গতি মাপতে ব্যগ্র হন।

আমি বলি, যতদূর পারি সব অভিজ্ঞতাকে কঠোর ভাবে পরীক্ষা করবো। পরীক্ষা সংখ্যাস্থিত হলে সব চেয়ে ভাল হয়, কিন্তু না হলেও চলে। সংখ্যা-মূলক পরীক্ষার দ্বারা যাচিয়ে নেবার প্রয়াসে অনেক লাভ হয়— ক্ষতি যা হয় পূর্বে উল্লেখ করেছি, সৌন্দর্যজ্ঞান কিংবা ধর্মজ্ঞানের আসল প্রকৃতি ধরা পড়ে না। লাভের কথা এখন লিখছি। গোড়াতেই বাজে জিনিস বাদ পড়ে, যেমন intelligence-test-এ হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষার্থীর কেবল ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতা ধরা পড়লেও, প্রতিভা আবিষ্কৃত না হলেও, যারা বোকা ও হাঁদা তারা প্রথমেই বাতিল যায়, এবং তাদের মধ্যে প্রতিভা আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই কম। দ্বিতীয়ত, পরিমাণের চেষ্টাতে পরীক্ষকের বিচারবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, কেননা অঙ্কের শাসন অত্যন্ত কঠোর। তৃতীয়ত,—এইটাই সবচেয়ে দরকারি কথা—অঙ্কের অগ্নি-পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হলে তবে বোঝা যায় কোন্ অভিজ্ঞতা অঙ্কের অতিরিক্ত।

সংখ্যাস্থিত পরীক্ষা না হলেও পরীক্ষা সম্ভব। অঙ্কশাস্ত্রের ইতিহাসে অনেক কঙ্কাল দেখা যায়। ইয়ুক্লিডের জ্যামিতি শুধু এক প্রকার ক্ষেত্রের জ্যামিতি দাঁড়িয়েছে। পরিমাণ করা প্রধানত চোখের কাজ। এমন কিছু ধরাবাঁধা নিয়ম নেই যে, বিজ্ঞান শুধু চক্ষুলব্ধ অভিজ্ঞতাতেই আবদ্ধ থাকবে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাও বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে। শুধু তাই নয়, এমন বিজ্ঞানও বিজ্ঞান বলে পরিগণিত হতে পারে যেটি সংখ্যার ওপর সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত নয়, যেমন রসায়ন-বিজ্ঞান ও জীবতত্ত্ব। এ দুটি বিজ্ঞানের কতটুকু অংশ অঙ্কশাস্ত্রের উপর নির্ভর করে? বিজ্ঞান যে কেবল পরিমাণ করতেই ব্যস্ত সব বৈজ্ঞানিক তা বলেন না। আমি মাত্র দুই জনের নামোল্লেখ করছি— একজন ফ্রান্সিস্ বেকন, অন্যজন আইনস্টাইন। শেষোক্ত ব্যক্তিটি বলছেন— "The object of *all science*, whether natural science or *psychology* is to *co-ordinate* our experiences, and to bring them into a *logical* system." *Italicised* কথাগুলির ওপর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সত্য কথা এই যে, mathematical physicist-ই পৃথিবীর একমাত্র বৈজ্ঞানিক নন। কিন্তু তাই বলে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দানকে অগ্রাহ্য করলে চলবে না। তাকে বরণ করে নিতে হবে। দান এই— একটি সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা কল্পনা করা যায়, এবং সেই অভিজ্ঞতার জগতে আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়গম্য অভিজ্ঞতামূলক অঙ্কশাস্ত্রের সংকেতকে খাটানো ও বিস্তার করানো যেতে পারে। (২) মিষ্টিক্‌দের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, গুহ্য জগতই সত্য এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণই নিশ্চিত। প্রথমেই দেখা যাক, কাল্পনিক অভিজ্ঞতার দ্বারা সৃষ্ট-জগতের প্রতি বৈজ্ঞানিকের কী মনোভাব। "...but it must not be regarded as telling us anything more than is warranted by our original sense-data. If it suggests more, it has been introduced somewhere in the logical development, in the language of the analysis, or in the initial abstractions on which the analysis is based. The suggestion may be fruitful, as every imaginative effort may be, but it has to be tested on its merits before it can become a fact of science."—এই উক্তিটি আইনস্টাইনের মতামত সম্বন্ধে একজন চিন্তাশীল লেখকের। এই উক্তিটি বিজ্ঞান সম্বন্ধেও খাটে, আবার যোগধর্ম সম্বন্ধেও খাটে।

গুহ্য জগতের অস্তিত্ব মানলেও, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন মানলেও, সেই জগৎ এবং সেই জ্ঞান একমাত্র সত্য ও সুনিশ্চিত, অন্য জগৎ ও প্রমাণ অবাস্তব

কি করে প্রমাণিত হয়? ন্যায়ের রীতিতে প্রমাণিত হয় না বটে, কিন্তু কি করে মানুষের মনে প্রমাণিত হতে পারে তার আভাস দেওয়া যেতে পারে। আদিম সমাজে ইন্দ্রজালের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। ভয় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ভোজবিদ্যার প্রয়োজন ছিল। ঐন্দ্রজালিকের অতিপ্রাকৃত বিদ্যা তাকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় করে তোলে। মিষ্টিক্-দার্শনিক সেই ঐন্দ্রজালিকের বংশধর। মধ্যযুগের পুরোহিতসম্প্রদায় যা ক'রে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্য স্বর্গরাজ্যের মহিমা প্রচার করতেন, স্বর্গরাজ্যকে একমাত্র রাজ্য এবং এই জগতকে হেয় প্রচার করতেন, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি ও স্বার্থসন্ধানের ধারা হয়ত মিষ্টিক্-দার্শনিকের মনে অলক্ষিতভাবে এখনও বয়ে চলেছে। দ্বিতীয় আভাসের ইঙ্গিত করছি। প্রত্যেক জ্ঞানার্জনের এক একটি ইতিহাস আছে। সব জ্ঞান-সঞ্চয়ের প্রথম এক অবস্থায় আহৃত তথ্য নিষ্কর্ষণ করে মনঃকল্পিত বাচ্য স্থির করতে হয়। বাচ্যগুলি অবশ্য নিরালম্ব। সেগুলি যেন সিঁড়ির এক একটি ধাপ— না হলে ওঠাও যায় না, আবার চিরকাল ধাপে বসে থাকলে জ্ঞানও বাড়ে না। কিন্তু সমস্ত বিজ্ঞানে, সমস্ত জ্ঞানের ইতিহাসেই বোধ হয় দেখা যায় যে, মানুষ আরামের জন্য বাচ্যকে সত্তা বলে ভুল করছে— বাচ্যকে ছাড়তে মন আর চাইছে না। মনে এমন একটি গাঁট পড়েছে যে ছাড়ান দুষ্কর। তুলনা বদলে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক বাচ্যটি যেন উপদেবতা হয়ে ওঠে। প্রত্যেক উপদেবতার একটি পুরোহিত জোটে— এই পুরোহিত জ্ঞান-বুদ্ধির প্রধান শত্রু। এতদিন পদার্থবিজ্ঞানে Substance, Force, সৌন্দর্যতত্ত্বে Beauty, অর্থশাস্ত্রে Utility, নীতিশাস্ত্রে Good প্রভৃতি অনেক গাঁট ছিল— অনেক উপদেবতা ছিল। এখনও নব্য মনোবিজ্ঞানে Libido, সমাজতত্ত্বে Group-mind, জীবতত্ত্বে Entelechy, Mneme জুটছে। দর্শনেও ঐ প্রকার বাচ্য, গাঁট, উপদেবতা আছে। সব চেয়ে অপকারী দেবতার নাম ঐশী-শক্তি, যার প্রধান পুরোহিত মিষ্টিক্। ঐশী-শক্তির দাপটে আমাদের সব শক্তি পঙ্গু হয়েছে। বুদ্ধির দিক থেকে, অভিব্যক্তির দিক থেকে, আত্মজ্ঞানের ক্রমবিকাশের দিক থেকে ঐশী-শক্তিকে যখন একটি ধাপ অর্থাৎ সুবিধামূলক বাচ্য বলে সন্দেহ করি, তখন বাচ্যকে সত্তা ভাবা পুরোহিতের নিতান্ত স্বাভাবিক কর্ম বলে মনে হয়। সকলেই জানেন যে, প্রত্যেক পুরোহিত তাঁর ব্যবহৃত মন্ত্রকে স্বর্গরাজ্যের একমাত্র চাবি মনে করেন। চাবি যখন একটি, তখন সে চাবি দিয়ে যে জগতের দ্বার খোলা যায়, সেইটিই একমাত্র স্বর্গ প্রমাণিত হতে বিলম্ব হয় না।

ব্যাপারখানি বিশদ ক'রে লিখছি। আমরা প্রত্যেকেই কখনো স্বার্থপর,

কখনো পরার্থপর— কখনো বা আমাদের আপন-পর জ্ঞানই থাকে না। একই ব্যবহারে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা মেশান থাকতে পারে। আডাম স্মিথ্ এই ব্যবহারগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করতে চেষ্টা করলেন— তাঁর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি একটি সাধারণ গুণনীয়ক বেছে নিলেন। যাঁর যেমন উদ্দেশ্য, সিদ্ধি তাঁর সেই রকমের। অমনি একজন economic being, বৈষয়িকজীব, তৈরি হলো, প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক ব্যবহারে এই মন-গড়া মানুষটি পিছন থেকে অলক্ষ্যে কাজ করে প্রমাণিত হলো। সব মানুষই বৈষয়িক, ইকনমিক্ জগতই একমাত্র জগৎ, মানুষের অন্যান্য ব্যবহার স্বার্থপ্রবৃত্তির বিকাশ মাত্র এক নিঃশ্বাসে প্রমাণিত হয়ে গেল। মনের কোথায় ফাঁকি হলো দেখাচ্ছি। একটি সাধারণ গুণনীয়ক মানুষের আকার নিয়েছে; একটি বর্তমান উদ্দেশ্য-নির্দিষ্ট সাধারণ গুণ পিছনে গিয়ে এত শক্তিশালী হয়েছে যে সেটি সত্তার, সমগ্রতার ওপর কড়া প্রভুত্ব করছে— তার অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পাইয়ে দিচ্ছে। ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত কার্যের একটি মাত্র কারণের শুধু নামটি, শক্তিমান হয়ে, গুহ্য উপায়ে, এমন কাজ আরম্ভ করে দিল যে, আর সত্তার একত্ব, নিজত্ব, বৈশিষ্ট্য রইল না। কী করে আডাম স্মিথ্ এই যাদুমন্ত্র শিখলেন তা সেই ভগবানই জানেন যিনি মিস্টিকের দ্বারা আবিষ্কৃত এবং মিস্টিকের সেবাতেই পরিপুষ্ট। ফ্রয়েডও ঐ উপায়ে কামশাস্ত্র লিখেছেন। ফ্রয়েডের কাম-প্রবৃত্তি, মিস্টিকের ঐশী-শক্তি, সমাজতত্ত্ববিদের হট্টমন, মনের এক ধরনেরই জুয়াচুরি।

মোদ্দা কথা এই যে hypothesis কিংবা fiction-কে সত্য বলে ভুল করতে আমরা সকলেই প্রস্তুত, কেননা তাই মনে করলে মনের টান্-টান্ ভাবটি কেটে যায়— মনের ছিলে আল্‌গা হয়ে যায়, আমরাও স্বপ্ন দেখে বাঁচি। ফাঁকি দিতে আমরা সকলেই ব্যগ্র, কেননা, ফাঁকিতে আরাম পাওয়া যায়। তার ওপর যদি বিহার জোটে, তাহলে সোনায় সোহাগা! এক সঙ্গে ফাঁকি দিতে পারলেই সংঘারাম!

(৩) হয়তো আমি আডাম স্মিথ্, ফ্রয়েডকে যা বুঝেছি, মিস্টিক্‌কেও তাই বুঝেছি। বুঝতে যে পারিনি তার কারণ কি? গুহ্য-ধর্ম বুঝি না, তার কারণ মিস্টিক্ বলছেন যে, আমার বোধি বলে কোনো নতুন ইন্দ্রিয়ের স্ফুরণ হয়নি। আডাম স্মিথ্ বুঝতেও কী economic sense, ফ্রয়েড্ বুঝতেও কী sex-sense চাই না? কিন্তু সকলের গলদ ত' একই। বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সত্তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করা হয়েছে, সেই টুক্‌রো থেকে একটি বাচ্য তৈরি ক'রে সত্তার স্কন্ধে চাপান হয়েছে। গলদ যখন এক, তখন গলদ বার করবার জন্য ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নেই— সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাই কাজ চলে—জোর না হয় সে

বুদ্ধিকে মার্জিত করলেই চলে। গলদ বার করা ছাড়া অবশ্য বোঝবার অন্ত দিক আছে। তা থাকলেও বিপদ এই যে, অভিজ্ঞতার যতগুলি শ্রেণী ততগুলি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। একটি ছোট ছেলের সাধারণত পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, সে আবার যদি হিন্দু হয়, তাহলে শাস্ত্রানুসারে তার আরো গোটাকয়েক ইন্দ্রিয় থাকতে বাধ্য, না হলে হিন্দুধর্ম ও ধর্মাত্মক সমাজের জাতি-বিচার, অবতার-বাদ, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি লক্ষণগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না— আর তাই যদি না পারে তাহলে ছেলেটি যবনের বংশে জন্মগ্রহণ করেছে প্রমাণিত হলো, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সনাতন-ধর্ম বিদ্যালয়ে চাকরি পাবার আশা রইল না— এক কথায় সে উৎসন্ন গেল। ছেলেটির বাবা যদি আবার তাকে কোন ভাল বিদ্যালয়ে পাঠান তাহলে চোদ্দ বৎসরেই তাকে আট-দশটি বিষয় আয়ত্ত করতে হবে। অতএব প্রত্যেক হিন্দু বালকের কম করে কুড়ি-পাঁচিশটি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় থাকা চাই— নচেৎ সে হিন্দুও হবে না, মানুষও হবে না। যোগী হতে গেলে আরো একটি চাই। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের কি অতগুলি ইন্দ্রিয় আছে? সেইজন্য বলি যে, যতগুলি অভিজ্ঞতা আছে ততগুলি ইন্দ্রিয় না মেনে, এই সাধারণ বুদ্ধিকে মার্জিত করলে কী ক্ষতি হয়? সাধারণ বুদ্ধিলব্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে শুদ্ধ করলে, বুদ্ধিকে মার্জিত করলে সত্তাকে বোঝবার জন্য তাকে খণ্ড খণ্ড করবার দরকারও থাকে না। মনোবিজ্ঞানেও ত' gestalt এসেছে, জীবতত্ত্বে science of organisation এসেছে, পদার্থবিজ্ঞানেও entropy প্রবেশ করছে। অবশ্য এগুলিও পরে বাচ্য হবে— প্রত্যেকটি উপদেবতার আবার পুরোহিত জুটবে, প্রত্যেক পুরোহিত আবার জ্ঞানবৃদ্ধিতে বাধা দেবে। কিন্তু বিজ্ঞানে পৌরোহিত্য কিংবা ভূতের উপদ্রব ক্ষণস্থায়ী।

আমার কথা এই, কেন আমি সহজে, প্রথমেই, না মাথা ঘামিয়ে, কোনো অ-সাধারণ, অতিপ্রাকৃত, গুপ্ত, রহস্যময় মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করবো? ইংরাজী শিক্ষিত মিষ্টিক্ অবশ্য মাথা ঘামানোকে খারাপ কাজ বলেন না— অন্য মিষ্টিক্ বলেন কিন্তু। "বিশ্বাসে মিলিবে ইত্যাদি, তর্কে বহুদূর।" কিন্তু প্রায় সব মিষ্টিকই বলেন যে, সর্বসাধারণেরই মধ্যে এমন একটি ইন্দ্রিয় আছে যেটি খুললেই জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন থাকবে না। অতএব প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে জ্ঞানালোচনা করার চেয়ে একটি গুপ্তমন্ত্রের সাহায্যে তৃতীয় লোচন খোলার প্রয়াস করা। যদি এই নতুন ইন্দ্রিয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকে, তাহলে প্রত্যেক মানুষের সংস্কার, শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী এই ইন্দ্রিয় বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে। বৈশিষ্ট্যের যা বিপদ তাই আবার ফিরে এল। যদি এই গুহ্য ইন্দ্রিয়ের কোনো ব্যাপারে সাধারণত্বের ছাপ থাকে তাহলে সে ছাপ

গুহ্য ইন্দ্রিয়ের বশে যে অভিজ্ঞতা জন্মায় তার সহজ-গ্রহণীয়তাতেই আছে। অর্থাৎ, বোধির বৈশিষ্ট্য মানলে গুহ্য-ধর্মের অভিজ্ঞতাকে সহজ ও সরল মনে হয়। তাকে বোঝবার জন্য নতুন করে খাটতে হয় না, তাকে গ্রহণ করবার জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোনো বিচার-বুদ্ধি অনুমোদিত প্রমাণের অপেক্ষা করতে হয় না। অপেক্ষা না করলেই সব সহজ মনে হয়। সবই যেন স্বতঃপ্রণোদিত এবং স্বতঃপ্রমাণিত ঠেকে। গুপ্তমন্ত্র কী গুহ্যপদ্ধতি গ্রহণ করলে ত' আর কথাই নেই, সব জল হয়ে যায়! আমি ধর্ম কেন, কোনো অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেই এই ধরনের 'সস্তায় কিস্তি' সারা পছন্দ করি না।

যোগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান শুনেছি একেবারেই অনুভূতিসাপেক্ষ। আমি অনুভূতিকে অতি সন্দেহের চোখে দেখি। এক কারণ এই যে, সকল স্ত্রীলোকেরই অনুভূতি আছে। অথচ সকল স্ত্রীলোকের বুদ্ধি থাকে না। তাঁদের নির্বুদ্ধিতার কারণ যদি শিক্ষা-দীক্ষার অভাব হয়, তাহলে তাঁদের না শিক্ষা দিয়ে আমরা ভালই করেছি বলতে হবে— কেননা তাঁদের যখন সহজ অনুভূতি আছে তখন আর কিছুর দরকার নেই— শিক্ষার ফলে বরঞ্চ অনুভূতির এনামেল উঠে যেতে পারে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে আবার যাঁরা বুদ্ধিমতী তাঁরা অনেকেই ব্যক্তির অসম্পৃক্ত কোনো কাজে বুদ্ধিকে নিয়োজিত করতে পারেন না। তাঁদের অনুভূতি যদি থাকে, তাহলেও সে অনুভূতি কোনো ব্যক্তিগত গুণসম্পর্কীয়। কিন্তু যোগের অনুভূতি যদি এই ধরনের হয়,তাহলে একটি মানুষ কিংবা মানুষের মতন দেবতাকে গুরু করতে হয়। গুরুবাদ কিন্তু ধাতে সয় না, এই বিপদ। এই বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, যদি আমাদের একটি সত্য কথা বলবার সাহস থাকে, যথা—স্ত্রীলোকদের বাস্তবিক কোনো অনুভূতি নেই। যদি থাকত, তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারতেন যে, তাঁদের অনুভূতিটি আমাদের দেওয়া শাড়ি, গহনা, গ্রামোফোনের মতনই উপহার মাত্র। তাঁদেরকে নিয়ে ঘর করতে হয়, তাঁদের দিয়ে কাজ করাতে হয়— নিতান্ত নিরীহ ও শান্তিময় উপায়ে ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা বুদ্ধিমতীদের আছে। তাই তাঁদের মনস্তুষ্টির জন্য, সংসার শান্তিময় করবার জন্য, তাঁদেরকে আমরা খোশামোদ করি। সেইজন্য তাঁদের একটি অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় দিয়েছি এবং তাঁদের বুঝিয়েছি— নানা উপায়ে— বিশেষত কবিতা লিখে— যে, এই অনুভূতির মতন জিনিস আর নেই —এটি বুদ্ধির চেয়ে ঢের সূক্ষ্ম, ঢের কার্যকরী, বেশি সুনিশ্চিত— অতএব বুদ্ধি যদি কম থাকে, কিংবা না-ই থাকে, তাহলেও তাঁরা আমাদের প্রিয় বস্তু। সহজানুভূতি উপহার পাওয়ার অন্য উপায়ও আছে। এই ধরনের অনুভূতির সঙ্গে সত্য অনুভূতি যদি থাকেও তবে তার পার্থক্য কোথায়, ধরা শক্ত। তর্ক

উঠতে পারে যে, মেয়েদের অনুভূতি নেই বলে মিষ্টিকের অনুভূতি নেই প্রমাণ হয় না। উত্তর এই— সমস্যা মিষ্টিকের কী আছে কী নেই, তা নয়। সমস্যা এই, প্রশ্ন এই যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি গুপ্ত ইন্দ্রিয় আছে কী নেই? মিষ্টিক্ বলেন, আছে— আমার সন্দেহ, নেই। শুধু তাই নয়; আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, সাধারণ স্ত্রীলোকদের যেমন কোনো অনুভূতি নেই, সেটি আমাদের উপহার মাত্র, এবং যদি থাকে তার প্রভাবে ও তাড়নায় বিপথগামী হতে হয়, তেমনি প্রত্যক্ষজ্ঞানীর তথাকথিত সহজানুভূতি আমাদের মন-ভোলান উপহার হতে পারে। সেই উপহারসামগ্রীকে যাচাই করে নেওয়া পুরুষোচিত ব্যবহার। (সহজানুভূতি-বিশ্বাসী পুরুষ মেয়েদের তরফদারি করতে গিয়ে, আশা করি, নিজের পুরুষালি দাম্ভিকতা এবং মনের মেয়েলি গঠন দেখাবেন না)।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের তাড়নায় হাজার হাজার ভুলের মধ্যে হয়তো একটি সত্য বোঝা গেল। সে সত্যের মূল্যওআমাদের গ্রহণ ও ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। আমি Paul Valery-র Introduction to the Method of Leonardo Vinci থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি। "Our revelations are only happenings of a certain kind and it is *still* necessary to interpret events which occur in the domain of knowledge···It is always necessary." "Even the happiest of our intuitions are results that are *inexact*; *through excess as compared with our normal understanding, through deficiency when considered in relation to the infinity* of lesser things and particular cases which they seem to bring within our grasp. Our personal merit, which is what we strive after, consists less in submitting to them than in seizing them, and in seizing them less than in sifting them." আর্টেও অনুভূতি সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। "The intuitive element, then, is far from giving their quality to works of art. Take away the artist's work and your intuition is *no more than a spiritual accident, lost among the statistics of the local life of the brain.* Its true value does not rise from the *mystery of its origin,* nor form the *supposed depths* out of which we *like to think* it has emerged, nor even from the *delighted surprise* it comes in ourselves; but because it meets our *wants* and, in short, because of the *considered use* to which

we can put it, because, that is to say, of its *utility* to the whole personality."

Italicised অংশগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সহজানুভূতি সম্বন্ধে অন্যান্য বক্তব্য আছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হলো, তাই আমার নিজের কথাগুলি একত্রে সাজিয়ে প্রবন্ধ শেষ করছি।

আমি সাধারণ বিচারবুদ্ধির শক্যতা ও সম্ভাব্য শক্তিতে বিশ্বাস করি। সেইজন্য অসাধারণ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব মানতে সহজে রাজি নই। তথাকথিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই বিচারবুদ্ধির মার্জিত সংস্করণ। বুদ্ধি যখন মার্জিত হলো, তখনই সত্যের প্রকৃত উপলব্ধি হয়। বুদ্ধি যখন পরিমার্জিত হলো তখনকার অভিজ্ঞতাই সহজ, সরল, প্রত্যক্ষ মনে হয়। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা অর্জনের পূর্বাবস্থা, ধারা, রীতি, নীতি মোটেই সোজা নয়, ন্যায়ের দ্বারা আবদ্ধ। মার্জিতবুদ্ধিলব্ধ অভিজ্ঞতার মূল্য খুব বেশি, তবে অন্য ধরনের অভিজ্ঞতার অনাপেক্ষিক মূল্য অপেক্ষা বেশি কী কম জানি না। অন্যান্য অভিজ্ঞতার জন্য যে ধরনের সতর্কতার প্রয়োজন, এই অভিজ্ঞতার জন্য সেইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এতদিন প্রাকৃতিক জগৎ নিয়ে কত না আলোচনা হলো। কালকার মত আজ বাতিল হলো। পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও জীবতত্ত্বের সম্পাদ্যগুলি পরিত্যক্ত হলো, কিংবা রূপান্তরিত হলো, কিন্তু এই গুহ্যজগৎ ও গুপ্তইন্দ্রিয় সম্বন্ধে অসভ্য অবস্থায় মানুষের মনে যা ভয়, যা ধোঁয়া ছিল তাই রয়ে গেল। এখন আমাদের এই ভয় ও ধোঁয়া দূর করবার সময় এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের নামে যে সব অতিরিক্ত দাবি করা হতো, আজ ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে গুহ্য-ধর্মের নামে এই দাবি হয় অনুমোদন করেন, না হয় পেশ করেন। কিন্তু আজ অনেক বৈজ্ঞানিক একমাত্র সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাই বিনয়ী হয়েছেন। বিনয় এতদূর গড়িয়েছে যতদূর যাওয়া হয়তো বুদ্ধির আদেশাতিরিক্ত। এই সব বৈষ্ণবী, যোগী বৈজ্ঞানিকের বিনয়োক্তি উদ্ধৃত করে আমাদের দেশের অন্ধকার-বিলাসী, গুহাবাসী স্বদেশভক্ত বৃদ্ধ ও যুবকের দল অত্যন্ত আত্মতৃপ্ত হয়ে উঠেছেন। তার চেয়ে ঐ বিদেশী বৈজ্ঞানিকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের বুদ্ধিকে নিষ্ঠুরভাবে যাচিয়ে নিলে অনেক কাজ হতো।

মোদ্দা কথা এই, এমন অভিজ্ঞতা আছে যার উপলব্ধি একমাত্র মার্জিত বুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব, এবং সেই অভিজ্ঞতার সংখ্যা বেশি, মূল্যও কম নয়। বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি এবং অঙ্কশাস্ত্রের শাসন ভিন্নও বুদ্ধি মার্জিত করা সম্ভব। সে মার্জনা-পদ্ধতি খুব কঠোর হওয়া চাই। আমি মানি যে, ঐ ধরনের অভিজ্ঞতা

অর্জন না করলে জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার থেকে প্রমাণ হয় না যে, সেই অভিজ্ঞতাই একমাত্র সত্য, এবং সেই অভিজ্ঞতাই অন্য অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ করে, কিংবা তাদের মূল্য নির্ধারণ করে। মাথার ওপর টালার চৌবাচ্চার মতন একটা Libido, Universal spiritual ঐশী-শক্তি, Selfish Ego, Group-mind, Oversoul, Mind-stuff মানতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটি নল মনে করতে হয়। আমি কেবলমাত্র নল হতে গররাজি— তা ভগবানেরই হোক আর সমাজ-মনেরই হোক। আমিই আমার কাছে সব চেয়ে মূল্যবান বস্তু। টালার কর্তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হয়, নিকটে নদী নেই বলে। কিন্তু মানুষের জীবন একটি স্রোতস্বিনী। নদী সমুদ্রে পড়ে, সমুদ্রের লোণা জলও বুকে টেনে নেয়। নদীতে জোয়ারভাটা সবই আছে। নদীতে অবগাহন করলে পুণ্য হয়, কলতলায় নাইলে কাজ চলে, কিন্তু মানুষের সত্য সত্যই জাত যায়। জীবনের বৈচিত্র্য মানলে সব বিজ্ঞানের, সব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে স্বীকার করতে হয়। বোধি যদি মার্জিত বুদ্ধিই হয়, তাহলে অবশ্য তার প্রাধান্য মানলেই অন্য ইন্দ্রিয়কে অগ্রাহ্য করবার প্রয়োজন থাকে না।

এই সাধারণ বুদ্ধি, যেটি ব্যবহারিক জগতে খাটে, যার দ্বারা ভালমন্দ বিচার করা যায়, যার দ্বারা ভাল কবিতা, গান, ছবি উপভোগ করা যায়, যেটি বৈজ্ঞানিকেরা খাটাতে চান, তাকে সম্প্রসারণ ও মার্জিত করলে কোথায় গিয়ে পৌছান যায় তা লিওনার্দোর জীবনে বেশ দেখা যায়। এই পরিমার্জনকে পল ভালেরি 'a process of perpetual exhaustion, of detachment without rest or exclusion from everything that comes before it whatever the thing may be' বলেছেন। বুদ্ধির দ্বারা যেখানে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি উপনীত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা করতে গিয়ে ভালেরি এই সব ভাষা ব্যবহার করছেন :— যেখানে 'itself and X, both of them abstracted from everything, implicated in everything, implicating everything equal and consubstantial'...'the point of pure being,' যেখানে 'there is no act of genius which would not be less than the art of being. He is the I' ইত্যাদি। এ অবস্থা কী কোনো মিষ্টিকের বাঞ্ছিত অবস্থা হতে ভিন্ন? সকলেই জানেন যে, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের দ্বারাই লিওনার্দো এই অবস্থায় এসেছিলেন।

এই লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির জীবন একদেশদর্শী মিষ্টিকের জীবন অপেক্ষা আমার কাছে বেশি মূল্যবান। এ জীবনে বিজ্ঞান আছে, সাধারণ বুদ্ধির স্ফুরণ

আছে, অতিপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বদলে মার্জিতবুদ্ধিলব্ধ নতুন অভিজ্ঞতা আছে এবং এক কাম ভিন্ন (ফ্রয়েডের মতের বিপক্ষেই এ কথা লিখছি) অন্যান্য অভিজ্ঞতার যথার্থ মূল্য দেওয়া হয়েছে। এই আন্তরিক সাম্যের একটি "deep note of existence"-এ তিনি যে-হাতে ঘা দিয়েছিলেন, সেই হাতে মোনালিসার ছবি, আবার বিস্তর কলকব্জার নক্সাও এঁকেছিলেন। তিনি সেই হাতে ঘোড়ার খুর পর্যন্ত বেঁকাতে পারতেন। তাঁর প্রতিভা সাধারণ বুদ্ধিকে মার্জিত করেই তাকে অতিক্রম করেছিল, এবং সাধারণের বোধগম্য উপায়ে বিকশিত হয়েছিল। লিওনার্দোর সব ছিল, ছিল না শুধু মনের আলস্য। তার মন্ত্র Obstinate Rigour— এই মন্ত্র কয়জন মিষ্টিক্ জপ করেন ? যাঁরা করেন তাঁরা আমার নমস্য। আমার মতে সকলের এই মন্ত্র জপ করবার সময় এসেছে, বিশেষত আমাদের দেশে।

হয়ত আমার প্রবন্ধের নাম "যোগধর্মের যুক্তি" ঠিক হয়নি। মিষ্টিসিজম্ আর যোগধর্ম এক বস্তু না হতে পারে। কিন্তু এই প্রবন্ধে যদি কোথাও 'যোগ' কথাটি উল্লেখ করে থাকি, তাহলে মিষ্টিসিজমের অর্থেই ব্যবহার করেছি। যোগ সম্বন্ধে কিছুই জানি না, যা জানি তাও বই পড়ে। অবশ্য যোগীর মতে তাতে কিছুই জানা যায় না। আমার লেখার ভেতর যদি কোন শ্লেষ ও অশ্রদ্ধাসূচক ভাব ফুটে থাকে তাহলে সেটি আমার জনান্তিকে। প্রবন্ধটি লিখেছি কেবল আমার নিজের মত সাজাবার জন্য— এমন কী পরকে গালাগালি দেবার জন্যও নয়। আশা করি, পাঠকবৃন্দ আমার প্রবন্ধের কোন পাঠিকা নেই। আমার বক্তব্যটি শুনে আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করবেন।

যুগধর্মের অন্যদিক

পৌষ সংখ্যার 'জয়তী'তে আপনার 'খোলা চিঠি' পড়লাম। বাদানুবাদের বিষয়টি নিতান্তই গুরুগম্ভীর— আমার প্রতিবাদ নাতিদীর্ঘ চিঠিতে পরিস্ফুট হবে না, ভয় হচ্ছে। তবুও চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই।

এক এক সময়ে মনে হয়, বুঝিবা মনের খামখেয়াল অনুসারে যতসব দৃষ্টি-ভেদ। অন্তত, মেজাজ ভিন্ন বলে একই উদ্দীপনের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। এই দেখুন না, আমার 'সমাজ ও সন্ন্যাস-গ্রহণ' পড়ে আপনার ভাল লেগেছিল, তার মধ্যে আপনি 'দৃঢ়চিত্ততা ও যুক্তিবত্তা'র পরিচয় পেয়েছিলেন— আবার প্রমথবাবু পেয়েছিলেন বন্ধুর প্রতি অভিমান— দিলীপকুমার পেলেন রাগ ও দ্বেষ। আর যে 'যোগধর্মের যুক্তি' পড়ে আপনি 'apologetic tone-এর রেশ' পান, সেইটে পড়ে অনেকের মন্দ লাগেনি, এক-আধজন আবার তাতে যুক্তিবত্তারই প্রমাণ পেয়েছিলেন। আবার দেখুন, আপনার মনে হয়, "চিন্তার ক্ষেত্রে এই তপোবনের আদর্শকে একালে পরম বলিয়া চালাইতে যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রয়াস পাইয়াছেন সেখানে সত্য ও কল্যাণের আকর্ষণ তাঁর শিথিল" হয়েছে। আমার মনে হয়, তাঁর আদর্শ কখনো তপোবনের ছিল না, তিনি বরাবরই আশ্রম-ধর্ম বলতে লোকে যা বোঝে তার বিরোধী, কেবল গান্ধী-যুগের পর নয়। তিনি তপোবনের ছবিই এঁকেছেন, এবং Message of the Forest-এও প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার একটি মূল কথার ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি সে আদর্শ কেন, কোনো আদর্শই 'চালাতে' চেষ্টা করেননি, এবং কোনো তত্ত্বই তাঁর কবিত্ব-শক্তিকে হীন করতে সক্ষম হয়নি। অতএব, আপনার পক্ষে, 'সে তত্ত্বের উপজীব্য যে হইবে মধ্যযুগীয়তা' এই সিদ্ধান্তে আসা যেমন স্বাভাবিক, আমার পক্ষে ততটা নয়। তপোবনকে মধ্যযুগে না ছুঁড়ে ফেলে, এবং রবীন্দ্রনাথের সমগ্র লেখা বিচার করে, (দু'চারটা লাইন তুলে নয়,) যদি

প্রমাণ করতেন যে তাঁর আদর্শ তপোবনের, এবং বর্তমান যুগের সভ্যতার বিরোধী, তবেই ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আমার পক্ষে সহজ হতো। আপনি আবার লিখেছেন, "সত্যানুভূতির তীব্রতা অগভীর হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্প-প্রতিভাও শ্রান্ত হইয়া আসিবে আশ্চর্য্য কি"। আমার পক্ষে এটা খুবই আশ্চর্যের কথা। আমার বিশ্বাস, বয়সের সঙ্গে তাঁর সত্যানুভূতি বেড়েছে এবং শিল্প-প্রতিভা হীনপ্রভ হয়নি। টলস্টয়ের হয়েছিল, অতএব রবীন্দ্রনাথের হতে হবে, এ আমি মানি না। 'অতএব' আপনি লেখেননি, কিন্তু সেটা উহ্য রয়েছে সন্দেহ হয়। আশা করি, সন্দেহটি অমূলক। আপনার চিঠি হতে এই ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে। অবশ্য তাই থেকে, অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ার ও সংস্কারের পার্থক্যজনিত সিদ্ধান্ত-বিভিন্নতা থেকে প্রমাণ হয় না যে, "আমার ও আপনার মধ্যে যে প্রভেদ সে আমাদের মনের প্রস্থান-ভূমির প্রভেদ, অতএব তর্ক অচল।" মনের ক্রিয়া একটু পৃথক বলে প্রতিক্রিয়া আলাদা— জোর এই প্রমাণ হয়। তর্ক বেশ ভালো রকমই চলতে পারে। বিলেতের চরমপন্থী ও নরমপন্থী উভয় দলই পার্লামেন্টের প্রভুত্ব স্বীকার করে, তাই তাদের মধ্যে ভীষণ তর্ক চলে। আমরা দু'জনেই যুক্তির প্রাধান্য, ভদ্রতার সুবিধা মানি, তাই তর্ক বেশ চলবে বিশ্বাস করি।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমার মনের গঠন কি? আমি উত্তর দেব, আপনিই আমার চেয়ে বেশি জানেন। গঠনটা কি নিজে জানি না, কিন্তু অন্য মনের ক্রিয়াকলাপ দেখলে বুঝতে পারি যে কোথাও না কোথাও কী একটা পার্থক্য রয়েছে। যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের মধ্যে পার্থক্যটা কি? তাহলে বিশদ করে বলতে পারব না, শুধু ইঙ্গিত দেবো। আপনার মধ্যে কর্মপ্রবণতা আছে, আমার মধ্যে ওসব বালাই নেই, আপনি যুগকে, কালকে শত্রু ভেবে জয় করতে চান এবং যাকে অতিক্রম করে জয় করেছেন বিবেচনা করেন তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন . আর আমি কালস্রোতে ভেসে বেড়াতে অনিচ্ছুক হয়েই ঠিক করেছি যে কাল কিংবা যুগধর্ম সমাজেরই তৈরি জিনিস। মানুষে কী ভাবে এই কালকে বোঝে তার সঙ্গে তার ধর্ম অর্থাৎ মানসিক গঠনরীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

আমাদের তর্কের প্রধান বস্তু ছিল যুগধর্ম এবং তারই সংক্রান্ত কোনো বিশেষ যুগের মনোভাব। আমার মতামত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। আপনার মতামত আবার এখন জানলাম। আমার সন্দেহ হয়েছে যে, আপনার মতামতের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত বিরোধ রয়েছে। দুই স্থান থেকে দুটি তিনটি মন্তব্য সাজাচ্ছি: "কিন্তু ভারতবর্ষীয়

সভ্যতা বলিয়া কোন কিছু আছে কি? ইসলামিক সভ্যতা কথাটির মতন ইহাও vague নয়?" "তবুও একি সত্য নয় যে, শীত বসন্ত বর্ষা এ সব পৃথক ঋতু, আর ইহাদের ধর্মও পৃথক?" আবার, "সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্যন্ত কালকে মোটামুটি তিনযুগে ভাগ করা হইয়া থাকে—আদিযুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ।" তারপর আপনিই প্রত্যেক যুগের বিশেষ ধর্মও ব্যাখ্যা করেছেন। আপনার আপত্তি কোথায়, গজ-কাঠিতে, না ঘড়ির কাঁটায়, ভূগোলে, না যুগে? ঐ যে 'তবু' ও 'মোটামুটি' কথা প্রয়োগ করেছেন ওরই মধ্যেই কী স্বীকার করছেন না যে, সুবিধার জন্য সময়কে ভাগ করতে হয়? আমি শুধু এই সুবিধাকে সুবিধা ছাড়া অন্য কিছু নয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম মাত্র। মাপামাপির সময়, স্থান ও কাল, দুইই মাপকাঠি মাত্র। আসল কথা, মাপে পাত্রে, অর্থাৎ মানুষেই।

এর মানে নয় যে, কোনো মানসিক গঠন কোনো যুগেই ছিল না। এমন কোনো সভ্যযুগের কথা জানি না যখন মানুষ ছিল না। মানুষ থাকলেই মন থাকবে। আমি শুধু বলি, কালের মধ্যে এমন কোনো অন্তর্নিহিত দৈবশক্তি নেই যেটি নিজের জোরে, ব্যক্তিগত মনের গঠননির্বিশেষে, নিজের ধর্ম রচনা করতে পারে। কোনো ভৌগোলিক সীমানারও সে ক্ষমতা নেই, কোনো ঐতিহ্যেরও নেই। মনের সংস্পর্শে এসেই তাদের সার্থকতা ফুটে উঠে। সেগুলি মাল-মশলা, কিংবা terms of reference মাত্র। মনই স্বধর্মের সূত্রপাত করে. আরো খুঁটিয়ে বলতে গেলে, মস্তিষ্কেই ঝোঁকের ঝাঁক বাসা বাঁধে। কার্যকরী শক্তিটা মনের। প্রতিবেশের, অতীতের, বর্তমানের ভবিষ্যতের আশা-ভরসা, এমন কী region-এর প্রকৃতিদত্ত গাছপালা, জন্তু-জানোয়ারের, folk, place, work, tradition-এর পরিপ্রেক্ষিতে সে-ধর্ম দিশা পায়, রূপ নেয়। রূপ নিলেই এই সর্বসাধারণের মানসিক ধারা ও অনুষ্ঠানকে ধর্ম বলা হয়। ধর্মের যে ধারা কেটে চলল, সেটা অভ্যাস-ধারা; সে ধারা মরুতে হারায় না, জোর ফল্গুনদীর মতন বালির মধ্যে আত্মগোপন করে। যখন সেই বালি খুঁড়তে মানুষ নারাজ হয়, তখনই মানুষে বলে, ধারা লুপ্ত হয়েছে। এখন আমি যদি বালি খুঁড়ে, ধারা উদ্ধার করে, সে ধারার প্রবাহে স্নান করি, তখন জোর আপনি উপদেশ দিতে পারেন, কলের জলে স্নান করা আমার-পক্ষে বেশি স্বাস্থ্যকর। এর বেশি আর কিছু বলা চলে কি? সে ধারা কখনই ছিল না কিংবা নেই— বলা গলাবাজি।

উপমার অন্তরালে, সেই নদীর মতনই, যদি যুক্তিপ্রবাহ হারিয়ে থাকে তাহলে আপনার পন্থাই অনুসরণ করছি, সুবিধার জন্য। যুক্তিকে খণ্ড খণ্ড

করে দেখাচ্ছি। যুগধর্মে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে চাই না কেন ?

(১) যুগধর্ম বলে যদি বাইরের কোনো শক্তি থাকে, তাহলে সে শক্তি কোন্ শ্রেণীর লোকের কোন্ ব্যবহারের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয় বোঝা যায় না। অতিমানবের না জনসাধারণের ? অনেক স্থলে যা ইঙ্গিত করেছেন তাই থেকে বোঝা যায় যে, আপনি অতিমানবের ভক্ত। কার্লাইল থেকে উদ্ধৃতাংশ-টুকুই তার যথেষ্ট প্রমাণ নয় কি ? কিন্তু অ-সাধারণ ব্যক্তির কার্যাবলী যা লক্ষ করেছি তাইতে মনে হয় যে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই আনুষ্ঠানিক আচার অর্থাৎ যুগধর্মের বিপক্ষে লড়াই করেন, লড়াই করে সেই পুরাতন অভ্যাসের জড়ত্ব, নিশ্চলতা, তদবস্থ-স্থিতি-প্রবণতাকে সজীব ও সচল করেন। সজীব ও সচল হয়েই আপনার 'যুগধর্ম' নব-রূপে রূপবান হয়ে ওঠে। তারপর, এই নব-যুগধর্ম জনসাধারণের দ্বারা অনুকৃত হয়, নবত্ব তার ঘুচে যায়। (অনুকরণ-প্রবৃত্তি বলে মানুষের একটা প্রবৃত্তি আছে বলছি না)। এখন কা'কে ধর্ম বলব— অনুকরণকে না অনুকরণের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানকে ? সামাজিক ব্যবহার বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, বিরোধ ও সৃষ্টির কাজ অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গেই চলছে।

এই প্রসঙ্গে একটা ছোট কথা মনে হচ্ছে। কে এই যুগধর্ম ব্যাখ্যা করছে ? ড· সাফাৎ আহাম্মদ খাঁ মুসলমান শিক্ষিত সমাজের যুগধর্ম-প্রবর্তক, না ঢাকার 'শিখা' সম্প্রদায় ও 'জয়তী'র দল ? রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যুগধর্মপ্রবর্তক, না নব্য-সাহিত্যিকবৃন্দ ? সাহিত্যের কথা ছাড়ুন— রাজনৈতিক আন্দোলনই কী যুগ-ধর্মের প্রকৃত লক্ষণ ? শিশুমৃত্যুর হার কমানো নব্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, না ক্যান্সার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ ? নোবেল সাহেবের, রকফেলার সাহেবের কোন্ দিকটা নব্য ? দু'দিকেই বল্লে চলবে না, প্রত্যেক যুগের যে পরিষ্কার বৈশিষ্ট্য আপনি দেখিয়েছেন, তাই থেকে মনে হয় যে নিজের মতকে প্রতিপন্ন করতে পণ্ডিতের মতনই অর্ধেক ত্যাগ করতে আপনি সদাই প্রস্তুত। ইতিহাসে দেখেছি, যখনই যুগধর্মের কথা উঠেছে তখনই তার পিছনে কোনো শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রয়াস রয়েছে, যখনই নবযুগ-প্রবর্তনের কথা তোলা হয়েছে তখনও তাই। আপনার আমার মতন বুদ্ধিমান লোকের কর্তব্য বোধ হয় শ্রেণীগত স্বার্থের বাইরে দাঁড়ান। মেয়েদের চুল ছেঁটে ফেলে নারী-সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবার পিছনে প্যারিসীয়ান নর-সুন্দরদের আত্মরক্ষার গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল শুনেছি।

অতএব আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যুগধর্মের বাহ্যিক অস্তিত্ব মানলে বড় ছোট, প্রকৃত অপ্রকৃত, ভালো মন্দ, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, সৃষ্টি অনাসৃষ্টি,

কীর্তি অকীর্তির, অর্থাৎ মূল্যের ভেদাভেদ থাকে না। একে হিন্দু, সেজন্ত একটা না একটা ভেদাভেদ মানতেই হয়, তায় শিক্ষিত, সেজন্ত আরো কুণ্ঠিত হয়ে দিন গুজ্‌রান করতে হয়। ঠাট্টা ছেড়ে দিন,— যা হয় একটা কিছু-কে বড নাম দিয়ে কিংবা যা করে হোক, জোর করে চালাতে পারলেই হলো, তারপর আমরা বিদ্বানের দল আছি। একটা কোনো কিছু বাজারে প্রতিপত্তি লাভ করুক, তারপর আমরা সংখ্যার সাহায্যে তাকে যুগধর্মের প্রকৃত লক্ষণ বলে খাড়া করে দেবোই দেবো। মোটা মোটা কেতাবে তার প্রকৃত পরিচয় দেবো —আমাদের ছাত্রেরা পড়বে। সে যুগধর্ম কত মাইল বেগে এক বৎসরে ছুটছে, মায় তাও থাকবে। এই উপায়ের উপকারিতা যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তগুলো ভালো করে দেখলেই টের পাবেন, সেই average tendency বার করার মূলে আছে নির্বাচন-শক্তি এবং সে শক্তি সব সময়ে সংস্কার মুক্ত নয়; যদি তাকে শুদ্ধ রাখার প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহলে আমাদেরকে সদাই সন্দিগ্ধচিত্ত হতে উপদেশ দিন, যুগধর্মের অস্তিত্বে গোড়া থেকেই আস্থাবান হতে অনুরোধ করবেন না। অরবিন্দ ও রবীন্দ্রের প্রতি যে মনোভাব আনতে বলেছেন, সেই মনোভাবের সাহায্যেই যুগধর্মে বিশ্বাস রাখা যায় না। তাঁদের ওপর বর্তমান কেন পূর্বতন সব যুগের প্রতিক্রিয়ার ছাপ আছে, কিন্তু তাঁরা কোনো যুগেরই দাস নন।

(২) অসাধারণ ব্যক্তির ব্যবহারে আর একটা জিনিস লক্ষ করছি। তাঁরা যে পূর্ববর্তী যুগের কিংবা সমসাময়িক যুগের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন, এ কথা হয়তো কেউ বলে না। কিন্তু এ কথাও ভেবে দেখলে বোঝা যায়, যে, তাঁরা পূর্ববর্তী যুগের সংস্কারবাহী মনুষ্য-বলদ হওয়ার চেয়ে, সে সংস্কারে আত্মনিবেদন করে সহজে কাজ হাঁসিল করার চেয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এই যুগেরই অস্থায়ী সংস্কারকে কিংবা কোনো ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে চিরন্তন সত্যের কোঠায় তুলতে বেশি ব্যগ্র। লড়াই করাটাই চরম কথা নয়, শেষটাই ঢের বেশি দরকারি কাজ; নচেৎ আমিও ত' লড়াই করি! চির-চঞ্চলকে স্থায়ী করা, শাশ্বতে পরিণত করা 'অতি মানবের' একটি চিহ্ন। বাঁশবনের ভেতরে হাওয়া ঢুকে শন্ শন্ করছে, তাই শুনে আনন্দ পাচ্ছি, এও এক ধরনের মানুষের স্বভাব; আবার সেই বাঁশকে পাকিয়ে তাকে তপ্ত ছুঁচ দিয়ে ফুটো করে, বাঁশিতে পরিণত করে, সেই বাঁশিতে শ্রীমুখের ফুঁ দিয়ে বাজানো এবং বাজিয়ে আনন্দ পাওয়া ও দেওয়া আর এক ধরন মানুষের স্বভাব। যে বাঁশি তৈরি করে, কিংবা বাজায়, সে কী বাঁশকে অস্বীকার করে? সে শুধু বাঁশ বেছে নেয়, তাকে ফুটো করে বাঁশি বাজায়।

(৩) পূর্বোক্ত দুই কাজ ছাড়া আপনার 'অতিমানব'ই কখনও কখনও আর এক উপায় অবলম্বন করেন— নিজের অখণ্ডতা অটুট রাখবার জন্য। সে উপায়কে পলায়ন বলা হয় কিন্তু তাকে নিষ্ক্রমণও বলতে পারেন। আপনি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাশক্তির অনুপযুক্ততা এবং অরবিন্দের অন্তর্মুখীনতা নিয়ে যা কড়া মন্তব্য করেছেন তাই পড়ে মনে হয়, এই 'যুগধর্মের' প্রতি বিমুখ হওয়ার জন্যই তাঁরা আপনার শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। বোধ হয় আপনার বিশ্বাস এই যে, তাঁরা যুগধর্ম মানেন না, এবং সেইজন্যই পণ্ডিচেরী কিংবা য়ুরোপে পলায়ন করেন। এ বিশ্বাসটা ভুল, সম্পূর্ণ ভুল বললেও অত্যুক্তি হতো না। তাঁরা যুগ-ধর্মের হীনতা, অর্থাৎ ফ্যাশানের অংশটুকু (কি সেটা আপনাকে বলে দিতে হবে না, আমার মতে— বিশ্বের কল্যাণ) তাঁরা পুরোপুরি গ্রহণ করেন। বর্তমান সভ্যতার মানবিকতা, কল্যাণ-চিন্তা অরবিন্দের প্রত্যেক ছত্রে, প্রত্যেক কর্মে পরিস্ফুট। তিনি বর্তমান যুগের 'আধুনিকতম' সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শন-ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। আজকাল তিনি বড় বেশি লেখেন না, কিন্তু যখন লিখতেন, অর্থাৎ দশ-পনের বৎসর পূর্বে, তখন বর্তমান চিন্তাধারার দোষগুণ যা দেখিয়েছিলেন তা এখন বড় বিদেশী মহারথীদের বড় বড় কেতাবে পড়ে মুগ্ধ হই। তাঁর একটা ছোট বই অনেক আগে পড়ি, evolution নিয়ে, তারপরে ঐ সংক্রান্ত ন্যূনকল্পে এক ডজন বই ঘেঁটেছি ; সে বইয়ের বেশি অন্য কোথায়ও মূলকথার সন্ধান পেয়েছি স্মরণ হয় না। পেয়েছি শুধু barren facts ; আমার কথা ছেড়ে দিন। সকলেই জানে যে অরবিন্দ এই যুগের, যদি না জানতো, তাহলে সনাতন হিন্দুরা তাঁর যোগধর্ম-প্রবর্তনের মধ্যে পশ্চিমী সভ্যতার আমেজ পেয়ে তাঁকে অতটা অবহেলা করতো না। অরবিন্দ এই যুগেরই লোক. তাঁর পণ্ডিচেরী-প্রয়াণ বর্তমান যুগের সমস্যা হতে পলায়ন নয়। বিজ্ঞানের সমালোচনা করার অভ্যাসটাও তাঁর আধুনিকত্বের পরিচায়ক। বিজ্ঞানের গোড়ায় যদি গলদ থাকে, বৈজ্ঞানিক উপায়ের মধ্যে যদি ফাঁকি থাকে, তাহলে সেই ফাঁকি দেখানো মধ্যযুগীয় মনোভাব, না নব-যুগের বুদ্ধিবাদী সন্দিগ্ধচিত্ততার প্রকৃষ্ট পরিচয় ? সেই ভুলকে পরিহার করে, অন্য উপায়ে— যেটি পুরাতন উপায়ের পুনরাবৃত্তি নয়— জীবন-যাত্রা চালানো, জীবন-সমস্যার নিরাকরণ করাতে কী মধ্যযুগীয় কাপুরুষতা আপনি পেয়েছেন, আমি বুঝি না। কোনটা যুগধর্ম— বিজ্ঞানে অন্ধ-বিশ্বাস, না বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অপূর্ণতা দেখানো ? অন্ধ-বিশ্বাসই যদি আপনার মতে অন্ধকার-যুগের চিহ্ন হয়, তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, এই যুগে বিজলী-বাতি হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মনের অন্ধত্ব ঘোচেনি। বিজ্ঞানেরও একটা ক্ষণিক ফ্যাশান থাকতে পারে না কি ? আবার দেখুন,

গতানুগতিকতার মধ্যে ফাঁকি থেকেই যায়, বিজ্ঞানও ভীষণ রকম গোঁড়া হতে পারে, অর্থাৎ ভুলকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে, ভালবাসে, চায়। শ্রুতি-স্মৃতির প্রামাণিকতা শুধু ধর্মক্ষেত্রেই বাধা দেয় না, বিজ্ঞানেও দিয়ে থাকে, —বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। যদি যুগ মানতেই হয় তাহলে বলা চলে যে ফাঁকি ধরাই এই যুগের কাজ,— উপায় মার্জিতবুদ্ধি, reason, শুধু scientific method নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি এই যুগেরই আবিষ্কার? ওটা প্রকৃতিকে জয় করবার বহু পুরাতন অস্ত্র। সে অস্ত্রের প্রয়োগও ছিল বহুল। আজকাল শাণ দিয়ে চকচকে হয়েছে মাত্র। বরাবরই সর্বক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ হতো। তবে সে পদ্ধতি ছিল তখনকার বিজ্ঞানের পদ্ধতি। এখন জ্ঞান বেড়েছে, বিজ্ঞান মার্জিত হয়েছে, তাই প্রয়োগও হচ্ছে বহুলতর ক্ষেত্রে ও নির্মমভাবে। সমগ্র অতীত যুগের মাজা-ঘষাতে এই অস্ত্র ধারাল হয়েছে। তাই স্বীকার করতে হয়, এ যুগে ওর চেয়ে ভালো যন্ত্র বেরোয়নি, তাই বলি যেখানে পারি ঐ যন্ত্র প্রয়োগ করবো। আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে যদি এ কথা বলেন, তাহলে আমি বলা-কওয়া ছেড়ে দেবো, কেননা আমার বিশ্বাস, আমার কথাই আপনি আমার চেয়ে ঢের ভালো করে বলতে পারবেন। তবে স্বীকার করবেন যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ এই যুগের সৃষ্টিও নয়, প্রধান চিহ্নও নয়। যেখানে পারছেন না লাগাতে, তখনও স্বীকার করতে হবে। অবশ্য দু'দিন পরে লাগাতে পারব এই আশা বুকে পোষণ করতে হবে,— তবেই হবো rational, নয় কি?

রবীন্দ্রনাথ বছরে বেশির ভাগ সময়ই বিদেশে থাকেন, কারণ অরবিন্দের মতন তিনিও 'যুগধর্ম-প্রবাহে' আত্মোৎসর্গ করতে নারাজ। আপনি লিখেছেন যে তিনিও বর্তমান যুগধর্মের বিরোধী,কেননা 'তপোবনের আদর্শ'— বিজ্ঞানমুখী চিত্তের প্রাখর্য ম্লান ইত্যাদি। আপনি নিশ্চয় Golden Book of Tagore-এ ড. মেঘনাদ সাহার প্রবন্ধটি দেখেছেন। শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী জয়ন্তী-উৎসর্গে এবং Golden Book of Tagore-এও রবীন্দ্রনাথের প্রিয় পুস্তকাবলির বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কথা কয়েও দেখেছি। বড় কবিদের মধ্যে অতগুলি বিজ্ঞানের উপর অত গভীর অনুরাগ এক গেটে ছাড়া আর কারুর কাছে পেয়েছি বলে ত' মনে হয় না। তাও ছেড়ে দিন। বিশেষ করে ইদানীং-এর লেখায়, কী পদ্যে, কী গদ্যে, বৈজ্ঞানিক তথ্য নিজের চিন্তার মধ্যে এনে তিনি ভাষাকে কতটা সমৃদ্ধ করেছেন লক্ষ করেননি কি? বনবাণী, শেষের কবিতা, যাত্রী, পূরবী, প্রবাহিণী: আমার টেবিলে রয়েছে। পাতা উল্টে দেখলুম যে প্রায় প্রত্যেক পাতায় অন্তত একটা না একটা বিজ্ঞান থেকে তুলনা

দেওয়া হয়েছে। আপনি বলবেন, এগুলো তার উপমার মাল-মশলা। স্বীকার করছি, কিন্তু এই উপমা থেকেই কি নির্ণয় হয় না তাঁর মন কোন্ দিকে খাদ্য খুঁজতে ঝুঁকেছে? তাঁর content কি তাঁর from-কে নতুন ভাবে গড়ে তুলছে না? কবির কাছে কি চান? যা তিনি নন, অর্থাৎ পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিক, তাই নন বলে দুঃখ করে লাভ কি? আপনি নিজেই লিখেছেন, গোটের মতন তিনি বৈজ্ঞানিক হোন এ আশা করেন না।

এইখানে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। একজন কবি কিংবা সাহিত্যিক বিজ্ঞানের কতটুকু অংশ গ্রহণ করতে পারেন বিবেচনা করেন? প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় বসে থাকার চেয়ে নিজের মনের কথা লিখে ফেলি। ধরুন জীবতত্ত্ব; কোনো সাহিত্যিক, বার্গসঁ যেভাবে ও যতটুকু জীবতত্ত্ব বোঝেন, তার বেশি তাকে গ্রহণ করতে পারেন না, অন্তত গ্রহণ করতে দেখিনি। আজকালকার ল্যাবিরেটারির বৈজ্ঞানিকের জীবতত্ত্ব সংক্রান্ত মতামত গ্রহণ করলে সাহিত্য-ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয় মনে করি, কেননা physico-chemical method কিংবা monism, সাহিত্যের যে ধর্ম, অর্থাৎ spiritual variety of personality তার বিরোধী। সাহিত্যিকের জীবতত্ত্বে প্রাণধর্মটুকু থাকবে, আর সে প্রাণ একটি অখণ্ড আবিষ্কারের মতন প্রতীয়মান হবেই হবে। কোনো দার্শনিককে অভিব্যক্তিবাদ গ্রহণ করে আলেক্‌জাণ্ডার কিংবা বার্গসঁ-এর বেশি কিছু বলতে শুনেছেন? যদি কোনো সাহিত্যিক নব্য মনোবিজ্ঞান স্বীকার করতে চান, তাহলে তাঁকে Gestalt school-এর মূলসিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, নচেৎ personalism কিংবা introspectionism,— খাঁটি behaviourism তাঁর সয় না। আমি কোনো কথা জোর করে বলছি না, তবে মনে হয় এইটাই স্বাভাবিক। পরে কি হবে জানি না, আপাতত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যা দশা তাই থেকে এই মনে হয়। পরে কী হবে তখন দেখা যাবে; এখন যা চলছে তাতে যা মনে হয় তাই লিখছি। এর কারণ কি? গ্যেটের ভাষাতেই বলি, একটার সঙ্গে অন্যের elective affinity আছে। এই আন্তরিক সম্বন্ধটুকু গোঁজামিল নয়। তার মূলে আছে সাহিত্যিকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরালম্ব হবার অক্ষমতা, কোনো মানুষ কিংবা ঘটনাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেখার অনভ্যাস, এবং সম্পূর্ণভাবে দেখতে যাবার দুরাশা। ধরা যাক প্রাণবাদ ভুল, গেস্‌টাল্‌ট ভুল, আর এই ভুলের সঙ্গে সাহিত্যিক সংসক্তি স্থাপিত হলে বিজ্ঞানের কাছে সাহিত্যকে হাস্যাস্পদ হতে হবে। তাতেও, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভুল পরে প্রমাণিত হলেও সাহিত্যের কিছু ক্ষতি হয় না আমার মতে। গ্যেটের জীবন থেকেই দু'টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—তাঁর archetype theory এবং colour theory। এই দুটোই

ভুল প্রমাণিত হয়েছে— তাতে দুঃখ নেই, অন্য লোক রয়েছে সত্য মত বার করবার জন্য। তাঁর ভুল মতটা কিন্তু গোটের মানসিক ধর্মের পরিচয় দেয়। সেই যুগের জ্ঞানের সম্পর্কে গোটের মতন সাহিত্যিক, দার্শনিক ও অতিমানবের পক্ষে ঐ বৈজ্ঞানিক ভুলটা করা নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল। সে যা হোক, রবীন্দ্রনাথের মতন কবির পক্ষে বিজ্ঞানের সেইটুকু গ্রহণ করা স্বাভাবিক যেটুকু তাঁর মূল-ধর্মের অনুকূল। সেইজন্যই তিনি সেই সব বিজ্ঞান থেকে উপমা গ্রহণ করেন যাতে আছে space, আছে গতি, ভূমার আভাস। ল্যাবরেটারি-বিজ্ঞানে তাঁর কবিপ্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানের বদলে যদি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের কথা তোলেন তাহলেও আপনার আপত্তি মঞ্জুর হয় না। কোন্ বিশ্বাসটা তিনি বিচারের তুলাদণ্ডে ওজন করেননি? কোথায় তিনি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন? দেশাত্মবোধক গোঁড়ামির বিপক্ষে যখন মারমুখী হ'ন, তখন চটি কেন? চরকার বিপক্ষে যখন তিনি কলম ধরেন তখন সত্যেন দত্তও দুঃখিত হয়েছিলেন, আমি জানি। যখন যান্ত্রিক-সভ্যতা নিয়ে কড়া কথা শোনান, তখন তাঁর বিদেশী অতি-বড় ভক্তেরাও মনঃক্ষুণ্ণ হ'ন। এই দুঃখ রাগ ও অভিমানের অর্থ কি? দেশাত্মবোধ, চরকাকাটা, যান্ত্রিকসভ্যতাও ত' যুগধর্ম! এর মানে শুধু এই যে, তিনি অরবিন্দের মতনই, আপনি যাকে যুগধর্ম বলছেন, তার প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দেননি, তার স্রোতের বিপক্ষে সাঁতার কেটেছেন। এর মানে এই যে, আপনি যাকে যুগধর্ম বলেন, সেটা নিয়ে তাঁর কারবার নয়; এর মানে, তাঁর যুগধর্ম 'আমাদের' যুগধর্মের প্রতিকূল। কোন্টা ঠিক? লোকে যখন লড়াই করে তখন শত্রুকে স্বীকার করে। সাদরে গ্রহণ না করলে কিংবা ভুল জানলে তাকে পলায়ন বলতে পারেন না। তিনি সব যুগের ফ্যাশানকেই গালাগালি দেন— ছিং টিং ছট্ থেকে দেশাত্মবোধক গোঁড়ামি পর্যন্ত। তিনি নেহাৎ ভালমানুষের মতন সরলবিশ্বাসী নন।

প্রকৃত যুগধর্ম কি— আমরা যে বুঝতে পারি না, তার জন্য দায়ী আমরা। আমাদের মূল্যজ্ঞান শিক্ষিত নয়। তা ছাড়া, 'প্রকৃত' কথাটির দুটি অর্থ আছে, এবং সুবিধা বুঝে কথাটি দুই অর্থে প্রয়োগ করি। বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার চেয়ে মধ্যযুগের লোকেরা এ বিষয়ে বেশি সজ্ঞান ছিল। যে স্কলাষ্টিসিজমের আপনি অত বিরোধী তাইতে আছে প্রকৃতির দু'টি সংজ্ঞা; এক অর্থ, যা দেওয়া রয়েছে কিংবা যা ঘটছে; অন্য অর্থ— অনেকটা আজ্ঞার মতন। এই আদেশাংশ শেষে প্রত্যেক মানুষের বিবেক এবং মানুষের সাধারণ নৈতিক আদেশের সঙ্গে মিলে যায়। প্রকৃতির আদেশ হয়ে গেল প্রাকৃতিক নিয়ম, সেটা মিশল জাতির

আচার-ব্যবহারের সারাংশের সঙ্গে, তারপর সেটা হলো ভগবানের আদেশ, তারপর সব পরিণত হলো মানুষের ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি ও বিবেকের সিদ্ধান্তে। অর্থাৎ প্রকৃতি কথাটির ব্যক্তিগত আদর্শের দিকও রয়েছে। কিন্তু এই দিকটা আমরা দেখি না, আমাদের নিজেদের কোনো আদর্শই নেই। তাই যুগধর্মও বুঝি না, বুঝি ফ্যাশান। উন্নত আদর্শের দিক থেকে যা হওয়া উচিত আপনি এবং অন্যান্য ভালো লোকে যা বিবেচনা করছেন সেইটাকেই প্রকৃত বলতে আপত্তি থাকা আপনার মতো আদর্শবাদীর পক্ষে শোভন নয়। রবীন্দ্রনাথের মতন লোক যে আদর্শের প্রবর্তন করছেন সেইটাই হবে নবযুগের ধর্ম—অতিমানবে বিশ্বাসী ন্যায়ত তাই বলতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছেন যে, বিজ্ঞান, যন্ত্র, কর্মকুশলতা, শুধু সুচারুরূপে কর্মসিদ্ধির উপায় মাত্র। সিদ্ধি কি করে হবে তাও তিনি ইঙ্গিত করেছেন, অবশ্য গুরুর মতন গুরুগম্ভীর ভাষায় কারুর কাণে মন্ত্র দেননি। উপায়ের চাপে উদ্দেশ্য শুকিয়ে যাতে না যায়, সেইটাই জোরে বলেছেন। তাঁর মতে সত্য হচ্ছে পার্সন্যালিটি। এই সত্যটি যতই রবীন্দ্রনাথের লেখায় ধরা পড়ছে ততই মনে হচ্ছে যে, তিনি আমাদের সকলের একমাত্র আশা-ভরসা। এই সত্যের প্রচারই হলো যান্ত্রিক-সভ্যতার বিপক্ষে একমাত্র প্রতিবাদ। এটা challenge—পলায়ন একেবারেই নয়। এইটাই নবযুগের বোধন-বাণী। যে নবযুগ আনবে বলে চেঁচায় সে পুরাতন যুগের রোগচিহ্ন মাত্র।

বাধা-সৃষ্টির দ্বারা স্রষ্টাকে সৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ করা ছাড়া যুগধর্মের অন্য কাজও থাকতে পারে। এক রকম সাহিত্য থাকতে পারে যাকে Edwin Muir-এর ভাষায় literature of escape বলতে পারেন। আপনার খোলা চিঠির প্রথম প্যারাগ্রাফে Moore থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করেছেন। ঐ নামের এক ব্যক্তি Utopia রচনা করেছিলেন। তার নাকি সাহিত্যিক মূল্যও আছে। ফ্রান্সিস্ বেকনের মতন লোকও ঐ ধরনের কী একটা বই লেখেন— অথচ তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তক, মন্ত্রী, ঘুষখোর, এক কথায়— জীবন থেকে তিনি পালাননি— এক জেলে কয়েকদিনের জন্য যাওয়া ছাড়া। ঐ Edwin Muir থেকেই এই ধরনের সাহিত্য সম্বন্ধে গোটাকয়েক দামী কথা তুলে দিচ্ছি। "For escape is one way of saving oneself from being overwhelmed by the suggestion of the age, and of penetrating to a source of inspiration deeper than it.···The defect of the literature of escape is that it is too sweeping; it has neither the exactitude nor the practical temper of the literature of

conflict. It postulates only two things; its vision of truth and beauty, and a world which does not correspond to that vision. Yet its criticism may be profound as far as it goes, for it apprehends the problem in its full and appalling form, though it can find no solution."— এই ইংরেজী বুকনির সার্থকতা আমার কাছে নেই, কেননা আমি কেউ পালাতে পারে বিশ্বাস করি না,—ভলটেয়ারও পারেননি, রোমাঁ রোলাঁও পারেননি, টলস্টয়ও পারেননি,—ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। আর আমি পলাতক-সাহিত্য বলে সাহিত্যের নতুন শ্রেণী আবিষ্কার করতে রাজি নই। আপনার কাছে এর সার্থকতা হয়তো থাকতে পারে, কেননা সাতত্যের চেয়ে বিরতিরই আপনি বেশি পক্ষপাতী, এবং প্রয়াণকে কাপুরুষজনোচিত পলায়ন বিবেচনা করেন। অরবিন্দের পণ্ডিচেরী-প্রয়াণ ও রবীন্দ্রনাথের বিদেশ-ভ্রমণ এই যুগের, এই দেশের, এই যুগের ধর্মের সব চেয়ে বড় নিষ্ঠুর সমালোচনা— অন্তত এ কথা মানুন, যদি তাঁরা এযুগের জন্য নতুন কিছু নাই করছেন ভাবেন। নবযুগধর্ম রচনারও যেমন প্রয়োজন, বর্তমান যুগধর্মের আলোচনারও তেমনি প্রয়োজন। নয় কি?

শুধু যুগধর্ম নিয়েই এক যুগ কাটালাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, নাতিদীর্ঘ চিঠি লিখব। হয়ে গেল অতিদীর্ঘ চিঠি। এর পর অন্যান্য বিষয় নিয়ে তর্ক করে আপনার ধৈর্যচ্যুতি করবো না। আপনার খোলা চিঠিতে অন্তত একশ'টা আলোচ্য বস্তু রয়েছে। সেজন্য মূল বক্তব্যটি পরিস্ফুট না হলেও, তাদের ওপর আপনার চিন্তাধারার একটা ছায়া পড়েছে। আপনি যে ঐ সব জিনিস নিয়ে ভাবছেন, এইটাই বড় কথা, এবং হয়তো আমার একটা ছোট চিঠির অজুহাতে আপনার চিন্তাধারা যে খুলে গিয়েছে এইটাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। চিন্তাশীলতার দামও কম নয়! আমি নিজে যখন লিখি তখন আপনার মতনই আমার মস্তিষ্কে হাজার হাজার fringe thoughts এসে হাজির হয়, ভিড় করে প্রধান কথাটিকে ঠেলে দেয়। অনেকে উপমা বদলে বলেন; ভূতের মতো উপদ্রব করে যজ্ঞ নষ্ট করে। চালাকি করে নিজেকে সমর্থন করি, ভাবি— যজ্ঞ না করার চেয়ে, কিংবা একলা ঘরে চুপটি করে একটু তরকারির ভূরিভোজন করার চেয়েও কাজটা মন্দ নয়। এই ধরনের চিন্তাকে অপরিষ্কার বলতে বাধ বাধ ঠেকে। এক ধরনের মস্তিষ্কের অভ্যাসই এই যে, চিন্তার বিষয়কে চার ধার থেকে দেখে দেখে একটি বিষয়ের নানা দিক একই সঙ্গে চোখে পড়ে। সকলেই কী অ্যারিস্টটলের যুক্তিরীতি মুখস্থ করে ভাবে? বেশিরভাগ লোক ভাবে ideogram-এর পদ্ধতির মতন, একটা বাক্যের ওপর আর একটা বাক্য

চাপিয়ে, যেন পিকাসোর বেহালার ছবি। একটির পর একটি বাক্য সাজিয়ে লেখা কারুর ধাতে আসে, কারুর আসে না। আমি নিজের দোষ সম্বন্ধে সচেতন বলে আপনার লেখার দোষ দেখতে নিরস্ত হলাম। এই দেখুন না, বই থেকে, বিশেষ করে বিলেতী বই থেকে, লম্বা কোটেশন্ দেওয়াটাও আমার অভ্যাস! আপনারও সে-অভ্যাস আছে দেখছি। ভালই হয়েছে; যে কুকুর কামড়েছে তার রোঁয়া নাকি মস্ত দাওয়াই, তবে তাতে রোগ সারবে বলে মনে হয় না। এই চিঠিতেই দেখুন না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না। মধ্যযুগের চিন্তাধারা নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। বর্তমান দর্শনে Neo-Thomism নামে একটা ঝোঁক এসেছে। ঝোঁক দিয়েছেন বোধ হয় জ্যাক্ ম্যারিটেন্। এই ভদ্রলোকটি একজন চিন্তাশীল লেখক—বিলেতেও এঁর চেলা হচ্ছে। এঁদেরকে neo-scholastics বলা হয়। আমার এইটুকু বিদ্যা নিয়ে জোর করে তাঁদের সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা যায় না। শুধু বলা যায়, neo-scholasticism মানে মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া নয় কিংবা সেই যুগের বিজ্ঞানকে চরম জ্ঞান ভাবা নয়, সেটা এই যুগে থাকবারই কথা, সেটা বিজ্ঞানের বিরোধী নয়, শুধু জড়বাদ ও যন্ত্রবাদের বিরোধী, সেটা খুবই বুদ্ধিবাদী, সেটা অভিব্যক্তিবাদকে অস্বীকার করে না, ঐ বাদের উপর যে ঝুটা দর্শন খাড়া করা হয়েছে সেই দর্শনকে প্রতিবাদ করে, সেটা বৈজ্ঞানিক রিসার্চকে শক্তির অপব্যয় ভাবে না, শুধু বিজ্ঞান জীবনের যে অংশ বাদ দিয়েছে—অর্থাৎ value-র দিকটা (তাঁদের ভাষায়—ধর্মের দিকটা) সেইটে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানের দাম্ভিক অদ্বৈতাংশটুকুর প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদ করা ছাড়াও তার দু'চারটা নতুন কথা বলবার আছে, এই যেমন theory of knowledge নিয়ে, দেহ মনের সম্বন্ধ নিয়ে, সত্যের সত্তা নিয়ে। Pragmatism কিংবা romantic idealism-এর বিপক্ষেও এই দলের ভীষণ আপত্তি। এঁদের দ্বৈতবাদী বস্তুতত্ত্ব নেহাৎ বাজে জিনিস নয়, কিংবা মধ্যযুগে ফিরে যাবার জন্য মন কেমন কেমন করাও নয়। আর্ট সম্বন্ধেও এঁদের অনেক কথা প্রণিধানযোগ্য।

তাহলে দাঁড়াল এই, বৈজ্ঞানিক মনোভাবের তাড়নায়, যোগধর্ম, গুহ্য-ধর্ম কিংবা অনুভূতিকে যদি গ্রহণ করতে নারাজ হ'ন, তাহলে সেই সঙ্গে আরো কিছু ত্যাগ করতে হবে। প্রথমে এইটুকু আমি বুঝেছি। তা ছাড়া আরো বুঝেছি যে, বুদ্ধিমান হলে আধুনিক হতে হবে কিংবা মধ্যযুগ কী পূর্বতন যুগকে পরিত্যাগ করতে হবে, তাও নয়। যুগধর্ম বলতে যুগ কথাটার অর্থও বুঝতে হবে; সেজন্য কাল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর করে তুলতে হবে। তারপর

ধর্ম, সেটা নির্ভর করছে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধের ওপর। অর্থাৎ একধারে পার্সন্যালিটি, অন্যধারে কাল।

এই বার শেষ করি। ইতিমধ্যে, অর্থাৎ 'যোগধর্মের যুক্তির' পর, একাধিক প্রবন্ধ লিখেছি। পুস্তকও বেরিয়েছে, তবে ইংরেজী ভাষায়। আশা করি, আপনার ভাষাবিদ্বেষ নেই। আচ্ছা, এই Neo-Thomist-দের দু'চারটা কথা শুনে নিলে দোষ কি? আমি তাঁদের গোঁড়া শিষ্য নই, বলা বাহুল্য। *

পুঃ— অনুগ্রহ করে মধ্যযুগকে অন্ধকারের যুগ বলবেন না, যেমন মেট্‌ল্যাণ্ডের এক ছাত্র ভেবেছিল। বল্লে, মেট্‌ল্যাণ্ডের উত্তর শুনতে পাবেন—**It is dark to you.**

১৩৩৯

---

* অধ্যাপক ম্যাক্‌মারে 'Some Makers of the Modern Spirit' নামে এই সেদিন একখানি পুস্তক সংকলন করেছেন। তাইতে মধ্যযুগের দান সম্বন্ধে অনেক সারবান কথা আছে। পরিশীলন, উৎকর্ষ কিংবা কৃষ্টির দিক থেকে মধ্যযুগে যে ঐক্য সাধিত হয়েছিল সেটি বর্তমান যুগে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে বলে য়ুরোপীয়ানরা আপশোষ করছেন। বলা বাহুল্য, তাকে ধর্মগত ঐক্য বলে ছেড়ে দিলে চলবে না। একোয়াইনাসের বুদ্ধির প্রাধান্য প্রচার করার প্রয়াস দেখেই বোধ হয় হোয়াইটহেডের মতন নব্য-নৈয়ায়িক বলেছেন যে মধ্যযুগই ইতিহাসের সব চেয়ে র‍্যাশান্যালিস্ট যুগ। ইতিহাস অর্থে য়ুরোপীয়ান ইতিহাস; আপনিও তাই বিশ্বাস করেননা কি? অগ্রহায়ণ ১৩৪০।

সাহিত্যিকের যুক্তি তথা সাহিত্যে মিথ্যাবাদ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আদর্শবাদী ও বস্তুতন্ত্রবাদীর মধ্যে দলাদলির কারণ শুধু অর্থসমস্যা, কী প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা, কিংবা শক্তিহ্রাসের ভয়,— এক কথায়, সাহিত্যিক ব্যবসায়ে লাভালাভ, বললে চলে না। আমার মনে হয় যে, সাহিত্যিক প্রতিপত্তি দলাদলির পূর্ববর্তী ঘটনা হলেও সেটি অন্য গূঢ় কারণের নিদর্শন মাত্র। গূঢ় কারণটি নির্ধারণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কার্ল মার্কসের ব্যাখ্যা আমি ইতিহাস ও রাজনীতির ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বীকার করি না, সাহিত্য-ক্ষেত্রে ত' দূরের কথা। অবশ্য, আর্থিক বৈষম্য ও সেই সঙ্গে শ্রেণী বিরোধের ফলে সাহিত্যের রূপ খানিকটা নির্ধারিত হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটা দলাদলির পটভূমি কিংবা অবস্থান মাত্র।

গোড়ার কথা এই যে, সত্যের প্রতি মনোভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর্টিস্টের অনেক প্রভেদ রয়েছে। দু'জনেই মানুষ বলে, গোটাকয়েক যন্ত্র-তন্ত্র সাধারণ হতে বাধ্য— যেমন মন ও দেহ। তবে আর্টিস্ট-মনের কাজের বৈশিষ্ট্য আছে, এবং আর্টিস্টের দেহের প্রক্রিয়াও কিছু অন্য ধরনের। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর্টিস্টের মিলের চেয়ে গরমিলই আমার কাছে এক্ষেত্রে দরকারি কথা। এক কথায়, তফাৎ হচ্ছে, সাধারণ মানুষের মন অশিক্ষিত এবং আর্টিস্টের মন সুশিক্ষিত। তর্ক উঠতে পারে যে, বৈজ্ঞানিকেরও মনও শিক্ষিত, অতএব গরমিল শুধু আর্টিস্টের সঙ্গে নয়, বৈজ্ঞানিকেরও সঙ্গে। কিন্তু 'বৈজ্ঞানিক মন' বলে কোনো মনের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায় ন্যায়ত স্বীকার করতে পারেন না, কেননা তাঁরা চোখ, কান এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ মনের দ্বারকে প্রথম থেকে শেষ অবধি সন্দেহ করেন। বিজ্ঞান-পদ্ধতির প্রক্রিয়া হচ্ছে বস্তু কিংবা ঘটনার সঙ্গে মনের ছোঁয়াচ না লাগতে দেওয়া। যতক্ষণ না প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক এক একটি আইনস্টাইন্ হচ্ছেন ততক্ষণ বৈজ্ঞানিকের মন সাধারণ ব্যক্তির মন থেকে একেবারে ভিন্ন জাতির হবার আবশ্যক নেই। অতএব আমাদের দু'টি কাজের হিসাব নিতে হবে। একটি সাধারণ ব্যক্তির মনের, এবং অন্যটি আর্টিস্টের।

মানুষের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির মিলনও চলছে, বিরোধও ঘটছে। এই দ্বৈত সম্বন্ধের ফলে, মন ও বুদ্ধি উৎপন্ন না হলেও মন ও বুদ্ধি যে সজাগ, ক্রিয়াশীল, এবং প্রখর হয়ে ওঠে তা অস্বীকার করা যায় না। তার ওপর আবার অন্তঃপ্রকৃতিও রয়েছে। ভিতরের এই জড়প্রকৃতি মধ্যে মধ্যে এমন বাধা তোলে যে, মন ও বুদ্ধি (mind) সেই বাধাগুলিকে সোজাসুজি অতিক্রম না করতে পেরে গলি দিয়ে পাশ কাটাতে চায়, কিংবা বাধা-বিপত্তির আনাচে-কানাচে দাঁড়িয়ে পড়ে। গলিগুলি নিতান্তই বাঁকা এবং কোথাও নিচু, কোথাও উঁচু। এইরূপ অসমতল ক্ষেত্রের মধ্যে মানসিক বক্রগতির ইতিহাস সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করা যেতে পারে যে, সেইরূপ বাঁকা পথ অবলম্বন করে, কিংবা তার ধারে কোন অলিগলিতে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম লাভ করে, মনের অনেক প্রবৃত্তিকে সাময়িকভাবে বশে আনা যেতে পারে, কিন্তু গন্তব্য স্থানে, অর্থাৎ যথার্থ কিংবা সার্থক-সত্যে পৌছান যায় না। মনের সাময়িক বিশ্রাম-জনিত সুখকে সত্যোপলব্ধির পরম আনন্দ বলে মনে হওয়াই শ্রান্ত পথিকের পক্ষে স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি কিন্তু ইয়ুলিসেসের মতন আরামকে অগ্রাহ্য করে অগ্রসর হতে পারে, সেই বেঁচে গেল, নচেৎ মিথ্যার কুহকে চিরকাল ভেড়া হয়েই রইল। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দু দার্শনিক মন ও বুদ্ধিকে অত নিচু স্তরে রেখেছেন। এই জন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ আর্টের ব্যাখ্যায় মন ও বুদ্ধির উল্লেখ না করে আত্মারই উল্লেখ করেন। মন ও বুদ্ধির কাজে জুয়াচুরি থাকবেই থাকবে— কেননা তাদের রাস্তা গলিঘুঁজি ; আত্মার বিকাশে জুয়াচুরি নেই, তার রাস্তা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর মতই সোজা ও চওড়া। সাধারণ ব্যক্তির ও বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আর্টিস্টের তফাৎ এইখানে। সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে আত্মার বালাই নেই,— কেবল দেহ, মন ও বুদ্ধির সঙ্গেই তার কারবার, এবং আর্টিস্টের কারবার দেহ, মন, বুদ্ধি, এবং আত্মার সঙ্গে। মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলে মনে হয় যে, সাধারণ ব্যক্তির মূলধন বুদ্ধি, ও আর্টিস্টের মূলধন আত্মা, অতএব যেন আর্টিস্টের গড়নই আলাদা। অতএব সাধারণ ব্যক্তি যে বাধা-বিপত্তি ও বৈষম্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, সে বাধা-বিপত্তি ও বৈষম্যে মধ্যে আর্টিস্টের হারিয়ে যাবার ভয় নেই। আর্টিস্টও বুদ্ধিমান জীব— তারও মন আছে, সেইজন্য সে ফাঁকি তৈরি করে, কিন্তু তার মন, বুদ্ধি ও আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে নিজে সহজে ফাঁকে পড়ে না। মোদ্দা কথা এই যে, এ জগতে একমাত্র আর্টিস্টই গোটা মানুষ।

কোনো জিনিসের স্বরূপ অর্থাৎ যথার্থ কিংবা সার্থক সত্যকে সহজে বুঝতে

না পেরে মানুষের বুদ্ধি সত্যের তিনটি মূর্তি খাড়া করে।* প্রথমটি সদৃশ সত্য (Fiction) কিংবা কাল্পনিক সত্য, দ্বিতীয়টি আনুমানিক সত্য, (Hypothesis) এবং তৃতীয়টি অনুমোদিত কিংবা গৃহীত সত্য (Dogma)। এই ত্রিমূর্তির পূজা প্রত্যেক বুদ্ধিমান জীবই করে থাকেন— কী বৈজ্ঞানিক, কী তথাকথিত সাহিত্যিক। তবে পূজার রীতি-নীতি, বিধি-ব্যবস্থা দুই জনের মধ্যে পৃথক হয়; হতে বাধ্য, কেননা উপাদান ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। সেইজন্যই সাহিত্য-স্রষ্টায় ও বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিগত চিন্তাধারার রীতি-নীতি ভিন্ন মনে হয়। কিন্তু যেকালে সব আর্টিস্টেরই মন ও বুদ্ধি আছে, এবং সে মন ও বুদ্ধি আত্মার অধীন, এবং যেকালে বস্তুর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করে রসসৃষ্টির জন্য আত্মার ও জড়ের কোনো না কোনো প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করা চাইই চাই, তখন সর্বপ্রকার রসস্রষ্টার সৃজন-নীতি প্রধানত এক হতে বাধ্য, যদিও রূপের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক।

সদৃশ সত্যের গোটাকয়েক দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: রাজনীতির ক্ষেত্রে রুশো ও হব্‌সের কল্পিত মানবসমাজের আদিম অবস্থা; অর্থনীতিতে আডাম্ স্মিথ্-কল্পিত স্বার্থপর ও স্বার্থান্বেষী সাধারণ ব্যক্তি· সমাজতত্ত্বে গড়পড়তা সুস্থ মানুষ; বিজ্ঞানে পরমাণু; জীববিজ্ঞানে গোটে-কল্পিত জীব-জন্তুর একমাত্র মূল আদর্শ (the animal archetype) প্রভৃতি। সাহিত্যে ঐ প্রকার গোটাকয়েক কল্পিত অর্থাৎ সদৃশ সত্যের সন্ধান পাই। যেমন, প্রত্যেক ব্যক্তি হচ্ছেন প্রকৃতির কবল থেকে মুক্ত পুরুষ (আদর্শবাদীর গোড়ার কথা), এবং প্রত্যেক ব্যক্তি হচ্ছেন ভিতরের ও বাইরের প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ জীব (বস্তুতন্ত্রবাদীর গোড়ার কথা)— অর্থাৎ মানুষ হয় ভগবানের বংশধর, না হয় ভূগোল কিংবা শয়তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সদৃশ তথা কল্পিত-সত্যে সুস্থ মানুষের মন বসে না, সে তাই সত্যের সন্ধানে আরো এগিয়ে পড়ে। ফলে হয় আনুমানিক সত্য-সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত, যেমন ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ। সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত যেমন— প্রত্যেক মানুষই নিজের ইচ্ছাশক্তিতে কিংবা ভগবৎ-কৃপায় প্রকৃতির কবল থেকে মুক্ত হচ্ছে

* আমার সমালোচনার বিষয় আর্ট নয়, আর্টিস্ট এবং তাঁর চিন্তাধারা ও কার্যাবলী। বৈজ্ঞানিক সমালোচনা, অর্থাৎ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন সমালোচনা আমি ভাল বুঝি না। Vaihinger তাঁর Philosophy of As If বইখানিতে সাধারণ মনের এই সব জুয়াচুরির কথা ভাল করেই জানিয়ে দিয়েছেন।

(আদর্শবাদী), এবং কোনো মানুষই এই নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারে না (বস্তুতন্ত্রবাদী)।

শোনা যায়, অসুস্থ ব্যক্তি, মৃগীরোগী, কিংবা উন্মাদের দল যথার্থ-সত্যে সাধারণত পৌঁছতে পারে না, কিন্তু দেখা যায় যে বেশির ভাগ তথাকথিত সুস্থ লোক আনুমানিক সত্যেই জমে গেল। তখন সদৃশ্য-(কল্পিত) সত্য ও আনুমানিক সত্যের সাহায্যে বেশির ভাগ লোক যে নতুন সত্য অনুমোদন ও গ্রহণ করে তার প্রকাশভঙ্গি এইরূপ : অতএব যে ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ গ্রহণ করল না সেই গোঁড়া ধার্মিক (সার্ আর্থার কীথের সেদিনকারের বক্তৃতা), অতএব সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম হচ্ছে চরিত্রকে দেবোন্মুখ কিংবা পাতকী অঙ্কিত করা ; অর্থাৎ, একমাত্র প্রকৃতির অতিরিক্ত মানুষ (দেবতার আত্মীয়), কিংবা একমাত্র প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ জীব (শয়তানের আত্মীয়) হিসাবেই মানুষকে বোঝা যাবে। এখন, দেবতার প্রকাশ হয় অনুভূতির মধ্যে, এবং পাতকীর প্রকাশ তার প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজে, দৈনন্দিন ঘটনায় ; এই যুক্তি অনুসারেই একটি গৃহীত সত্যের (আদর্শবাদের) প্রকাশভঙ্গি অনুভূতিমূলক, অন্যটির (বস্তুতন্ত্রবাদের) প্রকাশভঙ্গি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ-সাপেক্ষ হয়। একটি হয়ে ওঠে দিব্যদর্শন, অন্যটি বিজ্ঞান ; একটি কুলীন, অন্যটি শূদ্র। দৃষ্টান্ত, অনুরূপা দেবী, যতীন সিংহের সাহিত্যালোচনা, এবং জোলার বস্তুতন্ত্রের ব্যাখ্যা।

অথচ, জীববিজ্ঞানের যথার্থ সত্য হচ্ছে ডারুইনের Struggle for Existence (মাৎস্যন্যায়), ক্রপ্‌টকিনের Mutual Aid, ডী ভ্রিজের Mutation, সব মিলিয়ে এবং হয়তো তারও অতিরিক্ত একটি জীবনী-শক্তির প্রকাশ, অথচ সাহিত্যের একমাত্র কর্তা ও কর্ম মানুষ, যে একাধারে দেবতা, শয়তান ও নিতান্ত সাধারণ, এবং যে মানুষ বলেই কখনও কখনও বিজ্ঞান-সম্মত এবং সাধারণের ব্যবহৃত পথের বাইরে যূথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

এ ত' গেল দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্তের দ্বারা অনেক সময় ভিতরের কথাটা বোঝা যায় না। কাল্পনিক (সদৃশ) সত্যের ধরন এই যে, সে-সত্যের সঙ্গে ব্যবহারিক জগতের অর্থাৎ বাহ্য ঘটনা ও অভিজ্ঞতা এবং মানসিক জগতের প্রয়োজনীয় চিন্তাধারার আন্তরিক বিরোধ থাকতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে এই বিরোধ দূর করবার, এই উৎকট প্রসারণের, এই মানসিক অশান্তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার বাসনা সদৃশ-(কাল্পনিক) সত্যের রূপের মধ্যে থাকবেই থাকবে, প্রকাশ্যে কিংবা অ-প্রকাশ্যে। (বস্তুতন্ত্রবাদীর অঙ্কিত পাষণ্ডের মধ্যেও একটি ছোট্ট মেয়ে না হয় একটি কুকুরের ওপর মমতায়, এবং আদর্শবাদীর অঙ্কিত

মহাত্মার চরিত্রে একটি নির্দোষ খেয়াল কিংবা একটি মিথ্যা কলঙ্কের চিহ্নে পূর্বোক্ত বিরোধ ও তার অবসানের বাসনা ধরা পড়ে)। কল্পিত সত্যের কল্পনাটুকু স্রষ্টার কাছে সর্বদা প্রকট থাকলেই বুদ্ধির পক্ষে ভাল। কাল্পনিক সত্যের একমাত্র গুণ, বুদ্ধির সুবিধা ও উপকার, কেননা তার দ্বারাই বুদ্ধি অনুমান ও অনুমোদন করতে অগ্রসর হয়।

কাল্পনিক সত্যের ও আনুমানিক সত্যের উৎপত্তি এবং আকার অনেক সময় একই প্রকারের। আকার এক হলে গোলমালের সম্ভাবনা বেশি। আদিম মানব কামুক ও ক্ষুধার্ত, কিংবা ধার্মিক এবং ব্রহ্মচারী ; (আমাদের সভ্যতা মানবের আদিমত্বকে দূর করতে মোটেই পারেনি) এবং (অতএব) কাম ও ক্ষুধা কিংবা সংযম অথবা ব্রহ্মচর্য সব মানুষেরই আদিম (যথার্থ) প্রবৃত্তি— এই দু'টি বাক্যের তাৎপর্য পৃথক হলেও বর্তমান বাংলা সাহিত্যে একই আকার ধারণ করেছে। কিন্তু অনুমান সর্বদাই সত্য বলে প্রমাণিত হবার জন্য প্রস্তুত। প্রত্যেক অনুমান, এক একটি চ্যালেঞ্জ, যুদ্ধং দেহি হাঁক ছাড়ছে। অনুরূপা দেবীর চরিত্রগুলি যদি কারুর অ-সত্য বলে মনে হয়, গ্রন্থকর্ত্রী অতি সহজেই উত্তর দিতে পারেন, 'মানুষ যে দেবতার বংশধর এই কথাটির ওপর আগে জীবন গড়ে তুলুন, একবার নিজে মহাত্মা ও মুক্ত পুরুষদের সঙ্গে মিশুন, একবার সাদা চোখে মানুষকে দেখুন, তাহলেই বুঝবেন আমার চরিত্রগুলি সত্য কী কল্পনাপ্রসূত। তাও যদি না করেন, তাহলে প্রমাণ করুন যে, মানুষ পুরুষকারের দ্বারা কিংবা গুরুর কৃপায় নিজেকে উন্নত করতে পারে না।' তেমনি ড. নরেশচন্দ্র রস-সমালোচককে বলতে পারেন, 'একবার দুচোখ খুলে বেড়াবেন, দেখবেন মানুষের মন ও দেহ এক-একটি কুরুক্ষেত্র। নেহাৎ না পারেন, প্রমাণ করুন যে ঐ প্রকার বদ্ধজীব পৃথিবীতে নেই, কিংবা এতই দুর্লভ যে, যাদুঘরের কাচের ভেতর রাখা ছাড়া নভেল নাটকের পাতায় আনা যায় না।' রামচন্দ্র ও ক্যাসানোভা দু-এরই অস্তিত্ব আছে, সেইজন্য রামায়ণ ও কামায়ণ লেখা দুই-ই অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ— তবে যার যেমন অভিজ্ঞতা। কোনো অনুমানই নিরীক্ষণের ভয় পায় না। আদর্শবাদীর যন্ত্র দূরবীক্ষণ, বস্তুতন্ত্রবাদীর অণুবীক্ষণ, একই যন্ত্রের উল্টো দিকটা। যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষিত হলেই আনুমানিক সত্যকে যথার্থ-সত্য বিবেচনা করা স্বাভাবিক। কিন্তু যন্ত্র কিছু অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত ফল দেখায় না— এই কথাটি সকলেই ভুলে যান। সেইজন্য আনুমানিক সত্যকে অনেক সময় যথার্থ-সত্য বলে ভ্রম হয়। আনুমানিক সত্যের অনুমান-অংশটুকু যন্ত্র অথবা অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথর দ্বারা পরীক্ষিত হলেই, সন্দেহাংশটুকু বিশ্বাসের

দ্বারা দূরীভূত হলেই, আনুমানিক সত্য অনুমোদিত (dogma) সত্যের কোঠায় উঠে পড়লো।

অতএব কাল্পনিক সত্যের উৎপত্তি এবং মাপকাঠি নির্দেশের পক্ষে যেমন সুবিধার বস্তু, আনুমানিকের সুবিধা তেমনি সম্ভাবনীয়তায়। মানুষকে অতিপ্রাকৃত আঁকবার সুবিধা যে কত সকলেই জানেন— অলৌকিক ঘটনার অবতারণা থেকে আরম্ভ করে পূর্বপরিচিত ধর্ম ও মধুর ভাবের সমাবেশ পর্যন্ত সবই সুবিধার। রবিবাবুর অনুকরণে দু-চারটা বাণী, অজানা আনন্দের ঝিলিক্ প্রভৃতি কথা লেখার মধ্যে ছিটিয়ে দিলে অতি সহজেই আদর্শবাদী সাহিত্যিক বলে প্রতিপন্ন হওয়া যায়। আবার শরৎবাবুর অনুকরণে (?) ঘেয়ো কুকুরের ডাক, প্যাঁচার আওয়াজ, ঘেঁটুফুল ও বস্তির দুর্গন্ধ, বেশ্যাবাড়ির কাঁক্ড়া চড়চড়ির ছিব্‌ড়ে, গদ্যে আনলেই বাস্তবপন্থী নাম কেনা অতি সহজ হয়ে ওঠে। দুইই সম্ভব ঘটনা, ভূমার আভাস এবং বস্তির গল্প। কিন্তু দুই প্রকার সাহিত্যিকই, যাঁরা যথার্থ-সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, অর্থাৎ রবিবাবু ও শরৎচন্দ্রের বহুদূরে পড়ে রইলেন। কল্পনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করলেই অর্থাৎ ন্যায্য হলেই, কাল্পনিক সত্যের কাজ ফুরালো। কিন্তু আনুমানিক সত্যকে ঘটনাপারম্পর্যের মধ্যে আবিষ্কার করতে হয়, কতখানি যথার্থ-সত্যের নিকটবর্তী হয়েছে সর্বদাই চোখ রাখতে হয়, অর্থাৎ প্রমাণসাপেক্ষ এবং সম্ভব কী না দেখতে হয়। এখানে অভিজ্ঞতাই একমাত্র পরীক্ষক। নতুন অভিজ্ঞতা যদি পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রতিকূল হলো, তাহলে আনুমানিক সত্যকে তৎক্ষণাৎ বর্জন করতে হবে— একটি মাত্র অভিজ্ঞতা যদি পূর্বতন অনুমানের বিপক্ষে যায়, তাহলে পুরাতন অনুমানকে অগ্রাহ্য করতে হবে। কল্পনার ও বালাই নেই, তার পরীক্ষক ঘটনা নয়— একটি কল্পনার সঙ্গে অন্য কল্পনার বিরোধ না ঘটলেই হলো, কিংবা সূত্র জড়িয়ে না গেলেই হলো। তাহলেও কাল্পনিক সত্য অগ্রাহ্য হবে না— জোর mixed metaphor, জংলা মিশ্র সুর, arabesque, grotesque, eclectic আর্ট হবে। তবে এ সবেও কল্পনার ধর্ম বজায় রাখা চাই 'গাঁজা, গুলি, ভাঙ,' এর সঙ্গে 'সুতরাং' মেলান চাই।

যদি কল্পনার ধর্ম রক্ষিত হলো, যদি অনুমান সব চেয়ে অধিকসংখ্যক অভিজ্ঞতাকে বরণ করতে পারলে, তাহলে কল্পনা ও অনুমান গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। তখন আগেকার পন্থাগুলি ঐতিহ্যে পরিণত হয়। একবার যা' তা' করে কল্পনা ও অনুমানকে ঐতিহ্যে পর্যবসিত করতে পারলে সেই গোড়ার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। সত্য গৃহীত হলেই মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করতে পারে, কেননা তখন আর সুবিধা-অসুবিধা, ন্যায্য-অন্যায্যর কথা থাকে না। এই

প্রকার মানসিক দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি অনেকটা কাজীর বিচার, কিংবা হিন্দুমুসলমান প্যাক্টের মতন। বীরবলের ভাষায়, শেষে প্যাক্টই হয়ে যায় ফ্যাক্ট, গোড়ার সেই ট্যাক্টের কথা সকলেই ভুলে যায়— কেননা গোলমেলে জিনিস ভুলে যাওয়াই বুদ্ধির ধর্ম। মানুষ নিজের সৃষ্ট ফ্যাক্টকে ধূপ ধুনা দিয়ে অর্চনা করে, পেঙ্গুইন দ্বীপের Saint Oberosia-র ছাইএর মতন। তখন প্যাক্ট ও ফ্যাক্টটি আদর্শে বেমালুম রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। যে সেই আদর্শকে গ্রহণ করলে না, সেই পাজী, অ-সাহিত্যিক ; যে করলে সেই প্রকৃত ভক্ত, রসিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি। অর্থাৎ ড· নরেশ সেনগুপ্তের মতে শ্রীমতী অনুরূপাদেবী ভ্রান্ত এবং শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর মতে ভূদেবচন্দ্রের পরবর্তী সব লেখকই পাষণ্ড (heretic)। কিন্তু দুজনেই গোঁড়া ; একজন কাল্পনিক সত্যকে যথার্থ-সত্য বলে ধরে নিয়েছেন, অন্যজন আনুমানিক সত্যকে সার্থক-সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। সেইজন্য দুজনের কারুর মনে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই— দুজনেরই মনে শান্তি বিরাজ করছে। দুজনেই আত্মতৃপ্ত। তা না হলে মতামতগুলি অত জোরের সঙ্গে কেউ বলতে পারে!

এক পারেন আর্টিস্ট। জনকয়েক এমন লোকের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে যাঁদের কার্যকলাপ লক্ষ করে আমি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে এসেছি। একমাত্র আর্টিস্টই মন ও বুদ্ধির সঙ্গে প্রকৃতির আদিম দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারেন। আর্টিস্ট কাল্পনিক সত্যের সুবিধা ও আনুমানিক সত্যের প্রয়োজনীয়তা মানেন। তবে তিনি তাদের মধ্যে একটিকেও যথার্থ সত্য বলে মনে করেন না। তিনি জানেন যে, প্রত্যেক মানুষ, কী সাধারণ, কী বৈজ্ঞানিক, ফাঁকি খোঁজে, এবং শেষে ফাঁকিতে পড়ে। তিনি জানেন যে, তাঁকে সত্যবাদী হতেই হবে। সুবিধা যে সুবিধা ছাড়া অন্য কিছু নয়, অনুমানের প্রয়োজন যে যাথার্থ্য নয়, শুধু মনের মিথ্যাবাদ, এ কথা তিনি ভাল রকমই জানেন। রস-সৃষ্টির আসরে মিথ্যার স্থান নেই— প্রজার মতন, মিথ্যা দরবারের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। মিথ্যা যেকালে বুদ্ধির সৃষ্টি, এবং আর্টিস্ট যেকালে বোকা মানুষ নন, অথচ ব্যবহারিক ও মনোময় জগতের দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে ব্যাকুল, তখন এই ব্যবহার-দুষ্ট মন ছাড়া তাঁর পক্ষে অন্য একটি অ-ব্যবহারিক এবং অসম্পর্কিত মনের চর্চা করা স্বাভাবিক। এই প্রকার মন (লোকে এই মনকে আত্মা বলে, শুনেছি ও পড়েছি) হয়ত ব্রহ্মজ্ঞানীর আছে, কিন্তু আর্টিস্টের আছে নিশ্চয় জানি— কেননা দেখেছি। যাঁদের এই প্রকার মন আছে তাঁরা কল্পনা, অনুমানের এবং অনুমোদনের বাইরেকার সত্যের আভাস পেয়েছেন। তাঁরা মিথ্যার ধার ধারেন না, আদর্শবাদ ও বস্তুতন্ত্রবাদ তাঁদের কাছে

মিথ্যাবাদের কাব্য ও গদ্য-সংস্করণ মাত্র। শরৎবাবুর লেখা অনেক হিন্দু ও ব্রাহ্ম রুচিবাগীশ পছন্দ করেন না— কেননা তাঁর লেখায় বাস্তবের পূতিগন্ধ বর্তমান, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে, হিন্দু-সমাজের উত্তমাঙ্গ অর্থাৎ ব্রাহ্ম-সমাজ যে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণের মধ্যে স্ত্রীজাতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রচার-কার্যে ব্যগ্র, সেই উচ্চ আদর্শের মধ্যে যথার্থ সত্যটুকু শরৎবাবুর প্রতি নভেলে, প্রতি পতিতারমণীর বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। 'ঘরে ঘরে, পথে ঘাটে মা বোন' যিনি দেখেন, তাঁর আদর্শহীনতা সম্বন্ধে কোনো শুচিবাইগ্রস্ত পুরুষ কী রমণীই সন্দিহান হতে পারেন না। রবিবাবুর মতন বস্তুতান্ত্রিকও দুর্লভ— 'ঘরে বাইরে'র মেজো জায়ের মতন, 'যোগাযোগে' ভাঁড়ার ঘরের মতন নিখুঁত ও প্রকৃত ছবি কেউ এঁকেছেন কিনা জানি না, প্রেমের নীচতা এবং নিষ্ফলতা সন্দীপ ও বিনোদিনী অপেক্ষা আমাদের সাহিত্যের অন্য কোনো চরিত্রে অত পরিস্ফুট হয়েছে কিনা জানি না। তাঁর পোস্টমাস্টার ও বোষ্টুমীর চিত্র নব্যতন্ত্রের সাহিত্যিকে আঁকতে পারলে নিজেরাই যে ধন্য হতেন সে বুদ্ধি হয়ত তাঁদের নিজেদেরই আছে। শরৎচন্দ্র পতিতাও এঁকেছেন, অন্য চরিত্রও এঁকেছেন, রবিবাবু বড় ঘরের কথাও লিখেছেন আবার অন্য চরিত্রও এঁকেছেন। দুজনেরই সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, দূরদৃষ্টি আছে— কারণ তাঁদের দৃষ্টিশক্তি আছে, আর যা যথার্থ-সত্য দেখেছেন, ভেবেছেন, বুঝেছেন, সবই চমৎকারভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। তাঁদের মন ও বুদ্ধি আত্মার দ্বারা গ্রথিত ও মার্জিত, তাঁরা সম্পূর্ণ ও integrated, তাই তাঁদের সব অভিজ্ঞতাই সত্য— এমন কী খুঁটিনাটি-টি পর্যন্ত, অজানার আভাসটি পর্যন্ত। তাঁরা আর্টিস্ট, অর্থাৎ যথার্থ-সত্যের সন্ধানী। অন্যেরা বুদ্ধিমান, আত্ম ও সত্য-সন্ধানী নন। এঁদের কারবার খণ্ড সত্য, কল্পিত সত্য, আনুমানিক সত্য নিয়ে। জোর এঁরা বৈজ্ঞানিক। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের মতন আর্টিস্ট অভিজ্ঞতাকে বিচ্ছিন্ন করে, টুকরো করে ব্যবসা চালান না। আর্টিস্টের কাজ তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের দ্বারা অর্জিত সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে। তাঁদের এক পা স্বর্গে, অন্য পা মর্ত্যে। এক পদ মর্ত্যে রাখলে সাধারণ মানুষের অন্য পদটিকেও মর্ত্যে রাখতে হয়, কিন্তু যাঁরা নটরাজের নৃত্যের তালে তালে ছন্দ রাখতে পারেন, তাঁদের পক্ষে এ প্রকার অদ্ভুত ভঙ্গিমা অসম্ভব নয়। আর্টিস্ট সাধারণ মানুষও নন, বৈজ্ঞানিকও নন, সেইজন্য আদর্শবাদ ও বস্তুতন্ত্রবাদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনোভাবেরই মতন।

সমাজধর্ম ও সাহিত্য

ধর্ম বলতে সাধারণত শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত ধর্ম বুঝি। যে পরিমাণে প্রত্যেক নর-নারীর বিকাশ, তার শ্রেণীর কিংবা সমাজের অবস্থা ও অভিব্যক্তি এবং সমাজ-নায়কদের আদর্শের ওপর নির্ভর করে সেই পরিমাণে ব্যক্তিগত ধর্ম সামাজিক ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে বাধ্য। ব্যক্তিগত ধর্মই সামাজিক ধর্মের প্রেরণা। ব্যক্তিগত ধর্মের অর্থ যতটুকু ধারণ করবার শক্তি, ততটুকু ধর্মই সহজাত। কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম মানে শুধু ধারণ করবার শক্তি নয়, সৃষ্টি করবারও শক্তি। সর্বক্ষেত্রেই, অবস্থার বিপর্যয়ে পুনর্গঠনের শক্তিই ধর্মের প্রাণ। সামাজিক ধর্ম যখন রক্ষণ ও ধারণ করে ক্ষান্ত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সে সমাজে মানুষের মতন মানুষের দুর্ভিক্ষ হয়েছে, সে সমাজে আছে শুধু কঙ্কাল। ব্যক্তিগত ধর্ম যখন কেবল পুরাতনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা ছাড়া অন্য কাজ পায় না, তখন বুঝতে হবে যে, সে ধর্ম বহুদিন পূর্বে মারা গিয়েছে। সৃষ্টির অর্থে জীবজগতের সৃষ্টি যতদূর হোক আর না হোক, রূপ-জগতের, মানসিক জগতের, ব্যবহারিক জগতের এবং আনুষ্ঠানিক সৃষ্টিই বুঝতে হবে। সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে মুক্ত ব্যক্তি, সমাজ সেই মুক্তিযজ্ঞের মাল-মশলা জোগান দেয় মাত্র। বাংলা দেশের বর্তমান সমাজ এই জোগান দিতে পরাঙ্মুখ হয়েছে বলে সকলেরই মনে হচ্ছে। স্নেহান্ধ পিতামাতা যেমন সন্তানের অর্বাচীনতা বয়সের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা দোষমুক্ত এবং দায়িত্বশূন্য হন, তেমনি অনেকে পূর্বোক্ত পরাঙ্মুখীনতাকে যুগধর্মের স্বভাব বলে বেশ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন দেখেছি। কিন্তু অক্ষমতাকে যুগধর্ম বলে যাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন তাঁরা এই কথাটির মধ্যে ধর্মের যথার্থ মানে না বুঝে, ধর্মকে বাদ দিয়ে, যুগেরই উপাসনা করেন। যে কোনো দু'টি মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে সেই কালই সেই পরিবর্তনের সম্পর্কে যুগ। কালও পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত রয়েছে— কালাতীত পরিবর্তন হতে পারে না। দুটি ক্ষণস্থায়ীর মধ্যে একটি বুঝতে হলে, সুবিধার জন্য, হয় একটি স্থির ভাবতে হবে, না হয় তৃতীয় একটি স্থিরসত্তা ভাবতে হয়। যুগ অনবরত সরে যাচ্ছে, ধর্মও অনবরত বদলাচ্ছে— ঐ ক্ষেত্রে যুগধর্ম মানে জার্মান

অধ্যাপকের আবিষ্কৃত Zeit Geist-এর তর্জমা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কালের, যুগের এমন কোনো সত্ব, কিংবা গুণ, কিংবা প্রাধান্য থাকতে পারে না, যার জন্য ধর্মের সত্তা, গুণ কিংবা প্রাধান্য লোপ পাবে। এ বৎসরের পঞ্জিকায় যে ১৯০০ সাল লেখা নেই,—১৯২৮ সাল লেখা আছে, এই তথ্যটি পরিবর্তন-ক্রিয়ার কর্তা নয়। তবে কর্তা কে? সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, কর্তা হচ্ছে সমাজ কিংবা শ্রেণী, অর্থাৎ ব্যষ্টির সমবেত শক্তি। কিন্তু যাঁরা মানব-মনের অনুকরণেচ্ছা লক্ষ করেছেন তাঁরা বোধ হয় অ-সাধারণ ব্যক্তিকে কর্তা বলতে দ্বিধা বোধ করবেন না। যাঁরা অসাধারণত্বে অবিশ্বাসী, তাঁরাও ভেবে দেখেছেন যে ব্যক্তিই হচ্ছেন কর্তা; যদিও কর্তৃত্ব করবার সুযোগ ঠিক করে ঐ সমাজ, এবং আজকালকার যুগে ঐ শ্রেণী।

সে যাই হোক, আর্থিক কিংবা পারমার্থিক কারণে সমাজ না হয় বদলে গেল। কিন্তু স্রষ্টা এবং অ-সাধারণ ব্যক্তি জন্মায় কী করে? সুপ্রজননবিদ্যার সাহায্যে অসাধারণত্বের খানিকটা প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সমাজ এখানেও বাধা দিচ্ছে। যে সমাজে শিক্ষিত যুবকের দল পর্যন্ত জন্মরোধের সুফল সম্বন্ধে সন্দিহান, যেখানে জীবনের বিবাহাদি প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক এবং প্রেতমূর্তি পিতামাতা এবং পত্নীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে সুপ্রজনন-বিদ্যার বিস্তৃত প্রয়োগ আপাতত অসম্ভব। অবশ্য এই বিদ্যাটি রসায়নশাস্ত্র কিংবা পদার্থবিজ্ঞানের মতন এমন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি যে, তার সিদ্ধান্তের সাহায্যে কোন ভবিষ্যৎ-বাণী করা যায়। তবুও মানুষের নির্বাচন-শক্তির দ্বারা অনুপযুক্ত লোকের জন্মরোধ, আর্থিক দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ এবং উপযুক্ত লোকের মৃত্যু-হার কমান সম্ভব, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। যে দেশে উপযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেশি, সেখানে এই হলেই যথেষ্ট। আমাদের দেশে দুঃখ থেকে নিস্তার পেলেই চলবে না, সুখের রীতিমত ব্যবস্থা করতে হবে। তবে উপযুক্ত ব্যক্তি কে — কী রকম বিবাহে কোন্ ধরনের উপযুক্ত ব্যক্তি জন্মাবেন — আগে থেকে ঠিক করা অসম্ভব। কেননা, যেমন সুপ্রজনন-বিদ্যাটি অপরিণত, তেমনি বিদ্যার্থীর মনে উপযোগিতা সম্বন্ধে কোনো মতের ঐক্য নেই— ফলে সুপ্রজনন-বিদ্যা, হিন্দুশাস্ত্রের মতন উদার হয়ে উঠেছে। যে বিদ্যায় যে কোনো পূর্বতন সংস্কারের নজির পাওয়া যায়, সে বিদ্যা অল্প জানলেই নিজের মতকে দৃঢ়তর করা যায়। বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে উপযোগিতা সম্বন্ধে অনৈক্যের অন্যতম কারণ— প্রেমের প্রতি অন্ধবিশ্বাস। জাতিবিচার নিরর্থক হবার পরেই যৌন-বিচারের অন্য পদ্ধতি আবিষ্কার করা দরকার হলো। বাংলা দেশে প্রেম নামক পদ্ধতিটি আবিষ্কার করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কর্তাদের

বারণ কেউ মান্‌ল না। তার পর এলেন রবিবাবু। তিনিই আমাদের সকলকে প্রেমে পড়তে শিখিয়েছেন। তাঁরই ভাষা দিয়ে আমরা প্রেম করি, তাঁরই ভাব দিয়ে আমরা প্রেমে পড়ি— গুরুজন ও গুরুদাসবাবুর বাধা সত্ত্বেও। প্রেম আমাদের ধাতে এসে গিয়েছে। ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যের প্রকোপে অন্য কিছু হতেই পারত না। সে যাই হোক, প্রেম করে বিবাহের মধ্যে এমন একটি দৈহিক ও মানসিক মাদকতা এবং অন্তত কয়েক মাসের জন্যও যৌন-সম্বন্ধের এমন একটি সম্পূর্ণতা আছে যার ফলে পুত্রকন্যারা ঢের বেশি স্বাধীনতাপ্রিয় ও নির্ভীক হয়ে ওঠে। যাঁরা বর্তমান হিন্দু-বিবাহের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা খুঁজে পান, এবং হিন্দু-বিবাহে আধ্যাত্মিকতা ছাড়া অন্য কিছু নেই, এবং থাকা উচিত নয় মনে করেন, তাঁদের অবশ্য প্রেমে আস্থা নেই। যে আধ্যাত্মিকতা খুঁজে বার করতে হয়, তার চেয়ে দৈহিক ও মানসিক মাদকতা জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করা স্বাভাবিক। প্রেমে পড়ে বিবাহ, এ ক্ষেত্রে মন্দের ভাল মানতেই হবে। এ গেল সুপ্রজনন-বিদ্যার উপকারিতা সম্বন্ধে ইংরাজী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত যুবকদের ধারণা। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং অন্যধরনে শিক্ষিত ব্যক্তির মনে সামাজিক উপযোগিতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার ধারণা থাকলেও, একটি গড়পড়তা মত পাওয়া যায়। উপযুক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য থাকবে, সাধারণ বুদ্ধি থাকবে, টাকা রোজগারের ক্ষমতা থাকবে, এবং সে ব্যক্তি অন্তত প্রকাশ্যে সামাজিক প্রথা মেনে চলবে। স্বাস্থ্য, অর্থ ও বুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানের জন্যও সুপ্রজনন-বিদ্যার প্রয়োগ প্রয়োজনীয়, কিন্তু সুবোধ, সুশীল সন্তানদের জন্য সে প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। যে বিবাহের ফলে সুবোধ, সুশীল বালক-বালিকা জন্মগ্রহণ করে, সে বিবাহের নামই বিংশ শতাব্দীর 'হিন্দু-বিবাহ'। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশে লোক যে দেহে ও মনে এত ভীরু তার একটি কারণ এই যে, দেশের পিতামাতার বিবাহিত জীবনে কোনো প্রকার স্বাধীনতা ও স্ফূর্তির ছাপ নেই, বরঞ্চ এমন একটি সংকোচ আছে যার আওতায় দেহ ও মন ফুটে উঠতে পারে না। ভবিষ্যতে যুবক-যুবতীর মন থেকে ভীরুতা দূর করবার এবং তাদের সাহসী করবার একমাত্র উপায় যৌন-নির্বাচন। যতদিন সে উপায়টি অবলম্বিত না হচ্ছে ততদিন প্রেমে পড়ে, বিবাহকেই বরণ করে নিতে হবে।

অ-সাধারণ ব্যক্তির জন্মগ্রহণের সুযোগ দেওয়া ভিন্নও সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার দ্বারা সমাজের সাধারণ স্তরকে উন্নত করা যায় অনেকে বিশ্বাস করেন। এই উপায়ের বিপক্ষে অনেক আপত্তি আছে। প্রথমত, উপায়টিই উপায়ের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, সুপ্রজনন-বিদ্যায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা

শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির খুব বেশি উন্নতি করা যায় বিশ্বাস করেন না। এ কথা সত্য যে, সাধারণের মধ্যে বুদ্ধির এবং জ্ঞানার্জনের ক্ষমতার বিভাগ এবং বিস্তার সহজাতশক্তির ওপর যতটা নির্ভর করে, শিক্ষার তারতম্য এবং বিস্তারের ওপর ততটা করে না। শিক্ষিত হবার ক্ষমতাও যৌন-নির্বাচনের দ্বারা বাড়ান যায়। তৃতীয়ত, সুপ্রজনন-বিদ্যা সম্বন্ধে যেমন মতের অনৈক্য আছে, শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি বৈ কম অনৈক্য নেই। শুধু তাই নয়, প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা সমাজের বড় বেশি উন্নতি করা যায় না। অবশ্য, এগুলি ঠিক আপত্তি নয়, বিপত্তি। অতএব ধীরে ধীরে বিপত্তিগুলি দূর হবে আশা করা যেতে পারে। যে কোনো ভাল কাজেই বাধা-বিঘ্ন আছে— যে কোনো সত্যেরই অন্তরায় আছে —সে অন্তরায় দেখাতে পারলেই সত্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে অন্তরায় হচ্ছে সাধারণের অশিক্ষা। অতএব সুপ্রজনন-বিদ্যার কথা মনে রেখে শিক্ষাবিস্তার করতে হবে। সেইজন্য বাংলাদেশে একটি মানসিক ভূগোল তৈরি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় একা এ কাজ হাতে নিতে পারে না— রাজারও ইচ্ছা নেই, কল্পনা নেই। অতএব বিবাহিত জীবনকেই সংস্কৃত করতে হবে। বিবাহিত জীবনই সামাজিক জীবনের মেরুদণ্ড, সেটিকে সোজা রাখতে হবে। উপায়— প্রেম ও সুপ্রজনন-বিদ্যার সাহায্যে যৌন-নির্বাচনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা। এক কথায়, উপায়— জীবনকে, জীবনের প্রধান প্রধান অধ্যায়কে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত করা। আমার বক্তব্য এই যে, বর্তমান মাসিক-পত্রের পাতায় পাতায় পরোক্ষে বিবাহ ও যৌন-সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু খোলাখুলি অথচ ভদ্রভাবে কেউ এ সম্বন্ধে লেখেন না। আমার বিশ্বাস আর্টিস্ট এই নিয়ে গল্পও লিখতে পারেন। কিন্তু সকলেই প্রেম নিয়ে ব্যস্ত। নব্য-সাহিত্যিকরা মনে করেন, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের যুগ চলে গিয়েছে— যদি গিয়েই থাকে তাহলে তাঁদের আবিষ্কৃত প্রেমও মাসিক-সাহিত্যের পাতা থেকে চলে যাক না কেন? সামাজিক ধর্ম বদলাচ্ছে, ব্যক্তি বলছে যে, সে শুধু ধর্ম রক্ষা করে ক্ষান্ত হতে পারছে না। সে এমন একটি ধর্ম গড়তে চায় যার সাহায্যে তার শক্তির স্ফুরণ হবে— তার ক্ষমতাগুলি শতদলের মতন বিকশিত হবে। আপাতত, ব্যক্তি কাঁটা হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তির সঙ্গে পুরাতন সংস্কারের গরমিল হচ্ছে। সমাজ পেছিয়ে পড়ছে, ব্যক্তির অভাব পুরণ করতে পারছে না। ব্যক্তিও জোর গলায় বলছে না যে, সে বড় একটা কিছু করতে চায়। তার আকাঙ্ক্ষা ছোট। এ সময় মানুষ যা চাচ্ছে তার মধ্যে বীরত্ব নেই, সমাজ যেভাবে বদলাচ্ছে তার মধ্যে ব্যক্তির প্রবল ইচ্ছা নেই, তার পিছনে বুদ্ধির চালনা নেই, তার সামনে কোনো বিজ্ঞানসম্মত আদর্শ নেই। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের লেন-দেনের মধ্যে

মানুষের চাওয়া কম— এর মধ্যে অনেকখানি ইচ্ছাশক্তির অতিরিক্ত, অর্থগত ও বিদেশীভাবগত অসামঞ্জস্যের প্রেরণা রয়েছে। যা পরিবর্তন হচ্ছে সবই আমাদের অনিচ্ছায়— এ পরিবর্তন ভগবানের লীলার মতন বীর্যহীন। যা কিছু করতে হবে— সব যেন চোখ খুলে করি, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে করি, নিজের শক্তি খাটিয়ে করি। Social force-এ বিশ্বাস করাও যা, বাইরের ভগবানে বিশ্বাস করাও তা— সবই আত্মপ্রবঞ্চনা।

এক বছর পরে দেশে ফিরে তিনটি ঘটনা আমার চোখে পড়েছে। একটি সাহিত্যিক ঝগড়া, দ্বিতীয়টি কলকারখানায় ধর্মঘট, এবং তৃতীয়টি যুবক-সম্প্রদায়ের জাগরণ। প্রত্যেক ঘটনার পিছনে আছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ। প্রথমটির সম্বন্ধে এত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে যে, সে বিষয়ে কোনো নতুন কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটা অতি পুরাতন কথা না বলে থাকা যায় না। নবীন সাহিত্য, অতি আধুনিক সাহিত্য বলতে আমি 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি'র ভাল লেখাকে যেমন ধরি, তেমনি ধরি 'শনিবারের চিঠি'র ভাল ব্যঙ্গ-রচনাগুলিকেও। দুই দলের লেখাতেই স্বাতন্ত্র্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। রস জিনিসটি দেশ ও কালের অতিরিক্ত হলেও যে বস্তুর, যে রূপের, যে আধারের সাহায্যে সেটি তৈরি হয়, সে বিষয়-বস্তু, সে রূপ ও সে আধার সাধারণত দেশ ও কালের অন্তর্ভুক্ত সমাজসংক্রান্ত চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রতিক্রিয়াও এক ধরনের যোগ। শুধু প্রতিক্রিয়ার দ্বারা অবশ্য সাহিত্য হয় না, কিন্তু সব প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র বৈপরীত্যের বিকার নয়। বৈপরীত্যের পিছনে নতুন ভাবের তাড়না থাকতে বাধ্য— যেমন মাইকেলী যুগে ছিল। অতি-আধুনিক সাহিত্য আমাকে রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনী, মাইকেলের জীবন-কথা, এবং নিমচাঁদের চরিত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। ভূত যখন ছাড়ে, তখন ছাড়ার চিহ্নস্বরূপ গাছের ডালপালা ভেঙে দিয়ে যায়। অত্যন্ত প্রপীড়িত হয়ে মানুষ যখন শাসনের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে, যখন সে বিদ্রোহ দমন করতে শাসনকর্তা শাস্ত্র আওড়ান এবং শস্ত্র ধরেন, তখন সে বিদ্রোহের মধ্যে, সে শাস্ত্র ও অস্ত্রক্ষেপের মধ্যে সঙ্গতি, সামঞ্জস্য, সুবিচার, সুরুচি থাকে না— কারণ এক দৈহিক পীড়ন ছাড়া অন্য কোনো পীড়ন সামাজিক পীড়নের মতো নিষ্ঠুর, নিবিড় ও ব্যাপক নয়। কিন্তু মানুষ বিরক্ত হয়ে মহাপুরুষদের মতন সংসার ত্যাগ করতে পারে না— সে যখন সমাজের মধ্যে থাকতে বাধ্য তখন তার বুদ্ধিবৃত্তিও অসামাজিক হতে বাধ্য। সেইজন্য মানুষের সঙ্গে তারই রচিত সমাজের মনকষাকষি চিরকালই চলছে— নিজের রচনার সঙ্গে বিবাদ করা বোধ হয় মানুষের ধর্ম। যে কর্মী, সে এই অসামঞ্জস্য-জনিত শক্তিকে সংস্কারের কাজে

লাগায়, সেই নবযুগের পুরুষ। যে সাহিত্যিক কোনো মতামত প্রচার না করেও গোটা মানুষের সঙ্গে বাহিরের সমাজ ও অন্তরের প্রকৃতির নতুনপ্রকার বিরোধকে রূপ দিতে পারে সেই নব্য-সাহিত্যিক। এই রূপ সামাজিক হবে না, অ-পরিচিত হবে জনসাধারণের কাছে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিরোধের সঙ্গে পরিচিত সে এই নতুনত্বের খাতির করবে। সাহিত্যের সঙ্গে যুগধর্মের ও সমাজের সম্বন্ধ এই বিরোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য, যতদিন সাহিত্যের বিষয় মানুষ থাকবে এবং যতদিন সাহিত্যিক বুঝতে কল বুঝব না, মানুষ বুঝব।* সমাজতত্ত্ববিদ্ অবশ্য রূপ সৃষ্টি করে না, কিন্তু সেও মানুষের দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পায়, সেও সামাজিক অত্যাচার লক্ষ করে, এবং অত্যাচার উপশম করবার জন্য জ্ঞানত অসামাজিক মতামত পোষণ ও প্রচার করতে বাধ্য হয়—এই হতে বাধ্য যতদিন সমাজতত্ত্বের বিষয় প্রথমে মানুষ, পরে মানুষের অনুষ্ঠান থাকবে— যতদিন সমাজতত্ত্ব লিখতে মানুষের দরকার হবে। বিজ্ঞানসম্মত সমাজতত্ত্বেও সামাজিক

---

* ১৬ই মে তারিখের আমেরিকান 'নেশন' পত্রিকায় দুটি উপাদেয় প্রবন্ধ পড়লুম। একটির বিষয় বর্তমান ফরাসী সাহিত্যের ধারা, অন্যটির বর্তমান রুশ-সাহিত্য। লেখকদ্বয় নামজাদা সমালোচক। Rene Lalou লিখেছেন—"The most striking feature in every field of French literature at the present moment seems to be a general disinclination to treat art for art's sake ; our writers deliberately use it as an instrument for the probing of social or psychological problems"—লেখক বিস্তর দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখেছেন—"...in our time *the true traitor is the artist who does not take sides.* Even in psychology, neutrality seems impossible...From that point of view literature may be said to play its part in the national effort to build up France again." Louis Fischer ঐ সংখ্যায় রুশ-সাহিত্য সম্বন্ধে একই কথা লিখছেন—"To the Soviet critic an author's social philosophy is the first criterion...The only decisive difference between seven or seventeen literary armies is their realism or futurism"—মন্তব্যগুলি ফরাসী কী রুশ-সাহিত্য সম্বন্ধে সত্য কী মিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতা নেই। বিদেশে যা হচ্ছে এদেশে তাই হওয়া উচিত তাও বলছি না। তবে সামাজিক পরিবর্তনকে অর্থাৎ বিরোধকে সাহিত্যিক সাহিত্যের বস্তুহিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য, এই আমার ধারণা।

অত্যাচার নিরাকরণের অধ্যায় বাদ পড়বে না। অতএব যদি সমাজের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়ে থাকে, যদি সমাজ-শাসনের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে থাকে. এবং সে প্রতিক্রিয়ার যদি কিছু মূল্য থাকে ; যদি লোকে বুঝতে পেরে থাকে যে, বড় আদর্শ, পুণ্য, ধর্ম, পবিত্রতার নামে সেই পুরাতন ব্রাহ্মণের বংশধর, সমাজরক্ষকের দল পৈতা ফেলে, plain dress constable সেজে agent provocateur-এর কাজই করছে, তাহলে সে বিদ্রোহের, সে প্রতিক্রিয়ার সুফল-কুফল মাসিক-সাহিত্যের পাতায়, সমাজতন্ত্রের পাতায় ধরা পড়বে। অবশ্য যদি এই সব সত্য হয়, তবেই ধরা পড়বে, নচেৎ নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। নব্য মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, complex ভাঙবার একমাত্র উপায় সাহসভরে তাকে বোঝা, তাকে প্রকাশ করা। সেইজন্য মনে হয় যদি কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি ও শনিবারের চিঠির লেখকবৃন্দের মধ্যে যে কেউ প্রতি মাসে বর্তমান সমাজের বিপক্ষে যুবক-সম্প্রদায়ের আপত্তিগুলি দাখিল করেন, তাহলে নিছক সাহিত্যসৃষ্টি না হলেও যুবক-সম্প্রদায়ের জাগরণ, সত্যকারের জাগরণ হয়, যুবকদের মনে প্রতিক্রিয়ার অসার বৈপরীত্যবোধ লোপ পেয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয়, এবং তাঁরা নিজেদের ধর্ম খুঁজে পেয়ে সংযত হন। সংযমী হবার এই একটি উপায় আছে। দেশে জনকয়েক Calvins of East Bengal-এর দরকার হয়েছে— ব্রাহ্মধর্মের কাজ এখনও ফুরোয়নি। নতুন সাহিত্য গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সমাজের দোষত্রুটি লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার সময় এসেছে। নব্য-সাহিত্যের অতিরঞ্জনের জন্য সমাজকেই দায়ী করি। মানুষের দোষ বেশি দেখতে পাই না, যদি তার দোষ থাকে সেটি এই যে, সে এতদিন সমাজের দোষগুলি বুঝতে পারেনি।

নব্য-সাহিত্যে এই অতিরঞ্জনের মধ্যে বিদ্রোহ এবং প্রতিক্রিয়ার অংশটুকু বাদ দিলে অন্য কোনো সাহিত্যগুণ আছে কিনা সে বিষয় আলোচনা আমি করছি না। রসবোধ রুচিসাপেক্ষ। রুচি শুধু স্বাভাবিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, শুধু বিচার-বুদ্ধির দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না, শিক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হয় না— শুধু conditioned reflex বা learned reaction দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা যায় না— রুচি নিউটনেরও তোয়াক্কা রাখে না, ওয়াট্‌সনেরও খাতির রাখে না। রুচি অভ্যাস নয়, স্মৃতিও নয়। রুচি ব্যক্তির একটি সম্পূর্ণ অনুভূতির প্রতিবিম্ব। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ হয়নি, তার অনুভূতি একদেশদর্শী, তার অনুভূতি প্রবৃত্তির নামান্তর— অতএব তার রুচির কোনো বিশেষ মূল্য নেই— অন্তত রসের ক্ষেত্রে। ব্যক্তিত্ববিকাশের স্তরের জন্য রুচিগত পার্থক্য হয়। রুচির অভিব্যক্তি

আছে, ইতিহাস আছে, অতএব ভিন্নস্তরের রুচির সঙ্গে মিল সম্ভব নয়। সেইজন্য রুচির কথা ছেড়ে দিচ্ছি। পূর্বেই বলেছি যে বোঝবার সুবিধার জন্য সাহিত্যের বক্তব্য এবং বিষয়-বস্তুকে রস থেকে পৃথক করতে হয়। বক্তব্য বিষয়ে অতি-আধুনিক সাহিত্যিক সচেতন কিনা, রূপে কতখানি মতামতের খাদ থাকা উচিত, কিংবা কতখানি খাদ থাকলে অলংকার তৈরি হতে পারে, একই বিষয়-বস্তুর একই রূপ হওয়া উচিত কিনা, আমি জানি এইটুকু— যদি ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের মনোমালিন্য হয়ে থাকে, যদি এই মানসিক কর্ষণের ফলে ব্যক্তির মধ্যে কোনো নবশক্তির উদ্রেক হয়ে থাকে, তবে সে শক্তিকে মাত্র একটি রূপে পর্যবসিত করলে সে শক্তিকে অপমান করা হয়।

একটি রূপ বলতে একধারে যৌন-সম্বন্ধমূলক সাহিত্য এবং অন্যধারে সেই সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ায় ব্যঙ্গরচনাকেই নির্দেশ করছি। যৌন-সম্বন্ধ মানুষের খুব বড় সম্বন্ধ, পুরুষ স্ত্রীজাতির ওপর অত্যাচার করে এই সম্বন্ধ নিয়ে, যৌন-সম্পর্কেই অত লুকোচুরি, অত জুয়াচুরি ; এবং সে অত্যাচার, সে জুয়াচুরি যত শীঘ্র সমাজ থেকে যায় ততই মঙ্গল। ব্যঙ্গরচনাও উচ্চ সাহিত্যের একটি অঙ্গ। 'পরশুরাম' বাংলা সাহিত্যে অমর থাকবেন— সতীশ ঘটকের 'রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' সকলেরই প্রিয়। কিন্তু হিন্দু-বিবাহের বাধাবিপত্তির বিপক্ষে বিদ্রোহটাই যেমন রচনা-শক্তি নয়, তেমনি বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এমন শক্তি নেই যেটি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারে। যৌন-সম্বন্ধ মানুষের সম্বন্ধ, ব্যঙ্গ-শক্তি মানুষেরই শক্তি। মানুষকে ভুলে গিয়ে তার বিশেষ কোনো শক্তি এবং সম্বন্ধ বিচার করা বৈজ্ঞানিক হিসাবে সুবিধার কথা হলেও রসানুভূতির পথ নয়। যেখানে ব্যথা, যেটি সহজগম্য নয়, সেইখানেই চোখ পড়া স্বাভাবিক— অতএব সাহিত্যের বিষয়-বস্তু অবৈধ অর্থাৎ অসামাজিক প্রেম হতে বাধ্য। প্রেমে পড়া— কী বৈধ কী অবৈধ প্রেমে পড়া— মানুষের সব চেয়ে exacting profession হলেও সাধারণত এমন প্রেম ত' দেখিনি যার জন্য মানুষের সব চিরকালের জন্য বদলে গেল। আর যাদের সব বদলে যায় তাদের সাহিত্যসৃষ্টি করবার কোনো স্থির-বুদ্ধি থাকে না। প্রেমে ভাটা পড়লে তবে পলি পড়ে এবং সেই পলিতেই আর্ট ও সাহিত্যের ভাল ফসল তৈরি হয়। রাগ থাকলে তবে ব্যঙ্গরচনা সম্ভব হয়। সাহিত্য detumescent অবস্থার চিহ্ন। অবশ্য এ সব কথা রসস্রষ্টার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধেই খাটে— কিন্তু রাগ এবং অনুরাগের সব অবস্থাই সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হতে পারে না বলি কি ক'রে! ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে রক্তের স্রোত বইত, দু'শ বছর পরে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবে রঙ্গমঞ্চে খুন-খারাপি বন্ধ হ'ল, আবার আজকাল সে দেশে এমন

নাটকও লেখা হচ্ছে যার প্রথম দৃশ্যেই বন্দুক চলেছে। রোস্তাঁর বৃদ্ধা বেশ্যাকে দেখলে লেসিং লাওকনের হাসি-মুখের অন্য ব্যাখ্যা করতেন নিশ্চয়। সব জিনিসই রসবস্তু হতে পারে, তবে রসোৎপাদনের জন্য সে বস্তুর কতটুকু প্রকাশ্য, কতটুকু বেছে নিতে হবে তার ভার রসস্রষ্টার হাতে। আমার বক্তব্য এই যে, কামবিষয়ে নিরর্থক এবং নিতান্ত অপকারী লজ্জাকে ভাঙতে আমাদের সব শক্তি যেন নিয়োজিত না হয়— সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য complexকেও ভাঙতে হবে। আসল কথা, মনের ভয় ভাঙা; কাম ছাড়া মনের অন্য জুজু নেই কি? আমার বিশ্বাস, সাহিত্য জুজু তাড়াবার ভার বেশ নিতে পারে। হয়ত সেটি মাসিক-সাহিত্য হবে, তা হোক, এই মাসিক-সাহিত্যের চিরস্থায়ী হতে কোনো বাধা নেই। অনেক নজির দেখান যায় যে, মাসিক-সাহিত্য সনাতনত্বের কোঠায় উঠেছে। সমসাময়িক সভ্যতা গড়ে তোলা কি এক দলের কাজ, না শুধু সমাজ-সংস্কারকের একচেটে ব্যাবসা? এ কাজ সাহিত্যিকের, বৈজ্ঞানিকের এবং ঐতিহাসিকের, পরে সমাজ-সংস্কারকদের, এককথায় এ কাজ প্রবুদ্ধ ব্যক্তির; আমি সব দলকে নিবেদন করছি, যেন তাঁরা ক্ষোভের বশে, দাম্ভিকতার বশে, রাগের বশে সভ্যতা তৈরি করার ভার অন্যের হাতে ন্যস্ত না করেন।

কথাটা অন্যভাবে বলা যাক। বাস্তব-সাহিত্য বলে যদি কোনো সাহিত্য থাকে তাহলে সে সাহিত্যের methodology হবে বৈজ্ঞানিক এবং বিষয় হবে প্রকৃতি ও মানুষের অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাত। এই বচনটি বস্তুতন্ত্রবাদের গুরু জোলা লিখেছিলেন গত শতাব্দীতে, যখন বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের মোহে সকলেই আচ্ছন্ন। কিন্তু এখনও সে মোহ সকলে কাটিয়ে উঠতে না পারলেও অনেকেই বেশ বুঝেছেন যে, মোটামুটিভাবে বৈজ্ঞানিকের মনোভাবের সঙ্গে রূপকারের মনোভাবের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। মধ্যযুগের শিল্পী তাঁর সততা, নির্বাচন-শক্তি এবং একনিষ্ঠতার সাহায্যে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের সমকক্ষ। অবশ্য সাধারণ লোকের, যাদের মন শিল্পীরও নয়, বৈজ্ঞানিকের নয়, অথচ শিল্প ও বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত, তাঁদের ধারণা এই যে, ঐতিহ্যের সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে objective outlook-এর একটি আন্তরিক বিরোধ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ বিরোধ বিজ্ঞানের সঙ্গে আর্টের নয়, এ বিরোধ ঐতিহ্যবাদী আদর্শবাদীর সঙ্গে বিজ্ঞানবাদীর— রূপ ও রসসৃষ্টির স্বাধীনতার সঙ্গে প্রভুসম্মত বাণীর। আমরা সাধারণ লোক, কিছুই সৃষ্টি করতে পারি না— কিছুই ভাঙতে চাই না কিংবা ভাঙবার সাহস আমাদের নেই— আমাদের বিজ্ঞান পড়া ইংরাজী, সংস্কৃত ও ইতিহাস না জানার দরুণই হয়। কিন্তু যাঁরা বস্তুতন্ত্রবাদী তাঁদের কাছেও বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং বর্তমানের প্রতি শ্রদ্ধার

নিদর্শন প্রত্যাশা করা কি অসঙ্গত? শনিমণ্ডল বস্তুতন্ত্রবাদী নন, কিন্তু তাঁরাও বলেন যে, তাঁরা নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা করে থাকেন— কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করেন না, কেবল ধারা নিয়ে সমালোচনা করেন— অর্থাৎ ব্যবহারে তাঁরা বৈজ্ঞানিক এই প্রমাণ করতে চান। কিন্তু তাঁদের কারুর মধ্যে scientific spirit আছে বলে ত' মনে হয় না। কল্লোল-দল কাম ও ক্রাইম নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে লিখবেন, কেউ রাগতে পাবে না, শনিমণ্ডল কোনো বিশেষ ব্যক্তির অযথা ও অন্যায় সমালোচনা করবেন, তাঁর বন্ধুরা রাগতে পাবে না— এইটুকুই কি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সঙ্গে তাঁদের একমাত্র সম্বন্ধের চিহ্ন হবে? নব্য-সাহিত্যিক বাল্য-বিবাহের বিরোধী, প্রেমে স্বাধীনতা চান, বিবাহকে সংস্কার গণ্য করেন— কিন্তু হিন্দু-সমাজকে, হিন্দু-মনোভাবকে ভেঙে-চুরে দিতে হবে বলতে ভয় পান কেন? আমি জানি দু'দলের কোনো কোনো মহারথীরা হিন্দু-ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতে শতমুখ হ'ন—হিন্দু-সমাজ এতদিন বেঁচে এসেছে বলেই শ্রেষ্ঠ সমাজ, কায়দায় পড়ে, না জেনেশুনে, অন্য সমাজকে অন্য ধর্মাবলম্বীকে আশ্রয় দিয়েছে বলেই খুব উদার, হিন্দু-ধর্ম সর্বধর্মকে সমন্বয় করবে, এইসব ধারণা হৃদয়ে পোষণ করেন, এবং তাঁদের মস্তিষ্কটি হৃদয়ে অবস্থিত বলেই হিন্দু-ধর্ম নিয়ে অনেক ভাবপ্রবণ 'চিন্তাশীল' লেখা লেখেন; নব্য-সাহিত্যিকরা সব খদ্দর পরছেন— মনের কোনে বোধ হয় এই বিশ্বাস আছে যে, খদ্দর পরলে দেশ স্বাধীন হোক আর না হোক সাহেব জব্দ হবে। এঁরা কেউ কেউ দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় ব্যস্ত— অথচ সত্যকারের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের কাছে, গণতান্ত্রিক মনোভাবের কাছে, দরিদ্র-নারায়ণের যথার্থ সেবকবৃন্দ, অর্থাৎ সোশিয়ালিস্টের কাছে না আছে দেশী না আছে বিলেতী। সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রবাদ কি তাহলে অসাহিত্যিক মনের কাজ ছাড়া অন্য কিছু নয়? একটি নতুন ভঙ্গিমার বিস্তার মাত্র? এর মধ্যে সত্য কী কিছুই নেই? আধুনিক সাহিত্যিকরা শুধু Realism-এর ভক্ত— না সত্যকারের Realists? শনিমণ্ডলের লেখা পড়লে মনে হয় যে, তারা সব ব্রাহ্মণ-সভার পরিপোষক, গোপনে গোপনে বোধ হয় চাঁদাও দেন। বস্তুতন্ত্রবাদীরা না হয় অবৈজ্ঞানিক হলেন, কিন্তু তাঁদের হতে আপত্তি কি? তাঁরাও ত' নব্যভব্য— তাঁদের রস-রচনাও ত' বাংলা সাহিত্যে নতুন সম্পদ এনেছে? স্রেফ গালাগালি দেওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য কখনই হতে পারে না। উদ্দেশ্য, মাত্র এক সমসাময়িক সভ্যতার মূল্য নির্ধারণ করাই হতে পারে, পুরাতন সভ্যতার মূল্য নতুন আদর্শ নতুন অবস্থার অনুপাতে নতুন করে যাচাই করা এবং পরবর্তী সভ্যতা ভব্যতা ও বৈদগ্ধ্যের ভিত্তি গাঁথাই আদর্শ হতে পারে। কল্লোল,

কালি-কলম, প্রগতি এবং শনিবারের চিঠি আমি পেলেই পড়ি এবং প্রায়ই পড়ি। কিন্তু কোথাও contemporary culture-এর সমালোচনা পড়েছি বলে মনে হয় না। শনিমণ্ডলের সমালোচনাশক্তি কল্লোল-দলের অপেক্ষা বেশি আছে অনেকে সন্দেহ করেন, তাঁরাই এ কাজটি করুন না? আমি শনি-মণ্ডলকে কালো নীরে ঝাঁপ দিতে অনুরোধ করি। নিজেদের ছায়া দেখে ভয় করলে চলবে না। আমার সন্দেহ হয়েছে যে, শনিমণ্ডল কল্লোল-সম্প্রদায়ের মতনই সমাজ ও জীবনের first and last things নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভয় পান, কিংবা সময় পান না, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধে যে শক্তি জন্মগ্রহণ করেছে তাকে খাটাতে ভয় পান কিংবা সময় পান না! আমাদের মতন কাপুরুষ বোধ হয় কুত্রাপি নেই— নচেৎ যাঁরা দেহ সম্বন্ধে এত খোলাখুলি লিখতে সাহস পান— যাঁরা যে কোনো সাহিত্যিকের লেখা সমালোচনা করতে ব্যগ্র এবং জনমতের বিপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করতে উদ্যত, তাঁরাও লজিকের শেষবেশ দেখতে নারাজ!

কার্ল মার্কসের শিষ্যেরা সমাজ অর্থে মূলত শ্রেণী বোঝেন। তাঁদের মতানুসারে সামাজিক ধর্মের মানে শ্রেণীগত ধর্ম বদলাচ্ছে; পূর্বে, পরে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত ধর্মও বদলাচ্ছে। যৌন-সম্পর্ক সমাজ-ধর্মের একটি মূলকথা, সে সম্বন্ধে ধারণা বদলাচ্ছে (অনেকস্থলে সাহিত্যের সাহায্যে), বিষয়বস্তুর নির্বাচনে এই পরিবর্তনের আভাস ভাল করেই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সমাজে অন্যান্য ঘটনাও ঘটছে— সেগুলির মূল্য আমরা দিতে শিখিনি। বিবাহ-পদ্ধতি বদলান যেমনভাবে দরকারি মনে করি, দেশের অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তনও তেমন আগ্রহের সঙ্গে দরকারি মনে করি না। সেগুলি সাহিত্যের বিষয়বস্তু বলে গ্রাহ্য করছেন অনেকে, দু' এক জনের হাতে সেগুলির সাহায্যে রসসৃষ্টিও হয়েছে। কিন্তু সেই ঘটনাগুলির প্রভাবে যে নতুন মানুষ তৈরি হচ্ছে সেই নতুন মানুষের স্থান সাহিত্য এখনও নিরূপণ করেনি। সাহিত্য সেগুলিকে tendency বলে ছেড়ে দিয়েছে— সেই tendency-র ফলে সংস্কৃত ব্যক্তির আচরণ লিখতে অনেকেই ভয় পান। এই যে ধীরে ধীরে বাংলা দেশের লোকেরা গ্রাম ছেড়ে ছোট বড় শহরে বাস করছে, এই যে লোকেরা ব্যবসা শুরু করছে, ধান ডাল যবের ক্ষেত না করে পাট এবং রপ্তানীর উপযোগী শস্যের চাষ আরম্ভ করেছে, এই যে টাকার আধিপত্য শুরু হয়েছে, যেখানে কল-কারখানা সেখানে মুটেমজুরের দর ঝুঁকে পড়েছে অথচ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘরকন্না করতে পারছে না, কিংবা যে ঘরে ঘরকন্না করছে সেটি বাসের উপযুক্ত মোটেই নয়, এই যে মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায় শহরের মেসে বাস করছে এর ফলে কি ধর্ম,

সমাজ এবং গোষ্ঠী ভেঙে যাচ্ছে না— এবং সেই ভাঙনের ফলে মানুষের আচরণ ব্যবহারগুলি কি বদলে যাচ্ছে না ? মুটেমজুর, চাকরবাকর, বাড়ির স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, চাষী ও গরীব কেরানির দল সকলেই অত্যাচারের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, সঙ্ঘ বাঁধছে, ধর্মঘট করছে, টাকা দিয়ে মানুষের মূল্য ঠিক করছে, এককথায় 'জড়বাদী' হয়ে উঠেছে। আগে লোকেরা কতখানি আধ্যাত্মিক ছিল জানি না, তবে ভগ্নী নিবেদিতার পর থেকে জনসাধারণের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বিরল হয়ে উঠেছে দেখছি। তবে ভণ্ডামিও সেই অনুপাতে বাড়ছে বলা যেতে পারে। জড়বাদ ভাল কী মন্দ সে কথা উঠছে না এবং সাহিত্য জড়বাদের ব্যাখ্যা করুক তাও বলছি না। তবে জড়বাদ যে বর্তমান যুগে নিতান্তই স্বাভাবিক, সে-কথা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি এবং শহুরে লোক কী করে অস্বীকার করে ? যতক্ষণ অঙ্গ অসুস্থ থাকে ততক্ষণ মন অসুস্থ অঙ্গের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে— অবশ্য তুলনাটি ঠিক হলো না, কেননা ক্ষুধা অসুস্থতা নয়, সুস্থদেহেরই লক্ষণ। যাই হোক, মানুষের মনোবৃত্তিগুলি এবং আচার ব্যবহার এমনিভাবে বদলাচ্ছে যে, সেগুলি সকলেরই নজরে পড়া উচিত। নজরে পড়লে অনেকে তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করে ফেলেন। মনের মধ্যে একধারে ঐতিহ্যরূপ চেড়ীর দল চাবুক নিয়ে শাসাচ্ছে, অন্য ধারে গালফুলো ভুঁড়িওয়ালা, গগন ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রের ভট্‌চায্যি মশাই-এর মতন আত্মপ্রসন্ন দেশাত্মবোধ সর্বদাই স্মরণ করিয়া দিচ্ছে যে, আমরা সব আধ্যাত্মিক ; ফলে মন কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। বস্তুতন্ত্রবাদীদের সোশিয়ালিস্ট হবার সাহস আছে কি ? সামাজিক পরিবর্তনের ফলে দেশের মতিগতি কোন্ ধারে যাচ্ছে তার খতিয়ান শনিমণ্ডল কবে করবেন ? সবই নারায়ণ করছেন বলে আশ্বস্ত হলে চলবে না। বীর্যবান্ ভগবানের মুখ চেয়ে থাকে না। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি,প্রপীড়িত ব্যক্তি ধীরে ধীরে বুঝছে যে তার রচিত, কিংবা ধনীর, কিংবা ব্রাহ্মণের রচিত ভগবান স্বকল্পিত দুঃখের অবসান করতে পারেন, কিন্তু প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক দুঃখের অবসান করা সেই স্বকল্পিত ভগবানের ক্ষমতার অতিরিক্ত। নাটকের ছয়টি চরিত্রের কোনোটিও নাট্যকারের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে না। দরিদ্রবৎসল, প্রপীড়িতবৎসল ভগবান, হয় দরিদ্র ও পীড়িত মস্তিষ্কের, না হয় স্বার্থপর মস্তিষ্কের উদ্ভূত।

তরুণ দলের অনেকে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় রত হয়েছেন। দরিদ্র ব্যক্তির সেবকদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু দেশের আত্মার সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন তাঁরাই দরিদ্রের ভগবানকে খুঁজে বার করেছেন। যাঁরা নিজেদের আবিষ্কৃত দেশাত্মার উপাসনা করে ও পূজারী হয়ে অন্নের সংস্থান করেন, সাধারণত তাঁরাই সর্বদেশে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায়েৎ হ'ন। এঁরা সকলেই প্রায় মধ্যবিত্ত

সম্প্রদায়ের লোক। এঁরা যখন মুখ খোলেন এবং সেই মুখ থেকে যখন অনুকম্পার দুধ ক্ষরণ হয়, তখন সেই দুধের স্বাদ হয় একটু ঘোলের মতন। যে কোনো নামজাদা বিলেতী নভেলের পাতায় গরীবদের জীবনকাহিনী এবং বর্তমান মাসিক-পত্রিকায় বর্ণিত মুটেমজুর বেশ্যার জীবনকাহিনী পড়লেই বেশ বোঝা যায় তফাৎ শুধু আর্টের ক্ষেত্রে নয়, sincerity of feeling-এও। এ লেখায় মধ্যে মধ্যে এমন একটি patronising-এর সুর পাওয়া যায় যেটি সত্যকারের অভিজ্ঞ ব্যক্তির কলম থেকে আশা করা যায় না। এ ধরনের লেখা মন্দের ভাল। একধারে যেমন মজুরদের শিক্ষার অভাবে তুলসী গোঁসাই ও দেওয়ান চমনলাল নেতা হতে বাধ্য হয়েছেন, তেমনি বাধ্য হয়ে অধ্যাপকের দল ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মজুরসাহিত্য লিখতে শুরু করেছেন। আর একটি কারণে এই ধরনের বর্ণনার মধ্যে ভুল সুর থাকে। যে পরিমাণে যৌবন আদর্শবাদী, সেই পরিমাণে যৌবন দুঃখবাদী নয়। বুদ্ধদেব যাই থাকুন না কেন, বর্তমান যুগে খুঁজে খুঁজে দুঃখ বার করা এবং সেই দুঃখের সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাওয়া, নয় বিকারের চিহ্ন, না হয় এক ধরনের ভাববিলাস মাত্র। দুঃখ চোখের সামনে না এসে পড়লে, মনকে বিশেষ রকম ধাক্কা না দিলে, দুঃখকে তাড়াবার এবং উড়িয়ে দেবার চেষ্টা বিফল না হলে আর কেউ দুঃখকে গ্রহণ করে না। দুঃখকে বুঝে তাকে দূর করবার জন্য উপায় অবলম্বন করবার সঙ্গে যে সাম্য ও মৈত্রীভাব আসে, সেই ভাবই স্থির ও কার্যকরী, কিন্তু সে ভাব আনতে রীতিমত সময় লাগে। শিশুরা পর্যন্ত ভীষণ অর্থাভিমানী হয়। অনেক দেখে শুনে, অনেক পোড় খেয়ে, অনেক অভিজ্ঞতার পর, অনেক বিচারের ফলে মানুষ সত্যকারের জ্ঞানী হয়। সহানুভূতি স্থিরবুদ্ধির ফল, অর্বাচীনতার ফল নয়। যৌবনে দরিদ্র-নারায়ণের পূজা করা সাহিত্যের রোমান্টিসিজম্ ছাড়া সাধারণত অন্য কিছু নয়। শুধু তাই নয়, যেমন প্রেম শেষ হবার সময় সাহিত্য-সম্ভব হয়, রাগ থামলে ব্যঙ্গরচনা সার্থক হয়, তেমনি পরের দুঃখে কান্না বন্ধ হলেই ব্যথার সাহিত্য সম্ভব হয়। আমার মনে হয় মুটেমজুর বেশ্যাকে দেখবা-মাত্রই যে কান্না আসে, সে কান্না চোখের দোষেই। সত্যকারের দরদ আনবার জন্য সহানুভূতি ছাড়া কার্ল মার্কসের বই পড়তে হয়, তাঁর মত এদেশে কতখানি খাটে ভেবে দেখতে হয়, এককথায় কিছু বুদ্ধি খরচ করতে হয়। দেখেশুনেও যদি দুঃখ ঘোচাবার প্রবৃত্তি থাকে তাহলে পুরোপুরি সোশিয়ালিস্ট হতে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রীতিও উড়ে যাবে জেনে রাখা ভাল। দরিদ্র-নারায়ণ দেশমাতার ভীষণ শত্রু। দুটোর একটিকে ছাড়তেই হবে— না একটিকে রাখা চলে ? মাসিক-পত্রিকা পড়ে মনে হয় যে, নব্য-সাহিত্যিকবৃন্দ দুই-ই রাখতে

চান ? ভাবপ্রবণতার সরু গলিতে জুড়ি হাঁকান অসম্ভব।

সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সমাজ ও ধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির সূক্ষ্মপুরুষটি না বদলালেও তার মানসিক অভ্যাসগুলি বদলে যাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের বিবরণ চাই। সেই বিবরণই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হবে। তারপর অ-সাধারণ ব্যক্তির কথা— আর্টিস্টের কাজ। সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না।

১৩৩৫

বিশ্ব-কবি

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্ব-কথাটি সর্বদাই যুক্ত থাকে। কী অর্থে এই কথাটি প্রযোজ্য ভেবে দেখা উচিত। যাঁরা জ্ঞানী পাঠক তাঁরা দেখিয়ে দিতে পারেন কাব্যের কোন্ উপকরণ দেশ ও কালের অতীত, কোন্ পদ্ধতি সার্বভৌমিক, কোন্ লিখন-ভঙ্গি অমর। সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করে, তার উপাদানের ও উপাদান-সংযোগের চিরন্তন মূল্য যাচাই করা সাধারণ পাঠকের শক্তিতে কুলায় না। সকলেই কিন্তু একটা কথা বোঝেন, কবি হতে গেলেই দেশ ও কালের ভেতরে থেকেও তাদেরকে অতিক্রম করতে হয়, কবির কাছে তাঁর দেশ ও কাল উপায় মাত্র। এমন অনেক কবি আছেন যাঁদের কাব্য-বস্তু ও কাব্যাবস্থান আমাদের সুপরিচিত না হলেও তাঁরা আমাদের নিতান্ত প্রিয়। তাঁদের পরিমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের আপেক্ষিক অজ্ঞানতা আমাদের রস-গ্রহণের মাত্রা হ্রাস করে মনে হয় না। কিন্তু অন্য একটা দিক থেকে আমাদের কাছে দেশ ও কালের একটা বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে অন্তত দেখার আনন্দ হয়, যাকে চিনি না তার কাছে সংকোচ বোধ করি, তাকে আপন করতে সময় লাগে, অভ্যস্তকে আমরা সহজে গ্রহণ করি, অনভ্যস্তকে আমরা ভয় করি, নচেৎ অনিচ্ছায় গ্রহণ করি। আমাদের কাছে আমাদের দেশ ও কাল বন্ধুর মতনই পরিচিত। অবশ্য জ্ঞানের দ্বারা অপরিচিতও পরিচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে জ্ঞানলাভের জন্য শক্তি খরচ করতে হয়, মনকে নিবিষ্ট করতে হয়। শক্তির এই 'অপ'-ব্যবহার, এই 'অপচয়' সহজ-আনন্দ-উপভোগে বিঘ্ন উৎপাদন করে। কারণ, অন্তত পরিমাণের দিক থেকে বলা যায় যে, কোনো এক বিশেষ অবস্থার পক্ষে মানসিক শক্তি স্থির ও নিত্য। স্থূলভাবে দেখলেই মনে হয় যেন মন একটা বিশেষ ঘটনা-সমাবেশের জন্য একটি সাধারণ অবিভিন্ন শক্তি বিকিরণ করছে। অতএব উপযুক্ত জ্ঞানের দ্বারা আনন্দের মাত্রা বাড়ান সম্ভব হলেও, কবিতা পড়ে আনন্দ-উপভোগের মতো সহজ মানসিক কার্যের বদলে সাধারণ

পাঠক তার শক্তির মূলধনকে জ্ঞানার্জনের মতন অনিশ্চিত ব্যবসায় খাটাতে অনিচ্ছুক হয়। এই অপচয়ের অনিচ্ছা এবং পূর্ব পরিচিতের সাক্ষাৎজনিত সহজ-ভাব ও শক্তি-সংরক্ষণের সুবিধা ছাড়া সাধারণ পাঠকের কাছে দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতের অন্য কোনো বিশেষ মূল্য নেই। এর বেশি মূল্য যদি নাই রইল, তাহলে দেশ ও কালের অতিরিক্ত ও অতিক্রান্ত বিশ্বের একটি অর্থ হচ্ছে —দেশ ও কালের মধ্যাস্থঃ সাধারণ মানুষের নিকট কবির রস-সৃষ্টির সহজ-বোধ্যতা, সহজ-উপভোগ্যতা। বিশ্ব-কবি সর্বসাধারণের কবি, সহজ কবি।

জ্ঞানী পাঠকদের বিশ্ব থেকে বহিষ্কৃত করা যায় না। অধ্যাপকদের সম্বন্ধে দুই মত থাকতে পারে। প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসুর কাছে বিশ্ব-কথাটির অর্থ প্রকাশ পায় তুলনামূলক বিচারের ফলে। অর্থাৎ বিশ্বের এই তাৎপর্য অর্জন করতে হয়। এমন একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব তৈরি করা সম্ভব যার দ্বারা কবির প্রত্যেক কীর্তিকে সর্বদেশীয় ও সর্বকালীন রূপসৃষ্টির ধারার সম্পর্কে আনা যেতে যেতে পারে। বিনয়াবনত মনে জ্ঞানার্জনের ফলে সাহিত্য-রূপ সম্বন্ধে গোটা-কয়েক মূল তথ্য ধরা পড়ে। পৃথিবীর সব বড় কবিই গোটাকয়েক সাধারণ গুণ ও নিয়ম মেনে চলেন। বাস্তবিক পক্ষে নিয়ম নেই, কিন্তু সুবিধার জন্য সাধারণ গুণগুলিকেই নিয়ম বলা হয়। কয়েকটি গুণের উল্লেখ রসিক সমালোচক করে থাকেন, এই যেমন,প্রত্যেক কবি ও আর্টিস্টের অনুভূতি নিতান্তই গভীর ও সত্য হবে, সেই গভীর ও সত্য অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করতেই প্রত্যেকেই সুসমর্থ হবেন, পাঠকের মনে সেই সব অভিজ্ঞতাকে পুনর্জীবিত করতে প্রত্যেকেই পারবেন ; অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে পাঠকের মনের ও নিজের সৃষ্ট রূপের একটা মিল থাকবেই থাকবে। অতএব কী রকম ভাবে কাব্যের ও আর্টের সাধারণ নিয়মাবলী আর্টিস্ট ও কবির রচনায় আত্মপ্রকাশ করছে জ্ঞানী পাঠক তাই দেখবেন। তুলনামূলক বিচার করে সেই প্রকাশকে বোঝবার ও বুঝে আনন্দ পাবার প্রয়াসের মধ্য দিয়েই বিশ্ব-কথাটির অন্য একটি অর্থ সার্থক হতে পারে। প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে বিশ্ব-কথাটি যে ইঙ্গিত বহন করে, সেটি হচ্ছে শ্রদ্ধা, তুলনা-মূলক বিচার, এবং তারই ফলে 'সৎ'-সাহিত্যের চিরন্তন লক্ষণ-নির্ধারণ।

পূর্বেই বলেছি— একমাত্র সুবিধার জন্যই আর্টের সাধারণ লক্ষণগুলিকে নিয়ম বলা যেতে পারে। নিয়ম বললেই আইন-কানুন কিংবা নীতি, অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের কথা মনে হয়। এই রকম নিয়মে আর্টিস্টের স্বাধীনতা খর্ব হয় মনে করা স্বাভাবিক। কে না জানে আর্টিস্টকে, কবিকে কেবলমাত্র ঐতিহ্যের সম্পর্কে এনে তার সৃষ্টিকে বিচার করলে, তার অন্য দিকটা, অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার ব্যক্তিগত সত্তার দিকটা ফাঁক পড়ে যায়? ঐতিহ্যের এই প্রকার ঐকান্তিক

ধারাবাহিকতার ধারণার দ্বারা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করা সম্ভব হলেও সে উপায়ে সৃষ্টি-রহস্যের একটি মূল কথা প্রকাশ পায় না। সৎ-সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণগুলিকে নিয়ম করা শুধু সুবিধাজনক বলে এবং তারই ফলে নিয়মের ধারাবাহিকতা আর্টিস্টের স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যকে অনেক সময় বাধা দেয় বলে, রস-সৃষ্টির ও রসোপভোগের অন্য একটি ঐক্য-বিধায়ক মূল তত্ত্বের সন্ধান করা দরকার। (রবীন্দ্রনাথ সে সন্ধান নিজেই দিয়েছেন)। মূল তত্ত্বটি হলো পার্সন্যালিটি। ব্যক্তিত্বের এই সংজ্ঞাটিতে সৃষ্টির ভেতর ও বাইরের প্রধান তথ্যগুলি সূচিত হয়, ভেতরের সৃষ্টি-চাতুর্য এবং বাইরের সৎ-সাহিত্যের লক্ষণগুলি। কারণ, পাত্রই দেশ ও কালকে ঐতিহ্যের ধারা প্রাণবন্ত করে অতিক্রম করে। পাত্রটি শুধু কোনো ব্যক্তি-বিশেষ নয়, বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তার অন্য গুণ যথেষ্টই রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য-বিকাশের ধারার মধ্যেও এমন অনেক সাধারণ গুণ রয়েছে যাদেরকে ব্যক্তির সম্পর্ক থেকে পৃথক করে বাহ্য বিষয় বলে গণ্য করা অসম্ভব নয়, বরঞ্চ স্বাভাবিক— কারণ, প্রত্যেক সৎ-পুরুষের কার্যই হচ্ছে নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে সর্বাত্মক করে তোলা। পার্সন্যালিটির প্রধান লক্ষণই এই। (রবীন্দ্রনাথ একেই ক্রিয়েটিভ্ ইয়ুনিটি বলেন)। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের মধ্যে মৈত্রীভাব রয়েছে। সে বিকাশের গোড়ার কথা এই— বিশেষের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির প্রেরণায় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সকলের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে, এবং সেইজন্য ঐক্য ও বিশ্বজনীনতা লাভ করে। পাঠকের বৈশিষ্ট্য যত বিচিত্রই হোক না কেন, আর্টিস্টের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশে তাঁর বিকাশধারায় এসে, তাঁর ও অন্যের থেকে নিজের পার্থক্যটুকু হারিয়ে ফেলে, একত্রে সম্পূর্ণ হয়। এই ধরনের সম্পূর্ণতাই হলো ব্যক্তি-বিশেষের সফলতা। এক কথায়, আর্টিস্টের সৃষ্টিতে ছোট আমিটা পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়ে বড় আমিতে পরিণত হয়। প্রত্যেক পাঠকেরই অভ্যন্তরে, নিজের অজানিত অবস্থায়, এই নতুন সৃষ্টি চলতে থাকে। অতএব এই সৃষ্টি কারুর নিজের সম্পত্তি নয়। তবুও লোকে ভাবে অন্য কথা— কেননা, সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রথম অভিজ্ঞতা তার নিজত্বটুকু নিয়ে। যদিও হয়ত কোনো সম্পূর্ণ অর্থাৎ সৎ-পুরুষের সাহায্যে সেই নিজত্বকে লোপ পাওয়ানই তার শেষ অভিজ্ঞতা। কবির ব্যক্তিত্ব সমুদ্র-বিশেষ, তার মধ্যে সকল বিশেষের নদ-নদী সম্পূর্ণ হতে পারে। তিনি সৎ-পুরুষ, অতএব তিনি বিশ্বের।

পূর্বোক্ত মন্তব্যগুলি সাধারণের বেলা এবং রসগ্রাহী জ্ঞানী পাঠকের বেলাতেও খানিকটা খাটে। সত্য কথা এই যে, মানুষই মানুষের প্রধান আগ্রহের বস্তু, তার আনন্দের প্রধান উপাদান। প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে

সম্পূর্ণ ও সার্থক হবার তাগিদ রয়েছে— সে জানুক, আর নাই জানুক— যে জানে, সেই তাগিদ সম্বন্ধে যে সচেতন, সেই জ্ঞানী, যে জানে না সেই সাধারণ। সাধারণ মানুষ পরিপূর্ণ হতে পারে না, অন্ধ-জীবনস্রোতে নিজত্বটুকু হারিয়ে ফেলে। এর জন্য তার বরাবরই একটা ক্ষোভ থেকে যায়। সে ক্ষোভ যখন ঈর্ষাতে পরিণত না হয়, তখনই সাধারণ ব্যক্তি কোনো সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে আশা মেটায়, ক্ষতিপূরণ করে। এটা হয়ত বুদ্ধিমানের কার্য নয়, কিন্তু বুদ্ধি-নামক ইন্দ্রিয়টা সকলের থাকে না, যাদের থাকে তারা আর্টিস্টের অসম্পূর্ণতা দেখাতেই ব্যস্ত। যাদের বুদ্ধি মার্জিত,তাঁরা সৎ-সাহিত্যের লক্ষণ নিরূপণ করতেই ব্যস্ত। সাধারণে অ-সাধারণের মধ্যে নিজের আশা মেটান ; নিজের অপূর্ণতার ক্ষতিপূরণ করা অন্তত বহির্মুখী স্বভাবের রীতি। যাঁরা অন্তর্মুখী তাঁরা একটি মহান্ ব্যক্তিত্বকে নিজের মধ্যে শ্রদ্ধাসহকারে এনে নিজেকে সম্পূর্ণ করতে প্রয়াসী হন। উভয় ক্ষেত্রেই পাত্রের বিশেষত্বটুকু বড় আধারের আশ্রয়ে সার্থক হয়। অতএব এই একীকরণ শুধু দেশ, কালের বাইরে নয়, নিজ পাত্রেরও বাইরে। আর্টিস্টের ব্যক্তিত্ব যদি সাধারণের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের তাগিদ কিংবা ক্ষোভ মেটায়, তাকে প্রকাশ করেই হোক, কিংবা তাকে হৃদয়ে ধারণ করেই হোক, তাঁর সৃষ্টি যদি আমাদের সৃজন-শক্তিকে প্রবুদ্ধ করে, তাহলে সেই আর্টিস্টকে বিশ্ব-কবি নাম ছাড়া অন্য নাম দেওয়া যায় না। ব্যক্তিত্ব-বিকাশই হলো বিশ্ব-কবির মর্মকথা।

অবশ্য একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতিভাশালী ব্যক্তির পার্থক্য অনেক। সাধারণের আধার ছোট, তার প্রেরণা দুর্বল, তার তাগিদের জোর কম। কিন্তু কোথায় যেন একটা সুনিশ্চিত মিল থাকেই থাকে। প্রতিভাশালী ব্যক্তির মধ্যে, যে জীবনী-শক্তির লীলা সকলের মধ্যেই চলেছে, সেই জীবনী-শক্তিরই অভিব্যক্তি পুনরাবৃত্ত হয় দ্রুততরভাবে, সংক্ষেপে, অথচ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে। প্রত্যেক জীবেরই জীবনে তার শ্রেণীগত ইতিহাসের পুনরাভিনয় হয়। যে সব জীবের জন্য শ্রেণীর উন্নতি সাধিত হয়, তার মধ্যে জীবনী-শক্তি চৌদূনে চলে। মনে হয়, যেন জীবনের তাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে, সুর ও লয় ভ্রষ্ট হয়েছে, নতুন কিছু সংসাধিত হচ্ছে। মানসিক জগতেও এই নিয়মের বড় বেশি ব্যতিক্রম হয় না। মনের ইতিহাসে, সাধারণ মানুষ এখনও যৌবনে, অর্থাৎ সভ্যতার স্তরে পদার্পণ করেননি। এখন যদি দেখি, কোনো মানুষের সৃষ্টিতে, তাঁর সর্বাঙ্গে সভ্যতার রাজটিকা পরান, শুধু তাই নয়, মনের ভবিষ্যৎ গতির একাধিক ইঙ্গিত তাঁর প্রত্যেক কর্মে ও চিন্তায় নির্দিষ্ট হচ্ছে, তখনই সে মানুষের সঙ্গে বিশ্ব-কথাটি জুড়ে দিতে পারি। কেননা, মানসিক বিবর্তন ঘটছে, এবং ঘটছে

বলেই সেটি কোনো বিশেষ যুগের ও দেশের সম্পত্তি নয় ; কেননা স্থান ও কাল সেই বিবর্তন বোঝবার সুবিধাজনক সংকেত মাত্র। এই মানসিক বিবর্তনের গতিকে নিজের আধারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করান, কিংবা তার শক্তিতে শক্তিমান হওয়া যদি প্রত্যেক পাত্রের চরম সার্থকতা হয়, তাহলে স্বাতন্ত্র্য হয়ে ওঠে বিশ্বজনীনতা। এবং যে ব্যক্তির মধ্য দিয়ে এই গতি সুন্দরভাবে, অবলীলাক্রমে প্রবাহিত হচ্ছে, তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্ব-মানব।

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভিতর দিয়ে প্রত্যেকেই, দেশ ও কাল নির্বিশেষে, নিজের বিকাশমর্ম উপলব্ধি করতে পারে। এতে নিজের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয় না, নিজের শক্তির অপচয় হয় না, সে বিশেষ শক্তি সঞ্চিত, সার্থক, সম্পূর্ণ হয়। প্রত্যেকের বিশেষত্ব তাঁর বিশেষত্বের মধ্যে, তাঁর বিরাট বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে শতদলের মতন ফুটে উঠতে পারে। প্রত্যেকের স্বভাব তাঁর সৃষ্টিতে চরিতার্থ হয়। স্বভাব কথাটির দুটি অর্থ আছে —একটি, মাত্র প্রকৃতির দান, যেটি স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি, অন্যটি সেই দানেরই সার্থক মূর্তি, পরিপূর্ণতা, সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সুন্দর ইমারত। এ দু'টি অর্থ যেখানে এক হয়ে যায় সেখানেই সার্বজনীন পরিমাণ, সর্বাঙ্গীন পরিণতি ও উন্নতি সূচিত হয়। (যেমন য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের পরিমাণ, পরিণতি ও উন্নতি সূচিত হয়েছিল রোমান জুরিস্টদের সাধারণ ও প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে।) সেইভাবে যদি আমাদের দেশাত্মবোধ তাঁর বিশ্ববোধে পরিণত হয়, তাহলে তিনি কেবল আমাদের দেশের নন, সকল দেশের। যদি বর্তমান সভ্যতার গতি ও উন্নতি তাঁর চিন্তায় ও কর্মে নির্দিষ্ট হয়, তাহলে তিনি ভবিষ্যৎকালের, অর্থাৎ বর্তমানের সম্পর্কে সকল কালের। যদি তাঁর রচনার মধ্যে আমাদের দেশের ও অন্য দেশের রস-সৃষ্টির ধারার প্রধান পর্যায়গুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সেই ধারার ভবিষ্যৎ গতি ইঙ্গিত করে, তাহলে তিনি কেবল আমাদের ও অন্যদের দেশের ঐতিহ্যে আবদ্ধ নন— তিনি হ'ন, সৎ-সাহিত্যিক। যদি তাঁর সঙ্গীত-রচনায় আমার সঙ্গীত-প্রিয়তার, আমাদের ও অন্যদেশের সঙ্গীত-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ লক্ষ করি তাহলে তিনি শুধু আমাদেরও নন, তাঁদেরও নন, তিনি বিশ্বের। যদি তাঁর কাজের মধ্যে জীবনের সারধর্ম অনুস্যূত হচ্ছে দেখতে পাই, তাহলে তিনি সর্ব-জীবনের। যদি তাঁর মধ্যে সাধারণ মানুষের আশা-ভরসা, চিন্তা, কর্ম ও ধর্মের নিষ্কর্ষ-সাধন হচ্ছে মনে হয় তাহলে তিনি সর্বসাধারণের।

এই রস-সৃষ্টিধারার, এই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের, এই জীবন-ধর্মের পুনরাবৃত্তির দিক থেকে তাঁকে আমি বিশ্বকবি বলি। লোকেও তাই বলে। অতএব এই

আখ্যা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্ব-জ্ঞান বাড়ান, সে দায়িত্ব-জ্ঞান দেশ, কাল ও পাত্রের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না হতে দেওয়া, এইটাই হলো বিশ্ব-কথাটির প্রকৃত অর্থ-জ্ঞান। নামকরণের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড দায়িত্ব লুকান থাকে। সে সম্বন্ধে সচেতন হলে নাম-ধারীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখান হয়। তাঁর কর্তব্য তিনি করেছেন, এখনও করবেন— তাঁর দায়িত্ব তাঁর নিজের প্রতি। তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই বিশ্ববোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া। লিখে, চিন্তা করেই তিনি ক্ষান্ত, আমাদের সাধনার কিন্তু অবসান নেই। রস-সৃষ্টি করে তিনি হন সারা, মোদের কিন্তু এই হলো শুরু।

১৩৩৯

দেশের কথা

আমাদের ছেলে বয়সে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, গুরুজনেরাই রাজনীতির চর্চা করতেন। সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকখানায় বসে হোইটহলের আদ্যশ্রাদ্ধ হতো। সে শ্রাদ্ধসভায় গবর্নমেণ্টের legislative executive এবং judicial functions-এর পৃথকীকরণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণোচিত কূটতর্ক উঠতো। সে তর্কে বিলেতী শ্রুতি-স্মৃতির বিচার চলত। এবং সে বিচারের শেষে ব্রাহ্মণ-বিদায়ের ঝামেলা সহ্য করতে হতো অন্তঃপুরস্থ মহিলাদের। আমার বিশ্বাস, সেই থেকেই ভারত-ললনা 'সাধের ঘুমঘোর' থেকে প্রথম জেগে উঠলেন। বৎসরের শেষে, বড়দিনের ছুটিতে কংগ্রেসের ডেলিগেট হয়ে কর্তারা দেশভ্রমণে বেরুতেন। বৎসরারম্ভের পর একমাস পর্যন্ত ফিরোজসা মেটা, সুরেন্দ্রনাথ, দিনসা ওয়াচা ও মালব্যজীর ইংরেজী বক্তৃতার তুলনামূলক বিচার চলত। কেউ বলতেন মেটা সাহেবের আওয়াজ সুরেন বাঁড়ুয্যের চেয়ে গম্ভীর,কিন্তু মালব্যজী কী গোখ্‌লের মতো অত মিষ্টি নয়। কেউ বলতেন লালমোহনের ইংরেজী সবচেয়ে ভাল ছিল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতেন, বাঙালির কাছে কেউ লাগে না, কী বুদ্ধি, বিদ্যায়, অর্থাৎ ইংরেজী বক্তৃতায়।

তারপর স্বদেশী যুগ। লাল-বাল-পাল তখন দেশের দেবতা, অরবিন্দ শুধু দার্শনিক। ত্রিমূর্তির পূজা জোরে চলল। যুবার দল সামনে এলেন, প্রৌঢ়েরা পিছিয়ে পড়লেন। সকলের মুখে বন্দেমাতরং, হাতে আনন্দমঠ, পরনে জোলার ধুতি, পকেটে যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরং, যেথায় সেথায় সভা-সমিতি, সকালে বিকালে স্বদেশী গান ও মিছিল,রঙ্গমঞ্চে প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, মুখের ও কলমের ভাষা তেজোময়, ডেপুটি মশায়দের গৃহবিচ্ছেদ, উকিলদের জয়জয়কার। আমরা, ছেলেছোকরারা তখন মেতে উঠেছি, প্রধান কাজ আমাদের ভলাণ্টিয়ারি করা,— ভোরবেলা লাঠিখেলা, দুপুরবেলা স্কুল পালিয়ে গানের মহলা দেওয়া, বিকেলবেলা দেশী কাপড় ফিড়ি করা, রাত দশটায় বাড়ি ফেরা। তখন আমাদের আকাশে-বাতাসে মাদকতা, প্রাণে আশা, মনে

আবেগ। স্বদেশী বস্ত্রালয়, স্বদেশী ফ্যাক্টরি, স্বদেশী স্কুল, স্বদেশী সাহিত্য, স্বদেশী গান, স্বদেশী ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বদেশী মন, স্বদেশী যুগ।

ধূমকেতুর মতন হঠাৎ কোথা থেকে বিপ্লবপন্থীরা এসে হাজির হলেন। ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে উঠল। রিজলীসার্কুলারের দোহাই-এ স্কুলের মাস্টার ও বাড়ির কর্তারা আমাদের সঙ্গীবিচার শুরু করলেন। এধারে, উত্তর বঙ্গের জনকয়েক ছেলে স্কুল ছেড়ে কলকাতায় এসে হাজির। জাতীয় বিদ্যালয় তৈরি হলো, জনকয়েক ভাল ছেলে সেখানকার অধ্যাপক হলেন। তাঁরাই হলেন আমাদের আদর্শ। তাঁদেরই মধ্যে একজনের ভাষায় বলতে গেলে, কর্তারা গেলেন 'ভড়কে'। কর্তারা স্বদেশী ব্যবসায়ে কিছু টাকা দিয়েছিলেন, সে টাকা আর ঘরে এলো না। লক্ষ্মী ছেলেদের হাতে কাজ কমে এল, তাই দলে দলে বিজ্ঞান পড়তে শুরু করলাম। কলেজে বিজ্ঞানের ক্লাসে ছেলে ধরে না। সন্ধ্যাবেলায় এঁরাই নরনারায়ণের সেবা করতেন নৈশ বিদ্যালয়ে পড়িয়ে। জনকয়েক পিক্‌রিক্ অ্যাসিড নিয়ে পরীক্ষাও করতেন। যাঁরা বিজ্ঞান পড়তেন না তাঁরা ভাল ভাল চাকরি নিলেন। যাঁরা বাকি রইলেন কিংবা যাঁদের পুরাতন ইতিহাস 'নির্মল' নয়, তাঁরা হলেন ব্যবসায়ী কিংবা রিসার্চ-স্কলার ও অধ্যাপক।

তারপর গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। তখন যুদ্ধ বেধেছে, যুদ্ধের বাজারে দেশ বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করল। বাংলা দেশের প্রাদেশিক কৃষ্টির অভিমান ভাঙতে আরম্ভ হলো। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ তখন জেগে উঠছে, তারা বাঙালির দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি পেলে। 'নিখিল-ভারতীয়তা'র হালকা হাওয়ায় তারা নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। জালিয়ানওয়ালা-বাগের পর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলো। বাংলার অন্তরীণ নীতিটা ছিল দেওয়ানি মোকদ্দমার মতন, পাঞ্জাবের কাণ্ডটা হলো ফৌজদারি মামলা, তাই অতি সহজেই লোকের মন উত্তেজিত হলো। নতুন আন্দোলনে বিস্তর লোক দেশের জন্য 'একটা কিছু' করবার সুবিধা পেলে। স্বদেশী যুগে যে প্রাচীন ভারতের রঙিন ছবি আঁকা হয়েছিল, আজ তারই আভাস পাওয়া গেল— সেই ত্যাগধর্মে, সেই সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনে, সেই ধর্মপ্রাণতায়। কিন্তু ইংরেজী-সভ্যতায় অনুপ্রাণিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, মোহ না কাটাতে পেরে, প্রাণ খুলে অ-সহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে পারলেন না। বুঝেসুঝেই গান্ধীজী তাঁদের সাহায্য চাননি। বেকারের দল বড়ই মুস্কিলে পড়লেন, আন্দোলনে যোগ না দিলে দেশদ্রোহী হতে হয়, তাই যোগ দিতে হলো, আধখানা প্রাণ ও সিকিখানা মন নিয়ে। এই অবস্থা থেকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে

বাঁচালেন চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল, স্বরাজ-দল তৈরি করে। ঘরের মধ্যে থেকেই ঘর ভাঙার ফন্দী আমাদের মনোমত, তাই আমরা স্বরাজিস্ট্ হলাম।

কিন্তু বেশিদিনের জন্য নয়। বুদ্ধির, বিশেষত, আমাদের দেশের শিক্ষা-দ্বারা মার্জিত বুদ্ধির এক-চতুর্থাংশের এমন কোনো সাধ্য নেই যে ভাবাবেগকে রুদ্ধ করে। ভাবাবেগ জোরে বইল ধর্মের ভিতর দিয়ে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এতদিন যে বন্ধন ছিল সেটা ছিল মাটির বন্ধন, এখন থেকে যে ঐক্য তৈরি হতে লাগল, সেটা চেতনার স্তরের। দু'দলই ধর্ম ও পলিটিক্সের মধ্যে পার্থক্যটুকু অ-স্বীকার করলেন। দু'দলই ন্যাশালিস্ট, কিন্তু একদল ভারত-বর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বিদেশে জাতীয়তার ধর্ম-কেন্দ্র খুঁজতে ব্যস্ত হলেন। কংগ্রেস আর গান্ধীজী এক হয়ে গেল। তার পর, তিনি মহাত্মা কী সর্বশ্রেষ্ঠ পলিটিসিয়ান এই বুঝতে বছর পাঁচেক কাটলো! দেশের ইতিহাসে ও-কটা বছর নিমেষ মাত্র। শেষে সিদ্ধান্ত হলো, ধর্মই হলো তাঁর পলিটিক্স্ আর পলিটিক্সই হলো তাঁর ধর্ম। যুগান্তরের বাণী এতদিনে সার্থক হলো, মূর্ত হলো। ভাগ্যিস সাইমন-সপ্তক এলেন, তাই আমরা বিরোধের নতুন বিষয় পেলাম। অকিঞ্চিৎকর আইনকানুনের নিষ্ফল তর্ক-বিতর্ক নিয়ে দেশ বেশিদিন খুশী থাকতে পারে না। পুরানো কর্তার দল তখন প্রায় গত, না হয় অবসর গ্রহণ করে ধর্মচর্চা করছেন কিংবা কীর্তন গাইছেন। যুবার দল তখন জেলে গিয়ে ভুগছেন কিংবা ফিরে এসে গৃহস্থালীতে মন দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন মারা গেলেন, মতিলালজী ছেলের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। Holy Ghost তখন সম্পূর্ণ-ভাবে Son-কে আশ্রয় করবার সুবিধা পেলেন। কামাল পাশা খিলাফৎ আন্দো-লন চালাতে দিলেন না। বাইরের বিরোধ-প্রণালী বন্ধ হয়ে বিরোধের আবেগ ঘরের মধ্যে চলে এল। ধর্মের নামে চাকরি ও ভোটসংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শেষে দাঙ্গাহাঙ্গামা পর্যন্ত চলল খুব। মহাত্মাজী দেশকে বিরোধের নতুন প্রণালী দেখিয়ে দিতে আত্মনির্বাসনদণ্ড তুলে নিলেন। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করলেন না। তবুও তাঁর প্রভাব অপ্রতিহতই রইল। তাঁর এই পুনরাভিষেকের কথা সকলেরই মনে আছে। তার পর জোরজবরদস্তি, সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স, বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ার জন্য বাঙালির রাগ ও অভিমান, এলাহাবাদ পণ্ডিতবর্গের নেতৃত্ব, বম্বে, আমেদাবাদ, কলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের কবলে মহাত্মাজী ও মদনমোহনের আত্মসমর্পণ, গোলবৈঠক, মহাত্মাজীর বিলেত যাত্রা, সেখানকার নিষ্ফলতা, রাজা-রাজোয়াড়াদের আকস্মিক দেশপ্রীতি, সাম্প্রদায়িক গৃহবিবাদ, খাজনা না দেওয়ার হুকুম-জারির জন্য কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করা-এ সব ত'

কালকার ঘটনা।

আজকার অবস্থা এই, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট যা দেবেন আমাদের তাই নিতে হবে। গৃহবিবাদের মীমাংসার ভার দিয়েছি তাঁদের উপর, তাঁরা অর্থে কনসারভেটিভ, কেননা মন্ত্রীরা ঐ দলের ক্রীড়নক মাত্র। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতারাই জেলে, যুবক-সম্প্রদায় চুপ্‌চাপ্‌, মজুরের দলে মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ করছেন, হিন্দুরা অভিমান করে বসে আছেন, মুসলমানরা আশান্বিত ও উৎফুল্ল হয়েছেন, পঞ্চমরা ঠিক করতে পারছেন না কোন্ দলে যাবেন, নরম-পন্থীরা একটু চড়া স্বর ধরেছেন তাঁদের খাতির কমে যাচ্ছে বলে। এক শুধু স্ত্রীজাতি মাথা ঠাণ্ডা রেখে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গোটাকয়েক মূলকথা প্রস্তাববদ্ধ করেছেন। এবং রাজ্য-চালকেরা ও বিলেতী খবরের কাগজওয়ালারা হাসছেন। অনুষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস ভেঙে গেলেও কংগ্রেস না হলে কোনো বন্দোবস্ত গ্রাহ্য হবে না এই ধারণাই হলো ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল ইতিহাসের মোটা কথা।

এ ছাড়াও আমাদের ইতিহাসের অন্য ধারা আছে। কিন্তু চোখে পড়ে না, সে ধারা মরা নদীর মতন ঝির ঝির করে বইছে। রামন নোবেল-প্রাইজ পেলেন, মেঘনাদ, সত্যেন নতুন চিন্তা করছেন, রবি ঠাকুর নতুন বই লিখলেন, ভাতখাণ্ডের স্বপ্ন আংশিকভাবে সার্থক হলো, মজুররা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে, বারদলী ও যুক্তপ্রদেশে চাষীরা নিজেদের স্বার্থ বুঝছে, বাংলা দেশে সাহিত্যের নেশা ধরল, দিল্লীতে Council of Agricultural Research খোলা হলো, পুণা ও কোয়েম্বাটুরে নতুন শস্যের পরীক্ষা আরম্ভ হলো, লোক-সংখ্যা বেড়ে চল্‌ছে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় চাকরি না পেয়ে, আন্দোলনে যোগ না দিতে পেরে অনাসৃষ্টির জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন কিংবা চুপচাপ্‌ বসে আছেন, এসব ঘটনাগুলি চোখে পড়ছে না। কেন চোখে পড়ছে না তার কারণ বার করতে গেলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হতে হয়। কিন্তু একটু বাইরে থেকে কারণ খুঁজতেই হবে, নচেৎ ভবিষ্যৎকে গোটাকয়েক অন্ধ শক্তির হাতে ফেলে দিতে হবে। হয়ত, কী জাগ্রত, কী অন্ধ শক্তি কিছুই নেই। তাই যদি হয়, তাহলে যা হচ্ছে তাই ভাল হচ্ছে মনে করে সুখনিদ্রায় বিভোর থাকাই একমাত্র উপায়!

অল্প কথায় আমি এই কারণগুলি ইঙ্গিত করছি।

(১) পলিটিক্‌সই হয়েছে আমাদের একমাত্র ভাব, একমাত্র ধর্ম।

(২) কিন্তু পলিটিক্‌সকে আমরা জ্ঞানের বিষয় করিনি, ভাবরাজ্যেই রেখেছি। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন সত্যকারের **anti-intellectual** ভাববিলাস মাত্র।

(৩) প্রধানত এই জন্য সে আন্দোলনের সঙ্গে নানা অবান্তর জিনিস মিশেছে, যেমন ধর্ম, মেয়েলী অভিমান, এক কথায় অ-বাস্তবতা।

(৪) এই আন্দোলনের যতটুকু চেতনার ক্ষেত্রে, ততটুকুতেই বিরোধ। সর্বদাই বিরোধের বস্তুকে একমাত্র সত্তা বিবেচনা করা বুদ্ধির একমাত্র অভ্যাস হয়ে উঠেছে। এ লক্ষণগুলি শুভ নয়। ভবিষ্যতে যদি এই মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহলে ক্ষতি বই লাভ হবে না। কোন্ ধরনের ক্ষতি হবে প্রবন্ধের শেষে আভাস দেব।

প্রথমেই একটা আপত্তির জবাব দিই। অনেকে বলেন, এ ছাড়া উপায় ছিল না। এক কথায় তাঁদের মতে, কারণগুলি ঐতিহাসিক। কিন্তু ইতিহাসের দৈবশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে আমার ভীষণ আপত্তি। আমাদের পরাধীনতাই হলো একমাত্র fact। এটা এতদিনের পুরানো fact যে সেটা স্বাভাবিক ঘটনা, যেন দিনরাত্রির মত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সভ্য মানুষ স্বাভাবিক ঘটনাকে কেবল স্বাভাবিক বলেই ছেড়ে দিচ্ছে না। তাকে ভাঙছে, নতুন করে গড়ছে। আমাদের পরাধীনতার মতো কোনো স্বাভাবিক ঘটনার শক্তিকে ও কার্যকে প্রত্যাহত করতে হলে নতুন কোনো ইতিহাস তৈরি করতে হবে। আমরা পরাধীন এটা fact, আমাদের স্বাধীন হতে হবে— এটা হলো দায়িত্বপূর্ণ event। শুধু তাই নয়। ধরা যাক fact ও event-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবু পরাধীন হলেই যে ভাববিলাসী হতে হবে, কিংবা জীবনের অন্য সব মূল্যজ্ঞানকে জলাঞ্জলি দিতে হবে, কিংবা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, সর্বজন স্বীকৃত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, যে কোনো অস্ত্র, যেমন ধর্মকে প্রয়োগ করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। ধর্ম বলতে যদি ইংরেজী religion বোঝা হয়, তাহলে অবশ্য অন্য কথা। ধর্মের যে অর্থ এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে তার ইংরেজী প্রতিশব্দ spirituality, সেটা ব্যক্তিবিশেষের গুহ্য সম্পদ, তাকে অন্য কাজে লাগান যায় না। এ দু'টি জবাব ছাড়া অন্য একটি জবাব দেওয়া চলে। যদি কোনো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে সঠিক নিরূপিত করে, তাহলে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধটিকে mechanical sequence বলা হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধকে ঐতিহাসিক ধারা বলা চলে না। আমাদের ধারণা আছে যে, আমরা খুব ধর্মপ্রাণ, অর্থাৎ anti-mechanical, তবু কেন যে পরাধীনতার ইতিহাসই স্বাধীনতার পন্থা কেটে দেবে, অর্থাৎ যা ঘটেছে তাই ঠিক এবং সেইজন্যই যা ঘটবে তাই ঠিক হবে আমরা বিশ্বাস করি, বুঝি না। সত্যকারের ধর্মের মধ্যে পুরুষকারের স্থান আছে, ঐতিহাসিক দৈবের স্থান কম। স্রোতে গা ভাসানকেই যদি সাঁতার কাটা বলি, বিদেশী সভ্যতার বিপক্ষতা আচরণের জন্যই যদি ধর্মাত্মা

হই, তাহলে অবশ্য গত পঁচিশ বছরের ইতিহাসের সমালোচনা করা যায় না, সে ইতিহাসকে ভগবানের ইচ্ছা বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়।

এইবার আমি কারণগুলির ব্যাখ্যা করছি। আমার আশা এই যে, আমাদের জীবনের অন্য ধারাগুলো কেন চোখে পড়ে না বুঝতে গেলেই সে ধারাগুলি প্রকট হয়ে উঠবে। পলিটিক্‌সই যে আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং সেইজন্যই মন অন্য কোনো চিন্তাকে স্থান দিচ্ছে না তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। বোম্বাই অঞ্চলের হিন্দু জিম্‌খানা থেকে এবার কেউ বিলেতে ক্রিকেট খেলতে গেলেন না। সব বড় বড় খেলাতেই মোহনবাগানের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নির্বাচিত হবার জন্মগত অধিকার প্রকাশ্যে অস্বীকার করার বিপদ আছে। এমন খুব কম খেলা দেখেছি যেখানে দেশী টিম বিলাতী টিমের কাছে নিজের দোষে হেরে গিয়েছে— দর্শক স্বীকার করেছেন। খেলা দেখাই বাঙালির প্রধান কাজ, সেইখানেই এই। কলেজ ও স্কুলের মাস্টারদের বিশ্রামের ঘরে পলিটিক্‌স ছাড়া অন্য আলোচনা শুনেছি কিনা মনে হয় না। বড় বড় অধ্যাপকরা যখন রিসার্চ করেন, তখন তার মধ্যে জাতীয়তার ও দেশাত্মবোধের ছাপ না থাকলে, তাঁদেরকে আমরা দেশদ্রোহী ভেবে থাকি। Scientific কিংবা higher criticism যে একদম বিদেশী ও দাসমনোভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় এই ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করে একজন প্রবীণ অধ্যাপক আমার এক পরিচিতের একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। আমাদের শিক্ষক-সম্প্রদায়ের মনে, যেখানে আমরা পলিটিক্‌স্ ছাড়া অন্য চিন্তাধারার প্রবাহ আছে আশা করিতে পারি, সেখানেও এই জাতীয়তা কী সূক্ষ্মভাবে ও অলক্ষ্যে কাজ করছে দেখলে অবাক হতে হয়। ভারতবর্ষে জাতিবিভাগ আছে, কিন্তু সেটা পশ্চিমা সমাজের অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগের চেয়ে ভাল, বাল্য-বিবাহ আছে, কিন্তু তাতে অন্যান্য কুফলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আমাদের আধ্যাত্মিক গুহ্য-ধর্ম জীন্‌স্, এডিংটন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মতে বিজ্ঞানেরই চরম কথা। আমাদের চাষ-বাস, শিক্ষাপদ্ধতি সব কিছুই অন্য দেশের তুলনায় কত ভাল এ সব শুধু লালা লাজপৎ রায় কিংবা রজ আয়ার লেখেন না, এ সব কথা আমাদের পণ্ডিতবর্গকেও লিখতে হয়, নচেৎ রক্ষা নেই। অধ্যাপকদের মধ্যে বুদ্ধিমানরা বলেন যে, যেকালে আমরা ঐ সব রীতি, নীতি, পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, তখন ও সব আমাদের পক্ষে ভাল বলতেই হবে। এ তর্কটা খাটে জীবজগতে। মানুষের বেলা অবশ্য ঐতিহ্য কথাটি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যেও ফাঁকি কোথায় পূর্বেই দেখিয়েছি। ছবি ও গানে পলিটিক্‌স কতটা ছায়াপাত করেছে, অর্থাৎ দেশাত্মবোধ কতটা

প্রবেশ করেছে বিশদ করে দেখাবার অবসর নেই। অজন্তার পচা অনুকরণ করাকে আর্ট ভাবা, সঙ্গীতের উন্নতি অসম্ভব মনে করা, মাদুরা ও জগন্নাথের জবড়জং স্থাপত্যে গৌরব অনুভব, এর মধ্যে সৃষ্টির কোনো সম্বন্ধ নেই, আছে ভাবাবেগের, যার একমাত্র মূল্য থাকতে পারে রাজনীতির ক্ষেত্রে। বুদ্ধির এমন ফাঁকি অন্য দেশে সম্ভব কিনা জানবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এ দেশে চলছে ও চলা অন্যায় জানি। এ ধরনের স্বদেশিয়ানা সাহেবিয়ানারই ওপিঠ।

যখন পণ্ডিতদেরই এই অবস্থা, তখন অন্যে পরে কা কথা! যখন গায়ে ফোড়া হয়, তখন সব ভাবনাই সেই তাড়সে জর্জরিত হয়ে ওঠে। এটা স্বাভাবিক কিন্তু বুদ্ধির কাজই অ-স্বাভাবিক রকমের। অনেকে বার্গসঁ-এর নাম উচ্চারণ করে বলে থাকেন যে পলিটিক্‌স্ কেন সব ক্ষেত্রেই বড় কাজের পিছনে একটা প্রচণ্ড ভাবশক্তি, ভাবাবেগ থাকতে বাধ্য, এবং কেবল বুদ্ধি দিয়ে কোনো বড় কাজ করা যায় না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে চাই না, বিস্তর হয়েছে। আমি শুধু বলতে চাই, রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত আন্দোলনের মধ্যে অনেক কার্য-বিভাগ আছে। প্রথম, সমগ্র জাতিকে জাগিয়ে তোলা— এটা খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস, খুবই শক্ত কাজ ও একান্ত কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, দাবা খেলার মতো বিপক্ষকে মাৎ করা, যেটাকে হয়ত নিতান্ত ছোট কাজ মনে করা হয়। দু' কাজের দু'রকম রীতিনীতি, প্রথমটার strategy, দ্বিতীয়টির tactics। এ ছাড়া একটা কার্যতালিকা তৈরি করে সেই মতো সমগ্র শক্তিকে নিয়োজিত করার দিকও আছে। নিতান্ত মোটামুটি ভাবে বলা হয় যে, প্রথমটায় ভাবাবেগ, দ্বিতীয়টায় কূটবুদ্ধি এবং তৃতীয়টিতে কল্পনা, মার্জিত বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির বেশি প্রয়োজন। এ ধরনের ভাগ করা উচিত নয়। কেননা আমি জানি যে দেশকে জাগাতে হলেও বুদ্ধির আবশ্যক। একটি ছোটছেলেকে সন্দেশের লোভ দেখিয়ে, কাতুকুতু দিয়ে, আদর করে জাগান যায়, তার পর ছেলে কেবলই খুঁৎখুঁৎ করে, কোলে উঠে সন্দেশ চায়, আবার 'খোকা ওঠ, সকাল হয়েছে, মুখ ধুয়ে গাছ-পালায় জল দিতে হবে, তারপর হাঁসের কলম কেটে ছোট মামাকে একটা চিঠি লিখতে হবে, শুয়ে থাকলে চলবে না,' এই ধরনের কথা কয়ে, ধীরে, মধুরভাবে অথচ দৃঢ়স্বরে ছেলেকে জাগান যেতে পারে। আমাদের দেশের মন যদি জেগে থাকে তাহলে প্রথম উপায়ে। আমরা গান গেয়েছি 'সোনার বাংলা', 'এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি', 'আ মরি বাংলা ভাষা'; ম্যালেরিয়া তাড়ান, দেশকে গড়ে তোলা, বাংলা ভাষার দৈন্য দূর করা, এ সব নিয়ে বেশি মাথা ঘামাইনি। আমরা থিয়েটার করেছি প্রতাপাদিত্য, রাণাপ্রতাপ, ছত্রপতি, নট ও নটীর, নাট্যকার ও শ্রোতার দায়িত্ব না মনে রেখে; শোভাযাত্রায় যোগ

দিয়েছি ভিড় করার জন্য ; কংগ্রেসে বক্তৃতা দিয়েছি birth right, natural right জন্মগত স্বাধিকার নিয়ে, অধিকার অর্জন আমাদেরকে ব্যস্ত করেনি। খুব চেঁচিয়েছি, গানে, কবিতায়, বক্তৃতায়, লেখায়, কথাবার্তায়, অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করার বদলে তাদেরকে গণ-ঈশ ভেবে খোশামোদ করেছি, বড় বড় নেতাকে পূজা করেছি, তাদের ছবি ঘরে টাঙিয়েছি, মেয়েরা তাদের নামে শাড়ি পরেছেন, ব্যবসাদারেরা তাদের নাম নিয়ে ব্যবসা করেছেন, বিবেকানন্দ ঘৃত, আচার্য মিষ্টান্নভাণ্ডার, গান্ধী সিগারেট, সুভাষ পুস্তকালয়, ইদানীং আবার ডিক্‌টেটার করছি। শাঁকঘণ্টা ধূপধুনোর কিছুরই ত্রুটি নেই, আছে অভাব স্থির প্রতিজ্ঞার, grim determination-এর, ঋজুতার, obstinate rigour-এর, অভাব আছে, এখানেও বুদ্ধির প্রয়োজনস্বীকারে। একটা এত বড় দেশকে ঘুম থেকে তোলা খুব বড় সাধনা, সে সাধনা আমাদের নেই, আর নেই বলেই ভাতখাণ্ডেজীর চল্লিশ বৎসরের সাধনা, মেঘনাদ-রামন-সত্যেনের সাধনার, বেঙ্গল কেমিক্যালের রাজশেখর বসুর, যাদবপুরের কর্তৃপক্ষের, দয়ালবাগের সাহেবজী-মহারাজের সাধনার ইতিহাস অল্প লোকেই জানে, আর জানলেও তার খাতির নেই, যতটুকু খাতির আছে তাও ভারতবাসী বলে। এই সব সাধকদের আমাদের কাছে উপকারিতা মাত্র এই বলবার জন্য— 'হে ইংরেজ, হে পশ্চিমবাসী, হে বিশ্বের অধিবাসী, তোমরা যে বলতে আমরা কেবল অতীত গৌরব নিয়েই পড়ে থাকব, আমাদের বড় বৈজ্ঞানিক হবে না, শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি হবে না, এই দেখ এঁরা কী তোমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চেয়ে কিছু কম!'

দেশ জাগান ছেড়ে দিলে, পলিটিক্‌সের দাবির অংশটুকুতে শয়তানি বুদ্ধিরই দরকার। সেখানে 'জয়, অমুকের জয়'-এর স্থান নেই, আধ্যাত্মিকতার স্থান নেই, আছে সেখানে মারপ্যাঁচ, দরকষাকষি আপোস করবার ক্ষমতা, অর্থাৎ কূটবুদ্ধির প্রয়োজন। এ স্তরে সততা টিকতে পারে না, যদিও পারে, তাও সততা শ্রেষ্ঠ কৌশল হতে পারে এই হিসেবে। যে দেশে ন্যায়শাস্ত্র লেখা হয়েছে, সে দেশের কূটবুদ্ধি নেই বলা যায় না। কিন্তু রাজ্য-শাসন প্রণালী সংক্রান্ত কূটবুদ্ধিতে ইংরেজদের তুলনায় আমরা কোথায় পেছিয়ে আছি তার প্রমাণ হয়ে গেল গোলবৈঠকের সভাতে, মাত্র দু'টি চালে আমরা মাৎ হয়ে গেলাম। প্রথম, প্রধানমন্ত্রীকে সাইমন সাহেব যে চিঠি লেখেন, তার ফলে ভারতের দু'টি অ-সম উন্নত ও বিষমনৈতিক খণ্ড এক সূত্রে বাঁধা হয়ে গেল। আমাদের মহারথীরা যখন বিলেতে পৌঁছলেন তখন প্রথম শুনলেন যে রাজা-রাজোয়াড়ারা হঠাৎ দেশভক্ত হয়েছেন। তখন federalism সম্বন্ধে জানবার

প্রয়োজন হলো। শিবস্বামী আয়ার নামে একজন নরমপন্থী মাদ্রাজী (যিনি গবর্নমেণ্টের হয়ে মধ্যে মধ্যে ভোট দিতেন) ঐ সম্বন্ধে একটা বই লেখেন। বিলেত থেকে সেই বই পাঠাবার জন্যও তার আসতে লাগল। দ্বিতীয় চাল হলো কন্সারভেটিভদের দ্বারা আপত্তি তোলান, সে আপত্তির দ্বারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের ভয় দেখান, তাঁদের মনে 'এই বুঝি সব গেল' ভাবটি সৃষ্টি করা, তার পর ঠোঁটে জলপাইএর ডাল দিয়ে লর্ড রিডিং ও বেন সাহেবকে পাঠান, আপোস করবার জন্য মধুর বক্তৃতা, তার মধ্যে অমনি casually, গোটাকয়েক **safeguard**-এর কথা তোলা। এই হৃদয়-পরিবর্তনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, ও সেই উচ্ছ্বাসে **federalism** এবং **safeguards** দুইই গলাধঃকরণ করবার সম্মতি জ্ঞাপন করেছি। আমাদের মতো কৃতজ্ঞ জাত পৃথিবীতে দুটি নেই। 'এই বুঝি সব গেল' 'না, আঁ বাচলাম' 'ধন্যবাদ' এই হলো গোল বৈঠকের পলিটিক্স। এখানে যেটি সংঘটিত হচ্ছে; তাকে মাত্র ঘড়িতে লম্বমান দণ্ডের আন্দোলনের সঙ্গেই তুলনা করা চলে, যার axis হলো হোইটহলে, যার দোলনের শক্তি হলো আশা ও নিরাশা। মোদ্দা কথা দাবার চালে আমরা ঠকেছি, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ক্রাডক্ সাহেবের বক্তৃতা— 'নিতান্ত ভালমানুষ পেয়ে এই ধূর্তটি আমাদের ঠকিয়ে গেল!' এই বোকা সাজাটাই হলো পাবলিক্ স্কুলের প্রধান এবং ইংরেজদের পক্ষে সব চেয়ে উপকারী শিক্ষা।

গোলবৈঠকের কথাও ছেড়ে দিচ্ছি। শুনেছি, এই অসহযোগ আন্দোলন পৃথিবীকে বিরোধের একটা নতুন অস্ত্র দিয়েছে। কিন্তু অন্য দেশের বিপ্লবের ইতিহাস পড়লে, এবং এই 'নতুন' আন্দোলনের লক্ষণ দেখলে, লেনিন, কামাল পাসা, মুসোলিনি, রেজা খাঁর কীর্তিকলাপ ও আমাদের নেতৃবর্গের নেতৃত্ব তুলনা করলে মনে হয় যে আমাদের আন্দোলনের মধ্যে দোলনের অংশটুকুই বেশি! ক্রপট্‌কিনের আত্মজীবনী, মির্সকি কিংবা স্ত্রীর লেখা লেনিনের জীবনীর সঙ্গে মহাত্মাজীর আত্মকাহিনী পাশাপাশি পড়লে একটা ভীষণ পার্থক্য ধরা পড়ে। মহাত্মাজীর জীবনে প্রধান সুর হলো তাঁর নিজের মোক্ষ, ক্রপট্‌কিনের জীবনে প্রধান সুর হলো দলিতের উদ্ধার-সংকল্প। লেনিনের উদ্দেশ্য আরো সীমাবদ্ধ। যে অত্যাচার তাঁদের প্রত্যেকের সহ্য করতে হয়েছিল তার তুলনায় আমাদের জাতির সাধনা অ-বাস্তব ভাববিলাস মনে হয়। মনে হয়, আমাদের সংকল্প দৃঢ় নয়, নিতান্তই অস্থির, আমাদের চিন্তা নিতান্তই ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট। তাই হতে বাধ্য যতক্ষণ না তার পিছনকার ভাবাবেগ,ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা দমিত, প্রশমিত ও চালিত না হয়। কিন্তু নিছক ভাবাবেগকে দমন ও চালনা করবে কে? অবশ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁরা মধ্যবিত্তের শ্রেণীভুক্ত। এঁদের প্রকৃত

কাজ প্রোগ্রাম বাঁধা। বাংলা দেশে চিত্তরঞ্জনের প্রেরণায়, কংগ্রেস অফিস তৈরি হয়েছিল, কলকাতার করপোরেশনটা নিজেদের হাতে এসেছিল। আমাদের শহরে তারই ফলে প্রাথমিক শিক্ষার অভূতপূর্ব বিস্তার এবং নাগরিক দায়িত্ব প্রচারকল্পে একখানি উৎকৃষ্ট সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়েছিল, পাড়ায় পাড়ায় স্বাস্থ্য-সমিতিও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এছাড়া অন্যত্র, ভেবেচিন্তে একটা কোনো নতুন constructive policy খাড়া করা হয়েছিল বলে মনে হয় না। অনেকে বলবেন, আমাদের সময় ছিল না, সুবিধা ছিল না। তা নয়। পাছে কোনো প্রোগ্রাম বাঁধতে গেলেই বাধাবিপত্তি এসে পড়ে, এই ছিল আমাদের ভয়। জন্মরোধের কথা তুললে ধার্মিকরা সরে দাঁড়াবেন, শাস্ত্রের নামে আপত্তি তুলবেন, জমি ও আয়ের আপেক্ষিক সমভাগের কথা তুললেই জমিদার, বিত্ত ও বৃত্তিভোগীর দল পালিয়ে যাবেন— এই ধরনের ভয়কে শক্তির সঞ্চয় বলে এসেছি। তা ছাড়া শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের তরফ থেকে এও বলা চলে যে, বর্তমান আন্দোলনটা অনেকটা শিক্ষার ও শিক্ষিত সমাজের বিরোধী। এ শিক্ষার অর্থ অবশ্য বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি। কিন্তু যতক্ষণ না নতুন শিক্ষা-পদ্ধতির আবিষ্কার ও বহুল প্রচার হচ্ছে, ততক্ষণ এঁদেরকে নিয়েই চলতে হবে। (অ-সহযোগ আন্দোলনের তৈরি 'আশ্রম ও বিদ্যাপীঠে' শিক্ষা যে সম্পূর্ণ হয় না এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত)। নেতাদের বক্তৃতা থেকে মন্তব্য উদ্ধার করে আমার বক্তব্য সমর্থন করতে চাই না। মাত্র একটি উদাহরণ দেব। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যখন ১৯৩০ সালে জেলে যান, তখন তাঁর গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ, তাঁর মতের বিপক্ষে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ছাত্র-দের কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিতে পরোয়ানা জাহির করেন। উদ্দেশ্য হয়ত খুবই সাধু ছিল। ফলে তিনমাস প্রায় কলেজ বন্ধ থাকে, বিলেতী জিনিস কেনাও বন্ধ হয়, কিন্তু কোনোটাই ছেলেদের পিকেটিং-এর জোরে নয়, ভাড়া-করা চাষী-ভলান্টিয়ারদের জন্য। যে ছেলেরা কলেজ ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে গেল তারাই ফিরে এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করলে এই শর্তে যে, শিক্ষকেরা যেন অতিরিক্ত বক্তৃতা দিয়ে ঐ তিন মাসের ক্ষতিপূরণ করেন। আমরা ক্ষতিপূরণ করলাম। পরীক্ষার কিছু পূর্বে এবং পরের দিন থেকেই ছাত্রেরা পরীক্ষকদের কাছে এসে, মুখ তুলেই অনুরোধ করলে, 'এবার যখন ক্ষতি হয়েছে, তখন সোজা করে যেন খাতা দেখা হয়, এবং কিছু ফালতো নম্বর দেওয়া হয়।' এ অবস্থায় বুদ্ধি ও বুদ্ধিজীবীর স্থান কোথায়? স্থান একমাত্র পড়বার ঘরে, ল্যাবরেটরিতে। সেখানেও কান্নার আওয়াজ কানে আসে, তাই শুনে প্রাণটাও ব্যাকুল হয় স্বীকার করলে আশা করি দেশের নেতারা বিশ্বাস করবেন। তাঁদের একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি,— ঘটনাটি

ঘটে সেশনের প্রথম সপ্তাহে অর্থাৎ কলেজের কুশিক্ষা পাবার পূর্বেই।

যত রকম বুদ্ধি-বিরুদ্ধ ভাব এই আন্দোলনের মধ্যে এসেছে তার-মধ্যে সব চেয়ে সর্বনাশ করেছে ধর্ম। পুরাতন কংগ্রেসে ধর্মের স্থান ছিল না, ধর্ম তখন ব্যক্তিগত ছিল, লোকের গোপন সাধনা ছিল। কংগ্রেসের কর্তারা গোঁড়া হিন্দু, গোঁড়া ব্রাহ্ম, আর্য কী প্রার্থনা-সমাজী, মুসলমান কী পার্শি হলেও ধর্মের সঙ্গে পলিটিক্স মেশাননি, অন্তঃপুরবাসিনীকে হাটবাজারে দাঁড় করিয়ে দর কষাকষি করেননি। বাংলা দেশে ধর্ম এই আন্দোলনে নাক ঢোকালে গীতার গর্ত দিয়ে। যুগান্তর, বন্দেমাতরম্, সন্ধ্যার লেখা আমার মনে পরে, গীতা-ক্লাসে দু'একবার গিয়েওছি। বারীন্দ্র, উপেন্দ্র নিজেরা স্বীকার করেছেন যে তাঁরা প্রথমেই বুঝেছিলেন যে, ধর্মের সাহায্য ব্যতিরেকে, ধর্মের আশ্রয় ভিন্ন দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবে না। তাঁদের দাবি গ্রাহ্য করতেই হবে। কেননা এঁদের পূর্বে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সাধুজনের প্রবর্তিত হিন্দুয়ানির মধ্যে রাজনীতির রেশ পর্যন্ত ছিল না। বরঞ্চ বলা চলে যে, সমাজ-সেবায় তাঁরা ধর্মভাব আনতে চেয়েছিলেন। বোধহয় বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল যে, জীবন্ত সমাজের বন্ধনীকে লোকে ধর্ম বলুক। রাজা রামমোহন রায়ের কৃপায় সমাজধর্মকেই ধর্ম বলতে সাধারণে প্রেরণা পাচ্ছিল। কিন্তু ১৯০৫-৬ সালের গীতাপাঠ একটু অন্য রকমের হলো। সমাজ-ধর্মের এক অংশে রাজনীতিতে, ধর্মের প্রভাব প্রকাশিত হলো। গীতাপাঠ যখন ছেলেরা আরম্ভ করলে, বৈষ্ণবেরা কেন চুপ থাকবেন? আরম্ভ হলো কীর্তন, নাচন-কাঁদন, গড়াগড়ি, বৈষ্ণব-সাহিত্য-পাঠ। একধারে অমৃতবাজারের দল, অন্যধারে চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জন ধনী, হাতে একাধিক কাগজ। বিপিনচন্দ্র পালকে দিয়ে বলান হলো যে বাংলার বিশেষত্ব হলো এই বৈষ্ণবসাহিত্যে, ভাবাবেগে, কল্পনায়, এই 'কাছাখোলা ভাবে' ইত্যাদি। Soul of India, বাংলার প্রাণ আবিষ্কৃত হবার পর সেই soulful প্রাণব্যঞ্জক সাহিত্য, কলা, চারুশিল্প তৈরি ত' হলোই, কর্মক্ষেত্রেও তার প্রকাশ শুরু হলো। এই সময় এলেন গান্ধীজী, আমরা তাঁর মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাণ খুঁজে পেলাম। কিন্তু তিনি মূলত ধার্মিক, তাঁর সমস্যা তাঁর নিজের। তাঁর সমস্যাকে দেশের মনে করা হলো। দুঃখ এই যে, কী করে একজন ব্যক্তির সমস্যা দেশের সমস্যার সঙ্গে মিশে গেল জানতে হলে mass psychology পড়লেই যথেষ্ট হয়, পলিটিক্স জানবার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর খিলাফৎ আন্দোলনের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হলো স্বাধীনতার কাজে। খিলাফৎ আন্দোলনের প্রধান কথা— superterritorial sovereignty of the Khalif, আর

আমাদের কথা ছিল ভৌমিক স্বাধীনতা। সমুদ্রের জল গ্রামের নদীতে প্রবেশ করলে বান ডাকে, কিন্তু তারপর ভাটাও পড়ে। এখন সেই ভাটা চলছে। জোয়ারের জলের অংশ নিয়ে গ্রামের আলের ওপর লাঠালাঠি চলছে। মুসলমান সভ্যতা বলতে ভারতবাসী মুসলমান যা বোঝেন তাতে ধর্ম ও পলিটিক্সের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ পার্থক্যহীনতা গান্ধীজীর মনোমত। তাই সরলা দেবী চরকার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের চক্রের তুলনা করলেন, সরোজিনী দেবী চরকা চালিয়ে মাথা ঘুরে অনেক দিব্যদৃষ্টি লাভ করলেন, প্রফুল্লচন্দ্র চরকার প্রসার-কার্যে এবং বিদ্যামন্দির, বিশেষ করে ল' কলেজ ভাঙবার ক্রুসেডে দেশে দেশে বেড়াতে লাগলেন। চরকা হলো নতুন জাতীয়তা-ধর্মের ত্রিশূল। এই ধরনের প্রতীক অনেক জুটল। তারপর মহাত্মা-খোঁজার পালা —বেহারের রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মাদ্রাজের রাজগোপালাচারি, সব গান্ধীজীর উৎসবমূর্তি। তাঁদের পূজা-অর্চনাই দেশের প্রধান কাজ হলো। এই দুটো দৃষ্টান্তই ধর্মের জয়-ঘোষণার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই সময় শত শত ধর্ম-পরিবর্তন হয়েছিল, মতিলাল, চিত্তরঞ্জন, তবে সবই revealed ধরনের। গণপূজার মধ্যেও ধর্মের সেই mystic whole, খদ্দরপরিহিতের মধ্যে সেই feeling of the elect, বক্তৃতার সরল ভাষায় সেই sermonising, বিশেষ করে sermon on the mount-এর গল্প, জেল-প্রত্যাগতের মধ্যে সেই feeling of martyrdom, ধর্মের সব কিছুই এই আন্দোলনে জুটেছিল। রুশ, ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে religious revival-এর তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে ধর্মের অংশটুকু ছাড়া অন্য অংশও ছিল। এবং যদি নাও থাকত তাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, কিংবা ধর্মকে তাড়াবার দায়িত্ব কমে যেত না। সেই ধর্মাংশটুকুর জন্য সে দেশে যা ক্ষতি হয়েছে তার অনুকরণ করার সার্থকতা আমাদের ছিল না, এখনও নেই। সে যা হোক, আমাদের দেশে এতদিন আন্দোলনের পরে যদি ঐ ধরনের মিশনারী খ্রীস্টানী অনুকরণটাই সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হয়ে থাকে তাহলে খুব একটা বড় কাজ যে হয়েছে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ধর্মের ঠেলা কতদূর পৌঁচেছে মহাত্মাজীর একটা কার্য থেকেই প্রমাণিত হয়। গবর্নমেণ্টকে জব্দ করার জন্য তাড়ি বিক্রি বন্ধ করবার প্রয়োজন হয়। মহাত্মাজী তার একটি উপায় পর্যন্ত বাতলে দিয়েছিলেন— উপায়টি তাঁর অন্যান্য উপায়ের মতনই ধার করা। এবার ধার করেন শ্রীরাধার কাছ থেকে, যিনি কৃষ্ণের বাঁশির ওপর অভিমানে বাঁশি কেন বাঁশ-ঝাড় পর্যন্ত উজাড় করতে চান। উপায় ঠিক হলো, তাল গাছ কাটতে হবে। কাজটা নেহাত শক্ত নয়। কিন্তু এই সহজ কাজই একটা ছেলে করে উঠতে পারল না! সে পড়ল তালগাছ

চাপা, গেল মারা। মহাত্মাজী তাঁকে martyr বল্লেন। আজ গত কয়েক বৎসর এই martyr কথাটির যত প্রচার হয়েছে অত প্রচার শিক্ষারও হয় নি, চরকারও হয়নি। সাহেব খুন করলে martyr, হিন্দুকে খুন করলে শহিদ, আবার তালগাছ চাপা পড়লেও martyr! তফাত কোথায়? তফাত নেই, কেননা সব খুনের পিছনে আছে একটা 'ধর্মপ্রেরণা' যার সঙ্গে সাধারণ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কোনো যোগাযোগ নেই। দণ্ডী যাত্রার কথা, হিন্দুসভা, জমায়েৎ উলেমার কথা সকলেই জানেন। আর জানেন, কিন্তু স্বীকার করেন না, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, তথাকথিত দেশাত্মবোধের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বল্লেই, যে বলে তার religious persecution হয়, যেটা Ordinance-এর মতন দেহে না বাজলেও প্রাণে বাজে।

এই প্রকার ধর্মভাবের প্রাদুর্ভাব আমার কাছে আদিম অসভ্যতার পরিচায়ক। জ্ঞানের ইতিহাসে দেখেছি, প্রত্যেক জ্ঞান নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখছে, specialisation কথাটির অর্থই তাই। বিলেতে পলিটিক্সের আলোচনা ও ব্যবহার দুই-ই অনেকদিন ধরে চলে আসছে,সে দেশে অ্যারিস্টটল্ সর্বপ্রথমে পলিটিক্সকে ধর্মজ্ঞান, অর্থাৎ এথিক্স থেকে পৃথক করেছিলেন, মধ্যে মধ্যযুগে ক্যাথলিক চার্চের জন্য, সে পার্থক্য কমে এলেও তারপর থেকে এই পার্থক্যটা চলে আসছে। ফ্যাসিস্টরা আবার পার্থক্য দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন, কিন্তু কম্যুনিজ্‌মের প্রতিকূল শক্তিতে সে চেষ্টা য়ুরোপের অন্য দেশে সফল হবে মনে হয় না। বর্তমানে সর্বদেশে ধর্মকে রাজ্যতন্ত্র থেকে ভিন্ন করা হচ্ছে। এক মুসোলিনি করছেন না, আর আমরা করছি না। এখানেও আমরা ফ্যাসিস্ট। এই আদিমতার উৎপাত সভ্য জগতে একেবারেই অচল। সচল হতে পারে জীবনকে দুইভাগে ভাগ করে, একটা private world আর একটা public world, এবং এই দু'এর যোগটি contractual basis-এর ওপর স্থাপিত করে। ফরাসী বিপ্লবের সময় executive decree-র দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করানো, কমুনিস্ট গবর্নমেণ্টের প্রোপাগাণ্ডার সাহায্যে তাঁর অনস্তিত্বে বিশ্বাস করানো. এবং ইটালীর concordrt-এর সাহায্যে spiritual এবং temporal authority-র মধ্যে বনিবনাও করানোর মধ্যে যে সচেতন ইচ্ছাশক্তির প্রমাণ আছে, কেবলমাত্র তারই দ্বারা বর্তমান সভ্য জগতে আদিম যুগের ধর্মপ্রবণতাকে এই যুগের কর্মশীলতার সঙ্গে খাপ খাওয়ান যেতে পারে। কিন্তু মহাত্মাজী তা করছেন না। তাঁর নিজের মনে, হিন্দু-সভার মনে, মুসলিম লীগের মনে পলিটিক্স ও ধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। আমাদের বিরোধ-জ্ঞান কেবল মাত্র ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিপক্ষেই খাটিয়ে নিঃশেষ হয়েছে।

নচেৎ স্বরাজ পার্টির মধ্যে, কংগ্রেস দলের মধ্যে সামাজিক সংরক্ষণশীলতার প্রধান কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যায়!

অনেকে বলেন, সব হবে, তবে এক সঙ্গে নয়। যেটা প্রথম দরকারি সেইটে আগে হোক, পরে সব : আগে রাজ্যভার আমাদের হাতে আসুক, পরে সমাজ-সংস্করণ, সাহিত্য-সৃষ্টি ইত্যাদি। এই আগে-পরে জিনিসটা ঠিক বুঝি না। যদি আমাদের দেশাত্মবোধ জেগেই থাকে, তাহলে সেটা শুধু একটিমাত্র প্রণালীতে বইছে স্বীকার করা যায় না, আর যদি স্বীকার করাও যায়, তাহলে বইতে দেওয়া উচিত নয়, ভবিষ্যতের দিকে থেকে। আমাদের পলিটিক্স বিরোধের, সৃষ্টির নয়। সর্বদাই opposition party, বিরুদ্ধ দল হয়ে থাকাতে যে দায়িত্বহীনতা, সৃষ্টিবিমুখীনতা, আলস্য আসে, সে সবই আমাদের এসেছে, লক্ষ করেছি। 'পরে হবার' আশার মধ্যে যতটা ধৈর্যের ইঙ্গিত আছে, সেটুকু উপদেশেরই মধ্যে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করার মধ্যে সেটুকু নেই। একটা তারিখের মধ্যে স্বরাজ পাবার আশাতে অধৈর্যের প্রমাণই পাওয়া যায়। এ সবের পিছনে আছে একটা দায়িত্বহীনতা, যার জন্য দায়ী এই স্থায়ী-বিরোধের অবস্থা। বিরোধ না হলে চলে না— কিন্তু বিরোধকে সংঘবদ্ধ হবার একমাত্র উপায় ভাবার মতন একদেশদর্শিতা আর ত্রু'টি নেই। যদি বিরোধকে নিজের স্থানে আবদ্ধ না রাখা হয়, তাহলে সর্বনাশ হয়। সর্বদাই বিরোধের উপর সৃষ্টির দৃষ্টি রাখতে হয়, তাকে একটা উপায় মাত্র ভাবতে হয়, তবেই লাভ। যেখানেই বিরোধ একটিমাত্র সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে, সেখানেই অন্যান্য সামাজিক ব্যবহার অস্বাভাবিক রকমে বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

এখন, আমাদের দেশের এই political obsession-এর ফলে বিরোধ-বৃত্তিকে সামলান যাচ্ছে না। অন্যান্য সমাজে যেমন খেলাধূলো, নাচগান, শোভাযাত্রা, লেখাপড়া, যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা বিরোধ প্রশমিত হয়, এদেশে তা আর হচ্ছে না, কেননা ভারতবর্ষের গ্রাম্য-সমাজ ভেঙেচুরে গিয়েছে, তার বদলে এসেছে নগর-সভ্যতা। মূল খুইয়ে আমরা ভেসে বেড়াচ্ছি। গ্রামকে পুনর্জীবিত করার কোনো উপায় দেখি না, এক ছোট শহর হতে পারে, যেখানে মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী বসবাস করবেন। কিন্তু তাঁরাই অন্নাভাবে লোপ পেতে বসেছেন, অতএব এখানেও হতাশ হতে হয়। সেইজন্য একটি উপায় মনে হয়, জনকয়েক লোকের, এই আন্দোলনের বাইরে থেকে সৃষ্টির কাজে মনোনিয়োগ করা। বিরোধ-বৃত্তির কুফল হতে বাঁচতে ও বাঁচাতে হলে এক দল নিষ্কাম ও নির্বিকার প্রবৃত্তির লোকের একান্ত প্রয়োজন। ঠিক এই সময় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, বিশ্ববিদ্যালয়ের, লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরির যত

প্রয়োজন, অত প্রয়োজন বোধ হয় কখনও ছিল না।

বিরোধের মাত্র কয়টি কুফল দেখাচ্ছি। বিদেশী রাজাকে জব্দ করবার জন্য আমরা কী উপায় অবলম্বন করেছি একবার স্মরণ করি। আমরা ভাবাবেগের সাহায্য গ্রহণ করেছি, বুদ্ধি অর্থাৎ বিচারশক্তিকে সরিয়ে রেখে, তাকে কর্ম-প্রবণতার প্রতিকূল ভেবে। আমরা বিশেষ করে ধর্মের সাহায্য গ্রহণ করেছি এই ভেবে যে ভারতবাসী বড়ই ধর্মপ্রাণ। আমরা পলিটিক্‌সটাকে নিতান্তই অবাস্তব জগতের সামগ্রী করে তুলেছি। আমরা সর্বদাই বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে কুণ্ঠা বোধ করিনি। এখন উপায়মাত্রেরই এই স্বভাব যে, তার দোষগুণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে ও সার্থকতার সঙ্গে মিশে থাকে। যখন উদ্দেশ্য সফল হয় তখন তার সাধনের ইতিহাস সিদ্ধি থেকে মুছে যায় না। সেইজন্য আমার ভয় হয় স্বরাজ গবর্নমেণ্ট গণ-মনের ক্রীড়নক হবে; এবং গণ-মন যে চপল, নির্বোধ ও নিষ্ঠুর এ আর বলে দিতে হবে না। জনসাধারণকে জাগ্রত করা ভাল কাজ, পলিটিক্‌সের প্রধান কাজ। কিন্তু সত্যিকারের জাগ্রত অর্থাৎ শিক্ষিত হবার পূর্বেই যদি জনগণ আধঘুমন্ত অবস্থায় কঁকিয়ে ওঠেন, তাহলে সেই কঁকানিকে vox dei বলে পুজো করার মতন শক্তির অপচয় আর কী হতে পারে? এই জনমতের প্রভাবেই হয়ত আমাদের যুদ্ধও করতে হবে এবং বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোকের প্রতি অত্যাচারও করতে হবে। গণ-আন্দোলনের বিপদই এইখানে, সেটা anti-intellectual হয়েই পড়ে। তখন আদিম প্রবৃত্তির বশে মানুষে যা করে তাই ভাল বলে প্রমাণিত হয়। আমরাই প্রমাণ করি।

ধর্মভাব শুনেছি দরকারি জিনিস। কিন্তু পলিটিক্‌স আর ধর্ম মিশলে অন্তত এই ধরনের কাজ আমরা করতে বাধ্য হব। স্বরাজ পেলেও দেশে চোর-জোচ্চোর থাকবে— আজ না হয় কাল মতপার্থক্যের জন্য একাধিক দল তৈরি হবে, তার মধ্যে একটি দলের লোকসংখ্যা অন্তত অন্যের অপেক্ষা কম হবে, তখন সেই ছোট দলের পাণ্ডাদের আদালতে হাজির করতে হবে, শাস্তিও দিতে হবে। সে শাস্তি আইনসঙ্গত হবে না— হবে ধর্মসঙ্গত। Political offence হবে তখন sin, কিংবা heresy, এবং পাপ তাড়ানর জন্য মানুষের যত উৎসাহ অত উৎসাহ আর কিছুতে নেই। ভাগ্যে বিপিনচন্দ্র পাল স্বরাজ পাবার পূর্বেই মারা গেছেন।

যে দেশাত্মা বিপিন পালের আবিষ্কৃত সেই দেশাত্মাই মূর্ত হয়ে উঠবে একটা Hegelian State-এ, একটা abstraction-এ, idea-তে। হেগেলের রাষ্ট্র ছিল দার্শনিক-বুদ্ধিগত, আমাদের হবে ধর্মগত, অনেকটা বর্তমান ইটালীর Corporate state-এর মতন। ততদিনে আশা করি লাঠির বদলে সড়কি,

জোলাপের বদলে আর্সেনিকের চলন হবে। যে দৈত্য সামনাসামনি যুদ্ধ করে তার সঙ্গে পারা যায়, কিন্তু যে মেঘের আড়াল থেকে বাণ ছোঁড়ে তার অবাস্তবতা আমাদের এতই মুহ্যমান করে তার বিপক্ষে হাত তোলার শক্তিই থাকে না।

সবচেয়ে ভয় হয় যে বিরোধের নেশায় আমরা সৃষ্টির অবসর পাব না। খানিকটা বিনিময়, আইনকানুন, অনুশাসন ও অবসর দেশকে পেতেই হবে। কিন্তু দায়িত্বহীন সমালোচকের দল থাকবেই, কর্মবিমুখতার অভ্যাস সহজে ঘোচে না, নিরর্থক সমালোচনার মোহ অনেক দূর জের টানে, কুঁড়েমির মজা অনেকদিন থাকে। শুধু কথার জন্য কথা কওয়ার অভ্যাস ছিল উনবিংশ শতাব্দীর রুশিয়ান বিপ্লববাদীদের, এখনও যে সেই পুরাতন অভ্যাসের দোষেই পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান ততটা সার্থক হচ্ছে না এ কথা নিজেই স্ট্যালিন স্বীকার করেছেন। এই বিরোধের জন্য বিরোধের অভ্যাসই আমাদের স্বরাজ গবর্নমেণ্টের প্রধান শত্রু হবে। সাহিত্যেরও সর্বনাশ হবে আমার মতো সমালোচকদের হাতে পড়ে।

আজ যদি এই বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রয়োজন থাকে, তাহলে এখন থেকেই সাবধান হতে হবে— ভাবাবেগকে দমন করতে হবে, রিয়ালিস্ট হতে হবে, ধর্মকে নিজের কোঠায় বন্দী রাখতে হবে, সৃষ্টির কাজ শুরু করতে হবে, সেজন্য সুবিধা দিতে হবে। আমাদের জ্ঞান চাই। নিজেদের দেশের কথাই আমরা জানি না। কী আশ্চর্য! প্রত্যেক দেশের দলেরই না কত Research Bureau আছে— তাদের গবেষণা একটু একদেশ-দর্শী হলেও, তাদের fact-finding zeal-কে অগ্রাহ্য করা যায় না। আমাদের কংগ্রেস এতদিন ধরে কাজ করে আসছে, আমাদের কাজ ভারতের মতন মহাদেশকে স্বাধীন করা, অথচ এতদিনে একটা Research Bureau স্থাপিত হলো না। এ জগতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই প্রধান বল, তাই আমাদের নেই। আমাদের প্রতিনিধিরা বই কিংবা রিপোর্ট পড়েন না, কিংবা যখন পড়েন তখন সেখানে কোথায় কোন্ ঘটনা, কোন্ সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছে দেখাবার সামর্থ্য নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছে এই facts যোগান দেবার প্রত্যাশা করা যায় না। তাদের না আছে সময়, না আছে সুবিধা, না আছে সাহস, না আছে ক্ষমতা। যদি কোনো বড় সাহেব বলেন, দেশের লোকেরা আর্থিক হিসাবে উন্নত হচ্ছে, আমাদের হাতে এমন কোনো statistics নেই যার দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি, দেশের লোক গরীব হয়ে যাচ্ছে। যদি বড় কর্তারা বলেন— লোকসংখ্যার হার বাড়ছে, তবুও দেশের দুর্দশা বাড়েনি—

আমরা না বলতে পারি না, জোর বলতে পারি— জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। ভাবের বদলে জ্ঞানের সাধনাকেই দেশের একমাত্র আশা বিবেচনা করি।

প্রগতি

প্রগতি বলতে আদর্শ কিংবা প্রেরণা অনুসারে অগ্রসর হওয়া বুঝি।

মানুষই আদর্শ সৃষ্টি করে। মানুষই প্রেরণার আধার। মানুষই অগ্রসর হয়।

অগ্রসর হওয়ার জন্য পরিবর্তন চাই।

(২)

মানুষের অগ্রসৃতি সরল রেখায় নয়। অতএব পুরাতন জ্যামিতির নিয়ম এখানে সম্পূর্ণভাবে খাটে না।

জীবজগতের পরিবর্তন চারিধারে হয়। মানুষের পরিবর্তন তারও বাইরে। সেখানে দিক্‌নির্ণয় অসম্ভব, দিক নেই বলে। মানুষ তার জ্যামিতি এবং জীবতত্ত্বের অংশটুকু জয় করে দিক হারিয়ে ফেলে।

জীবের পরিণতি কালের মধ্যেই। মানুষের জীবনে কমা থেকে দাঁড়ি সবই আছে মনে হয়, কিন্তু নেই। মানুষের স্থিতি হচ্ছে মৃত্যু। জীবের স্থিতি ও গতি, মানুষের কিন্তু মতি। অতএব জীবতত্ত্বের অভিব্যক্তিবাদ এখানে সম্পূর্ণভাবে খাটে না।

মানুষ জড় ও জীব। তার ওপর মানুষের আত্মা আছে। অতএব জড় ও জীবজগতের নিয়ম এ-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য না হলেও, একেবারে ভুল নয়। ভুল সংশোধিত হয়, অসম্পূর্ণতা লুপ্ত হয়, আত্মার সন্ধান পেলে। আত্মার কী নিয়ম জানি না। বোধ হয়, আত্মা নিয়মকর্তা, আপনাতে আপনি অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ স্বাধীন। অতএব মানুষের পক্ষে পরিবর্তনের পরিণতি মানুষের স্ব-অধীনতা।

(৩)

প্রেরণা পূর্বকালের, আদর্শ উত্তরকালের।

মানুষের সব কাজই প্রেরণা-সম্ভূত কিংবা আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত বিশ্বাস

করতে গেলে স্নানঘরের কলের জলকে সত্য এবং স্রোতের জলকে মিথ্যা গণ্য করতে হয়।

গোমুখীতে তীর্থস্নান না করে টালার ট্যাঙ্কের তলায় মাথা রাখলে কাজ চলে, পুণ্য হয় না।

(৪)

আদর্শের উৎপত্তি পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বে। কালও প্রকৃতি। যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নিজের জড়প্রকৃতি এবং বর্তমানের সঙ্গে মানুষের গরমিল হয়, তখনই দ্বন্দ্বের বাইরে যাবার ইচ্ছা হয়।

অশান্তির ফল দিবাস্বপ্ন, ইয়্টোপিয়া, রামরাজত্ব, সত্যযুগ।

বাইরের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য শক্তি চাই। সব চেয়ে বড় শক্তি মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলি। তাদের মধ্যে যে কয়টির সাহায্যে অশান্তি দূরীভূত হওয়া সম্ভব, সেইগুলির ব্যবহার স্থিরীকৃত হলেই ধর্মাচার আরম্ভ হয়। আচারগুলি প্রথম প্রথম আদর্শের সহায় হয়, তারপর তারা মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রভাবের নাম ধর্মবুদ্ধি। তৈরি জিনিস হাতের কাছে পেলে কে আর খাটতে চায়? তখন মানুষ সব ধার্মিক হয়ে ওঠে। আদর্শের পরিণতি ধর্মগত প্রাণ হওয়া, ধর্মবুদ্ধি আদর্শের কারণ নয়। যে মানুষের মন ধর্মবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন না হলো, সে মানুষের মন নতুন আদর্শ গড়তে শুরু করলে। অন্যের ধর্মবুদ্ধি, এমন কী নিজের ধর্মবুদ্ধিও, নতুন আদর্শ-গঠনের অন্তরায়। তখন আবার অশান্তি। এই চলল চিরকাল।

(৫)

ভিতরের আদর্শ-গঠন এক প্রকারের মূল্য-নির্ধারণ। সে মূল্যের ভিত্তি সংখ্যা হলে আপেক্ষিকতার অর্থ কেবল বিয়োগ হতো। জীবন সরলরেখা হলেও তাই, যেমন কগ একটি সরলরেখা হলে ভিতরের কখ = কগ — খগ। অসমতল ক্ষেত্র ও বক্ররেখা হলে শুধু বিয়োগ হবে না। তখন একটি বিন্দুর মূল্য নেহাত একান্ত, অথচ তার নিকটবর্তী ঐ ধরনের মূল্যবান অনেক বিন্দু রয়েছে।

অন্তর থেকে আদর্শগড়ার মানে ফুটে ওঠা। মানুষ ফুটে ওঠে, চারিধারে ও বাইরে। তাতেও সময় লাগে।

(৬)

মূল্য শুধু সময়ের ওপর স্থাপিত করলে, যা কিছু হচ্ছে কী হবে, তাই, যা হয়ে গিয়েছে তার চেয়ে ভাল কিংবা মন্দ প্রমাণিত হতো। বস্তুত তা নয়। অথচ

সবই বদলাচ্ছে। সেইজন্য মূল্যের গুরুত্ব নির্ভর করে কোন্‌টি কালের অতীত এবং কিসের সাহায্যে কালের অতীত হওয়া যায়, তার ওপর। যেমন সা, রে, গা, মা সাধবার পর গানের স্বাধীনতা। সমাজের ভেতর থেকে সমাজের বাইরে গেলেই মানুষ হয়। অতএব, এইটাই আদর্শ। দ্বীপের মধ্যে রবিন্‌সন্‌ ক্রুসোর বাহাদুরি হিন্দুসভার গোঁড়া সভ্যের মতনই।

(৭)

বুদ্ধি দিয়ে আদর্শ সৃজন করলে মানুষ কর্তৃত্ব করবার আত্মপ্রসাদ উপভোগ করতে পারে, কিন্তু জীবনটা হয় কল। জীবনের খানিকটা কল, খানিকটা জীব— কিন্তু গোটা জীবন তারও অতিরিক্ত একটি অখণ্ড শক্তি। এই শক্তি আত্মার। আত্মশক্তি, আত্মোপলব্ধির, আত্মানুভূতির ফল। 'উন্নতি' মানে মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ।

(৮)

মানুষ বলতে ব্যক্তি বুঝি। সমাজ কিংবা দেশের কোনো আত্মা নেই। আছে শুধু ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং আচার-ব্যবহারের বিশেষত্ব। সমাজ ব্যক্তির সহায় এবং সুবিধা মাত্র। দেশাত্মবোধ আত্মার সংশ্লিষ্ট কোনো বস্তু নয়, ব্যক্তিগত মনের তৈরি, এবং সেই মনেরই তৈরি সুবিধাসূচক মন্ত্র মাত্র। ব্যক্তিরই মন ও আত্মা আছে। ব্যক্তিই ইতিহাস সৃষ্টি করে, সমাজ নয়।

(৯)

সমাজের সভ্যতা, ব্যক্তির বৈদগ্ধ্য। বৈদগ্ধ্যই পরিবর্তন, অগ্রস্থিতি এবং প্রগতির মূলগতি। সভ্যতা সেই গতির রুদ্ধ অবস্থা, চরম অবস্থা, অর্থাৎ মৃত্যু। বৈদগ্ধ্য আত্মার বিকাশ। বুদ্ধির দ্বারা সেই বিকাশকে নিয়মে গ্রথিত করে বোঝবার প্রয়াসকে সভ্যতা বলা যেতে পারে। বৈদগ্ধ্যে উপনিষদ্‌, সভ্যতায় টীকাভাষ্য। একটিতে মানুষ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, আর্টিস্ট, সম্পূর্ণ মানুষ, অন্যটিতে মানুষ কলের কুলি, যজ্ঞের পুরোহিত, স্কুল-মাস্টার এবং সাহিত্যক্ষেত্রের সমালোচক ও প্রবন্ধ-লেখক। একটির দেবতা ব্রহ্মা— রবীন্দ্রনাথ, দ্রষ্টা ও স্রষ্টা; অন্যটির দেবতা বিষ্ণু—৺ভূদেবচন্দ্র, ভর্তা ও রক্ষক।

(১০)

অতএব 'সামাজিক উন্নতি'র কোনো মানে নেই। যে সমাজে আত্মার যতটুকু বিকাশ সম্ভব যে সমাজ ততটুকু উন্নত। নিজের মৃত্যু দিয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা

বিকাশের অবকাশ দেওয়াই উন্নত সমাজের একমাত্র কর্তব্য। এই অবকাশ কিংবা সুযোগই আসল জিনিস, সমাজে কয়জন আত্মজ্ঞ ব্যক্তি আছেন তাঁদের সংখ্যা আসল জিনিস নয়। সংখ্যামূলক কিংবা তুলনামূলক বিচারে আত্ম-বিকাশের কোনো মূল্য নেই। হয়ত একটা রবীন্দ্রনাথ দশটা শেলীর মতন, একটা ঋষি কুড়িটা সেণ্ট্ ফ্রান্সিসের সমান! হয়ত বিপরীত, কে জানে?

১৩৩৪

বক্তব্য

উৎসর্গ

ছায়া দেবীকে

মুখবন্ধ

নানা পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এ যাবৎ আমার অনেক প্রবন্ধ বেরিয়েছে। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে এগুলি লেখা। এইসব প্রবন্ধ অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত, কিন্তু বিষয় ও সুরের দিক থেকে তাদের মধ্যে একটা সংযোগ এবং বিবর্তনের আভাস লক্ষ করা যায়।

এই কারণে বিভিন্ন পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল, সেইগুলোকে একত্র করাই আমার উদ্দেশ্য। কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে চিন্তার উদয় হয়েছে এবং সেই সব চিন্তার সূত্রে কি ধরনের প্রতিপাদ্য তৈরি হয়ে উঠেছে, প্রবন্ধগুলির শিরোনামা থেকে তা বোঝা যাবে। তাই বইখানির নাম দিয়েছি 'বক্তব্য'। অর্থাৎ যা বলতে চাই। এখন বক্তব্য যথার্থভাবে ব্যক্ত হয়েছে কি না, তার বিচারের ভার সেই পাঠকের ওপর, যাঁরা পড়েন এবং ভাবেন।

বইখানা দু'টো স্তবকে ভাগ করা হয়েছে একটি সমাজ, অপরটি সংস্কৃতি-সংক্রান্ত চিন্তা নিয়ে; তবে বক্তব্যের মধ্যে তিনটি মোটা সূত্র রয়েছে। প্রথমটি ইতিহাস, এবং তারই চারপাশে আরো গুটি কয়েক লেখা দানা বেঁধেছে। দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে, এবং তাঁরই সম্পর্কে, বিশেষ করে তাঁর সঙ্গীত ও সমাজ-চেতনা নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ গড়ে উঠেছে। শেষ সূত্রটি হল 'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা' এবং তারই সংক্রান্ত আরো কয়েকটি প্রবন্ধ। প্রথম ও তৃতীয় সূত্র কার্ল মার্কসের অজুহাতে। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সমাজতত্ত্বকে ঘিরে। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার মন্তব্য অপেক্ষাকৃত স্বাধীন।

'বক্তব্যে' এমন একাধিক প্রবন্ধ রয়েছে, যা নিয়ে তর্ক বহুদূর চলে। কিন্তু তর্কের সীমা নেই। যেখানে সেটা থেমেছে, সেখানে তাকে থামতে দেওয়াই উচিত। গন্তব্যেরও শেষ নেই। যেটা চলছে, তাকে চলতে দেওয়াই উচিত। প্রবন্ধকে সংশোধিত অথবা পরিবর্ধিত করছি না। শুধু প্রবন্ধের শেষে রচনা-কাল উল্লেখ করলাম।

দেশ ছেড়ে বহুদিন বাইরে রয়েছি, তায় অসুস্থ শরীর। এ অবস্থায় বই ছাপার সময়ে নিজে দেখতে পারিনি। তাই কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়া সম্ভব। তবে 'বক্তব্য' প্রকাশের ব্যাপারে দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুলেখক সুশীল জানা এবং আমার ছোট ভাই বিমলাপ্রসাদ অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করেছেন। সেজন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার স্ত্রী ছায়া দেবী একাধিক প্রবন্ধের উদ্ধার করেছেন। তাঁকে এ বই উৎসর্গ করলাম।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

নব্য সমাজ দর্শনের ভূমিকা : ১

নব্য ভারতেব জন্য বহু জিনিসের প্রয়োজন। নব নব দ্রব্যসম্ভারের কথাই সকলেব মুখে, এটা স্বাভাবিক ও সামাজিক। নতুন আগ্রহ, এমন কী নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গির উল্লেখও পাওয়া যায়, তবে অল্প পরিমাণে। ইংরেজ তাড়াবার পর কী হবে আমরা ভাবিনি, এবং যাঁরা ভেবেছিলেন তাঁরা চিন্তা ও যুক্তি অপেক্ষা জাতির অনাহত, অকৃত্রিম, আদিম, সহজাত শক্তির ওপরই আস্থাবান ছিলেন বলে জন-সাধাবণের সামনে ভবিষ্যৎ ভারতের কোনো রূপ ফোটাতে পারেননি, এটাও স্বাভাবিক কিন্তু অ-সামাজিক। মহাত্মাজীর কল্পিত রূপ ক্ষণিকের জন্য জন-সাধাবণের না হলেও জনকয়েকের মানসপটে ভেসে উঠেছিল নিশ্চয়, কিন্তু কালো মেঘ পাশেই ছিল, দিল তাকে ঢেকে। সে রূপ সম্বন্ধে একাধিক বই, দেশে সেই অনুযায়ী একাধিক অনুষ্ঠান, তার দ্বারা প্রভাবান্বিত একাধিক সজ্জন, মহাজন থাকলেও নানা কারণে দেশ তার প্রতি আগ্রহহীন। ভক্তির জোরে ভোট দেওয়া কী সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়, কিন্তু দেশ যতদিন পর্যন্ত কর্তাভজার দলে পরিণত না হচ্ছে ততদিন নাম জপের কার্যকরিতা কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। বাম-মার্গী দলের প্রয়োজন এইখানে। এখনও কিন্তু দেশে বামমার্গের প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তার বহর কম। আমরা অনেকেই মার্কসের ও বিদেশী মার্কস্‌বাদীদের লেখার সঙ্গে পবিচিত; আমরা কত রকমেরই না সোশিয়ালিস্ট দল তৈরি করছি, মাতৃ-ভাষায় প্রবন্ধ লিখছি, পড়ছি; কিন্তু যে পরিমাণে চিন্তার ক্ষিপ্রতা, গভীরতা ও বিশ্লেষণ থাকলে ভারতের গণপ্রধান রূপ জনগণের সামনে প্রকট হতে পারে, তার নিদর্শন মেলা দুর্ঘট। কমিউনিজম্‌ ঘেঁষা সাহিত্যের প্রচার সব চেয়ে বেশি, কিন্তু সেখানে নতুন তথ্য কিছু থাকলেও তার তত্ত্বকথা ভক্তির আড়ম্বরে চাপা ও তার বিচার যান্ত্রিক। সোশিয়ালিস্ট সাহিত্যের প্রচার আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু মানবেন্দ্র-নাথ বায়ের রচনা ভিন্ন অন্যত্র চিন্তার সাক্ষাৎ বড় বেশি পাওয়া যাচ্ছে না। এই সুযোগেই গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্রের জন্মলাভ। এটা হয়ত সুবিধাবাদের লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। গান্ধীবাদীরা বুঝেছেন যে সমাজতন্ত্র বা 'সোশিয়ালিজম্‌ কথাটি

গ্রহণ করাই সঙ্গত ; এবং কংগ্রেসের প্রতি বহু রুষ্ট, অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা দেখছেন যে কার্যকলাপে কংগ্রেস-নীতি থেকে দূরে সরে এলেও গান্ধীজির নাম পরিত্যাগ করা এখনও অ-সমীচীন। কিন্তু আজ পর্যন্ত গান্ধীবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদের মূলগত পার্থক্যের বিচার হয়নি, কেবল নাম নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। তাই মনে হয় নব্য ভারতের পক্ষে সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন নব্য সমাজদর্শন।

ইংরেজীতে যাকে মেটাফিজিকস্ (metaphysics) বলা হয় তার সৃষ্টির ভার বিশেষজ্ঞের ওপর ন্যস্ত করলেও দেখা যায় যে সাধারণের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একেবারে অসম্ভব নয়। বর্তমান পরিস্থিতিটাই পরিবর্তনের অনুকূল। ইয়ুরেনিয়াম যুগ লোহা-ইস্পাত যুগের দ্বারে ধাক্কা দিচ্ছে, ভারতবর্ষের আত্মশক্তির পরীক্ষা শুরু হয়েছে, দ্রুতগতিতে কৃষিপ্রধান জীবনযাত্রা যান্ত্রিক সভ্যতার সামনে হঠে যাচ্ছে, সামন্ত শাসন মুমূর্ষুপ্রায়, ধনিকতন্ত্র জাগ্রত ও জীবন্ত, পুরাতন সমাজবিন্যাসের শক্তি হ্রাস পেয়েছে ও সেই সুযোগে নতুন সমাজবিন্যাসের ছায়া পড়ছে জনসাধারণের মনের পর্দার ওপর। অবশ্য, আনুকূল্যের সুযোগ হারাবার বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ছড়ানো। বহু জাতি পারিপার্শ্বিকের আহ্বান শুনতে না পেয়ে চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়েই রইল। আবার বহু জাতির পক্ষে ক্ষুদ্র সুবিধার ক্ষীণ কণ্ঠই যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তপ্রাচুর্যে বিভ্রান্ত হওয়া কিংবা তার সাহায্যে নিষ্কাম ধ্যান-বিলাস যখন নব্য ভারতের কাম্য নয় তখন জ্ঞানত সামাজিক সুবিধা-সুযোগকে আপন কাজে লাগানো ছাড়া তার অন্যগতি নেই। অন্যথা ভারতবর্ষ স্বাধীনতারূপ স্বপ্ন দেখে পাশ মুড়েই শুয়ে থাকবে। অর্থাৎ আমাদের ভূয়োদর্শন কর্মশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই— এই হল নব্য সমাজদর্শনের প্রথম প্রতিজ্ঞা। কর্মশীলতার যত প্রকার প্রকাশ পশ্চিমী-দর্শনের ইতিহাসে আছে তার বিচারের স্থান অন্যত্র। এখানে মাত্র তার দু'টি মূল তত্ত্বের উল্লেখ সম্ভব : অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষতা ও পরীক্ষা-নির্ভরতা। শ্রুতি স্মৃতি অনুযায়ী কর্মের মধ্যে আদেশ পালনের অংশই বেশি, এবং উদ্যোগ ও স্ব-অধীনতার অংশ কম। কিন্তু নানা কারণে নতুন কর্মপদ্ধতি শীঘ্রই নিত্যকর্ম ও আচারে পরিণত হয় ; সেজন্য পরীক্ষার প্রবৃত্তিকে সদা জাগ্রত রাখতেই হয়। সৌভাগ্যের কথা এই যে, বিজ্ঞানপ্রসারের ফলে পরীক্ষাবিমুখতা কিছু কমে আসছে। ওধারে জগৎ এতই জটিল হয়ে পড়ছে যে, পুরাতন আদর্শবাদের কর্মপ্রেরণা এখন আর যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থত্যাগের আবেদন দুর্বল হয়েছে কে না জানে! স্বেচ্ছাসেবক এখন কর্মচারী।

আদর্শবাদের ভিত্তি ভগবানে বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এখনও অক্ষুণ্ণ আছে কী নেই তা প্রমাণসাপেক্ষ। এ বিষয়ে গ্যালপ পোল্ নেওয়া যায় না। গির্জায়

এখন কম লোক যায় যদি কেউ বলেন তবে তার উত্তরে রাশিয়ার গির্জাভিমুখে যাত্রার উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্যাথলিক য়ুরোপে, এশিয়ায়, দক্ষিণ আমেরিকায় এখনও ভগবানে বিশ্বাস বর্তমান শুনেছি। অতএব ব্যাপারটি সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না। তার নিরিখ সমাজের প্রধান ও উগ্র কর্মধারার দ্বারাই বাঁধা সম্ভব। সে কর্মধারাতে বিশ্বাস এতই বর্তমান যে, তাকে ভগবৎবিশ্বাসের মতনই মনে হয়। ঠিক যতটা বিশ্বাসের ঘনতা মধ্যযুগের সাধু, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুদের (monks and friars) ব্যবহারে ছিল বলে আমরা জানি ঠিক ততটা, কী তার চেয়েও বেশি, একাগ্রচিত্ততা, সুখত্যাগ বর্তমান যুগের ধনিক-সম্প্রদায়ের ব্যবহারে দেখতে পাই। কৃচ্ছ্রসাধন (asceticism) ধনিক-তন্ত্রের একটি প্রধান মনোভঙ্গি এবং ঐতিহাসিক মূল। তার প্রথমযুগে দু'টি বিশ্বাসের পার্থক্য ধরা পড়ে না, কারণ ধনীর দল ব্যক্তিগত ও আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মপ্রাণ। ক্রমে ভগবৎবিশ্বাস যতই দুর্বল হতে থাকে ততই বাড়ে দানখয়রাতের পালা। পরে পিঁজরাপোল, মেয়ে হাসপাতাল, মন্দিরনির্মাণেও চলে না, বিশ্বাস উপছে পড়ে গুরু কিংবা কোনো মহামানবের উপর, আরো পরে রক্ষণশীল, রাজকীয় দল, এমন কী গবেষণা-সমিতির ওপর পর্যন্ত। মহাত্মা গান্ধীকে কেন্দ্র করে, তাঁর নাম ভাঙিয়ে ধনিকতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি আমাদের দেশে নতুন হলেও অন্যত্র পন্থাটি পুরাতন। ঠিক উক্ত উপায়েই য়ুরোপের ধনিকতন্ত্র গড়ে উঠেছে, এবং তার অজস্র দৃষ্টান্ত হেবার, টনি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ মধ্যযুগের শেষ ভাগের ইতিহাস থেকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু দু'টি আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। রিনেসাঁর পর যে রিফর্মেশন য়ুরোপে আসে তার প্রধান কীর্তি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা; এবং তারও পূর্বে যে হিসাব-নিকাশের পদ্ধতি (accounting) মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময় ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য আবিষ্কৃত হয় তার প্রধান ফল, সম্বার্ট্ যাকে বলেছেন, rational outlook—যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এই দু'টি বস্তুই সনাতন ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতিকূল। আমাদের দেশের ব্যবসা ইংরেজ সর্বনাশ করেছিল বলে, এবং আরো দু' একটি কারণে, প্রথমত শিক্ষা-পদ্ধতির বিশেষত্বের জন্য, আমাদের মধ্যে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে পড়েনি, এবং ব্যবসায়ী ধর্মবুদ্ধির অর্থাৎ business morality-র প্রসার হয়নি। তবু একপ্রকার প্রটেস্ট্যান্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও তারই সংযুক্ত সংস্কার-প্রবৃত্তির সঙ্গে আমাদের ধনিক-তন্ত্রের নিবিড় যোগ আছে, যার প্রমাণ বোম্বাই প্রদেশে বেশি চোখে পড়ে। অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই এখনও এখানে ধনিকতন্ত্রের প্রধান সক্রিয় বিশ্বাস। তাই সোশিয়ালিজম্-এর ভাবসমুদ্রের প্রতি তার ক্রোধ নিতান্তই ধর্মগত। বলা বাহুল্য, যে প্রকার ধর্মের সাহায্যে ধনিকতন্ত্রের উপকার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অভ্যুদয় ও

প্রসার হয় তার অন্তরে ভগবানে বিশ্বাস ক্রমেই ক্ষীণ হতে বাধ্য। শেষে যতটুকু বা থাকে তাও লোপ পায় ঐ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির তাড়নায়; থাকে মাত্র business attitude বা ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গি; অর্থাৎ রাজ্য চালানো হোক ব্যবসায়ীর দ্বারা, ব্যবসায় যে-ভাবে বৃদ্ধি পায় তারই রীতিনীতি অনুযায়ী ইত্যাদি। মহাত্মাজী ও ক্যালভিন চেয়েছিলেন রাষ্ট্র ও ব্যবসায়কে ধর্মপ্রাণ, আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে উদ্রিক্ত করতে; তাঁদেরই নামধারী ভক্তের দল ধীরে ধীরে দাঁড় করালেন রাষ্ট্র ও ধর্মকেও ব্যবসায়ের অঙ্গতে। অবশ্য বিশ্বাস বজায় রইল, কেবল বিশ্বাসের বিষয় বদলাল। ছিল স্বর্গ, পুণ্য, গুণের আদর; ছিলেন ভগবান; এল এই পৃথিবী, সুখ, আত্মপ্রত্যয়, সংখ্যাপূজা, কোটির জন্যই কোটি। মহাত্মাজীই ভারতের শেষ ভগবৎবিশ্বাসী নেতা, কেবল ভারতে নয়, সর্বত্রই, এক আফ্রিকা ও বোধ হয় মধ্য-এশিয়া এবং পাকিস্তান ছাড়া। অতএব ভগবানে বিশ্বাস কোনো প্রকার উপযোগী নব্য সমাজদর্শনের ভিত্তি হতে পারে না। সেটা কেবল ব্যক্তির জন্যেই থাকবে মনে হয়।

প্রথম প্রতিজ্ঞার সঙ্গে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার বিরোধ আছে। কর্মপ্রবণতার একটা উৎস ভগবানে বিশ্বাস। ইস্‌লাম-ধর্মের প্রসারের হেতু তাই অনেকে বলেন। একাধিক কর্মবীরের জীবনের সার্থকতার মূলে ঐ বিশ্বাসের খোঁজ মেলে। মহাত্মাজী, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত আমরা সকলেই জানি। কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে ব্যাপারটি অত সহজ মনে হয় না। ব্যক্তিগত জীবনের আলোচনা রূঢ় ও অভদ্র হবে, কারণ, এমন বহু সার্থক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় আছে যাঁরা সমাজের, বৃত্তির, চাকরির শীর্ষস্থানে উঠেছেন উপরওয়ালা ক্ষমাতাশালী প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধনের সঙ্গে ভক্তি মিশিয়ে। সার্থক জীবনের ফরমূলা হচ্ছে খোসামোদ+দক্ষতা+ভগবৎবিশ্বাস। খাঁটি ভগবৎবিশ্বাসে কিন্তু মানুষ সংসার পরিত্যাগ করে, কিংবা জড়ভরতের মত যেখানে ছিল সেখানেই থাকে। ইস্‌লাম-ধর্মের প্রসার সম্বন্ধে নতুন গবেষণা পড়ে মনে হয় যে সেজন্য আরব-ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজিত জাতির শক্তিহীনতা এবং সেই সময়কার মধ্যপূর্ব, মধ্য-এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার আপেক্ষিক অনুন্নতাই প্রধানত দায়ী। তদ্‌ভিন্ন প্রথম যুগের ইস্‌লাম-ধর্মে ভগবৎবিশ্বাস একটু অন্য রকমের ছিল এবং তার সঙ্গে গান্ধীজী কী রবীন্দ্র-নাথের বিশ্বাসের তুলনা হয় না। সে-বিশ্বাসের মালমশলা ছিল খানিকটা ভয়, খানিকটা পৈতৃক শক্তিকেন্দ্রে প্রত্যাবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, খানিকটা মিলেনিয়্যাল (millennial) আশা। বিশেষত মূর্তিপূজার ধর্মের অপেক্ষা ইস্‌লাম-ধর্ম অধিক উন্নত, শান্তি স্থাপনের কাজে অধিক দক্ষ এই প্রকারের সামাজিক ধারণাগুলি। প্রফেটিক (prophetic) ধর্মের ভগবান একরকম বিশ্বাস এবং রিভিল্ড

(revealed) ধর্মের ভগবান অন্যপ্রকার বিশ্বাস মানুষের কাছ থেকে আদায় করেন। যীশুখ্রীস্ট ও সেন্টপলের কর্মকাণ্ড বিচার করলেও তাই মনে হয়। হিন্দু ধর্মকে যদি বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে আর্যসভ্যতার বিস্তারের জন্য ভগবানকে আবিষ্কার করতে হয়। অশোক ছিলেন বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের প্রসার কিছুতেই ঐ কারণে নয়। গুপ্ত-সাম্রাজ্য, হর্ষবর্ধনের রাজ্য প্রভৃতি ভারতবর্ষের গৌরবময় যুগের জন্য যে ভগবৎবিশ্বাসই দায়ী ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। ঈশ্বরের আগমনে ধর্মাচরণের উন্নতি সম্ভবত কেন নিশ্চয়ই হয়েছিল ; কিন্তু সে জন্য জ্ঞানে ও কর্মে হিন্দু জাতির সমৃদ্ধি ঘটেছিল বলা যায় কি ? কে জোর গলায় বলতে পারে যে বিশ্বাস-প্রধান বৈষ্ণব-দর্শন সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়ের অপেক্ষা বড় ! অতএব যদিও কোনো কালে ভগবৎ-বিশ্বাসের সঙ্গে কর্মশীলতার যোগ থেকেও থাকে এযুগে তার পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়।

হাঁ, পাকিস্তানের উৎপত্তিতে ধর্মের দায়িত্ব ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তার সঙ্গে ইংরেজের দায়িত্বও কম ছিল না। সে হিসাবে স্বাধীন ভারতেও ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগ ওতদুপরি ইংরেজের অনিচ্ছাকৃত সাহায্য বর্তমান। আমাদের কল্পিত ভারত-অনুশাসন ধর্মনিরপেক্ষ (secular) হবে যে-মুখে, যে-ক্ষণে— সেই ক্ষণে রামরাজ্য কথাটি পর্যন্ত আমরা শুনতে পাই। এবং রামচন্দ্র ছিলেন ভগবান, খণ্ড নয়, অখণ্ড। তা হলে দাঁড়াল এই : স্বাধীন ভারতবর্ষের মূলে ভগবানে বিশ্বাস, পাকিস্তানেরও তাই ; অথচ একটির হল ক্ষতি, অন্যটির হল লাভ, যদিও মহাত্মাজীর বিশ্বাস জিন্না সাহেবের বিশ্বাসের চেয়ে অনেকগুণ বেশি ছিল। যে-বিশ্বাসের ফল হয় বিপরীত, অন্তত এই যুগে সেটা বেশি কর্মপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না।

অথচ বিশ্বাসের নিতান্ত প্রয়োজন। বিশ্বাসের ইচ্ছাবৃদ্ধির সামাজিক উপায় আছে, কিন্তু তার আলোচনা এই প্রবন্ধের নয়। কিসে বিশ্বাস, এই প্রশ্নটাই প্রাথমিক। বলা বাহুল্য, মানুষের প্রতি বিশ্বাস। ইতিহাসে দেখি মানুষের প্রতি বিশ্বাস, (মানব-ধর্ম, মানবিকতার) রূপ বহু, এবং তার মধ্যে অন্তত তিনটি রূপের ছটা বেশি। রিনেসাঁ যুগের মানবতার (humanism) তিনটি অঙ্গ ; গ্রীক পরীক্ষাশীলতা, বাণিজ্য প্রসারের ফলে লাভের জন্য ব্যক্তিগত দুঃসাহসিকতা ও খ্রীস্টান সভ্যতার উত্তরাধিকার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তার নিষ্পত্তি করলে রিফর্মেশন দ্বিতীয় অঙ্গের পক্ষে রায় দিয়ে। ফলে 'ব্যক্তি' (individual) জন্মাল য়ুরোপে। ফলটি সু কী কু জানতে আমাদের বাকি নেই। য়ুরোপীয়ান কালচার বলতে আমরা যা বলি তার অধঃপতন আরম্ভ হয় রিনেসাঁ যুগ থেকেই। কালচারের ভিত্তি ব্যক্তিগত কৃষ্টি নয়, community,

যাকে হিন্দুরা 'সমাজ' বলেন। **Sense of community** বা সমাজবোধ নষ্ট হবার পরই শূন্যতা ভরাট করবার জন্য জাতীয়তার (**nationalism**) প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি যেমন এক, নেশন বা জাতিও তেমনই একটি ; ব্যক্তি যেমন লাভের জন্য দুঃসাহসী, জাতিও তেমনই শক্তিপ্রসারের অভিলাষী। জাতি বা নেশন থেকেই ন্যাশনাল স্টেট, কিন্তু সেটা তৈরি হবার সঙ্গেই ব্যক্তিকে সংযত করার ক্রিয়া চলে, কেন না সমগ্রের ধর্মই তাই। ব্যক্তি আপত্তি জানায় স্বাধীনতার নাম নিয়ে আর রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করবার প্রয়াসের দ্বারা। এই জন্যই আমরা গণতন্ত্রের ধারণাটির প্রচলনের অব্যবহিত পূর্বেই মার্কেন্টিলিজম্-এর সাক্ষাৎ পাই। সেই সুরেরই রেশ জনগণের আওয়াজ ভেদ করে আজকালকার সরকারী হুঙ্কারে পরিণত হয়েছে। রিনেসাঁ-হ্যুম্যানিজমের এই দশা। ১৩৫৫

হ্যম্যানিজম্‌-এর দ্বিতীয় পরিচিত রূপ রুশোর সৃষ্টি। তাঁর কল্পিত মানুষ স্বভাব-সুন্দর। সমাজের প্রাক্‌কালে মানুষ ছিল সহজ, সরল, উদার, মহান ; কিন্তু জনকয়েক স্বার্থপর লোকের তাগিদে ও অর্থের প্রয়োজনে সমাজ তৈরি হল এবং সেই থেকে বাধল যত অনর্থ। রুশোর মতে মানুষের আদিম স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন কেবল বাঞ্ছনীয় নয়, সম্ভব। সেজন্য তিনি গণতন্ত্র ও নব্য শিক্ষা-পদ্ধতির বিধান দিলেন। সামন্ত যুগের সমাজবিন্যাসের কড়া শাসনের বিপক্ষে রোমান্টিক ব্যক্তিস্বাধীনতাই তখনকার দিনের একমাত্র প্রতিবাদ। মাত্র এইদিকে থেকে তিনি ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত। কিন্তু এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে না। তিনি রিনেসাঁ-রিফর্মেশনের যুগ থেকে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও 'কম্যুনিটি'র যে ভাঙন শুরু হয় তারই ধারা বহন করেন। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে আধিদৈবিকের যোগ ছিল : প্রমাণ সেই শতাব্দীর মিস্টিকদের জীবন, কবিতার প্রতীক ও বিভিন্ন গুহ্য ধর্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে যোগসূত্র আরো ঢিলে হল, অনেকের মতে বিজ্ঞানের আশীর্বাদে। খানিকটা সত্য বটে ; নিউটন, প্যাস্‌কাল প্রভৃতি পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তত শেষ ভাগের বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস তুলনা করলেই বোঝা যায়। সম্ভবত পরীক্ষপ্রধান বিজ্ঞান-প্রসারের পিছনে অন্য একটি বিশ্বাস ছিল। মার্কেন্টিলিজম্‌-এর বিপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে যে বিদ্রোহ মাথা তোলে তার দার্শনিক ভিত্তি আইডিয়ালিজম্‌ বা আদর্শবাদ, বার্কলের নয়, লক্‌ প্রভৃতির। তার মূল বক্তব্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, অবশ্য ইংরেজী সংবিধান-অনুযায়ী। 'ইংরেজী' এই জন্য যে ইংলণ্ডেই সর্বপ্রথম সামন্তযুগীয় রাষ্ট্র লোপ পায় ও 'ক্লাস স্টেট' গড়ে ওঠে ঐ ব্যক্তি-গত স্বাধীনতার নাম ব্যবহার করে। ইংরেজী আদর্শবাদের কল্পিত মানুষ ঠিক 'নোবল্‌'ও নয় 'স্যাভেজ্‌' নয়, 'নোবল্‌ ম্যান'। ইনিই পরে জন হ্যালিফ্যাক্স 'জেন্টলম্যান' হলেন। য়ুরোপে কিন্তু এই 'জেন্টলম্যান,' প্রত্যয়টি মেলে না ; তাই জুল্‌ ভার্নে, কনরাড প্রভৃতির নায়ক ইংরেজ। তার কারণ এই : য়ুরোপে অভিজাত সম্প্রদায় লোপ পাবার পরে এমন কোনো মধ্য শ্রেণী তৈরি হয়নি যেটি দেশস্থ রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করবার ফলে রুশো কল্পিত 'নোবল্‌ স্যাভেজ্‌'কে ভদ্রজনে পরিণত করতে পারে। ইংলণ্ডের ভদ্রজন ইংরেজ সমাজের মেরুদণ্ড, তাঁদের 'সিভিক' ও 'পলিটিক্যাল' বোধ দেশকে জাগ্রত রাখতো, তাঁদের স্বেচ্ছাসেবার জন্য রাষ্ট্রের ওপর চাপ কমেছিল ও গণতন্ত্রের দিকে গতি সংহত, অবরুদ্ধ হয়েছিল। য়ুরোপে কিন্তু 'নোবেল্‌ স্যাভেজ্‌' বা গ্রামীণ কৃষিজীবীর আদর্শ মধ্যশ্রেণীর অবর্তমানে, কিংবা

অপেক্ষাকৃত অল্প প্রভাবের জন্য বজায় রইল। একধারে লর্ড শাফট্‌সবেরি ও অন্য দিকে বাকুনিন, ক্রপট্‌কিন-এর মত অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিভূদের সমাজবোধের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। রুশোর 'নোবল্ স্যাভেজ্'-এর সন্তান দু'টি, য়ুরোপীয়ান সন্ত্রাসবাদী নিহিলিস্ট ও হিটলার-লুডেনডর্ফ। বর্তমানের অ্যানার্কিজম্ ও ফ্যাশিজম্ খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই। এখন আমাদের বিবেচ্য কতদূর আমরা এ প্রকারের মানবতা গ্রহণ করব, করতে পারব।

গান্ধী-কল্পিত সমাজের আদর্শ-মানব 'নোবেল্ স্যাভেজ্'-এর সমগোত্র। মহাত্মাজী নিজে মানুষের 'ইনেট গুডনেস'-এ প্রত্যয়শীল ছিলেন এবং তাঁর অনুমোদিত সত্যাগ্রহের সত্য ভগবান, কিন্তু আগ্রহ মানুষের সহজাত; মানুষের সহজ, সদ্-প্রবৃত্তির উদ্বোধনই তাঁর রাজকীয় আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান, উচ্চ-নীচ জাতি, ধনিক-শ্রমিক, রাজা-প্রজার 'প্রকৃত' সম্বন্ধ নিরূপণের মূল কথা। প্রতি মানুষ, প্রতি ভারতবাসীর কাছে 'স্যাভেজ্'-এর প্রকৃতিগত সারল্য তিনি চেয়েছিলেন। তাঁর কল্পিত ও অনুমোদিত সমাজ-গঠনেও পূর্বোক্ত প্রত্যয়ের চিহ্ন বর্তমান। য়ুরোপীয় অ্যানার্কিস্টদের সমাজ-গঠনে দু'টি প্রধান তত্ত্ব ছিল— 'ডিসেণ্ট্রালিজেশন' আর 'ফেডারেলিজম্'। প্রথমটি যন্ত্রযুগের ও দ্বিতীয়টি উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র-পদ্ধতির প্রতিক্রিয়া। গান্ধী-কল্পিত সমাজ 'ডিসেণ্ট্রালাইজড্ ইকনমির' ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে আমরা জানি; কিন্তু যদিও তাঁর রচনায় ফেডারেলিজমের রূপ সুস্পষ্ট নয়, তবু তিনি এতটাই কেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে ছিলেন যে মোটামুটি তাঁকে এক প্রকারের ফেডারেলিস্ট বলা যায়। বলা বাহুল্য, তাঁর ফেডারেলিজম্ জেফার্সনীয় নয়। অ্যানার্কিস্টদের সঙ্গে এর আর একটি মিল কো-অপারেটিভ সমাজের প্রতি আস্থায়। সেটিও ইংরেজী ধরনের নয়, আমাদের দেশের পঞ্চায়েত কিংবা ক্রপ-ট্‌কিনের মনোমত রাশিয়ার 'মীর' সমাজের মতন। এই সহযোগী সমাজও 'নোবেল্ স্যাভেজ্'-এরই উপযোগী। (অবশ্য গান্ধীভক্ত শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজ, পঞ্চায়েত প্রভৃতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্য ধারণা পুষতেন)। এর বেশি বোধ হয় অন্য মিল পাওয়া যাবে না। গরমিলটাই এখন দ্রষ্টব্য।

ব্লাংকি, বাকুনিন, ক্রপট্‌কিন (সরেল্ একটু অন্য ধরনের এনার্কিস্ট) প্রভৃতির 'মর‍্যালিটি' খুবই উজ্জ্বল, কিন্তু গান্ধী মতবাদের ধর্মজ্ঞান একেবারেই অন্যরকম, কারণ সেটি ভগবৎবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। রুশো, ভলটেয়ারও ভগবান মানতেন, কিন্তু সমাজ-জীবন ও ব্যবহারিক জগৎ থেকে পৃথক রেখে। গান্ধীজীর মতে "ডিইজম্"-এর দ্বৈতবোধ ছিল না। এর ফল তাঁর জীবন ও নিকটস্থ ভক্তের পক্ষে শুভ হয়। ভগবানই তাঁকে রক্ষা করেন। সেই সঙ্গে হিন্দু সমাজকেও অবশ্য ধরতে হয়। হিন্দু সমাজের মতন বিশুদ্ধ টোট্যালিটেরিয়ান, 'রেজিমেণ্টেড' সমাজ

পৃথিবীতে নেই। এখানে গর্ভাধান থেকে মৃত্যুর পর ছয় পুরুষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের আসর। এখানকার একমাত্র ব্যক্তি মুক্তপুরুষ— যিনি কর্মফলকে জয় করেছেন। এই সমাজে 'অ্যানার্কিজম্' অচল, 'নোবল্ স্যাভেজ্'-এর প্রত্যয় বিরুদ্ধ। প্ল্যানিং-ই এই সমাজের ধর্ম অনুযায়ী। স্টেটের কথা এতদিন অবাস্তর ছিল, কারণ আমাদের ও-বস্তুটি ছিল না, এখন সবে তৈরি হচ্ছে। যতদিন না সেটা পাকাপাকি তৈরি হয় ততদিন অ্যানার্কিস্ট আদর্শের সামাজিক অর্থ নেই। যান্ত্রিক সভ্যতা এসেছে বটে, এখনও তার প্রসার ও প্রভাব এতটা হয়নি যে তার বিপক্ষাচরণ জীবনধর্ম হতে পারে। দেশের নেতৃবৃন্দের আচরণে যান্ত্রিক সভ্যতার সর্বপ্রথম গুণ, অর্থাৎ সময়জ্ঞান, যদিও এখনও মেলে না, তবু তাঁরা পোষ্যবৃন্দ সমেত হাওয়া-জাহাজে দিল্লী বিলেত পাড়ি দিচ্ছেন। এই হিসাবে তাঁদের মনুষ্যত্ব এখনও অটুট। এখনও প্রতি ভারতবাসী যন্ত্র চায়, যান্ত্রিক সভ্যতায় মুগ্ধ। হেঁটে তীর্থ যাত্রা করতে কোনো গ্রামবাসী, কোনো হিন্দু বিধবাই চান না। হঠাৎ লাঙল ছেড়ে ট্রাকটার ধরতে চাষীরা চায় না বটে, কিন্তু সেজন্য কৃষিবিভাগের অক্ষমতা কী চাষীদের রক্ষণশীলতা দায়ী এখনও তা স্থির হয় নি। তা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাগার, পরীক্ষাকেন্দ্র যান্ত্রিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয় কি? অর্থাৎ, যান্ত্রিক সভ্যতার চাহিদা এখনও অশেষ। এই বাস্তব সত্যকে গান্ধীবাদী মানেন তার 'নোবল্-স্যাভেজ্' বা গ্রামীণ কৃষিজীবী প্রত্যয়ের জন্য : অন্য ভাষায় ও ভাবে আদর্শবাদের জন্য। দুই প্রকার সত্যের— বাস্তব ও আদর্শ সত্যের (মধ্যযুগের 'নেচার অ্যাজ ইট ইজ' ও 'নেচার অ্যাজ ইট্ স্যুড্ বি') মধ্যেকার ফাঁক কিন্তু ভগবান নামে চিরন্তন সত্য ভরাট করতে পারে না এই যুগে। এমন কী ভারতবর্ষেও : তার প্রমাণ মহাত্মাজীর জীবদ্দশায় তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও ইংরেজের সঙ্গে নতুন ব্যবসার বন্দোবস্ত, এবং তাঁর বিশ্বাস ও তাঁর অনুরোধসত্ত্বেও কালোবাজার, আর তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই আশীর্বাদ অর্থাৎ 'ডিকন্ট্রোল'-এর এমন অসদ্ব্যবহার। গত দু'তিন মাসে কাপড়ের দাম বৃদ্ধি গান্ধীমতবাদের আভ্যন্তরীণ গলদ চেঁচিয়ে প্রমাণ করছে। 'নোবল্ স্যাভেজ্'-এর 'নোবিলিটি' আর রইল না, থাকল 'স্যাভেজারী'-টুকু। মোদ্দাকথা এই : গান্ধীবাদের মানুষ আপনার আমার পরিচিত মানুষ নয়, অথচ গান্ধীযুগের শক্তিশালী মানুষ আপনার আমার জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে। রুশোর কল্পনা, তথা অ্যানার্কিস্ট কল্পনার দোষই এই : সেখানে ইতিহাসের স্পর্শ নেই। অতএব এমন হ্যুম্যানিজম্ চাই যেটি বাস্তব সত্য ও ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এমন হ্যুম্যানিজম্ চাই না যার অন্তে নিহিলিজম্— সম্পূর্ণ নেতিবাদ, যার চরম প্রকাশ সন্ত্রাসবাদীর গুলির আওয়াজে, কিংবা থোরোর বনবাসে, টলস্টয়ের পলায়নে, নীটশের মহামানবে, আশ্রমবাসের অদ্ভুত উৎকেন্দ্রিক নিয়ম-বহির্ভূত আচরণে।

নব্য সমাজদর্শন একটু পেসিমিস্ট হতে বাধ্য।

কোঁৎ, হ্যারিসন, হিউম, শিলার, জুলিয়ান হাক্সলি প্রভৃতির হ্যুম্যানিজম্ আলোচনা করবার প্রয়োজন যতটা পাঠ্যপুস্তকে আছে এখানে ততটা নেই। প্রকৃত পক্ষে পজিটিভিজম্ ও তার পরবর্তী বৈজ্ঞানিক মানবতা মানুষ-বিহীন মানবধর্ম। ভগবান ও মানুষ উভয়কে পরিত্যাগ করে যে ধর্ম হয় না রবীন্দ্রনাথ চমৎকার দেখিয়েছেন তাঁর 'চতুরঙ্গে'। যদিও ধরা যায় যে তিনি ভুল বুঝেছিলেন, তবু যতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকের হাতে রাজ্যভার না আসছে ততদিন বৈজ্ঞানিক মানবতা নিরর্থক। বরঞ্চ যা দেখছি তাতে মনে হয় যে, বৈজ্ঞানিক অন্যের উপর রাষ্ট্র কিংবা মনিবদের হাতে দায়িত্ব সঁপে দিতে ব্যস্ত। পৃথিবীতে কোথাও বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় পলিসি নিয়ন্ত্রণ করেন না। সেদিন একটি অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল, বহুবাজারের 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স্'-এর বাৎসরিক রিপোর্ট ও আবেদনে। কর্তৃপক্ষ ধনিকশ্রেণীর কাছ থেকে ফেলোশিপ চাইছেন। তার শর্ত কী ধরনের হবে লিখতে গিয়ে আমেরিকান মেলন এন্‌ডাউমেন্টে-এর শর্ত উদ্ধৃত হয়েছে। একটি শর্ত এই: দাতার মত নিয়ে রিসার্চ ছাপানো হবে, অর্থাৎ মত না দিলে এমন কোনো রিসার্চ ছাপানো হবে না যার ফলে দাতার ব্যবসায়ের ক্ষতি হয় ইত্যাদি। মজা এই: এগুলিকে সমান্তরাল আদর্শ গণ্য করা হচ্ছে। যাঁরা করেছেন তাঁরা সকলেই দেশভক্ত, প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক, স্বাধীনতাপ্রিয়, গবেষণায় শ্রদ্ধাবান, বিজ্ঞানে আস্থাবান, এবং বৈজ্ঞানিকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। হয়তো তাঁদের ধারনা এই: টাকাটা তো প্রথমে আসুক, বিজ্ঞান তো প্রথমে ছড়িয়ে পড়ুক, তারপর দেখা যাবে ধনিক কত-বড় শক্তিশালী। এঁরা বোধ হয় পেটেন্টের বর্তমান অবস্থা ভুলে গেছেন। হয়তো আমেরিকার টাকার সরগরমে এঁরা মুহ্যমান। কিন্তু আমেরিকাতেই একা বেল টেলিফোন সিস্টেম ৩৪০০ অব্যবহৃত পেটেন্ট চেপে রাখলেন একচেটিয়া ব্যবসার মুনাফার জন্য। খবরটি ১৯৩৭ সালের সরকারী ফেডারেল কম্যুনিকেশন্‌স্-এর রিপোর্টে আছে। এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল সংখ্যায় 'দি কী টু দি আইস্ বক্স' নামে প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। এই সব কারণেই মনে হয় যে বৈজ্ঞানিকেরা সমাজ-চিন্তার জন্য এখনও অনুপযোগী। এতদূর পর্যন্ত বলা চলে, সমাজবোধহীন বৈজ্ঞানিকবৃন্দের কাছ থেকে কোনো প্রকার মানবধর্মই প্রত্যাশা করা অন্যায়। এঁদের সঙ্গে আদর্শবাদী দার্শনিকদের কোনো প্রভেদ নেই: যাঁরা সমাজ চালান তাঁরা দু'দলকেই বোকা বানাতে পারেন, চাকর রাখতে পারেন।

যুক্তি এসে পৌঁছেছে: দর্শন চিরন্তন সনাতন নয়, যুগানুযায়ী, যদিও প্রত্যেক

যুগোপযোগী দর্শন যুগের প্রয়োজনীয়তা অতিক্রম করতে ব্যগ্র। ভারতের এখন নতুন অবস্থা, যার আহ্বানে সাড়া না দিলে সে মরে যাবে। অতএব নব্য দর্শনের প্রথম প্রতিজ্ঞা কর্মশীলতা; অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-সাপেক্ষতা। এতদিন যে দর্শন চালু ছিল তাকে যা নামই দেওয়া হোক না কেন তার মূলে থাকতো ভগবৎবিশ্বাস; এখন ভগবৎবিশ্বাস সমাজে নতুন প্রাণসঞ্চার করতে অক্ষম, যদিও সমাজ পরিবর্তনের নতুন শক্তি, ধনিকতন্ত্র, তাকে ব্যবহার করতে, আত্মরক্ষার জন্য তার রূপ গ্রহণ করতে সদা তৎপর। ভারতীয় ধনিকতন্ত্রের কীর্তিকলাপ দেখে শুনে মনে হয় সেটি প্রকৃত ভগবৎবিশ্বাসের শত্রু। তা ছাড়া, আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হচ্ছে। অথচ বিশ্বাস চাই। মানুষের প্রতি বিশ্বাসই ভগবৎবিশ্বাসের স্থান নিতে পারে। সে বিশ্বাসেরও ভিন্ন রূপ আছে। রিনেসাঁ-রিফর্মেশন যুগের মানুষ ঐ ধনিকতন্ত্রের চাপে ব্যক্তি হল, এবং সেইদিন থেকে য়ুরোপীয় সমাজ গেল ঘুচে। রুশো-কল্পিত মানবের পরিণতি নিহিলিস্ট সন্ত্রাসবাদী ও হিটলার। বৈজ্ঞানিক মানবতায় মানব-প্রত্যয় নেই, মানবিকতা কিংবা 'কমন ম্যান' নামে এক অবাস্তব বস্তু আছে যার ওপর বিশ্বাসের প্রেরণায় সমাজের নতুন রূপ পরিগ্রহ সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায়ের ব্যবহারে সমাজবোধ এখনও প্রসারিত হয়নি, অন্তত আমাদের দেশে। এখন প্রশ্ন হল, তবে কোন্ মানব-প্রত্যয়? গান্ধী-কল্পিত মানব প্রত্যয়ের গলদ প্রতি ভারতবাসী বুঝতে পেরেছে। তিনি 'ইনেট গুডনেস্' বা স্বভাব ভালমানুষে বিশ্বাসী ছিলেন, এবং তারই জোরে কণ্ট্রোল তুলে দিলেন। ফল সাদা বাজার, যেটি 'কালোবাজারে'র চেয়েও ভয়ংকর। অর্থাৎ নব্য সমাজ-দর্শনের মানুষ 'নোবল্ স্যাভেজ্,' বৈজ্ঞানিক, কিংবা অপরিণত দেবতা হতে পারে না। মানুষ হবে পুরুষ; সে একক ব্যক্তিসত্তা বা ইণ্ডিভিজুয়াল হবে না,—হবে 'পার্সন'।

১৩৫৫

ব্যক্তিবাদের পরিণতি যদি নিহিলিজম্, অর্থাৎ য়ুরোপীয় সামাজিক নেতিবাদ ও নিছক শক্তিপূজা অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ না হতো তবে পুরুষ সংজ্ঞাটির বিশেষ কোনো আবশ্যক থাকতো না। বলা বাহুল্য, যুগোপযোগী পুরুষ-সংজ্ঞা সাংখ্যের পুরুষ কিংবা গীতার পুরুষকারের পুরুষ ঠিক নয়। অথচ স্বেচ্ছায় প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা এবং কর্মচক্র থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীলতা অর্থাৎ পুরুষকারের মধ্যে একটা মিল রয়েছে। সেই জন্যই পুরুষ কথাটার ব্যবহার সু-প্রয়োগ। ব্যক্তিবাদের সঙ্গে পুরুষবাদের পার্থক্য কিন্তু অনেক। প্রথম পার্থক্য সমাজ থেকে ছিন্ন, ভিন্ন, অতএব হয় সে সমাজের শত্রু, না হয় ব্যর্থতাবোধে সামাজিকতায় আত্মহারা, নৈরাত্মক। এই ভিন্নতাবোধের প্রথম অবস্থা—একাকিত্ব, যার জন্য দুর্কহাইম্-এর মতে আত্মহত্যা ও এরিক ফ্রম-এর মতে ফ্যাশিজম্। দ্বিতীয় অবস্থা, দায়িত্বহীন সমালোচনা ও অসামাজিক ব্যবহার, যার প্রমাণ কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে, ট্রামে-বাসে-এ, চা-এর ও কাপড়ের দোকানে। তৃতীয় অবস্থা, বিরুদ্ধতার জন্যই বিরুদ্ধতা, আইন ফাঁকি দেবার জন্যই ফাঁকি, পুলিশের প্রতি অশ্রদ্ধার জন্যই অশ্রদ্ধা, অর্থাৎ নিয়মকানুনে অবিশ্বাস ও অনিয়মের অভ্যাস। এরই প্রতিফলন দেখি প্ল্যানিং না মানায়, ধনিক-তন্ত্রের ও আন্তঃ-রাষ্ট্রনীতির অরাজকতায়। কবিতায় দুর্বোধ্যতা, বৈজ্ঞানিক ও আর্টিস্টের আত্মম্ভরিতা, বিশেষজ্ঞের দম্ভ, কী সমাজ-সংস্কারকের আত্মপ্রসাদ, প্রত্যেকটি ঐ ব্যক্তিবাদের অন্তঃস্থ বৈপরীত্য-বোধের প্রকাশ। ন্যায়শাস্ত্রের either/or অব্যয়টিও তাই থেকে উদ্ভূত। তার জন্য বিজ্ঞানে ও অন্য জ্ঞানে কত সর্বনাশ হয়েছে দেখাবার স্থান নেই। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে either/or-এর ক্ষতির বোঝা দুর্বিসহ। যথা, হয় তুমি আমার বন্ধু, না হয় শত্রু; হয় তুমি রাশিয়ার দলে না হয় আমেরিকার; হয় তুমি হিন্দুস্থানী, না হয় পাকিস্তানী; হয় তুমি কমিউ-নিস্ট, না হয় ধনিকের পোষ্যপুত্র; হয় সাহিত্যে 'ক' ও সঙ্গীতে 'খ'-এর ভক্ত, না হয় শত্রু····ইত্যাদি। অনেকের মতে এই এরিস্টটেলিও যুক্তি-পদ্ধতি বুদ্ধির ধর্ম, চিরন্তন সত্য। নিতান্ত সুখের বিষয় যে, আধুনিক গ্রীক-সভ্যতার বিশেষজ্ঞরা পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছেন যে, এরিস্টটেলিও তর্কশাস্ত্র পতনোন্মুখ গ্রীক সভ্যতার প্রতিফলন, এবং তার পূর্বে, যখন গ্রীক সমাজজীবন ঘন-সম্বদ্ধ ছিল, তখন, অন্য যুক্তি-পদ্ধতির প্রচলন ছিল। কেবল তাই নয়, ক্রাবিন্‌স্কী নামে একজন পোল মহাপণ্ডিত তাঁর *Science and Sanity* নামে যুগান্তকারী বইএ প্রমাণ করেছেন যে, য়ুরোপীয় জ্ঞানের প্রত্যেকটি বিষয়ে— তিনি প্রায় কুড়িটি

বিদ্রূপ ধরেছেন— এই অ্যারিস্টটেলিয় অবয়ব মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করেছে, যার ফলে সমগ্র জগৎ আজ উন্মাদ-আশ্রম। তিনি Non Aristotelian Society-র সভাপতি। পুরুষবাদে বিপরীতবোধ— versus-sense নেই। তার পরিবর্তে আছে সংযোগ-বোধ— integral-sense. এর যুক্তি প্রধানত ডায়েলেক্টিক্, অন্ততপক্ষে জন স্টুয়ার্ট মিল-এর composition, association-এর নিয়মাবলী, যেগুলিকে তিনি সমাজ বিজ্ঞানের উপযোগী ভেবেছিলেন। অতএব পুরুষবাদের স্বাধীনতা স্ট্যাটিক কনসেপ্ট (static concept) নয়, dynamic —চলন্ত, সক্রিয়। অর্থাৎ বিপক্ষাচরণের স্বাধীনতা আর সহযোগে কাজ করার সঙ্গে মানুষের যে স্বাধীনতা জন্মায় ও অন্যপ্রকার উঁচু ধরনের কর্মে অধিকার আসে— এই দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। মিল মাত্র পুরুষ ও ব্যক্তির দেহে, মাত্র যে বস্তুটি তবু খানিকটা নিজস্ব ও একান্ত।

সমবায়ী, সংযোগী পুরুষই বাস্তব, ব্যক্তি অবাস্তব। মানুষ সামাজিক জীব, এর অর্থই তাই। সে জন্মায়, জীবন চালায়, মরে সমাজ-বন্ধনের মধ্যে। সমাজ-গণ্ডি বিভিন্ন ; প্রাথমিক গণ্ডিতে যাকে প্রাইমারি গ্রুপ (Primary group) বলা হয়, জীবন জীবতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ও দৈহিক সংযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন গোষ্ঠী। তার পরের গণ্ডিতে, যাকে সেকেণ্ডারি গ্রুপ (secondary group) বলা হয়, মানুষ জীবজগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়। মুক্তিটাই যদি সেকেণ্ডারি গ্রুপ সৃষ্টির একমাত্র ঘটনা হতো তবে তাই থেকেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সূত্র টানা যেত। সৌভাগ্যক্রমে সেকেণ্ডারি গ্রুপ গড়ে তোলবার কাজটা থাকে ; এবং কাজ আরম্ভ হলেই দেখা যায় নতুন বন্ধন, নতুন নিয়মকানুনের প্রয়োজন। এই চলল, বহু প্রকারের সমবায় মানুষ তৈরি করেছে যার একটি অন্যটি থেকে খোলা অথচ নিয়ম বহির্ভূত নয়। স্বরাজ অর্থে স্বকৃত নিয়মাবলীর অনুবর্তিতা। শৈশবকালে মা-ঠাকুমার নিয়ম প্রায় নিয়তির মতন ; প্রৌঢ় বয়সে বিজ্ঞান-সমিতির সভ্যতা প্রায় স্বাধীনতার সামিল। জীবপ্রকৃতির নিয়মাধীনতা থেকে সভ্য জগতের ভদ্র ব্যবহার পর্যন্ত ক্রমেই ইতিহাসে স্বাধীনতার নিদর্শন মাত্র— এক গণ্ডি থেকে অন্য গণ্ডিতে যাবার অদম্য ইচ্ছাটুকু। এইখানে নিয়তিবাদের সীমা, আবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতারও সীমা। পুরুষ দু'টি সীমার মধ্যে পথ হারায় না। ব্যক্তিই ধাঁধায় পড়ে। রবীন্দ্রনাথের 'সীমার মধ্যে অসীম তুমি' প্রভৃতি কবিতার ভাবের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁদের কাছে পুরুষ প্রত্যয়টির অর্থ সহজ।

যে পুরুষবাদ নব্য দর্শনের প্রতিজ্ঞা হবে তাকে কিন্তু অন্য একটি নিকটস্থ পুরুষবাদ থেকে ভিন্ন রাখতে হবে। একপ্রকার অবিনশ্বর আত্মায় বিশ্বাস আছে সেখানে মৃত্যুর পরও ব্যক্তিত্ব বা personality-র অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। আত্মীয়ের

মৃত্যুর পর এই প্রকার স্বীকার হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু তার উল্লেখ এখানে হচ্ছে না। খ্রীস্টান ধর্মের ব্যক্তিত্বের কথা বলছি। যীশুর জীবনাদর্শে পুরুষত্ব খাড়া করা, কিংবা তাঁর মাধ্যমে পরমপিতার প্রিয় হওয়া অচল। পূর্বে লর্ড শাফ্‌ট্‌সবেরির নাম করা হয়েছে। তিনি ছিলেন 'টোরি', ধর্মপ্রাণ, খ্রীস্টান শ্রমিকদের স্বপক্ষে ইংরাজী আইনের তিনি ছিলেন বিধাতা। যিনি তাঁর জীবনী পড়েছেন তিনি জানেন যে, তাঁর সংস্কার-প্রবৃত্তির উৎসে না ছিল ধনিকের প্রতি হিংসা, না ছিল শ্রমিকের প্রতি প্রেম, ছিল কেবল যীশুখ্রীস্টের আদর্শ। সে আদর্শের ফলে তিনি শ্রমিক আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন। অর্থাৎ খ্রীস্টান ধর্মের করুণায় (grace) নির্যাতিতের ক্ষত শুকোয়, কিন্তু তার সাহায্যে কেবল স্কন্ধ থেকে নামাটি হয় না। আজ অনেক ক্যাথলিক প্রায় সোশিয়ালিস্ট হয়েছেন, লাল ডীনের নাম অনেকেই শুনেছেন, কিন্তু ফ্রান্সে এঁদের প্রকৃত রূপ ফুটে উঠেছে। স্বর্গ থেকে পতনই যদি মানবেতিহাসের আদি ও স্বর্গে গমনই যদি তার শেষ পর্ব হয় তবে মানব-সৃষ্ট ইতিহাস পার্শি থিয়েটারের মহাভারত নাটকের দু'টি অঙ্কের মধ্যেকার প্রহসন, তামাসা, ভাঁড়ামি ছাড়া অন্য কিছু বলে গণ্য হতে পারে না। পুরুষের কর্মশীলতায় আর কিছু থাক আর না থাক মর্যাদা থাকা চাই। ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদাজ্ঞান নেই। একধিক খ্রীস্টান পণ্ডিত অবশ্য খ্রীস্টান পুরুষবাদে একটা ট্র্যাজিক মর্যাদা পেয়েছেন। কিন্তু আজ যে একটি খ্রীস্টান জাতি পৃথিবীর উপর সর্দারি করছেন তার বিচার-বুদ্ধি, পুরুষত্বের নমুনা দেখলে মাতাল ভাঁড়ের কথাই মনে আসে। তার অজানিতে তার ব্যক্তিত্ববাদের ফলে সমগ্র বিশ্বের যে ক্ষতি হবে সেইটেই হবে সত্যকারের ট্র্যাজেডি। তার সঙ্গে খ্রীস্টান পণ্ডিত বর্ণিত খ্রীস্টান পুরুষের **"tragic sense of being in Christ on the cross'**-এর কোনো প্রকার আত্মীয়তা নেই।

আরেক প্রকার পুরুষবাদকেও এড়িয়ে যেতে হবে। আদিম, অসভ্য, বর্বর জাতি শত্রু-মিত্রকে পার্সোনেলাইজ (personalise) করতো। শক্তিকে নৈর্ব্যক্তিক ভাববার জন্য যতটা মননের উন্নতি দরকার ততটা উন্নতি তাদের হয়নি; কিংবা হয়তো তাদের যুক্তিধারা অন্যরকমের ছিল। যে কারণেই হোক, বাহ্য শক্তিকে মানুষে পরিণত করার অভ্যাস বর্বরতার একটি সাধারণ গুণ। আচার ব্যবহারের ছকে গুণটি বাঁধা পড়ে। ফলে সমাজবিন্যাস শুরু হয়। নেতা, পুরোহিত, চারণ প্রভৃতি উপরকার শ্রেণী— এঁরা শক্তিকে মানুষ ভাবতে ও ভাবাতে পটু— এবং নিম্ন-শ্রেণী— এঁরা হলেন বাকি সব লোক যাঁরা প্রাকৃতিক শক্তির সম্মুখীন হতে অক্ষম, এই দু'টি ভাগে সমাজ আদিকাল থেকেই বিভক্ত। কিন্তু সমাজ-প্রথা গঠনের জন্য 'ঈশ্বরে মনুষ্যরূপ আরোপ' বা **anthropomorphism**-এর প্রতি আমরা যতই কৃতজ্ঞ হই না কেন আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে যে, সমাজের পূর্বোক্তটি দু'

শ্রেণীকে চিরন্তন রাখবার জন্য অর্থাৎ সমাজ-বন্ধনের জন্য, ঐ ঈশ্বরে মনুষ্যরূপ আরোপ করা' বা এ্যানথ্রোপোমরফিজম্‌ই দায়ী। নেতা থেকে নেতৃত্ব, শামান জাদুকর থেকে পৌরোহিত্য, চারণ থেকে সভা-কবি প্রভৃতি অনুষ্ঠান যখন সৃষ্ট হলো, তখন অনুষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ শক্তি, অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে কিংবা ভয় থেকে বাঁচিয়ে কাজ চালানো ও সেই কাজকেই উত্তম ও চিরন্তন সত্য প্রতিপন্ন করার শক্তি মানবিক সম্বন্ধে কেবল ঢাকাই পড়ল, পরিবর্তিত হলো না। এ্যানথ্রোপোমরফিজম্‌-এর দৃষ্টান্ত দিলেই ভয় বস্তুটির সাক্ষাৎ মিলবে। সব চেয়ে মধুর দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তাঁর *Personality* বইখানিতে। তিনি বলেছেন, আজ আমরা দেব-দেবীকে ঘরোয়া, আত্মীয় করে নিয়েছি : দুর্গা আমাদের ঘরের মেয়ে, তিনি বাপের বাড়ি আসেন আবার শ্বশুর বাড়ি যান, যথা আগমনী বিজয়ার গান ইত্যাদি। এই 'আমরা' কেবল বাঙালী, ভারতবাসী, না বিশ্বের প্রত্যেক পূর্বতন জাতি— এ প্রশ্নটি না তুলে ঐ প্রকার মানবীকরণ প্রক্রিয়ারই অন্য একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। বসন্তের জন্য মা শীতলা, কলেরার জন্য ওলা দেবীর কথাই আজ মনে উঠছে। শীতলাকে যখন মা, ওলাকে যখন দেবী বলা হচ্ছে, যেমন বঙ্গরমণীকে বলা হয়, তাঁরা নিশ্চয় মানবীকৃত হয়েছেন ; এবং বসন্ত ও কলেরার শক্তি এতই প্রচুর ও ভয়ংকর যে আজও পর্যন্ত কলকাতা করপোরেশনের মত প্রতিষ্ঠানও তাদের বাগে আনতে পারছেন না। এখন যদি কোনো উড়িয়া ঠাকুর মা শীতলা কী ওলা দেবীকে নিয়ে বাড়ির দরজায় হাজির হন তখন ঐ হ্যুম্যানইজড্‌ বা মানবীকৃত শক্তির জন্য চারটি পয়সা দিতে আধুনিক গৃহিণীরাও কার্পণ্য করেন না। ভাবেন, না দিলে কী জানি বেবু-মার কী হয়! মা দুর্গাকে আমরা সাদরে আহ্বান করি নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁর সাদর-অভ্যর্থনা না হলে গৃহের অকল্যাণ হবে— এ ভয়টিও থাকে। মহাত্মাজীর জীবদ্দশায় তাঁর অতি বড় ভক্তরাও তাঁকে ভয় পেতেন, পাছে কোনো কাজ মতবিরুদ্ধ হয়। কারণ তিনি ছিলেন ভারতের কল্যাণ ও স্বাধীনতার 'মূর্তি'। বহুলোকে মনে মনে তাঁর প্রদর্শিত পন্থার সমালোচনা করেছে, কিন্তু কাজের সময় সেই পথ ছাড়া অন্য পথে যাবার সাহস পাননি। বহুবার তিনি কংগ্রেস সমিতিকে এমন কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন ও যার গুরুতর বিপক্ষাচরণ উঠলেই বলেছেন, "তোমাদের ইচ্ছা, যা ভাল বোঝ তাই করো আমি যা ভাল বুঝি তাই আমাকে করতে দাও। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও" ; এই প্রকার আচরণ ও প্রায়োপবাস, অনশন প্রভৃতিকে অনেক ভক্তরাও পিস্তল মুখিয়ে ধরার সঙ্গে তুলনা করতেন। তবু তাঁর কথাই খাটতো, কেন না তাঁর অবাধ্যতা অন্যায় হবে, কারণ তিনি কল্যাণমূর্তি। মূর্তিটিকে যেমন লোকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো

তেমনই তাকে ভয়ও পেত। অমন প্রেমের অবতারের সম্বন্ধেও যদি আমাদের দিক থেকে ভয় আসে তবে অন্যে পরে কা কথা। তাঁর উপদেশ মেনে আমরা প্রায় স্বাধীন হয়েছি, অতএব কল্যাণমূর্তির প্রত্যয়ে উপকার নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু মূর্তি পূজার জন্য স্বাধীন চিন্তার অবসর মেলেনি এ কথাটাও মানতে হবে। নচেৎ, জহরলাল পর্যন্ত স্বীকার করতেন না **'we have been taken unawares'**—তাও একবার দু'বার নয়, বহুবার; নচেৎ গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র নামে 'সোনার পাথর বাটি' বাজারে সোনার তাল বলে চলত না; নচেৎ বাম-মার্গী যে কোনো দলকে খোঁচা দেওয়া, ঘৃণার্হ ভাবা বিশুদ্ধ দেশ-ভক্তির চিহ্ন হতো না। এ্যানথ্রোপোমরফিজম্-এর মানুষ মানবধর্মের মানুষ নয়। তার মানুষ সাধারণ্যের শক্তিকে না বুঝতে পারার ফল; তার মানুষ রক্তমাংসের নয়, প্রেতাত্মার শরীর ধারণ। সেটা মানব-সভ্যতার অঙ্গ নিশ্চয়, কিন্তু ডাক্তারেরা এপেন্ডিক্স্টাকেও অঙ্গ ধরেন, তবে বর্তমান দেহের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবে। সমাজদেহের পেরিটনাইটিস্ কিছু কাম্য নয়।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, পুরুষ প্রাইমারি গ্রুপে জন্মে তাকে অতিক্রম করে। তার পরি:ওলের অন্ত নেই। গোত্র, গোষ্ঠী (**clan tribe**) প্রভৃতির মধ্যে বদ্ধ থাকা তার পক্ষে অসহ্য, কারণ এই প্রকার গণ্ডিও তার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করে। তবে মরা-বাঁচার উপর সেগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করে না। তার মর্যাদা-মণ্ডলির সংখ্যাবৃদ্ধি, আয়বৃদ্ধিও যুদ্ধজয়ের জন্য। পুরুষ তাই বৃহত্তর সঙ্গ, সহবাস, সহযোগ, সমবায় সৃষ্টি করতে চায় যেখানে তার মনুষ্যত্বের মান যাচাই হতে পারে। এই ক্রমাগত অতিক্রমের ইচ্ছা পুরুষকারের প্রকৃত পরিচয়; এবং এটা হিন্দু গোষ্ঠীর **heteronomons** ব্যক্তিত্ব ও য়ুরো-আমেরিকান সমাজের অসামাজিক **a-nomons** ব্যক্তিত্ব, উভয় থেকেই পৃথক; কারণ এটি **autonomous,** স্ব-অধীন। এবং ঠিক এ কারণেই পুরুষ যেমন অধিকার অর্জনে তৎপর তেমনই দায়িত্ববোধে কর্মী ও জ্ঞানী। 'পুরুষের আশ্রয়েই অধিকার-দায়িত্ব একত্রিত হয়। একটি বৃত্তের অধিকার অন্য বৃত্তের দায়িত্বে তখনই রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব যখন ব্যক্তি বনাম সমাজ কী রাষ্ট্র প্রভৃতি দ্বন্দ্বের পরিবর্তে সমাজ-সংযুক্ত মানুষ সমাজ-পরিধিকে ক্রম-বর্ধমান করে তোলে। অতিক্রমশীল সামাজিক মানুষের কাছে অধিকার-দায়িত্বের অ-বাস্তব বিরোধ নেই।

আর একটি বিরোধও সমন্বিত হয় পুরুষবাদে। ঐতিহ্য ও পরীক্ষার দ্বন্দ্বের কথা সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, বিজ্ঞানে ছড়াছড়ি। যতক্ষণ মানুষ অ-সামাজিক, অ-বাস্তব, অ-বিশেষ মানব-কণা মাত্র ততক্ষণ এ বিরোধের অর্থ আছে। লোকের ধারণা, যে ঐতিহ্য মানে সেই রক্ষণশীল, আর যে পরীক্ষা করে সেই প্রগতিশীল।

কেবল তাই নয়, লোকে ভাবে হয় তুমি এটি না হয় তুমি অন্যটি, এবং এটি-ওটি চির শত্রু। এ সেই either/or যুক্তি। কিন্তু পুরুষ জন্মায় ঐতিহ্যের গর্ভে, এবং কর্মের জোরে বেরিয়ে আসে জীবনের পরীক্ষাগারে। একই মানুষ ঐতিহ্যের ভার বহন করে আগুয়ান হয়, কখনও ভার কমায়, কখনও আবার নতুন ভার গ্রহণে ভয় পায় না। এই প্রকার নির্বাচিত নিরবচ্ছিন্নতা, এই ক্রমশ প্রকাশ্যতাই পুরুষের একমাত্র স্বাধীনতা। য়ুরোপীয় সোশিয়ালিস্টরা যখন পশ্চিমী ডিমক্রাসির অর্থ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ধরেন তখন তবু খানিকটা বোঝা যায় কেন না 'ব্যক্তি' প্রত্যয়টি য়ুরোপীয়ান জ্ঞান ও কর্মধারা থেকে উঠেছে, কিন্তু ভারতীয় সোশিয়ালিস্টের পক্ষে গণতান্ত্রিক সোশিয়ালিজম্-এর (democratic socialiasm) সঙ্গে অন্য প্রকার সোশিয়ালিজম্-এর পার্থক্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতায়, এ কথা বলা অ-যৌক্তিক। ভারতীয় সমাজ যতই ভেঙে পড়ুক না কেন সেটি এখনও অসংলগ্ন, ব্যক্তিকণার জঞ্জাল হয়নি। তার আচার-ব্যবহারে, তার দৃষ্টিভঙ্গিতে এখনও এমন একটি মানব প্রত্যয়ের আভাস মেলে যেটি ব্যক্তিত্বের অপেক্ষা পুরুষ-তত্ত্বের অনুকূল। হিন্দু-সমাজ —মুসলমান সমাজকেও ধরা যায়— পুরুষত্বের বাধা দেয়নি বলছি না— তা যদি হতো তবে কোনো দুঃখই ছিল না। তবে যদি এমন কোনো মনোনয়ন আমাদের করতেই হয়, য়ুরোপীয় সভ্যতার খণ্ড-বিখণ্ডিত, অবরোহী নির্ণয়-সিদ্ধ ভাসমান, শিকড়-ছেঁড়া ও সে হিসেবে স্বাধীন, ব্যক্তি-প্রত্যয় গ্রহণ করবো, কিংবা ভারতীয় সভ্যতার এখনও অখণ্ড, জমাট বদ্ধ—concrete, এবং সে হিসেবে আচার ও নিয়মাধীন মানুষকে দিয়ে নব্য সমাজের গোড়া পত্তন করবো, তখন আমরা নিশ্চিন্ত মনে ঐতিহ্যের ধারা অনুসারে অগ্রসর হতে পারি। আমাদের কেবল দেখতে হবে দ্বিতীয়, তৃতীয় মণ্ডলের সামাজিক দায়িত্ব পরের মণ্ডলীর অধিকারে বাধা দিচ্ছে কি না। আমাদের সমাজের বৃহত্তর মণ্ডলী হল জাতি (caste); তার অতিরিক্ত যে মণ্ডলী আছে সেটি মৃত ব্যক্তির আত্মার— অবশ্য এটিও জাতির বর্ণালী। সবশেষে আছেন লোকাতিরিক্ত ব্রহ্ম। তাকে মণ্ডলী বলা যায় না। মধ্যেকার মণ্ডলীর মধ্যে আছে কেবল দার্শনিক ও সন্ন্যাসীর দল যাদের কুম্ভ-মেলায় নিয়মিত মিলন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অত্যাশ্চর্য সামাজিক ঘটনা। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতীয় সমাজে অন্য মধ্যস্থিত গ্রুপ তৈরি হয়েছে, যেমন আর্থিক শ্রেণী, যার আভাস হয়তো পুরাতন ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যায়, কিন্তু যার স্পষ্টপ্রকাশ মাত্র এই কয় বৎসরের ঘটনায়। এদের অগ্রাহ্য করে কোনো নব্য সমাজদর্শন তৈরি করা যায় না। তবে পুরুষতত্ত্বের প্রথম কথাটি ভুললে চলবে না; শ্রেণীকেও খোলা রাখতে হবে। মুক্তশ্রেণীই প্রকৃত ডিমক্রাটিক বা গণতান্ত্রিক সমাজ, এবং সেই সমাজেই পুরুষত্ব পূর্ণ হয়। তার রূপ কী হবে পরে জ্যোতিষীরাই বলতে পারেন। আমি যতটা মার্কস্-এঙ্গেলস বুঝেছি তাইতে আমার ধারণা হয়েছে এই যে, এই প্রকার পুরুষ-তত্ত্বই তাঁদের মনের কথা ছিল।

১৩৫৫

মার্কস্‌বাদ ও মনুষ্যধর্ম

মার্কস্‌বাদের বিপক্ষে একটা বড় ও সাধারণ আপত্তি এই যে, তাতে ব্যক্তির কোনো স্থান নেই। অনেকেই এই আপত্তির জবাব দিয়েছেন। জবাবের মধ্যে দু'টি কথা সকলেই অবশ্য মানতে বাধ্য: (১) ধনতন্ত্রের দাপটে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ব্যক্তিত্ব খুইয়েছে, অতএব ধনতন্ত্র না গেলে ব্যক্তিত্ব-স্ফুরণের অবকাশই মিলবে না; এবং (২) এই সমাজে মাত্র যে জনকয়েকের ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের সুবিধা ঘটেছে, তাদের জীবনেও সেই সুবিধার পূর্ণ ব্যবহার হয়নি। প্রমাণ-স্বরূপ প্রত্যেক শ্রমিক ও 'ব্যাবিট্'-শ্রেণীর অপরিণত জীবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ ছাড়া, অন্য স্তরের লোকেরাও প্রাণ ধারণে এত ব্যস্ত, আর্থিক শোষণে এতই ক্লান্ত যে ব্যক্তিত্ব তাদের পক্ষে গল্প মাত্র, ফুটিয়ে তোলা তো দূরের কথা। শিক্ষক-সম্প্রদায়, আর্টিস্ট, বৈজ্ঞানিক, প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীরই আজ এই দশা। তবু এই ধরনের উত্তর নঙর্থক, কারণ ধনতন্ত্রে মানুষ ছোট হচ্ছে মানলেই মার্কস্‌-পছন্দ সমাজে মনুষ্যত্ব ফুটবেই ফুটবে বলা যায় না। এইখানেই রাশিয়ার ঝগড়া ওঠে। কেউ বলছেন সেখানে মানুষ যাঁতা কলে পিষে মরছে, আবার কেউ বলছেন সেখানে মানুষ সব অতিমানুষ হয়ে উঠেছে। ওদেশে যখন যাইনি তখন মাত্র এইটুকু মানবো যে সেখানকার মানুষ নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু আমেরিকানরাও আত্মবিশ্বাসী। দু'টোর মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে, তবে মনে হয় যে তার ইঙ্গিত পূর্বোক্ত মার্কসিজম্‌-এর স্বপক্ষে জবাবদিহির মধ্যে নেই।

অন্য উত্তর চাই। ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে দেখলে মন্দ হয় না। মানুষের সভ্যতায়, চিন্তায় ও ব্যবহারে বহুবার তার সঙ্গে প্রকৃতির ও সমষ্টির বিবাদ বেধেছে। আদিম তথাকথিত অসভ্য জাতির মধ্যে সর্বদা দেখি বিশ্বতত্ত্ব বা **cosmology**-র পাশে একটা নৃতত্ত্ব বা **anthropology** রয়েছে। দৃশ্য ও অদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তির সঙ্গে আদিম মানুষ প্রশ্ন করেছেন তার নিজের উৎপত্তি কি ও কোথায়? প্রথমে দেখি ভুতুড়ে ব্যাখ্যা আসছে, পরে মাইথলজি (mythology) সৃষ্টি হচ্ছে। তাই থেকে ধর্ম উঠল; এবং ধর্ম পুরাণকে নষ্ট না করে তাকে পুষতে লাগল। ফলে যেটা ছিল মাত্র জানবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এখন সেটা হলো 'মানুষ কী'— সেই জ্ঞানেরই কর্তব্যবোধ। এই মন ঘুরে যাবার পর থেকেই মানুষ সমগ্র প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন ঐক্য, অথাৎ সমষ্টি থেকে বিচ্যুত হলো। এতদিন প্রকৃতি ছিল নৈর্ব্যক্তিক সমগ্র ও সুনিশ্চিত, মানুষের পৃথক সত্তাই ছিল না; কিন্তু আত্মজ্ঞানের তাগিদে বহির্জগতের সূত্র গেল ছিঁড়ে, আর বেড়ে চলল প্রশ্ন আর সন্দেহ। বর্তমান সভ্যতার কত গোড়ায় এই আত্মজ্ঞান ও সন্দেহ শুরু হয়েছে দেখলে আশ্চর্য লাগে। এই থেকেই 'মনুষ্যধর্মের' আরম্ভ। দর্শনের ইতিহাসে দেখি—

> Scepticism has very often been simply the counterpart of a *resolute humanism.* By the denial and destruction of the objective certainty of the external world the sceptic hopes to throw all the thoughts of man upon his own being. Cassirer.—*What is Man?*

এই scepticism— সন্দেহবাদের সঙ্গে মার্কসীয় তত্ত্ববিচারের সম্বন্ধ আছে, যদিও মার্কসবাদের অন্যান্য প্রত্যয়ে সেটা ঢাকা পড়ে। সন্দেহবাদ ও আত্মজ্ঞানের পর্ব অনেকদিন চলে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জুডা, ইস্‌লাম ধর্ম সে-পর্বের এক একটি অধ্যায়। লাভ হয়েছিল এই যে, মানুষ যে বিশ্বের কেন্দ্র একথা ভুলতে পারেনি। কিন্তু ক্ষতি হয়েছিল বিস্তর; নিজের উপর অতটা আস্থা থাকার দরুণ অস্তিত্বটাই লোপ পেতে বসেছিল। অর্থাৎ, প্রকৃতি-সমষ্টি পরিণত হয়ে গেল ব্যক্তি-বিন্দুতে। প্রতিক্রিয়া এল কোপার্নিকান ও কার্টেসিয়ান চিন্তা-পদ্ধতিতে। অনন্ত বিশ্বের প্রেক্ষিতে মানুষ আবার পেল ভয়। মানুষ গেল কুঁকড়ে, ছোট হয়ে। রিনেশাঁ যুগের এই দিকটা ঐতিহাসিকরা বড় বেশি দেখাননি, তাঁরা হ্যামলেটের মানব-অর্চনা উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত। মনটেন লিখছেন:

> Can anything be imagined so ridiculous, that this miserable and wretched creature, who is not so much as master of himself, but subject to the injuries of all things; should call himself master and emperor of the World, of which he has not power to know the least part, much less to command the whole? (এটা ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে, তখন ভারতবর্ষে সাধুসন্তের কৃপায় মানবধর্মের জোয়ার বইছে। আমাদের চিন্তা ও কর্মে কোপার্নিকান কিংবা কার্টেসিয়ান সিস্‌টেমের মতন অবিশেষ প্রকৃতি-ধর্মের প্রচার হয় নি। তার ফল বিচারের স্থান অন্যত্র।)

এইবার প্রশ্ন উঠল— প্রকৃতির নাগপাশ থেকে মানুষ কী করে মুক্ত হবে; যদি মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ হয়, তবে প্রকৃতির নিয়মাবলী থেকে মানুষের নিয়মাবলী, অর্থাৎ সমাজ, ইতিহাস, রাষ্ট্রের, পরিশীলন, আচার-ব্যবহারের নিয়মকানুন কী ভাবে ও কতটা বিভিন্ন? কোপার্নিকাস, ডেকার্ট-এর চিন্তাধারায় মানুষ গণিতশাস্ত্রে শাসিত, কারণ প্রকৃতির মর্ম সংখ্যার হাতে। কিন্তু এই গণিতশাস্ত্রই মানুষকে তার পূর্বতন স্থানে ফিরিয়ে আনলে। অসীম বা infinite-এর বিচারে দেখা গেল যে মানুষ তার বিদ্যাবুদ্ধির জোরে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এবং সে প্রকৃতির প্রতিবেশ এই পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ নয়,

গ্রহনক্ষত্র আকাশ প্রসারী। অতএব, অঙ্কশাস্ত্র ও তার অধীনস্থ সর্বপ্রকার বিভার সাহায্যে মানুষ আবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার সুযোগ পেল। ব্যাপারটা মোটেই সহজ ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চলেছিল মানব-সংক্রান্ত সমগ্র ঘটনাকে অঙ্কশাস্ত্রে পরিণত করতে— বাক্‌ল, ফেক্‌নার থেকে সলভে, এজ্‌ওয়ার্থ-এর দৃষ্টান্ত সকলেরই মনে পড়বে।

কিন্তু গণিতবিদ্যার সাধারণত্ব ও অবরোহী-পদ্ধতির বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াল জীববিদ্যা— biology। ডারুইনের কৃপায় আরোহী যুক্তি-পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ প্রসারিত হল। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে থেকেই রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি ঘটেছিল। জীবতত্ত্বের প্রচারে মানুষ প্রথমেই অবশ্য প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি; বরঞ্চ মানুষ আরো পরাধীন হয়ে পড়েছিল, যেমন কোঁৎ, হার্বাট স্পেন্‌সার, শাফ্‌ল প্রভৃতির সমাজতত্ত্বে। টেন এক জায়গায় লিখেছেন, ফরাসী বিপ্লবের পরে ফ্রান্সের ইতিহাস তিনি লিখবেন 'metamorphosis of an insect' হিসেবে। তবুও ফল বিপরীত হলো দু' দিক থেকে: (১) জীবতত্ত্বের বিচারে একটা জীবনস্রোতের সন্ধান মিলল, যার জোরে মানুষ ক্রমশ নিজের চেষ্টায় প্রতিবেশ বদলে অন্য জীবের অপেক্ষা বেশি অগ্রসর হয়েছে মনে হলো কিংবা দেখা গেল। এবং (২) এই উন্নতির ইতিহাস একটি অদৃশ্য উদ্দেশ্যে চালিত হয়েছে বলে ধারণা জন্মাল। ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন থেকে আজ পর্যন্ত যতটা উন্নতিবাদের চলন হয়েছে তার মূলে ছিল, ঐ উদ্দেশ্যবাদ, ঐ মানুষের প্রতি আস্থা, তার বর্তমান গৌরব ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস। উদ্দেশ্যচালিত উন্নতিবাদই হলো আমাদের পরিচিত মানব-ধর্মের প্রাণবস্তু। গণিতের কবলে থাকলে মানুষ প্রকৃতির নিয়ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারতো না। (ক্যাসিরার এই উন্নতিবাদের ব্যাপারটা ধরতে পারেন নি। এই খবর ক্রিস্‌টোফার ডসন দিয়েছেন চমৎকার।) একবার পথ যেই খুলল, অমনই মানুষ-সংক্রান্ত যত প্রকার বিদ্যা আছে সব এগিয়ে চলল। মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, কেউ পড়ে রইল না।

কিন্তু নতুন বিপদ এল। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই দু' নৌকোয় পা; কিছুদূর অগ্রসর হলেই প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের গহ্বরে, আবার না এগুলে কেবল বর্ণনার জঞ্জাল জড়ো করা। সেই পুরাতন তর্ক, সাধারণ বড় না বিশেষ বড়? সাধারণকে মানলে মানুষের ইতিহাস হয় অঙ্কের অধীন; না হয় 'ন্যাচারাল হিস্‌ট্রি'; আবার বিশেষকে স্বীকার করলে কোনো নিয়মই খাড়া করা যায় না, কোনো কাজই সম্ভব হয় না, কোনো কিছু বোঝাই যায় না। জনকয়েক ঐতিহাসিক বললেন, ইতিহাস বিজ্ঞানের মতন করেই লিখতে হবে; যেমন র‍্যাঙ্কে; আবার কেউ বল্লেন,

ইতিহাস সাহিত্যের অঙ্গ, যেমন কার্লাইল। অবশ্য লেখবার বেলা কেউই নিজের মতানুসারে চললেন না। আর একটি বিপদ ঘটল এই যে প্রত্যেক মানুষ-সংক্রান্ত বিদ্যাই নিজের নিজের নিয়ম তৈরি করে দাবি জানালে যে সেইটাই একমাত্র নিয়ম, অন্য কোনো নিয়ম মানুষের বেলা খাটে না। এই বিভিন্ন দাবির উৎপাতে সেই পুরাতন ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর গড়া মূল পত্তন গেল ভেঙে। আজও সেজন্য হা-হুতাশ শুনতে পাই, যেমনক্যাসিরার— *An Essay on Man*, পৃ. ২১, ২২।

কিন্তু আমার মতে দুঃখের অতটা কারণ নেই। মার্কস্‌বাদে এই দুঃখের অনেকটা অবসান হয়। এই মতে মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ; অথচ প্রকৃতি থেকে স্বাধীন, অর্থাৎ বুদ্ধি, বিচার ও কর্মের দ্বারা সে কেবল মানব-প্রকৃতিই নয় জড়-প্রকৃতিরও নিয়ম বুঝতে, সমালোচনা করতে, এবং নিজের মত ভেঙে-গড়ে নিতে পারে। কোপার্নিকান-কার্টেসিয়ান পদ্ধতির বাঁধাধরা নিয়ম এতে নেই, তবে সমগ্র ধারার গতিপ্রবাহ এতে আছে। অনেকে একে এনভিরন্‌মেন্টালিজম্‌-এর (environmentalism) পর্যায়ে ফেলতে চান; কিন্তু যদি এই ধরনের মন্তব্য করতেই হয় তবে হুম্যান জিয়োগ্রাফির সঙ্গে একে যুক্ত করাই যুক্তিসাপেক্ষ। মার্কসিজম্‌-এ অন্ধনিয়তির স্থান নেই, আবার আকস্মিকতারও স্থান নেই। অসীমের বিচারে যেমন মানুষ স্বাধীনতার সন্ধান পেয়েছিল তেমনই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রত্যয়ে মার্কস্‌বাদী আপনার প্রতি বিশ্বাস অর্জন করতে পরে। মার্কসিজম্‌-এর যুক্তিপন্থা প্রধানত আরোহী। বিশেষ ক্ষেত্রে অবরোহী। এর মূলকথা জীবতত্ত্বের পরিচিত পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, সাধারণীকরণ, শ্রেণীবিভাগ ও অবিশেষ-চর্চা; এবং সেই অবিশেষ সংজ্ঞা ও প্রত্যয় থেকে কর্মক্ষেত্রের বিশেষত্বে প্রত্যাবর্তন। মার্কসিজম্‌-এ বিশেষ ও সাধারণের বিবাদ খনিকটা মিটেছে। কেবল তাই নয়, সেই জন্যে মার্কস্‌বাদী ইতিহাস ন্যাচারাল হিস্ট্রি থেকে পৃথক হতেও পেরেছে। তার উন্নতিবাদ গড্‌উইন, কন্‌ডর্স-এর অজানিত উদ্দেশ্যচালিত উন্নতিবাদ নয়। মানুষের চেষ্টার ওপর গ্রথিত বলে সেটা এত পাকা, এতটা সুনিশ্চিত হয়েও অনিশ্চিত। মোদ্দা কথা এই : মার্কস্‌বাদ সেই বহু পুরাতন মনুষ্যধর্মের আধুনিক সংস্করণ। বলা বাহুল্য, এর সঙ্গে স্টোয়িক মানবতার (stoic humanism) আত্মকেন্দ্রিকতার মিল নেই; ভারতীয় মানবতার আত্মচর্চার সঙ্গেও তার মিল কম; য়ুরোপীয় রিনেসাঁ যুগের শেষভাগের মানবতার খাপছাড়া, মুনফালোভী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরও বিপরীত ধর্মী, এবং আজকালকার বৈজ্ঞানিক মানবতার (scientific humanism) সঙ্গেও পার্থক্য তার অনেক খানি।

তা হলে দাঁড়াল এই : মার্কস্‌বাদের কেন্দ্র মানুষ। কিন্তু মানুষ আর ব্যক্তি

কী এক বস্তু? যদি বলা যায় যে, মাত্র ব্যক্তিই সত্য, কারণ তারই মন ও দেহ আছে, তবে সকলেই মানতে বাধ্য যে মার্কসিজম্‌-এর সঙ্গে এই ব্যক্তিসত্তার সম্বন্ধ সাক্ষাতের বা সোজাসুজি নয়, একটা কোনো মানব-গোষ্ঠীর মারফত; অর্থাৎ সেই গোষ্ঠী প্রথমে স্বাধীন হলে তবে 'ব্যক্তি' হবে মুক্ত। আর যদি কেউ বলেন যে, ব্যক্তি বলে কোনো বস্তু নেই, একটা কাল্পনিক সংজ্ঞামাত্র, এবং সমষ্টিটাই সত্য, কারণ ব্যক্তি সমষ্টির দ্বারাই প্রভাবিত, প্রচলিত ও নিয়ন্ত্রিত, তবে মার্কসিজম্‌-এর সঙ্গে মানব-সমষ্টির সম্বন্ধ নিতান্ত প্রত্যক্ষ। আমার নিজের বিশ্বাস, অবশ্য তার যথেষ্ট কারণ আছে, যে ব্যক্তি পদার্থটি একটি প্রকাণ্ড **abstraction** বা বিমূর্তভাব, যার উৎপত্তি ইংলণ্ডে ধনিকতন্ত্রের যুগে এবং যার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার ও ভারতীয় সমাজের ও ঘটনার কোনো যোগ নেই। ভারতীয় চিন্তায় আছে পুরুষ; ও আমাদের সমাজে এখন পর্যন্ত এমন খুব বেশি 'ব্যক্তি' জন্মাননি যাঁদের চরিত-কথার প্রেরণায় ধন ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায়। (তবে তাঁরা অবতীর্ণ হচ্ছেন।) ব্যক্তিত্ববাদের মূল কথা আর্থিক উন্নতির সাধনা। পুরুষবাদের তত্ত্বকথা বর্ণাশ্রম, অর্থাৎ সমাজের ভেতরে বিকশিত হবার পর গুটিপোকার মতন কেটে বেরোনো। মার্কস্‌বাদ আর হিন্দুত্ব এক বস্তু বলছি না; আমার বক্তব্য এই যে, ব্যক্তিত্বের নামে মার্কস্‌বাদের বিচার করা ভারতবাসীর মুখে মানায় না। মানায় ভারতীয় ধনিকদের এবং ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের। তারা কি ভারতবাসী? মার্কস্‌বাদের অন্য গলদ থাকতে পারে; তবে ব্যক্তিত্ব নামক কল্পিত বস্তুর বিশেষ রকমের উন্নতিবিধানের স্থান, কিংবা জল্পনাকল্পনা মার্কস্‌বাদে নেই বলে তার সমালোচনা চলে না; কারণ, তা হলে সমগ্র মানব-প্রচেষ্টার গতির বিপক্ষে যেতে হয়; জ্ঞানের ইতিহাসকে অপমান করা হয়। মার্কস্‌বাদের সঙ্গে মানবধর্মের সম্বন্ধ পুরুষতত্ত্বের (**personalism**) ভেতর দিয়ে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মারফত নয়।

১৩৫৪

অতঃকিম্

এক প্রকারের স্বাধীনতা তো পাওয়া গেল, এখন আমাদের কর্তব্য কি ? এই প্রশ্নের উত্তর যথা শীঘ্র খুঁজতে হবে, সহজ ভাবে ও মনোহারী করে সাজাতে হবে যাতে জনসাধারণ স্ব-ইচ্ছায়, আপন স্বার্থের অনুকূল ভেবে তাকে গ্রহণ করে। স্বার্থ আবার আধুনিক কালে আবদ্ধ থাকলে চলবে না ; যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূরের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে স্বার্থকে না চালালে দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। এখানেই চিন্তাশীলদের পরীক্ষা। জনপ্রিয়তা জলাঞ্জলি দিতে তাঁরাই তবু সক্ষম, নেতাদের পক্ষে সেটা অসম্ভব। তাঁদের দৃষ্টি বর্তমানের জাদুরেখায় দিশেহারা হয় হয় না, কুক্কুটের মতন তাঁদের বিচরণ খড়ির দাগে ব্যহত হয় না।

প্রথমেই জিজ্ঞাস্য— কী প্রকারের স্বাধীনতা আমরা পেলাম। ইংরেজ সাধু কী অসৎ, বিচারের প্রয়োজন নেই ; কারণ, স্বরাজ্য চালাবেন যাঁরা তাঁরা বলেছেন ইংরেজরাজ সদিচ্ছায় চলে যাচ্ছেন, অতএব অসাধু প্রেরণা এই নিষ্ক্রমণের পিছনে থাকলেও তার প্রভাব স্বাধীন ভারত কাটাতে পারবে বলেই তাঁদের বিশ্বাস এবং আমাদেরও সে বিশ্বাস থাকা চাই ; এটুকু না থাকলে নিজেদের খেলো করা হয় আর স্বাধীনতার কোনো প্রতিজ্ঞা থাকে না। তার মানে এ নয় যে, বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজম্ দেশ থেকে উঠে গেল, আর আমাদের সাবধানতার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকবে, এবং এখনও আছে, তবে সেটা প্রাথমিক নয়। অনেকে কিন্তু এখনও তাকে প্রাথমিকই ভাবছেন। তাঁদের চিন্তা কতটা গতকালের সন্দেহে পুষ্ট আর কতটা বৈজ্ঞানিক বলতে পারি না। আমার মতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পিছু হটার, এমন কী রূপ-পরিবর্তনের কারসাজি, আমরা বুঝতে পেরেছি, এবং বুঝতেও পারব। কখনও কখনও আত্মবিশ্বাস আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর হয়, আবার সময় সময় 'যেন আমরা শক্তিশালী' এই ধারণাও মনে বল আনে। তর্কের খাতিরে কেবল নয়, দেখে শুনেই এই প্রতীতি হয়। আজ আমাদের মন থেকে অতিরিক্ত সন্দেহ দূর হওয়াই মঙ্গল। দূর হবার পরই স্বাধীতনার স্বরূপ ফুটে উঠতে পারে।

আপাতত, স্বাধীনতা নঞর্থকই রয়েছে। জওহরলালই স্বীকার করেছেন, যে শাসনক্রিয়াটি পর্যন্ত আর চলছে না। দেশে দুর্ভিক্ষ আসেনি এটা মস্ত কথা বটে, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। দেশের মানসিক আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে ; সেখানে ঝড়ও বইছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই ঝড়ে ভারতবর্ষের দু'টো অংশের অবস্থা কি হলো ? ইংরেজ বিদ্বেষ এখন হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে ; এবং এই বিদ্বেষে সৃষ্টি-শক্তির হ্রাস হয়েছে মানতে হবে। তাই হিসেব- নিকেশে স্বাধীনতার

সদর্থক দিকটা এই বছরে যে খুলেছে মনে হয় না। এশিয়ান কনফারেন্‌স্ বসেছিল, এখানে ওখানে ভারতের দূত পৌঁছেছে, এই প্রকারের দু'চারটি দফা সাজানো যায় বটে; কিন্তু বাম দিকের তালিকা প্রায় শূন্য। বরঞ্চ ক্ষতিটাই নজরে পড়ে। এখনও জমিদারী গেল না, এবং বহু প্রদেশে মজুরদের মাথায় বাড়ি পড়ছে। তৎসত্ত্বেও আমরা স্বাধীনতার সম্মুখীন হচ্ছি। ভাগ্যতাড়িতের সুদিন আমোদ-প্রমোদেই কাটে, সুযোগ দুয়ারে আঘাত করে চলে যায়, অভাগা শুনতে পায় না। এমনটি যাতে না হয় সেজন্য এখন থেকে ভাবতে হবে। কংগ্রেস-লীগের নেতারা বহু চিন্তা করেছেন এতদিন, তবু কেন আমরা যন্ত্রচালিতের মতন অগ্রসর হলাম ? ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, স্বাধীনতার সদর্থক রূপ-সৃষ্টির জন্য আজ অন্য চিন্তা-পদ্ধতির প্রয়োজন। তার প্রধান প্রতিজ্ঞা বিপক্ষ বিচার নয়, স্বপক্ষ বিচার। চিন্তার মুখ আমাদের ঘোরাতেই হবে।

মুখ ঘোরাবার প্রথম অবস্থা নেতৃত্বের বিশ্লেষণ। যদি কখনও ভারতের ইতিহাসে তার আবশ্যক হয়ে থাকে তো এখন, এই মুহূর্তে। বাংলা ও পঞ্জাব বিভাগ সম্পর্কে যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল তার প্রেরণা ভাব, ভাবনা নয়। আমি বলছি বিচারবিশ্লেষণ। অবশ্য অসময়ে অযথা সমালোচনাও নিরর্থক; তাতে বিদ্বেষ বাড়ে, কাজ এগোয় না। খানিকটা এজন্য কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকারিতা কমে গেল। সোশিয়ালিস্ট পার্টিরও বিশ্লেষণে কমতি নেই, কিন্তু তাঁদের কার্যক্ষমতা পূর্ণাঙ্গ হতে পারছে না অন্য কারণে; তাঁরা একই সঙ্গে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির বিপক্ষে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখছেন যাতে তাঁদের শক্তিক্ষয় হচ্ছে। যেকালে চিন্তার স্রোত পরিবর্তন পার্টির কাজ, ব্যক্তিবিশেষের নয়, তখন বামমার্গী সমস্ত দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই একমাত্র উপায় মনে হয়। দুর্ভাগ্যবশত তার সম্ভাবনা নিতান্ত কম। তবে নিচে থেকে শ্রমিক-কিষাণদের তাগিদ এলে সম্ভব হবে। সেজন্য আমার মতে, স্বাধীনতাকে সদর্থক করতে হলে শ্রমিক-কিষাণদের সঙ্গে প্রত্যেক বামমার্গী দলের আরও আন্তরিক ভাবে যুক্ত হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, এখানেই কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বাধবে বিরোধ। কিন্তু উপায় কি ?

পূর্বোক্ত যোগসূত্রটি দৃঢ় হলে অন্য চিন্তাও কীভাবে পরিণত হয় তার তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। অন্য চিন্তার অর্থ অনাবশ্যক চিন্তা নয়। দেনা-পাওনার (**assets and liabilities**) ভাগ নিয়ে বহু জল্পনা-কল্পনা চলছে, বড় বড় বিশেষজ্ঞকে ডাকা হয়েছে, এবং আমরা শুনছি যে এমন শক্ত ব্যাপার আর কিছু নেই। অবশ্য শক্ত মানতেই হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে কেন শক্ত জানা চাই। প্রথম কথা এই যে জনসাধারণের হাতে কোনো

তথ্য নেই, যতটুকু আছে তাও সরকারের দফ্‌তরে, সেখানেও তা সাজানো নেই, কারণ আমাদের সরকার ঐ বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনো অনুসন্ধান করেননি। দেশের আয় কি, কেউ জানে না। ইংরেজ ঐ প্রকার জ্ঞানে আস্থাবান নয়, মাত্র এই কয় বছর ইংলণ্ডে বাজেট এবং সঙ্গে দেশের আয় সংক্রান্ত একটা হিসেব পার্লামেণ্টের সামনে পেশ করা হচ্ছে। আমার ধারণা যে, আমাদের নেতৃবৃন্দ ইংরেজের কাছ থেকে জ্ঞানের প্রতি অনাস্থা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে দায় ভাগের সোজা, মূল বক্তব্যটি প্রকাশ করলে সর্বনাশ, তাই হিসেব যত গোলমেলে রাখা যায় ততই সুবিধা। মূল বক্তব্য এই, পাওনা সম্পদের বিভাগ (**division of assets**) প্রকৃত পক্ষে ভাগ নয়, গুণ, অর্থাৎ **capital accumulation**— ধনসঞ্চয়। যাঁরা এই ধনসঞ্চয় পদ্ধতি সম্বন্ধে ভেবেছেন তাঁরাই জানেন সে-পদ্ধতিতে একাধিক স্তর ও অবস্থা আছে, যার অনুসারে ধন-সঞ্চয়ের পরিমাণ ও দিক্‌নির্ণয় হয়। ভারতবর্ষে বণিক-সম্প্রদায় ধনিক হচ্ছেন। ভারতবর্ষের সমস্যা— কীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ধন-উৎপাদনের উপাদানে পরিণত করা যায়। তার অন্তত দু'টি পন্থা আছে (১) ব্যক্তি বিশেষের খরচ করবার পর যতটুকু জমেছে তাই দিয়ে **assets** কিনে নেওয়া এবং (২) জনকয়েক পুঁজিদার মিলে কিংবা ব্যাঙ্কের সাহায্যে **assets**-গুলির মালিকানা— **titles of ownership** বা মালিকানা-স্বত্ব অধিকার করা। এটা হল **acquisition** বা অর্জন-ক্রিয়ার স্তর। তারপর আসে **realisation** বা কার্যের পরিণতি, অর্থাৎ **ownership of means of production**-কে **instruments of the productive process**-এ রূপান্তর। আপাতত আমাদের দেশে দু'টি পন্থাই অনুসৃত হচ্ছে; তবে দ্বিতীয় পন্থার দিকেই ঐতিহাসিক ঝোঁক। যখন রিয়েলাইজেশনের (**realisation**) জন্য সঞ্চিত মূলধন (**saved capital**) যথেষ্ট নয়, তখন ফিনান্স গ্রুপ ও ব্যাঙ্ক ক্যাপিটাল চাই। তাই এই পাওনা সম্পদ বিভাগের (**division of assets**) গতিটা **concentration of the ownership of titles**-এর দিকে, অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যবসার দিকে হতে বাধ্য। কেবল তাই নয়, এ্যাকুইজিশান ও রিয়েলাইজেশনের মধ্যে কিছু সময় যাবেই যাবে, বিশেষত যখন **capital goods** মিলছে না। এই অবসরে যতবার মালিকানা স্বত্বে (**title of ownership**) হাত ঘোরে ততই লাভ। খাট্টা ফাটকা বাজারের খবর সকলেই জানেন। মালিকানাস্বত্বে বিক্রির সময় মালিক চান বেশি দাম, আর কেনবার সময় কম। এখন যদি মালিক ও ক্রেতার দল শক্তিশালী হন তবে সরকারের উপর তারা এমন জোর দিতে

পারেন যাতে তাঁদের সুবিধা মতো মালের ও স্বত্বের দাম বাড়ে কমে। সর্বদেশে তাই হয়েছে, এখানেও তাই হচ্ছে, ও হবে। সরকারের সাহায্য ছাড়াও ধনিকশ্রেণী সম্মিলিত চেষ্টায় বাজার দর ঘুলিয়ে দিতে পারেন আমরা জানি। এ তো গেল দায়ভাগের স্বরূপ, যার মূল কথা ধনবৃদ্ধি। বিশ্লেষণটি আরো চালালে দেখি ধনবৃদ্ধি ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ধনবৃদ্ধির দায়িত্ব কার, তার উদ্দেশ্য কি? যদি বলি দায়িত্ব সরকারের, উদ্দেশ্য জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধন, তবে দায় ভাগের ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায় আপনা থেকে। কারণ তাতে মালিকানা স্বত্বের হাত-ঘোরা বন্ধ হয়; এবং বাজার দর, এ্যাকুইজিশান ও রিয়েলাইজেশনের অন্তরালে একটি শ্রেণীর হাতে না পড়ে, তার লাভের জন্য না উঠে না নাবে, জনসাধারণের প্রয়োজনে নির্ধারিত হতে পারে। যদি আমাদের অর্থনীতিবিদ্ বুদ্ধিজীবীরা জনসাধারণের জীবনযাত্রার দিকটা লক্ষ করেন হবে তাঁদের এমন বিপাকে পড়তে হয় না। সেজন্যই বলছিলাম, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা একেবারেই ঘুরিয়ে দিতে হবে। সেজন্য জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রটি অত্যন্ত দৃঢ় করা চাই। না করলে আমরা ঠকব এই হিসেবের মারপ্যাঁচে। শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লার ফিরিস্তিতে পাওনা সম্পদগুলোকে (assets) fetish ভাবে ধরা হয়েছে, অর্থনীতিবিদ্‌ও তা ছাড়া তাদের অন্য কিছু ভাবতে আমাদের বলেননি; তাই ব্যাপারটা অত গোলমেলে ঠেকছে। আদত কথাটা নিতান্ত সরল— কার জন্যে দায় ভাগ, কার জন্যে স্বাধীনতা? এতটা লেখবার প্রয়োজন এই যে, সামনের কয়েক মাসের মধ্যে, এই রাজকীয় গোলমালের অন্তরালে ধনিকশ্রেণী আপন শক্তি বাড়িয়ে নেবে। অর্থনীতিবিদ্ সম্প্রদায়ের স্বাধীন হবার সময় এসেছে। তাঁদের দায়িত্ব এ যুগে খুবই বেশি। কিন্তু নতুন শ্রেণীর সঙ্গে আন্তরিক যোগ না থাকলে দায়িত্বজ্ঞান আত্মম্ভরিতাই থেকে যায়। মোদ্দা কথাটা এই, নেতৃত্ব এখন থেকে অর্থনৈতিক হওয়া চাই, এবং অর্থনৈতিক নেতৃত্বের শক্তির উৎস ঐ নতুন শ্রেণী— এটি কিছুতেই ভুললে চলবে না।

দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের আর একটি সিদ্ধান্ত— মুসলমানদের সঙ্গে নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করা। যদিও আমি থাকি এমন দেশে যেখানে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কলুষিত করেনি, তবু বিদ্বেষের বহরটা আমার অজ্ঞাত নয়। এই সেদিন সীতাপুর জেলায় মোহনলাল গৌতমের মতন অগাস্ট বিদ্রোহী, সোশিয়ালিস্ট, একজন তালুকদার সন্তান, হিন্দুসভার মনোনীত সদস্যের কাছে ভোটে হেরে গেলেন। গৌতমের তরফে সমগ্র

কংগ্রেসবাহিনী ছিল। এই অঞ্চলে ব্যাপারটা কল্পনাতীত। তাই বিদ্বেষ যে অত্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু তাকে উল্টে দিতে হবে। আজ বাংলা ভেঙে গেল; দুঃখের কথা নিশ্চয়ই। এককালে বিভাগে আপত্তি আমরা জানিয়েছিলাম, এবার নিজেরাই চাইলাম। দুঃখ এই, তখন কেন পুনর্মিলন চেয়েছিলাম তার গূঢ়ার্থ আজও প্রকট হয়নি। বাইরে ছিল তার দেশাত্মবোধ, অন্তরে ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent settlement) বজায় রাখার অজানিত চাহিদা। এবারও আমরা পুনর্মিলন চাইব— কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রাখতে নয়। তাকে ভেঙেই পুনর্মিলন সম্ভব। পাকিস্তান-রাষ্ট্র তৈরি হবার পরের দিনই এই ভাঙন শুরু হবে। যদি আমাদের দৃষ্টিকোণ সত্যই বদলে থাকে তবে সেই ভাঙনে পাকিস্তানকে সকলেরই সাহায্য করতে হবে। কেবল তাইতেই বিদ্বেষ দূর হবে বলছি না, তবে একত্রে সামন্ততন্ত্রকে বিনষ্ট করবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সৃষ্টির পথ খুলতে পারে; এবং সৃষ্টির সুযোগেই হৃদয়ের যোগ হয়। এতদিন যে প্রয়াস চলছে তাতে না ছিল প্রাণ, না ছিল অর্থ, ছিল নিছক আদর্শবাদ; তাই মুসলিম জনসংযোগের (muslim mass contact) মতন অদ্ভুত পরিকল্পনা দেশের সামনে রাখা হয়েছিল, তাই সেটা নিষ্ফল হলো, উল্টো ফল ফলল। এটা মার্কসীয় ব্যাখ্যা। জনসাধারণ সৃষ্টির সুযোগ পায়নি; জনসাধারণের মধ্যে মুসলমানেরাই প্রধানত মজুর-কিষাণ, নির্যাতিত-প্রপীড়িত-অশিক্ষিত। এই সোজা কথাটি আঁকড়ে ধরে থাকতে হলে তাকে স্পষ্ট ভাবে দেখতে হবে; চোখে আদর্শবাদের ঠুলি পরলে স্বাধীন ভারতের প্রতীক রূপ প্রকট হবে না। মুসলমান-প্রীতির অন্য কোনো অর্থ নেই। বলা বাহুল্য, ঐক্যবদ্ধ বাংলা (United Bengal)— এ আন্দোলনের সঙ্গে এই বিচারের কোনো যোগ নেই।

আর একটি দৃষ্টান্ত: দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে আমাদের নেতৃবৃন্দ নানা কথা বললেও একই মনোভাব দেখিয়েছেন। সে মনোভাব বিশেষ নয়, ইংরেজ-অধীন ভারতবর্ষের ব্যাপারেও তাই দেখেছি, অর্থাৎ trusteeship এই কথাটি যে পৃথিবীর কত সর্বনাশ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এদেশেও তার নমুনা দেখা দিয়েছে। মহাত্মাজী পুঁজিওয়ালাদের, রাজন্যবর্গকে সকলকেই অধস্তন শ্রেণীর জিম্মাদার (trustee) হতে বলেন; জওহরলালও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (constitutional monarchy) চান। এটা ঊনবিংশ শতাব্দীতে হয়তো চলতো— তাও পুরোপুরি চলেনি, এখন তো একেবারে অচল। আমাদের এখন জনগণের সরকার (Peoples government) চাইতে হবে। এবং সেই সঙ্গে জনগণও ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর ক্রীড়নক যাতে না হয় তার

ওপরও নজর রাখতে হবে। **Balkanisation** উত্তর **Balkan Peninsula**-তেই তার আশেপাশেই আছে। দেশীয় রাজ্যে ভারতবর্ষের সব সমস্যা যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সেখানে একত্রে সামন্ত, ধনিক-বিদেশীর ষড়যন্ত্র। তাকে ভাঙতে একমাত্র সমগ্র ভারতবর্ষের নতুন শ্রেণীরই সামর্থ্য আছে। বর্তমান কংগ্রেসের নেই, লীগেরও নেই। সৌভাগ্যবশত বাংলার সামনে এই সমস্যাটি প্রধান নয়; তবু দেশীয় করদ-রাজ্যের দিকে বাঙালীর দৃষ্টি পড়লে মনের দিক থেকে অন্তত খানিকটা লাভ হয়।

এই প্রবন্ধে মাত্র গোটা কয়েক সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করলাম। সেগুলি একত্র করবার পর দেখি একটি মাত্র প্রশ্ন উঠেছে— কী ভাবে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সম্ভব? বুদ্ধিজীবী হিসেবে একটি উত্তর কলমের মুখে প্রথমেই আসে: পৃথিবীতে যতগুলো বড় গৃহযুদ্ধ হয়েছে তার ইতিহাস মন দিয়ে পড়া। আমরা আজ কয়েক বৎসর **socialist classics** পড়ছি; তাতে উপকারই হয়েছে গড়পড়তা: আজ সেই সঙ্গে গৃহযুদ্ধের সাহিত্য পড়ার দরকার হয়েছে, বিশেষত আমেরিকার (যেমন ধরা যাক **Leo Hubarman**-এর **We the People**)। স্পেন, চায়নার গৃহবিবাদের ইতিহাস জানতে হবে। কিন্তু মাত্র পড়ে শুনে যে বড় বেশি দেশের উপকার হবে মনে হয় না। একটা না একটা দলের সঙ্গে যোগ থাকা চাই। কোন দল? দেশের যতগুলো বামমার্গী দল রয়েছে তাদের দোষগুলো সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়েছি। তার প্রধান দোষ তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদবিদ্বেষ। এতে জার্মানীর সর্বনাশ হয়েছে, অষ্ট্রিয়া লোপ পেয়েছে আমরা সকলেই জানি। সোশ্যাল ডেমোক্রাট আর কমিউনিস্ট পার্টির ঝগড়াতেই হিটলারের অভ্যুত্থান সহজ হয়। **Otto Bauer, Brunthal** প্রভৃতি অষ্ট্রিয়ান সোশিয়ালিস্ট নেতাদের নিজেদের লেখাতেই প্রমাণ হয় যে, অত বিদ্যাবুদ্ধি, অত সততা থাকা সত্ত্বেও সংকটের সময় তাঁরা পক্ষঘাতগ্রস্তের মতো ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য সেই দেশেই অমান্য হচ্ছে তো আমাদের দেশে কোন ছার! আমাদের কাছে সোশ্যাল ডেমোক্রাসী ও কমিউনিজম্‌ও তাই দু'টোই ধরতাই বুলি। অতএব বামমার্গীর দলের মিলন বইএর সাহায্যে ঘটবে না। এইখানেই বিচারের প্রয়োজন। বামমার্গীর অন্তর্বিবাদের কারণ কি ব্যক্তি হিংসা?

সৌভাগ্যবশত আমি একাধিক পার্টির কর্তৃপক্ষদের চিনি। তাঁরা কী ঐতিহাসিক জ্ঞানে কিছু কম? মোটে না। প্রকৃত বিদ্বান তাঁদের মধ্যে দেখেছি। হৃদয় অনুন্নত কারুর কম বেশি? তাও মনে হয়নি। দেশকে কেউ কম কেউ বেশি ভালোবাসেন? প্রেমের কষ্টিপাথর আমার কাছে নেই,

তবে সকলেই জেলে গেছেন, সকলেরই স্বার্থত্যাগ রোমাঞ্চকর। সকল দলেরই আস্থা কিষাণ- মজুরের ওপর।

পন্থার পার্থক্যটাও কারণ নয়, সেটাই তো প্রশ্ন। জীবনের অন্যদিক থেকে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, মানুষের কার্যকারিতা নির্ভর করে সেইখানে যেখানে সে কতকটা নতুন শক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তার ওপর। নতুন শক্তি সম্বন্ধে কারুর মতভেদ নেই। তা হলে যোগ সাধনেই পার্থক্য— এই-টাই বিচারে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বামমার্গীদের গৃহবিবাদের কারণ— কোনো দলই শ্রমিক-কিষাণেব সঙ্গে বীতিমত যুক্ত নয়। আমি কারুর নিন্দা করছি না, কেবল বিচাব করছি, কেন বামমার্গীর দল মিলতে পারছে না। অবশ্য সেজন্য নতুন শ্রেণীব অপবিণত অবস্থাও দায়ী। কিন্তু আজ মজুররা, কিষাণেরা কি সত্যই অপরিণত? আমার সন্দেহ হয়েছে— তা নয়। আমার বিশ্বাস যদি সত্য হয় তবে শীঘ্রই বামমার্গীর মিলন ঘটবে। নচেৎ অতঃকিম্-এর কোনো সদুত্তর পাওয়া যাবে না। আমার ধারণা যদি ভুল হয় তবে পরিণত করবার দায়িত্বটাই বাড়ে। সে দায়িত্ব বুদ্ধিজীবীদের, অন্য কারুর নয়। ১৩৫৪

ইতিহাস : ১

সভ্যজগতে ইতিহাস-সম্বন্ধে মতামত গড়ে তোলবার একটা বিশেষ প্রয়োজন সর্বদাই। ঘটনার পারম্পর্য কিংবা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে সেই মতামতের সংস্পর্শে। নচেৎ, মানুষ ঘটনাস্রোতে খড়-কুটোর মতন ভেসেই চলে, জীবনের কোনো অর্থ ও সার্থকতা থাকে না। যে ব্যক্তি জ্ঞানত অর্থ খুঁজতে ব্যস্ত নয়, যা করে হোক দিন গুজরান করাই যার সমস্যা কিংবা অভ্যাস, সেও জীবনের অসার্থকতা ও নিরর্থকতার বেদনা অনুভব করে। কেবলমাত্র গতানুগতিকতার মধ্যে যেটুকু সার্থকতা আছে, তারও পিছনে ইতিহাস-সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা কাজ করতে থাকে, বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের সঙ্গে যাঁদের দ্বন্দ্ব নেই, অর্থাৎ যাঁরা কোনোপ্রকার পরিবর্তনের বিরোধী, তাঁদের ধারণা এই যে, তাঁদের মৃত্যুর পরই পৃথিবী উৎসন্নে যাবে, ইতিহাসের গতি মন্দা হবে। যাঁরা কল্পলোকে ফিরে যেতে চান, কিংবা এই লোকেই গোলোক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন তাঁদের ইতিহাস-সংক্রান্ত মতামত পূর্বোক্ত মতামতের কাব্য-সংস্করণ। বিপ্লবপন্থীদের ধারণা, ইতিহাসের গতি ক্রমশই দ্রুততর হয়ে স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গতির ক্ষেপ দাদুরীর, কূর্মের নয়। তাঁদের কাছে ইতিহাসের ধর্ম হলো উন্নতি। অতএব এই সমাজে সুখে বসবাস করতে হলে, এই সমাজ থেকে উদ্ধার পেতে হলে, একে ভেঙে নতুন সমাজ তৈরি করতে হলে ইতিহাসের ধর্ম বুঝতে হয়। কারণ, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমাবেশ সাধন করে ভালভাবে এবং আরো ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা তার উপর নির্ভর করছে।

শুধু তর্কের খাতিরে স্বীকার করা চলে যে অ-সামাজিক ব্যক্তির ইতিহাস-সংক্রান্ত সংস্কারের কোনো প্রয়োজন নেই। বস্তুত অ-সামাজিক ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। দ্বীপে আটক হবার পূর্বে রবিনসন ক্রুসোর সমাজ ছিল, দ্বীপে থাকবার সময় যে রকমে আহার সংগ্রহ করতেন বা অসভ্যদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন তার মধ্যে পূর্বতন সামাজিক সংস্কার রীতিমতই প্রকট ছিল; সেই সমাজে ফিরে আসবার জন্য ব্যগ্রতাও তাঁর কমেনি। এক কথায়, রবিনসন ক্রুসোর অবস্থা বর্তমানকালের সংসারত্যাগী আশ্রমবাসীদের অবস্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সত্যকারের যোগী কালাতীত হবার জন্য সাধনা করেন শোনা যায়। তিনি ইতিহাসের হাত থেকে, ইতিহাস-সম্বন্ধে মতামত গড়ে তোলার প্রয়োজন থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন বলে মনে হয় না। যোগী সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ চিন্তায় নিযুক্ত থাকেন, বিশ্বের অকল্যাণ হয়েছে, অকল্যাণের পথে অগ্রসর হচ্ছে না ভাবলে কল্যাণচিন্তার প্রয়োজনই থাকে না। তা ছাড়া, যোগের

ইতিহাস আছে, আবার যোগীরও ইতিহাস আছে, এবং সমাজ কী ভাবে যোগীকে দেখে এসেছে তারও ইতিহাস আছে।

বুদ্ধিজীবীদের কথা স্বতন্ত্র নয়। দার্শনিকদের সব প্রচেষ্টার মূলে একটি প্রশ্ন লুকিয়ে থাকেই থাকে— কাল-বস্তু মনের রচনা, না তার কোনো পৃথক অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ মহাকালের ইচ্ছায় পরিবর্তন, না পরিবর্তনের একটি গুণের নাম কাল? অর্থশাস্ত্রের মূল কথা মূল্য নিরূপণ, সেখানেও কালক্ষেপে মূল্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব নিরূপিত হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কালের উৎপাত। বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে ইতিহাসের প্রবেশ নিষেধ থাকলেও, পরীক্ষার পূর্বতন ইতিহাস, মনসাদেবীর মতো, কোনো-না-কোনো ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ লাভ করে। আইনস্টাইন কালকে বশ করতে চেষ্টা করেছেন— অঙ্ক কষে। কিন্তু তার পূর্বে মাইকেলসন, মর্লি, মিন্‌কাওস্কি, ম্যাক্‌সোয়েল না থাকলে তিনি অন্য কিছু হতে পারতেন, যা হয়েছেন তা হতে পারতেন না নিশ্চয়ই। আদত কথা এই, সব জ্ঞানই জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট, জীবন সামাজিক, অতএব জ্ঞান সমাজের সঙ্গে যোগসাধনের একটি প্রধান উপায়। আবার যখন নানা কারণে সমাজের সঙ্গে সহযোগ-সাধন অসম্ভব হয়, তখন নতুন ভাবের অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে পুরাতন সমাজ ভাঙা হয়, নতুন সমাজ গড়ার চেষ্টা চলে। অতএব বুদ্ধিজীবী ও প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির ইতিহাস-সম্বন্ধে সত্য-সংস্কার সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য রয়েছে। এ বিষয়ে যিনি উদাসীন তিনি জ্ঞানের উন্নতি করতে পারেন না।

বিশেষত ভারতের এই যুগে। শাসক-সম্প্রদায় (তাঁরা আবার ভিন্ন জাতি) বলেছেন, "ধীরে ধীরে ইতিহাস চলে, আমাদের দেশে, ইংলণ্ডে, তাই চলছে, প্রমাণ এড্‌মণ্ড বার্কের উক্তি; অতএব প্রথমে প্রাদেশিক বৈঠকে আংশিক স্বাবলম্বন, যোগ্যতাপ্রমাণের পর সম্পূর্ণ, তারপর দিল্লীতে দ্বৈয়ারকী, সেখানে যোগ্যতা প্রমাণের পর কানাডা অস্ট্রেলিয়ার মতন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। ভারতে ইতিহাসের ধারা এই হওয়া উচিত, অতএব এই হবে।" শাসিতের মধ্যে এক শ্রেণী অন্তত উত্তর দিচ্ছেন, "আমরা প্রস্তুত, তবে ইতিমধ্যে আপসে যদি গোটাকয়েক শর্ত খাড়া করতেই হয়, তবে সেগুলোকে আমাদের শুভের জন্যই প্রয়োগ করা চাই, এবং কিছুদিন পরে সেগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে।" ইতিহাসের অর্থ যে ক্রমোন্নতি দু'দলই তা স্বীকার করেছেন— হোর্ থেকে মহাজ্ঞানী পর্যন্ত। বছর বারো পূর্বে ইতিহাস-সম্বন্ধে আমাদের অন্য ধারণা ছিল, মহাত্মাজীর বাক্যে আস্থা রাখলে, তাঁর আদেশ মান্য করলেই আমরা একটা বিশেষ তারিখে ইতিহাসের স্বরাজ অধ্যায়ের পাতা খুলে ফেলব। সে ধারণা আর নেই। এখন ক্রমোন্নতির যুগ। সমাজ সংস্কারেও এই নতুন ধারণা কাজ করছে। উচ্চশ্রেণীরা (অর্থাৎ মহাত্মাজী

ও মালব্যজী) হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিতে প্রস্তুত। কিন্তু চতুর্বর্ণের উপর হাত না দিয়ে। একে ইতিহাসের কমঠ-সংস্কার বলা চলে।

কূর্ম অবতার এ দেশেরই কল্পনা হলেও এবং কমঠ-বৃত্তি এ দেশের একটি সুপরিচিত সাধনা হলেও, ইতিহাস-সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ধারণা কিন্তু আমাদের নয়। আমাদের কার্যাবলী থেকে অন্য কোনো ধারণা উদ্ভূত হয়নি বলেই শাসক-সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সুবিধামত একটি ধারণা আমরা গ্রহণ করেছি। আমাদের পণ্ডিতবর্গ নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে ইতিহাসের ধর্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো মত সৃষ্টি করতে পারেননি বলেই, উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে জীববিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদকে যেমন সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করা হয়েছিল, তেমনি অন্ধভাবে তাকে আমরা এই দেশে প্রয়োগ করছি। এটা আমাদের অনুকরণ, সৃষ্টি নয়। সেইজন্য পার্থক্য শুধু তালে, শাসক ও ব্রাহ্মণ চাইছেন ঠায়ে চলতে, শাসিত এবং হরিজনেরা চাইছেন দুনে। লয় সমান। জীব-জগতের অভিব্যক্তি ও ক্রমবিকাশ কোনো কালেই সমাজে প্রযোজ্য নয়, এমন কী ইংলণ্ডেও নয়, বিশেষত এখন। ভুল অনুকরণে শক্তির অপচয় হয়, সঞ্চয় হয় না। ভারতের দায়িত্ব অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি, আমাদের অনেক কাজ পড়ে আছে। অপচয় শুধু পাপ নয়, বোকামি।

অনেকে বলতে পারেন, আমাদের দেশে ইতিহাসের নতুন ধারণা সৃষ্টি করবার প্রয়োজন নেই। তাঁদের মনোভাব এই যে— সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলির আবর্তন কিংবা ব্রহ্মার মুহূর্ত পরিকল্পনার সাহায্যে এ যুগের ব্যাখ্যা ও কর্তব্য নিরূপিত হতে পারে।

মনোভাবটিকে অসম্ভবনীয়তার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সভ্য জগতের, বিশেষত জার্মান দার্শনিকদের মতামত উদ্ধৃত করা হয়। হিন্দু পৌরাণিক ও নীট্‌শে, স্পেংগলারের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক হলো ইতিহাসের এই চক্রবৎ পরিবর্তনের পরিকল্পনা। শুধু সত্যের খাতিরে এটুকু মনে রাখলেই চলবে যে, হিন্দু পৌরাণিক উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক, এবং আজকালকার পণ্ডিতদের উদ্দেশ্য আধিভৌতিক, জোর আধিদৈবিক, কিন্তু ফল দাঁড়ায় একই। সে জন্য এই দু'টি ধারণাকে একত্র সমালোচনা করা চলে। এইসব বৃহৎ পরিধির আবর্তনের তুলনায় আমাদের পরিচিত সভ্যযুগের আবর্তন এতই ছোট যে, তার মধ্যে মানুষের সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়ে ওঠে। যে অর্থের সন্ধানে ইতিহাসের ধর্ম ব্যাখ্যার প্রয়োজন জন্মায়, সেই সন্ধানের প্রারম্ভেই ব্যর্থতা স্মরণ করা কিংবা আত্মবিশ্বাস হারানো উচিত নয়। মানুষ বাদ দিয়ে ইতিহাসের অর্থ থাকে না, অন্তত মানুষের কাছে। আসল কথাই এই যে অতি পুরাতনকালে, যখন মানুষ

নিজের মতে বাইরের সম্বন্ধকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারেনি, তখন কালের পরম্পরা ও প্রসার সম্বন্ধে কোনো রীতি আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অল্পদিন হলো আমরা অতীত সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়ে উঠেছি, তারই কৃপায় আমরা কাল-প্রবাহের গতি ও রীতি এবং সেই গতি ও রীতির সাহায্যে বর্তমানের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যতের প্রগতি বুঝতে শিখেছি। এখনও আমাদের ধারণা নিশ্চিত ও দৃঢ় হয়ে ওঠেনি, সেটি ধ্যানে পরিণত হয়নি। বৈজ্ঞানিকের বিবেচনার বহির্ভূত হয়ে এই অস্পষ্ট ধারণা লজ্জায় আত্মগোপন করছে। কিন্তু পরিবর্তনের যে রীতি ব্রহ্মার যোগনিদ্রা থেকে উদ্ভূত হয়ে সেই নিদ্রায় লীন হবেই হবে, যে গতির গুপ্ত অভিসন্ধি জানবার কোনো অধিকার কোনো বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কিংবা শ্রেণীর জন্মগত সংস্কারমাত্র, সে পরিবর্তন শুধু স্বপ্নবিলাস, সত্যকারের পরিবর্তনই নয়। তার সাহায্যে বর্তমান জগতের জাগ্রত ও নিষ্ঠুর বাস্তবতার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়— তা সে ধারণাতে ইচ্ছাপূরণের যত সুযোগই থাক না কেন। তার সাহায্যে বৈচিত্র্যের মর্মকথা প্রকাশ পায় না, কারণ 'এব চ' মন্ত্র উচ্চারণে শুধু একীকরণই সাধিত হতে পারে। আগে যা ছিল, পরেও তাই হবে, রূপে ও আত্মার কোনো পরিবর্তন হবে না— একথা নীট্‌শের কল্পিত জরাথুস্ট্রের মুখেই শোভা পায়। নিয়তির চাপে সমীকরণ, কলকারখানা ও যন্ত্রের চাপে সমীকরণের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নেই। ব্রহ্মা কিংবা ব্রহ্মের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করলে ঐতিহাসিক ও ব্রাহ্মণ একই ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। তা হলে সমূহ বিপদ অব্রাহ্মণের পক্ষে, যাঁদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পুরাণের মতো কলিযুগে ব্রাহ্মণ নেই যখন, তখন ঐতিহাসিকের কাজও কমে গেল। এই প্রকার অতিপ্রাকৃতের হস্তে ইতিহাসের রীতি-উদ্‌ঘাটনের ভার ন্যস্ত করলে প্রুশিয়ান রাজ্যই হয়ে ওঠে ব্রহ্মের একমাত্র প্রকাশ, ব্রাহ্মণ প্রফেসার হয়ে ওঠেন ব্রহ্মজ্ঞানী, এবং দর্শন হয়ে ওঠে সোহহংবাদ।

পূর্বোক্ত মন্তব্যের এ অর্থ নয় যে আমাদের কোনো ইতিহাস ছিল না। বক্তব্য এই, আমাদের যে ইতিহাস ছিল, মাত্র এখনই তা আমরা বুঝতে পারি। এই অর্থেই সব ইতিহাস সমসাময়িক ইতিহাস। বক্তব্য এই যে অতিপ্রাকৃতের সাহায্যে ইতিহাসের অর্থ পাওয়া যাবে না। অর্থের পদগুলি প্রকৃতির মধ্যেই আছে, যদিও সে প্রকৃতির ক্রিয়ায় ও ব্যবহারে এমন 'অসম্ভব' ঘটনা ঘটে যার হদিশ পাওয়া যায় না বলে তাদেরকে 'অ-প্রাকৃত' নাম দেওয়া হয়। মাত্র এইভাবে দেখলেই ইতিহাস স্বকপোল-কল্পনার দোষ থেকে মুক্ত হতে পারে। বাহ্যপ্রকৃতির সংস্পর্শে এসে আমাদের আচার-ব্যবহার কী ভাবে গড়ে উঠেছে, আমরা কতটুকু নিয়তির অধীন, কতটুকু নির্বাচন করেছি, কতটুকু নির্বাচিত হয়েছি জানবার পরই ইতিহাস বাহ্য হয়ে ওপরে উঠতে পারে। নচেৎ, ইতিহাস কল্পনাবিলাসীর সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে

ওঠে। বাস্তববিকপক্ষে ইতিহাসের নিকটতম সম্বন্ধ ভূগোল। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের অন্য কোনো অর্থ নেই— ঘটনা কিছু বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক হতে পারে না। ঘটনার ব্যাখ্যাই বৈজ্ঞানিক হতে পারে, সেজন্য ব্যাখ্যার বিষয়কে, অর্থাৎ ঘটনার সম্বন্ধে ও পারম্পর্যকে যতটা বাহ্য করা যায় ততই ভাল।

মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে বাঁচবার জন্য। প্রধান উপায়ের নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে আজকাল নিষ্কাম-ধর্মের কোঠায় তোলবার চেষ্টা চলেছে, কিন্তু তার আদি ছিল সকাম, ভুললে চলবে না। কি করে বহিঃপ্রকৃতির কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা যায় এটাই ছিল মানুষের একটি প্রধান সমস্যা। যতদিন থেকে খাদ্যসমস্যা ততদিন থেকে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের মূলে অর্থনীতিগত ব্যাপারটি (ইকনমিক ফ্যাক্টর) সর্বদাই ছিল, এবং সে বিষয়টি অঙ্কের ভাষায়, প্রাইমারি— একেবারে প্রাথমিক ; অর্থাৎ একে আর অন্য কোনো বিষয় দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। ধরা যাক, আদিম যুগের কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোনো একটি উপায় উদ্ভাবন করলে ; সেই থেকে একটি জাতির খাদ্য-সংগ্রহের ভার কিংবা অন্য কোনো শত্রুর কবল থেকে বাঁচবার ভার তার লাঘব হলো, খানিকটা শক্তি সঞ্চিত হলো, যার জোরে সেই জাতি অন্যদিকে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। আদিম যুগের আবিষ্কারের পিছনে ও পরে এই বাঁচবার তাগিদ ছিল, নচেৎ আবিষ্কারের প্রচার হতো না, একটি আবিষ্কারের সঙ্গে অন্য আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় কোনোটাই টিকতে পারতো না। যখন কোনো একটি আবিষ্কারের সাহায্যে, পূর্বের অপেক্ষা ও অন্যদের অপেক্ষা ভালভাবে বাঁচবার উপায় প্রচারিত হলো, তখন সেই আবিষ্কারের সাহায্যে ও তাকে কেন্দ্র করে সেই সমাজ নতুনভাবে গড়ে উঠতে লাগল। কেন না, সমাজ ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এক— বাঁচা এবং আরো ভাল করে বাঁচা। যে সমাজে আবিষ্কারক জন্মাল না কিংবা যে সমাজ অনুকরণ করতে পারল না, সে পিছিয়ে পড়ল এই জীবন সংগ্রামে। এই চলল কিছুকাল— অর্থাৎ নতুন নতুন আবিষ্কার, সেই সঙ্গে নতুন উপায়ে সমাজ-গঠন।

কিন্তু আবিষ্কারের গতি সমাজের পুনর্গঠনের গতির চেয়ে দ্রুততর হতে বাধ্য। আবিষ্কার করে জনকয়েক লোক, কিন্তু সমাজ সব লোককে নিয়ে। জনকয়েক লোক তাদের সমগ্র অবসর নিয়োজিত করতে পারে সৃষ্টির কাজে। এ দুই গতির ভিন্ন হারের ফলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয়। যখন শিকার ছিল একমাত্র খাদ্য-সংগ্রহের উপায়, তখন শিকারী সমাজের আচার-ব্যবহার, মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং পুরুষ ও স্ত্রীর সম্বন্ধ, সম্পত্তি-জ্ঞান ও ধর্ম গঠিত হয়েছিল শিকারবৃত্তির চার-পাশে। পশুচারণ যুগে (কিংবা টাইপে) দেখা গেল যে, পশুর সাহায্যে শক্তির কম খরচে খাদ্য-সংগ্রহ করা চলে। পশুকে বশে আনবার জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন

চাষ করা সম্ভব হলো। নচেৎ মাটি আঁচড়ানো, ঝুম-চাষ, বাগান চাষই ছিল। লোকসংখ্যা বেড়েই চলেছে, গ্রাম তৈরি হচ্ছে, মানুষ বসবাস করছে ঘর-বাড়িতে। তাদের জন্য একটা সুনিশ্চিত খাদ্য-সরবরাহের প্রয়োজন। সেই থেকে পুরুষ কর্তা হয়ে উঠল, সম্পত্তি বর্তমান আকার ধারণ করল, স্বর্গের আকার বদলে গেল, ভগবান পুরুষ সেজে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। প্রত্যেক যুগে পুরাতন অবস্থার চিহ্ন বর্তমান থাকতো, কোনো টাইপই শুদ্ধ ছিল না। যে জাতি পূর্ণভাবে কল-কারখানাকে গ্রহণ করেছে, সে জাতিরও মধ্যে চাষবাস পরিত্যক্ত হয়নি, অন্য পরে কা কথা! কৃষিপ্রধান জাতির মধ্যে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ভূসম্পত্তির মালিকমাত্র হয়ে ধনশালী হয়ে উঠলেন। ছোট চাষীরা আর খেতে পায় না, অথচ বংশবৃদ্ধি হচ্ছে। অন্য একটি শ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্য করে টাকা বাড়াতে লাগল। ইতিমধ্যে পুরাতন কলের সার্থকতা কমে এসেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে, অর্থাৎ সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে নতুন কল তৈরি হলো। নতুন কারখানায় টাকা আসতে লাগল পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর কাছ থেকে। পূর্বতন সমাজের অতিরিক্ত লোকসংখ্যা আর অতিরিক্ত রইল না, অনেকে কলকারখানায় চাকরি নিলে, কেউ বা বিদেশে চলে গেল। আজ দেড়শ' বৎসর মাত্র গোটাকয়েক দেশে এই ব্যাপার ঘটেছে, এবং অন্য দেশ এখন সেসব দেশের অনুকরণ করছে। কারণ এ ছাড়া অন্য উপায়ে প্রচুর লোকের যথেষ্ট অন্নসংস্থান হয় না।

কিন্তু বিজ্ঞানের আশীর্বাদের প্রথম ফল উপভোগ করলেন ধনী-সম্প্রদায়। তাঁরা এখনও সেই ফলভোগ করছেন— মাত্র এইটুকু বললে ইতিহাসের রীতি বোঝা যাবে না। একটু তলিয়ে দেখতে হবে। বিজ্ঞানের ফলে প্রথম উন্নতি হলো যন্ত্রবিদ্যার, তার দরুন কলকারখানার প্রসার হলো। এক একটি কল যেমন অনেক লোককে খাওয়াতে পারে, তেমনি অনেক লোকের বদলেও সে কাজ করতে পারে। অতএব লোকদের তাড়িয়ে দিতে হয়, কিন্তু বেশি দূরে নয়। প্রথম প্রথম অনেকে অন্য দেশে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল যে মজুরদের কলকারখানার কাছে কাছে রাখলেই মালিকদের সুবিধা হয়। সুবিধা দুই প্রকারের— এক, যদি চাহিদা বাড়ে তখন সরবরাহ করবার জন্য বেশি লোকের প্রয়োজন হবে; আর এক প্রকার— শ্রমিকের একদল যদি মজুরি বেশি চেয়ে বসে, তা হলে অন্য শ্রমিকদলের চাকরি পাবার আশঙ্কায় তারা জব্দ থাকবে। বাস্তবিক পক্ষে চাহিদা তখন বেড়েই চলেছে, নতুন আকার নিয়েছে। কল তৈরির জন্য নতুন কারখানার প্রয়োজন হলো। ইংলণ্ড এই কল তৈরির ভার নিল। জনকয়েক লোক আবার কাজ পেল। তাদের মজুরি বাড়ল। সেইসঙ্গে তাদের সংখ্যা বেড়েই চলল। তারা যত বাড়ে তত পরিমাণে তাদের মজুরি জোটে না। কিন্তু বিজ্ঞান— অর্থাৎ

বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করে সামাজিক উৎপাদনের উপায়— বসে থাকবার ছেলে নয়। সে শুধু দিতেই জানে। কখন দিতে হয়, কী দিতে হয়, কাকে দিতে হয়, কীভাবে দিতে হয়, সে জানেই না— বোকা ছেলের মতন। প্রথমে সে তা জানতো। কিন্তু এখন বিজ্ঞান একটা শ্রেণীর বৃত্তি হয়ে উঠেছে, যে শ্রেণীর স্রষ্টা এই ধনীসম্প্রদায়, যে বৃত্তি পরবিত্তভোগী, যার উদ্দেশ্য অন্য শ্রেণীর উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় আবিষ্কার করা। এই সময় ধনীসম্প্রদায় বিজ্ঞান, শিক্ষার জন্য অনেক টাকা দিলেন, নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়, বড় বড় ল্যাবরেটরি তৈরি করলেন, নিজেদের কারখানায় বৈজ্ঞানিকদের মাইনে দিয়ে রাখলেন, তাঁদের জন্য পরীক্ষাগার তৈরি করলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের কেনা গেলেও বিজ্ঞানকে কেনা যায় না। এখানেই আবার বিপদ ঘটল। কল যেমন থামে না, বিজ্ঞানও তেমনি থামে না। তাই কলের মালিক নতুন সুর গাইতে বাধ্য হলেন। আজ তাঁরা বলছেন, "কিছুদিন বিজ্ঞানের উন্নতি রোধ করলে পৃথিবীর মঙ্গল হয়।" আজ তাঁরা পেটেন্ট কিনে লোহার সিন্দুকে তুলে রাখছেন। অনিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুনাফাতে টান পড়ে, তাকে ভাগবাঁটোয়ারা করতে হয়। সেজন্য হয় বিজ্ঞান বন্ধ করা চাই, নচেৎ বিজ্ঞানেরই সাহায্যে ক্ষতি কমিয়ে লাভ বাড়ানো চাই। শেষ উপায়টির নাম সায়ান্টিফিক ম্যানেজমেন্ট, র‍্যাশনালিজেশন। কিন্তু উদ্দেশ্য একই, উচ্চহারের মুনাফা রক্ষা করা। উপায় একই, শ্রমিকদের নিজেদের শ্রেণীতে থাকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা। ধনীসম্প্রদায়ের দাস বৈজ্ঞানিকদের তথা বিজ্ঞানের দৌলতেই আজ সমাজের এই শ্রী।

কলকারখানার মালিক ধনীসম্প্রদায় সহজে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছাড়বার পাত্র নন। বিজ্ঞানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তাঁরা অন্য উপায় গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কুফল বুঝতে পেরে তাঁরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সংকীর্ণ করতে প্রয়াসী হলেন। সেজন্য গত কয়েক বৎসর ধরে ব্যবসায়-ব্যাণিজ্যে ট্রাস্ট, কার্টেলের প্রসার হচ্ছে। গোটাকয়েক সমবায় বিশেষ কোনো দেশ ও সাম্রাজ্য অতিক্রম করলেও বেশি সংখ্যক সমবায় দেশের মধ্যেই বিস্তৃত। কিন্তু দেশের বাজার বড়ই মন্দা। সেজন্য ছোট গণ্ডি তৈরি করার প্রয়োজন হলো। ভিন্ন দেশের একচেটিয়া ব্যবসার সঙ্গে প্রতি-যোগিতার বাধাবিপত্তিও অনেক। সেজন্য এই বৃহৎ সমবায়গুলি উপনিবেশে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে মনোনিবেশ করলে। ভের্সাই সন্ধিতে পৃথিবীর বাকি অংশটুকু ধনীজাতির, ধনীশ্রেণীর মধ্যে বণ্টন হয়ে গেল। উপনিবেশের ব্যবসায় মুনাফা বেশি, বাজার ভালো, সস্তায় কাঁচামাল ও মজুর পাওয়া যায় এবং ব্যবসায় রাজশক্তির সাহায্য পাওয়া যায়। উপনিবেশে ধনতন্ত্র না প্রবেশ করলে

ধনতন্ত্র মারা যাবে, স্থানাভাবে। ধনতন্ত্রের সবচেয়ে উন্নত অবস্থা হলো একচেটিয়া ব্যবসা এবং তারই বাজার হলো উপনিবেশ। এই অধিরাজক-শাসনের বেড়াজালে ভারতবর্ষ জড়িয়ে পড়েছে। গত কয়েক বৎসরে আরো বেশি করে, কারণ অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড এখন প্রায় স্বাধীন রাজ্যের সামিল, অর্থাৎ সে দেশেও ধনীসম্প্রদায় উঠেছেন, তাঁরাও মুনাফা বাড়াতে চাইছেন। জগতের ইতিহাসের যে ধারা প্রবল হয়ে উঠেছে, তারই সহযোগে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা বুঝতে হবে।

শুধু এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে না। বাহ্যত, এখন ধনতন্ত্রের বোলবোলাও অবস্থা। কিন্তু ভেতরে ঘুন ধরেছে। বাহ্যত, অন্তত ওয়েলস্ এবং তাঁর শিষ্যদের কাছে, জগৎ এক হয়ে আসছে। পৃথিবীর নানা স্থানে ছোট-বড় দল তৈরি হচ্ছে, পৃথিবীতে একটি মহারাজ্য স্থাপনের পক্ষে এ চিহ্নগুলো শুভ মনে হওয়া স্বাভাবিক। একধারে বৃটিশ-সাম্রাজ্য, অন্য ধারে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা; বলকান দেশেও তিন-চারটি ছোট রাজ্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে, ফরাসী-পোল-চেক মিলে একটা দল হয়েছে। তা ছাড়া, আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রায় সবটাই য়ুরোপের কোনো-না-কোনো রাজ্যের অধীনে। তবুও কোথায় যেন শনির দৃষ্টিপাত হয়েছে। পৃথিবীর একাংশে মাত্র দু'বৎসর আগে, ১৯৩১ সালে লক্ষ লক্ষ মণ গম পুড়িয়ে ফেলা হলো, কফি গুঁড়িয়ে ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হলো, সৈনিক রেখে খনি থেকে পেট্রল এবং রবার গাছ থেকে রবার নেওয়া বন্ধ করা হলো। তুলোর ক্ষেত গাছ ও ফুলসুদ্ধ চষে ফেলা হলো, চিনি যারা তৈরি করে তারা পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান করে উৎপাদন কমিয়ে দিলে; তামা, টিন, দস্তা, অ্যালু-মিনিয়াম বেশি প্রস্তুত হচ্ছিল বলে খনিতে মজুরের সংখ্যা ও খাটবার সময় কমানো হলো, চিলির সোরার ব্যবসা উৎসন্ন গেল, কলে তৈরি সোরার জন্য। কিন্তু পৃথিবীর অন্যধারে লোকে খেতে পাচ্ছে না, মজুরি কমে গেছে, লোকের সংসার-খরচ জোটে না, দু' কোটির উপর শ্রমিকের হাতে কাজ নেই, প্রত্যেক জাতি রপ্তানি করবার জন্য প্রস্তুত, আমদানি করতে অনিচ্ছুক। চারধারে শুল্কের বেড়া, বড় বড় কলকারখানা বন্ধ, টাকার বাজার যায় যায়, সমগ্র য়ুরোপ আমেরিকার কাছে ঋণী, অথচ আমেরিকা সে ঋণ শোধ নেবে না জিনিস নিয়ে, রীতিমত ও যথাযোগ্য টাকা ধার নিয়েও সাহায্য করবে না, জার্মানীর হাতে টাকা নেই, ফ্রান্সের হাতে বিস্তর সোনা, এই সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেছে, অথচ সোনার, কমতি নেই, পৃথিবী জুড়ে। এই দৈন্যকে শনির দৃষ্টি ছাড়া কি বলা চলে? যে শিশু বিজ্ঞান ও ধন-তন্ত্রের দ্বারা লালিত-পালিত সেই শিশুই বড় হয়ে বিজ্ঞান ও ধনতন্ত্রকে মেরে

ফেলতে চায়। ইতিহাসের নিয়মই এই।

এই প্রবন্ধে ইতিহাসের স্থূলধারা ও তার একটিমাত্র রীতির ইঙ্গিত করা হলো। ধারাটি ধন-সমাগমের ও বিজ্ঞানের ইতিহাস দ্বারা পুষ্ট। রীতি হলো এই যে, কোনো একটি অনুষ্ঠানের মধ্যেই তার ধ্বংসের কারণ লুকানো থাকে। ধ্বংসের কারণ— ভগবানের ইচ্ছা-সাপেক্ষ নয়। তার কারণ— ধনতন্ত্রমূলক সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর তদবস্থস্থিতি-প্রবণতা এবং বিজ্ঞানের কৃপায় নব নব উপায়ে উৎপাদনের প্রাচুর্য। এই সামাজিক জীবনের স্থিতি, প্রগতি ও অবনতির ব্যাখ্যা হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে— অর্থাৎ মানুষ তার সমবেত চাহিদা ও চেষ্টার ফলে যে উপায়ে বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করেছে কিংবা চেষ্টা করছে জয় করতে তারই ইতিহাসের সাহায্যে। ভারতবর্ষের ইতিহাস জগতের ইতিহাসের অঙ্গ, বৈশিষ্ট্য তার পারিপার্শ্বিকের। ১৩৪০

ইতিহাস : ২

ইতিহাসের অর্থ ও রীতি সূচনায় ইঙ্গিত করা হয়েছে। দৃষ্টান্তের দ্বারা সেই ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট করাই প্রবন্ধের এই অংশের উদ্দেশ্য।

ইতিহাসের স্থূলধারাটি এক হলেও, বিভিন্ন দেশের পারিপার্শ্বিকের জন্য সে ধারা ভিন্নরূপ ধারণ করে ও ভিন্ন গতিতে চলে। যে দেশ কোনো কারণে কৃষিপ্রধানই রয়ে গেল, চাষবাস ব্যতীত যে দেশের লোকের জীবিকা-সংগ্রহের অন্য উপায় আবিষ্কৃত কিংবা অনুকৃত হলো না, সেখানে সমাজের গঠন নির্ভর করে প্রধানত জমির স্বত্বের উপর। কৃষিপ্রধান দেশে জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধটি অন্যান্য সামাজিক সম্বন্ধের মূলসূত্র হয়ে ওঠে। হপ্‌কিন্‌স্ নামক একজন চিন্তাশীল লেখক পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ বিচার করে এক পুস্তক লিখেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি দেখাচ্ছেন যে, সম্পত্তির উপর পিতার একচেটিয়া অধিকারের বিপক্ষে পুত্র বরাবরই আপত্তি করে এসেছে এবং সেই বিরোধের ফলে সমাজধর্মে অনেক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। তাঁর ভাষায়, কৃষিপ্রধান সমাজে পিতার স্থান বর্তমান সমাজের মনোপলিস্ট ক্যাপিটালিস্টের (Monopolist Capitalist)—একচেটিয়া সত্বভোগী পুঁজিপতির মতন। রোমান আইনে পিতার অধিকার গোড়ায় কি ছিল এবং পরপর কী ভাবে কমে এসেছিল দেখলে হপ্‌কিন্‌সের মন্তব্যে সায় দিতে হয়। চীন সভ্যতাকে আমরা নিতান্তই ধর্মপ্রাণ ও অটল-অচল বলে শ্রদ্ধা করি— কারণ সেটি গোষ্ঠি-প্রধান। গ্রানে সাহেব দেখিয়েছেন যে, চীন-গোষ্ঠীর মধ্যে পিতা-পুত্রের আদর্শ সম্বন্ধের ভিত্তি হলো জমিদারের প্রতি প্রজার শ্রদ্ধাভক্তি। ইজিপ্টেও এই জমি-সত্ব-সম্বন্ধ মনসবদারিতে পরিণত হয়ে সমাজের অন্যান্য কর্মে ও চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস থাকলেও ঐতিহাসিক নেই— সেজন্য এই কৃষিপ্রধান দেশের সম্পত্তিজ্ঞান কীভাবে তার সমাজকে গড়ে তুলেছিল আমরা ঠিক জানি না। একটা কথা তবু জোর করে বলা চলে, মুসলমান ও ইংরেজ যুগে জমিদারি-সত্বের ইতিহাস না জানলে লোকসমাজের ইতিহাস বুঝতে পারা যায় না। আমাদের লোকাচার বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে লোক-ধর্মে, আমাদের বিবাহাদি অনুষ্ঠানে, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধে, শ্রাদ্ধতর্পণে, গ্রাম্য সমাজের মনোভাবে জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। ভগবানকে রাজা এবং ভক্তকে প্রজা বলবার প্রথাটি অপ্রাচীন নয়। পৌরাণিক স্বর্গের সমাজও এই সমাজের প্রতীক। তা ছাড়া, মুসলমান সাম্রাজ্যের উৎপত্তি, বিস্তার ও পতনের মধ্যেও এ সম্বন্ধটি যে বিশেষভাবে কার্যকরী তা দেখতে পাই।

মুসলমান রাজারা জমির ভোগদখলে বিশেষভাবে হস্তক্ষেপ করেননি বলেই তাঁদের প্রভুত্ব ভারতের ঐতিহাসিক ধারাকে বিশেষভাবে পরিবর্তিত করেনি। ইংরেজ যুগের আইনে ভোগসত্ব পরিবর্তিত হচ্ছে, সেজন্য আমাদের ইতিহাসের ধারাও বদলাচ্ছে। একদিকে স্থায়ী বন্দোবস্ত, অন্যদিকে প্রজাসত্বের আইন,— ও খানিকটা তারই ফলে ফ্যাক্টরি-প্রতিষ্ঠা, এইগুলোই হলো ভারতের বর্তমান যুগের নির্দেশ চিহ্ন।

কৃষিকার্যের অপেক্ষা জীবনধারণের আরো ভালো উপায় আছে ইংরেজের কাছেই প্রথমত আমরা এ খবরটি পেয়েছি। সেজন্য ইংলণ্ডের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইংলণ্ডে জীবনধারণের রূপ-পরিবর্তন এতই অদ্ভুত বলে লোকের মনে ঠেকে যে তাকে রেভলিউশন বা বিপ্লব বলা হয়। কিন্তু এই ইনডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বা শিল্প-বিপ্লবের পূর্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে আর একটা বিপ্লব লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধিত হয়েছিল। পশমের ব্যবসার জন্য মেষপালনের প্রয়োজন, সেজন্য অনেক জমি একত্রে থাকা চাই, তাই চাষার দখলে যেসব খণ্ড খণ্ড জমি ছিল সেগুলিকে এই জমিদার-ব্যবসাদার সম্প্রদায়ের দখলে আনা হলো। পার্লামেণ্ট কোনো আপত্তি করলে না, পার্লামেণ্টের প্রায় সব সভ্যই তখন ঐ দলের। ইংলণ্ডের গ্রাম-অবস্থা তখন অন্য গ্রাম ও কৃষিপ্রধান দেশের মতোই ছিল। এখনকার ইংলণ্ডের অবস্থা দেখলে সে অবস্থা বোঝা যায় না, কেন না ইংলণ্ডই বোধ হয় একমাত্র দেশ যেখানে উৎপাদনের উপায়ভেদে, অর্থাৎ কল-কারখানার জন্য, সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ের পাতা শেষ করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্যন্ত ইংলণ্ড কৃষিপ্রধান ছিল, (১৭৯২ সালেই প্রথম রীতিমত শস্য আমদানি হতে লাগল), অনেক জমি তখনও ছোট জমিদারের হাতে। কুটির-শিল্পের সাহায্যে তখনও অনেক লোকে জীবনধারণ করছে। কিন্তু এই সময় জমিদারের হাতে ব্যবসালব্ধ টাকা জমতে শুরু হয়। তারা উদ্বৃত্ত টাকায় নতুন জমি, চাষবাসের নতুন কল কিনলেন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে শস্যের দাম কমালেন। ছোট চাষীরা হটে গেল, কুটির-শিল্প নষ্ট হলে, টুকরো টুকরো জমি বড় বড় জমিদারের দখলে এল। জমি দখলের জন্য অনেক সময় আইনের সাহায্যও নিতে হতো না, তিন ভাগের দু' ভাগ চাষী সম্মতি দিলেই চলত। সম্মতি তাদের দিতেই হতো। ফলে ১৮০০ সাল থেকে ১৮১৯ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ একর জমি জমিদারের হাতে এল, ১৮৫০ সালে আর কিছুই বাকি রইল না। চাষী ও গ্রামবাসীদের common land-এর ওপর অধিকারও চলে গিয়েছিল। গরীবের দুঃখ উপশমের জন্য একটা পরিবেষ্টন-

সমিতিও যে বসেনি তা নয়, ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু টাকাও চাষীরা পায়— কিন্তু সে টাকা দু'দিনেই উবে যায়। কখন জমি ও গ্রাম থেকে বিতাড়িত চাষী বাধ্য হয়ে কলকারখানায় যোগ দেবার জন্য শহরে এল, কিংবা এই জমিদার ও প্রজার বেড়াজালের বাইরে নতুন দেশে, আমেরিকায় চলে গেল।

ইতিমধ্যে অবার কলকারখানার নতুন মালিকরা জমিদার হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এইজন্য জমির দাম খাজনার চল্লিশগুণ হয়। পুরানো জমিদারের গোষ্ঠী লোপ পেল, নতুন বড়লোকের সঙ্গে বিবাহাদি চলতে লাগল। রিফর্ম বিলের সময়, ১৮৩০।৪০ সালে, পশ্চিম য়ুরোপের মধ্যে ইংলণ্ডেই জমিদারপিছু গড়পড়তা সবচেয়ে বড় এবং জমির সত্বাধিকারী চাষীপিছু গড়পড়তা সবচেয়ে ছোট জমির চাষ হতো। ইংলণ্ডের গ্রাম্য সমাজ এইভাবে তিন ভাগে বিভক্ত হলো— খাজনা উপভোগী জমিদার, ফসলের ব্যবসাদার জমিদার এধং চাষের মজুর সম্প্রদায়। কিন্তু গ্রাম্যসমাজও ক্রমে লোপ পেল, ইংরেজ শহরবাসী হলো। যেখানে কলকারখানা সেখানেই ভিড়, সেখানেই শহর।

ইংরেজ-সমাজের আমূল পরিবর্তন ও নতুন শ্রেণী বিভাগের জন্য একধারে যেমন ধনতান্ত্রিক কৃষিকর্ম তেমনি অন্যধারে নতুন কলকব্জার আবিষ্কার ও ঔপনিবেশিক ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ-সমাগমই দায়ী। এই সময়কার কলকব্জার আবিষ্কারের বিবরণ পড়লে মনে হয় যে, আবিষ্কারকদের প্রেরণা একেবারেই নিঃস্বার্থ ছিল না। কয়লার খনিতে জল ভরে উঠছে, সেই জল তুলে ফেলতে হবে। মজুররা পারছে না, নতুন কল চাই, অশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়াররা ব্যবহারিক বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ চালানো কল একটা খাড়া করলেন, পরে একজন আবিষ্কারক সেই কলগুলোকে অদলবদল করে নতুন কল সৃষ্টি করলেন, যার সাহায্যে খনি থেকে জল তোলাও হলো, আবার এক শহর থেকে অন্য শহরে দ্রুততরভাবে এবং সস্তায় মাল পাঠানো হলো। এই উপায়ে তুলোর কারখানায়, রাস্তা তৈরিতে, খাল কাটানোতে, সরবরাহের উপায়ে, রেল-জাহাজে, কলের বহুল প্রয়োগ শুরু হলো। অবশ্য এ সবই বিজ্ঞানের দৌলতে। আজকালকার বৈজ্ঞানিকদের আপত্তি মঞ্জুর করে এই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ-বিজ্ঞান কিংবা টেকনলজি বলা চলতে পারে। কলের প্রয়োগ থেকে শুধু উৎপাদনের সংখ্যা ও হার বৃদ্ধি হলো তা নয়, বহিঃপ্রকৃতির কাছ থেকে জীবনধারণের উপায়ও পরিবর্তিত হলো। প্রথম পরিবর্তন উৎপাদনের উপায়ভেদে ; মানুষের বদলে কল, যার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ দূর থেকে দূরতর হতে চলল, যার ফলে আবার উৎপাদন নামক প্রকৃত সামাজিক প্রক্রিয়াটি নৈর্ব্যক্তিক ও অমানুষিক হয়ে উঠল। দ্বিতীয় পরিবর্তন সামাজিক শক্তির রূপভেদ— পূর্বে ছিল যার

অন্নসংস্থান বেশি তারই প্রতিপত্তি, এখন হলো যার হাতে টাকা কিংবা যার টাকা ধার করবার ক্ষমতা বেশি তারই প্রভাব বেশি। পূর্বে সামাজিক প্রতিপত্তির মাপকাঠি ছিল প্রতিপালন, এখন সে ক্ষমতা সামাজিক কল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উৎপাদনের পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্যই নিয়োজিত হলো। পূর্বে ক্ষমতার দায়িত্ব ছিল সমাজের প্রতি, এখন শক্তির দায়িত্ব হলো শুধু নিজের অর্থবৃদ্ধি এবং শক্তির প্রয়োগ হলো শক্তিশালী ব্যক্তির এবং শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য চাই প্ল্যান, চাই নতুন কল, চাই নতুন বাজার, কিংবা পুরনো বাজারে চাহিদার নতুন স্তর, চাই র‍্যাশনালিজম্‌, চাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির বুদ্ধি, চাই ব্যবহারিক ধর্ম, চাই মুনাফা বাড়াবার জন্য একনিষ্ঠতা। যত টাকা জমছে, ততই কল বাড়ছে; যত কল বাড়ছে, ততই টাকা জমছে— এ যেন একটা স্বাভাবিক নিয়ম। আগে মধ্যযুগে, একজোড়া কাপড়ের জন্য তাঁতির বাড়ি যেতে হতো, তাঁতি অর্ডার না পেলে ভালো কাপড় তৈরি করতো না। কলের মালিক এই রকম ব্যক্তিগত অর্ডারের জন্য বসে থাকতে পারেন না। কল ও টাকাকে সর্বদাই খাটানো চাই, বসে থাকলেই তাদের মালিককে তারা, গল্পের ভূতের মতন, মেরে ফেলবে। সব জিনিস এক ছাঁচে ঢালাই হলো ও বেশি পরিমাণে প্রস্তুত হলো। সেইজন্যই শ্রমবিভাগ, যাতায়াতের সুগমতা এবং নতুন বাজারে অবাধ বাণিজ্য ও ব্যবসা চাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাসের মূল কথা এই প্রয়োজনগুলো। এদের তাগিদেই ইংলণ্ড এখনকার বৃটিশ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

কলকারখানার যুগে শ্রেণীবিভাগ সামাজিক পরিবর্তনের একটি প্রধান কথা। পূর্বে বলা হয়েছে, কৃষিজীবীদের অবস্থা নতুন জমিদারী প্রথার জন্য খারাপ হয়েই আসছিল। গৃহশিল্পীরাও কলকারখানার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ল। নতুন ধরনের জমিদার ও কলকারখানার মালিক— এই দুই সম্প্রদায় মিশে নতুন ধনীর শ্রেণীতে পরিণত হলো। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীবিভাগ নতুন ধরনের, কিন্তু নতুন সৃষ্টি নয়। সমাজের শ্রেণীবিভাগ পূর্বেই ছিল, এখনও রইল, জমিদার ও প্রজার শ্রেণী এখন কলকারখানার মালিক ও মজুর শ্রেণীতে পরিবর্তিত হলো মাত্র। আদিম যুগে, অসভ্য জাতির মধ্যে শ্রেণীবিভাগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। অসভ্যদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ, কর্তৃপক্ষ ও শাসিত এবং বিবাহ-বন্ধনের উপযোগী শ্রেণীবিভাগ ঐতিহাসিক ঘটনা। অনেকের মতে এটা ইকনমিক বিভাগ নয়। যদি নাও হয়, তবু এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, অন্নসংস্থানের জন্য বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করে, কিংবা তার সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ স্থাপন করার ফলে ইকনমিক শ্রেণীবিভাগ তাদের মধ্যে ছিল না। স্ত্রীপুরুষ, যুবাবৃদ্ধের জৈববিভাগের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম বিভাগও ছিল। ধরা যাক, শ্রেণীবিভাগ হল কৃষিযুগের শেষদিকে। কিন্তু

মানুষ সে সম্বন্ধে সচেতন তখনও হতে পারল না। প্রথম ঐতিহাসিক কারণ বোধ হয় যে, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অর্থাৎ পুরোহিতবৃন্দ এই বিভাগকে গোপন রাখতে চেষ্টা করলেন, ধর্মের সাহায্যে। এই সময় সামাজিক একত্বের প্রচারক হলেন পুরোহিত এবং উপভোগী হলেন জমিদার, পরে জমিদারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জমিদার, অর্থাৎ রাজা। রাজা হলেন ধর্মের রক্ষক, কাণ্ডারী। এই যুগের কোনো বড় লেখকদের লেখায় সমাজ যে এক নয়, বিচ্ছিন্ন, এই কথাটি ধরা পড়ে না। ধরা না পড়লেও এ কথা ঠিক যে, সমাজ তখন শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। তখন বৃহত্তর সমাজের চেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী ও পেশার প্রতিই মানুষের অনুরাগ পড়েছে। কিন্তু মধ্যযুগের সর্বত্রই যে গিল্ড (guilds) ও প্রফেশন (profession) তৈরি হয়েছিল, এই ঘটনাই সভ্যতার ইতিহাসের সব কথা নয়। যেটি চক্ষুর অন্তরালে ঘটছিল, সেটি একটি নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি। ক্যাথলিক চার্চের সৃষ্ট একত্বের চেয়ে এই ঘটনার সঙ্গেই বর্তমান সভ্যতার যোগসূত্র বেশি দৃঢ়। যখন শুধু জীবন-ধারণের জন্য চাষবাসের বদলে শস্যের ও অন্যান্য কাঁচামালের আমদানি-রপ্তানিতে বেশি মুনাফা আছে দেখা গেল; যখন রাস্তা-ঘাটের বদলে সমুদ্রযাত্রা, গ্রামের বদলে ছোট শহর, হাট ও মেলার বদলে বাজার, উঠানের একপাশে মরাইয়ের বদলে শহরের মধ্যে কিংবা নদীর ধারে গুদাম, সোজাসুজি লেনদেনের বদলে টাকার (ও পরে বিল ও চেকের) সাহায্যে লেনদেন শুরু হলো, তখন একদল ভদ্রলোক উঠলেন, যাঁরা নিজেরা কিছু উৎপন্ন করেন না, অথচ উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে সাহায্য করেন। প্রথমে এই দলের অনেকে ইহুদী ছিলেন। কারণও ছিল,— প্রাথমিক খ্রীস্টান ধর্মের বাধার জন্য খ্রীস্টানেরা তেজারতি করতে পারতেন না। সে বাধাও ক্রমে রোমান আইনের দৌলতে হ্রাস পেল। সেই হ্রাসের ইতিহাস উদ্ধার করা হয়েছে। প্রথমে উত্তমর্ণ সুদ নিতেই পারতেন না। যা টাকা ধার দিতেন তাই ফেরত পেতেন। রোমান আইনে প্রথম ঠিক হলো (Damnum Emergens), যদি ধার শোধ হবার দিন উত্তমর্ণ যে টাকা ধার দিয়েছিলেন কেবল তাই ফেরত পান, তা হলে যা ক্ষতি হতে পারতো (অথচ হয়নি) তার পূরণের নামে সামান্য কিছু বেশি টাকা উত্তমর্ণ গ্রহণ করতে পারেন। ইতিপূর্বেই উত্তমর্ণ ক্ষতিস্বরূপ সুদ গ্রহণ করছিলেন, তবে লুকিয়ে। যা অলক্ষ্যে ঘটছিল, আইনের দ্বারা তাকেই প্রকাশ্য ও আইনসঙ্গত করা হলো। তারপর **Lucrum Cessens**, অর্থাৎ উত্তমর্ণ যে নিজে ব্যবসায়ে টাকা না খাটিয়ে বড়লোক হবার সুযোগ দিয়েছেন, এই স্বার্থত্যাগের জন্য লাভের টাকা থেকে উত্তমর্ণের আংশিক ক্ষতিপূরণ করার প্রয়োজন আইনে স্বীকৃত হলো। শেষে **Contractus Trinus**—অর্থাৎ মোটা টাকা ও মুনাফার ক্ষতিপূরণের বিপক্ষে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের

মধ্যে চুক্তিপত্র। (মধ্যযুগের আইনের ফাঁকি এখন অষ্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদের সুদ ও মুনাফা সম্বন্ধে মতবাদে পরিণত হয়েছে বলে সন্দেহ হয়)।

কৃষিযুগের পরিণতি জমিদারতন্ত্রের যুগে— সে যুগের শ্রেণীবিভাগের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে এ যুগেই বড় বড় ব্যাঙ্ক তৈরি হয় ইটালী, জার্মানীর বাণিজ্যপ্রধান শহরে। সেখানে জমিদারের বদলে বণিক ও মহাজনরা অনেকটা স্বাধীনভাবেই নগরের কাজ চালাতেন। এঁরাই উপনিবেশে ব্যবসা চালাবার জন্য নিজেদের গবর্নমেন্টের কাছ থেকে অনুমতি চাইলেন। গবর্নমেন্টও সে অনুমতি সাগ্রহে দিলেন। তখন রাজা এবং তাঁর পারিষদ ও পার্শ্বচরবর্গই তখনকার গবর্নমেণ্ট। তাঁদের টাকার দরকার তখন খুবই বেশি। উপনিবেশ থেকে বিস্তর জিনিস আসতে লাগল, আমেরিকা থেকে সোনা রূপা এল। জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন ধনীর আবির্ভাব হলো, squirearchy, ইংলণ্ডে যাঁদের প্রতিনিধি হলেন হ্যাম্পডেন। এই শ্রেণীর চাপে রোমান ক্যাথলিক চার্চের, জমিদারের, পাদরীর ও রাজার প্রভুত্ব কমল। যাঁরা ধর্মের সাহায্যে ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের ভাষায় এই system of protestant rational ethics-ই মধ্যসত্বোপভোগী ধনীসম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের হেতু। তাঁদের ব্যাখ্যায় কার্যকারণ সম্বন্ধটি উলটে গেলেও তাঁদের বিবৃতি অনেকটা সত্য। কোথায় রইল মানুষের জঠরের ক্ষুধা? এখন এই মধ্যসত্বোভোগীর কৃপায় উৎপাদনের প্রয়োজন পরিণত হলো মানুষের বদলে পকেট ও কলের ক্ষুন্নিবৃত্তিতে, মুনাফার হার চড়ানো ও অবাধ বাণিজ্যের জন্য নতুন বাজারের সন্ধানেতে। একধারে মানুষ দল বাঁধছে, অন্যদিকে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা লোপ পাচ্ছে। সবাই ভাবলে— এই বুঝি প্রকৃতির নিয়ম। বড় বড় পণ্ডিতে প্রকৃতির এই নিয়ম বোঝার জন্য বই লিখলেন, একটা শাস্ত্র পর্যন্ত খাড়া করলেন। এঁরাই হলেন নতুন ধনীর পুরোহিতবৃন্দ। ভারতের অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতবর্গ ও নেতারা এঁদেরই বংশধর। অ্যাডাম্ স্মিথ, রিকার্ডো শুধু অর্থনীতির নয় ব্যক্তিতন্ত্রবাদেরও আদি ধর্মপ্রচারক।

ধর্মের এনামেল খসে যাবার পরও সমাজের শ্রেণীবিভাগ লোকের কাছে ধরা পড়বার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তখন অন্য প্রলেপ লাগানো হলো— একটি দেশাত্মবোধ, অন্যটির ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ না থাকলেও তার সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত— Liberalism. এই দু'টি মতবাদের ইতিহাস লেখবার স্থান এ নয়। মাত্র তাদের ভেতরকার সম্বন্ধটুকুর প্রকৃতি নির্ণয় করছি। সপ্তদশ শতাব্দীর য়ুরোপের রাজারা যে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন তার সমর্থন পেয়েছিলেন তাঁরা জমিদার সম্প্রদায়ের নিকটে। সেই থেকে দেশাত্মবোধের সৃষ্টি। ক্যাথলিক ধর্মের দ্বারা পুষ্ট একতা-জ্ঞান এই দেশাত্মবোধের কাছে হেরে গেল। রাজা ও জমিদার-

বর্গের সন্ধির ফলে **Physiocratism** মতবাদ প্রচারিত হয়। ইংলণ্ডে এই মতের বহুল প্রচার হয়নি। নতুন ধনীকে তুষ্ট করার জন্য ইংলণ্ডে অন্য মতবাদের (**Mercantilism**) প্রয়োজন ছিল। ইংরেজ সর্বপ্রথম দেশাত্মবোধের তথা ভূম্যাত্মবোধের মোহ কাটালে। সর্বপ্রথম বুঝলে যে, ঔদার্যের মতো মহৎ গুণ আর নেই। এই উদারপন্থাকে বিচার করলে বোঝা যায় যে, এটি নতুন ধনীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। ঔদার্যের দ্বারাই কলকারখানার মালিক নিজেদের সার্থকতা প্রমাণ করে, স্বার্থ গোপন করে, পরকে ভোলায়। প্রায় একশত বৎসর ধরে পুরোদমে ইকনমিক জাতীয়তা চালাবার পর প্রমাণ করার প্রয়োজন হলো যে বস্তুটি অসার। প্রমাণিত হলো যে, সমাজের মূলে আছেন ব্যক্তি, যাঁর গোটাকয়েক জন্মগত অধিকার আছে, যিনি নিজের কিসে ভালো হয় নিজেই ভালো বোঝেন, অতএব তাঁকে নিজের মতে কাজ করবার সুবিধা দিলে জগতের অধিকতর উপকার হবে। অতএব সিদ্ধান্ত হলো— ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। উদারতার অর্থ ব্যক্তির স্বাধীনতা। অবশ্য ব্যক্তি মানে যে-সে ব্যক্তি নয়, ধনী-ব্যবসাদার সম্প্রদায়ের যে কোনো ব্যক্তি। অন্য ব্যক্তির পক্ষে সহগুণই সবচেয়ে বড় সদ্‌গুণ— কারণ সহ্য করলেই অন্ন জুটবে, নচেৎ জুটবে না। পৃথিবীতে নানা প্রকৃতির মানুষ আছে, কিন্তু অন্তরের মনুষ্যত্ব যখন একই বস্তু তখন ঝগড়াঝাঁটি করে লাভ নেই, তখন সেই ভেতরের মনুষ্যত্বকে সুবিধা দেওয়া হোক, জয় হোক সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার, জয় হোক সাধারণতন্ত্রের! ভেতরের মনুষ্যত্ব অর্থে হিসাবী জীবটুকু, যার একমাত্র কাজ সস্তায় কিনে মাগ্যিতে বেচা, যার একমাত্র প্রয়োগ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-সিদ্ধি। (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলেই বুদ্ধিবাদের প্রকোপ-বৃদ্ধি হয়)। আসল কথা, ব্যবসা চালাবার জন্য কোনো বাধাবিঘ্ন থাকলে চলবে না, না থাকবে রাজনৈতিক বাধা, না থাকবে শুল্কের, না থাকবে দূরত্বের। টাকা ঘরেই রয়েছে, সে টাকা খাটাবার জন্য, কাঁচা মাল পাকামালে পরিণত করে বেচবার জন্য বাজার চাই। মজুরদের যেখানে-সেখানে চাকরি নেবার, জমি, ঘরদোর ছেড়ে কলকারখানার দরজায় ভিড় করার জন্য স্বাধীনতা চাই। দেশে যে বাধা দেবে সে জেলে যাবে, বিদেশে যে বাধা দেবে তার সঙ্গে যুদ্ধ হবে। অর্থাৎ বাজারের কোনো দরজা থাকবে না, বাজার হবে অনিয়ন্ত্রিত। মাত্র একটি নিয়ম সেখানে থাকবে। সেটি মানুষের তৈরি নয়, বোধ হয় ভগবানের, ভগবানের না হলে প্রকৃতির, প্রকৃতির না হলেও মানব-প্রকৃতির, তাও না হলে তাই হওয়া উচিত। নিয়মটি হল মুনাফার আশা। বড় বড় জীবতত্ত্ববিদ, বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদ, দার্শনিক, অর্থনীতির মহারথীরা বল্লেন, 'হাঁ, হাঁ, তা তো বটেই, আমরাও ভেবে তাই বুঝেছি।' অমনি বই লেখা হয়ে গেল। অধ্যাপক যোগীশচন্দ্র সিংহ এই

ইতিহাস অতি চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'বিচিত্রা'র পাতায়।

ইংলণ্ডই য়ুরোপ নয়। ফ্রান্সে ও জার্মানীতে জমিদারতন্ত্রের প্রকোপ আরো বেশি দিন ধরে চলেছিল বলে সে সব দেশে নতুন শ্রেণী অত শীঘ্র গঠিত হতে পারেনি। ফরাসী বিপ্লবের পরেই ফ্রান্সে এবং আরো প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে জার্মানীতে নব্য-সম্প্রদায় মাথা তোলেন। ফ্রান্সে ছোট ছোট চাষী জমির অধিকারী হওয়ার দরুণ, কয়লা এবং লোহা না থাকার দরুন এবং উপনিবেশ হস্তান্তরিত হবার জন্যই ফরাসী মধ্যসত্বোপভোগী শ্রেণী ভালভাবে সমাজের ও রাষ্ট্রের বুক জুড়ে বসতে পাননি। জার্মানী নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। একাংশে জমিদার অন্যাংশে ছোট চাষী, মাঝখানে কলকারখানার মালিক ও বণিকের প্রাধান্য ছিল। জার্মানীর আবার উপনিবেশ পর্যন্ত ছিল না। এই সব কারণে ফ্রান্স ও জার্মানীতে ইংলণ্ডের মতো মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রভাব ফুটে উঠল না। যতটুকু ফুটেছিল তারই জন্য **industrial movement**-এর গোড়ার দিকে ফ্রান্স ও জার্মানীকে খানিকটা উদারপন্থী হতে হয়। এখনকার তুলনায় তখনকার বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্কের বাধা কমই ছিল।

কিন্তু সব দেশেরই একই সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চলতে পারে না। বাজার কই? দেশের সমাজের নতুন স্তর কিংবা দেশের বাইরে উপনিবেশ ভিন্ন বাজার নেই। অন্য দেশের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যে ও বিনিময়ে বাধা তোলে ধনীসম্প্রদায়ের সৃষ্ট দেশাত্মবোধ। তাই বাকি পৃথিবীর ওপর টান পড়ল। এশিয়া ও আফ্রিকা ভাগ হলো। যে দ্রব্য-উৎপাদনে তুলনায় বেশি লাভ সম্ভব, সেই বিশিষ্ট দ্রব্য এক দেশে বেশি প্রস্তুত হতে লাগল। প্রতিযোগিতার হাত থেকে তবু রক্ষা নেই। সব দেশ নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হলো। শ্রম-বিভাগের নতুন সংস্করণ শুরু হয় এই অবস্থা থেকে। আগে দেশের সমাজে ছিল ধনী ও নির্ধন, মালিক ও মজুর, কল-কারখানা ও কৃষি, এখন সেই বিভাগ পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। য়ুরোপ পাকামাল রপ্তানির এবং এশিয়া, আফ্রিকার উপনিবেশগুলি ও আমেরিকা কাঁচামাল সরবরাহের ভার নিল। অর্থাৎ ধনীর স্বদেশ বলে কিছু রইল না এবং ধনোৎপাদনের সাহায্যে শ্রমিকের ভৌগোলিক পরিসীমাও লোপ পেল। কিন্তু উপনিবেশ কারুর ভাগ্যে বেশি, কারুর ভাগ্যে কম, কারুর ভারবাহী জাহাজ বেশি, কারুর কম। তাই মন্দভাগ্য দেশের ধনীরা দেশের দিকে মন দিলেন। আগে দেশের এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে জিনিস পাঠাতে হলে শুল্ক দিতে হতো। শুল্ক তুলে দেওয়া হলো। রাস্তাঘাট, খাল, রেল-লাইন দেশকে ছেয়ে ফেললে। একা ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড ব্যতীত য়ুরোপের বাকি সব দেশই আত্মরক্ষার

অর্থাৎ দেশের ঐক্যসাধনে মন দিলে। স্টেট হল ভগবান, জাতিগত ঐক্য হলো সবচেয়ে শক্ত বাঁধন। এটাই হল জার্মান লিবারেলিজম্। এর সঙ্গে ইংরেজ লিবারেলিজমের পার্থক্য অনেক। জার্মান উদারপন্থার মূলকথা স্টেট ও সমাজগত ঐক্য, ইংরেজী উদারপন্থার মূলকথা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। পার্থক্যের কারণও সুস্পষ্ট, ইংলণ্ডের উদারপন্থা উপনিবেশ ও অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যের ফল, জার্মানীর হলো উপনিবেশ না থাকার প্রতিক্রিয়া। এজন্যই বোধ হয় ইংরেজী চিন্তাধারায় লালিত ভারতবাসী কমিউনিজম্ ফ্যাসিজম্, নাৎসি আন্দোলন ঠিক বুঝতে পারে না। জার্মানীতে উদারপন্থী মতের প্রচারক ছিলেন হেগেল, ফিখ্‌টে প্রভৃতি দার্শনিক, লিস্টের মতো অর্থনীতিবিদ এবং আমনের মতো জাতিতত্ত্ববিদ। সকলেই ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করতেন, অর্থাৎ ঐতিহাসিক পারম্পর্য ও বৈশিষ্ট্যকে গণ্য করেই তাঁরা নিজেদের মত প্রস্তুত করছিলেন। ইতালীতে এ মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন সিস্‌মণ্ডী। লিস্ট দেখলেন, বিশ্বজনীন অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য সব দেশের পক্ষে সব সময় উপযুক্ত নয়। কোনো দেশ কৃষি-প্রধান, কোনো দেশ ব্যবসা ও বাণিজ্যপ্রধান, অতএব অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা চাই। লিস্ট বলেন, ইকনমিক নিয়মাবলী ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক নয়। প্রত্যেক দেশের অবস্থা প্রায় সমান হলে তবেই তাদের মধ্যে অবাধ ব্যবসা চলতে পারে। সেজন্য গবর্নমেণ্টের, রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন— কেন না সমাজের অন্য কোনো শক্তি বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধ করতে পারে না। ইতিমধ্যে স্টেটের সাহায্যে দেশের উৎপাদন-শক্তি সর্বাঙ্গীণ হয়ে উঠুক, ইংলণ্ডে যেমন অবাধ ব্যবসা-যুগের পূর্বে ছিল, যেমন আমেরিকায় সে সময় হচ্ছে। লিস্টের মতবাদে গোটা-কয়েক জিনিস লক্ষ করতে হবে। (১) ঐতিহাসিক অবস্থা ও পারম্পর্যের প্রতি শ্রদ্ধা, (২) ইকনমিক জাতীয়তা, (৩) স্টেটের উপর নির্ভরশীল; (৪) অবাধ বাণিজ্যের আপাত অসম্ভবনীয়তা। লিস্ট অবাধ বাণিজ্যের বিপক্ষে ছিলেন না। বরঞ্চ স্বপক্ষেই ছিলেন, তবে তখন নয়— পরে, স্টেটের সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির পরে। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে লিস্ট দেশবাসীকে বোঝালেন যে, ভৌগোলিক দূরত্ব না ঘোচালে দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চলতে পারে না। তাঁরই উপদেশে জার্মানীতে রেল-লাইন বিস্তৃত হয়। লিস্টের মূল বক্তব্যগুলি লক্ষ করলে সন্দেহ হয় যে, তাঁর মতবাদ জার্মানীর ধনতন্ত্রের পরিপোষক মাত্র। অন্য দিক দিয়ে দেখলেও তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। আমেরিকা থেকে লিস্ট ব্যালেন্সড্ ইকনমি (balanced economy) শিখে এসেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, স্টেটকে আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে চাষবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে, এবং কৃষিজীবী

ও ব্যবসাজীবীদের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কোনো একটি বিশেষ উপায় বা শ্রেণী অন্য কোনো উপায় বা শ্রেণীকে গ্রাস করবে না। তখন জার্মান শ্রমিকরা শ্রেণীবদ্ধ হয়নি, তাই উপায় বলতে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা শস্য-উৎপাদন, এবং শ্রেণী বলতে রাজকর্মচারী, ব্যবসাদার, কৃষিজীবীই বোঝাতো। এই জার্মান (প্রুশিয়ান) জমিদার সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ জমিদারের মতন ছিলেন। তাঁরা ছিলেন প্রভু ও ধনী, জমিদারি ছিল তাঁদের প্রকাণ্ড, লোকলস্করের সাহায্যে জমিদারিতে বসে তাঁরা জমিদারি চালাতেন। তাঁরা এখন স্টেটের কাছ থেকে লিস্টের মতানুযায়ী সাহায্য চেয়ে বসলেন, সমগ্র দেশের খাদ্য সরবরাহের নামে। স্টেট তাঁদেরকে অনেক সুবিধা দিতে বাধ্য হলো। প্রোটেকশানিজম্ (**Protectionism**)-এর মোদ্দা কথা এই— দেশের মধ্যে দেশাত্মবোধের নামে নতুন ধনী সম্প্রদায়কে অর্থাৎ ব্যবসাদার ও জমিদারকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া ; স্বাধীনতার প্রধান উদ্দেশ্য মুনফাবৃদ্ধি করা ও এমন বাজার তৈরি করা, যেখানে অন্যদেশের সস্তা মাল প্রবেশ করতে পারবে না। এ স্বাধীনতা স্টেটের দান।

এইবার ইংলণ্ড অন্যপথ ধরলে। ইংলণ্ডের ধনতন্ত্র আরো পুরাতন, দেশটাও ছোট, সব মাল দেশে তৈরি হয় না, পুরো বছরের খাবারের জন্য অন্য দেশ থেকে মাল আমদানি করতে হয়, অথচ টাকা বেশি, উপনিবেশ অনেক। ভারবাহী জাহাজ, জীবনবীমা, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা ইংলণ্ড পৃথিবীকে কিনে রেখেছে। এই অবস্থায় ধনতন্ত্র সে দেশে সহজে উগ্র হয়ে উঠবে আশা করা যায়। কিন্তু উগ্ররূপ পরকে দেখানো যায় না। মালিকের দল তাই প্রতিযোগিতার কুফল বুঝে খুব বড় বড় কলকারখানা ফাঁদলেন। দেশের মধ্যে বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলিতে অর্থ ও বিজ্ঞানের জোরে এবং উপনিবেশে নিজেদের রাষ্ট্রের জোরে একচেটিয়া ব্যবসার পত্তন করলে। একচেটিয়া ব্যবসা চালাবার জন্যই সমুদ্রপারের উপনিবেশের সার্থকতা। আজ সে সার্থকতা সর্বত্রই ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে, উপনিবেশের ধনীসম্প্রদায় স্বদেশ-হিতৈষী হয়েছেন। যে কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন পতাকা, সেই কারণে ভারতবর্ষেরও গৈরিক পতাকা। নানা বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও এখানেই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগ। ইতিহাসের এই ধারাতেই আমাদের বর্তমান ইতিহাস পুষ্ট হচ্ছে, আমাদের সমাজ ও মন গড়ে উঠছে।

আমাদের মানসিক ইতিহাসের তিনটি বর্তমান লক্ষণ আছে। এক— দর্শন ও ধর্মের ভাষার নিয়ত প্রয়োগ, দুই— দেশাত্মবোধ, ও তিন— উদার মত। এই তিনটি নিদর্শন কিন্তু আমাদের ইতিহাসের মর্মকথা ব্যক্ত করে না। বরঞ্চ

গোপন করে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, কংগ্রেস ও শিক্ষিত সমাজ এই গোপন ষড়যন্ত্রের নায়ক। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের চক্রান্ত ধরা পড়েও পড়ছে না। মহাত্মাজী ও মালব্যজী অচ্ছুৎদের মন্দিরে ও কাউন্সিলে প্রবেশাধিকার দিতে প্রস্তুত, কিন্তু চতুর্বর্গের উপর হস্তক্ষেপ না করে। অচ্ছুতোদ্ধার সমিতির সভাপতি বিড়লা ব্রাদার্সের একজন। কংগ্রেস শ্যাম রাখেন না কুল রাখেন নিজেই বুঝে উঠতে পারছেন না। একধারে ধর্ম, অন্যধারে অর্থের প্রতিকূল টানে কাম নিষ্কামের কোঠায় উঠেছে— মোক্ষ ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। কংগ্রেস কাকে সন্তুষ্ট করবেন— ব্যবসাদারকে না জমিদারকে? অনুষ্ঠান কাকে সন্তুষ্ট করছে, এই প্রশ্নের উত্তরই অনুষ্ঠানকে বিচার করে। ধনী-সম্প্রদায়ের কার্যাবলী দেখলে বোধ হয় যে, তাঁরা তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন, তাই তাঁরা কংগ্রেসকে খানিকটা সাহায্য করতে প্রস্তুত। শ্রমিকেরা বোধ হয় এখনও সচেতন হয়নি, তবে বোধ হয় হতে বেশি দেরি নেই। একদিকে ভারতের ইতিহাস এখনও লিবারেল যুগের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে একচেটিয়া ব্যবসার তাগিদে যে অধিরাজ্য বা ইম্পিরিয়ালিজম্ তৈরি হয় তারই ফলাফল আমাদের সকলকে ভোগ করতে হচ্ছে। এই দু'এর মধ্যে বিরোধ রয়েছে, কিন্তু সেটা গতির হারের, সাময়িক ক্রমের পার্থক্যে। বিরোধটি প্রকৃতিগত নয়; অনেকের মতে আমাদের সমাজ অতি শীঘ্রই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে, বাইরের চাপে, যেমন ল্যাবরেটরিতে অতিরিক্ত আলোর জোরে একটি জীবকোষ অল্প সময়ে বিভক্ত হয়।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে দেশ অনেক বেশি প্রত্যাশা করে। সে প্রত্যাশা তাঁরা মেটান নি বলে তাঁদের সামাজিক কৃতঘ্নতার তুলনা নেই। তাঁরা বিদেশী রাজা ও ধনীসম্প্রদায়ের আশ্রয়ে জন্মেছেন বলে পরিত্রাণ নেই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা অগ্রণী তাঁদের কার্যাবলী অর্থাৎ তাঁদের বই সকলকেই পড়তে হয়। বিশেষত ঐতিহাসিকদের। দু' একজন ছাড়া এঁরা সকলেই দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ, সকলেই ইংরেজী ধরনের উদারপন্থী। কেউই সামাজিক ইতিহাস লেখেন না। কারুর লেখাতেই ইতিহাসের ধর্ম ও রীতি প্রকাশ পায় না। কার্যকারণ-সম্বন্ধ তাঁদের দেখাতে হয়, কিন্তু সে সম্বন্ধ নির্ভর করে শুধু প্রমাণের উপর। প্রমাণ-সাপেক্ষতাই তাঁদের যৌক্তিকতার একমাত্র অস্ত্র। তাঁরা উকিল হলেও পারতেন, ঘটনার বিপর্যয়ে, বোধ হয় নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বড় উকিল না থাকার দরুন, ঐতিহাসিক হয়েছেন। ইতিহাসের আদিতে ও ঘটনার পারম্পর্যের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা কাজ করে তার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই। তাঁরা সামাজিক বিপ্লবের ইতিহাস লেখেন না। কীভাবে সমাজ বাঁচবার চেষ্টা করছে,

ভালোভাবে বাঁচবার জন্য সমাজ-গঠন কোন্ সংকট-মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে— এ বিষয়গুলি তাঁরা বাদ দেন। তাঁরা জনসাধাধারণের ইতিহাস লেখেন না, জনসাধারণকে অবহেলা করেন, বোধ হয় ঘৃণাও করেন। সেজন্য আমাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকেরা হয় ছদ্মবেশী উকিল, না হয় ছদ্মবেশী কেরানি। তাঁদের ইতিহাস পুরানো কাসুন্দী ঘাঁটা, সমসাময়িক ইতিহাস নয়, ভবিষ্যতের ইতিহাসও নয়। যা হচ্ছে, যা হয়ে এসেছে তাই ভালো— এই প্রমাণ করাই তাঁদের গূঢ় অভিসন্ধি।

ভারতবর্ষের অর্থনীতিবিদদের বিপক্ষেও অনেক আপত্তি রয়েছে। আমরা পড়াই অ্যাডাম স্মিথ্, রিকার্ডো, মার্শাল, যাঁদের মতগুলি অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ বাণিজ্যের ধনতন্ত্র ও অধিরাজকতন্ত্রের সমর্থনের জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মনে মনে চাই আমরা protectionism, যার প্রকৃতিও পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যা পড়াই এবং যা চাই, তার মধ্যে মতের বিরোধ রয়েছে। তা ছাড়া আমরা ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে, চরকা চালানো ও চাষবাসের সপক্ষে। কিন্তু অবাধ বাণিজ্য ও স-বাধ বাণিজ্য, দু'ই কলকারখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যে দেশ কৃষি-প্রধান তাদের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। বলকান্ দেশ ও রুশের ইতিহাস আমাদের পড়া উচিত, সবুজ বিদ্রোহের ইতিহাস আমাদের জানা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়েও ওসব দেশের ইতিহাস পড়ানো হয় না। নিখিল ভারতীয় ইকনমিক কনফারেন্সে মার্শাল কিংবা তাঁর দলের মত ভিন্ন অন্য মতের আলোচনা করলে হাস্যাস্পদ হতে হয়। নিখিল ভারতীয় ইকনমিক কনফারেন্স যে চলছে তার একমাত্র কারণ এই যে, আমাদের বংশগত একটা ঐক্য আছে। সেটি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উদারপন্থাকে সমর্থন করা। অটোয়া চুক্তির তর্কে আমাদের অর্থনীতিবিদেরা ধনীসম্প্রদায়ের স্বার্থই দেখেছিলেন। যাঁরা আপত্তি করলেন তাঁরা বম্বেওয়ালার মুখ চেয়ে কিংবা দেশাত্মবোধের দোহাই দিয়ে, যাঁরা সমর্থন করলেন তাঁরা বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের মূল কথাটি অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ-সন্ধান না বুঝে। সামাজিক ইতিহাসের দিকে কেউ দেখলেন না। ভারতবাসীর এই মানসিক কাঠামোতে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যকে বসানো হয়েছে। সেজন্য বিজ্ঞানের ডাক্তার হয়েও গোঁড়ামি, বিজ্ঞান-শিক্ষার বদলে শিল্প-শিক্ষার চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞান-বিভাগের ছাত্রেরা আর্টস-বিভাগের ছাত্রের চেয়ে কম কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয় এবং তাঁরাও গবর্নমেণ্টের চাকরি না পেলে বিশ্ববিদ্যালয় তুলে দিয়ে শিল্পবিদ্যার কলেজ প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বচন উদ্ধৃত করে। আর দর্শন। আমাদের দর্শনের পুস্তক সবই দর্শনের ইতিহাস, সে ইতিহাসও আবার রেকর্ড ঘেঁটে রিপোর্ট লেখা। সাহিত্যের আজ ভীষণ দুর্ভাগ্য। তরুণ-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা সব বড়লোক হতে চান, ওপরের শ্রেণীতে উঠতে

চান। সেখানে যেটুকু দুঃখের খবর পাই সেটুকু অর্থের অনটনে কিংবা রোমাঞ্চকর ভাব-বিলাসের অসুবিধায়।

এই হলো আমাদের দেশের অবস্থা। এর মধ্যে বৈশিষ্ট্য হলো— বিংশ শতাব্দীতে জীবনধারণ করে য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর উপযোগী জীবনধারণের উপায় অবলম্বন করা। এখানে সৌভাগ্য কী দুর্ভাগ্যের কথা ওঠে না। কথা ওঠে ঐতিহাসিক রীতিনীতির, যার মধ্যে দৈবশক্তির ক্রীড়া না থাকলেও কার্যকারণ-সম্বন্ধের দুর্নিবার পরাক্রম লক্ষ করা যায়।

১৩৪০

ইতিহাস : ৩

আমি ইতিপূর্বে বরাবর 'শ্রেণী-বিরোধ' কথাটি ব্যবহার করেছি। এই অধ্যায়ে আমি 'শ্রেণী'র তাৎপর্য বোঝাতে চেষ্টা করবো। ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞাস্থাপন এক্ষেত্রে অসম্ভব ; কারণ ইতিহাসের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা এবং অন্য প্রত্যয় থেকে শ্রেণী-প্রত্যয়কে বিযুক্ত করা যায় না। ইতিহাসের সংজ্ঞা নয়— ইতিহাসের প্রত্যয় কর্মের পন্থা নির্দেশ করে।

সর্বপ্রকার জ্ঞানেই প্রত্যয়ের আবশ্যক। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলো ছিন্নভিন্ন অবস্থায় উপেক্ষিত হয়, একের সঙ্গে অন্যের যোগ হয়তো থাকে না, থাকলেও সে যোগটি পরিষ্কার নয়। জ্ঞানের দিক থেকে অথচ অভিজ্ঞতাগুলোকে যুক্ত-ভাবে দেখবার একটা তাগিদ থাকে। প্রত্যয়ের দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হয়। একবার গ্রথিত ও সমন্বিত হলে সেই প্রত্যয়েরই সাহায্যে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত ও নূতনতর হয়। প্রত্যয়ের সাহায্যে, সেই প্রকারের অভিজ্ঞতার গভীরতর সমালোচনা সম্ভব হয়। এই উপায়ে একজনের জ্ঞান সর্বসাধারণে ভোগ করতে পারে। প্রত্যয় হলো সমন্বয়-জ্ঞানের ভাষা এবং ভাষার ওপর কারুর একচেটিয়া অধিকার নেই। প্রত্যয়ের অন্য প্রকৃতি হলো বেষ্টনীর সঙ্গে জ্ঞানীর ও পূর্বার্জিত জ্ঞানের সমযোগ-সাধন। জ্ঞানীর ও জ্ঞানের মধ্যে চিরকালই যে বৈরীভাব থাকে তা নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু জোর করে বলবার দরকার রয়েছে যে, বৈরীভাব না দূর করলে জ্ঞানবৃদ্ধিও হয় না, জ্ঞানী সে জ্ঞানের সাহায্যে সম্পূর্ণ হন না, শান্তিও পান না। একমাত্র প্রত্যয়ের দ্বারাই বৈরীভাব দূরিত হয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি ও সম্পূর্ণতা-স্থাপন সম্ভব হয়ে ওঠে। অভিযোজন-কার্যের ফলে পূর্বদৃষ্টি আসে। পূর্ববোধের সাহায্যে ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতাকে সজ্জিত ও নিয়ন্ত্রিত করা যদি বিশদ জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তা হলে প্রত্যয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি কোনো জ্ঞানই কখনও পাবে না।

ইতিহাসও পাবে না। ব্যক্তির দিক থেকে বলা চলে যে, ইতিহাসের ব্যাপকতর প্রত্যয়ের সাহায্যে অতীত, বর্তমান, এমন কী ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা সুব্যবস্থিত হয়ে ব্যক্তিকে সুসম্পূর্ণ করে। এই হিসাবই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি, প্রকৃত দর্শন। কোনো জ্ঞানকে বিজ্ঞানের স্তরে তুলতে গেলে প্রত্যয়ের প্রয়োজন আরো বেশি করে অনুভব করতে হয়, এমন-কী গোটাকয়েক নতুন রকমের প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয়। আমাদের আলোচ্য জ্ঞান হলো ইতিহাস, যার বিষয় হলো সামাজিক অভিজ্ঞতার ধারা। সে ধারার রীতিনীতি আছেই আছে, কেন না অভিজ্ঞতা এক পক্ষে মানুষেরই, এবং মানুষের কার্যা-

বলী পুরোপুরি এলোমেলো কী অগোছাল নয়। অন্যপক্ষে বহিঃপ্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত রয়েছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে বহিঃপ্রকৃতির নিয়মাবলী মানব-প্রকৃতির নিয়মাবলী অপেক্ষা সুসম্বদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ ইতিহাসের বিষয়বস্তুর উপাদান-গুলির একাংশ অন্যাংশের চেয়ে বিজ্ঞানাধীন। বহিঃপ্রকৃতির কোনো বিশেষ ঘটনাকে ঘটনাপারম্পর্য থেকে যূথভ্রষ্ট করা চলে, নিরালম্ব করা যায়, করলে বৈজ্ঞানিকের কোনো সামাজিক ক্ষতি হয় না; কিন্তু মানব-প্রকৃতির বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতাকে ধারাবাহিকতা থেকে মুক্ত করা চলেই না, কারণ এই ধারাবাহিকতা যান্ত্রিক অনুক্রম নয়, পূর্বে ও পরের অন্বয়, এবং বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সামাজিক ক্ষতি হয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে এই দুই কারণে বাইরের ঘটনাকে পরীক্ষাগারে পুনর্গঠিত করা চলে এবং অন্তরের ঘটনা-সমাবেশ নিরুপম থেকেই যায়। (অবশ্য সবই আপেক্ষিকভাবে)। সংখ্যা শ্রেণীর একটি সাধারণ গুণ এবং তার অন্য সাধারণ গুণ সম্ভব হয় একটি বিশেষ গুণের পুনরাবৃত্তির দরুন। (এখানে শ্রেণী অর্থে অঙ্কশাস্ত্রের 'ক্লাশ' বলছি)। অতএব পদার্থ-বিজ্ঞান অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মাধীন এবং অধীন হয়েই সার্থক, মনোবিজ্ঞান কিংবা সমাজতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে অধীন হতে পারে না। অধীন হতে পারে সংখ্যা-শাস্ত্রের (Statistics), কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের (Mathematics) অধীনে এলে সার্থক হয় না পূর্বোক্ত দুই বিদ্যার মধ্যে পার্থক্যটুকু সকলেরই বিদিত।

ইতিহাসের মতন কোনো মানুষ-সংক্রান্ত সামাজিকতত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানের মতন বহিঃপ্রকৃতি-সংক্রান্ত বিজ্ঞানের রূপ কখনও নিতে পারবে কিংবা নেওয়া উচিত— এসব বিষয়ে বেশিদূর তর্ক চলতে পারে না। কারণ, যে উপায় অবলম্বন করলে তর্কের সিদ্ধান্ত হয় সেই উপায়টিই বর্তমানে ন্যায়ের বিচারাধীন। তা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক সমাজের নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও যখন নানা দোষ থেকেই যাবে, তখন পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে সমাজতত্ত্ব হয়তো অচিরেই পদার্থ-বিজ্ঞানের কোঠায় উঠবে, তবু তার সাহায্যে সমাজের ভবিষ্যৎ প্রগতি নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হবে কি না সন্দেহজনক। বিজ্ঞানসম্মত সমাজ হয়তো এমন হবে, যেখানে ব্যক্তি কিংবা অন্য অবৈজ্ঞানিক শক্তির দ্বারা নবতর সমাজের পুনর্গঠন একান্ত অবশ্যম্ভাবী ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। এ প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী না করাই ভালো। আমার বক্তব্য গোড়াতেই বলে রাখছি— সমাজের আংশিকভাবে সত্য নিয়মগুলিকে (ঘটনার সাধারণ অভি-মুখিনতা কিংবা ঝোঁকগুলিকে) পূর্ণতর সত্যে পরিণত করতে গেলে আপাতত যে উপায়ে বিজ্ঞানের ব্যাপকতর সত্যের সন্ধান মিলেছে, সেই উপায় অবলম্বন করাই ভালো। উপায়টি হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যেটি নির্ভুল না হলেও

নিতান্তই উপকারী। এবং জ্ঞানের দিক থেকে দেখলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ইতিহাস হলো প্রত্যয়ের ইতিহাস। তাই বলে ইতিহাস পদার্থ-বিজ্ঞান নয় এবং পদার্থ কিংবা রসায়নবিদ্যার প্রত্যয় ও ইতিহাসের প্রত্যয় এক জিনিস নয়।

পদার্থ-বিজ্ঞানকেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতিনিধি হিসাবে ধরছি। পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও ইতিহাসের প্রকৃতির পার্থক্যটুকু স্বীকার না করে উপায় নেই। আমার মতে তিনটি মূলগত পার্থক্য আছে। (১) পদার্থ-বিজ্ঞান দেশ ও বিশেষত কাল-নির্দেশ থেকে মুক্ত— অণুর গঠন ভারতবর্ষেও যা, হল্যাণ্ডেও তাই; আবার আজও যা, বহু শতাব্দী পূর্বেও তাই ছিল এবং আজ হতে শতবর্ষ পরেও তাই থাকবে, পরিবর্তনটি মতের মাত্র; কিন্তু ইতিহাস দেশ ও কাল-নির্দিষ্ট। অবশ্য দেশ ও কাল-নির্দেশ নিয়তির নির্দেশ নয়, নিয়মাধীন। (২) পদার্থ-বিজ্ঞানের বিষয়গুলি (data) কিংবা 'দত্তি' সকল প্রত্যক্ষ-ভাবে নিরীক্ষণ-লব্ধ, তার প্রতিপাদন পরীক্ষিত ও সর্বদাই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত। প্রত্যক্ষের সঙ্গেই পদার্থ-বিজ্ঞানের কারবার। ইতিহাসে নির্দিষ্টের সংখ্যা নিতান্তই কম। যেসব ঘটনা ঘটেছে তারই পুরাতন কিংবা সমসাময়িক বিবৃতি, পুঁথি, শিলালিপি প্রভৃতি থেকে ইতিহাস উদ্ধার করতে হয়। শুধু এই চিহ্নগুলিকেই প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ করা চলতে পারে, ঐতিহাসিকের বাকি কাজ অপ্রত্যক্ষভাবে পুনরুদ্ধার; অনেকটা জুরি কিংবা ডিটেকটিভের মতন। ইতিহাসের প্রণালী হলো প্রধানত অবরোহী। ঐতিহাসিকের জানা নেই কোন্ ঘটনা সত্য, কোন্‌টি অসত্য, কোন্‌টি অতিরঞ্জিত; সত্য ঘটনা তাকে আবিষ্কার করতে হয়। (এখানে পুরাতন ঘটনার বৃত্তান্ত ও পারম্পর্যের বিবৃতি অর্থে ইতিহাস কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে)। **All facts are born free and equal** বলা চলে না, কারণ শৃঙ্খলা ও শিকলের গুরুত্ব এক নয়। বরঞ্চ, পূর্বোক্ত উপায়ে যেসব দেশ ও কাল-নির্দিষ্ট ঘটনা জানা যায় সে সব ঘটনাকেই ঐতিহাসিক ঘটনা বলা চলে। সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে, ঐতিহাসিকের জ্ঞান অ-প্রত্যক্ষ ও অবরোহী। (৩) পদার্থ-বিজ্ঞানে যতটুকু অবরোহ-প্রণালী বা বিলোম ব্যবহৃত হয় সেটি শুদ্ধ, অর্থাৎ তার মধ্যে নতুন কোনো ঘটনা প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, অবান্তর নামে তাকে বহিষ্কৃত করা হয়। ইতিহাসে তা চলে না, ইতিহাসে রবাহূতের সংখ্যা কম নয় এবং তাদেরকে অন্তত মৌখিক অভ্যর্থনা করতেই হয়। সেজন্য ইতিহাসের অবরোহ-প্রণালী অ-শুদ্ধ। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশে যে কার্যকারণ-সম্বন্ধ রয়েছে তার মধ্যে মানুষের প্রবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তি, উদ্দেশ্য প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়াকে ধারণ করতে হবে। বহিঃপ্রকৃতিতে যেসব আকস্মিক ঘটনা ঘটে তার প্রভাবকেও অবহেলা করলে চলবে না। ইতিহাসে আকস্মিকের স্থান

আছে, যেমন জীবের অভিব্যক্তিবাদে **mutation**,— সে স্থান কতটুকু কিংবা কতখানি, বর্তমান প্রবন্ধের তা আলোচ্য নয়। তবে আকস্মিককে স্বীকার করলে অবরোহ-প্রণালী বিশুদ্ধ থাকে না, এই তথ্য জানলে ইতিহাস ও পদার্থ-বিজ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতি ও প্রণালীগত পার্থক্য বোঝা যাবে।

পূর্বোক্ত কারণে ইতিহাসের প্রত্যয় পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত মুক্ত, নিরালম্ব, বিষয়বস্তু থেকে নিষ্কর্ষিত হলেও অ-সংশ্লিষ্ট। সেগুলি একটি মনঃকল্পিত জগতের অশরীরী অধিবাসী। তারা যেন কোনো বড় সাজ-পোশাকের দোকানের ম্যানিকিন-প্যারেড, জনসাধারণ কাচের বাইরে রাস্তা থেকে তাদের দেখছে, বিস্মিত হচ্ছে। ব্র্যাড্‌লির অতুলনীয় ভাষায়, তারা রঙ্গমঞ্চের রক্তহীন নর্তকীর দল। কিন্তু ইতিহাসের প্রত্যয়গুলি রক্তমাংসের। তারা মূর্ত, সংহত, দেশ ও কাল-নির্দিষ্ট ব্যবহার থেকে অ-মুক্ত। প্রত্যয় মাত্রই মনঃকল্পিত, তবু যেন ঐতিহাসিক প্রত্যয়গুলি এই ব্যবহারিক জগতেরই অধিবাসী। জনসাধারণের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ যেন আরো ঘনিষ্ঠ, মধ্যে যেন বিশেষ ব্যবধান নেই। সামাজিক ব্যবহারে অভিসিক্ত থাকার দরুন ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের বিষয়-সন্নিবেশ সুদীর্ঘকালের মধ্যে ব্যাপ্ত, পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় সর্বদাই কালাতীত। প্রাকৃতিক ঘটনাকে পরীক্ষাগারে এনে সহজ করা চলে, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা পরীক্ষাগারে আনা যায় না, তারা জটিল ও বিচিত্র থেকেই যায়; সেজন্য পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় বর্জন করতে করতে তৈরি হয়, নেতিবিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু ইতিহাসের বিষয়কে অপ্রত্যক্ষভাবে জানা গেলেও ঐতিহাসিক প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত সাক্ষাৎজ্ঞানলব্ধ, বর্জন করলে তার অস্তিত্ব ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে ওঠে, অর্থাৎ তার অস্তিত্বই থাকে না। অনেকটা সহযোগ ও অসহযোগ নীতির মতন। ঐতিহাসিক প্রত্যয় আরো গতিশীল, কর্মনিয়ামক। পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় সম্বন্ধে সচেতন হলে প্রকৃতির ধর্ম পরিবর্তিত হয় না, কিংবা প্রকৃতিকে ভিন্ন পথে চালিত করা যায় না, শুধু বিজ্ঞানই অগ্রসর হয়; কিন্তু ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের সাহায্য, অর্থাৎ তার সম্বন্ধে সচেতন হলে সামাজিক প্রগতি ও পরিবর্তন সম্ভব হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অনুবৃত্তি গড্ডলিকাপ্রবাহের মতন, পদার্থ-বিজ্ঞানের অনুবৃত্তি পরপর, চলচ্চিত্রে ফিল্মের ফোটার মতোই। ইতিহাসের অতীত বর্তমানে জাগ্রত হয় এবং ভবিষ্যতের আভাস দেয়, বরফের গোলার মতো বড় হতে হতে চলে, পরের মধ্যে পূর্ব অন্তত আংশিক-ভাবে অনুবিষ্ট হয়। এজন্য ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের মধ্যে মূল্যাবধারণ থাকেই থাকে, কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয়ের মধ্যে থাকলেই সর্বনাশ। অবশ্য এসব পার্থক্য আপেক্ষিক। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পার্থক্য কমে আসবেই আসবে, কিন্তু

মূল্যজ্ঞান ও মূল্য-বিচারকে বর্জন করতে ঐতিহাসিক কখনও পারবে কি না জানি না। কারণ পদার্থ-বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মানুষ হলেও তাঁর বিষয় মানুষ নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক ডিটেকটিভ কিংবা জুরি হলেও মানুষ এবং তাঁর বিষয়ও মানুষ। এক্ষেত্রে মূল্য-বর্জন ঐতিহাসিকের পক্ষে নিতান্তই কষ্টসাধ্য। মানুষ হয়তো অন্য মানুষকে যন্ত্র কিংবা সংখ্যায় পরিণত করতে চায়, কিন্তু নিজে হতে আপত্তি করে। অবশ্য যদি মূল্য-জ্ঞান খাঁটি সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে ঐতিহাসিককে অন্য বৈজ্ঞানিকের মতন পুরোপুরি নির্মমভাবে নৈর্ব্যক্তিক না হলেও চলবে, তাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি লাঞ্ছিত হবে না। বিজ্ঞানের আদত কথা সত্য-প্রিয়তা, সেটা ঠিক মূল্যজ্ঞানের প্রতিকূল নয়।

শ্রেণী ও বিরোধ পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক প্রত্যয়। বিরোধ সম্বন্ধে পরে লিখব। শ্রেণী বললেই দু'টো মানসিক অবস্থা সূচিত হয়। (১) শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষের মধ্যে একতা ও সাম্যভাব। সমভাব ও একতার জন্য সীমার মধ্যে সহানুভূতি জন্মায়; তাকে **consciousness of kind**-এর পরিবর্তে **feeling of kind** বলা চলে; কারণ সচেতন অবস্থা সব সময় থাকে না, পরে আসে। (২) যারা অন্য শ্রেণীর জীব তাদের সম্বন্ধে নিজেদের উচ্চ কিংবা নিম্নশ্রেণীর জীব বলে স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট ধারণা। এই ভাবগুলি বহুভাবের সমষ্টি, কারণ উচ্চস্তর ও নিম্নস্তর একটি একটি দু'টি নয়, সমাজ বহুশ্রেণীতে বিভক্ত; অথচ প্রত্যেক শ্রেণী কোনো-না-কোনো স্থানে অন্য শ্রেণীকে স্পর্শ করেই আছে। ভাবগুলি নির্ভর করে শিক্ষাদীক্ষা, জীবনযাত্রার উপায়, পরস্পরের আলাপ-পরিচয় দূর কিংবা নিকট সম্বন্ধের উপর নানারকমের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অসমতার উপর। এই হল মরিস্ গীনস্বার্গের মতে শ্রেণীর অর্থ। তাঁর মতে, শ্রেণীর সংজ্ঞার জন্য কোনো উদ্দেশ্য কিংবা স্বার্থ প্রতিপন্ন করবার প্রয়োজন নেই, কারণ খুব কম শ্রেণীই সুস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্য ও স্বার্থ সম্বন্ধে সজ্ঞান। বলা বাহুল্য এই ব্যাখ্যা সমাজতত্ত্বের বেলা সঙ্গত হলেও, আমরা যেভাবে ইতিহাসকে বুঝতে চেষ্টা করছি সেভাবে অর্থ বহন করে না। 'আমরা একদলের' মনোভাবটি ইতিহাসের অন্য ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; সেটি প্রধানত আর্থিক ব্যবহারের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট; সজ্ঞান কিংবা অজ্ঞান অবস্থার ওপর তার মৌলিক অস্তিত্ব নির্ভর করে। যখন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য উৎপাদনের অধিকারকে কেন্দ্র করে কোনো লোকসমষ্টি তৈরি করে তখনই শ্রেণীর উৎপত্তি। উৎপাদন অতি পুরাতন, শ্রেণীও অতি পুরাতন; উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও অধিকার বদলাচ্ছে, শ্রেণীর রূপ বদলাচ্ছে; কিন্তু শ্রেণীও থাকছে যেমন উৎপাদন ও অধিকার থাকছে। এক শ্রেণীর সীমানির্ণয় হয় অন্যান্য স্বার্থ-গণ্ডীর দ্বারা।

তারা সর্বদাই বাধা দিতে থাকে, কারণ উৎপাদন-শক্তি একই সমাজে এককালে এত প্রচুর নয় যে, সকলের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হয়ে সব দলকে সন্তুষ্ট করতে পারে। কখনই করতে পারে না, যতক্ষণ সমগ্র সমাজে সম্পত্তিগত সম্বন্ধ রাষ্ট্রের দ্বারা পরিষ্কারভাবে স্থিরীকৃত এবং সম্পত্তি জনসাধারণের বদলে ব্যক্তির দ্বারাই অধিকৃত, অর্থাৎ যতক্ষণ অধিকার-ভেদ থাকে।' তা ছাড়া, সব শ্রেণীর মধ্যে আবিষ্কার করার উপযুক্ত জ্ঞান এবং অন্যের আবিষ্কারকে অনুকরণ করে উৎপাদন-শক্তিকে বৃদ্ধি করার সুযোগও সমান নয়। সেই জন্য শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের বীজ থাকবেই থাকবে। বিরোধ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীও আরো দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়। বিরোধের তাৎপর্যই হল উৎপাদন-শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার, অর্থাৎ অন্য শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব-স্থাপন। ব্যক্তিগতভাবে প্রভুত্ব-স্থাপনের অর্থ নেতৃত্ব ; কিন্তু তার আদিতে জীবগত পার্থক্য থাকলেও তার অনন্ত নিত্যতা ও চিরস্থায়িত্বের জন্য আর্থিক বৈষম্যই দায়ী। প্রভু নিজের পদত্যাগে সর্বদাই অনিচ্ছুক, সেজন্য প্রভুত্বরক্ষার অনিবার্য-পদ্ধতি অনৌদার্য ও 'জবরদস্তি'। তা ছাড়া সর্বপ্রকার আধিপত্যের মধ্যে লাভের আশা রয়েইছে। মুনাফার আশাই শ্রেণীকে চালিত করে। শ্রেণী সেজন্য কখনই লোকশ্রেয়কে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। তার মঙ্গল আংশিক। আসল কথা এই যে, সামাজিক অভিব্যক্তি ও সমসাময়িক ব্যবহারের মধ্যে বিরোধ ও সন্ধি, প্রভুত্ব ও দাসত্ব, লাভ ও ক্ষতি, সামাজিক কল্যাণ ও শ্রেণীর স্বার্থ এই চিরন্তন বিপরীত প্রবাহ ঐতিহাসিককে লক্ষ করতে হবে। শ্রেণী-প্রত্যয়টি এই বিপরীত প্রবাহের বিজ্ঞানসম্মত প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের মধ্যে বিরোধ সূচিত হচ্ছে বটে, কিন্তু বিরোধ-প্রত্যয়টি অনেকের মতে আরো ব্যাপক। বিরোধ বিশ্বেরই নিয়ম, সে নিয়মের মানবিক প্রকাশ যখন ইতিহাসের মধ্য দিয়ে হয় তখন সেই বিরোধের আশ্রয়কে শ্রেণী এবং সেই বিরোধকে শ্রেণী-বিরোধ বলা চলে। আমার মতে শ্রেণী ও বিরোধ সম্পূর্ণ পৃথক প্রত্যয় নয়।

একাধিক পণ্ডিতের মতে শ্রেণী-প্রত্যয়ের কোনো সার্থকতা নেই, কারণ সেটিকে জাতিভেদের জাতি (caste), ব্যবসায়ের বৃত্তি (vocation, কিংবা profession) ও শিল্পজীবিকা (craft) থেকে পৃথক করা যায় না। এই মতকে গ্রাহ্য করতে আমি অনিচ্ছুক, কারণ শ্রেণীর পূর্বোক্ত অর্থে তাকে অতি সহজেই পৃথক করা চলে। সমাজে একাধিক শ্রেণী আছে, তারা পরস্পর মিশে আছে— এবং ব্যক্তি একাধিক জনমণ্ডলীর আশ্রয়ভুক্ত, এ-দু'টি আপত্তি নয়, প্রত্যয় স্থাপনের বিপত্তি মাত্র। জাতিভেদের জাতি জন্মগত সংস্কার, এতদিন তার মূল্য ধর্মের দ্বারা নিরূপিত হয়ে এসেছে। শ্রেণীর সংজ্ঞায় ধর্মসংস্কারের স্থান নেই, থাকলেও প্রলেপের

মতন। সুপ্রজননবিদ্যার সাহায্যে জাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত কিংবা জাতিভেদ সমর্থিত না হলেও, সংখ্যার দিক থেকে বলা চলে যে, সমাজের মধ্যে গুণগত বিভাগ আছে। অবশ্য ইতিহাসের ও বর্তমান সমাজের শ্রেণী এবং গুণগত সাংখ্যিক বিভাগ এক নয়। যাদুবিদ্যা ছাড়া অন্য কোনো বিদ্যার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বুদ্ধিতে ও চরিত্রে স্বভাবতই সবচেয়ে উঁচু স্তরের এবং শূদ্রেরা সবচেয়ে নিচু স্তরের। বিদেশী সমাজে যেখানে শ্রেণী পুরাতন হয়ে জাতির সংস্কার গ্রহণ করছে সেখানেও ঐ কথা খাটে। বর্তমান হিন্দুসমাজের জাতি ধর্মের প্রত্যয় মাত্র, জাতিগত অধিকারের মধ্যে আর্থিক স্বার্থের ও আধিভৌতিকের প্রভাব থাকলেও সে অধিকার আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের আবরণে প্রচ্ছন্ন। জাতির প্রস্তুতি হলো পরমার্থিকের সাহায্যে কিংবা আশ্রয়ে সমাজের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করা। অথচ বাইরে থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সেই স্থান ও মর্যাদা আপনা হতেই স্থির হয়ে আছে। বলা বাহুল্য, আপনা হতে কিছুই স্থির হয় না। যে শক্তি সামাজিক অবস্থান নির্দেশ করে সে হলো উৎপাদন নামক সামাজিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস ও অভিব্যক্তি, উৎপাদক-জনসমূহের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য জনসমূহের সম্বন্ধ, অর্থাৎ সম্পত্তির অধিকার ও অর্থ-রোজগারের ব্যবস্থা। ধর্মসংস্কার ও অভ্যাসের দ্বারা এই শক্তির প্রকাশ ও পরিণতি ব্যাহত হয়, ইতিহাসের প্রকৃতি ঢাকা পড়ে। শ্রেণী-প্রত্যয়ের দ্বারাই সে শক্তির পূর্ণ পরিণতি সম্ভব হয়, অর্থাৎ ইতিহাসের প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হয়।

বৃত্তি অনেক প্রকারের। শিল্পবৃত্তি (**craft**), ব্যবসাবৃত্তি (**vocation**) এবং জীবিকা (**profession**), যেমন ডাক্তারি, ওকালতি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি। আমাদের পুরাতন ইতিহাসে শ্রেণী ও গণ আছে, প্রথমটি হলো সম-ব্যবসায়ীর দল, দ্বিতীয়টি হলো এমন দলের বৃত্তি যাতে একাধিক ব্যবসায়ীর সাহায্য নিতে হয়। এখন তাদের চিহ্ন পর্যন্ত লোপ পেতে বসেছে। ইন্দোর, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে খুঁজলে তাদের সন্ধান মেলে, কিন্তু তাদের মূল শুকিয়ে গিয়েছে। আমরা যে অর্থে শ্রেণী বলছি তার সঙ্গে সে সব শ্রেণীর মূলগত কোনো যোগ নেই। তারা এতদিন সংস্কারের পরগাছায় আচ্ছন্ন থেকেও বেঁচে ছিল, পরগাছা সরিয়ে নেবার পরে দেখা গেল যে তারা মরে গিয়েছে। সংস্কার-পুষ্ট জাতির আদিতে একপ্রকার উৎপাদনশক্তি কাজ করতো; শ্রমবিভাগ, যোগ্যতা ও শিক্ষানবিশির সুবিধা অনুসারে সে শক্তি বিভক্ত হয়ে বৃত্তির সৃষ্টি করেছিল; এক জাতি অন্য একাধিক জাতিতে বিভক্ত ও একাধিক জাতি একটি জাতিতে পরিণত হওয়ার মধ্যেও সে শক্তি কাজ করে এসেছে। আজকাল যে শক্তির দ্বারা

জাতিবিভাগ কিংবা জাতি গঠন হচ্ছে, তার পরিচয় অর্থনীতিতে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ধর্মসংস্কারের ইতিহাসে, কিংবা রাজনৈতিক লাভের লোভে। কিন্তু আদত ব্যাপারটি অন্যরূপ, যদিও রূপ এখনও প্রকট হয়নি। আজ বৃটিশ অধিরাজ্যের আশীর্বাদে ভারতবর্ষের অন্তত পণ্যদ্রব্য-উৎপাদনের রীতিনীতি বদলেছে। সমাজ সেই নতুন শক্তি ধারণ করতে পারছে না, পুরানো বোতল যেমন নতুন মদ ধারণ করতে পারে না। তাই সমাজে বিপ্লব এসেছে, সেই আধার ও আধেয়ের মধ্যে বিরোধের ফলে সত্যিকারের শ্রেণী তৈরি হবার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এখনও নতুন শ্রেণী তৈরি হয়তো হয়নি, কেন না এই বিরোধটি প্রকৃতপক্ষে বিরোধ নয়, গৃহবিবাদ মাত্র, তাই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া দেখছি। নতুন শ্রেণী যদি হয়েও থাকে, তবু সে শ্রেণী ইতিহাসের পটে নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন নয়। নট এসে হাজির হয়নি, দর্শকবৃন্দের মধ্যে একজনকে ধরে কয়ে নামানো গেল, তিনিও নটযশপ্রার্থী অথচ শঙ্কিতচিত্ত, আশ্বাস দেওয়া গেল উৎকৃষ্ট স্মারক আছেন; কিন্তু প্রম্পটিং-এর জোরে কতদূর চলে? বিশেষত যখন প্রতিপক্ষের নিজের কথাই মনে নেই। এ অবস্থার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত, তাই একটু ভুলচুক হতেই হবে। এখন আমার বক্তব্য এই যে কী হিন্দু কী য়ুরোপীয় সমাজে (চীন দেশেও) জাতি, কারুশ্রেণী ও সমবৃত্তিধারী জনসঙ্ঘের ব্যবস্থান নিরূপিত হতো উৎপাদনের রীতিনীতির দ্বারা। কৃষিপ্রধান সমাজে কারুশিল্প প্রস্তুত হতো শৌখিন সম্প্রদায়ের ভোগতৃপ্তির জন্য, কর্ষণ-বৃত্তির অতিরিক্ত কাজ হিসাবে। চাহিদা না এলে উৎপাদনই হতো না। তখন এক জমিদার-সম্প্রদায়ই নিজেদের অস্তিত্ব, কর্ম ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই তাঁরাই হলেন তখনকার একমাত্র শ্রেণী, আমাদের অর্থে। এখন কিন্তু উৎপাদনের প্রক্রিয়া উল্টে গিয়েছে (যদিও সম্পত্তির প্রকৃতি ও রূপ একই রয়েছে)। শিল্পীর সংখ্যা আর মুষ্টিমেয় নেই, সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের দলের পুরাতন গুণ লুপ্ত হয়েছে। তারা ছিল শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ, যত লোক বাড়ল, ততই শিল্পজ্ঞানের বদলে শুধু শ্রম করবার দৈহিক শক্তি ও বিশেষ জ্ঞানের বদলে সাধারণ বুদ্ধি ও তৎপরতার আবশ্যক হলো। এখন প্রায় সর্বত্রই শ্রমিকের বৃত্তি স্বপ্রধান হয়ে উঠেছে, অন্যবৃত্তির উপরে নির্ভর করছে না, কৃষিকার্যে মুনাফা কম, কুটিরশিল্পও নষ্ট হয়েছে। চাহিদা আছে কী নেই শ্রমিকশ্রেণীকে বুঝতে হয় না, তাদের কর্তব্য শুধু খাটা, সবই বোঝেন তাদের প্রভুরা, তাও হিসাবে গোলমাল হয়, ফলে অতিরিক্ত উৎপাদনই হচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যক্ষ চাহিদা এখন কলের, কল চালিয়ে রাখতেই হবে, কল বন্ধ হলেই সর্বনাশ হবে। কলই এখন শ্রমিকের প্রভু। তা ছাড়া, পূর্বোক্ত বৃত্তির শ্রম ছিল হাতের, শিল্প ছিল প্রথাসঙ্গত; প্রথার পরিবর্তন কোনো বৈজ্ঞানিক

পরীক্ষার দ্বারা হতে পারতো না, সামান্য যে একটু আধটু পরিবর্তন হতো, তা হাতে কাজ করতে করতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় তারই দ্বারা ধীরে, অতি ধীরে, সংস্কারকে খাতির করে। এখন বিজ্ঞানের আশীর্বাদে প্রত্যহই নতুন কল তৈরি হচ্ছে, শ্রমিক ও শিল্পীর অভিজ্ঞতার মূল্য কমে আসছে, সে অভিজ্ঞতা বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার কোনো সুযোগ নেই— শ্রমবিভাগ আরো বিভক্ত ও বিশেষ হচ্ছে। শ্রমিকদল বিজ্ঞান জানে না, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তারা করতে পারে না, তাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেই। প্রভুশ্রেণীর ধারণা এই যে, শ্রমিকেরা শুধু শ্রম করতেই জানে, বিজ্ঞান-শিক্ষার উপযুক্ত নয় তারা। প্রমাণও মিলেছে বড় বড় অধ্যাপকের বইতে ; সুপ্রজনন বিদ্যাই না কী তাই বলছে। উচ্চশিক্ষায় খরচও অত্যধিক, সব উচ্চ বিদ্যালয়ও প্রোফেশনালদের হাতে, সে-বিদ্যালয়ের টাকাকড়িও দিয়েছেন বড়লোকরা, জমিদার ও কলের মালিকরা। অতএব তাঁদের সন্তানরাই বৈজ্ঞানিক হবেন, বড় বড় প্রোফেশনে যোগ দেবেন।

এ বিবরণ আজকালকার অবস্থার। ইতিমধ্যে অতি গোপনে একটি নতুন শ্রেণী গোকুলে বেড়ে উঠেছে। তার নাম প্রোফেশন। কারুশিল্প দৈহিক শ্রমে পরিণত হবার পূর্বে একটি বিশেষজ্ঞের দল তৈরি হয়। তাঁরা মস্তিষ্কের দ্বারা হাতের কাজকে অর্থাৎ কারুশিল্পকে সহজ করে দিলেন, অর্থাৎ শ্রমবিভাগকে আরো বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। মোটা রবারকে টেনে পাতলা করা যায়, আরো টানলে ছিঁড়ে যায়। তাই আজ প্রোফেশনের উত্তমাঙ্গটি অর্থাৎ পণ্ডিতবর্গ সমাজদেহ থেকে বিচ্যুত হতে বসেছেন, সমাজ এখন ছিন্নমস্তা। পণ্ডিতেরা সামাজিক ব্যবহাররূপ উদ্দেশ্যকে বর্জন করেছেন ও প্রতিশোধে সমাজও তাঁদেরকে বর্জন করছেন। বর্তমান যুগান্তরের সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হলো এই— পণ্ডিতে যা বলেছেন দেশনেতারা তার বিপরীত কাজ করেছেন। পণ্ডিতে চাইছেন স্বাধীন বাণিজ্য কিংবা বাণিজ্যে শান্তি, ঘটছে ঠিক তার উল্টোটি, ট্যারিফের দেয়াল উঁচু হয়েই চলেছে, বিরোধ বেড়েই চলেছে। অত্যধিক শ্রমবিভাগের ফলে, বুদ্ধি ও কর্মের, বিজ্ঞান ও প্রয়োগশিল্পের, মতামত ও ব্যবহারের, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে সামাজিক বন্ধনটি ছিঁড়ে গিয়েছে। তারই দরুন ধনীরা যারা শুধু শ্রমিক তাদেরকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছেন। প্রোফেশনগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকা হলো এই— তাদের উৎসাহে যেমন বিজ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে, তেমনি তাদেরই কর্মফলে শ্রমিকের অধোগতি সাধিত হয়েছে। ভালো ও মন্দ একই কার্যের কর্মফল— ঐতিহাসিক নিয়তির রীতিই তাই। জ্ঞানের দ্বারাই এ নিয়তির কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এক্ষেত্রে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, প্রোফেশনগুলি এক একটি শ্রেণী। কারণ, উৎপাদন-শক্তিকে বাড়িয়েও তারা

উৎপাদন-শক্তির উপর অধিকার বিস্তার করেনি, তারা সমাজ-ধনের অল্পাংশ নিয়েই সন্তুষ্ট রয়েছে। তাও দক্ষিণা হিসাবে। কারণ, তারা নিষ্কাম হলে কী হয়, অন্য একটি শ্রেণী বেশিই সকাম। বিশেষজ্ঞের দল আজ এই শ্রেণীর আজ্ঞাবহ দাসানুদাস, নিতান্তই অনুগত ভৃত্য। তা ছাড়া, তাঁরা নিজেদের কর্মের ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন নন। তাঁদের ধর্ম 'মা ফলেষু কদাচন'। জ্ঞানযোগীর দলকে শ্রেণী বলতে কুণ্ঠা হয়। শ্রেণীর ধর্ম কর্মযোগের।

য়ুরোপের প্রোফেশনের ইতিহাস উদ্ধার করা হয়েছে। গোড়ায় জনকয়েক ব্যবসায়ী অবসরকালে নিজেদের মধ্যে সামাজিকভাবে মেলামেশা ও স্ফূর্তির ফাঁকে নিজেদের ব্যবসা-সংক্রান্ত আলোচনা করতেন। পরে তাঁরা ভদ্র অবস্থার উপযোগী আয় দাবি করলেন। অকারণে তাঁরা দাবি পেশ করেননি। তাঁরা বহুদিন ধরে শিক্ষানবিশি করেছেন, ফলে তাদের অনেক অভিজ্ঞতাও হয়েছে এবং অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তাঁরা বিশেষ জ্ঞানও অর্জন করেছেন, যার ফলে সমাজের উপকার হয়েছে। একটি বিশেষ জ্ঞানপদ্ধতি তাঁদের করায়ত্ত এবং সেই টেকনিকের প্রয়োগে তাঁরাই একমাত্র দক্ষ, অন্যে নয়। এই হল কার-সণ্ডার্সের মতে প্রোফেশনের ইতিহাস। হোইটহেডের নতুন বই থেকে ক'টি লাইন উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

'Profession means avocation whose activities are subjected to theoretical analysis and are modified by theoretical conclusions derived from that analysis "

অর্থাৎ পূর্বদৃষ্টি হবে থিওরির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং থিওরি প্রতিষ্ঠিত হবে বৃত্তিলব্ধ অভিজ্ঞতার ওপর। সিডনী ওয়েবের মতে প্রত্যেক প্রোফেশনের পিছনে সৃজনী শক্তি, অধিকার ও সম্পত্তিজ্ঞান এবং সহানুভূতির প্রেরণা আছে। এই মতটির মূল্য হয়তো খুব বেশি নয়, কারণ প্রায়ই সব দলের মূলেই আছে এই তিন প্রকারের প্রবৃত্তি। তাদের সাহায্যে শ্রেণীকে বৃত্তি থেকে পৃথক করা যায় না। অন্য দু'টি সংজ্ঞার দোষ ও অসম্পূর্ণতা পূর্বেই দেখিয়েছি, তবু সংজ্ঞা দু'টি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য শুধু এই দেখানো যে প্রোফেশনের বিশেষত্ব অন্য মতাবলম্বী ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের কাছেও ধরা পড়েছে। ভারতবর্ষের প্রোফেশনগুলি নিতান্ত খোলাখুলিভাবেই বিদেশী ধনীসম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার ও রক্ষার জন্যই সৃষ্ট ও লালিতপালিত।

অতএব শ্রেণী বলতে আমরা এই ক'টি প্রস্তাব গ্রাহ্য করি। (১) উৎপাদন-শক্তিকে কেন্দ্র করে জনসঙ্ঘ গড়ে ওঠে ; (২) ইতিহাস নির্দিষ্ট উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে এক একটি জনসঙ্ঘের সম্পর্ক স্থাপিত হয় ; উৎপাদনটি সামাজিক ব্যাপার এবং সম্পর্কটি রাষ্ট্রের দ্বারা সাধারণত স্থিরীকৃত ও আইনের দ্বারা অনুমোদিত ;

(৩) সম্পর্ক-স্থাপনের পর সামাজিক শ্রম ও সম্পত্তি এই জনসঙ্ঘের মধ্যে বিভক্ত হয়, পরে সেই বিভাগ রাষ্ট্রের দ্বারা চিরন্তন বলে ঘোষিত হয়। এই প্রকার জনসঙ্ঘকে শ্রেণী বলা হচ্ছে। অতএব ঐতিহাসিক প্রগতিতে শ্রেণীর একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। শ্রেণী-বিরোধের জন্যই সমাজ বর্তমান আকার ধারণ করেছে। পুরাতন পুঁথি ঘাঁটা ছাড়া যদি বর্তমানের সঙ্গে ইতিহাসের কোনো যোগ থাকে, ইতিহাস যদি সমসাময়িক বিবৃতি হয়, এবং ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত দেয় এবং নিয়ামক হয়, অর্থাৎ ইতিহাস যদি কেবল পৌনঃপুনিক ইতিবৃত্ত না হয়ে গতিশীল ও কর্মনিয়ামক হয়, তাহলে শ্রেণী-প্রত্যয়টি এই অর্থেই গ্রহণ করতে হবে এবং শ্রেণী-বিরোধকে ঐতিহাসিক প্রগতির একটি মূল শক্তি স্বীকার করতেই হবে ; (৪) জনসঙ্ঘ ঘনীভূত হবার প্রকট উপায় হলো বিরোধ ; (৫) বিরোধের প্রকৃতিই হলো লাভের আশা ও উৎপাদনকেন্দ্রের ওপর একাধিপত্য বিস্তার। অন্য ভাষায় বলতে গেলে :

"Classes are groups of people, such that one group may appropriate to itself the toil of the other owing to the differen-ce of their (historic) situation, which is itself determined by the mode of their economic life." : *Moscow Dialogues (Hecker)*

(৬) নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন না হলে শ্রেণী হয় না এবং শ্রেণী-বিরোধ সম্বন্ধে সচেতন না হলে এবং শ্রেণী-বিরোধ সম্বন্ধে সজ্ঞান না হলে সমাজের আমূল পরিবর্তন সম্ভবপর হয় না। বলা বাহুল্য, সব প্রতিজ্ঞাই একটি মূল সূত্রের চারপাশে দানা বেঁধে রয়েছে। (৭) অনেকের মত অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক উৎপত্তি ছাড়া শ্রেণীর অন্য উৎপত্তি আছে, যেমন ধর্মসংস্কার, সামাজিক সংস্কার, রাষ্ট্রের রীতি-নীতি। রাজনৈতিক কারণগুলি বিরোধের মধ্যে সর্বদাই বর্তমান, তাই আমাদের সংজ্ঞায় তারা ইতিপূর্বেই গৃহীত হয়েছে। শিক্ষাদীক্ষা, সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগের সামাজিক কারণগুলি মূলত অর্থনৈতিক। ধর্মসংস্কারের পার্থক্যে যে সামাজিক বিভাগ হয় সেটি শ্রেণীবিভাগ নয়। অনেক সময় সংস্কারগত পার্থক্য শ্রেণীবিভাগে বাধা দেয়, কিংবা প্রচ্ছন্ন রাখে। তাই বলে এই কারণ-গুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তারা আছে এবং সুখে স্বচ্ছন্দেই আছে। তাদের ইমারত সুদৃঢ়, তবে তাদেরও ভিত্তি অর্থনৈতিক মনে রাখা চাই।

গত অধ্যায়ে শ্রেণীর পুরানো ইতিহাস বর্ণনা করেছি। এই অধ্যায়ে ইতিবৃত্ত ও সমসাময়িক ইতিহাসের ধর্ম বোঝবার জন্য একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রত্যয় ব্যাখ্যা করলাম। ভবিষ্যতে শ্রেণী কী আকার নেবে একমাত্র তিনিই বলতে পারেন যাঁর নখদর্পণে বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের ভবিষ্যৎ প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তর্কবুদ্ধির

দিক থেকে বলা চলে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি-জ্ঞান, উৎপাদনের উপর একাধিপত্য এবং স্বার্থবুদ্ধি কমলে বিরোধের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হবে ও সেই সঙ্গে শ্রেণীও ব্যাপক হবে, সমাজের মধ্যে প্রসারিত হবে। তখন শ্রেণী-বিরোধের ভীষণতা থাকবে না। বিরোধ এক প্রকারে না হোক অন্য প্রকারে থাকবে, কেন না বাধা-বিপত্তি, বিবাদ ও বিরোধের মধ্য দিয়ে অগ্রগতিই হলো বোধ হয় বিশ্বচরাচরের নিয়ম। বিরোধের অবসানে বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সচেতনভাবে এই বিশ্বশক্তিকে শ্রেণী-বিভাগ তুলে দেবার কাজে নিয়োজিত করাই ঐতিহাসিকের একমাত্র সামাজিক কর্তব্য। সমাজের দিক থেকেও বটে, ব্যক্তির দিক থেকেও তাই। কারণ, শ্রেণীতে বিভক্ত হবার জন্যই মানুষ মানুষ হতে পারছে না। অথচ এ না হয়ে উপায় ছিল না। সমাজের প্রকৃতিতে যে সব অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, বৈসাদৃশ্য, বিরোধ-বিসম্বাদ রয়েছে তাদেরকে প্রকাশ, খণ্ডন ও সমন্বয় করতে করতেই সমাজের অভিব্যক্তি হয়েছে ও হবে। যখন সচেতনভাবে কোনো একটি মণ্ডলীর দ্বারা এই কার্য সাধিত হয়, তখন সেই কার্যের নাম হলো শ্রেণী-বিরোধ। এই হলো শ্রেণী-বিরোধের প্রকৃত তাৎপর্য। আমি জানি, এই অধ্যায়ে ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা স্থাপন করা হলো না। আমরা যেভাবে ইতিহাস বুঝতে চেষ্টা করছি, তার সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা খাপ খায় না। আমাদের প্রত্যয় পথ দেখিয়ে দেয়, অগ্রসর হতে সাহায্য করে, গন্তব্য নির্দেশ করে।

১৩৪১

রবীন্দ্রনাথ ও তুলনা

৭ই অগস্ট থেকে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা দিলাম, অনেক প্রবন্ধ লিখলাম। তারও বেশি অনেক শুনলাম ও পড়লাম। আমার যা অবস্থা তাই যদি সকলের হয় তবে প্রত্যক্ষ আচরণের সাধ্য কী মনের কথা প্রকাশ করে! হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে তবু কলম ধরতে হবে, সম্পাদকের ভয়ে নয়, টাকার লোভে নয়, কেবল এই ভেবে, এত দিনের অনাদর, মূর্খ আলোচনার যদি সামান্য একটুও ক্ষতিপূরণ হয়। ছেলে-বয়সের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, পঞ্চাশ বছর থেকে যা গালিগালাজ তিনি খেয়েছেন, যা কানাঘুষো তাঁর বিপক্ষে চলেছে এবং তিনি শুনেছেন, তার খানিকটা আমরা জানি। একপ্রকার উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা, অশ্রদ্ধার যান্ত্রিক বৈপরীত্য। রামানন্দবাবু নিজের অবস্থাকে বৈধব্যের সঙ্গে তুলনা করেও লিখেছেন— সজ্ঞান শ্রদ্ধা চাই। এই তো মানুষের মতন কথা। কিন্তু, মানুষ হওয়া ভারী শক্ত।

শক্ত না হলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই রকম পাগলের মতন লোকে তুলনা করে। এক নিঃশ্বাসে দ্য ভিঞ্চি, গ্যেটে, হ্যুগো, ব্যাস, তুলসীদাস, কালিদাস প্রভৃতির নাম বেরুচ্ছে বক্তার মুখ ও লেখকের কলম দিয়ে। বিদেশের পটভূমি না হলে আমাদের আত্মসম্মান বজায় থাকতো না এককালে, যখন তাঁকে ভারতের শেলী বলতাম, কিন্তু ১৯১১ সালের পর, অন্তত বাংলা সাহিত্যে, ঐ প্রকারের পরাশ্রয় আত্মার পরাজয় এবং রবীন্দ্রনাথের শোকপ্রকাশে তাঁরই অপমান। তিনি আর মহাত্মাজী আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠ করেছেন। তাঁর আশীর্বাদে বাংলা সাহিত্য পৃথিবীর সাহিত্যে আসন গ্রহণ করেছে, তাঁর কৃপায় ভারতীয় অনুশীলনে লজ্জা-বোধ বিদূরিত হয়েছে, তাই বিদেশী মহারথীদের নাম গ্রহণ আজ নিতান্ত অশোভন। লোকে বলতে পারে যে, তাঁর বিশাল সৃষ্টি ও লোকোত্তর প্রতিভায় আমাদের বিচার-বুদ্ধি এতই বিমূঢ় হয়েছে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের সঙ্গে তুলনা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আমার বিশ্বাস, উপায় আছে— নীরব থাকা।

তুলনা কোথায় জানতে ইচ্ছে হয়। আমি ঐ সব মহাজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত নই। তবে যাঁরা তুলনা দিচ্ছেন তাঁরা যতটা ও যেভাবে রবীন্দ্র-নাথকে জানেন তার চেয়ে কম চিনি না আমি ঐসব মহাজনদের এক আধজনকে। গর্ব করছি না সত্যি কথা লিখছি। ধরা যাক গ্যেটেকে। তাঁর রচনার— নাটক, নভেল, কবিতা, কথোপকথন প্রভৃতির— অনুবাদ ইংরেজীতে আছে এবং তাঁর পাঁচখানা জীবনচরিত ইংরেজীতে লেখা হয়েছে। আমাদের যুগে ঐ বইগুলোর

সঙ্গে পরিচয় শিক্ষার অঙ্গ বিবেচিত হতো। আমরা অনেকেই সেগুলি পড়েছি— জার্মান ভাষা না জানার জন্য উপভোগ আমাদের অসম্পূর্ণ রয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু খানিকটা ক্ষতিপূরণ হয়েছে কার্লাইল, ক্রোচে, রবার্টসন, লিউইস, সাইম প্রভৃতির ব্যাখ্যায়। এই আংশিক অধিকারে আমি গ্যেটের সমালোচনা করতে অক্ষম, কিন্তু গ্যেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভেদ দেখাতে অক্ষম নই। আমার উক্তিকে পাঠক যদি দম্ভ ভাবেন তবে নাচার।

দু'জনের মধ্যে মিল প্রতিভার ক্ষেত্র ও প্রভাব নিয়ে। গ্যেটে একাধারে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। সাহিত্যে তিনি নভেলিস্ট, নাট্যকার ও কবি বলেই বিখ্যাত। তাঁর চিঠিগুলোও চমৎকার। বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁর দেহ-তত্ত্বের পরীক্ষা বিপ্লব এনেছিল এবং অপ্‌টিক্‌স ও রং সম্বন্ধে মতামত আজ অগ্রাহ্য হলেও অন্য হিসেবে মূল্যবান। তা ছাড়া, গ্যেটে ছিলেন মন্ত্রী ও শাসক, অর্থাৎ স্টেট্‌স্‌ম্যান। হ্বীমার ছোট হলেও তার সংস্কার খুবই উঁচু ধরনের। গ্যেটের প্রতিবেশ ছিল জার্মানীর ছোট ছোট চল্লিশটি রাজ্য, ফরাসী বিপ্লব এবং তারই সঞ্জাত নেপোলিয়নের একীকরণের সভ্যপ্রচেষ্টা। গোটাকয়েক উৎকৃষ্ট গানের কথাও তিনি লিখেছিলেন। ছোট গল্প, আমার যতদূর জানা আছে, তিনি লেখেননি। নাট্যমঞ্চের প্রতি তাঁর প্রীতি ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তার নতুন রূপ তিনি দিয়েছিলেন বলে জানা নেই। নৃত্য সম্বন্ধে তাঁর দান শূন্য। অন্য ধারে রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিক নন, বিজ্ঞান তিনি ভালবাসতেন। কবিতায় বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন, 'বিশ্বপরিচয়' লিখেছেন, জ্যোতির্বিদ্যা, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ভূগোল-সংক্রান্ত নতুন নতুন বই তিনি অতিশয় আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন— যাতে মানসিক প্রসারতা, ভূমার আভাস, বিশ্বসংসারের প্রাথমিক ও সর্বব্যাপী রীতিনীতির সাক্ষাৎ মেলে। গ্যেটের মনোভাব ছিল ভিন্ন। তিনিও 'arche-type' খুঁজতেন, কিন্তু পরীক্ষার মারফৎ। রবীন্দ্রনাথের 'arehe-type' উপনিষদের, অর্থাৎ ব্রহ্ম। রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রিত্ব করেননি, জমিদারি চালিয়েছেন, হয়তো তাঁর জমিদারির আকার হ্বীমারের চেয়ে কম ছিল না, তবু জমিদারি বিদেশী রাজার অধীন এবং হ্বীমার ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র। গ্যেটে যখন নেপোলিয়নের সঙ্গে দেখা করেন তখন তাঁর আশেপাশে গুপ্তচর ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথকে লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি সাবধান করেছিলেন, বিদেশেও তাঁকে একাধিকবার বিধ্বস্ত হতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা দু'হাজারের উপর, চিত্রের সংখ্যাও তাই শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নৃত্য, রঙ্গমঞ্চ ও নটশিল্প দেশে যুগান্তর এনেছে। গ্যেটে 'ফাউস্ট' লিখেছিলেন, যেটা সমগ্র য়ুরোপীয় সভ্যতার অভিব্যক্তি ও পরিপূরণের নাটক। রবীন্দ্রনাথের নাটক ঐ ধরনের নয়।

দু'জনের প্রতিবেশ ভিন্ন। গ্যেটে স্বাধীন দেশের লোক, রবীন্দ্রনাথ পরাধীন দেশের। গ্যেটের রাজনৈতিক সমস্যা ছিল রাষ্ট্রিক একীকরণের, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র স্বাধীনতার। ফরাসী বিপ্লবের দূত হিসেবে নেপোলিয়ন এসেছিলেন তাঁর দেশে এবং যারা 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরেজী সংস্করণ বাজেয়াপ্ত করলে তারা নিশ্চয় স্ট্যালিনের বংশধর নয়।

এই পরাধীনতার চাপ তাঁর ওপর কতখানি পড়েছিল তার বিচারের স্থান নয় এখানে। কিন্তু ভীষণভাবেই যে পড়েছিল তা অনেকেই জানেন। তিনি সেটা কাটিয়েও বিশ্বের সামনে দাঁড়ালেন, এটা তাঁর কৃতিত্ব, বৃটিশ সাম্রাজ্যের নয়। গ্যেটের বিশ্বজনীনতা অনেকটা ফরাসী বিপ্লবেরও প্রাপ্য। রবীন্দ্রনাথ স্টেটস্‌ম্যান হবার সুযোগ পাননি। মহামানবত্বে, ঋষিত্বে, ঐ রুদ্ধ কর্মপ্রবৃত্তি পরিণত হয়ে আজ যদি মানবের কল্যাণ বেশি সাধিত হয়ে থাকে, তবে শ্রদ্ধা দেব একাই তাঁকে, যিনি ভারতবর্ষের বাণীতে বিশ্বাসের জোরে এবং স্বকীয় প্রতিভার সমর্থনে এই বিরোধী সমাবেশের অসুযোগ অতিক্রম করতে পারলেন। য়ুরোপীয় সভ্যতায় তাঁর বিশ্বাসকে অমান্য করছি না, কিন্তু টিকল কোন্‌টা? গ্যেটে তার জয়গানই করে গেলেন, আর রবীন্দ্রনাথ তার মুখোশ ছিঁড়ে তার লোলুপ মূর্তিটা দেখালেন শেষ বয়সে। ইংরেজী পরিশীলনের ফলে রবীন্দ্রনাথ, মিথ্যে কথা এবং ফরাসী বিপ্লবের ফলে গ্যেটে, সত্যি কথা, কেন বেশ বোঝা যায়।

দু'জনের মানসিক গঠনের পার্থক্য প্রথমে চোখে না পড়লেও তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। গ্যেটের কোনো রচনায় রসিকতার চিহ্ন নেই; তার চিঠি ও কথোপকথনে গভীর তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু ঔজ্জ্বল্যের পরিচয় পাই না। রবীন্দ্রনাথের রসিকতা সর্বজনবিদিত, সে সম্বন্ধে বাক্যব্যয় নিরর্থক। গ্যেটের রচনা যে জ্ঞানে ভরপুর সেটা অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত, তাই তাঁর শান্তিতেও কলঙ্কের দাগ কখনও কখনও চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে জ্ঞান আছে সেটা অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে বলছি না; অভিজ্ঞতা আত্মার ভূমিকায় প্রস্থাপিত ও উন্নীত হয়ে যে শান্তি লাভ করেছে, সেই শান্তিতে তাঁর জ্ঞান প্রদীপ্ত। এক্ষেত্রে ললাটে জয়ের উদ্ধত তিলক কিংবা পরাজয়ের লাঞ্ছনা থাকতেই পারে না। অভিজ্ঞতাকে যিনি সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি-উপকরণ ভাবেন, তিনি উপকরণগুলোর ব্যবহার করবেন নিতান্ত সহজভাবে, সানন্দে, শান্তভাবে। ব্যবহারটাই আত্মার প্রকাশ এবং আত্মার প্রকাশে আড়ষ্টভাব নেই। গ্যেটের জ্ঞান আত্মজ্ঞান, রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান আত্মার বিকাশ। কোন্‌টা কার ভাল লাগবে নির্ভর করছে রুচি ও শিক্ষাদীক্ষার ওপর। কিন্তু এটা ঠিক যে দু'টোর অন্তরে পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্যের জন্যই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে, রসিকতায় ঝলমল

করছে এবং গ্যেটে একটা বই লিখতে প্রায় ত্রিশ বছর লাগালেন। দু'জনের মুখ দেখলেই বোঝা যাবে, একজনের মুখে বিশটা দাগ, অন্যের মুখ সূর্যের মতন প্রশান্ত, ক্ষতের চিহ্ন পর্যন্ত ভাস্বর। একজনের মুখ দেখলে মনে ওঠে— ওক্ গাছের গুঁড়ি আর অন্যজনের মুখ দেখলে মনে হয়— সীডার-এর উচ্চ অভিলাষ। জীবনটাকে বিরোধ ভেবে ভারসাম্যে অবস্থান এবং তাকে আত্মার ক্রমবিকাশ জেনে সুখ-দুঃখের সমন্বয়— দু'টি প্রত্যয় এক নয়।

তার পর ওঠে প্রভাবের কথা। পূর্বেই লিখেছি গ্যেটের প্রভাবকে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করা শক্ত। কিন্তু কিছুতেই রবীন্দ্রনাথকে বিদেশী সভ্যতার প্রণালী ভাবা যায় না। অবশ্য, এককালে লোকে তাই ভাবতো, সে ভাবনার মূল্য নেই আজ। বরঞ্চ মাইকেলই সর্বপ্রথম সাহিত্যের সাহায্যে বিদেশী মনোভাবের প্রচার করেন; সে কাজ ন্যস্ত হয় বঙ্কিমের উপর। ফলে যে ইঙ্গ-বঙ্গ মনোভাবের প্রসার হয়, তার অনেকখানি ছিল মেকি, ঝুটো মাল: রবীন্দ্রনাথ নিজে তাকে পরিত্যাগ তো করেনই, তাঁর কৃপায় আমরাও খানিকটা তাকে বর্জন করতে শিখেছি। রাষ্ট্রিক ব্যাপারে সাহেবিয়ানায় বাঙালি যদি অবিশ্বাসী হয়ে থাকে তার জন্যে তিনিও ধন্যবাদার্হ। মাতৃভাষার ব্যবহার থেকে চিত্তশুদ্ধি, পল্লীসংগঠন, ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে আত্মনিষ্ঠা— এ সবই প্রমাণ করে যে, তাঁর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয় চিন্তায় ও কর্মে পূবের দানই বেশি ছিল এবং সেই শক্তিতেই তিনি আপন আসন জোর করে কেড়ে নেন। গ্যেটের সমন্বয়ে 'জার্মান'-অংশ কম ছিল অনেকেই বলছেন। যদি কোনো ভারতবাসী ভক্ত আপত্তি তোলেন, তবে 'খাঁটি জার্মান' আর্থার রোথেনবার্গ তাঁর সম্বন্ধে কী লিখেছেন স্মরণ করাচ্ছি। একাধিক জার্মান দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, গ্যেটের মধ্যে জার্মান রক্ত ও তেজ এতই কম ছিল যে, তাঁর ছেলেকে 'স্বাধীনতার যুদ্ধে' যোগ দিতে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। আশ্চর্য হই যখন শুনি জার্মানীতে গ্যেটের প্রভাবের কথা। অন্যধারে, রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা পর্যন্ত বাঙালি আত্মসাৎ করেছে। আমরা আজ ভাবি তাঁর ভাষার দৌত্যে, প্রেমে পড়ি, বন্ধুকে চিঠি লিখি, শরতের আলো দেখে উৎফুল্ল হই, কাল-বোশেখীর রুদ্ররূপে ভয়ার্ত হই, ছড়া শুনে, আলপনা দেখে উল্লসিত হই, তাঁরই কৃপায়। জাতীয় মনে এমন ছড়ানো শিকড় আর কার? বাঙালি মেয়েদের নাম তো তাঁরই দেওয়া। আন্নাকালী থেকে সমিতা নমিতায় পরিণতিকে আমি জাতির প্রাথমিক রুচি-পরিবর্তন বলি। গ্যেটের পর মাত্র মারগারেট, মিনঁ আর ডরথির প্রচলন হয়।

আবার বলি যে, গ্যেটের সমালোচনা করতে আমি অপারগ। তাঁর মাহাত্ম্যে আমি পূর্ণ বিশ্বাসী। য়ুরোপে তাঁর জুড়ি নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও আমাদের কাছে অদ্বিতীয়। তাঁর অদ্বিতীয়ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে তাঁর বিশেষত্বের জ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজন। সেটার অভাবে তুলনা হয়ে ওঠে ভাবোচ্ছ্বাস এবং দাসমনোভাবের চরম নিদর্শন।

১৩৩৮

রবীন্দ্র-সৃষ্টি

খড়্গ'র বাগানবাড়িতে একদিন সমালোচনা-সাহিত্যের কথা উঠল। কীভাবে তার উন্নতিসাধন সম্ভব, সাধারণ বিচারের পর দু'টি পথ দেখা গেল। প্রথম, কবির নির্বাচিত জনকয়েক লেখক 'পরিচয়ে'র পৃষ্ঠায় 'কবিতা ভালো লাগে কেন?'— এই প্রশ্নের ব্যক্তিগত উত্তর দেবেন; দ্বিতীয়, কোনো একজন বিশেষ কবিকে উপলক্ষ্য করে গোটা কয়েক প্রবন্ধ লেখা হবে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পন্থা অনুসরণ করতেই উপদেশ দিলেন। পরে, ঠাট্টার সুরে বললেন, "দেখো, এমন কবি নিও যে ভার সইতে পারে।" মাইকেলকে ধরাই ঠিক হলো। তাঁর উপদেশ এখনও পালন করা হয়নি। আজ আবার সেই ভার সওয়ার কথা মনে হচ্ছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য কত ভার সইতে পারে তার ইয়ত্তা নেই; বহু যুগ ধরে তার আলোচনা চলবে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ফলে ক্রমশই তার নতুন নতুন সৌন্দর্য আবিষ্কৃত হবে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার আলোচনা সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হবে নিশ্চয়ই। অনেকদিন যাবৎ রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি বাঙালি হয় নিরাগ্রহ না হয় বিরূপ ছিল। মাত্র বছর ত্রিশ থেকে বাঙালি ও অন্যান্য ভাষী তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই ক'বছর হলো যৎসামান্য বিচারও শুরু হয়েছে। প্রারম্ভেই আমাদের উপলব্ধি হলো যে, এমন বিরাট প্রতিভা জগতে দুর্লভ। এখনকার সমস্যা এই: কীভাবে রবীন্দ্র-সৃষ্টির সম্মান প্রদান, উপভোগ ও সুবিচার সম্ভব। কাজটি একার নয়, এক যুগেরও নয়। কিন্তু দীর্ঘ কালের জন্য সংকল্প এখন থেকেই করতে হবে। বলা বাহুল্য, ভাবপ্রবণতা স্বল্পায়ু। এই প্রবন্ধে আমি সংকল্পের নক্সা দিচ্ছি না, সে কাজ আমার শক্তির বাইরে। রবীন্দ্র-সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয়ে আমার মনে যে ধারণাটি বদ্ধমূল হয়েছে আমি তারই ইঙ্গিত দিচ্ছি।

আমার প্রাথমিক ধারণা এই: তাঁর সৃষ্টি প্রায় একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। প্রকৃতির মধ্যে আছে অঙ্গাঙ্গী যোগ, প্রতিবেশের সহযোগে বৃদ্ধি এবং একটা সমুত্থিত ঐক্য। তা ছাড়া, সমগ্রের ইতিহাস বিশেষে পুনরাবৃত্তিও প্রকৃতির ধর্ম। 'প্রায়' লিখেছি এই জন্য যে, মানসিক নির্বাচন সর্বদাই বর্তমান, যদিও তার সীমা প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে অঙ্গাঙ্গী যোগের দৃষ্টান্ত খুঁজতে কষ্ট নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্য, তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীত, তাঁর সমাজ ও রাজনীতি, তাঁর ধর্মতত্ত্ব ও বিশ্ববোধ, এই যুগ্ম প্রত্যয়গুলির একটি অন্যটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। কেবল চিত্রের বেলা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে সেটি একক; যূথভ্রষ্ট। অর্থাৎ, যাঁকে আমরা সৌন্দর্যের উপাসক ভেবে এসেছি, যাঁর প্রতিভা আর লিরিসিজমকে

সমীকরণ করাটাই আমাদের মধ্যে প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাঁর হাত দিয়ে এমন অদ্ভুত কল্পনার প্রকাশ 'খাপছাড়া'ই লাগে। কিন্তু এই ভাবনার মূল ধারণাটিই মস্ত ভুল। রবীন্দ্র-সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক ঘটনার মতন ভাবলে বিস্ময়ের হেতু থাকে না। রুদ্র, অবাস্তব, ভয়ংকর প্রভৃতির স্থান প্রকৃতিতে আছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যেও আছে। নেই ভেবে যাঁরা খুশী হতে চান, তাঁদের জন্য জীবজগতের 'স্পোর্ট'-এর উল্লেখ করছি। 'স্পোর্ট' আকস্মিক হলেও অভিব্যক্তিরই নিদর্শন।

প্রতিবেশের সহযোগে বৃদ্ধিকে লোকে প্রভাব বলে। 'প্রভাব' কথাটিতে সাধারণত একাংশ নিষ্ক্রিয় ও অন্যাংশ সক্রিয় বোঝায়। যে অংশ অন্যান্য দিকে সক্রিয় তার একটি প্রতিপত্তি থাকে, তাকে যখন কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন সঙ্গীত, সক্রিয় বলি, তখন আমাদের অজানিতে অন্যাংশটিকে কেবল নিষ্ক্রিয় নয়, পঙ্গুই বিবেচনা করি। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের উপর য়ুরোপীয় প্রভাব বিচারের সময় এই ভুল আগে অনেকেই করেছেন, সঙ্গীতে এখনও অনেকে করে থাকেন, চিত্রেও তাই। কিন্তু প্রকৃতির কাজে প্রভাব নেই, আছে সক্রিয় সহযোগ, **active adaptation**। সহযোগের ক্রিয়ায় বিরোধ, প্রতিকূল আচরণ, পরিত্যাগ বাদ পড়ে না। মন যখন নিতান্ত শক্তিশালী তখন নির্বাচন সহজ ও গুণগত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্র-সৃষ্টির স্বাদেশিকতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, বিদেশী সঙ্গীতের হার্মনি ও উচ্চারণ এবং আধুনিক বিদেশী চিত্র ও কবিতার আঙ্গিক প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। প্রত্যেক বিষয়েই রবীন্দ্র-সৃষ্টি গ্রহণ ও বর্জনের ফলে প্রাকৃতিক সঙ্গতি লাভ করে নব সমন্বয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। এককালীন গ্রহণ-বর্জনের জন্যই সেটি একত্রে স্বদেশী ও বিশ্বজনীন, একত্রে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, একত্রে ভারতীয় ও বিদেশী, সনাতন ও পরীক্ষাশীল, অর্থাৎ আধুনিক।

অনেকেই ৭ই অগস্টের পর থেকে শোকপ্রকাশের সম্পর্কে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিরাটত্ব উল্লেখ করেছেন। বিরাট তো বটেই, কিন্তু সুসম্বদ্ধ। কোথা থেকে, কেমনভাবে অতগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ একটি প্রধান ছকে, অতি সহজে, সুন্দর-ভাবে বিন্যস্ত এবং বিন্যস্ত হবার পর নতুন ও ব্যাপক সমন্বয়ে সজ্জিত হচ্ছে, বিশ্লেষণ করবার সময় দৈব-প্রেরণায় আস্থাবান হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আপাতত অন্য ব্যাখ্যাতেই চলে। জীবধর্মের মর্মই হল বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে, ঘাত-প্রতিঘাতের সাহায্যে ঐক্য-সাধনা। রবীন্দ্র-সৃষ্টির প্রত্যেক নতুন অধ্যায়ের পূর্বেকার ইতিহাস হলো এই— যেই একটি রূপ ছাঁচ হয়ে উঠছে, অমনই আদিম জীবন-শক্তির ভাঁড়ার থেকে নতুন রূপের প্রেরণা আসছে। অনবরত জীবনের কাছ থেকে শক্তি আহরণই হল রবীন্দ্র-সৃষ্টি-পদ্ধতির মৌলিক বন্ধন। রবীন্দ্রনাথের ভাঁড়ার ছিল দু'টি: সামাজিক ক্ষেত্রে জনগণ, অর্থাৎ, গ্রামের জনগণের জীবনধারা; ও

আদর্শের ক্ষেত্রে সনাতন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ধর্মের পূর্বেকার সরল ঔপনিষদিক শান্তি, শিব ও অদ্বৈত প্রত্যয়ে ও অজেয় আত্মায় প্রগাঢ় বিশ্বাস। দু'টি নিদর্শন যথেষ্ট হবে। (১) সমাজের আড়ষ্টতা ভাঙবার, সঙ্গীতে মুক্তিলাভের উপায়, গ্রাম্য জীবনের উদ্ধারে এবং বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তনের আশীর্বাদে। (২) কবিতার অভিব্যক্তির এক যুগে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', দ্বিতীয় যুগে 'এবার ফিরাও মোরে' ও তৃতীয় যুগে 'বলাকা'র গতিরাগ। চরম সংক্রান্তি সাধিত হলো বের্গসঁর জীবন-শক্তিকে উপনিষদের সাহায্যে creative unity-তে পরিণত করে। জীবধর্মকে মনন এইভাবেই প্রয়োগ করে।

জীবতত্ত্বে বলে যে, জাতির ইতিহাস ব্যক্তিবিশেষের বিবর্তনেই পাওয়া যায়। সব ক্ষেত্রে সত্য না হলেও জগতের মহান কীর্তিতে ঐ তথ্যের প্রমাণ আছে। অবশ্য মানসিক অভিব্যক্তিতে সময় সংক্ষিপ্ত হবেই। কিন্তু যে সৃষ্টি অর্ধ শতাব্দী জুড়ে রইল, তার ক্রম এত দ্রুত নয় যে আমাদের চোখে ধরা পড়বে না। রবীন্দ্র-সৃষ্টির বৃহৎ অধিশ্রয়ণে অন্তত ভারতবর্ষের মানসিক গতির সন্নিপাত হয়েছে। কবিতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; সংস্কৃত, বাংলা সকল ছন্দই এখানে রয়েছে, তা ছাড়া বিস্তর নতুন ছন্দেরও সাক্ষাৎ পাচ্ছি। রাজনীতিতে ইংরেজ জাতির উদার মতে বিশ্বাস থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া, প্রত্যেক অধ্যায়টি রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক রচনায় বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকে আধুনিক কালের প্রিমিটিভ বলা হয়। এক হিসাবে মন্তব্যটি খুব সারবান। যখন বস্তুর অনুকরণে বিদেশী আর্টিস্ট দিশে হারালো, তখনই তারা ছুটল আফ্রিকায়, টাহিটিতে, গুহায়, মধ্য এশিয়ায়, ভারতবর্ষে, চীনদেশে, জাপানে। এই সন্ধান আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরে ও-দেশে চলছে। রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে এই সন্ধান দশ বৎসরের সীমায় আবদ্ধ। 'খাপছাড়া' ও 'চিত্রলিপি'র চিত্রে আধুনিক সমগ্র য়ুরোপীয় চিত্র-প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত, ঘনীকৃত হয়েছে। চোখ মেলে দেখলে উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তবিকতা নাক, মুখ, চোখ ও দৃশ্যপটে পাওয়া যাবে। অথচ চিত্রগুলি যেন প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীর কল্পনা। মনোবৈজ্ঞানিক তাদের বলবেন অবচেতনার বুদ্‌বুদ। একই কথা প্রায়, আজকালের অবচেতনাতেই আদিমতা আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু নাম-করণটাই প্রধান নয়। ভুললে চলবে না যে, নতুন সৃষ্টির শক্তি বাইরেকার চৈতন্যের নিচু তলাতেই জমা হয়ে যায় এবং বিপ্লবের সময় সেখানেও হাত পাততে হয়। অন্তরের ও বাইরের লেন-দেনে জাতির বিবর্তন ব্যক্তিবিশেষের ক্রমবিকাশে পরিস্ফুট হওয়ায়ই প্রাকৃতিক জীবনের একটি বড় রীতি।

পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিপক্ষে দু'টি আপত্তি উঠতে পারে। কেউ বলতে পারেন যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সৃষ্টি একপ্রকার জৈব-ঘটনা। কিন্তু এটা বিশ্বাস্য নয়।

সাধারণত যেসব রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তাদের পটভূমি এতই ছোট ও তাতে শক্তির চিহ্ন এতই কম যে, তাদের উৎপত্তি জীবনের একাংশ থেকেই মনে হয়। সভ্যতার ইতিহাসে এমন দশ জনও আছেন কি না জানি না, যাঁদের রচনায় প্রাকৃতিক সম্পূর্ণতার রাজটিকা আছে। দ্বিতীয় আপত্তিটাই আলোচ্য। অনেকের ধারণা হতে পারে যে, আমি এতক্ষণ উপমারই বিস্তার করছি, প্রকৃত-পক্ষে মানসিক সৃষ্টি জীব-জগতের অভিব্যক্তির ধার ধারে না, দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে সম্বন্ধ উপমিতির, জোর সাদৃশ্যের। আমার উত্তর এই: মননশীলতার নিদর্শন নির্বাচনে এবং যদি রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে সজ্ঞানে গ্রহণ ও পরিত্যাগের সন্ধান পেয়ে থাকি তা হলেই যথেষ্ট। (ইতিপূর্বে, আমার প্রাথমিক ধারণার বিবৃতির পরই আমি 'প্রায়' কথাটি ব্যবহার করেছি।) এই মনস্বিতা বিশাল, সূক্ষ্ম ও পরিব্যাপ্ত, প্রাকৃতিক ঘটনার উদ্‌ঘাটনেরই উপযোগী। আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় একাধিক লোকের পক্ষে সম্ভব, সেটা অসাধারণ প্রক্রিয়া নয়, মাত্র সজাগ মনের কর্ম। রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে যা বর্তমান, সেটা অত্যন্ত গভীর ও নিতান্ত প্রাথমিক।

ধরা যাক মৃত্যু-কল্পনাকেই। এই যুগের মানুষের চোখের সামনে যা ঘটছে তাকে মৃত্যুলীলা বলা যায়। যুদ্ধবিগ্রহের কথা ছেড়ে দিলেও আমরা দেখি যে, সমগ্র য়ুরোপীয় সংস্কৃতিতে মৃত্যু-ইচ্ছা মূর্তিমান। এই যে য়ুরোপীয়ান সাহিত্যে প্যাশানের চর্চা, এই যে সমাজের বুকে বিনাশের ভীত কম্পন, যাকে ভুলতে, জয় করতে এত প্রচেষ্টা, অনুষ্ঠানে, নাটকে, সঙ্গীতে, এই যে হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রলাপ— এ সমস্তই মৃত্যু সম্বন্ধে একটি বিশেষ য়ুরোপীয় প্রত্যয় থেকে উঠেছে। প্রত্যয় অবশ্য সর্বত্র স্পষ্ট নয়, পুরুষকার ও দম্ভের দ্বারা অনেক সময় আবৃত। কিন্তু য়ুরোপীয়ান সাহিত্যে, চিত্রে ও সঙ্গীতের প্রাণবস্তু যদি 'প্যাশান' হয়, যদি সেই সভ্যতার মর্ম হয় প্যাশানের মতো বাঁচা, তবে রবীন্দ্র-সৃষ্টির মতন য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণ পরিণতির সমকালীন ও তথাকথিত প্রভাবান্বিত সৃষ্টির অন্তরে যে প্রত্যয় পাব, সেটা ঐ মৃত্যু-ইচ্ছার সমগোত্রেরই হবে। যদি অবশ্য, নির্বাচন-শক্তিবিহীন প্রাকৃতিক ঘটনাতেই সেই সৃষ্টি আবদ্ধ থাকে। কিন্তু তা থাকছে না। আমরা দেখেছি, রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের বালি'র পর প্রেম আর প্যাশান এক বস্তু নয়, সেখানে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ অন্ধ নিয়তির ক্রীড়নক নয়, যাকে **sense of doom** বলা চলে, যেমন ইসোল্ট-ট্রিস্টামে, আনা ক্যারেনিনা-ভ্রন্‌সকিতে, আবেলার্ড-হেলয়তে, সেটি অবর্তমান। তার পরিবর্তে আছে মুক্তির আস্বাদ ও প্রেরণা। ঠিক এই জন্যই আবার মৃত্যু সম্বন্ধে কবিতায় মৃত্যুকে মধুর, অসত্য, শান্তি ও মঙ্গলের দ্বার বলা হয়েছে। মাত্র একটি কবিতায় মৃত্যুকে য়ুরোপীয়ভাবে কল্পিত হতে দেখি। কিন্তু ইদানীংকার ও শেষ কবিতার

মৃত্যু কি ইয়েট্সের মৃত্যু? কিছুতেই নয়। 'মহুয়া'র প্রেম কি পেত্রার্কের? মোটেই নয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীত কি হ্বাগনারের সমপর্যায়ে? নিশ্চয়ই নয়। রবীন্দ্র-প্রত্যয় ভারতীয়, একান্তভাবে স্বদেশী, উপনিষদের। প্রেমকে বেদনা না ভেবে সম্পূর্ণতা ও মুক্তির উপায় ভাবা এই দেশেরই ভাবনা। শেলী, কীট্স, বাইরন প্রভৃতির প্রভাব কাটিয়ে আত্ম-প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠা, ধ্বংসলীলায় অবসানে জীবনের, মঙ্গলের, সত্যের অধিষ্ঠান শুভবাদীর স্বপ্ন নয়, রোম্যান্টিসিজম্ নয়, নির্বাচনের নিদর্শন, এবং তার পর, স্বধর্মের ভূমিকায় প্রত্যাবর্তন, জীবনের প্রগতিরই সমর্থন।

এই প্রবন্ধে যা লিখলাম সেটি রবীন্দ্র-সৃষ্টির আলোচনা সম্পর্কে আমার প্রাথমিক ধারণা। আমার বিশ্বাস এটি দৃষ্টিভঙ্গির চেয়েও আরো কিছু।

১৩৪৮

রবীন্দ্র-সমালোচনার পদ্ধতি

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'পূর্বাশা'য় শ্রীশৈলেন ঘোষ 'প্রকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি থেকে একটি মূল্যবান অংশ উদ্ধৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী— অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে— আমি সমগ্রকেই মানি।....এই যে বিচিত্ররূপী সমগ্র, এর সঙ্গে ব্যবহার রক্ষা করতে হলে একটি ছন্দ রেখে চলতে হয়,— যদি তাল কেটে যায় তবেই সমগ্রকে আঘাত করি এবং তার থেকে দুঃখ পাই। বস্তুত যখন কিছুতে উত্তেজনার উগ্রতা আনে তার থেকে এই বুঝি, ছন্দ রাখতে পারলুম না,— তাই সমগ্রর সঙ্গে সহজ যোগসূত্রে জটা পড়ে গেল। তখন নিজেকে স্তব্ধ করে জটা খোলবার সময় আসে।" শৈলেনবাবুর মতে এই হলো রবীন্দ্রনাথের সাধনার ইতিহাস। আমারও মত তাই এবং ইতিপূর্বে অন্যত্র সেই মত ব্যক্ত করেছি। অবশ্য সর্বাস্তিবাদের অর্থ আমার কাছে অন্য।

সমগ্রতার সাধনাই যদি রবীন্দ্রনাথের সাধনা হয়, তবে তাঁকে বোঝবার ও বোঝাবার, অর্থাৎ রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা ঐ সমগ্র-সাধনার উপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। নচেৎ আমরা রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভায় দিশাহারা হয়ে যাব এবং তাঁর সৃষ্টির তাৎপর্য গল্প, নভেল, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, স্বদেশপ্রেম, সঙ্গীত, শিক্ষা ও অন্যান্য কর্মপ্রবৃত্তির তালিকায় পরিণত হবে— যা এতদিন ধরে হয়ে আসছে ও আজও হচ্ছে। সমগ্র হিসাবে তাঁর বিস্তারিত সমালোচনা এখনও হয়নি, কিংবা হলেও আমার নজরে পড়েনি। প্রথমেই তার কারণ খুঁজতে হবে।

সর্বপ্রধান কারণ আমার মতে রবীন্দ্রনাথ নিজে। অজস্র জায়গায় তিনি বিপরীত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। কখনও লিখছেন তিনি প্রথমত কবি, কখনও প্রথমত সঙ্গীত-রচয়িতা; কখনও ইঙ্গিত করছেন তিনি প্রথমে বাঙালি, ভারতবাসী, এশিয়ান, আবার কখনও বিশ্বজনীন; কখনও আভাস দিচ্ছেন তিনি প্রথমে ভবিষ্যতের, কখনও বর্তমানের, অতীতের। এমন কী এও লিখেছেন যে আর্টিস্ট একাকী, আবার বলেছেন, যেমন ঐ চিঠিতে, তাঁর মতো আর্টিস্টের সাধনা সমগ্রকে, অর্থাৎ অন্তত সমাজকে নিয়ে।* বস্তুত, তাঁর পক্ষে মতামতগুলো স্বতঃবিরোধী নয়। মহৎ ক্ষুদ্র বৈপরীত্যের অতিরিক্ত, তাকে অগ্রাহ্য করে নয়, তাকে গ্রহণ করেই। একে কবির খামখেয়ালও বলা চলে না, যদিও তিনি

* একই দিনে, টাউন হলে এবং সেনেট-হাউসে, এই বিষয় তিনি দু'টি ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। দু'টি সভাতেই আমি উপস্থিত ছিলাম।

খেয়ালি ছিলেন, এবং অনেক সময় শ্রোতা ও পাঠকের চাহিদা অনুসারে সমগ্রর পরিবর্তে মতামতের কোনো বিশেষ অংশ বা দিক তাকে দেখাতে হতো। একটু উঁচু স্তর থেকে দেখলে মনে হয় যে প্রত্যেককে, বিশেষকে, অতটা শ্রদ্ধার ফলই তাই। এ তো গেল তাঁর ব্যক্তিগত দিক।

সমালোচনার দিক থেকে বিপদ ভয়ংকর। অন্ধের হস্তীবর্ণনা সমালোচনার কাম্য নয়। অর্থাৎ, দ্বিতীয় কারণ সমালোচকের অক্ষমতা। কে অস্বীকার করবে যে রবীন্দ্রনাথ বিশাল মানুষ? প্রতিভা যে সাধারণ গুণ নয় সকলেই মানতে বাধ্য। জীবতত্ত্বেরও তাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শেক্সপীয়র, দান্তে, গ্যেটে প্রভৃতির সমালোচনার ধারা বন্ধ হয়নি। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ অ-সাধারণকে হৃদয়ঙ্গম করতে সর্বদাই চেষ্টা করেছে। তারা, নক্ষত্র, বিশ্ব, পৃথিবী, সমুদ্র, পর্বত, জোয়ার-ভাটা, অণু-পরমাণুর প্রকৃতি কিছু কোনো প্রতিভার প্রকৃতির চেয়ে কম মহান, কম জটিল নয়; তবু বৈজ্ঞানিক তাঁর কাজ থামিয়ে দেননি। প্রকৃতির বিশালতায় তিনি হয়তো হতভম্ব হয়ে গেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানের অন্বেষণের বিরাম হয়েছে কি? খোঁজের মধ্যে যে দম্ভ আছে সেটি দোষের নয়, বরঞ্চ সেইটাই মানবতার একটি প্রধান লক্ষণ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনায় যে বিনয় ধরা পড়ে সেটি মানবতায় অবিশ্বাস, একপ্রকার কাপুরুষতা। তারই ফলে খণ্ডবোধ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা-সমালোচনায় তাঁর সমাজবোধের উল্লেখ থাকবে না, তাঁর ছন্দ-বিশ্লেষণে তাঁর সঙ্গীতবোধের, সুরজ্ঞানের কথা আনলেই সেটা অ-সাহিত্যিক বিচার হবে; তাঁর রাষ্ট্রকল্পনায়, নাটক, গল্প, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে, নভেলে, কথা-বার্তায় তাঁর কবিত্ব, বাঙালিত্ব, ভারতবাসীত্ব নির্বাসিত করতেই হবে, নচেৎ 'বিশুদ্ধ' সমালোচনা হবে না; এমন-কী তাঁর গোষ্ঠীর পারম্পর্য দেখানোও অ-বিচার, অসভ্যতা। ব্যক্তিগত জীবনের উল্লেখ তো দূরের কথা— এই ধরনের বারণ খণ্ডদৃষ্টির পরিচায়ক। বারণ না মানা ঠিক স্পর্ধার লক্ষণ নয়, কারণ মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয় তবে এও স্বীকার করতে হবে যে, সমগ্র-বোধ (গেস্টাল্ট) চেতনারই প্রকৃতি, সে-বোধ সব জীবজন্তুর, আদিম মানবের, শিশুর পর্যন্ত আছে, অতএব বাঙালি সমালোচকেরও আছে।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের দু' তিনটি প্রবন্ধে অবশ্য আমি সমগ্রবোধের চেষ্টা লক্ষ করেছি। তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনটাকেই আর্ট বলেছেন। এটাও কিন্তু ঠিক নয়, সমগ্রদৃষ্টি নয়, কারণ এর পিছনে জীবন, জীবনীশক্তি, কিংবা ঐ ধরনের একটা কিছু গুহ্য ঐক্যের প্রত্যয় আছে। এখানেও অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বহু ব্যবহারে, বহু রচনায় তার সমর্থন মিলবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বকে এখানেও ছাড়া চাই। বিশাল সমগ্রবোধ রবীন্দ্রনাথের অর্জিত ধন, শৈলেনবাবুর উদ্ধৃত চিঠিতে তার

প্রমাণ রয়েছে, এ বোধ তাঁর পূর্বে ছিল না, অতএব, একে পিছনের কোনো মৌলিক ধাক্কা ভাববার প্রয়োজন নেই। জীবন-বোধ প্রত্যয়টি য়ুরোপীয় দর্শনের **genetic fallacy of original substance,** কিংবা অধ্যাপক রাইল সাহেবের ভাষায় **"ghost in the machine", "mistake of category"** বলা চলে।

পূর্বোক্ত দু'টি কারণ ছাড়া আরো অনেক কারণ আছে যেজন্য রবীন্দ্রনাথের সত্য সমালোচনা এখনও হচ্ছে না। তাদের উল্লেখ এখানে করবো না। আমার বর্তমান উদ্দেশ্য একটু পৃথক। যদি সমগ্রবোধ তাঁর সাধনার মর্মকথা হয়— আমার মতে সেটি গুহ্য নয়, নিতান্ত স্পষ্ট— তবে সমগ্রভাবে, অর্থাৎ চোখ খুলে, তাঁকে বুঝতে হবে। এই বোঝবার অর্থ কি? অর্থ এই যে তার রীতিনীতি ভিন্ন। খণ্ডদৃষ্টি আর সম্পূর্ণ দৃষ্টির জাতি পৃথক। অনেকের ধারণা বুদ্ধির ধর্মই খণ্ড করে দেখা, অতএব বুদ্ধি ও যুক্তিসম্মত বিচার খণ্ডদৃষ্টির জাতি নির্ণয় করে এবং অনুভূতি ভিন্ন যখন সমগ্রবোধ অসম্ভব, তখন সমগ্রদৃষ্টি অনুভূতির ধর্মানুসারে চলবে। এক হিসাবে এই ধারণা সত্য। কিন্তু তার পরিণতি হলো নীরবতা, কারণ অব্যক্তের সমস্তরের উপযোগী কোনো বর্ণনা নেই, সমালোচনাও নেই। সেজন্য অব্যক্ত থেকে নামতেই হবে। ফলে সমগ্র অনুভূতির প্রত্যক্ষ তীব্রতায় কিছু হ্রাস হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু এখানেই পাওয়া যাবে মজা, রস, পুনর্মিলনের প্রয়াসের আকুতি, সাধনা, সাহিত্য, কলা, প্রেমের প্রাণবস্তু। ব্রহ্মময় জগৎ বাদ দিলে বাকি প্রাণময়, মনোময়, বাঙ্ময়, জগতের সৃষ্টিতত্ত্বই হলো এই সামান্য দূরত্ববোধ, ঐটুকু হ্রাস, ঐ দ্বিত্ব, অর্থাৎ সমগ্রবোধের স্মৃতি। রস-সমালোচনায় জাগ্রত স্মৃতির প্রয়োজন, কারণ তাকে ভাষায় রূপায়িত করতে হবে, নচেৎ সমালোচককে বলতে হবে, 'পড়ে দেখ', যেমন সাধুরা শিষ্যদের বলেন 'ক'রে দেখ'। অতএব উপলব্ধির স্মৃতিময় বুদ্ধিসম্মত বিচারকে অনুভূতি থেকে পৃথক না রেখে উপায় নেই। আমি অনুভূতি-ক্রিয়া অস্বীকার করছি না। তার প্রয়োজনও একান্ত। যে-পাঠকের মনে কোনো-কোনো মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতার নক্সা স্থিরভাবে প্রতীয়মান হয়নি, তার পক্ষে রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। আমার বক্তব্য মাত্র এইটুকুই: উপলব্ধির পর তার স্মৃতি বজায় রেখে যে বুদ্ধিসম্মত সাহিত্য-সমালোচনা সম্ভব তার রীতিনীতি খণ্ডবোধের সমষ্টিগত সমালোচনার রীতিনীতি থেকে ভিন্ন, খণ্ড সমালোচনার রীতিনীতি থেকে তো বটেই। আধুনিক ন্যায়শাস্ত্রের কূটতর্ক তুলতে চাই না। কেবল এই বললেই বোধ হয় চলবে যে, রসজ্ঞান একপ্রকার **empirical knowledge,** এবং **empirical knowledge**-এর প্রস্তাব, **proposition** সত্য-মিথ্যা কাঠামোর ভেতরে ঠিক পড়ে না। সত্য-মিথ্যার কষ্টিপাথর অনুভূতি,

এবং সমালোচনার অর্থ analysis of meaning, অর্থ-বিশ্লেষণ, causation নয়। সমগ্রের সঙ্গে যোগ ব্যতিরেকে যখন অর্থ অসম্পূর্ণ, তখন রস-সমালোচনার কাজই হলো ঐ যোগের প্রক্রিয়া বোঝা ও বোঝানো।

এখানে গোটাকয়েক দৃষ্টান্ত দিলে ঐ প্রক্রিয়া ব্যাপারটা বোধগম্য হবে।

(১) প্রথমে ধরা যাক কবিতা। মোটামুটি দুইভাবে রবীন্দ্র-কবিতার বিচার হয়েছে। (ক) সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে; অর্থাৎ, ছন্দবিন্যাস, শব্দচয়ন, বাক্য-সঙ্গতি এবং ভাবার্থ ইত্যাদি। প্রতিরূপ, ধ্বনিসম্পাত, গঠন, ছক ও বুনানির দিক থেকে যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি, তবু এগুলো সাহিত্যিক বিচারের অন্তর্গত। প্রতিরূপ, প্রতীকের আলোচনা যথার্থভাবে না হলে সেগুলো সাহিত্যিক বিচার থেকে বেরিয়ে আসে। (খ) সাহিত্যের বহির্ভূত যে-কোনো স্থান থেকে। একে অ-সাহিত্যিক আলোচনা বলা হয়। সেটা হয়তো পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ 'অ'-এর অর্থ যথাযত বিপরীত নয় সর্বক্ষেত্রে, যেমন অ-সহযোগ, অ-জ্ঞান, অ-স্বাভাবিক-এর অর্থ অন্যক্ষেত্রে সহযোগ, আংশিক জ্ঞান ও ভিন্ন স্বভাব হওয়াও সম্ভব। তা ছাড়া অ-সাহিত্যিক সমালোচনার উদ্দেশ্য সাহিত্যসৃষ্টি-পদ্ধতির গুপ্ত কারণ (motive meaning) অভিব্যক্ত করা। আজকাল সামাজিক বিচারের চলন বেশি। এর খুবই দরকার ছিল ও এখনও আছে। আর একপ্রকার অ-সাহিত্যিক সমালোচনা দার্শনিক, যথা রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর উপনিষদ, সাধুসন্ত, বৈষ্ণব ধর্মের সারতত্ত্বের প্রভাব কিংবা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকল্পনা। পূর্বোক্ত দুই প্রকার অ-সাহিত্যিক বিচারধারা কখনও কখনও মিশে যায়, যেমন রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়ত্ব-আলোচনায়।

এখন সাহিত্যিক ও অ-সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণের দোষগুণের খবর আমরা সকলেই জানি, কেবল ব্যবহারে মনে রাখতে পারি না। বিশুদ্ধ কবিতা (pure poetry) যেমন সুরের স্পর্শে অশুদ্ধ, বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সমালোচনাও তাই। যদি রবীন্দ্রনাথের স্বরবিন্যাস-রীতি, সুর, অর্থাৎ— স্বর, ধ্বনি, তাল, মান, লয় সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকে, তবে রবীন্দ্র-কবিতার 'বিশুদ্ধ' সাহিত্য-সমালোচনা অ-সার্থক হয় এবং তাই হয়েওছে। তেমনই সামাজিক বিচার-পদ্ধতিও পুরোপুরি সাহিত্যরসের সন্ধান দিতে পারছে না। তার প্রধান কারণ আগেই বলেছি। অর্থাৎ genetic fallacy। কার্যকারণ-পরম্পরার উদ্ঘাটন (causation) বিশ্লেষণ (analysis of meaning) থেকে পৃথক সংজ্ঞার, বিশেষত সাহিত্য, সাহিত্য-সমালোচনার মতন ব্যবহারিক (empirical) জ্ঞানে। দ্বিতীয় কারণ sociology of knowledge-এ নিহিত রয়েছে। মার্কসীয় এবং তৎপরবর্তী শেলার, ম্যানহাইম প্রবর্তিত sociology of knowledge-এর বিচারস্থান অন্যত্র। এখানে

কেবল এইটুকু বলা চলে যে, যদিও সামাজিক অভিব্যক্তির সঙ্গে সাহিত্যিক অভিব্যক্তির একটা মোটামুটি সমান্তরালতা, এমন কী পারস্পরিক সম্বন্ধ (correlation) লক্ষিত হয়, তবু তার সাহায্যে সাহিত্যিকের প্রত্যেক, বিশেষ রূপসৃষ্টির ব্যাখ্যা অসম্ভব। কারণ স্পষ্ট : সাহিত্যের একটা নিজস্ব ধারা, গতি তৈরি হয়ে যায়, যার বেগফল সামাজিক কার্যক্রম থেকে কক্ষচ্যুত হওয়া স্বাভাবিক। ম্যল্রো যে-কথা বলেছেন সেটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না : চিত্রকর সাধারণত চিত্র থেকেই প্রেরণা সঞ্চয় করেন। অন্ততপক্ষে এটুকু মানতেই হবে যে, সাহিত্যিকের প্রত্যক্ষ (immediate, primary নয়) জ্ঞান সাহিত্য থেকে এবং পরে সমাজ-জীবন থেকে আহৃত হয়; আরো পরে অবশ্য পরম্পরা বদলে যায়, উল্টে যায় যেমন বিপ্লবের মুখে। এই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার priority সামাজিক ব্যাখ্যার priority থেকে ভিন্ন, এমন কী কখনও কখনও বিপরীত।

অতএব সমালোচকের কর্তব্য কি ? দেখতে পাচ্ছি দুই দৃষ্টিভঙ্গিরই সীমা আছে। কেবল তাই নয়, বিচারের সততা রাখতে হলে সীমা লঙ্ঘন করতেই হয়। এটা সমালোচকদের ত্রুটি নয়, মানুষেরই স্বভাব, মানবচেতনারই প্রকৃতি; অতএব লজ্জার কারণ নেই। লঙ্ঘনবৃত্তিকেই কাজে লাগাতে হবে। অর্থাৎ, কেবল কবিতার সাহিত্যিক বিচারে চলবে না, যেখানে কবিতা সঙ্গীতের কোলে মূর্চ্ছিত হচ্ছে তার সন্ধান দিতে হবে; কেবল সামাজিক বিচারও অসম্পূর্ণ, যেখানে সমাজ কবিকে, ঐতিহ্য কবিতা রূপ ও বিষয়কে মুক্ত হবার সুবিধা দিচ্ছে তার ঠিকানাও জানা চাই। এইভাবে দেখলে খণ্ডবোধের দোষ বিনষ্ট হয় এবং সমগ্রবোধের আভাস ফিরে আসে, অথবা জন্মায়।

(২) দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত সঙ্গীত। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে কথা, সুর ও ভাবসমন্বয়ের যৎসামান্য বিচার হয়েছে। কিন্তু কবিতার ওপরই বেশি জোর পড়েছে। আমার বিশ্বাস এই ধরনের বিচারই অসম্পূর্ণ; কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরবিন্যাসে যে প্রতিরূপ (image) ও প্রতীক (symbol) সৃষ্টি করে তার সঙ্গে সেই সঙ্গীতের কথাকৃত ও ছন্দকৃত প্রতিরূপ ও প্রতীকের সন্ধান দেখানো হয়নি, দু'য়ের মধ্যেকার যোগ স্থাপিত হয়নি। কেবল তাই নয়, রবীন্দ্রচিত্রের চিত্রগত প্রতিরূপ ও প্রতীক বাইরে পড়ে রয়েছে। অথচ কথা, ছন্দ, ভাব ও ধ্বনিগত রূপ ও প্রতীকের সঙ্গে সুরগত প্রতিরূপ ও প্রতীকের সম্বন্ধ নিগূঢ় এবং সেগুলো চিত্রগত প্রতিরূপ ও প্রতীকের অঙ্গাঙ্গী। কবিতায় মৃত্যুকল্পনা, চিত্রে সাদাকালো অর্ধ উন্মুক্ত রহস্যময়ী মূর্তি এবং জীবনের শেষ দিকের বহু সঙ্গীতের সুরবিন্যাসের (যথা, পূরবী) সাহায্যে সৃষ্ট প্রতিরূপ,— এইসব একই অখণ্ডিত সমগ্র পরিকল্পনার রূপান্তর। এই তথ্যটি মূল ; তার ব্যাখ্যায় যদি

উপনিষদের তত্ত্ব আসে আসুক, যদি তাঁর সুরজ্ঞানের আলোচনা আসে আসুক, যদি চিত্রসাধনার ইতিহাস আসে তো আসুক— এবং প্রত্যেকটিই আসবে— কিন্তু কোনোটাকেই মূলতত্ত্ব বলবো না; কারণ পূর্বে লিখেছি, আবার লিখছি— তাতে সমগ্রতার বিশ্লেষণ কিংবা বিচার হবে না, একটির সঙ্গে অন্যটির কার্যকারণ-পরম্পরাই দেখানো হবে।

(৩) নাটকের সমগ্র নকৃসা নিতান্ত সুস্পষ্ট। ধরা যাক চিত্রাঙ্গদা— এটি নাটক, কিন্তু নাট্য-কাব্য; তার কবিতা লিরিক্যাল, অর্থাৎ ড্রাইডেনের নয়, এলিয়টের নয়; লিরিক কবিতা সুরধর্মী; সুরের সঙ্গে প্রচলিত চরিত্রধর্মী নাটকের একটু বিরোধ আছে; সেই বিরোধের হ্রাস হয় ভাবজগতে, যেখানে বিরোধের তীব্রতা নির্ভর করে ভাব-ঐতিহ্যের দৃঢ়তার উপর, যেমন স্ত্রীত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় ঐতিহ্য, বীরত্ব, ত্যাগসংক্রান্ত ভারতীয় ধারণা— এই দু'টির ঘাতপ্রতিঘাতে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের নাটকীয় অভিব্যক্তি; অন্য দিকে লিরিক কবিতার সুর; ভারতীয় সুরের মেলডি যতটা লিরিক কবিতার অনুকূল ঠিক ততটাই প্রচলিত নাট্যধর্মের প্রতিকূল; ইতিমধ্যে নাট্যধর্ম ভাবজগতে পৌঁছে পরিবর্তিত হয়েছে; তবুও অসামঞ্জস্য থেকে যায়; তার অবসান চাই; এখন এল রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা; সে কথা, বাংলা ভাষার জন্য, ও রবীন্দ্রনাথের কথা বলে, একটি বিশেষ ধরনের, তার একটি অংশ চিত্রপ্রধান, আর একটি 'গল্প', ও আর একটি সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে, অন্তত চেষ্টা করে। চিত্রাংশের যোগ সাজসজ্জায়, আলোক-সম্পাতে দৃশ্যপটের রঙবাহারে; গল্পাংশের যোগ অভিনয়ে; আর সুরাংশের হলো তালে ও কথায়। যোগসূত্রে বাধা পড়ে যেখানে সেখানেই 'নাটকীয়' মুহূর্ত; গাছপালার nodes, antinodes-এর মতন। যদি জট পাকিয়ে যায় তবেই মুশকিল। জট খোলবার আঙ্গিকও আছে, কিন্তু সেজন্য চাই নীরবতা, শৈলেন ঘোষের উদ্ধৃত চিঠিতে তার উল্লেখ আছে: "তাই সমগ্রর সঙ্গে সহজ যোগসূত্রে জটা পড়ে গেল। তখন নিজেকে স্তব্ধ করে জটা খোলবার সময় আসে।" চিত্রাঙ্গদার অভিনয়ে এমনই কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত আছে যেখানে কথা নেই, সুর নেই, তাল নেই। এই স্তব্ধতায় রবীন্দ্র-কবিতা ভরা। শান্তিময় 'বলাকা'র আরম্ভ স্তব্ধতা-ভঙ্গে, কিন্তু সমগ্র কবিতাটি স্তব্ধতায় পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের আত্মিক সাধনায় ভোরবেলাকার ধ্যানের কথা কে না জানে! ঐ সময় সমগ্র থেকে বিচ্যুতির ফলে যেসব জট সারাদিন জমতো সেগুলি তিনি খুলতেন।

আমার বক্তব্য ঠিক পরিষ্কার হলো কি না জানি না। অনেক পাঠকই বলবেন হয়নি। কিছুটা আমার দোষ নিশ্চয়ই; কিন্তু সমগ্রবোধটাও বুদ্ধির দিক থেকে ঠিক সহজ নয়, যদিও শিশু, আদিম মানবের পক্ষে নিতান্ত সহজ। শুনেছি

সাধুসজ্জনের দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ। পড়েছি আইনস্টাইনও শিশুসুলভ সমগ্রদৃষ্টি-ভঙ্গিতে বিশ্বকে দেখেন। রবীন্দ্রনাথ তো নিজেই সহজ বোধের কথা লিখেছেন; এবং এইজন্যেই অধ্যাপকীয় সমালোচনার উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। সে যাই হোক, আর তিনটি সাবধানতাসূচক মন্তব্যের সাহায্যে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। (১) সমগ্রতাবোধ খণ্ডতাবোধের পাটিগণিতের যোগবিয়োগ নয়, যদিও তাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে খণ্ডের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু তখন যদি মনে থাকে যে খণ্ড পূর্ণের অংশ, তবে গোলমাল হয় না। (২) সমগ্রবোধের পর অংশবিচার যুক্তির অবরোহী প্রথা নয়; সমগ্রতা অংশের মধ্যে ওতপ্রোত, পরিব্যাপ্ত, বোরন্‌সনের ভাষায় যেমন tactile quality। পটুয়া যেমন মাটি, তেল ও তুলি দিয়ে দেবীর দেবীত্ব প্রতি লেপে ফুটিয়ে তোলে, তেমনই সমগ্রবোধও অংশকে সর্বদাই প্রবুদ্ধ করতে থাকে। (৩) সমগ্রবোধ চেতনার স্বভাব, অতএব সব সৃষ্টিরই স্বভাব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বিশাল তাঁর ছকের সূত্রও বহু, সম্বন্ধও বিবিধ এবং অংশকে অনুগত করাতে তাঁর বেশি কৃতিত্ব। এ ছাড়া প্রতিভার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু থাকলেও এক্ষেত্রে আপাতত অবান্তর, এবং সেই অজুহাতে রবীন্দ্র-সমালোচনাকে কৃতিত্বের তালিকায় পরিণত করা নিরর্থক।

১৩৫৭

রবীন্দ্রনাথের চিত্র

পঁচিশে বৈশাখ। প্রাতঃস্নানের পর রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে গোটা কয়েক কবিতা ও একটি প্রবন্ধ পড়লাম। মন-প্রাণ-বুদ্ধি তাজা হয়ে উঠল। দৈনিক পত্রিকায় দেখলাম, সরকার আজ ছুটি দিয়েছেন এবং বহু অনুষ্ঠানে কবির জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব হবে। খবর ভালো, কারণ রবীন্দ্রনাথ ছুটি ও উৎসবে, দু'টিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেন না বুঝে মনে যতটা ক্ষোভ জমেছিল, তার খানিকটা কমলো আমাদের প্রান্তিয় সরকারের ঔচিত্য-বোধে। কিন্তু শহর ও বাংলা দেশব্যাপী উৎসবের খবরে মনটা বেশিক্ষণ উৎফুল্ল রইল না। পুরাতন অভিজ্ঞতা বিভীষিকাময়। আবৃত্তির উচ্চারণ, গানের বেসুর, নৃত্যের বেতাল, উদ্যোক্তাদের গণ্ডগোল, বক্তৃতার অবান্তরতা ও সর্বোপরি প্রত্যেক অনুষ্ঠানের রাজকীয় মতের কাঠামোয় রবীন্দ্রনাথকে পুরে দেওয়ার প্রাণপণ প্রয়াসের স্মৃতি কিছু পিপাসিত চিত্তের পানীয় নয়। তবু ছুটি, তবু উৎসব, তবু চারুকলার সংস্পর্শ, তবু রবীন্দ্রনাথের নাম, গান, কবিতা। কোনো অনুষ্ঠানে কি তাঁর ছবি দেখানো হবে? সেখানে যেতে মন চায়।

একটু বেশি বয়সে কবি ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন বলে আমাদের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, চিত্রাঙ্কন ছিল কবির বৃদ্ধ বয়সের বিলাস। বিলাস কথাটারই উপর আমরা জোর দিয়েছি। অর্থাৎ, সেটা তাঁর স্বধর্ম ছিল না, এবং যে কালে স্বধর্মে নিধন শ্রেয় ও পরধর্ম ভয়াবহ, তখন কবি হিসাবে তাঁকে আমরা নিধন করলেও চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁকে দেখতে ভয় পাওয়াটাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক— এই প্রকার ধারণা আমাদের মনের মধ্যে কাজ করেছে। তবু ভয় পেলেও আমরা তাঁর ছবিকে অতটা অবহেলা করিনি যতটা তাঁর কবিতাকে করেছি। তার কারণ এই যে, ছবিকে লিখে ঠাট্টা করা বেশি শক্ত, কারণ এই যে, ছবির প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ কম এবং কারণ এই যে, চিত্রকর তখন যে কারণেই হোক জগদ্‌বিখ্যাত, নোবেল লরিয়েট এবং বৃদ্ধ। আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস যে রবীন্দ্রনাথের ছবি তাঁর কবিতা, গল্প, গানের মতনই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সঙ্গে একপ্রকার জৈব সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাঁর নিজের অনেক মন্তব্য অবশ্য আমাদের ভুল ধারণার সাহায্য করেছে। এই যেমন তিনি বলেছিলেন যে, সাহিত্য-রচনার সময়কার কাটাকুটি থেকেই তাঁর চিত্রের জন্ম, ছবি তাঁর খামখেয়াল, অশিক্ষিত-পটুতা ইত্যাদি। (গান সম্বন্ধেও তাই: এই যেমন বলতেন, তিনি গান শেখেননি, তাল ভালো জানেন না)। এক দিক থেকে এ সব কথাই সত্য; আবার অন্য দিক থেকে এগুলো বিনয়ের চিহ্ন,

বৈষ্ণবী বিনয় নয়, বহুমুখী ঐশ্বরিক প্রতিভা, তার প্রাচুর্য, তার অবিশ্রান্ত উৎসের সম্মুখে তার স্বত্বাধিকারী, এক জন মানুষের বিনয় মাত্র। আমরা এ কথাটা বুঝিনি, কারণ, না বোঝাই ছিল আমাদের সুবিধা।

তাই এক এক সময় সন্দেহ হয় যে, আমরা রবীন্দ্রনাথের চিত্রকে অবহেলা করে আমাদের নিজেদের সৌন্দর্যবোধের অভাবই প্রতিপন্ন করেছি। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে একটা ঘনতা আছে, এবং ঘনতাকে অশ্রদ্ধা করা সৌন্দর্যবোধের চিহ্ন নয়। তাঁর যে-সব কবিতা জনপ্রিয়, তাদের মধ্যে অনেক সময় ঘনতার অভাব আছে। অবশ্য একটা বাহন কী পটভূমির নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কোনো ভাব প্রকাশ করতে গেলেই যে সেটি গাঢ়সম্বন্ধ হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। উইলিয়ম ব্লেক ছিলেন একাধারে কবি, চিত্রশিল্পী ও মিস্টিক ; অর্থাৎ, খানিকটা রবীন্দ্রনাথের সমজাতি, স্বগোত্র না হলেও। এই ব্লেকের কবিতা নিতান্ত গাঢ়, কিন্তু তাঁর ছবি প্রায়ই অসম্বন্ধ, অলস, ঢিলে। আবার নামজাদা চিত্রকরও চিত্রে অসংযত, এক রকম বেসামালই হয়ে পড়েন, যেমন টার্নার। যাঁদের ডিজাইন নিতান্ত পাকা, যাঁরা ওস্তাদ ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান, যেমন র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, তাঁদের যে কয়েকটি কবিতা আছে তার জোরে তাঁদের কবি বলা চলে না। তবুও তাঁদের মতন চিত্রকরও যে ধর্মবহির্ভূত ব্যবহারে লিপ্ত হয়েছিলেন, এইটাই এখানে লক্ষণীয়। আর্টের মহাপুরুষদের মধ্যে এমন একটা শক্তি থাকে, যেটা কোনো বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। সেটা উপ্‌চে পড়বেই পড়বে ; কোথাও গোপনে, কোনো ক্ষেত্রে সর্বজনসমক্ষে। এই গণ্ডি ছাড়িয়ে যাওয়াটা জীবনের তাগিদ হলেও তার প্রকাশ-পদ্ধতির দু' একটা মোটামুটি নিয়ম আছে। একটা নিয়ম এই : যদি আর্টিস্ট তাঁর বিশেষ, নির্বাচিত রাজ্যের কার্যাবলীতে প্রধানত স্ব-ইচ্ছা, স্ব-প্রকাশের চাহিদা পূরণ করে থাকেন, তবে তাঁর নতুন ক্ষেত্রের, তাঁর উপনিবেশের শাসন একটু কড়া, একটু নিয়মিত হয়ে যায়। তখন তাঁর নতুন দায়িত্ববোধ আসে, তিনি নিয়মশীল হন। বিপরীত পন্থাটাও সত্য। আইনস্টাইন বেহালার সুর সৃষ্টি করেন, ফরাসী সার্জন মালার্মের উপর বই লেখেন, প্যাস্‌কাল ভক্ত হন— এই রকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একে ঠিক ক্ষতিপূরণ বলা যায় কি ? ক্ষতিপূরণ ব্যাপারটা নিতান্ত যান্ত্রিক।

অন্য একটি নিয়ম এই, আর্টিস্ট যে স্তরের বিশেষজ্ঞ, সেই স্তরের নিয়মকানুন মেনে নেওয়া যখন তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয় এবং যদি তাঁর প্রতিভার উদ্‌বৃত্ত কিছু থাকে, তবে তখন তিনি অন্য স্তরে যেতে চান। অলিভার লজ, ব্যারেট, রিশে প্রভৃতিকে আর্টিস্ট বলা হয়তো যায় না, কিন্তু এক স্তর থেকে অন্য স্তরে

যাওয়ার তাঁরা সাধারণ দৃষ্টান্ত। ক্লাসিক সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত অবশ্য গ্যেটে। তিনি শরীরতত্ত্ব ও বর্ণ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন। তাঁর বাহাদুরি এই যে, তিনি এক স্তরের নিয়মকে অন্য স্তরে প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। অনেকে তা পারেন না, যেমন দ্য ভিঞ্চি— তিনি মূলত বৈজ্ঞানিক ছিলেন, এবং এই স্তরেই আবার ফিরে আসেন— অন্তত এই হল ড. মার্টিন জন্সন নামক পদার্থবিদের মত। রবীন্দ্রনাথকে আমরা অন্তত দু'টি স্তরে বিচরণ করতে অনুমতি দিয়েছিলাম, সাহিত্যে ও গানে। তবু তিনি পলিটিক্স, ইকনমিক্স, বিজ্ঞান, চিত্রচর্চা না করে থাকতে পারেননি। এ সব তাঁর পক্ষে অনধিকারচর্চা হচ্ছে লোকে যে ভাবে, তা তিনি জানতেন। তবু মিস্ র‍্যাথ্‌বোনের চিঠির উত্তর, নাইট পদবী ত্যাগের চিঠি, স্বদেশী গান, দেশপ্রেম, ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ আমরা উপভোগ করেছি, কেবল তাই নয়, অধিকাংশ ভারতবাসী ঠিক ঐ সবের জন্যই তাঁকে আজও পর্যন্ত খাতির করে। আমরা, বাঙালিরা, জানি যে, তাঁর পলিটিক্স কাব্যধর্মী ছিল, এমন কী তাঁর বিজ্ঞানের বই 'বিশ্বপরিচয়ে', এ-উপমার ছড়াছড়ি। অর্থাৎ আমরা এতটুকু মানতে রাজি যে, অন্য স্তরের কর্মে তাঁর কাব্যস্তরের কৃতিত্ব প্রকাশ পেত।

কিন্তু ব্যাপারটা আরো একটু তলিয়ে দেখা দরকার। তাঁর স্তর ছিল চেতনার ঊর্ধ্বাংশে যেখানে বাক্য ফুটে ওঠে, অন্ধ গন্ধ চক্ষুষ্মান হয়, কথা লুটিয়ে পড়ে সুরের বাহুল্যতায়, এবং ভাসমান প্রতিচ্ছবি রূপায়িত হতে চায়। এটা মনের ঊর্ধ্বতম অবস্থা নয়; সেখানেও তিনি বিচরণ করেছেন উপনিষদের হাত ধরে— প্রমাণ, শান্তিনিকেতন সিরিজ। এখানে তিনি উপনিষদের এক অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যাকে ঠিক সাহিত্যিক ব্যাখ্যা বলা যায় না। কিন্তু চেতনার নিম্নতলে তিনি সাহিত্যের সিঁড়ি দিয়ে কখনও নামেননি। অবচেতনার টান, ঠেল কিংবা ঠেস তাঁর সাহিত্যিক রচনায় নিতান্ত কম, নেই বললেই চলে। এ রকমের ভদ্র, প্রায় পিউরিট্যানিক সাহিত্যিক জগতে ছিলেন, কী আছেন কি না জানি না। কিন্তু যে আর্টিস্ট বড় তাঁর হাতে সব রুটেরই টিকিট থাকে, তা তাঁর যাতায়াতের অভ্যাস মাত্র চৌরঙ্গী রুটেরই হোক না কেন। তাঁকে উঠতে হয় আবার নামতেও হয়। তিনি স্বর্গের অধিবাসী হলেও মধ্যে মধ্যে তিনি পাতাল-প্রবাসী। দান্তে, মিলটন, দস্তয়েভস্কির কথা না হয় ছেড়ে দিলাম— তাঁরা ছিলেন খ্রীস্টান— কিন্তু ব্যাস বা কালিদাসকেও পাতালে না হয় অন্তত প্রাসাদের তয়খানায় নামতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ রঙের তুলির ও চিত্রকল্পনার বিষয়ের সাহায্যে এই অবচেতনার স্তরে প্রবেশ লাভ করেছিলেন। তাঁর চিত্রিত মূর্তি তাঁর সাহিত্যে নেই, সেগুলি অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক পশু,

গোটা কয়েক পৌরাণিক দানব ; তাদের রং ভয়ংকর, তাদের লাল ঘন রক্তের ; তাদের রেখা সর্পিল ; এমন কী ফুলটি পর্যন্ত পারিজাত নয়, নারকীয়। এই বর্ণচ্ছটায় রবীন্দ্র-সাহিত্যে তথাকথিত চাঁদের আলো নেই ; এইসব মূর্তি আপন লালিত্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে না ; তাদের শরীর আলোয় ভেসে যায় না, যেমন যায় রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকাদের ; তারা সর্বদা থাকে একটা কালো পর্দার পিছনে, আড়ালে-আবডালে। তাদের দেখলে সন্দেহ হয়, বুঝি বা রবীন্দ্রনাথ আঁকবার পূর্বে কাপড়ের উপর একটা কালো পোঁচ দিতেন। কে বলবে এ সব অন্ধকারের জীব চিত্তরঞ্জন দাশের কল্পিত কবি রবীন্দ্রনাথের রচিত। একেও আমি ক্ষতিপূরণ বলতে নারাজ।

আমার মতে ব্যাপারটা এই : জীবনের ধর্ম কাব্যরচনা নয় ; চিত্রাঙ্কনও নয় : জীবনের ধর্ম প্রসার, সীমানার বাইরে, সর্ব স্তরে। জীবনের ধর্ম এই প্রসারণের সঙ্গে সঙ্কোচন ; এবং এই দু'টি প্রক্রিয়ার সাহায্যে নিয়মসৃষ্টি ও সেই নিয়মের অনুবর্তিতা। পন্থাটিকে চক্রবলয়, কিংবা কম্বুরেখার আকারে হয়তো পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু পন্থার চেয়ে পথিকই প্রধান। তাই আজ পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ নামে পুরুষকে বুঝতে চেষ্টা করাই ভালো, তার সমগ্রতাকে, তার মূলকে গ্রহণ করাই মঙ্গল। চিত্রাঙ্কন তাঁর ধর্ম-বহির্ভূত ছিল বলেই লোকের ধারণা, এবং ঠিক সেইজন্যই তাঁর অধার্মিক ব্যবহারের সাহায্যেই তাঁর পুরুষত্বের (পার্সনালিটির) অদ্ভুত সন্ধান মিলবে, আমি আশা করছি আজ।

এই সন্ধানের সুবিধা বাঙালিরই আছে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষা আমাদের ভাষা, অন্তত এখন। অন্য প্রদেশের ভারতবাসীদের এই সুবিধা নেই। তা ছাড়া, মনের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে তাঁদের একাধিক বাধা আছে। তাঁদের বিশ্বাস যে, বাঙালিরা তাঁকে নিয়ে একটু বেশি হুজুক করেছে, অবশ্য বাঙালিদের অভ্যাস বলেই। ভারতবর্ষে আজকাল ইকনমিক্স, পলিটিক্স ছাড়া আর কিছু নেই। সেই ইকনমিক্সে বাংলার দাম মাড়োয়ারের উপনিবেশ ও কলকাতার দাম তার রাজধানী বলে এবং পলিটিক্সে বাংলার মূল্য যা না হওয়া উচিত তার দৃষ্টান্ত হিসাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের মনে বাংলার স্থান নেই, ভবিষ্যৎ নেই। যা দেখছি, তাতে মনে হয় যে, আজ না হয় কাল পশ্চিম বাংলা চীফ কমিশনারের প্রদেশ কিংবা পাকিস্তানের সীমান্ত হয়ে দাঁড়াবে। এতে অভিমানের কিছু নেই, কর্তব্য ও দায়িত্বই আছে। আমরা বাঙালিরা আজ মনেও খণ্ডিত-বিখণ্ডিত, অন্যান্য ভারতবাসী যা নয়। মানুষ হিসাবে কোনো সম্পূর্ণ বাঙালি চোখে ত পড়ে না ; কারুর মূলের সঙ্গে যোগ আছে বলে সন্দেহ হয় না। রবীন্দ্রনাথের ছিল ; তিনি ছিলেন গোটা আস্ত মানুষ। তাঁর সাহিত্যে, তাঁর গান, তাঁর চিত্র সব একসূত্রে গ্রথিত। চিত্রকর

হিসাবে তাঁকে ভিন্ন মনে হয়; কিন্তু বিচারের ফলে দেখি যে তা নয়, দেখি সবই একটি পুরুষের, একই মানবের, একই পার্সনালিটির বিকাশ। আরো দেখি যে সেই বিকাশের নিয়ম আছে। বিখণ্ডিত মনকে একত্রিত করবার শ্রেষ্ঠ উপায় অখণ্ডিত, পূর্ণ পুরুষের মর্ম-বিচার, তার ফলে প্রকাশের নিয়ম আবিষ্কার ও সেই নিয়মের সদ্‌ব্যবহার। এই জন্যই আমি রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসবে যোগ না দিয়ে তাঁর ছবি দেখতে চাই প্রধানত, তার পর তাঁর গান ও কবিতা শুনতে চাই, এবং তাঁর সম্বন্ধে বক্তৃতা থেকে দূরে পালাই।

১৩৫৫

রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও গায়ন-পদ্ধতি

রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে আমি এখানে একটি মূল বিষয়ের আলোচনা করছি। আমার এক বন্ধু কথাটি পাড়লেন : "বুঝলাম তো সব। তবে হিন্দী গানের পর রবীন্দ্রনাথের ভাল গানগুলিও জমে না কেন?" তাঁর এই মনোভাব অন্য বন্ধুরাও সমর্থন করলেন। এঁরা কেউ সঙ্গীতজ্ঞ নন। তানসেন, বৈজু বাওরা, সদারঙ্গ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রতিই তাঁরা অধিক শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাবান। তাঁরা প্রত্যেকেই রসজ্ঞ আর দায়িত্বহীন মন্তব্যে অনভ্যস্ত। এখন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তুলনায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত জলো ও পাতলা ঠেকে কেন, তার বিচার চাই।

প্রথমেই বলে রাখি, রবীন্দ্র-সঙ্গীত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেরই অঙ্গ। যেসব গানে অঙ্গভঙ্গ হয়েছে মনে হয়, সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে তিনি রীতি-বিগর্হিত কাজ করেননি। রাগভ্রষ্টতার জন্য প্রধানত দায়ি কবিতার কোনো বিশেষ ভাব, যাকে মূর্তি দেওয়া প্রচলিত বিশেষ রাগরূপের মধ্যে একপ্রকার অসম্ভব। তবুও রবীন্দ্র-সঙ্গীত বর্ণসংকর নয়।

দ্বিতীয় কথা, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসরে অনেক গায়ক গলা ছেড়ে গান করেন না। ফলে বহু গান জমতে পায় না। মাইকের সামনে সভায় গাইবার অভ্যাসকে কেউ কেউ এর জন্য দায়ি করেন। খানিকটা সত্য নিশ্চয়ই, যদিও খোলা গলায় গাইলে মাইকের গান কেন দুর্বল লাগবে, বুঝি না। ফৈয়াজ খাঁ স্বাভাবিক শক্তিতে বেতারে গান করতেন না, মানি। তবু তিনি মাইকের সামনে ঝিমিয়ে কী ঘুমিয়ে পড়তেন না। মাইকের সামনে গলা চাপতে হয় না। শান্ত, ধীর ও শ্রুতিপ্রধান করতে হয়। তবে কি শিক্ষার দোষ? এ অভিযোগও শুনে থাকি। দিনুবাবুর শিক্ষা-পদ্ধতি একটু অন্যরকমের ছিল। তিনি প্রাণ দিয়ে গাইতেন—জোরে, স্ফূর্তি করে, যে জন্য শিক্ষার্থীরাও নিদ্রালু হতে পারতেন না। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বর্তমান শিক্ষকদের শিক্ষাপদ্ধতি লক্ষ্য করবার অবকাশ মেলেনি। তবে সন্দেহ হয়, তাঁরা যে কোনো কারণেই হোক, রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে যথোপযুক্ত প্রাণবান করে তুলতে পারছেন না। এ বিশ্বাস ঠিক নয় যে, রবীন্দ্রনাথের গান কেবল প্রাণস্পর্শী। যদি তাই হয়, তবে অনেকের মতে সভামণ্ডপে সে সঙ্গীতের স্থান নেই। কারণ, প্রাণস্পর্শন গোপন ও সূক্ষ্ম কর্ম এবং সভার প্রাণ নেই, আছে একটি শ্রোতার। সভায় থাকে একটি অস্পষ্ট সমবেত ভাব— যেটি চঞ্চল ও জাগ্রত হতে উদ্‌গ্রীব। আর সে আশা যদি কোনও কারণে অপূর্ণ থাকে, তবে ভাব হয়ে যায় আড়ি। কথাটি পুরোপুরি সত্য না হলেও, এটুকু বলা চলে যে শিক্ষাও অনেক ক্ষেত্রে যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। সংখ্যাধিক্যের জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সবিশেষ, ব্যক্তি-

গত মনোযোগ দেওয়া যায় না, আর তারাও নিজের পড়াশুনো, কাজকর্ম সেরে যথেষ্ট রেওয়াজের সময় পায় না। এর উপর আছে অর্থ-চিন্তা ও স্বাস্থ্যহীনতা।

গায়ন-পদ্ধতির উল্লেখ করছি বিশেষ কারণে। একেই আমাদের কণ্ঠ-সাধনার প্রক্রিয়া অবৈজ্ঞানিক। অন্তত যা ছিল— যেমন জাকরুদ্দিন, আলাবন্দে, নসীর উদ্দিন, বিষ্ণু দিগম্বর কী অঘোরবাবুর গলায়— তাও গেছে ঘুচে। তবু, হিন্দুস্থানী গায়ন-পদ্ধতির কণ্ঠ থেকে স্বর তোলাই সাধারণ নিয়ম। ভাতখণ্ডেজী ছাত্রদের হাঁ করে গাইতে, দীর্ঘ আ-কারের সাহায্যে স্বর বার করতে শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষায় কণ্ঠই স্বরের ভূমি, নাক নয়। সত্যই তাই। কণ্ঠের শ্বাস যেমন বুক থেকে ওঠে, স্বরের শ্বাসও তেমনি সেখান থেকে উঠবে। কেসর বাঈ, মুস্তাক আলি প্রভৃতি যে কোনো বড় গায়কই গলা চেপে গান না। বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা আজকাল খেয়াল গাইছেন, তাঁরাও এ বিষয়ে ততখানি অবহিত নন। কেবল মাইকের জন্যই নয়। আবদুল কম্বিম ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের প্রভাবের জন্যও বাঙালির কণ্ঠও ওজসের পরিবর্তে তথাকথিত মাধুর্যকে বরণ করেছে। ধ্রুপদের অবসানও অপর একটি কারণ।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়ন-পদ্ধতিতে কণ্ঠের সহজ উদাত্ত স্বরের ব্যবহার বরাবরই কিছু কম। এখন আরো কমে আসছে। সভায় সকলেই যদি ঠোঁট, গাল ও গলা বুজে গান, তবে আওয়াজ বেশিদূর পর্যন্ত ছড়াতে পায় না। সভাগৃহের দেয়াল থেকে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে না শ্রোতার কানে। যতদিন নাকী আওয়াজের সঙ্গে ন্যাকামির যোগ রয়েছে এবং লজ্জা অথবা স্বাস্থ্যহীনতার তাড়নায় মেয়েরা হাঁ করে মুখ খুলে না গাইছেন, ততদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে এই প্রকার মতা-মতের জন্য গায়ন-পদ্ধতিকেই দায়ি করবার সুযোগ থাকবে। দোষটি কিন্তু সহজেই কাটানো যায়; উপায়— তানপুরার সাহায্যে বছর দুই কণ্ঠস্বরের সাধনা। আ-স্বর যতদিন না কণ্ঠে বাসা বাঁধছে, অর্থাৎ স্থিত হচ্ছে, ততক্ষণ রবীন্দ্র-সঙ্গীত মুখস্থ করা উচিত নয়। সভাস্থ তো নয়ই। রবীন্দ্রনাথের গানে সব ক'টি স্বরবর্ণের প্রয়োগ করতে হয় এবং সাহিত্যের আদি অক্ষর অ-কার হলেও সঙ্গীতের আদি অক্ষর আ-কার। আ-কার পাকা হলে তার দৌত্যে শ্রোতার সঙ্গে গায়কের সম্বন্ধ পাকা হবে। নচেৎ শ্রোতাকে কান খাড়া ও মন সজাগ রাখতে হবে— যে কাজটি প্রিয় নয়। তা ছাড়া, উপভোগ সর্বদাই সম্ভোগ।

পূর্বোক্ত যুক্তির বিপক্ষে, অর্থাৎ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বর্তমান গায়ন-পদ্ধতির স্বপক্ষে একটি কথা অবশ্য বলা যায়। সঙ্গীত, বিশেষত রবীন্দ্র-সঙ্গীত হচ্ছে ললিতকলা এবং লালিত্য প্রকাশের কণ্ঠসাধনা একটু অন্যরকমের হবেই হবে। নাকী স্বর সাধারণত মিষ্টত্বসূচক— যথা, দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে নাঁনাঁ নাঁ… কী মিষ্টি!

শব্দতাত্ত্বিকদের মতও শুনেছি খানিকটা তাই, পুরোপুরি নয়। তা, থা, দা, ধা-র মতনও কিছু 'না' শব্দটির উচ্চারণ সম্ভব নয়। অতএব, গলা খুলে গাওয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতে অনুচিত। অন্তত সব সময় উচিত নয়। মানলাম, নাকী স্বর বর্জনে মাধুর্য ক্ষুণ্ন হবে এবং ধ্রুপদিয়া-খেয়ালিরাও নাকী স্বর ব্যবহার করেন। তবুও প্রশ্ন ওঠে— কার মাধুর্য, কিসের মাধুর্য ও কতখানি মাধুর্য। হিন্দুস্থানী গায়ন-পদ্ধতিতে মাধুর্য রাগের ও বন্দেশের— গায়কের নয়। এবং এতটাই নয় যে, গায়কের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত গৌণ। বন্দেশের মাধুর্যও বজায় রাখতে হয়— এই কথাটি অনেকে বোঝেন না, কী মনে রাখেন না বলে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হলো। বন্দেশী গানে, যেমন সেনিয়া ধ্রুপদ-ধামারে কী সদারঙ্গী খেয়ালে, রাগ ও বন্দেশ অভিন্ন। এইখানে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে 'পাক্কা' গানের মিল। গরমিল আরও গভীর। কিসের মাধুর্য, বিশ্লেষণ করলেই সেটি ধরা পড়বে। শ্রোতা রবীন্দ্র-সঙ্গীত যখন শুনছেন, তখন তাঁর সামনে রয়েছে গায়ক-গায়িকা আর কানে আসছে সঙ্গীতের রূপ। কিন্তু ঐটুকু ; অর্থাৎ কানে আসছে না রাগ-রূপ। বেশ— কিন্তু সেই সঙ্গে কবিতার রূপও আসা উচিত ছিল না, কারণ রবীন্দ্র-সঙ্গীত যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বহুব্রীহি সমাস কিংবা **emergent value**'র দৃষ্টান্ত হয়, তবে তাকে অত সহজে ভাঙা যায় না, ভাঙা উচিত নয়। অথচ শ্রোতার কানে সঙ্গীতের সাহিত্যিক (কবিতার) রূপটা ভেসে উঠছে। এই প্রকার **partial fission**-এর জন্য মাধুর্য কবিতায় ও গায়ক-গায়িকার ব্যক্তিত্বে, এমন কী রূপে আশ্রয় করে। **Fission** সম্পূর্ণ হয় হিন্দুস্থানী গায়ন-পদ্ধতিতে। ওস্তাদ কথাকে অবহেলা করেন— এটা সত্য নয়। তিনি বন্দেশ দেখাবার পর তান ও বাটোয়ারার সাহায্যে সমন্বয়টি ভেঙে দেন। ফলে শক্তি মুক্ত হয়, শতগুণ বৃদ্ধি পায়। অন্তত পুরোপুরি প্রকাশ পায়। মনোযোগের কেন্দ্র কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতে নড়ে বেড়ায় কবিতা ও গায়ক-গায়িকার মধ্যে। লিখতে খারাপ লাগে, কিন্তু শ্রীহীনা কুরূপার মুখে রবীন্দ্র-সঙ্গীত তেমন ফোটে না। কিসের মাধুর্যের উত্তর আর যাই হোক, মিষ্টি মুখের নয়। অতএব গায়ন-পদ্ধতির জন্য রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুরাংশ আরো কমছে এবং কবিতা ও ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য আরো বাড়ছে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসরে বাঁয়া-তবলা, খোল-পাখোয়াজ এবং তানপুরার সহযোগে গান হয়। এটা খুবই শুভ লক্ষণ। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ধ্রুপদাঙ্গের তাল আছে, যদিও অনুপাতে কম। সাধারণত লঘু ত্রিতালীর সংখ্যাই বেশি। অনেক গানে কবিতার মেজাজের সঙ্গে তালের মেজাজ খাপ খায় না। নাচন্ত তালে গম্ভীর ভাব ও শব্দ-সম্পদ ঢেলে দেওয়া একপ্রকার **bad investment**। অবশ্য তালের ছকে গানকে বাঁধলে কবিতার মেজাজ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বাঁচানো যায়, যদি

দ্রুত কিংবা বিলম্বিত করার স্বাধীনতা গায়কের থাকে। শুনলাম এই স্বাধীনতা দিতে শিক্ষকরা তেমন রাজি নন। এখন বোধ হয় পুরাতন ও হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের তাল ও লয় সম্পর্কে একটু স্বাধীনতা দেওয়া ভালো।

এতক্ষণ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের 'নির্জীবতা'র জন্য গায়ন-পদ্ধতিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনেকের মতে গলদ গোড়ায়, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যেই। তার প্রকৃতি সাহিত্যিক কাব্যধর্মী। কবিতার আবেদনে সুরের আবেদন চাপা পড়ে; মনোযোগ বিভক্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং যেহেতু কথার আবেদন সহজ ও মর্মস্পর্শী তখন সুরের দিক থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত খাটো হবেই। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সুর মুখ্য। কথাকে গৌণ মনে হয় আলাপ, তান ও অন্যান্য অলংকার ব্যবহারের সময়। কথার ফাঁকে ফাঁকে সুর মধুচক্র সৃষ্টি করে ও তারই গুঞ্জন কথার অর্থকে ঢেকে রাখে। হিন্দুস্থানী গানে সুরের সাতত্য, অবিচ্ছিন্নতা প্রায় অটুট, এক তালের প্রয়োজন ছাড়া। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চমৎকার শব্দ ও অর্থগুচ্ছ গায়নকে সুরবলয় থেকে বিচ্যুত করে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুর 'তৈলধারাবৎ'। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে স্বরকে কথার উপলখণ্ড অতিক্রম করতে হয়। স্বরের যদি সুরগত শক্তি থাকে, তবে উপলগুলিও সঙ্গে ভেসে যেতে পারে। কিন্তু সাধারণত তার সে শক্তি কম না হলেও উপলখণ্ডেরই ওজন ভারী, তার সৌন্দর্য সত্ত্বেও। এই কারণেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে 'আ' করে মুখ খুলে উদাত্ত স্বরে গাওয়া চলে না, তালের বৈচিত্র্য ও মর্যাদা রাখা যায় না। সুরের দিক থেকে এই ব্যাখ্যার পালটা উত্তর দিতে পারি না।

কিন্তু শ্রেণী-বিভাগের দিক থেকে বোধ হয় উত্তর দেওয়া চলে। অর্থসঙ্গীত আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত এবং সঙ্গীত নানা প্রকারের। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই বলতেন। তাঁর জবাবদিহি না মানবার কোনো কারণ দেখি না। বাস্তবিকই তাই। ল্যাংড়া, আলফন্‌সো, দশেরী, মালিয়াবাদীর স্বাদ পৃথক, যদিও প্রত্যেকটি সুস্বাদু আম। তা ছাড়া অন্য আমেরও রস আছে, কেবল তাকে গোপনে চুষে খেতে হয়। এই গোপনতাই হল রবীন্দ্র-সঙ্গীতে রসোপলব্ধির প্রাণের কথা। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগরাগিণী ও গায়ন-পদ্ধতি ব্যক্তি-নির্বিশেষ ও সাধারণ। বর্ষার জন্য মল্লার রাগটাই স্থায়ী ভাব, আদি ভাব। তাকে বজায় রাখো প্রথমে। তারপর তাকে সাজাও একটি স্বর বসিয়ে, কমিয়ে, হালকা ছুঁয়ে। তাইতেই যা বৈচিত্র্য হল, সেই যথেষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি গান একটি বিশেষ মেজাজের। তার আদিভাব নিশ্চয়ই থাকে। কিন্তু সেটি সব সময় সুরগত ভাব নয়, সাহিত্যিক ভাব। 'ঝর ঝর ঝরিছে বারিধারা' গানটিতে মিশ্র-মল্লার সুস্পষ্ট। 'আকুলা তকুলারে' পদে কাফির অংশ এবং মল্লার কাফি ঠাটের অন্তর্গত। অতএব বিচ্যুতিতে গুরুচণ্ডালী দোষ অর্সায় নি। অন্যদিকে 'বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা

বাদরে' গানটি পাকা ইমন এবং ইমনে কখনও বর্ষার হিন্দুস্থানী গান শোনা যায়নি। কেদারা ও হাম্বীরে বর্ষার হিন্দী গান ও রবীন্দ্রনাথের গান উভয়ই রয়েছে। কিন্তু যিনি 'বরখা ঋতু', 'কৈসে চাঁদিনী' প্রভৃতি কেদারার খেয়াল শুনেছেন, তিনিই বুঝবেন যে, 'তিমির অবগুণ্ঠনে' ওই বর্ষার গানটি কত বিশেষ specific মনোভাব ব্যক্ত করছে। 'কে তুমি'র স্বরবিন্যাসে যে নতুন ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়, সেটি নিতান্ত ব্যক্তিগত।

আমার নিজের ধারণা, এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা,— এই বিশেষ, অ-সাধারণ specific গুণের জন্যই রবীন্দ্র-সঙ্গীত নির্জীব মনে হয় সাধারণ সভায়। যেটি রবি-বাসরে শোভন, সেটি সাধারণ আসরে শোভা পায় না। দিগ্‌বিজয়ী প্রতিভার জোরে রবীন্দ্রনাথ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা রবীন্দ্রভক্ত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নই। আমরা তাঁর গান গাই, কিন্তু আমাদের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব নেই যার কৃপায় আমরা বিশেষকে নির্বিশেষে ও সাধারণে পরিণত করতে পারি। প্রতিভা এমন কী ব্যক্তিত্বের প্রসাদও যখন নেই, তখন শিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতি দিয়েই আমাদের কাজ চালাতে হবে। ১৩৬০

রবীন্দ্র-জন্মতিথি উৎসব

রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উপলক্ষে সারা দেশে উৎসব চলেছে। কলকাতা শহরে রবীন্দ্র-সপ্তাহ খোলা হয়েছে, এবং ছয়টি অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। এখনও সপ্তাহ শেষ হতে তিন দিন বাকি, অতএব আরো দু'একটি সভায় বোধ হয় যোগ দিতে হবে। কিন্তু ইচ্ছে নেই। অনিচ্ছার কারণ অনেকগুলি।

ব্যক্তিগত বাধা, যেমন যাতায়াতের অসুবিধা, বসবার কাষ্ঠাসন, ভিড় এবং জাতীয় সঙ্গীত শোনবার সময় পাঁচ দশ মিনিট খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা, সভার মধ্যে সিগারেট খাবার ইচ্ছে থাকলেও সংকোচ বোধ, এসব না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু যেগুলি ছাড়া যায় না তাদের তালিকাও কম নয়। আমার বিশ্বাস, যেসব দুর্লঙ্ঘনীয় বাধাগুলির উল্লেখ করবো সেগুলি জনসাধারণের। আর যদি তা না হয় তবে এই রচনাটি স্বদেশ-প্রত্যাগত এক জন মধ্যবয়স্ক প্রবাসী বাঙালির নতুন বাংলার প্রতিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারার নিদর্শন হিসাবে গণ্য হোক। সুস্পষ্টতার জন্য বক্তব্য দফা পিছু সাজাচ্ছি।

(১) রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসবে অ-বাঙালির কোনো উৎসাহ নেই। সন্দেহ হয় কর্তৃপক্ষরা তাঁদের উৎসাহ জাগ্রত করবার চেষ্টা করেননি, কিংবা করতে জানেন না। কারণটিকে হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না। ব্যাপারটা এই: বাঙালি ভাবে যে রবীন্দ্রনাথ বাংলার! সেটা অবশ্য সত্য। নিতান্ত প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি; তিনি বাংলায় লিখেছেন, বাংলার বিশেষত্বে ও ভবিষ্যতে তিনি বিশ্বাস করেছেন, বাংলার নদী, মাঠ, দৃশ্য তিনি ভালবেসেছেন, এমন কী বাঙালি মেয়েদের রূপগুণ সম্বন্ধে তাঁর একটু পক্ষপাতিত্ব ছিল। রবীন্দ্রনাথের এই প্রকার কাজে ও মতে অবাঙালিদের আপত্তি নেই। কেবল তাঁদের আপত্তি বাঙালির দাবিতে যে, রবীন্দ্রনাথ কেবল বাংলার। বাঙালিরা অবশ্য মুখে তা বলেন না, কিন্তু ব্যবহারে প্রকাশ করেন। অথচ, প্রত্যেক বাঙালি রবীন্দ্রনাথকে সমগ্র ভারতের ঐক্য-সাধনার একজন প্রধান সাধক ভাবেন। অবাঙালিরা ভাবেন, যদিও মুখে বলেন না, তাই যদি হয় তবে রবীন্দ্রনাথকে অতটা প্রাদেশিক করে দেখা অনুচিত। তাঁর মধ্যে ভারতীয় অংশটা দেখানো, তাঁর সভায় অবাঙালিকে সভাপতি করা, তাঁর স্মৃতি-সভামঞ্চে অবাঙালিকে বসানোই শোভন। অবাঙালি আরো ভাবেন, 'বিশ্বকবি' আখ্যাটা ছেড়ে দেওয়াই ভালো, কারণ এই ক্ষণে বিশ্ববোধের বদলে দেশাত্মবোধটাই সকলের মনকে অধিকার করেছে এবং দেশাত্মবোধ তাঁর নেহাৎই কম ছিল না। সে বোধ হয়তো তাঁর ভিন্ন রকমের ছিল। বেশ তো, কতটা ভিন্ন, কতটা উৎকৃষ্ট তাই বুঝিয়ে দিন। বলা বাহুল্য, মুসলমানদের

উৎসাহ জাগাতে হলে তাঁর দেশাত্মবোধের উপর জোর দিলে চলবে না। তাঁদের রবীন্দ্রপ্রীতি অন্য কারণে। সে যাই হোক, তাঁরাও রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করেন। এখন আমার বক্তব্য এই : বাঙালি-অবাঙালি উভয়েই ভাবছে রবীন্দ্রনাথ ভারতের কিন্তু বাঙালিরা কাজে দেখাচ্ছে যে, তিনি একা বাংলার। প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিক। যত দিন নেতাজী না ফিরছেন তত দিন বাঙালির প্রাণ খালি, তার মানের ঘর শূন্য থাকবে। কিন্তু শূন্যতা পূরণের জন্যই কি রবীন্দ্র-জন্মতিথির উৎসব চলেছে?

(২) আমার অন্য সন্দেহ আরো মারাত্মক। আমি অন্তত চারটে বক্তৃতা শুনেছি যাতে রবীন্দ্রনাথকে কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু যে ব্যক্তি চিরজীবন না হয়, অন্তত শেষ ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর দল ছাড়া হয়ে কাটালেন, যিনি দলাদলিতে দেশের সর্বনাশ হয়েছে বলে গেলেন, যিনি ব্যক্তিবিশেষকে পূজা করা মনুষ্যত্ববিকাশের অন্তরায় ভাবতেন এবং যাঁর স্থান দলের উপরে বলেই বিশ্বের ও চিরকালের, সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার বেলা তাঁকে বক্তার দলে টেনে আনার মধ্যে একটা ক্ষুদ্রতা ধরা পড়ে। এ প্রক্রিয়াটাও স্বাভাবিক; কারন, সব কাজ ছেড়ে আমরা এখন দলই গড়ছি। তবু উপলক্ষটার দাবি থেকে যায়। রাজনৈতিক সভায় যেটা চলে সেটা জন্মতিথিতে অচল। রবীন্দ্রনাথ স্ট্যালিনকে, জহরলাল, গান্ধীজী, সুভাষকে শ্রদ্ধা করতেন— কে না জানে! কিন্তু সকলেরই জানা উচিত যে, তিনি কারুর পায়ে নিজকে কী দেশকে অর্ঘ দিতে চাইতেন না। রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব সম্বন্ধে কাল কী রায় দেবে জানি না, কিন্তু তিনি মানুষের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানের এক-জন শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ছিলেন, তাঁর স্বপক্ষে এ ডিক্রী দিতে কালের কলম কখনও কাঁপবে না। দই-সন্দেশের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের নাম দেখে এক কালে দুঃখ হতো, কিন্তু এ দুঃখ তার চেয়ে বেশি। দই-সন্দেশে দেহ পুষ্ট হয়, দলাদলিতে মন হয় অসুস্থ।

(৩) শ্রদ্ধার অর্থ কি? প্রথমত, সেটা ভক্তি নয়। তাঁর রচনাবলী যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই তিনি নামজাদা সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর গান যখন রেডিওতে গাওয়া হয়, তখন নিশ্চয়ই তিনি গান লিখতে জানতেন। তাঁর স্মৃতিসভায় যখন ভিড় জমে, তাঁর সম্বন্ধে গান্ধীজী-জহরলাল থেকে বহু ইংরেজের ধারণা যখন উঁচু, তখন নিশ্চয়ই তাঁকে অবহেলা করা যায় না। অতএব ভক্তিভরে তিনি তমুক ছিলেন বলার মধ্যে মানুষের পুনরাবৃত্তির ও কাল-ক্ষেপের প্রবৃত্তি ছাড়া আর কী জাহির হয় বুঝি না। পুনরাবৃত্তিরও প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য; সময় কাটাবার দরকার আছে মানি, সদ্-ব্যবহার থেকে অব্যাহতির জন্য, কিন্তু দশ হাজার লোকের সামনে তাঁর উদ্দেশে

হৃদয় বিগলিত করা এক রকম মানসিক রোগ। শ্রদ্ধা সুস্থ মনের কাজ, পবিত্র মনের ব্যবহার। শ্রদ্ধা অর্থে বিনয়। বিষয়বস্তুকে যখন নিজের সম্পত্তি ভাবা যায় তখন ওঠে ভক্তি, আর যখন তাকে ব্যক্তি-সম্পর্ক-রহিত হিসাবে দেখা হয়, তখনই জন্মায় শ্রদ্ধার সূচনা। আত্ম-নিরপেক্ষভাবে দেখতে গেলে বহু সাধনার প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক ও আর্টিস্ট সশ্রদ্ধভাবে বিষয়বস্তুর সাধনা করেন। বৈজ্ঞানিক যখন পরমাণু কী জীবাণুর রূপ দেখেন তখন তিনি হৃদয়াবেগ সংযত করেন; চিত্রকর ও কবি সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখে কিংবা কল্পনা করে পাগল হন না। তাঁরা গঠনকে, কল্পিত রূপকে পৃথকভাবে জানতে চান প্রথমে এবং জানবার পর গঠন ও রূপের নিয়মানুসারে তাদের ব্যক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের কীর্তির কী রূপ, কী গঠন, কী নিয়ম ছিল জানাটাই শ্রদ্ধা এবং সেই জ্ঞানের প্রকাশই জন্মতিথি উপলক্ষে সভা-সমিতির উপযোগী বক্তৃতা।

(৪) উপযোগী শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উপায় আছে এবং সে ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা করেছিলেন। 'মুক্তধারা'র অভিনয় দেখলাম। রবীন্দ্রনাট্য শান্তিনিকেতন ছাড়া অন্যত্র অভিনীত হতে দেখলেই মনে হয় বাড়িতে বসে পড়লে বেশি মজা পেতাম। এটা রবীন্দ্রনাট্যের দোষ নয়, কারণ শেকৃসপীয়রের নাটক সম্বন্ধেও অনেকে এই ধরনের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাট্যে নাটকত্ব অবশ্য আছে; এবং সেটা রঙ্গমঞ্চে ফোটানোও যায়। তবে সেটা ভাবাশ্রয়ী বলে, অর্থাৎ নাটকের স্থায়িভাবের সূক্ষ্মতার দরুন ও তার প্রকাশে নিত্যন্ত সুচারু স্পর্শালুতার প্রয়োজন থাকার জন্যই, অভিনয় সাধারণত অসার্থক হয়। যদি চরিত্রের সংঘাত বেশি থাকতো, তবে ব্যাপারটা সহজ হতো। এ ক্ষেত্রে অভিনেতারা কবিতার যোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। তবু অভিনয়টি জমেনি, বোধ হয় রিহার্সেলের অভাবে। মোটামুটি, নাটকত্ব অটুটই ছিল। দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও অভিনেতাদের মধ্যে পার্ট সামান্য অদলবদল করলে পরের অভিনয় নিশ্চয়ই আরো জমবে। অবশ্য দর্শকবৃন্দ সাহায্য না করলে কিছুই হবে না। বাঙালি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে নাট্যগৃহে অভদ্রতা করবার সহজাত প্রবৃত্তি কবে কমবে জানি না। তাঁরা হয়তো বলবেন, স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা কমালেই সুযোগ মিলবে। কোন্‌টা ঠিক জানি না, কিন্তু এ কথা জানি অন্তত শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অনুষ্ঠানে কচি বাচ্চার চিল চেঁচানি ও সোডা-লেমনেড বিক্রির কর্কশ চীৎকার অচল। আবৃত্তি যা শুনলাম, সে সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখতে চাই না। আবৃত্তির জন্য ছন্দজ্ঞান থাকা চাই। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিংবা শিশির ভাদুড়ীর, যে কোনো ভঙ্গিই হোক না কেন, উচ্চারণ স্পষ্ট অর্থাৎ একটু গঙ্গার ধারের, মাত্রাবোধ, লয়জ্ঞান, বিরামবোধ, এগুলি নিতান্ত প্রাথমিক। কই, তার কোনো সাক্ষাৎ পেলাম না তো! অথচ বাঙালি মাত্রেই কবি শুনেছি। অবশ্য

একজন আবৃত্তিকার ছাড়া, কিন্তু সে ছিল সাহিত্যের রসজ্ঞ। গান সম্বন্ধে লিখতে গেলেই মন্তব্য কটু হবে, তাই একটু সামলে লিখছি। ত্রিশ-চল্লিশ জন যুবক-যুবতী একটি পুরনো উৎকৃষ্ট গান গাইলে। সঙ্গে পাখোয়াজ বাজল ; তাল ছিল সুরফাক্তা তানপুরো ছিল একটা, জোর দু'টো। তবু আমি চতুর্থ সারিতে বসেও গানটা শুনতে পাইনি। একে গান-গাওয়া বলে না। বাসরঘরে নতুন বৌ ও শালীর দলও এর চেয়ে জোরে গায়। শিক্ষার দোষ দিতে মন চায় না, কারণ সমস্যাটি সঙ্গীত সম্পর্কিত নয়, অর্থনৈতিক! দুধের দাম কমলে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে যাব মনস্থ করেছি। দু'টি যুবকের রসাল গান শুনলাম। তাঁদের বেশের পারিপাট্য দেখে আশান্বিত হয়েছিলাম, কিন্তু তাঁরা কোন্ গান দু'টি গাইলেন বুঝতে পারলাম না। কথার উচ্চারণ এতই অস্পষ্ট যে পাশের শ্রোতাকে প্রশ্ন করতে হয়, "রবীন্দ্রনাথ লুকিয়ে-চুরিয়ে উড়িয়া কী আসামী ভাষায় কবিতা লিখতেন না কি?" আরেকটি জিনিসের উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। জানি আজকালকার যুবক-যুবতীদের প্রবেশিকায় অনেক কিছু বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়, নোট মুখস্থ করতে হয় ও সেই সঙ্গে পুস্তিকার মারফত ল্যাস্কি-লেনিনের মতবাদ পড়তে হয়। তাতে নিশ্চয় স্মৃতির শক্তির উপর টান পড়ে, যার ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে থাকবার কথা নয়। কিন্তু তাই বলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে এসে দশ-বারো লাইনের গানটাও যদি মনে না থাকে ও সেজন্যে চোখের সামনে গানের কথা যদি ধরে থাকতে হয় তবে বলতে হবে—এই সব ছেলেমেয়েদের গান গাওয়া কেন? লেখাপড়াও বন্ধ করা উচিত। এটাও কি মাছের দামের দরুন?

একটি মাত্র মেয়ের গান ভালো লাগল। সুচিত্রা মুখার্জি চারখানা গান গেয়েছিল, তার মধ্যে একটি, 'সার্থক জনম আমার' সত্যই ভালো হয়েছিল। মেয়েটির গলায় জোর আছে, টপ্পার দানা আছে, আর ভাবও আছে, এবং প্রত্যেকটারই সংযত ব্যবহার করতে সে জানে। শুনলাম মেয়েটি কমিউনিস্ট। কমিউনিজমে দেশে সাহিত্যের উন্নতি ঘটেছে কি না জানি না তবে ঐ মেয়েটির গলার কোনো ক্ষতি হয়নি। বছর পাঁচেক প্রাণপণে ভালো লোকের কাছে শিখলে এ মেয়ে রীতিমত গায়িকা হবে, যদি ইতিমধ্যে গৃহিণী না হয়। কিন্তু গোখরোর সলুই এ-দেশে ঢোঁড়া-ঢ্যামনা হয়ে যায়। কথাটা আমার নয় রবীন্দ্রনাথের।

আসল কথা এই: রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে ভক্তিই পেয়ে গেলেন, শ্রদ্ধা পেলেন না। জন্মতিথি উপলক্ষে এই মাতামাতির মধ্যে কোথাও একটা মনের জুয়াচুরি আছে, আছে নচেৎ অনুষ্ঠানে অতটা ফাঁকি থাকত না। একবার সুরেশ সমাজপতি আমাকে বলেছিলেন, "তোমাদের রবি ঠাকুর আর কী চান বলতে পার? মাথা বিকিয়ে দিয়েছি ওঁর পায়ে তবু আশা মেটে না।"

এখন দেখছি রবীন্দ্রনাথ সমাজপতির চেয়ে বুদ্ধিমান ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মাথার কেনা-বেচা চাননি, যার মাথা তার কাঁধেই থাক চেয়েছিলেন। হৃদয় থাকলে মাথা থাকতে নেই?

এখন আমাদের কর্তব্য কি? কর্তব্যটা হলো ভক্তিকে শ্রদ্ধায় পরিণত করা। জনসাধারণের মনোভাব যা লক্ষ করলাম, তাতে কর্তব্যসাধন সহজ হবে না মনে হয়। আমাদের মন এখন ফাঁকা এবং কাব্যালোচনা দিয়ে সে বিশাল ফাঁক ভরানো যাবে না। রবীন্দ্রনাথকে অপেক্ষা করতেই হবে। ইতিমধ্যে যেটা সম্ভব তাই লিখছি। রবীন্দ্রসৃষ্টির যথার্থ বিচারই হলো আমার মতে একমাত্র সাম্প্রতিক বিধান। আমাদের দেশে একাধিক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন বিশ্বভারতী, সাহিত্য-পরিষৎ, রবীন্দ্র-চক্র প্রভৃতি। তা ছাড়া, মাসিক-পত্রিকাও বেরুচ্ছে বিস্তর। অধ্যাপকের দলও কম নয়। এখন যদি রবীন্দ্র-সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ অঙ্গবিচারের ভার বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করা যায়, তবে বিচারের সুবিধা ঘটে। ন্যস্ত কাঁরা করবেন, কাজ কতটা এগুচ্ছে কাঁরা দেখবেন, কাজের বিচারকর্তা কাঁরা হবেন, এ প্রকার সমস্যা প্রাথমিক নয়। 'বিশ্বভারতী'তে কিছু কাজ চলছে দেখছি। কিন্তু কোথাও যেন প্ল্যানের অভাব আছে। একটা প্রমাণ না দিয়ে থাকতে পারছি না। ধরুন, যদি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত কি ছিল জানতে চাই, কী লিখতে চাই, তবে আমাকে তাঁর সমগ্র গ্রন্থাবলী তন্নতন্ন করে খুঁজতে হবে। মহাত্মাজীর রচনাবলী গুজরাটে এমনভাবে সম্পাদিত হচ্ছে যে যৌন-সমস্যা সম্পর্কেও তাঁর মতামত একটা ছোট, পৃথক বই-এ পাওয়া সম্ভব। প্রচারের দিক থেকে রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর সম্পাদনা ভালো নয়। অথচ প্রচারের প্রয়োজন আছে, অন্তত বিচারের জন্য। বড় বড় কাগজের সম্পাদকরাও প্ল্যান করে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচারে সাহায্য করতে সহজেই পারেন। অধ্যাপকবৃন্দের কাছে বিশেষ প্রত্যাশা করি না। সাহিত্যের ডিগ্রী সাহিত্য-বিচারের অন্তরায়। তা ছাড়া, অধ্যাপকরা বড়ই ব্যক্তিতান্ত্রিক; বিশেষত এই দেশে যেখানে সকলে মিলে রিসার্চ করার অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। রবীন্দ্র-স্মৃতি রক্ষা ভাণ্ডারে টাকা উঠছে, যদিও নিতান্ত মন্থর গতিতে। যদি কোনো কালে পঁচিশ লাখ টাকা ওঠে, তবে যেন অন্তত দশ লাখ টাকা রিসার্চ ও প্রচারের জন্য রাখা হয়। আপাতত যে প্রতিষ্ঠান, যে ব্যক্তি যতটা পারে ততটা বিচার করুক।

১৩৫৬

কবির নির্দেশ

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর জন্মতিথি উৎসবের বিপক্ষে ছিলেন; কিন্তু আমরা প্রতিবৎসরই উৎসব করছি। স্মৃতিসভাতেও তাঁর মত ছিল না; তবুও আমরা সভা ডাকি, তাতে যোগদান করি এবং বক্তৃতা ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনি। আদেশ-ভঙ্গের পাপ আমাদের হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমরা সে পাপ মোচন করি নানা উপায়ে, প্রধানত ভাবের সাহায্যে। বাঙালির দুর্দশা দেখে যখন মন বিষণ্ণ, পশ্চিমী সভ্যতার দোর্দণ্ড প্রতাপে যখন ভীত, তখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের আত্ম-সম্মান প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়। সেই বলে আমরা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করি; তাঁর কবিতা, গল্প ও সঙ্গীতের মাধুর্যে বিগলিত হই, উচ্চকণ্ঠে এবং কখনও কখনও অশুদ্ধ বাংলায়, তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করি। এই প্রকার উচ্ছ্বাস আমি বহুবার পড়েছি ও শুনেছি এবং কতদিন পড়ব আর শুনব, তাও জানি না। তাই আজ আমার মনে হচ্ছে তাঁর আদেশ-ইঙ্গিত মেনে চলাটাই বোধ হয় ভালো ছিল।

অবশ্য অনেকেই বাঙালিকে ভাবপ্রবণ জাতি বলেছেন। সংস্কৃতির দিক থেকে এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল, এবং জাতির চরিত্র বলে কোনোও গুহ্য বস্তু নেই। এও শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথের রচনা যে-কালে মূলত ভাব-প্রধান, তখন সমালোচনাও সমগোত্রের হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধারণাটিও ভ্রান্ত। অবশ্য তিনি বুদ্ধি-সর্বস্ব ছিলেন না। মানুষের অযৌক্তিক অংশ ও ব্যবহারকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন অত্যন্ত। তাই বলে যে-ব্যক্তি আজীবন স্বেচ্ছায় শ্রেষ্ঠ মূল্যের চর্চা ও সমগ্র সৃজনী-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে এলেন, তাঁকে ভাবপ্রধান বলা মোটেই চলে না। বাংলা ভাষায় ক্রিয়ালঘিষ্ঠ অপূর্ণতাকে পূর্ণ করবার প্রয়াসে, হলন্ত শব্দ ও ব্যঞ্জনবর্ণ প্রধান যুক্তাক্ষরকে শাসিত ও নিয়মাধীন করবার ও সেই সঙ্গে ভাষাকে মুক্তি দেবার সাধনায়, তাঁকে কিছু কম সংযম করতে হয়নি। সম্ভবত তাতে শাসনের রুক্ষতা কিংবা প্রবীণ প্রথার নিয়মানুবর্তিতা ছিল না, তবু কী তাকে বাধাহীন, অনিয়ন্ত্রিত ভাবসর্বস্বতা বলা যায়? আমার মতে যায় না।

যাঁরা তাঁর জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁরা প্রত্যেকেই আমার মতে সায় দেবেন। আর কিছু হোক না হোক, ষাট-সত্তর বৎসর ধরে যিনি ভোর চারটায় শয্যা ত্যাগের পর উপনিষদের মন্ত্র জপ করে এলেন, তার ধর্ম— ধৃতি, জীবনের প্রতি অঙ্গকে ধারণ করে। এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উচ্ছ্বাসবিহীনই হওয়া উচিত নয় কি? অর্থাৎ, বুদ্ধি-বিচারই রবীন্দ্র-রচনার উপযোগী পদ্ধতি, কারণ রবীন্দ্র-রচনায় ভাবজাত বিপ্লবী পরীক্ষার বহু নিদর্শন থাকলেও তার মর্মকথা

ঐতিহ্যের সংযত অগ্রস্থতি, যে সম্পর্কে উচ্ছ্বাস, হা-হুতাশ, অতিরঞ্জন, একান্ত অচল, অবান্তর। তা হলে দাঁড়ায় এই, রবীন্দ্রনাথ আমাদের অভিমান নয়, তিনি কেবলমাত্র সম্মানের পাত্র নন, বর্তমান বাঙালি, ভারতবাসী, এশিয়াবাসী, এমন কী মানবের পরিমাণ, মানদণ্ড।

আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। বাঙালির আজ কী অবস্থা বুঝুন। আমি থাকি বাংলার বাইরে, তাই আমাদের অবস্থাটি একটু স্পষ্ট হয়েই দেখা দিচ্ছে আমার চোখে। বাঙালির গর্ব ছিল সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা এবং কল্পনার আশীর্বাদ, যে জন্য তার ন্যায়, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান ধন্য হয়েছিল। দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আছে একটি সত্য কথা বলার। আজ বাংলার তার নিজের ক্ষেত্রেই কোনো স্থান নেই, না আছে সাহিত্য, না আছে সঙ্গীত। বোধ হয় চিত্রকলায় এখনও আছে, তাও ক'জন বাঙালি ছবি কেনেন বা বোঝেন? অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাই। আজ যদি একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে পশ্চিম বাংলা ধ্বংস পায়, তবে এ দেশে ঐ রিলিভ-কেন্দ্র খোলা ছাড়া আর কিছু হবে না— সংস্কৃতির ক্ষতি হলো বলে কেউ সত্যিকারের এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না। হয়তো মন্তব্যটি রূঢ় শোনাচ্ছে, কিন্তু নাচার। এর কারণ কি? অনেকে বলেন, কারণ পলিটিক্স, পলিটিক্যাল হিংসা। জানি না কতটা সত্য। অন্য প্রদেশ জেগেছে, অতএব বাংলার একাধিপত্য তো যাবেই। হিংসা অবশ্য কিছু আছে; কিন্তু কিছু থাকলেই তো লোকের চোখ টাটায়। কিন্তু হিংসার কিছুই যে নেই আজ, কিংবা যা আছে তা যৎসামান্য, যেটা দু'দিন পরে লোপ পাবে। অবস্থাটি অত্যন্ত শোচনীয় নিশ্চয়ই। সেজন্য কী অভিমান-ভরে বসে থাকবো, না হা-হুতাশ করবো, না অন্য প্রাদেশিক সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করবো? আমার মতে সদুপায় রবীন্দ্রনাথের রচনাতে আছে। অর্থাৎ, বাঙালিকে বাঁচতে হলে রবীন্দ্রনাথের পথে চলাই ভালো। বলা বাহুল্য, এই প্রকার যুক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষেরও ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট করা যায়, বিশ্বজনেরও। সর্বত্রই আজ দুর্দশা। বিশ্বের কথা আজ তুলবো না, দেশের কথাই বলবো।

রবীন্দ্র-নির্দিষ্ট দু-একটি পথের উল্লেখ করবো আজ। প্রথমেই মনে ওঠে স্বাবলম্বন। কী রাজনীতি, কী অর্থনীতি, ভাষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, স্বাস্থ্য, সাজসজ্জা, গৃহের উপকরণ, জাতীয় জীবনের প্রতিটি বিষয়ে তিনি আপন-আপন চেষ্টাকেই নবজাগরণের মূলমন্ত্র বলেছেন। রাজনীতিতে তখন ভিক্ষাবৃত্তি চলছিল, তিনি সে-বৃত্তিকে ত্যাগ করতে বললেন এবং এই কারণেই, তাঁর সঙ্গে বালগঙ্গাধর তিলক এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ উগ্রপন্থীদের হৃদয়ের মিল হয়। তখনকার সরকার রবীন্দ্রনাথকে 'এক্স্‌ট্রিমিস্ট' ভাবতেন এবং

তাঁর পিছনে গুপ্তচর রাখতেন। কিন্তু এই আত্মসন্ধান, আত্মসাধনা বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের নামান্তর ছিল না। সমবেত সামাজিক প্রয়াসই তাঁর উপায় ছিল। সমাজ অর্থে তিনি হিন্দু-মুসলমান বুঝতেন না। প্রথমত গ্রামের সমাজই তাঁর মতে স্ব-অধীনতার কেন্দ্র হওয়ার উপযুক্ত ছিল। কিন্তু গ্রাম তখন দারিদ্র্যে ও রোগে মুমূর্ষু। তাঁর বিধান হলো, সমবায় এবং কুটিরশিল্প। তাঁর কল্পিত সমবায় কেবল 'ক্রেডিট সোসাইটি' নয়, একত্রে কনজ্যুমার্স ও প্রোডিউসার্স সোসাইটি। অধিকন্তু গ্রাম্য সমবায়ের হাতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এমন কী আমোদ-প্রমোদেরও ভার থাকবে। আজকাল এই সর্বাঙ্গ-সমবায়কে **'Multi-purpose Society'** বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন, "একে আমি চিনি। কিন্তু purpose-ই বা কেন, multi-ই বা কেন? Purpose তো জীবনেরই অভিব্যক্তি এবং জীবন তো সমগ্র, বহুর সমষ্টি নয়। অতএব এগিয়ে চল, কেবল ব্যাপারটা যান্ত্রিক করে তুলো না।" রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ উন্নতিকেই জাতীয় উন্নতির চরম অভিব্যক্তি ভাবতেন না। অবশ্য গ্রাম ছিল ভিত্তি, মূল, শিকড়। কিন্তু গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে তাঁর কোনোও প্রকার অন্ধ মোহ ছিল না। গ্রামের কূপমণ্ডুকতা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, নচেৎ ব্রহ্মচর্য আশ্রমকে বিশ্বভারতীতে পরিণত করতেন না।

আজ আমাদের জীবনে একটি ভীষণ শূন্যতা এসেছে। সেটা আমরা ভরে দিচ্ছি অনিশ্চিত ব্যর্থতা-বোধে। কোনো দেশে স্বাধীনতা পাওয়ার পর এত অল্পদিনের মধ্যে অমনতর ঘটনা ঘটেনি। শূন্যতা এসেছে নানা কারণে। প্রধান কারণ আমার মতে এই, আমাদের নিজেদের ভিত্তি নিতান্ত কাঁচা, শিথিল। জাতির ভিত্তি সর্বদাই জনসাধারণের সমবেত প্রয়াস। অন্য দেশে যাই হোক, ভারতবর্ষের জনগণ গ্রামবাসী, অর্থাৎ ভারতবাসীর জীবনধারা গ্রাম্য উপকরণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, ভাবধারাও তাই। ইংরেজ-আমলে এই উপকরণগুলি নষ্ট হয়েছে। তাই প্রতিটি মানুষ যূথভ্রষ্ট, একলা, নিরালম্ব। তার অবলম্বন চাই। এতদিন ছিল এক নৈর্ব্যক্তিক শাসন-পদ্ধতি। এখনও শাসন-পদ্ধতি চলছে, তবে সেটা স্বজাতি-চালিত বলে নৈর্ব্যক্তিক থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। তাই সেটি হয় জওহরলাল, না হয় অন্য কোনো ব্যক্তির কার্যকলাপ হতে বাধ্য। অথচ পদ্ধতি না হলে চলে না। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কর্তব্যের তালিকা বেড়েছে, বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র-পদ্ধতির সঙ্গে তাকে তাল ফেলে চলতে হচ্ছে। আমাদের শাসন-পদ্ধতি হয়ে উঠল রাষ্ট্র। অথচ রাষ্ট্র চালাচ্ছেন আমাদেরই স্বজাতীয় ব্যক্তিগোষ্ঠী। একধারে অসহায় বুভুক্ষু প্রতিটি মানুষ, অন্যধারে রাষ্ট্র ও তার পরিচালক। তাই এই প্রকাণ্ড শূন্যতা। মধ্যে কিছু

নেই। তাই প্রতি নিরালম্ব ব্যক্তি অবলম্বনের ব্যক্তিসম্পর্কহীনতা লক্ষ করে হতাশ হয় এবং পরিচালকবৃন্দকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে। এই শূন্যতা আসত না, যদি গ্রাম্য সমবায় আত্মনির্ভরশীল হতো, যা রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই কামনা করেছিলেন। অতএব যদি রাষ্ট্রের প্রতি অশ্রদ্ধা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় আত্মবিলাস না হয়, যদি আমরা সত্যই দেশের কল্যাণ চাই, তবে রবীন্দ্রনাথের এই মূল কথাটি শোনবার এবং শুনে কাজ করবার সময় এসেছে। এখনও দেশ মরে যায়নি; তাকে বাঁচানো যায়, সমবেত প্রয়াসের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ কেবল উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে তাঁর জমিদারিতে তিনি অসংখ্য সমবায় সমিতি, স্বাস্থ্য সমিতি, কুটিরশিল্প সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন গ্রামবাসীদের নিজেদেরই উদ্যোগে।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নির্দেশ আরো মৌলিক, আরো ব্যাপক, আরো জাতীয় জীবনের ধারণক্ষম। অবাঙালিরা প্রধানত তাঁকে দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তার মহাকবিই ভেবে থাকেন। আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ তাঁর স্বদেশী গান, প্রবন্ধ ও বক্তৃতাকে উচ্চ স্থান দিয়ে থাকি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই ধারণাটি অসম্পূর্ণ। আরেকটি কথা, যাঁরা তাঁর স্বদেশপ্রেমকে তাঁর প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ মনে করেন না, তাঁরা তাঁর বহুমুখী প্রতিভায় মুহ্যমান হন। অবশ্য হবারই কথা। দু' একজন ছাড়া সর্বতোমুখীনতায় তাঁর সমকক্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। তবু সেইটাই তাঁর ধর্ম নয়। একই বহু হয়। সেই ঐক্য আমাদের স্বীকার করতে হবে। একই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ-ব্যাখ্যাকার, কবি, চিত্রকর, গল্প-নাটক-উপন্যাস-প্রবন্ধ-লেখক, এবং কর্মী। একই ব্যক্তি একাধারে দেশপ্রেমিক, দেশসেবক এবং বিশ্ববোধে প্রবুদ্ধ। একই ব্যক্তি বিদেশের ও স্বদেশের গুণগ্রাহী। একই ব্যক্তি সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রবর্তক। একই ব্যক্তি বিদেশী রাষ্ট্রের বিপক্ষে মাথা তোলেন, আবার দেশবাসীকে কটুকথা শোনাতে কসুর করেন না।

একই মানুষ— এইটাই প্রধান কথা। অর্থাৎ তাঁর ধর্ম সর্বাঙ্গীণ; যেমন ফুলের, গাছের ফলের, মানুষের আত্মার। ফুল যখন ফোটে, তখন একটির পর অন্য পাপড়িটি খোলে না। অনেকেই ভোরবেলায় পদ্ম ফোটা দেখেছেন, কমল একই মুহূর্তে বিকশিত হয়। মানুষ যখন ধর্ম-পরিবর্তন করে, তখন আগে বেশভূষা বদলে, তারপর ধর্মপুস্তক অধ্যয়ন করে, তারপর কল্‌মা পড়ে কিংবা ব্যাপ্‌টাইজ্‌ড হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বী হয় না। একই সঙ্গে সবটা বদলে যায়। তারপর তাকে আর চেনা যায় না। জাতীয় জীবনেও তাই: সেটি অর্গ্যানিকই বলুন আর স্পিরিচুয়ালই বলুন, তার পরিবর্তন সর্বাঙ্গীণ। অর্থাৎ, আগে তো ইংরেজ যাক, তারপর যা হয় দেখা যাবে। তারপর গান, ছবি, অভিনয়, সাহিত্য, চারুশিল্প

এবং শিক্ষা— এই পদ্ধতিতে হয়তো ইংরেজ তাড়ানো যায়, কিন্তু তাড়াবার পর আর শ্বাস থাকে না, দম ফুরিয়ে যায়। ফলে আমাদের আজ দম ফুরিয়ে গেছে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ফিলজফিতে এই মস্ত গলদ ছিল যে, আমরা উন্নতিকে একটি অবিচ্ছিন্ন সরল রেখায় যাত্রা ভেবেছিলাম এবং সেই মতো কার্য করেছিলাম। মনে হয়েছিল, স্বাধীনতা একটা দূরের রেল-স্টেশন, যেখানে পৌঁছতে হলে দু'টি সমান্তরাল লাইনের উপর গাড়িতে চড়ে, একটির পর অন্য একটি স্টেশন পার হতে হবে। অন্য পথে চললেই দুর্ঘটনা ঘটবে। এর মধ্যে পিউরিটান মনোভাব ছিল, কিছু কাজও হয়েছে। কিন্তু ক্ষতিও হয়েছে ভীষণ। সমগ্রতাবোধ আমরা হারিয়েছি। সংস্কৃতির সংস্কারে আমরা পিছনে পড়ে গেলাম। তাই ছুটতে যাচ্ছে রাষ্ট্র; আর ব্যক্তিগতভাবে আমরা হাঁপিয়ে বসে আছি রাস্তার ধারে।

আজ সংস্কৃতি সম্পর্কে রাষ্ট্রের প্রয়াস ও আমাদের প্রয়াসের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত বেশি। বাংলা দেশের কথাই প্রধানত আমার মনে আসছে। অন্য দেশেও একই পরিস্থিতি। তবে কী না বাংলার গৌরব ছিল এককালে সংস্কৃতি সম্পর্কে। সে যাইহোক— উপায় কি? উপায় রবীন্দ্রনাথের বহুমুখীনতার মধ্যেই আছে। অর্থাৎ সমাজ-মনুষ্যত্বের ঐক্য। পলিটিক্স আর কালচারের খিচুরিভোগে আমার রুচি নেই। তবে কে অস্বীকার করবে যে, পলিটিক্স আর কালচার দুইই ঐ মানবিক সর্বাঙ্গীণতার বিবিধ রূপমাত্র। এইটাই আমার ধারণায় রবীন্দ্র-জীবনের মূল ধর্ম। তাকে গ্রহণ করবার সময় এসেছে। নচেৎ যা হচ্ছে তাই হতে থাকবে। তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের সাহিত্যের সঙ্গীতের চিন্তাধারার মানদণ্ড ভেঙে গেছে, কারণ প্রতিটি পৃথক করে ভাবছি, জীবনের সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন করারই দরুন। এটা মোটেই স্বাধীন জাতির পক্ষে সম্মানের নয়।

বড় পরিসর ছেড়ে দিয়ে ছোট গণ্ডিতে আসা যাক। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ, আমার কাছে বুনিয়াদি শিক্ষার চেয়েও বেশি মূল্যবান। আমি তাও ছেড়ে দিচ্ছি। আমি মাত্র গবেষণার উল্লেখ করবো, তাও একটি বিষয়ে, ইতিহাসে। কেউ কেউ আশ্চর্য হবেন কিনা জানি না, তবে একটু মনোযোগ দিয়ে তাঁর প্রবন্ধাদি পড়লে তাঁদেরও আমার মতো বিশ্বাস হবে যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল এবং সে বক্তব্য মূল্যবান। অধিকন্তু তাঁর নির্দেশ আমাদের ঐতিহাসিকরা (মাত্র একজন ছাড়া) কেউই গ্রহণ করেননি। তাঁরা খুবই ভালো কাজ করেছেন, অনেক পুঁথি-নজির-ফলক সংগ্রহ করেছেন, তাঁদের বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের সাহায্যে অনেক তথ্য ও যৎসামান্য তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত আমাদের সামনে তাঁরা ধরে দিয়েছেন। কিন্তু সত্য কথা বলুন তো, আপনারা এই সব

বৈজ্ঞানিক ইতিহাস পড়ে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকথা কী মূলধারা অবগত হয়েছেন কি? তার সাহায্যে ভারতীয় সভ্যতার কতটা পুনর্নির্মাণ সম্ভব হয়েছে? যৎ-সামান্য। আজ কোন্ ইতিহাসের পাঠ্য বই খুললে হতাশা ও গ্লানির অবসান হয়? কারণ নিশ্চয়ই ঐতিহাসিকের বিদ্যার অভাব নয়। কারণ ঐতিহাসিক পদ্ধতির আংশিকতায়। বহু রচনায় বিজ্ঞানের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চিহ্ন আছে; গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়। কিন্তু পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি 'মেকানিস্টিক্' ছিলেন না। তাই তাঁর ভারতবর্ষের ইতিহাস-ব্যাখ্যা অত গভীর ছিল। মাত্র আরণ্য-সভ্যতা (**forest civilisation**) নাম দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। অনেক দিন আগে চৈতন্য লাইব্রেরিতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলে যান, আমাদের ইতিহাসের রূঢ়-সামগ্রী (**raw materials**) হলো জনগণের সংস্কার, আচার-ব্যবহার, পুরাণ, **myths** প্রভৃতি। ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অনেক বৎসর পূর্বে 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার সূচনা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। সূচনাটি উদ্ধৃত হয়েছে অনেক জায়গায়। আমি তাই থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।...."বাঙলার প্রত্যেক জেলা যদি স্থানীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক জমিদার যদি তাহার সহায়তা করেন এবং বাঙলার রাজ-বংশের পুরাতন দপ্তরে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, 'ঐতিহাসিক চিত্র' তাহার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে, তবেই ঐ ত্রৈমাসিক পত্র সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে।" এই ধরনের কাজ কিছু হয়েছে ও হচ্ছে নিশ্চয়ই। যে কাজ এখনও হয়নি সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, "সমস্ত জনশ্রুতি— লিখিত এবং, অলিখিত, তুচ্ছ এবং মহৎ, সত্য এবং মিথ্যা এই পত্রভাণ্ডারে সংগ্রহ হইতে থাকিবে। যাহা তথ্য হিসাবে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত, যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাসরূপে প্রচলিত, তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। কারণ ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস।" এই শেষ মন্তব্যটি নিতান্ত মূল্যবান। মানবমন, বিশ্বাস, সত্য-মিথ্যা, তুচ্ছ-মহৎ জনশ্রুতির অর্থ হচ্ছে জনগণের মন, বিশ্বাস, শ্রুতি। রবীন্দ্র-কল্পিত ইতিহাসের মালমশলা **ethnology**, কেবল **archaeology**, কিংবা **state-record** নয়। শিলালিপি, নজিরপত্র তো কোনো আদান-প্রদানের চরম অবস্থা, বোঝাপড়ার শেষ কথা। বিশ্বাস ও জনশ্রুতি হলো চলিষ্ণু পদার্থ, সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত। কোনো এক নায়কের বা শ্রেণীর একচেটিয়া ধন নয়। কেবল তাই নয়, এই সব বিশ্বাস অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং প্রায় সব মানুষই বুদ্ধির বহির্ভূত অনেক কর্মই করেন। সে-সব বাদ দিয়ে **rational** ইতিহাস লেখা হতে পারে

কিন্তু বুদ্ধিমান ও নির্বোধ মানুষ,অর্থাৎ জনগণের ইতিহাস লেখা যায় না। তার চেয়ে আরো বড় কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমরা আশা করিতেছি, 'ঐতিহাসিক চিত্র' যে শ্রমে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহা বন্ধ্যা (অর্থাৎ unproductive) হইবে না। কেবল কৌতূহল পরিতৃপ্তিতেই তাহার অবসান নহে। তাহা দেশকে যাহা দান করিবে তাহার চতুর্গুণ প্রতিদান দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে। একটি বীজ রোপণ করিয়া তাহা হইতে সহস্র শস্য লাভ করিতে থাকিবে।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে ইতিহাস পূর্বোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলেই ফলপ্রসূ হবে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে— আমাদের ইতিহাস কৌতূহল পরিতৃপ্তি কেন, দেশাত্ম-পরিতৃপ্তিসাধন নিশ্চয়ই করেছে। কিন্তু সহস্র শস্য লাভ করেছে কি? এখানেও যে ঘাটতি, তা একই কারণে। পদ্ধতির দোষে, জনগণকে বাদ দেওয়ার ফলে।

আমার বক্তব্য সামান্য ও সহজ। রবীন্দ্রনাথের স্মরণে কিংবা বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে উচ্ছ্বাস করার অর্থ, তাঁর যথার্থ নির্দেশকে অগ্রাহ্য করা। তাঁর নির্দেশ একাধিক; আমি দু' তিনটির উল্লেখ করলাম। আরো অনেক আছে। এই যুগে, এই চিত্তবিক্ষোভে, এই হতাশায়, এই শূন্যতাবোধে সেই সব নির্দেশগুলি আমাদের সহায়ক হবে নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ কর্মনিষ্ঠার দিক ছিল। আত্মনির্ভরতার ওপর বিশ্বাস ছিল প্রগাঢ়, আর ছিল জনগণকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা। এক এক সময় তাই মনে হয়, এই আশ্চর্য সহজ ক্ষমতার জন্যই তাঁর মানসিক সৃষ্টি সুচারুরূপে বিধৃত হতে পেরেছিল।

রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আলোচনার প্রারম্ভেই আমার দু'টি গল্প মনে পড়ে। সেবার দার্জিলিঙ-এ চিত্তরঞ্জন ছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় তিনি ক্যালকাটা রোডে বেড়াতেন, সঙ্গে অনেকে থাকতেন, নানা রকমের গল্প, সলা-পরামর্শ চলত। একদিন আমিও ছিলাম। সেদিন কথা উঠল রবীন্দ্রনাথের একটি রাজনৈতিক বক্তৃতা নিয়ে। সকলেই প্রশংসা করলেন, চিত্তরঞ্জনেরও ভালো লেগে-ছিল। খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর চিত্তরঞ্জন বললেন, "কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি।" রাত্রে যখন হোটেলে ফিরলাম ম্যানেজার বাবু এসে বললেন, স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত সাহেবের থাকবার কষ্ট হচ্ছে অন্যত্র, আমার ঘরে যদি স্থান হয় তবে খুব সুবিধা হয়। ভুপেনবাবু বহু বৎসর বিদেশবাসের পর সদ্য দেশে ফিরেছেন, মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, 'যুগান্তরে'র ভুপেন দত্ত, বিবেকানন্দের ভাই, সানন্দে সম্মতি দিলাম। ভুপেনবাবুর সঙ্গে ভাব শীঘ্রই জমে গেল, রোজই একত্রে ঘুরতাম, খাবার পর গল্প চলত, আমি রাত্রে ঘুমের ওষুধ খেতাম, তিনি ঘোড়-তোলা জুতো পরে হাঁড়ির মতন পাইপ মুখে পুরে, জার্মান-মিশ্রিত বাংলা ভাষায় বিশ্বের তত্ত্ব আলোচনা করতেন। মনে পড়ে, এক গভীর রাতে তাঁর বিছানা থেকে একটা শব্দ উত্থিত হলো। নিজে বুঝিয়ে দিলেন, বাংলা গান, রবীন্দ্রনাথেরই, 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া····রী'। গান থামাবার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "রবিবাবু আর এই ধরনের স্বদেশী গান-টান লেখেন?" উত্তর দিলাম "ঝোঁক একটু বদলেছে সন্দেহ হয়। কিন্তু ওটা কি স্বদেশী গান?" একটু মৃদু হেসে বললেন, "আগে আমিও ভাবতাম, না— কিন্তু একদিন রাত্রে বার্লিনে— হঠাৎ গানটার noumenon প্রকট হলো।" খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে গানটিকে phenomenon-এ পরিণত করতে ধরে বসলাম। লম্বা ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার সব কথা মনে নেই, তবে তাৎপর্যটা এই: "তরণী" ধরুন প্রথমে, 'তরণী' হলো ship of state— 'অমল ধবল পাল' হলো গিয়ে আমাদের Political consciousness, feudal যুগেরই পাল-তোলা জাহাজ; তবেই, 'মন্দ মধুর হাওয়া', কী না moderate, liberal movement এই দাঁড়াল; 'দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু'····খুব খাঁটি কথা— কে বুঝবে বলুন যে কার্ল মার্কস্ না পড়েছে।" আমি বললাম, "কবিতার জন্য কার্ল মার্কসের প্রয়োজন আছে কি?" "কে বললে নেই। পলিটিক্যাল কবিতার জন্য কার্ল মার্কস্ না হলে চলেই না। আপনারা একটা মস্ত ভুল করেন, রবীন্দ্রনাথ প্রধানত একজন পলিটিক্যাল জীব, যিনি কবিতার মারফত আমাদেরই কথাগুলি বেশ গুছিয়ে সাবধানে লেখেন। একটু যদি কার্ল মার্কস্ পড়তেন

মনোযোগ দিয়ে তবে রক্ষা ছিল না।" "তা তো হলো, কিন্তু 'হাওয়া....রী' বললেন কেন?" "রী-টা হলো সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের টান, নববিধানের রে।" সে রাত্রে ভেবেছিলাম, কার কথা সত্য— চিত্তরঞ্জনের, না ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের। এই সেদিন 'আরোগ্য' নামে কবিতার বইটা এল। চিত্তরঞ্জনই ঠিক বলেছিলেন, নচেৎ রোগ-শয্যাতেও এত ভালো কবিতা বেরোয়! আবার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে শান্তি-নিকেতনে জন্মতিথি উৎসবে তিনি যে বাণী দিয়েছেন তাও পড়লাম....তবে কি ভূপেনবাবুই ঠিক বুঝেছেন। আজ এই সংশয়ের সমাধান করতে চেষ্টা করবো। ভেবে দেখলে পলিটিক্স ও কবিতার দ্বন্দ্ব সমাধানের ওপর ভারতের সংস্কৃতি নির্ভর করছে অনেকটা।

দ্বন্দ্ব কীভাবে ওঠে বিশ্লেষণ করা যাক। কবিত্ব যদি জীবন-ছাড়া, সমাজ-ছাড়া একটা পৃথক শক্তি হয়, যদি জীবতাত্ত্বিকের ব্যাখ্যানুসারে সেটা জীবনধারণের পর যতটুকু বাকি থাকে, অর্থাৎ উদ্বৃত্তাংশের খেলা হয়, তবে এই শক্তির প্রকাশের জন্য জীবনীশক্তির মূলধনে টান পড়ে— এবং তখনই ভাগাভাগির কথা ওঠে। তার ওপর যদি জীবনটাকে স্রোতের জল না ভেবে কলসীর জল ভাবি, তখন সঞ্চয় হয়ে ওঠে আমাদের প্রধান লক্ষ্য, কৃপণের মতন তাকে বজায় রাখতে চেষ্টা করি। আমি জানি এই ধরনের মতামত অনেকেই পোষণ করেন। কারণ সোজা, পাটিগণিতটাই সোজা মানুষের পক্ষে, তার ওপর আমরা দায়ভাগের বাঙালি। আবার যদি রাজনীতি অর্থে দলাদলি, পার্টি চালানো হয়, যদি বিরুদ্ধাচারণটাই রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কারের প্রথম ও শেষ কথা হয়, তবে কাজটা যে-কোনো কবির পক্ষে শক্ত। কিন্তু রাজনীতির এই অর্থটাও সোজা, কারণ আমরা বহুকাল ধরে পরাধীন, কারণ আমরা সমাজে শাসিতই হয়ে এসেছি, কারণ আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসটা অন্তর্শক্তির স্ফুরণ নয়, শাসন-কর্তার বিরুদ্ধাচরণ; কারণ আমাদের মনে ইংরাজী বুকনি, পলিটিক্যাল চিন্তা ও আচার-ব্যবহারের ছাপ পড়েছে; কারণ আমরা বাঙালিরা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে কোন্দলই করি। ব্যাপারটা এই, আমাদের মানসিক ও কর্মপদ্ধতির মূল যুক্তিটা হলো— হয় এটা, না হয় একেবারেই এটা নয়, অর্থাৎ যান্ত্রিক বনাম-মূলক। বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের জন্মস্থানে এই বনাম-কীর্তন একটু অদ্ভুত লাগে। প্রকৃত পক্ষে এটা অদ্ভুত নয়— কারণ, মনে মনে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজের ভক্ত। রবীন্দ্রনাথ এই যান্ত্রিকতার প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন, আর আমরা, যাঁরা তিনি কবি না পলিটিশিয়ান নিয়ে সন্দেহ পোষণ করি, এখনও তাতে অভিভূত আছি। এইগুলো হলো কালচার ও পলিটিক্সের মধ্যেকার বিরোধের হেতু। অপর পক্ষে, কবিও মানুষ, মানুষ সামাজিক ও রাষ্ট্রীক জীব, তার স্ফুরণের জন্য চলিষ্ণু সমাজ

ও স্বাধীন রাষ্ট্রের আবশ্যক— অন্যদিকে, স্বাধীন মানুষই শক্তি থাকলে কবি হতে পারে, কবিতা উপভোগ করতে পারে— এই প্রকার অর্গ্যানিক ধারণা সত্যই কঠিন এবং ইংরেজদ্রোহিতার চিহ্ন একপ্রকারের। কিন্তু ধারণাটি সত্য, সাধারণ-ভাবে, অতএব রবীন্দ্রনাথের মতামতের বিচারেও। আমার একান্ত বিশ্বাস যে, রবীন্দ্র-কল্পিত ও আচরিত কবির ধর্ম ঐ প্রকারের আদিম প্রতিজ্ঞারই উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামতের সোজা কথা হলো এই যে, পরাধীন দেশে ও আবদ্ধ সমাজে জনগণের অন্তর্নিহিত সৃষ্টির চরম বিকাশ, অর্থাৎ কাব্য-রচনা, এমন কী কাব্যোপভোগও একপ্রকার অসম্ভব। আপনারা যদি বলেন যে, তিনি এমন কথা কোথাও খোলাখুলি লেখেননি, তবে আমি উত্তর দেব যে, তিনি রাজনীতির পাঠ্য-পুস্তক লেখেননি, নিশ্চয়, কিন্তু তিনি ঠিক এই কথাই তাঁর প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। ব্যাপারটা বিশদ করে বলছি।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি বিদেশী ধরতাই বুলিগুলো মন থেকে প্রথমেই তাড়িয়ে দিন। যত ভুলের মূল ঐখানে, বনাম-যুক্তিরও একটা গলদ ঐ। ইংলণ্ডে ব্যক্তিত্ববাদ জন্মায় একটি আবহাওয়ায়— নিউটনী মেকানিক্‌সের, এবং দু'টি প্রয়োজনের সংযোগে। বেন্‌থাম, যিনি ব্যক্তিত্ববাদের জন্মদাতা— তাঁর লেখা পড়ে দেখলেই মনে হয় যেন তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে নিউটনের তিনটি নিয়মের প্রয়োগ করতেই ব্যগ্র। এধারে, ইংরেজ রাজা, পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা না যায় দেখতে গিয়ে নিজের একটা দল খাড়া করলেন— নাম তার কিংস্ পার্টি। পার্লা-মেণ্ট সেই দল ভাঙতে চেষ্টা করল, অবশ্য রক্তকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না করে। ইতি-মধ্যে ইংরেজ বণিক পৃথিবীময় ব্যবসা ফেঁদে বসেছে, অথচ আইন-কানুনের বাধায় মুনাফায় টান পড়ছে। এরা ধীরে ধীরে পার্লামেন্টের সভ্য হয়ে চেয়ে বসল বাধাগুলো তুলে দেওয়া হোক। অতএব দ্বন্দ্ব বাধল স্পষ্ট দু'টি দলে; একধারে রাজার দল ও যারা ডিউটি বসিয়ে তহবিল ভরতে ও জমিদারি স্বার্থ বজায় রাখতে চায়, এবং অন্যধারে পার্লামেন্টের নতুন ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত সভ্য যারা বললে— অবাধ বাণিজ্যে ইংরেজ আরো ধনী হবে। এই হলো ইংরেজ পলিটিক্‌সের 'বনামে'র প্রথম দফা। শুধু এইখানে ক্ষান্ত হলো না ব্যাপারটা। বণিকরা সেই সঙ্গে উপনিবেশের ও অন্যান্য অনুন্নত দেশের বাজার অধিকার করে যাচ্ছিল। সেই বাজারকে বশে আনবার স্বাধীনতাকে তখন ব্যক্তিত্ববাদ বলা হলো না— তখন বড় বেশি কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাত না। কিন্তু, ক্রমে ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা, জাপান বাজারে নেমে পড়ল, তখন তাদের ব্যক্তিত্ববাদ ইংরেজের অনুকরণে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার স্বার্থের বিপক্ষে। মুনাফাবৃদ্ধির অবাধ

স্বাধীনতাই হলো উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাথমিক প্রয়োজন। এরই নাম ইংরেজী লিবারেলিজম্।

ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ও তাঁর যুবা বয়সে যে আন্দোলন চলছিল সেটা হলো নকল লিবারেলিজম্। বই পড়ে যে মতবাদ জন্মায় কিংবা যে আন্দোলন চালানো সম্ভব তার দাম কম। অনেকে বলেন যে, আমরা সে সময় অনেক কিছু পড়ে ফেলি— বার্ক, মিল, বেন্থাম, কোঁৎ, যাদের চিন্তাধারার প্রসার কেরানি তৈরি করার জন্য নিয়মমাত্র-শিক্ষার বহির্ভূত ছিল। এক কথায় এঁদের মতে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছিল। আমার কিন্তু সন্দেহ আছে। জমি তৈরি থাকলেই গাছপালা সতেজ হয়, নচেৎ কাচের ঘরের ফুলের চারা দেখতে মজার, কিন্তু উপকারে লাগে না। বাস্তবিকই আমাদের ঐ সময়কার আন্দোলন একটু অবাস্তবই ছিল। কী করে বাস্তব হবে? ভারতবর্ষে কিংস্ পার্টি কোথায়? অবশ্য, এক হিসাবে লাট সাহেব থেকে ভিখিরীদেরই খাতির হয়। কিন্তু এইখানে দু'টি জিনিস স্মরণ রাখা উচিত। ১৯০৫ সালের পর থেকে দেশে যে extremism শুরু হয়, তার এক মুখ ছিল ধ্বংসের দিকে, অন্য মুখ ছিল গোঁড়ামির দিকে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ ও হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ববাদ কোনোটাই তাঁর সমাজ-ধর্মের অনুকূল ছিল না। রবীন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করেন আন্দোলনের মোড় ঘোরাতে, 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' থেকে 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত বিস্তর রচনায় তার প্রমাণ পাবেন। যেটার প্রমাণ সহজে মিলবে না সেটা তাঁর কর্মের। কিন্তু যাঁরা তাঁর কর্মজীবন লক্ষ করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, শান্তিনিকেতনে বসবাস, জমিদারিতে সমবায় সমিতি, পাঠশালা হাসপাতাল খোলা; পুকুর কাটানো গাছ বসানো, পল্লীসংস্কার, শ্রীনিকেতন স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্য, National Council of Education-এ যোগদান— তাঁর প্রত্যেকটি কাজের একটি গূঢ় অর্থ ছিল। সেটি হলো এই ভিক্ষার ঝুলি ফেলে দেশ যেন নিজের পায়ে দাঁড়ায়, জনগণের সমবেত শক্তি যেন জাগ্রত হয়, মিথ্যা ভান ত্যাগ করে কর্মীরা যেন প্রকৃত মাটির মানুষ হয়। রবীন্দ্রনাথ দেশকে জানতেন, সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো মোহ ছিল না, যেমন শরৎচন্দ্রেরও ছিল না। কিন্তু তিনি কখনও হতাশ হননি। তা ছাড়া কী জানি কেন, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে বরাবরই বিশ্বাসী। তিনি বলেছেন যে, এই ভূখণ্ডে নানা জাত এসে বসবাস করেছে, মিলেজুলে একটা সভ্যতাও খাড়া করেছে, তার ভালো খানিকটা, মন্দ খানিকটা, ফলে সেই সঙ্গে সে সভ্যতার একটা বিশেষ রূপও ফুটেছে, যে-রূপ গ্রামের সমবেত জীবনে, জীবনের ত্যাগে ও আধ্যাত্মবোধের প্রাধান্যে ধরা পড়ে। আজ সে-রূপ নেই অবশ্য, কিন্তু নতুনজীবন এলে সে-রূপে জলুস খুলবে। রবীন্দ্রনাথ সে প্রক্রি-

য়ার মানসিক সাধনারও ইঙ্গিত দিয়েছেন— বিজ্ঞান ও চিত্তশুদ্ধি। চরকা চালানো ছাড়া প্রক্রিয়ার অধুনা প্রচারের অন্য সব অঙ্গেরই নির্দেশ আছে রবীন্দ্রনাথের রচনায় ও কর্মে। তাই আবার বলি, রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব ইংরেজের পলিটিক্যাল ফিলজফির কোটরে ঢোকে না। সেখানে রাষ্ট্র আছে, তাই স্বাধীনতার অর্থ হলো ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি স্বদেশী সমাজের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে, তাঁর সমাজতত্ত্ব নিতান্তই অর্গ্যানিক— অধিকারসর্বস্ব নয়, ত্যাগধর্মী। এই হিসাবে তিনি বহু স্বদেশী নেতার চেয়ে স্বদেশী— কারণ আমাদের সমাজটাই ঐ ধরনের— অতএব, তিনি ঢের বেশি রিয়ালিস্টিক। লোকে তাঁকে যখন আদর্শবাদী বলে তখন তারা আইডিয়ালিস্ট কথাটির অনুবাদই করে, তাঁর সম্বন্ধে সত্য ধারণার প্রমাণ দেয় না।

কিন্তু ভারতবর্ষে সামাজিকতার প্রাধান্য থাকলে কী হয়! ভাগ্যচক্রের ঘোরে সে এসে পড়ল এমন একটা প্রাঙ্গণে যেখানে ন্যাশনালিজমের নামে রাষ্ট্রদৈত্যের পূজা অহরহ চলছে। আমি আপনাদের রবীন্দ্রনাথের Nationalism নামে বইখানি আবার পড়তে অনুরোধ করছি। ফ্যাসিজমের জন্ম-তারিখের বহু পূর্বে লেখা। যাকে totalitarianism বলা হয়, তারই পূর্বাভাষ, statism-এরই বিপক্ষে প্রতিবাদ এই বইখানিতে পাবেন। অবশ্য ইকনমিক ব্যাখ্যা নেই তাতে, কিন্তু তাতে প্রতিবাদের তীব্রতা কমেনি তিল মাত্র। বইখানি বেশি জনপ্রিয় হয়নি, দেশোয়ালিরা ভাবলে তিনি দেশদ্রোহিতা করেছেন, এবং বিদেশীরা ভেতরে ভেতরে ভীষণ চটে বাইরে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, স্বপ্নবিলাস। এখন তাঁরা বুঝছেন স্বপ্নবিলাস কী আর কিছু। সে যাই হোক— রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এ দেশে রাষ্ট্রসর্বস্বতার বিরুদ্ধে মাথা তোলেন, এটা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। এই সেদিনও যে সাম্রাজ্যবাদের কুফল দেখালেন তারও সংযোগ ঐ statism-এর সম্বন্ধে প্রতিবাদের সঙ্গে। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোড়ায় রয়েছে ঐ রাষ্ট্রবাদ— সেটি কোনো একটি বিশেষ জাতির একচেটে সম্পত্তি নয়। রাষ্ট্রবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ তাঁর মতে একই বস্তু, অর্থাৎ লোভের এ-পিঠ ও-পিঠ। আত্মসম্মানবোধে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়।

এই লোকের প্রকৃতি কি? উত্তরে ভাষা রুচিসাপেক্ষ। মানুষের দিক থেকে প্রকৃতিটা মানসিক, মানুষ বাদ দিলে প্রকৃতিটা ইকনমিক। মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে যার কারবার, সে বলবে লোভের জন্যই যত অত্যাচার। যে আবার ইতিহাসের রীতিনীতি খুঁজতে ও কাজে লাগাতে ব্যগ্র, তার মতে অত্যাচার ধনোৎপাদন ও তার নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত, অতএব মানুষের দোষ

কই যখন মানুষের প্রবৃত্তি ঐ সব পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানেরই প্রতিবিম্ব। প্রথম দল অত্যাচারের নিঃশেষ করবার জন্য আত্মশক্তি, চিত্তশুদ্ধির ওপর জোর দেন, দ্বিতীয় দল বলেন— নির্যাতিত শ্রেণীকে বিপ্লবী করে তোলা। কনেষ্টবল পর্যন্ত সকলেই ঐ দলের সভ্য। কিন্তু পার্থক্য আছে।

ভারতবর্ষে বিলেতী ধরনের state-ও নেই, গবর্নমেণ্টও নেই, আছে administration— যেটা একদল প্রবল পরাক্রম আমলাদের হাতে— তাঁরা যা হুকুম দেবেন তাই হল গবর্নমেণ্ট। রাজা বলতে তখন লোকে কী বুঝত আপনারা অনেকে ধারণাই করতে পারবেন না। আমার একটুখানি মনে আছে। রানী ভিক্টোরিয়ার ছেলের পায়ের তলায় একজন বিশিষ্ট সদ্ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে লুটিয়ে পড়েন, আর একজন মস্ত নেতা এক রাজপুত্রের কাছে ভারত-বর্ষের প্রতি করুণা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হাঁটু গেড়ে সাশ্রুনয়নে প্রার্থনা জানান। অতএব Crown-এর বিপক্ষে কোনো আপত্তিই ওঠেনি ভারতবর্ষে, কোনো কারণেই। বরঞ্চ আমরা বলতাম যে, মহারানীর প্রোক্লেমেশন মানা হচ্ছে না বলেই যা কিছু গোলমাল। সেইজন্য আন্দোলনটা চলল, বুরোক্রেসিরই বিপক্ষে। আমরা চাইলাম তাঁদেরই দলভুক্ত হতে, যেমন প্লিবীয়ানরা প্যাট্রিশিয়ান হতে গিয়েছিল। অন্যধারে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর তখনও অভ্যুদয় হয়নি যে, অবাধ বাণিজ্য চেয়ে বসবে, কিংবা জাপান, জার্মানী, আমেরিকার মতনও স্বদেশী ব্যবসা বাঁচাবার অজুহাতে প্রোটেক্‌শন নিয়ে সোরগোলটা জমবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য দেশে, যেখানে বাণিজ্যে পিছিয়ে ছিল, প্রোটেক্‌শনের মারফত লিবারেলিজম্‌ আত্মপ্রকাশ করে। তাই ইংরেজী লিবারেলিজম্‌ আর কন্‌টিনেণ্টাল লিবারেলিজম্‌ এতই পৃথক। কন্‌টিনেণ্টে উদার মতের পরিণতি রাষ্ট্রে আত্মবিসর্জন, কারণ, রাষ্ট্র ভিন্ন কে দেশী ব্যবসা বাঁচাবে? ভারতবর্ষের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র, কারণ ইংরেজ ব্যবসা আর দেশী ব্যবসা অহি-নকুল। এই পরিস্থিতিতে আমাদের লিবারেলিজম্‌ যে ঝুটো হবে সে আর বিচিত্র কী! অতএব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এ-দেশে কোনো ঐতিহাসিক কারণ নেই, অর্থ নেই। থাকত, যদি সাম্রাজ্যবাদের কূটনীতি আমরা বুঝতাম। ঐ যুগে বুঝতে পারার সুবিধাও ছিল না অবশ্য। কিন্তু যেসব মহারথীদের নাম নিয়ে আজ আমরা গর্ব অনুভব করি তাঁরা কী সত্যিই এমন বড় ছিলেন না যে তাঁদের কাছ থেকে ওটুকু ঐতিহাসিক দৃষ্টি প্রত্যাশা করা অন্যায়। সে যাই হোক— পূর্বোক্ত কারণে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে দু'টি মারাত্মক দুর্বলতা এসেছিল— ভিক্ষাবৃত্তি ও আবেদন-নিবেদনের পালা এবং সর্বসাধারণের জীবন থেকে বিচ্যুতি, পলায়নও বলতে পারেন।

রাজনীতির তো ঐ দশা। সমাজ সংস্কারও যে পাকা ভিত্তের ওপর ছিল তাও বলতে পারি না। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের জীবনযাত্রায় অন্ন সমস্যার নিরাকরণে এমন কোনো বিপ্লব বাধেনি যার জোরে সমাজের বনেদ ভেঙে যায়। নতুন জমিদার তৈরি হয়েছে, তাঁরা নিয়মমতো রাজস্ব দিয়ে যাচ্ছেন, প্রজারা যা হয় করে দিন গুজরান করছে— নতুন ফ্যাক্টরি এত বেশি সংখ্যায় খোলা হয়নি যে তাদের আকর্ষণে গ্রামের লোক হুড়মুড় করে শহরে হয়। অর্থাৎ, যা ছিল তাই চলছিল, কিন্তু সামান্য একটু গোল বাধল ঐ নতুন শহরে ভদ্রলোকদের জন্য। তাঁরা সমাজ-সংস্কারে বদ্ধপরিকর হলেন, আইডিয়ার তাড়নায়। ইতিমধ্যে ভিক্ষার ঝুলি খালিই রইল, জনকয়েক ঝুলি ঝেড়ে দেখলেন এক কুটো চালও পড়েনি। বিরক্তিটা স্বাভাবিক— তাই বিরক্তির মুখ ঘুরল প্রাচীন ভারতের দিকে— যখন ইংরেজ আসেনি। সেটা হলো স্বর্ণযুগ; আমরা হলাম আর্য; আমাদের দর্শন পরিশীলন শ্রেষ্ঠ⋯ইত্যাদি। শিক্ষিত সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত হলেন; তাঁদের চেঁচামেচির নাম উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে সামাজিক চিন্তা। বলা বাহুল্য এটাও অবাস্তব— রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলনের মতন। তবে এর কুফল বেশি— কারণ, জনসাধারণকে বাদ দিয়ে, তাদের তাগিদকে ব্যবহার না করে, সমাজ সংস্কার করতে যাওয়ার অর্থই হলো জীবনকে প্রত্যাখ্যান।

এখন রবীন্দ্রনাথ ও-সম্বন্ধে লিখতে শুরু করেই দু'টি কথা বল্লেন— ভিক্ষাবৃত্তি ছাড় এবং সমাজের সঙ্গে যুক্ত হও। অবশ্য যে-সে সমাজ নয়, স্বদেশী সমাজ, পল্লীসমাজ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের শাসিত সমাজ নয়, সকল সৃষ্টির বীজক্ষেত্র সমাজ। ভিক্ষাবৃত্তির উপর তাঁর কষাঘাত এতই তীব্র যে তার জলুনি কেবল মডারেটদের গায়েই ধরেনি, সরকার বাহাদুরেরও সর্বাঙ্গে লেগেছিল। আমাদের ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথকে সাহেবরা **extremist** বলতেন। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'ছোটো ও বড়ো' নাইটহুড পরিত্যাগের চিঠি, এমন কী সেদিনকার 'শান্তিনিকেতনে'র বক্তৃতা পড়ে সাহেবদের মনে তাঁর প্রতি অনুরাগ না আসাটাই স্বাভাবিক। এ পোড়া দেশে এটা কর্তব্যের ভাগ, উদ্দেশ্য এক। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মনুষ্যধর্মেরই নামে রাষ্ট্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে বিনিপাত বলে অভিসম্পাত করেছেন। সেই হিসেবে তিনি স্বধর্মই পালন করেছেন। অতএব চিত্তরঞ্জনের মতে অনেকটা সত্য পাচ্ছি, অন্য-দিকে জীবনের সমগ্রতা-সাধনাই কবির ধর্মতত্ত্ব। পরাধীন, নিরন্ন, রোগক্লিষ্ট, ভিক্ষাজীবীর শ্রেণী যদি ভারতীয় সমাজ-বহির্ভূত না হয়, যদি তাদের প্রাণবান্ না করা পর্যন্ত ধর্মসাধনা অপূর্ণ থাকে, যদি তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ আনা পলিটিক্সের প্রাণবস্তু হয়, তবে নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথ পলিটিশিয়ান— যেমন ভূপেন দত্ত

দার্জিলিঙএ আমাকে বলেছিলেন।

আমি একটি প্রশ্ন তুলে আমার বক্তৃতা শেষ করি। রবীন্দ্রনাথ যে কবি সকলেই স্বীকার করছেন, পলিটিক্স ও সমাজনীতিতে তাঁর দান মূল্যবান, অনেকেই এই কাণাঘুষো শুনেছেন— তাঁর দু'চারটে স্বদেশী-গানও আপনাদের জানা আছে। কিন্তু যে ব্যক্তি বজ্রকণ্ঠে বলতে পারেন 'আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা', তাঁকে অভিধানে কি বলে? আমার অভিধানে বলে মহামানব। নতুন জগতে যদি তিনি সাধারণ মানুষ বলেই অভিহিত হন, তবে তিনি Saint Simon-এর মতনই বলবেন, 'খুশী হলুম, খুশী হলুম, এরই জন্যে বসেছিলাম।'

১৯৪০

প্রগতি

বহু পূর্বে 'প্রগতি' নামে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখি। 'বিচিত্রা'য় সেটি প্রকাশিত হয়। তার শেষে লিখেছিলাম, 'আপাতত আমি এই বুঝি।' ইতিমধ্যে, অর্থাৎ গত দশ বৎসরে, আমার মতের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রগতিশীল লেখকদের অনুরোধেই আমার বর্তমান মতামত সাজাবার সুযোগ হলো। সেজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রগতির অর্থ পরিবর্তন, এবং যে ব্যক্তি প্রগতি কথা ব্যবহার করছেন তাঁর মতানুযায়ী দিকে পরিবর্তন। কিসের পরিবর্তন? যে বিষয়ের আলোচনা হচ্ছে তার; এ ক্ষেত্রে সাহিত্যের। কিন্তু সাহিত্য মানুষের কাজ, এবং মানুষ সামাজিক জীব, অতএব সর্ববিষয়ের পরিবর্তনের সঙ্গেই সমাজের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। সমাজ একটি নিরালম্ব বস্তু নয়, তার জন্মমৃত্যু উত্থানপতন আছে অর্থাৎ জীবন আছে। সমাজের জীবন এক হিসেবে ব্যক্তির জীবনের সমষ্টি। কিন্তু একটি ব্যক্তির'ও অন্য ব্যক্তি-সমষ্টি অর্থাৎ সমাজ ভিন্ন পৃথক সত্তা নেই। এই সংযোগ কেবল আধিভৌতিক দৈনন্দিন ব্যবহারে নিবদ্ধ নয়, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক আচরণেও সত্য। শেষের দু'টি স্তরের ব্যবহারও প্রথম স্তরের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। পূর্বে খাওয়া-পরার সংস্থান, পরে ভাবসম্পদ; অতএব পূর্বে সেই সংস্থান-সৃষ্টির পরিবর্তন তার ফলে ভাবসম্পদ সৃষ্টির পরিবর্তন। কিন্তু এদের মধ্যে হারের তারতম্য আছে। একটি সংস্থান-পদ্ধতির আশ্রয়ে যে জনকয়েক লোক লাভবান হয়, আইনকানুন, ধর্মনীতির সাহায্যে সেই লাভ অক্ষুণ্ণ রাখাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই সংস্থান-পদ্ধতি স্থাণু হয়ে পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের বৃদ্ধিতে মন্দা পড়ে না। এই দু'টি হারের বৈষম্যই স্থিতিস্থাপক ও গতিশীল দলের চিরন্তন বিরোধের প্রধান হেতু। সমাজের দিক থেকে, অর্থাৎ মানবজীবনের সংজ্ঞায়, পূর্বোক্ত বৈষম্যই প্রগতির প্রকৃত তাগিদ। বিরোধ না থাকলে গতি থাকতো না, অতএব প্রগতিও অসম্ভব হতো। বিরোধের রূপান্তর প্রগতির এক একটি ধাপ। এই বিরোধের অবসানে প্রগতি নিরর্থক। ইতিমধ্যের ইতিহাসেই প্রগতির আলোচনা করা চলে, কারণ জীবনটাই অনাদি ও অনন্ত।

বলা বাহুল্য, প্রগতি সম্বন্ধে ধারণাও পরিবর্তনশীল। তবে এটুকু জেনে তার প্রকৃতি বুঝতে চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত। যুক্তিকে নিরালম্ব না করলেই চলে। জ্ঞানের দ্বারা যে সমস্ত মূল্য ও স্বার্থ (values and interests) যাচাই করা হয়েছে তার সমর্থনই যুক্তির সামাজিক কর্তব্য।

এই হিসেবেই প্রগতির প্রকৃতি আলোচনা করছি। প্রগতির তিনটি স্তর

আছে— তথ্য (**facts**), ঘটনা (**events**), এবং মূল্য (**values**)।

প্রত্যেক স্তরের একটি একটি উপযোগী মনোভাব আছে। তথ্যের বেলা বৈজ্ঞানিক, ঘটনার বেলা **organismic** (বাংলা প্রতিশব্দ পাইনি) এবং মূল্যের বেলা দার্শনিক। মনোভাব অর্থে কর্মরহিত, ও স্তর অর্থে ইতর-ব্যাবর্তক অবস্থার ইঙ্গিত করছি না। বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কেবল এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যতদূর মেকানিষ্টিক ব্যাখ্যা চলে ততদূর গ্রহণ করা এবং তারপর যেখানে সহজে চলবে না সেখানেও সে ব্যাখ্যা খাটাবার চেষ্টা করাও প্রগতিশীল লেখকদের তথ্য সম্বন্ধে কর্তব্য। যদি নেহাত অসম্ভব হয় তবে চুপ করে যাওয়াই ভাল, অন্তত ইমার্জেণ্ট এভোলিউশনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করার চেয়ে, কারণ শেষোক্ত ব্যাখ্যায় অজ্ঞানতাকে গালভরা নাম দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিণত করবার চেষ্টা অনেক স্থলে লক্ষ করেছি। আকস্মিক পরিবর্তন জীবনে ঘটে, কিন্তু প্রথমত আকস্মিকতা সময় সংক্ষেপমাত্র, নতুন ধরনের পরিবর্তন নাও হতে পারে। তা ছাড়া অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে, আকস্মিক পরিবর্তন নিতান্ত অস্থায়ী এবং ক্রমবিকাশের প্রতিকূল। আরেকটি কথা বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্বন্ধে বলা উচিত। এরও একটা ইতিহাস আছে; আদিম যুগের জাদুকরও বৈজ্ঞানিক ছিলেন, মধ্যযুগের জ্যোতিষীও বৈজ্ঞানিক, আবার পদার্থ-বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের অধ্যাপকও বৈজ্ঞানিক। এমন পদার্থবিদ্‌ও আছেন যাঁরা কাগজেকলমে সিদ্ধান্ত কষে দেন— অন্য লোকে তার যাচাই করে। অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায়, অবরোহ ও আরোহ দুই প্রণালীকেই বৈজ্ঞানিক ব্যবহার করেছেন, আজও করছেন। একই পরীক্ষায় অনুসন্ধানের অবস্থা ও ব্যবস্থা অনুসারে আরোহ-অবরোহ-পদ্ধতি উপযোগী। অতএব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ক্রমবিকাশ যখন আছে, তখন বৈজ্ঞানিক মনোভাবও চিরন্তন, সনাতন, শাশ্বত পদার্থ নয়। এ যুগে পরীক্ষার জয়জয়কার সব বিজ্ঞানেই; যেগুলি অপেক্ষাকৃত অপরিণত সেগুলিতে, এবং পরিণত বিজ্ঞানে, যেমন ভূতবিদ্যায়, কিন্তু অবরোহ প্রথা পরিত্যক্ত নয়। কেন এই পদ্ধতির ও মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছে বুঝতে গেলেই আমরা সমাজের দ্বারস্থ হবো। হিন্দুদের মধ্যে বীজগণিতের এবং গ্রীকদের মধ্যে জ্যামিতির প্রত্যয়ের আবির্ভাবের জন্য সমাজে বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর স্থানভেদই প্রধানত দায়ী, এ সত্য হগবেন দেখিয়েছেন। আধুনিক গণিতের **equation**-এর মধ্যে সমাজের প্রতিবিম্ব দেখা যাবে না, কিন্তু তার ব্যবহারে ও তার ফলে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের রূপভেদে সমাজের নির্বাচন প্রক্রিয়া চোখে পড়ে। ব্যাপারটা এই— কোন্ সময় কোন্ পদ্ধতির রূপটি প্রচলিত হবে তা নির্ভর করছে বৈজ্ঞানিক সমস্যার ইতিহাসের ওপর, এবং সেই ইতিহাস ভালো

করে পড়লে বোঝা যায় যে সমস্তার আদিতে কোনো-না-কোনো ব্যবহারিক সমস্তা ছিল। মধ্যের অংশে সমাজ নির্বাচনের ক্রিয়া সুস্পষ্ট নয়। অন্ত্যে, অর্থাৎ কিছুকাল পরে ফলিত-বিজ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের পুনর্মিলন হয়। সে যাই হোক, প্রগতিশীল লেখকদের তথ্যসংগ্রহ সম্বন্ধে মনোভাব বর্তমান ও আগামীকালের বৈজ্ঞানিক মনোভাব হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, শ্রদ্ধা-সহকারে তথ্যকে বোঝাটাই প্রথম কথা। সব তথ্য বোঝা অবশ্য নয়, যে তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে তাদেরই কথা বলছি। মানুষের মন, ভয়-ভাবনাকে কেন্দ্র করে তথ্য সাজানো পুরাতন সাহিত্যিকের লক্ষণ। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহানুভূতি দেখানো রোম্যান্টিক মনোভাবের নিদর্শন। প্রগতিশীল লেখকের চাই প্রাকৃতিক তথ্যের অন্তরানুভূতি, 'সিমপ্যাথী' নয় 'এমপ্যাথী।'

তথ্যের পর ঘটনা। পুরাতন সাহিত্যের পরিণতি ছিল একটিমাত্র সংকটময় মুহূর্তে। সময় সম্বন্ধে কর্তাদের ধারণা ছিল আলোকের মতো। আলোকের রশ্মিগুলি যেমন লেন্সের ভেতর দিয়ে এসে একটি বিন্দুতে পরিণত হয়, তেমন চরিত্রের অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে এসে গোড়াকার শান্ত জীবন একটি চরম মুহূর্তে পরিণত করানোটাই তথনকার রীতি ছিল। এরই নাম গল্প বলার টেক্‌নিক ইত্যাদি। এখন, সময় সম্বন্ধে ধারণা বদলেছে, অতএব সংকট ও কালান্তর এখন শেষে অবস্থান করে না। তারা গল্পের মধ্যে, কবিতার মাঝ-মধ্যিখানেও অধিষ্ঠিত হয়েছে। প্রগতিশীল সাহিত্যে ঘটনার স্থান নির্দিষ্ট নেই, কারণ কাল সম্বন্ধে পূর্বেকার ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে।

ঘটনা সম্বন্ধে দু'টি মন্তব্য করতে চাই। কালকে উড়িয়ে দেওয়া একাধিক পণ্ডিতের মত। তাঁরা বলেন যে, প্রত্যেক ঘটনাই বিচ্ছিন্ন টুকরোভাবেই দেখা বৈজ্ঞানিকের কাজ, এবং জীবনটা পৃথক পৃথক ঘটনার সমাবেশ মাত্র, যেমন বায়স্কোপের চলন্ত ছবি ভিন্ন ভিন্ন ছবির দ্রুত পরিচালনা মাত্র। কিন্তু এ যুক্তিতে গলদ আছে। এখানে তথ্যের সঙ্গে ঘটনার পার্থক্য প্রকাশ পাচ্ছে না, অথচ সে পার্থক্যটা প্রকৃত। তা ছাড়া, চলন্ত ছবি চালায় কে, কী ভাবে চলেছে, কোন্ হারে চলেছে— এসব প্রশ্নের উত্তর পূর্বোক্ত যুক্তির সাহায্যে পাই না।

অথচ জীবনটা চলন্ত, বিশেষভাবে চলে, কখনও ঠায়ে, কখনও দুনে, কখনও আমাদের বাঞ্ছিত দিকে, কখনও উল্টো দিকে। কিন্তু যে কোনো অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত সময়ে জীবনের মধ্যে একটা না একটা ভালোমন্দ ছক খুঁজে পাওয়া যায়। এ ছক কি করে তৈরি হয়? উত্তর আসে— স্মৃতির সাহায্যে। কিন্তু স্মৃতির দোহাই দিলে জড়েরও স্মৃতি মানতে হয়। তাও আজকাল কেউ কেউ মানছেন। কিন্তু তার প্রকৃতিটা কি? লৌহদণ্ডের স্মৃতি আছে বলা হয়, তখন

কি তার এই অর্থ নয় যে, পুনঃ পুনঃ আঘাতের ফলে তার অণু-পরমাণুর নক্সা একটি বিশেষ রূপে সজ্জিত হয়েছে? পুনরাবৃত্তিরই মধ্যে কালের খেলা রয়েছে। অথচ সময় থেকে বিভিন্ন ভাবে দেখলে বিজ্ঞানের চলে না। অথচ প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, সান্তরতা ভিন্ন অন্য পথ নেই। সমগ্র জীবনটাকে ঐভাবে দেখলে সাহিত্য হয় বিফলতার বিবরণ, ব্যর্থতার কাহিনী, অর্থাৎ মূল্যহীন। কিন্তু প্রগতির মূল্য আছেই আছে, যখন কথাটি ব্যবহার করছি।

অতএব ঘটনা সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে যে, কাল-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সদর্থক হওয়া চাই। কোনো দার্শনিক আলোচনা না করে বলা চলে যে, হিন্দুদের মতন মহাকাল নামক দেবতার কল্পনা করবার প্রয়োজন নেই বটে, তবু কালবস্তুর নিতান্ত ব্যক্তিসম্পর্কহীনতা স্বীকারের প্রয়োজন আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একটি তথ্য অন্য তথ্যের সঙ্গে মিশে আছে নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে, কার্যকারণ সম্বন্ধের তাগিদেই সাধারণত। এই কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিচারের ফলে আমরা বুঝি যে, সব সময় যতটুকু কার্য একটি কারণের জন্য হওয়া উচিত তার বেশি কিংবা কম হচ্ছে। কখনও বা একই কার্যের একাধিক কারণ। এরূপ হয় কেন? তার ব্যাখ্যার জন্য কালাতিপাত মানতেই হয়। অর্থাৎ মাত্র অতিপাত কিংবা অতিক্রমের ফলে পূর্বেকার তথ্য একটি বেগভার অর্জন করে পরের তথ্যকে ধাক্কা দিচ্ছে। যখন পরের তথ্য সেই বেগভার হজম করতে পারে না তখনই তাকে ঘটনা (event) বলাই শ্রেয়।

ঘটনার আবার বেগভার আছে যার ফলে অন্য ঘটনা তৈরি হয়। এই চলন চিরকাল। প্রগতিশীল সাহিত্যে ঘটনার প্রত্যাশা করি, যার বেগভার থাকবে, নতুন ঘটনা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা থাকবে। পারম্পর্য (sequence) প্রগতির মূল কথা নয়। বেগভার প্রকাশ পাবার ঠিক পূর্বেকার অবস্থা পর্যন্ত সমাবেশের প্রকৃতি বাঁধাছাঁধা জৈব দেহের মতন। অর্থাৎ, একটা তার ছক আছে। একটি 'ক্রাইসিস্' থেকে অন্য 'ক্রাইসিসে' যাবার মধ্যে এই নক্সারই ছবি প্রগতিশীল সাহিত্যিককে আঁকতে হবে।

বর্তমান জগতে যে প্রকার জীবন সম্ভব তাতে নক্সাগুলি অত্যন্ত একঘেয়ে। এই সমাজে ব্যক্তিগত জীবনে ঘটনা ঘটতে পারে না, যা পারে তার নাম তথ্যের পুনরাবৃত্তি ও বিচ্ছিন্নতা। সেজন্য যন্ত্রকে দায়ী করা রোম্যান্টিকেরই সাজে। যুক্তিতে বলে— যন্ত্রের সঙ্গে গতানুগতিকতার সম্বন্ধ থাকলেও তার নিকটতম আত্মীয় হলো যন্ত্রের উপর অধিকার বিভাগ। এক কথায়, সমাজে অধিকার-বৈষম্যের জন্যই জনসাধারণের জীবন অত একঘেয়ে। প্রগতিশীল লেখকদের

এই সামাজিক তত্ত্বটুকু ধরতেই হবে। যেভাবে বাঁচছি তার চেয়ে ভালোভাবে বাঁচতে চাওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ভালোভাবে মানে ঘটনাবহুলভাবে। এটা একাধারে তথ্য ও তত্ত্ব।

ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই মূল্যের উৎপত্তি। ভালোভাবে এবং আরো ভালোভাবে জীবন চালাবার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছার মধ্যেই মূল্য নিহিত রয়েছে। যে হিসেবে ঘটনা ধরেছি সেই হিসেবে ঘটনা বাহুল্যকে মূল্যের একটি অঙ্গ ধরা যায়। কিন্তু বাইরে থেকে মনে হয় যেন মূল্য একটি 'আবির্ভাব' (Emergent Quality)। 'যেন' কথাটিতে সত্য-সন্ধানের কাল্পনিকতা ও আনুমানিকতাই সূচিত হচ্ছে। স্বার্থ এবং প্রাসঙ্গিকতার দ্বারা যখন তথ্যসমুদয় গ্রথিত হচ্ছে তখনই, যখন ভাব উদ্দেশ্যের দ্বারা এবং পূর্ব ঘটনার বেগভারে নতুন ঘটনা সজ্জিত হচ্ছে তখনই, মূল্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে গিয়েছে। মূল্যজ্ঞান জন্মায় সঙ্গে সঙ্গে এবং পরে। পূর্বকাল থেকে, কিংবা পিছনে বসে সেটি পুতুল-নাচের মাস্টারের মতন নক্সা কাটছে না। ভিন্ন ভিন্ন মূল্য যখন তৈরি হচ্ছে তখন মূল্যজ্ঞানও নিত্য নয়।

পূর্বেই বলেছি বর্তমান জগতে ঘটনা বড় একঘেয়ে এবং তার কারণ যন্ত্রের আধিপত্য নয়, যন্ত্রাধিপতির আধিপত্য। আধিপত্যের পরিবর্তনের অর্থ বিপ্লব। কথায় কথায় এবং কেবল কথার সাহায্যে বিপ্লব আসে না। তাই মূল্যের দ্রুত পরিবর্তন সহজ নয় এবং মূল্য-জ্ঞানের ইতিহাসও চলন্ত নয়। কিন্তু ভালোভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার উপায়ের জ্ঞানে অর্থাৎ বিজ্ঞানে ভাটা পড়েনি। মূল্যজ্ঞান আটকে রইল, অথচ বিজ্ঞান অগ্রসর হলো। এ যেন আরবী ঘোড়ার সঙ্গে খোঁড়া গাধা জুতে গাড়ি হাঁকানো। তাই গাড়ি উল্টে যায়। পাছে বিপ্লব বাধে এই ভয়ে কর্তৃপক্ষ বললেন যে, মূল্যজ্ঞানটাই সনাতন, এবং গতিটা মায়া। যে কোনো মূল্যজ্ঞানকে শাশ্বতে পরিণত করার মধ্যে একটি শ্রেণীর স্বার্থ আছে। শবের দৌরাত্ম্য প্রগতিশীল লেখক মানতে পারেন না।

অস্বীকার করাটা মস্ত কাজ, কিন্তু সুশ্রী নতুন সৃষ্টি করাটাই উদ্দেশ্য। মন্দকে নাকচ করা ছাড়া ভালোকে খাড়া করারও কর্তব্য রয়েছে। অবশ্য প্রথমটা না হলে দ্বিতীয়টি অসম্ভব। কিন্তু সম্ভব-অসম্ভবের অপর পারে আর একটি জগৎ রয়েছে সন্দেহ হয়। বিরোধের অবসান কি নেই? লেখকের চিত্ত বিক্ষুব্ধ থাকলে কলম নড়ে না, কে না জানে? অথচ লেখবার সময়ও শান্তি নেই; ভাষা, ভাব তখনও বিদ্রোহী জড়ের মতন ব্যবহার করে। তাদেরও বশে আনতে হয়। যতক্ষণ না নতুন ভাবের উপযোগী ভাষা করায়ত্ত হচ্ছে, ততক্ষণ নতুন প্রচেষ্টা গতির চিহ্ন মাত্র রইল। কেবল নিদর্শন কিংবা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকাটাই কি চরম কথা? শুধু সমাবেশের দারিদ্র্য কখনও ঘোচে না।

শুনেছি বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল লেখক আছেন। তাঁরা কেউ কেউ আঙ্গিকের উন্নতি করছেন। ভাবের দিকে বিশেষ কোনো নতুনত্ব পাইনি। সকলে এখনও ব্যক্তিবাদী। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথবাবু ও শরৎচন্দ্রের যুগে হিন্দু-সমাজের বিপক্ষে লড়াই করার প্রয়োজন ছিল, তাই ব্যক্তিবাদ তখন ছিল প্রগতিশীলতার মূলমন্ত্র। এখন সমাজ বদলেছে। নতুন সাহিত্যিকের লেখায় পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতনতার সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু কেন হলো, কীভাবে হলো— এই জ্ঞানের পরিচয় পাই না। ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া শিখে খেতে পাচ্ছে না; তাই কষ্ট পাচ্ছে, কষ্টের কারণ যে সে নিজে ফুটতে পারছে না— মাত্র এইটুকু কথা-সাহিত্যে ফুটছে। কবিতায় বিষাদের ছায়া দেখেছি, কিন্তু কিসের বিষাদ? সেই একই কারণে, অর্থাৎ কবি নিজে ভালোভাবে থাকতে পাচ্ছেন না। এরা যেন সকলে ভালো চাকরি খুঁজছেন। বাংলা কবিতা ও কথা-সাহিত্য বড় চাকরির দরখাস্ত লেখার সামিল হলে কি সাহিত্য হবে? যারা গরীব গৃহস্থের দুঃখে হা-হুতাশ করেন তাঁরা লোক ভালো, কিন্তু রোম্যান্টিক। আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনে তথ্য, ঘটনা ও মূল্যজ্ঞানের কোনো যথার্থ তাগিদ নেই। যখন তা নেই তখন আঙ্গিকের কেরামতি ঝুটো মনে হয়। আগে জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান আসুক, তার উপর রূপ সৃষ্টি হোক, তবেই প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা হবে। ঐ বস্তুটির অস্তিত্ব মানি, তার প্রয়োজন স্বীকার করি, তার আগমন বাঞ্ছনীয় ভাবি, অন্য দেশে তার সৃষ্টি হচ্ছে জানি। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে আঙ্গিকের অনুকরণ ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কিছু হয়েছে কি? সন্দেহ হয়, হয়নি। তাই স্বাদেশিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে শেষ প্যারাগ্রাফটি লিখলাম। সমাজ-জীবনের রূপ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলেও যে-নতুনত্ব সাহিত্যে আনা যায়, তাকে প্রগতিশীল সাহিত্যের অভিনবত্ব বলে ভুল করতে আমি রাজি নই। ১৩৪৪

বর্তমান সাহিত্যের মূল কথা

বর্তমান সাহিত্যের ধারা আলোচনার প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে— বর্তমান কথাটির তাৎপর্য কি? প্রশ্নটি উঠত না যদি আধুনিক সাহিত্য, প্রগতিশীল সাহিত্য প্রভৃতি কথাগুলির চলন না থাকত। সর্বপ্রকার সাহিত্য-সৃষ্টিরই আবেগ কোনো-না-কোনো ঘটনাঘাতের স্মৃতি থেকে উৎপন্ন হয়। ঘটনা-কেন্দ্র যদি যথাসর্বস্ব মনে হয়, যদি তার তীব্র উজ্জ্বলতায় চারিপাশের তমসা, পূর্বের কারণ পরের ফলাফল ও প্রতিবেশের সম্বন্ধকে আবৃত করে, তবে সেই প্রকার ঘটনাশ্রিত সাহিত্যকে আধুনিক কিংবা সাময়িক সাহিত্য বলাই সঙ্গত। কিন্তু এক্ষেত্রে অধুনা সময় কালপ্রবাহের অংশ নয় এবং সময়ও কালপ্রবাহ নয়। বর্তমান সাহিত্য-সৃষ্টির প্রকৃতি ভিন্ন। তারও স্মৃতিকেন্দ্র নিশ্চয়ই আছে, তবে সেটি অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল। ঘটনা-পরম্পরা, কার্যকারণ-সম্বন্ধ, নিকট ও দূরতর অর্থ তার বর্ণালী সম্পাতে উদ্ভাসিত। বর্তমান সাহিত্যের ঘটনা তাই সাময়িক না হলেও চলে। চিন্তা ও ভাবের ধারা— চিন্তা ও ভাব আমাদের মানসিক ঘটনা— বরঞ্চ অধুনা থেকে একটু দূরে সরে গেলেই যেন বেশি স্পষ্ট হয়। তাই এক অর্থে বলা চলে যে, আধুনিক সাহিত্যের মৃত্যুই বর্তমান সাহিত্যের জন্মলাভের সুবিধা। আধুনিক সাহিত্যের প্রধান উপকরণ ভাব, বর্তমান সাহিত্যের মূলধন অনুভূতি, অভিজ্ঞতা; হৃদয় যদি থাকে, স্নায়ু যদি কার্যকরী হয় তবে ঘটনার আঘাতে দু'টিই চঞ্চল হবে, এবং সাহিত্যিকের দু'টি বস্তুই অত্যন্ত সক্রিয়; কিন্তু তারপর যদি ভাবের শক্তি ফুরিয়ে যায় তখন অন্য উত্তেজনার প্রয়োজন ওঠে, সাহিত্যিক অন্য নতুন ভাবের সন্ধানে ঘোরেন এবং যদি মেলে তবে পূর্বভাবকে হারিয়ে ফেলেন কিংবা স্বেচ্ছায় মনন-কেন্দ্র থেকে তাকে সরিয়ে দেন। ফলে তাঁর সময় হয় ক্ষণিকের জঞ্জাল আর তাঁর আবেগ হয় ভাবের ভিড়ের ধাক্কা। কিন্তু বর্তমান সাহিত্যের অভিজ্ঞতা যেন অনুভূতির মালা। সাময়িক কী আধুনিক সাহিত্যের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই, সাহিত্যিক যখন মানুষ তখন মন্বন্তরের মতন কোনো বিশেষ ও গভীর দুঃখ তাঁর হৃদয়কে আঘাত করবেই এবং তার ফলে তিনি নিশ্চয়ই ভাবপ্রকাশে ব্যস্ত হবেন। এই পর্যন্ত এসে তিনি যদি বিরত হন তবে তিনি আধুনিক কী সাময়িক সাহিত্যিকই থেকে গেলেন। আর যদি তিনি ঐ মন্বন্তরের কোনো একটি ঘটনার অবলম্বনে মানুষের চিরন্তন দুঃখ, পীড়ন, নিরাশার কথা আমাদের সকলকে স্মরণ করাতে পারেন তবে তিনি সমসাময়িক, আধুনিক হয়েও বর্তমান সাহিত্যের স্রষ্টা। এবং যে কালে অপেক্ষাকৃত বিশাল পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন, ঘটনার আদি ও অন্ত্য, অতীত ও ভবিষ্যৎ, কারণ ও কার্য বোঝা যায় না, এবং যখন সেটি না

বুঝলে কর্ম-ফলপ্রসূ হয় না, তখন একমাত্র বর্তমান সাহিত্যই প্রগতিশীল সাহিত্য হতে পারে। বর্তমান সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য চাই প্রবল জীবনশক্তি, প্রশস্ত জীবনবোধ ও সুতীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি। এদেরই কল্যাণে আপাত প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম করা, তার অবান্তরের স্তূপকে সরিয়ে দেওয়া, সংযত ও সজ্জিত করা সহজ হয়, ও সেই সঙ্গে অন্তরের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে আসে, বিশেষ ক্ষণের গণ্ডি ভেঙে মানুষের সাধারণ ব্যবহারে পরিণত হবার সুবিধা পায়।

ঠিক এই হিসাবেই বাংলার বর্তমান সাহিত্য একাধারে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের নিজের সাহিত্যে বহু তৎকালীন ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে। তাদের মধ্যে একাধিক ঘটনা স্বদেশী আন্দোলন ও মহাযুদ্ধের মতন নাটকীয়, আবার বেশির ভাগই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যবহারের অন্তর্গত, নতুনত্ব কেবল দেখবার ও প্রকাশের ভঙ্গিতে। যে সময় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা জ্বলে উঠেছিল তার মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ ঘটে। কিন্তু তাই বলে তাঁকে যুদ্ধের সাহিত্যিক নাম দেওয়া যায় না। যেজন্য মহাযুদ্ধের আরম্ভ সেই কারণই ছিল তাঁর কবিতার আগ্রহ। তিনি সেই কারণকে আপন ভূয়োদর্শনের মধ্যে এনে সমগ্র মানবেতিহাসের উত্থান-পতনকে রূপ দিলেন আপন কবিতায়। তেমনই অন্যধারে পাড়াগাঁয়ের পোস্টমাস্টার, বোষ্টুমি, শহরের গিরিবালা, সুচরিতা, মক্ষিরানী, সিসি-লিসি-কিটি সকলেরই জীবন সাধারণ। কিন্তু সেই সাধারণ জীবনধারায় দু' একটি ঘূর্ণি দেখা দিল, স্রোতে চাঞ্চল্য এল, রবীন্দ্রনাথ তাই লক্ষ করলেন, ও সেই সব ব্যাপারকে একটি অবিশেষ জীবন-বহতার অঙ্গ হিসাবে রূপ দিলেন। ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্য কোনো প্রকার শ্রেণী-সাহিত্য হলো না বটে, কিন্তু সাহিত্য হলো এবং বর্তমান সাহিত্য হলো, এবং আজও রইল। আমার মনে হয় রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বুর্জোয়া সভ্যতা কী শ্রেণীর প্রতিভূ বলার মধ্যে বিচারের অভাব রয়েছে। বিষয় ও প্রতিজ্ঞা— **subject** ও **theme**, তথ্য ও মূল্য, অর্থাৎ **fact** ও **value**, অধুনা ও বর্তমান, এই প্রত্যয়গুলির পার্থক্য না বুঝলে সাহিত্যালোচনায় বড় বিপদে পড়তে হয়।

বর্তমান সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যকে অতিক্রম করবে নিশ্চয়ই, কিন্তু অন্যধারে জীবনের সমস্যা ক্ষণে ক্ষণে তিলে তিলে বাড়ছে এবং কোনোদিন সাধারণের অজ্ঞাতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করতেও পারে। কোনো সাহিত্যিক যে কালে অমর নন তখন নতুন রূপের, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সম্ভাব্যতা ও অস্তিত্ব মানতেই হবে তাঁকে ও তাঁর পরবর্তী সাহিত্যিককে। রবীন্দ্রনাথ আজ জীবিত নেই— এটুকু স্বীকার করাই ভালো, এবং জীবন সেজন্য চলা বন্ধ করেনি আমরা দেখছি। অতএব রবীন্দ্রোত্তর জীবনের সমস্যা যদি নতুন সমস্যা হয়, তবে

রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। আমি এখন পঞ্জিকা ধরে কোনো কথা বলছি না, নতুন সমস্যা, কিংবা পুরাতন সমস্যার নতুন রূপের, নতুন ঢঙেরই উল্লেখ করছি। আমার বিশ্বাস যে, রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য-প্রয়াসে অন্ততপক্ষে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। তার সাহায্যে প্রয়াস সার্থক হয়েছে কী না আমি বিচার করছি না। নতুনত্ব তিনটি ব্যাপারে লক্ষণীয়।

প্রথম ব্যাপার হল মৌলিক বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রত্যয়ের মধে সত্য, শিব, অদ্বৈত, আনন্দ ও সুন্দরই প্রাথমিক। এগুলো ভারতবর্ষের সনাতন প্রত্যয়। সবগুলো মিলে যে ছকটি তৈরি হয় সেটাই ভারতীয় ঐতিহ্য। সেখানে একটি প্রত্যয়ের সঙ্গে অন্যটির গরমিল সমন্বিত হয় ব্রহ্মের স্বরূপে, একমেবাদ্বিতীয়ম্— এই সংজ্ঞায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূলধন এই উত্তরাধিকার। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই উত্তরাধিকারকে গুদামজাত না করে, না জমিয়ে নতুন সুযোগে খাটান। সেজন্য তাঁর নকশায় জীবন, মানুষ, গতি প্রভৃতি নতুন প্রত্যয়ের আমদানি দেখি। সংস্কৃত কিংবা বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রত্যয়গুলো ছিল না বলছি না, কিন্তু অত জীবন্তভাবে নিশ্চয়ই নয়। চরৈবেতি সংজ্ঞার প্রভাব সংস্কৃত সাহিত্যে কোথায়? এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে মানুষের অপেক্ষা কেউ কি বড় নয়, তার উপরে কি কেউ নেই? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন? বৈষ্ণব সাহিত্যের গতি বাসকশয্যার দিকে, আর বৈষ্ণব দর্শনের গতি তো কেবল বৃন্দাবনের দিকে। সেখানে পৌঁছবার আনন্দ আছে, কিন্তু চলার আনন্দ কৈ? সে আনন্দের সুর কীর্তনে ধ্বনিত, কিন্তু গতিরাগের গানের পদ্ধতি ভিন্ন, গায়ন ভিন্ন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ছকের মানুষও একটু কম অবিশেষ, যদিও সেটি বিদেশী সাহিত্যের রক্তমাংসে গড়া, অন্য জীব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, বিশেষ ব্যক্তি নয়।

এখন, কেবল নকসা থাকলেই সাহিত্য হয় না, যদিও তা ছাড়া কোনো রচনা সাহিত্য পদবাচ্য নয়। প্রত্যয়গুলো প্রতীতিতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই হলো না। সত্য, আনন্দ, অদ্বৈত, জীবন, গতি, পুরুষ— যাকে তিনি পার্সন্যালিটি বলতেন, প্রভৃতিতে তাঁর নিজের বিশ্বাস ছিল অগাধ ও এতটাই সক্রিয় যে অসত্য, নিরানন্দ, দ্বিধা, মৃত্যু, স্থিতি ও ব্যক্তিত্ব প্রভৃতিকে এক এক সময় তিনি প্রায় দূরে ঠেলে রাখতেন। তার কারণও আছে : তিনি তাঁর প্রাথমিক বিশ্বাসগুলিকে অনির্বিশেষ, কালাতীত তাৎপর্য দিতেন আমাদেরই ঐতিহ্য অনুসারে। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও আমরা তাই দেখি, সেখানে জরা, মৃত্যু, দুঃখ, দারিদ্র্য, যেসব ব্যাপার দেখে বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করেন, সেসবই আপেক্ষিক, অর্থাৎ চিরন্তনের উপকরণ কিংবা ব্যত্যয় হিসাবে সহনীয় হয়েছে। এখন পরম মূল্যে বিশ্বাস ও ও আপেক্ষিক মূল্যে বিশ্বাস এক ধরনের হতেই পারে না। প্রথম বিশ্বাসের ফলে

সাহিত্যসৃষ্টি শান্ত, ব্যাপক, প্রসন্ন হয় ; দ্বিতীয় বিশ্বাসের ফলে আসে চাঞ্চল্য, দ্বন্দ্ব, জটিলতা ; যার চরম পরিণতি বস্তুতান্ত্রিক ট্র্যাজেডিতে, যেখানে একটি ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ কিংবা প্রকৃতির ক্রমাগত সংঘাত হচ্ছে। প্রথম বিশ্বাসে গঠিত সাহিত্যের সুর মেলডি, মীড়প্রধান, তৈলধারাবৎ ; তার বেধ (dimensions) সাধারণত দু'টি, সাধারণ নিয়ম ও সাধারণ মানুষ, অন্য ভাষায়, জীবাত্মা আর পরমাত্মা। তাদেরই সম্বন্ধেই গতি, উন্নতি, যেটা প্রকৃতপক্ষে নিমজ্জন, কারণ জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়, সাধারণ মানুষ সাধারণ নিয়ম মানতে বাধ্য ও মানাই তার ধর্ম। অতএব রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈচিত্র্যের অভাব অনেকেই অনুভব করেন। আপেক্ষিক মূল্যে বিশ্বাস বরাবরই অস্থির, বিচিত্র, হার্মনিসর্বস্ব বিলেতী সঙ্গীতের মতন মূল 'থীম্' থাকা সত্ত্বেও গতিশীল। আর যদি নতুন 'থীম্' এসে পড়ে—এবং বর্তমান সভ্যতার জটিলতা ফোটাবার জন্যে যেটা স্বাভাবিক— তবে স্থায়িতার ব্যভিচারী ভাবের ভিড়ে হারিয়ে যায়। অর্থাৎ প্রথম প্রকার প্রত্যয়ের ফলে একঘেয়েমি, আর দ্বিতীয় প্রকার প্রত্যয়ের ফলে অরাজকতার বিপদ রয়েছে। যিনি যতটা বিপদ এড়িয়ে চলতে পারেন তিনি ততটাই সাবধানী আর্টিস্ট। তাই বলি, জোর-জবরদস্তি করে যেমন বিশ্বাস আনা যায় না, অর্থাৎ যেমন স্ব-ইচ্ছায় আধুনিক সাহিত্যিক হতে পারলেও বর্তমান সাহিত্যিক হওয়া যায় না, তেমনই অধিক বিশ্বাসের ফলে সাহিত্য ধর্মের কোঠায় ওঠে ও বহু প্রতিজ্ঞার প্রতি আস্থার জন্য সাহিত্য সুবিধাবাদী প্রোপাগাণ্ডার স্তরে নেমে যায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের দোষগুণ সবই চরম পরিমাণে প্রতীতির জন্য, আর আধুনিক সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও অস্থিরতার জন্য দায়ী আপেক্ষিকতার উপর আস্থা।

অতএব সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকেও দু'টির মধ্যে পার্থক্য থাকতে বাধ্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচিত ; অর্থাৎ সেখানে গোটা-কয়েক বিষয় সাহিত্যের বহির্ভূত। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে অমন কোনো গণ্ডি নেই। রবীন্দ্রনাথ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি নিয়ে কবিতা লিখেছেন জানি, কিন্তু ময়ুরাক্ষী নদীর ধারেই তিনি স্বাভাবিক। লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের ইঙ্গিত তবু মেলে রবীন্দ্র-সাহিত্যে, বিশেষত নভেল ও কখনও কখনও ছোট গল্পে, কিন্তু কবিতায় তাদের বালাই নেই। ভয় একটা মস্ত বড় ভাব, সেটাও বাতিল। কাম নাম মাত্র, তাও দেহগন্ধী নয়। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ খুঁতখুঁতুনি নেই ; বস্তি আস্তাকুড় থেকে শুরু করে প্রাসাদ পর্যন্ত, ঝি-চাকর কুষ্ঠরোগী থেকে ক্রোর-পতি, বেনের লাভ থেকে পুঁজিপতির লোভ, প্রায় সবই আছে সেখানে। যদি খুঁতখুঁতুনি থাকে তো তো কেবল আদর্শের প্রতি। এবং ঈর্ষাধারায় মন যদি ব্যাকুলও হয় তবে সে ব্যাকুলতাকে আদর্শ-বিলাস নাম দিয়ে বহিষ্কৃত করবার

একটা ঝোঁক থাকে। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য এই প্রকার বিষয়ে সন্দিহান, একটু লজ্জিত।

এখন বিষয়ের যদি সীমা না থাকে তবে একটু ভিড় জমবেই। অথচ সাহিত্য বস্তুটার প্রকৃতিই হলো নিয়ন্ত্রণ। পৃথিবীতে নানা বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়কে আঘাত করছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাই বলে যদি প্রত্যেককে প্রবেশাধিকার দিতে হয় তবে নিজের কোনো দাঁড়াবার স্থান থাকে না। যদিও ধরা যায় যে, সাহিত্য জীবনের প্রতিফলন, তবু আরশি ধরতে তো হবে কাউকে, ক্যামেরার কাজ করবে কে? আরশির পিছনে পারার প্রলেপ থাকে নয়তো প্রতিফলন হয় না; আর ক্যামেরা বসাবার জন্য আলো ও স্থানের নির্বাচন চাই। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যিক এ সব কথা বোঝেন না বলছি না; তিনিও বুদ্ধিমান। তাঁর বিচক্ষণতার নিদর্শন ইমেজ-ব্যবহারে। সাহিত্যের সব রূপেই ইমেজ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কবিতাতেই বেশি। অনেক কবির মতে ইমেজই কবিতার স্বরূপ। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও ইমেজ রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যেও ইমেজ— তবে নতুনত্ব কোথায়?

নতুনত্ব অপ্রচলিত, অ-পূর্ব, এমন কী অদ্ভুত সম্বন্ধ স্থাপনে। প্রচলিত ইমেজ যেন ঘষা পয়সা, বহু ব্যবহারের ফলে সেটি উত্তেজনার শক্তি খুইয়েছে, তাই মনকে জাগাবার জন্য অদ্ভুত ইমেজের প্রয়োজন। সূর্য সমুদ্র পর্বত শ্বেত অশ্বত্থ প্রভৃতি প্রতীক এখন শক্তিহীন। আজ চাই এটম্, প্রোটোন, কলের জল, চিমনি, ধূসরতা মরসুমী ফুল, বনতুলসী, আশ শেওড়া, বুনো ফুল, শেওলা, মরুপ্রান্তরের ফণীমনসা; আজ কোকিলের পরিবর্তে দাঁড়কাক, উটপাখি। হ্যাঁ, তাতেও যদি না চলে, তবে বহু পুরাতন পৌরাণিক ইমেজের ব্যবহার অন্যায় হবে না, তবে নতুন ভঙ্গিতে তাকে দেখাতে হবে। অবশ্য তখন তারা হবে প্রতীক, সিম্বল, **primordial imges, archetypes,** যেমন জেসন ট্রয়লাস মহাশ্বেতা সবিতা ইত্যাদি। ইমেজ-সৃষ্টির পর তার ব্যবহার। রবীন্দ্র-সাহিত্যে কেবল পরিচিত ইমেজ আছে তাই নয়, তাদের বিন্যাসে একটা সহজ প্রাঞ্জল পরম্পরা থাকে। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে এই প্রকার পারম্পর্য নেই। সেখানে একটি ইমেজ বিড়ালছানার মতন কখনও অন্যটির ঘাড়ে পড়ছে, কখনও এতই ঘেষাঘেষি রয়েছে যে, মধ্যে কোনোও ফাঁক নেই যেখানে কাব্যের বাক্য (**poetic statement**) ঢোকানো যায়। উদ্দেশ্য ঘনতা আনা ও ইমেজ-স্তূপের সাহায্যে কবিতার সাধারণ মেজাজটি তৈরি করা। কিন্তু ঠিক এইখানেই বিপদ ঘনায়। যদি কবিতার পিছনে কোনো স্থায়িভাব, কোনো **basic passion** না থাকে তবে কবিতা হয়ে যায় ইমেজের ভগ্নস্তূপ। কেবল তাই নয়, স্থায়ি-ভাবেরও পিছনে একটা না একটা ভূয়োদর্শন থাকা চাই। ইমেজের দু'টি স্তর, প্রথমটির সম্বন্ধ মূল থীম্-এর সঙ্গে, কিন্তু যদি

মূলটাই কোনো সাধারণ সত্যের প্রতীক কী প্রতিভূ না হয়, তবে সেই ইমেজগুচ্ছ-সমন্বিত কবিতার কোনো দম থাকে না। রবীন্দ্র-সাহিত্যের কবিতাই একটি ইমেজ, তার অন্তর্গত ইমেজের সংখ্যা কম ও রঙও একটু ফিঁকে, প্রায় উপমা, রূপক, কখনও কখনও দৃষ্টান্তের সামিল। তবে সেখানে সাধারণ সত্যের সঙ্গে থীমের যোগ আছে, যদিও সে সাধারণ সত্যে বর্তমান মানুষের বুদ্ধি হয়তো সায় দেয় না। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে ইমেজের সংখ্যা বেশি, তবে পাকা হাতে তাদের বিন্যাস ঘন, রং গাঢ় হতে পারে, ও হয়। আর যখন হলো না তখন কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে গেল। তাতেও দোষ ততটা হয় না যতটা হয় নিতান্ত ব্যক্তিগত ইমেজের ব্যবহারে। তখন আর সাহিত্যের কোনো সার্থকতা থাকে না, কবি তখন রোগী। এই প্রকার সাহিত্যে সাধারণ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। বস্তুত সাধারণ বলে কোনো বস্তু কী প্রত্যয় এখানে নেই।

এই হলো রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের মোটামুটি পার্থক্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশ্বাস, প্রত্যয়গ্রন্থি ভিন্ন ; অথচ পাঠকদের মনে সেগুলো পূর্ব-পরিচিতির জন্য অনুজ্জ্বল হলেও বর্তমান। অন্যধারে জীবন নতুন ধারায় বইছে, সেখানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আসছে, নতুন সমস্যা, বিষয়, ব্যাপার উঠছে। তাদের জন্য নতুন প্রত্যয়, নতুন ইমেজের প্রয়োজন। দু'ধরনের প্রতীকের মধ্যে বিরোধ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মুহূর্ত যখন কাল ছাড়া নয়, মানুষের ব্যবহারে যখন তার ইতিহাসটাই প্রাথমিক, অপরিত্যাজ্য সত্য, তখন বিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই সমন্বয়ের কার্য চলবে। বাংলার বর্তমান সাহিত্যে সমন্বয় চলছে, যদিও আধুনিক সাহিত্যিকের রচনায় বিরোধের নিদর্শনই বেশি চোখে পড়ে।

মহারথীদের অবর্তমানে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে হতাশ হবার কারণ দেখি না, যদিও কোনো কোনো সাহিত্যিকদের রচনা পড়লে অন্য ভাব মনে আসে। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কটাক্ষপাত করছি না. কিন্তু তাঁরা যত প্রয়োজনীয় কাজই করুন না কেন, তাঁদের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাগুলো এখনও রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাগুলোকে উচ্ছেদ করে জনসাধারণের মনে অধিষ্ঠিত হতে পারছে না। এবং কেন হচ্ছে না যদি তাঁরা আলোচনা করেন, তবে বোধ হয় সাহিত্যের উপকার হয়। প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা অন্য প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা-সমষ্টি স্থাপনা করতে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে প্রত্যয়ের চেয়ে প্রতীতি এবং প্রতিজ্ঞার চেয়ে প্রতিশ্রুতিটাই স্পষ্ট। আমার একান্ত বিশ্বাস রবীন্দ্রোত্তর বর্তমান বাংলা সাহিত্যের আদি প্রত্যয়, প্রতিষ্ঠা, বিষয়, ইমেজ-ব্যবহার ও অন্যান্য আঙ্গিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সময় এসেছে। বাংলা দেশের আছে তো ঐ সাহিত্য, তাও যদি দৈনিক সংবাদে পরিণত হয় তবে থাকবে কী, বুঝি না। ১৩৫৫

গন্থ-কবিতা সম্বন্ধে 'কবি'র মন্তব্যের সাহায্যে অনুভূতি বাড়ে, রুচিও সৃষ্টি হয়, সীমানা নির্ধারিত হয় না নিশ্চয়ই। কিন্তু ঐ প্রকার শ্রেণীবিভাগ কী জাতিবিচার অসম্ভব। এখনও পর্যন্ত কোনো আলোচনা তত্ত্বের পুস্তকে কবিতা ও গন্থের সীমানা ঠিক হয়েছে জানেন কি? না কেউ তাই পড়ে গন্থের ও পদ্যের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করে? যে করে তার কোনো কিছু না পড়াই ভালো। সীমানা নিয়ে মাতামাতি academic mind-এর চিহ্ন, অর্থাৎ যারা কাঁচামালের ব্যবসায়ী তাঁদেরই। যাঁরা সাহিত্য-রসিক তাঁরা অবশ্য সীমানা নেই বললেন না, কিন্তু রুচি ও অনুভূতির উপরই জোর দেবেন। কোনো গুহ্য ধর্মের ইঙ্গিত করছি না। সাহিত্যিকের কেন ভালো লাগল তাকে বলতেই হবে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, সে ব্যাখ্যা উপভোগের পরে। পরে বলেই ব্যাখ্যায় ভুল হওয়া সম্ভব। ব্যাপারটা rationalisation-এর সমপর্যায়ে, সমস্তরে নয়, derivative বলতে পারেন। সেজন্য গন্থ-কবিতা সম্বন্ধে আমার মতামতের ঐকান্তিক সততা সম্বন্ধে আমি নিজেই সন্দিহান। আপনারা নিজে চিন্তা করে দেখুন। আমার আপাতত যা মনে হচ্ছে তাই লিখছি। চিঠি প্রবন্ধ নয় তাও মনে রাখবেন।

প্রথমেই ওঠে দৃষ্টিভঙ্গির কথা। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি দুই প্রকারের। এক হলো বাইরের সত্তাকে স্বীকার করা, আর এক নিজেকেই প্রামাণ্য ভাবা। স্বীকারের intensity অনুসারে প্রকাশ ভিন্ন হয়। পুরোপুরি অঙ্গীকারের চূড়ান্ত অবস্থা (তথাকথিত) বৈজ্ঞানিকের তাকে বাদ দেওয়াই ভালো, কারণ গন্থকবি আর যাই হোক তিনি বৈজ্ঞানিক নন, কারণ গন্থকবি এক ধরনেরই কবি। অন্যদিকে মাত্র আত্মোপলব্ধিকে বরণ করেন হয় যোগী, না হয় পাগল। চিত্রে ও ভাস্কর্যে তার দৃষ্টান্ত dadaism, সাহিত্যে জয়েসের ইদানীংকার রচনা এবং শ্রীমতী স্টাইনের কবিতা। ভাষা যদি একাধিকের সম্পত্তি হয়, তবে যোগী পাগল কিংবা এই সাহিত্যিক সম্প্রদায় ভাষার অপমান করে থাকেন। অতএব আমরা মধ্য পথেরই পথিক হব। নচেৎ গন্থ কবির বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বুঝব না। এখানে অনুপাতের কথা ওঠে।

কবি মাত্রেই যে ঘরমুখো ও অন্তর্মুখী মানতেই হবে, সে বাহিরকে নিজের বাড়ির অঙ্গন ভাবে। নিজেকেই সে সমগ্র বিশ্বের axis বিবেচনা করে,— রোম্যান্টিক কবিরাই অবশ্য বেশি। বাঙালিরা কেবল কেন, আজকালকার ইংরেজরাও এই রোম্যান্টিক কবিতাকেই একমাত্র কবিতা ভেবেছে বলেই তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করছে। ইংরেজী সাহিত্যে সে প্রতিক্রিয়ার ফল এলিয়ট

প্রভৃতির কঠিন কটমট কবিতায়। বাংলা সাহিত্যে সে বিদ্রোহের রূপ গদ্য-কবিতায়। পার্থক্য এই— এলিয়ট বিদ্রোহের ঝোঁকে পদ্যের মিল পদ্য থেকে নির্বাসন তো করেননি, বরঞ্চ নাটকে পদ্যরূপ দিতে চেয়েছেন— হয়তো সার্থকও হয়েছে। আমরা মিল পর্যন্ত ত্যাগ করেছি পদ্য থেকে এবং কবি নিজেই এই বিদ্রোহের নেতা। কিন্তু কোনো বিদ্রোহ নঙর্থক নয়। তার সদর্থ হলো আপন-পরের, ঘর-বাহিরের, অন্তর্মুখিতা ও বর্হিমুখিতার সম্বন্ধের, আরও খানিকটা পর, বাহির ও বস্তুসত্তা ঢুকিয়ে দেওয়া। অথচ যেন সম্পূর্ণ ব্যক্তি-সম্পর্ক রহিত না হয়, কারণ তা হলে কবি বৈজ্ঞানিকের কোঠায় পড়বে। একবার ঐ সম্বন্ধে বস্তুসত্তার জোর বাড়লে আত্মকেন্দ্রিক সব মনোভাবগুলো দমে যাবে— অর্থাৎ নদীকে তখন আর নায়ক-নায়িকার ব্যবহারের পটভূমি বলে মনে হবে না, চাঁদ আর তখন প্রেমিকের উদ্দেশ্য সাধনের পর অস্ত যাবে না, সেই সঙ্গে অকিঞ্চনেরও খাতির বাড়বে। এই আলোচনা থেকে একটি তথ্য বেরুল— **anti-romantic** মনোভাব। বস্তুর প্রতি কোনো রোম্যান্টিক কবির **attitude** অপেক্ষা গদ্যকবির **attitude** হবে বেশি সশ্রদ্ধ! আপেক্ষিক নিষ্কামতা গদ্যকবির রচনায় থাকা চাই।

তবু, ক্ল্যাসিকাল কবিতায় মিল আছে কেন, প্রশ্নটি অমীমাংসিত রয়েই গেল। গদ্যকবি কি বাথটবের নোংরা জলের সঙ্গে খোকাকেও নর্দমায় ফেলে দিয়েছে? অনেক সময়ে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু সব সময়ে নয়। যেখানে গদ্য-কবিতা স্বকীয় মহিমায় সম্পূর্ণ, সেখানে ক্ল্যাসিকাল কবিতার সঙ্গে সেটি বস্তুসত্তার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধায় সমগোত্রের নিশ্চয়ই! অবশ্য এই ধরনের মিলযুক্ত কবিতা আমাদের সাহিত্যে নিতান্ত কম (এক আছে ছড়া)। একে পরাধীন জাতির আত্মসর্বস্বতা ও কর্মহীনতা, তার উপর ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব। তবু আমরা ড্রাইডেন, পোপ প্রভৃতি পড়েছি, তাই ইংলণ্ডের ক্ল্যাসিকাল মনোভাব কী ছিল কল্পনা করতে পারি। আধুনিক বাঙালি কবি সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে অপরিচিত, পরিচয়ের মাত্রা জোর মেঘদূতের সঙ্গে, যে মেঘদূত সংস্কৃত সাহিত্যের মণি হলেও তার দেহ নয়, প্রাণও নয়। ক্ল্যাসিকাল মনোভাবের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত মহাভারত। যদি আমরা কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদও পড়ে থাকি তবু আমরা খানিকটা বুঝতে পারি। এইটুকু বলবার উদ্দেশ্য যে, প্রতিক্রিয়ার বশে মিল না ছাড়লেও আমাদের চলতো, যদি আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের একাংশের প্রবাহে ভাসতে পারতাম। সংস্কৃত ভাষায় এত বিস্তর শব্দ আছে, যার প্রয়োগে কবির নতুন মনোভাব বেশ ফুটে উঠত এবং সেই সঙ্গে মিল ত্যাগ করবার প্রয়োজনও হতো না। সুধীন্দ্র দত্তকে সংস্কৃতজ্ঞ কেউ বলবে

না, তার জ্ঞান ও প্রবৃত্তি নিতান্ত আধুনিক, তবু সে মিল ছাড়ল না; বিশেষ্য-বিশেষণের ঘষা পয়সা সে-ও চালায় না, কিন্তু ভীষণ শক্ত অর্থাৎ অপরিচিত কথার প্রয়োগে সে দু'কূল রক্ষা করে, কথা অবশ্য সংস্কৃত ভাষার। তার বস্তুসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ভঙ্গিটি বিচারযোগ্য নিশ্চয়ই।

আধুনিক গদ্যকবিদের মিল ত্যাগ করার একটি কারণ ধরা পড়ল সংস্কৃত সাহিত্যের ধ্রুব পদ্ধতির সঙ্গে অপরিচয়, শক্ত অপ্রচলিত কথার প্রয়োগে ভয়। সেই ভয় নানাপ্রকার···লোকে বুঝবে না, রসোপভোগে বাধা পড়বে, গণ্ডিবদ্ধ সাহিত্য হবে ইত্যাদি। অতএব, হুইটম্যান, লরেন্স? তারও প্রয়োজন নেই, প্রমাণ হয় প্রমথ চৌধুরীর সনেটে। সেগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে লেখা হতে পারত। প্রমথবাবুর মনে কোনো···রোমান্স নেই— তিনি হয়তো গদ্যকবি হতে পারতেন।

কারণটি খুব গুরুগম্ভীর ধরনের মনে হবে না জানি। তাই এমন একটি অন্য কারণ বলছি যাতে আপনাদের প্রতীতি জন্মাবে সহজে। কবিতায় যখন বাক্যসম্বন্ধ করা হয় তখন একটা-আধটা বিশেষণ থাকেই থাকে। বিশেষণের এক প্রকার মনের (ও বয়সের) উপর এমন প্রাদুর্ভাব যে, তার জোরেই অর্থ সৃষ্টি হয়— যদি অর্থবাহী মিল সম্ভব হয় তবে বহুত আচ্ছা, নচেৎ বিপদ বাধে। বিশেষণ আমরা বেশি সেধেছি— উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক বিশেষণ আমাদের করতলগত, আঙুলের ডগায় কলমের মুখ দিয়ে সহজেই বেরোয়। মিল খুঁজতে, রবীন্দ্রনাথের পর, বেশি কষ্ট হয় না। তাই এত যুবক এত সহজে অমন চলনসই কবিতা লেখে। কিন্তু বস্তুসত্তার প্রতি অধিক শ্রদ্ধা জানাতে গেলে বিশেষ্যের উপর এবং নতুন সম্বন্ধের প্রতি অধিক শ্রদ্ধার জন্য ক্রিয়া ও অব্যয়ের উপর বেশি ঝোঁক দিতে হবে। আমাদের অভ্যাসে বিশেষ্য কম, ভাষায় ক্রিয়া কম— সবই অসমাপিকা, মোহনবাগানের বিপক্ষের গোলের সামনে খেলার মতন অব্যয়গুলোও নড়বড়ে। অন্যধারে লোকে বুঝবে না তাই সহজ কথার ব্যবহার, জানি না তাই পুরাতন ঘষা পয়সার চালান করতে বাধ্যবাধকতা আসে। মনে কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে, ঘষা পয়সা আর চালানো উচিত নয়। দু'টোয় বিরোধ বাধে··· তার নিষ্পত্তি করা হয় মিল করে। বিশেষণও সেই সঙ্গে ত্যাগ করতে হয়। যদি কোনো গদ্যকবি বিশেষণের মোহে আচ্ছন্ন থাকেন দেখি, তবে তাঁর মামুলি কবি হওয়াই ভালো ছিল মনে হয়। এটা হলো পরীক্ষার দ্বিতীয় compulsory প্রশ্নের উত্তর। বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া নিয়েই বাক্য, অন্তত অধিকাংশ কবির বেলায় তাই। অল্পসংখ্যক লেখকের রচনায় অর্থের তাগিদে বাক্য রচিত হয়। বিশেষণের চাপে অর্থভ্রষ্ট হয় না তাঁদের। সাধারণত অর্থেও নতুনত্ব থাকে না।

কিন্তু যাঁদের অর্থ নতুন, অথচ বিশেষণ পাচ্ছেন না, তখনই তাঁদের গদ্য-কবিতা লেখার প্রবৃত্তি সার্থক।

সেইজন্যই লিখেছিলাম, গদ্য-কবিতাকে কেবল নতুন আঙ্গিক হিসাবে ধরলে চলবে না। তার অন্তরের মনোভাব ও অর্থের নতুনত্ব— অর্থাৎ তার **content**-এর তাগিদে গদ্য-কবিতাই **inevitable** কী না দেখতে হবে। ক্ল্যাসিকাল কবিতা মামুলি হলে বাজে গদ্য হয়, আর আত্মসর্বস্ব কবিতায় গা গুলিয়ে ওঠে— দু'এর মাঝখানে গদ্যকবি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। অন্যধারে কিন্তু বিশেষণের খাদ্যাভাবে, মামুলি মনোভাবের আবহাওয়ার অনভ্যাসে মধ্যস্থিত বিষয় শুকিয়ে যায়— তাই তাকে দেখায় কঠিন, রুক্ষ, **ascetic** ইত্যাদি।

আষাঢ়ে

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে কবি কালিদাসের নামোচ্চারণ করে আপনাদের ধন্য-বাদ জ্ঞাপন করছি। কবি কালিদাস সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু পড়িনি, নোটবুকে যা লেখা আছে তা ছাড়া, আর সে সব কথা এখন মনেও নেই। তাঁর সম্বন্ধে একটা কানাঘুষো শুনেছি যে, তিনি বাঙালি ছিলেন, কারণ না কী মেঘদূতে বর্ষার যে বর্ণনা আছে, সেটি বাংলা দেশের বর্ষার বেলায়ই খাটে। খবরটি কতদূর সত্য তাও জানি না, তবে আষাঢ়ে ক্লাবের কোনো সভায় যদি আষাঢ়ে গল্পের কোনো স্থান থাকে, তা হলে কালিদাসের কবিতা আলোচনা না করে বর্তমান জগতে বাঙালি ও বাংলা কবিতার স্থান নিয়ে গল্পগুজব করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধ হয়। হ্যাঁ, আর একটি কথা মেঘদূতের নাম শুনলেই মনে পড়ে। রুক্ষ বৈশাখের পর অঝোরঝরে বারিপাত হচ্ছে, শুষ্কা ধরণী মৃতসঞ্জীবনীসুধা পান করে নবজীবন লাভ করল, হৃদয় রসাল হলো, আর জেগে উঠল বিরহ, যে বিরহে তীব্রতা আছে, নৈরাশ্য নেই। কোথায় রইলেন কবি কালিদাস, কোথা রইল মেঘদূত, মনে পড়ল বাঙালির নিরাশ জীবন, সরস হৃদয়, পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা। অধ্যাপকীয় মনোভাবের রীতিই সৃষ্টিছাড়া।

আজ বাঙালির মনে নিরাশা আশ্রয় করেছে, সার্থকতার সম্পর্কে সে মন বিরহাতুর। আমাদের কর্মজীবন, ভয়-ভাবনা, সাহিত্য প্রভৃতি দেখলে অন্তত তাই মনে হয়। অথচ, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও বাংলা দেশ ভারতবর্ষকে চালাতো। **What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow.** তখন বাঙালির বুদ্ধি ও অগ্রস্থিতিই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। এই অল্পদিনে বাঙালির কি হলো? প্রায়ই শুনতে পাই যে বাঙালি সব দিকেই হটে যাচ্ছে, কী পরীক্ষায়, কী নেতৃত্বে, কী স্বাস্থ্যে, লোক বলছে বিদ্যা-বুদ্ধিতেও আমাদের স্থান প্রথম বেঞ্চে নয়, মাদ্রাজী মারহাট্টির পিছনে। যাঁদের কাছে এই খবর শুনেছি তাঁরা কেবল ভিন্ন প্রদেশের অবাঙালি নন। বাঙালিদের মধ্যে কেবল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকেই দোষ দিলে চলে না। প্রায় প্রত্যেক বয়োবৃদ্ধেরই এই মত। অবশ্য এই রটনার মধ্যে যেমন একধারে হিংসা রয়েছে তেমনি অন্যধারে লুকানো রয়েছে আকুল দেশপ্রেম, অধীর আদর্শবাদ, বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তীব্র ব্যাকুলতা। কিন্তু আজ আষাঢ়ের প্রথম দিবস, তাই মেঘদূতের পরিবর্তে ভগ্নদূতের আবাহন করতে মন চাইছে না— এমন কী ভগ্নদূতের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত স্বীকার করতে কুণ্ঠা হচ্ছে। নির্যাতিত ভবঘুরে ইহুদীদের কাছেও ব্যাপটিস্ট জনের স্থান জেরেমিয়ার বহু উচ্চে ছিল। কবিতা-হিসাবে উত্তরমেঘের স্থান হয়তো পূর্বমেঘের নীচে হতে পারে—

কিন্তু আজ আমাদের পক্ষে নয়। আজ আশার বাণীর প্রয়োজন রয়েছে। আজ বয়োবৃদ্ধের কাছে শুনে শুনে যুবকদের মনে ধারণা হয়েছে যে আমরা অপদার্থ, কেন না আমরা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করতে পারছি না। কিন্তু হয়তো বাংলা দেশের এমনি কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার দরুন সিভিল সারভেন্টরা সাহিত্যযশঃপ্রার্থী হয়ে ওঠেন, যার দরুন ইনসিওরেন্স কোম্পানীরাও সাহিত্যিক পত্রিকা-প্রকাশে সাহায্য করেন। নিরাশা যুবকদের বেশিক্ষণ ধাতে বসে না, তবে যদি কর্তারা তাঁদের কর্তব্যসাধনে আরো বেশি গম্ভীরভাবে তৎপর হন, তা হলে যুবক-সম্প্রদায়ের মনে নিরাশার কুয়াশা জমে উঠবে। উন্নত ও স্বাধীন জাতির যুবক-মনে এ কুয়াশা স্থান পায় না, পেলেও ক্ষতি হয় না, দার্জিলিঙের কুয়াশায় 'ওজোন' আছে। এমন কী নতুন জাতির অনাবিষ্কৃত মনে এই কুয়াশার সার্থকতা থাকতে পারে—সামুদ্রিক কুয়াশা ভেদ করার মধ্যে অনাগতের আহ্বান আছে। কিন্তু আমরা স্বাধীন নই, উন্নতির সর্বোচ্চশিখরে আমরা উঠিনি, আমাদের অনধিগত ভবিষ্যার্ণবও সুদূর বিস্তৃত নয়। অতএব, আমাদের মনে নিরাশার কুয়াশা ম্যালেরিয়ার নিয়াজ্‌মার মতনই ক্ষতিকর।

নিরাশার একটিমাত্র ক্ষতি উল্লেখ করছি। অনেকে বোধ হয় কুয়াশার রঙ-বাহারকেই কবিতার প্রাণবস্তু বিবেচনা করেন। তাঁরা ভাবেন আশা-নিরাশার দোলাতে না দুললে কবিতার ছন্দজ্ঞান লাভ হয় না। তাঁদের বোধ হয় ধারণা এই যে, জীবনকে পাঠশালায় পরিণত না করলে জীবের দ্বারা কোনো মহৎ কার্যই সাধিত হয় না। পাঠশালাতে পণ্ডিতমশাই ভয় দেখিয়ে পড়া নিতেন। আজকালকার পণ্ডিতেরা ভয় দেখিয়ে জাতকে বড় করতে চান। ভয় দেখিয়ে ভালো কাজ করানো যায় না, যে কাজ হয় সেটি খুব উচ্চশ্রেণীর নয়। আজকালকার তরুণ-তরুণী প্রায় সকলেই কবিতা লেখেন— এত বেশি লেখেন যেন মনে হয় আচার্য-দেবের, অবাঙালি ব্যবসায়ী ও বাঙালি বয়োবৃদ্ধের তীব্র প্রতিবাদেই তাঁরা লিখে যাচ্ছেন, যেন প্রমাণ করতেই ব্যস্ত যে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সিভিল-সার্ভিস অ্যাকাউন্টস্ পরীক্ষায় হটে গেলেও ভাবরাজ্যে, বিশেষত কবিতায় আমরা এখনও নিখিল ভারতের অগ্রণী! এই কবিত্বশক্তির প্রকোপবৃদ্ধির মধ্যে একটা কোথাও যেন ঝাঁজ আছে। বাইরের প্রতিকূল অবস্থার বিপক্ষে দাঁড়াবার সাহস ও বীর্যের সঙ্গে এ ঝাঁজের কোনো মিল নেই। এ যেন মনের সঙ্গে মতের লড়াই— এ যেন আত্মবিশ্বাসের অভাবের দৈন্য, যে দৈন্যের জন্য মেজাজ-মাফিক কেউ বা দুঃখবাদী হয়, কেউ বা চিৎকার করে আদর্শবাদ ও তারুণ্যের গুণগান প্রচার করে। আজ-কালকার কবিতা অখাদ্য বলছি না, বরঞ্চ শব্দসম্পদ ও ছন্দের বৈচিত্র্যে এখনকার কবিতা পূর্বের কবিতার চেয়ে বেশি মনোহারী। তবু অকপটে স্বীকার করতে হবে

যে মাত্র কয়েকজন কবিরই নিজস্ব বস্তু আছে। তাঁদের কথার ঢঙও একই ধরনের, দুঃখবাদের। তাও আবার সে দুঃখবাদ গভীর নয়— এই আমার দুঃখ! হবে কি করে? যুবকের মনে দুঃখবাদ কী নৈরাশ্য জাঁতার মতো বসতে পারে, না— শেওলার মতো ভাসতে থাকে। যে নিরাশায় যুবক-মন তলিয়ে যায় সে নিরাশা ক্ষণিকের। নিরাশা অবাস্তব নয়, খাঁটি সত্য— কিন্তু প্রিয়ার সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মুহূর্তেই বিরহী যক্ষ যে ভাবোদ্গার করেন নি, তার প্রমাণ আছে মেঘদূতের প্রত্যেক ছত্রে। বাস্তবকে খুন করবার পর তার কালো রক্ত দিয়ে ভালো কবিতা লেখা হয়— ক্ষণিকের কবিতা প্রলাপ মাত্র, যেমন শ্মশান-বৈরাগ্য ক্ষণস্থায়ী। এই প্রকার মিথ্যা নিরাশাকে আশ্রয় করে যে কবিতা রূপ নেয়, সে কবিতা শান্ত ও গভীর হয় না। শান্তরসের উদ্ভাবনা না করতে পারলে উচ্চশ্রেণীর কবিতা লেখা অসম্ভব। মানসিক ঝড়ের আবর্তে পড়ে অনেকে কবিতা লিখেছেন শোনা যায়, কিন্তু ঝড়ের মধ্যে একটি শান্ত কেন্দ্র আছে, সেই কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হলে কবিতা সম্ভব— এই হলো খাঁটি খবর। শান্তরসের উদ্বোধনে রসবস্তু যে সত্তা, যে অস্তিত্বটুকু অর্জন ও অধিকার করে, তার আবেদন সর্বদেশের, সর্বকালের, সার্বজনীন। নিরাশার কবিতা সমশ্রেণীর নয়। একটি পুরাতন ধ্রুপদ শুনলে রস-পিপাসার যে তৃপ্তিসাধন হয় আমি তারই ইঙ্গিত করছি। আপনাদের বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মিউজিয়মে একটি পার্বতী মূর্তি আছে— তার মধ্যে যে অচঞ্চলতা, যে আত্মসমাহিত ভাব লক্ষিত হয় আমি তারই ইঙ্গিত করছি। এর বেশি আমি বোঝাতে পারব না। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই— আজকালকার কবি— ভাষা ও ভাবের দিক থেকে অনেক সুবিধা সত্ত্বেও ধীর ও শান্তভাবে কবিতা লিখতে পারছেন না— প্রায় সব কবিতাতেই অধৈর্য, অশান্তি ও অসংযমের লক্ষণ পাচ্ছি। নিশ্চয়ই কবির অন্তরে কোথায় গলদ আছে, দ্বন্দ্ব আছে। সবচেয়ে বড় গলদ হলো আত্মবিশ্বাসের অভাব, সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব হলো যুবক-সুলভ আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব। আমাদের নেতৃবর্গ আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছেন না, আমরা উচ্ছন্ন যাচ্ছি এই বলে নিরাশই করছেন। আজ বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের প্রয়োজন বড়ই অনুভব করি।

আমি কবিতার দৃষ্টান্ত ইচ্ছা করেই দিয়েছি। অবাঙালিকে জিজ্ঞাসা করুন বাংলার বৈশিষ্ট্য কি? উত্তর পাবেন— বাংলার সাহিত্য, প্রধানত কবিতা, তাঁদের কাছে কবিতার অর্থ ভাববিলাস। মহাত্মাজী সত্যবাদী ও স্পষ্টবাদী ব্যক্তি, কিন্তু সত্য কথা তিনি বলেন অতি প্রিয়ভাবে। তিনি বলেছেন, "আমি বাংলার ভাব-প্রাচুর্য ও কবিতার ভক্ত।" মহাত্মাজীর মতপ্রকাশে যাঁদের আত্মপ্রসাদ আসে তাঁদের আসুক, কিন্তু আমার আসে না। তিনি বাঙালি বলতে হয়তো তাঁর বন্ধু রবীন্দ্রনাথকেই বোঝেন। অন্য বাঙালিদের মধ্যে তিনি যাঁদের

জানেন তাঁরা সকলেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সেই যোগদানের মধ্যে তর্কবুদ্ধি অপেক্ষা ভাব-ভক্তির অংশই বেশি ছিল বললে বোধ হয় তাঁদের প্রতি অন্যায় বিচার করা হবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, তাঁর কবি-জীবনে ও জীবনের অন্য দিকে ভাব ভিন্ন অন্য গুণেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং সেই সব গুণের আধার বলেই, সেই সব গুণের সমন্বয় করতে পেরেছেন বলেই তিনি প্রকৃতপক্ষে অত বড়। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে যাঁরা ভাবের প্রাধান্য দেখেছেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ভালো বোঝেননি। যে বৈরাগ্যসাধনে তিনি মুক্তি চাননি সে বৈরাগ্য কেবল নঙর্থক; তিনি জীবনের সমগ্র উত্তম জিনিসকে সাধনার দ্বারা লাভ করেছেন ও আমাদেরও লাভ করতে বলেছেন; তবে সে সাধনার ফলে আয়াসের গলদ্ঘর্ম ভাবটি থাকবে না, থাকবে মাত্র অধিকারের অভিজাত সহজ স্ফূর্তি, এই হলো তাঁর প্রাণের কথা। রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দেওয়া যাক। পুরাতন কালের বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগের বাঙালিদের কথাও ছেড়ে দিলাম। মহাত্মাজীর অবিদিত নেই যে বাংলা দেশে গত একশ বৎসরের মধ্যে রাজা রামমোহন, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, অশ্বিনীকুমার, আশুতোষ জন্মেছেন, যাঁদের প্রকৃতিতে ভাবের অত্যাচার সুস্পষ্ট নয়। তাঁদের প্রত্যেকের প্রকৃতিতে আমি ভাবের সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে কর্ম-প্রবৃত্তির যোগাযোগ দেখি এবং সেই যোগাযোগের ফলে তাঁরা সম্পূর্ণ ব্যক্তি, পুরুষ, ইংরেজীতে যাকে বলে persons, individuals নয়। অথচ তাঁরা পুরোপুরি বাঙালি। আমি শেষের দু'জনকে দেখেছি, দু' চারবার তাঁদের সঙ্গে কথাও কয়েছি, বিবেকানন্দের ভাববিলাস ও মাটিতে গড়াগড়ি যাওয়া সম্বন্ধে কী মত ছিল অশ্বিনীকুমারের মুখে শুনেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজের দৃষ্টান্ত প্রবাদ বাক্য হয়ে উঠেছে। আর রামমোহন? তাঁর মতন প্রাণবান পুরুষ ক'টা মেলে। তন্ত্রের শক্তি, বেদান্তের সাহস ও শুদ্ধ বুদ্ধি, ইসলামের তেজ, খ্রীস্টানের করুণা ও ভক্তি— সব ধারা এই মহাসাগরে মিশেছিল। তাঁদের কথাও বাদ দেওয়া যাক। মহাত্মাজী নিশ্চয়ই জানেন যে, অসহযোগ-নীতি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ না করেও, গভর্নমেন্টের চাকরি করেও বাংলা দেশে শহরে শহরে অনেক দেশপ্রেমিক নীরবে কাজ করে এসেছেন, এখনও করছেন। এ সংবাদ অবাঙালির পক্ষে জানা তত সহজ নয়। মহাত্মাজী মহামানব, তাঁর কাছে কিছুই অবিদিত নয়। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, তবে সংবাদ হিসাবে। যে জানার ফলে সমগ্র জাতির, বিশেষত আমাদের মতো বর্ণসঙ্কর জাতির বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার সম্ভব হয়, সে জানা বাস্তবিক পক্ষে তাঁর কাজ নয়। মহাত্মাজীর মধ্যে প্রাদেশিক দ্বেষ-হিংসা তিলমাত্র নেই শুনেছি, অন্যান্য অবাঙালিদের মধ্যে অল্পবিস্তর আছে। নানা কারণে সেই দ্বেষ-হিংসা উৎপন্ন হয়েছে, বোধ হয় প্রধান কারণ হলো আমাদের পরিশীলনের

সম্পূর্ণ রূপ-সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। অন্য প্রদেশের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আমার যা ধারণা হয়েছে তাই বলছি। আমাদের বিপক্ষে তাঁদের প্রধান আপত্তি ওঠে আমাদের ভাষাপ্রীতি নিয়ে। তাঁরা বলেন, "আপনারা আমাদের ভাষা গ্রহণ করেন না, যতক্ষণ দলের মধ্যে বাঙালি না থাকেন ততক্ষণ ভাঙা হিন্দী কী উর্দুতে কাজ চালান, কিন্তু যেই একজন বাঙালি এলেন, অমনি আমাদের অস্তিত্ব উড়িয়ে দিয়ে বাংলাতে তাঁর সঙ্গে ভাববিনিময় শুরু হলো।" আপত্তির জবাব দিয়েছি—"অভ্যাসটির উৎপত্তি আমাদের ভাষাপ্রীতিতে, আমাদের সাহিত্য অনেক অগ্রসর হয়েছে, আমাদের বক্তব্য মাতৃভাষায় যতটা প্রকাশিত হয়, অন্য প্রাদেশিক ভাষায় ততটা হয় না।" তর্ক চলে অনেকক্ষণ, তাঁদের মধ্যে যাঁরা মাথাঠাণ্ডা লোক তাঁরা অন্য আপত্তি তোলেন, ভাষাপ্রীতি থেকে আমাদের ভাষার ইতিহাসে, ভাষার ইতিহাস থেকে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য, তাই থেকে আমাদের চরিত্রালোচনা শুরু হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেই এক সিদ্ধান্ত— বাঙালি বড় ভাবপ্রবণ। নিয়তির মতনই সিদ্ধান্তটি স্থির ও অবিচল— আমরা বড় ভাবপ্রবণ— প্রমাণ আমাদের সাহিত্য— বিশেষত কবিতা। আমাদের সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের দৌড় অতটাই।

বিদেশী রাজ-কর্মচারীদের মধ্যেও এই ধারণা। বাঙালির প্রকৃতি অত্যন্ত অশান্ত, বাঙালিকে চালানো, বাংলা শাসন করা ভারি শক্ত, কারণ বাঙালি নিতান্ত ভাবপ্রবণ। তাঁরা অবশ্য সাহিত্য ছাড়া অন্য প্রমাণও দিয়ে থাকেন। একাধিক ইংরেজ রাজ-কর্মচারী ও অধ্যাপকের কাছে এই ধরনের মন্তব্য শুনেছি। এমন কী রোনাল্ডসে সাহেবের মত ছিল তাই।

সব চেয়ে মজার কথা হলো যে, আমাদের নিজেদের মনেও ঐ ধারণা গড়ে উঠছে। শ্রীঅরবিন্দের পর স্বদেশী-বিদেশী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বিপিনচন্দ্র পালকে বাংলার জাতীয়তাবোধের প্রধান দার্শনিক ব্যাখ্যাকার ভেবে এসেছেন। তাঁরই কল্যাণে আমরা বুঝেছি যে, বাংলার বৈশিষ্ট্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব পদাবলী। তাঁর ব্যাখ্যার প্রচার-কার্যে সহায়ক হয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন, তাঁর সম-সাময়িক নেতাদের মধ্যে মতিলালবাবু নিতান্ত পরিচিত কারণে এই মতেরই প্রচার করেন। তাই আজ আমাদের বিশ্বাস, বাংলার কৃষ্টি আর বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য এক বস্তু।

এই মতটি সম্পূর্ণ ভুল। যদিও স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের সমাজে, বিশেষত সাহিত্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব খুবই ব্যাপক। সমাজের অন্তরে কোন্ প্রভাবের কতটুকু ব্যাপ্তি মাপা না গেলেও বলা চলে যে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে পৌরাণিক হিন্দুয়ানি এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারই বেশি, যদিও খুব কম বৈষ্ণবই দেখেছি যাঁরা পৌরাণিক হিন্দুয়ানির শাক্ত-অংশটুকুর সঙ্গে

অন্য অংশগুলি বাদ দেন। আদমশুমারিতে খাঁটি বৈষ্ণবদের সংখ্যা দু' লক্ষের কিছু বেশি। চলতি হিন্দুয়ানির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের ছাপও যথেষ্ট। তা ছাড়া ইস্‌লাম ও খ্রীস্টান সভ্যতার বিপক্ষে আত্মরক্ষা ও তাদের সঙ্গে আদান-প্রদানে হিন্দু-সমাজে বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে— যার ফলে হিন্দু সমাজ বর্তমান আকার ধারণ করেছে। আমার বক্তব্য হলো এই— আদান-প্রদানেই বাংলার বৈশিষ্ট্য, ভাবের উচ্ছ্বাসে নয়। ভাবের আতিশয্যে আদান-প্রদান সম্ভব হয় না, ভাবের জোরে হয় পুরোপুরি গ্রহণ, না হয় পুরোপুরি ত্যাগ। সামঞ্জস্য-বিধান, সমযোগ-সাধন, কী কালানুবর্তিতার জন্য ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রয়োজন। হয়তো বুদ্ধির অর্থই তাই।

বাঙালি কেবল হিন্দু নয়। বাংলার একটি মুসলমান-সমাজও আছে। জন কয়েক মুসলমানের রচিত উৎকৃষ্ট মরমী কবিতার দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো হয় যে, বাঙালি মুসলমানও ভাবপ্রবণ। মরমী (mystic) ভাবের সঙ্গে ভাবালুতার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয় সে কথা না হয় নাই তুললাম। কিন্তু মরমী কবিতা দিয়ে বাঙালি মুসলমান-সমাজের বৈশিষ্ট্য বিচার করা উচিত নয়। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরে ধর্মের যে নতুন প্রবাহ বইছে তার মধ্যে ওয়াহাবী আন্দোলনই উল্লেখযোগ্য। সে-আন্দোলনে ভাবালুতা নেই। ইসলাম ধর্মের অশুদ্ধতা বর্জন করে আদিম অকৃত্রিম শুদ্ধতার প্রতি মনঃসংযোগ করাকে কর্মপ্রবৃত্তি বলাই ভালো। এর তুলনা দেওয়া চলে ইগনেশিয়াস্ লয়লার প্রবর্তিত আন্দোলনের সঙ্গে, আদিশূর, রঘুনন্দন, দেবীবরের সমাজ-বন্ধনের সঙ্গে। সমাজ-শুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধির কৃচ্ছ্রসাধনই বর্তমান থাকে। কর্মপ্রবৃত্তিকে ক্রোচের ভাষায় moral sence বলা চলে। ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে মুসলমান-সমাজে চারুকলার প্রসারলাভ হয়নি, কিন্তু কর্মপ্রবৃত্তি উন্মুখ হয়েছে নিশ্চয়ই। অবশ্য আমি বাইরে থেকে এই সন্দেহ পোষণ করি।

সন্দেহ সমর্থিত হয় অন্য উপায়ে। বাংলা দেশে মুসলমান জাগরণের ইতিহাস পড়লে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, কেবল চাকরি ও ভোট পাবার আশাতেই তাঁরা হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন। কোনো সমাজকে অতটা অদূরদর্শী ভাবতে পারি না— জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চাকুরে জাতি হবার দুরাশাকে অদূরদর্শিতা ছাড়া আর কি বলব? মাত্র ভোট পাবার জন্য এই প্রকার ব্যগ্রতাও বুঝি না— যে সমাজে এই প্রকার ব্যগ্রতা সম্ভব সে সমাজে পলিটিক্যাল সেন্স খুবই জাগ্রত বলতে হবে। মুসলমান-সমাজে এই ধর্মবিরহিত পলিটিক্যাল সেন্স জাগ্রত হয়নি, হওয়া উচিত মুসলমান নেতারা বিশ্বাস করেন না। অথচ তাঁদের জাগরণকে মানতেই হবে। গোটাকয়েক মরমী কবিতা, যাত্রাসঙ্গীত, আউল-বাউল, ফকিরি

গানের আওয়াজে তাঁরা জেগে ওঠেনি। তাঁদের জাগরণের মূলে আছে ওয়াহাবী আন্দোলন— অন্য অর্থনৈতিক মূলের উল্লেখ করলাম না।

অতএব মোট কথা এই দাঁড়াল যে, সমগ্র বাঙালি সমাজকে ধরলে বিপিন-বাবুর ব্যাখ্যা একদেশদর্শী মনে হয়। এত কথা বলবার প্রয়োজন হলো দু'টি কারণে — (১) আমাদের নৈরাশ্য দূর করবার জন্য আমাদের নিজেদেরই চেষ্টা করতে হবে; (২) আমার বিশ্বাস নৈরাশ্য দূর করা খুব শক্ত হবে না যদি আমরা জানি যে, আমাদের স্বভাবে ভাবালুতা থাকলেও আমাদের কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হলো ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ও মানসিক ধারার সমন্বয়-সাধন। নিজেকে জানাই সাধনার প্রথম কথা। নিজেকে জানাবার জন্য আমাদের সম্বন্ধে অন্যদের ভুল ধারণাও দূর করতে হবে। আমরা কেবল ভাবপ্রবণ কবিতাই লিখি এ ধারণা যিনিই পোষণ করুন না কেন, তিনিই ভুল করেন, তা তিনি যত বড় নেতা, যত বড় চিন্তশীল লেখক হোন না কেন? আত্মবিশ্বাসী হবার জন্য পূর্বাভিমত ত্যাগ করতে হয়, আত্মসন্ধানী হতে হয়, অর্থাৎ সমাজের ইতিহাস জানতে হয়। পুঁথি ঘাঁটা ইতিহাস চর্চা নয়; যে ইতিহাস অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের কাছে প্রত্যাশা করেছিলাম, যে ইতিহাস-চর্চায় ইতিহাস তৈরি হয়।

বাংলার সামাজিক ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। লেখা একজনের কর্ম নয়। নিজের সাধ্যও নেই। কাজটা আমারও নয়, আমি সমাজতত্ত্বের ছাত্র, আমার কাজ ইতিহাস লেখা নয়, সমাজের ছক ও গঠন দেখানো। আমি কেবল সামাজিক ইতিহাসের একটি **blue print** কিংবা ছক আঁকতে পারি। পণ্ডিত-দের কর্তব্য সেই ছকের ওপর নক্সা আঁকা, যুবকদের কর্তব্য হলো নক্সা বুঝে ইমারত খাড়া করা।

(১) বাংলার ভৌগোলিক সংস্থান। বাংলা দেশের জমির প্রথম কথা তার সবর্ণতা— **homogeneity**। বাংলার মধ্যে তিন-চারটি স্বাভাবিক ভৌগোলিক বিভাগ থাকলেও বাংলা দেশ নদীমাতৃক, এমন কী তার সমস্তটাই ব-দ্বীপ বলা চলে। নদীপুলিনের মাটি, প্রচুর বারিপাত এবং ভিজে হাওয়ার জন্য বাংলা দেশ একটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ব-দ্বীপের বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলার জল-বায়ুতে, ফল-ফসলে, ইকনমিক জীবনে প্রথমত পরিষ্কারভাবে, পরে অপরিস্ফুট হয়ে ইতিহাসে ও আরো অস্পষ্ট হয়ে বাঙালির মানসিক গঠনে প্রতিফলিত হবেই হবে। ভৌগোলিক প্রতিবেশ যে আমাদের একমাত্র ভাগ্য-বিধাতা তা বলছি না।

তবু ভূগোলকে বাদ দিলে চলবে না নিশ্চয়ই। বাংলা দেশের ম্যালেরিয়ার জন্য নদীর স্বাভাবিক বহতা বন্ধ করাই দায়ী সকলেই স্বীকার করেন এবং

ম্যালেরিয়ায় জন্য দেশের লোক মারা যাচ্ছে, দেশের গ্রাম জনশূন্য হচ্ছে, নাগরিক সভ্যতার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমরা সকলেই জানি। হিন্দু-আমলে মহাস্থান, মুসলমান-আমলে গৌড়, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ; ইংরেজ-আমলে কলকাতা, রাজধানীর এই স্থানপরিবর্তনের জন্য নদীর বহতাই অনেকটা দায়ী। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনার স্থান স্বতন্ত্র।

(২) জাতির গঠন (racial composition)। যে যাই বলুন না কেন বাঙালি জাতি শুদ্ধ জাতি নয়, বর্ণসঙ্কর জাতি। আর্যরক্ত আমাদের ধমনীতে অতিশয় ধিকি-ধিকি বয়। উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে প্রথমে নেগ্রিটো, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল থেকে অস্ট্রলয়েড এবং দ্রাবিড়ী, পরে পূর্বদেশ থেকে মুণ্ডা, তারও পরে আলপাইন বংশ মিলেমিশে এই বর্ণসঙ্কর জাতি তৈরি করেছে। রক্তের পবিত্রতা আমাদের মধ্যে নেই। অবশ্য, প্রশান্ত মহলানবিশ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছি, অর্থাৎ যতই আমরা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যাই, ততই অনার্য দেহবৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ পাই। এখন যাঁরা জাতির গঠনের উপর জাতির কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য অনেকটা নির্ভর করে বিশ্বাস করেন, তাঁদের এই তথ্য দু'টি মনে রাখলে ভালো হয়। জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যতটুকু পড়েছি তাতে কোনো সামান্য সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছতে পারিনি। কোনো জাতির কী বৈশিষ্ট্য আছে বৈজ্ঞানিক ভাবে বলা যায় না, আমার মতে। যাঁরা বিশ্বাস করেন, বলা যায় তাঁরা বাঙালি জাতির গঠনবিন্যাস নিয়ে যদি আলোচনা করেন, তবেই বাঙালির কৃষ্টির ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে।

জাতির গঠনের পর জাতির সংখ্যার কথা মনে রাখা উচিত। বর্গমাইল পিছু বাংলার লোকসংখ্যা ভারতে সবচেয়ে বেশি—বাংলা ৬১৬, উঃ-পঃ ৪৪২, বম্বে ১৭৩, মাদ্রাজে ৩২৮, ইংলণ্ডের মতো কৃষিবিহীন দেশে ৬৮৫। ফলে গড়পড়তা চাষভূমি বাংলার সবচেয়ে কম—২·৮ একর, বম্বে ১২·৪, মাদ্রাজে ১৩·২ উঃ-পঃ ৩.৪।

(৩) দেশ ও পাত্র আলোচনার পর বাঙালির কৃতিত্বের পরিচয় পেতে হবে। প্যাট্রিক গেডিস্ যাকে work বলেছেন সেটা মুখ্যত ভৌগোলিক প্রতিবেশকে বশে এনে শক্তি-সঞ্চয়, শক্তির প্রকাশ ও তার ব্যবহার। ভাষা পরিবর্তন করে একে forces of production বলাও চলে। বাংলা দেশের সম্পর্কে বিশেষত দু'টি জিনিসের অভিব্যক্তির ইতিহাস জানা চাই। একটি চরের ও নিম্নভূমির কৃষিকার্যের ও দ্বিতীয়টি জমিসত্ত্বের। কৃষিকার্যের মধ্যে প্রথমত ধান ও তারপর পাট প্রভৃতি। ধানের ইকনমিক্স যে যব গম ও পাটের ইকনমিক্স থেকে ভিন্ন এ কথা সর্ববাদি-সম্মত। জমিসত্ত্ব সম্বন্ধে মাত্র

এইটুকু এখানে বলা চলে যে, জমিদার ও চাষীর মধ্যে মধ্যসত্বোপভোগীর দল ও শ্রেণী বাংলা দেশে যত বেশি অত বেশি ভারতে কুত্রাপি নেই। তা ছাড়া **Permanent Settlement** তো রয়েইছে।

(৪) পূর্বোক্ত ছকটি লেপ্লে ও প্যাট্রিক গেডিসের। এই ত্রি-মূর্তি ছাড়া অন্য একটি মূর্তির পূজার প্রয়োজনও আছে। সে মূর্তিটি চোখে পড়ে না, সেটি বিগ্রহ মূর্তি নয়, তবু সেটি আছে। তার নাম ঐতিহ্য। একে **time co-ordinate of culture** বলা চলে। মাত্র কালক্ষেপে যে ভার জমে ওঠে, সেই ভারই ঐতিহ্যের। আমাদের সর্বাঙ্গে সেই ভার পড়ে বলে আমরা সেই ভার সম্বন্ধে সচেতন নই, কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সর্ব দেশেরই ঐতিহ্যের মধ্যে আমরা চারটি ধারা লক্ষ করি—(ক) ভাবের—বাংলা দেশের বৈষ্ণব ও সহজিয়া সাহিত্যে এই ভাবধারার পরিচয় মেলে, (খ) সাধনার—তন্ত্রেই এর পরিচয় পাই; (গ) বুদ্ধিবৃত্তির—ন্যায়ের, বিশেষত নব্য ন্যায়ের মধ্যে এই ধারা প্রবাহিত; (ঘ) চারুকলার—কবিতা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীতেই এই ধারার প্রকৃষ্ট প্রকাশ। ঐতিহ্যের প্রত্যেক ধারাটি বিশ্লেষণ করতে গেলেই বাংলার রাজকীয় ইতিহাসের তাৎপর্য ফুটে উঠবে। রাজকীয় ইতিহাসের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও ইংরেজের যুগ আছে। যুগ কথাটি ব্যবহার করছি সুবিধার জন্য। মোদ্দা কথা হলো এই যে, রাজার প্ররোচনায় এবং হিন্দু-আমলে স্মার্ত পুরোহিত, বৌদ্ধ-আমলে পুরোহিত ও শ্রেষ্ঠীর দল, মুসলমান-আমলে জায়গীরদার ও ইংরেজ-আমলে মুৎসদ্দী, আড়তদার ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তার আদান-প্রদান ঘটেছিল। ফলে আমাদের বাঙালির বর্তমান অবস্থা।

এই অবস্থার প্রধান গুণ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা। গুণটি অল্পসল্প পরিমাণে সব সমাজেই আছে; কারণ জীবনের অর্থই হলো খাপ খাইয়ে নেওয়া। তবে আমাদের সমাজে বেশি বললে অত্যুক্তি হবে না। এই গুণার্জনে আমাদের বাহাদুরির চেয়ে হয়তো তাগিদই বেশি ছিল। তাগিদ ইতিহাসের, এক কথায় আত্মরক্ষার, প্রধানত বিদেশী ও বিধর্মী রাজার বিপক্ষে। সেজন্য বাঙালি হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি অন্য প্রদেশের সামাজিক গোঁড়ামি অপেক্ষা অনেক কম। পরিশীলনের দিক থেকে এই খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। এ ভাষায় নেই কি? পর্তুগীজ, আরবী, ফরাসী, ফারসী, ইংরেজী সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত সবই আছে। আর আছে বিদেশী ভাব ও সমস্যার বেমালুম আত্মসাৎ। বাঙালি আত্মসাৎ করতে বরাবরই তৎপর; মিথিলার নব্য ন্যায় থেকে আরম্ভ করে তরুণ সাহিত্যিকের

সমস্যা পর্যন্ত সবই এই শক্তির সাক্ষ্য দেয়। একে অনুকরণ বলে হেয় মনে করা অন্যায়। অনুকরণে সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে থাকে। আমি একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি।

বাংলা দেশে অনেক দিন থেকেই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারা চলছে আমরা জানি। বাংলার নিজস্ব সম্পদ কীর্তন এও সকলে জানি। কিন্তু এককালে পুরাতন পদাবলী হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীতেই গাওয়া হতো বলে মনে হয়, অন্তত পদাবলীর উপর যেসব রাগরাগিণীর নাম লেখা থাকে সেগুলো লোক-সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী নয় নিশ্চয়ই। অনেকে মনে করতে পারেন যে লোক-সঙ্গীত থেকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ঐ সব রাগিণী গ্রহণ করেছিল। সর্বক্ষেত্রে তা যে নয় তার প্রমাণ আছে। অথচ এটা সুনিশ্চিত যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রভাব বিস্তারের পূর্বেও কীর্তন গাওয়া হতো। সে কীর্তন কী দোঁহার, কী রূপ ছিল তা আমরা জানি না। ড. প্রবোধ বাগচির কাছে শুনেছি যে, নেপালের কোনো পাণ্ডুলিপিতে অনেক রাগের নামোল্লেখ আছে— সে রাগ অন্তত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে নেই, কীর্তনিয়ারাও সে সব রাগে গান না। হয়তো একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে দোঁহা ও লোক-সঙ্গীত ঐ সব রাগিণীতে গাওয়া হতো। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে— বৈষ্ণব পদাবলী মুসলমান যুগের প্রায় সমসাময়িক, অতএব মুসলমানদের প্রবর্তিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতির প্রভাব পদাবলী কীর্তনে থাকা অস্বাভাবিক নয়। এখন অবশ্য কোনো কীর্তনিয়াই হিন্দুস্থানী রাগরাগিণী বজায় রেখে গান না। হিন্দুস্থানী রাগ ছাড়া কীর্তনে অন্য কোনো রাগিণী ছিল না কিংবা অসম্ভব তাও বলছি না। কীর্তনে কথার তান আছে, অতএব তান ও তালের বৈশিষ্ট্যও থাকবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কথাপ্রধান, ভাবপ্রধান কীর্তনও মুসলমানদের প্রবর্তিত হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণী আত্মসাৎ করেছিল— যার ফলে অন্তত এককালে, কীর্তনের সাহায্যে সঙ্গীত-রস উদ্বুদ্ধ হতো। ইচ্ছা করেই সঙ্গীত-রস লিখলাম, কারণ কথার সঙ্গে সুর, সুরের সঙ্গে কথা মেলানোই হলো এই adaptability-র একটি চরম বিকাশ। ক্রমে যদি পদ-কীর্তন নাম-কীর্তনে নেমে থাকে সেজন্য অন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কিন্তু যাত্রাসঙ্গীত, রামপ্রসাদ, নিধুবাবুর টপ্পা থেকে রবিবাবু, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল প্রভৃতির রচনায় পূর্বোক্ত সঙ্গীত-রসেরই সাক্ষাৎ পাই, যে রসসৃষ্টি আমাদের pliability-এর নিদর্শন। সাধে কী যুগলমূর্তি আমাদের অত প্রিয়!

পূর্বে বলেছি যে বাংলার ইতিহাস লেখা একার কর্ম নয়। আপনারা এই নক্সাটির আলোচনা করুন। অন্য নক্সা যদি তৈরি হয় আমি তার আলোচনা করব, ভালো হলে গ্রহণ করব। ব্যাপার হলো এই— বাংলার কৃষ্টি একরোখা

নয়, mosaic-এর সঙ্গে তার তুলনা চলে। বাংলার ঐতিহ্য এখনও শেষ হয়নি, এখনও চলছে। কোনো কালচারকেই ফল হিসাবে দেখলে চলে না— কোনো কালচারই নেতার হাতের আমলকী নয়; তার অভিব্যক্তি আছে, পর্যায় আছে, ক্রম আছে, প্রসার আছে, অতএব তার বিধি আছে, নিয়ম আছে। কৃষ্টির বিধি-নিয়ম জানতে হবে— জানলে বোধ হয় আমাদের পরিশীলন সম্বন্ধে লজ্জা কী সংকোচের কোনো কারণ থাকবে না। আমরা ভাববিলাসী নই, মোটেই নই, অমরা চলিষ্ণু চরের চাষী, বর্ণসঙ্কর জাতি। আমরা বৌদ্ধ ও ইস্‌লাম ধর্মকে নিজের করে নিয়েছি, মিথিলা থেকে নব্য ন্যায় এনে নবদ্বীপে বসিয়েছি। আমাদের গাদাধরী, জাগদীশী দক্ষিণ ভারতেও প্রচলিত, পরের কাছ থেকে ভাষা নিয়েছি, আবার পরকে আমাদের ভাষার খাতির করতে বাধ্য করিয়েছি, অথচ নিজের ভালো বড় বেশি ত্যাগ করিনি; কোটালিপাড়া, গুপ্তিপাড়া, ভাটপাড়াতে এখনও শ্রুতিস্মৃতির আলোচনা হয়; ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ইংরেজ বণিকের সঙ্গে আমরা সর্বপ্রথমে কারবার করি, তাদের মারফত পশ্চিমী সভ্যতার মূল্য বুঝতে শিখি, অন্য প্রদেশকে তার মূল্য বোঝাই। তা ছাড়া আমাদের ভাব-সম্পদ আছে। আমরা কবিতাই লিখি না, আমরা কবিতাও লিখি। আমাদের অতীত নেহাৎ হেয় নয়। অতএব নিরাশার প্রয়োজন নেই। এ রকম দুর্দিন আমাদের বহুবার এসেছে, আমরা কাটিয়েও উঠেছি। গত শতব্দীতে এত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও আমাদের দেশে এমন জন-কয়েক লোক উঠেছেন, যাঁদের জন্মভূমি বলে যে কোনো দেশ গরব করতে পারে। তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। বিপদ কাটিয়ে ওঠবার শক্তি আমরা ইতিহাসের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। যদি বাঁচবার প্রবল ইচ্ছে কোনো রোগীর থাকে তা হলে রোগী বেঁচে ওঠে এবং প্রত্যেক সংকট-রোগ হয়ে ওঠে, উন্নতির এক একটি মোড় ফেরা, ধাপ। নেতার মুখে দেশ উচ্ছন্ন গেল বলাও যা আর ডাক্তারের মুখে মারা গেল বলাও তাই। বিধবা বৃদ্ধার বেলা ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় মারা গেলেও দেশ আমাদের বিধবা হয়নি— বয়স আমাদের তিন কুড়ির ওপারে নয়।

ধান ভানতে শিবের গীত গাইলাম। কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই। কেন আপনাদের শহরে অক্ষয়কুমার মৈত্রের বাসভূমি? কেন বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি এই শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাঙালি জাতিকে পালবংশের অতীত গৌরব-বাণী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে— তার ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত সংকেত জ্ঞাপন করছে? কেন এই শহরের বাঙালি কবি রজনী সেনের দেশপ্রেম কানে সদা ঝঙ্কৃত হয়? কেন কালিদাস বাঙালি ছিলেন গুজব উঠল, কেন মেঘদূত পড়লে বাংলা দেশের

কথা স্মরণ হয়, কেন মনে জাগে এক তীব্র উজ্জ্বল মধুর বিরহ, কেন উত্তরমেঘের মিলনাকাঙ্ক্ষা মনে ওঠে ?

নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে
তৎ কল্যাণি ত্বমপি সুতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্ ।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমি ক্রমেণ ॥
শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা ।
পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণত শরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥

আর সবশেষে প্রশ্ন ওঠে, কেন আপনাদের সমিতির নাম 'আষাঢ়ে' রাখলেন ?

১৩৪১

সঙ্গীত-সমালোচনা

সঙ্গীত যে এতদিন আমাদের দেশে ওস্তাদের গলায় ও হাতে রয়েছে তার ফলে সঙ্গীতের কি উন্নতি হয়েছে? গোটাকয়েক প্রচলিত এবং দু' একটা অপ্রচলিত সুরের রূপ তাঁদের কৃপায় বেঁচে আছে ছাড়া আর অন্য কোনো সুফল হয়েছে বলতে কুণ্ঠা বোধ হয়। অনেক ভালো ভালো সুর যে তাঁদের জন্য লোপ পেতে বসেছে বলাই বহুল্য। ওস্তাদরা নতুন সুরের নামই বলতে চান না, এমন কী তাঁদের প্রিয় শিষ্যের কাছেও। প্রচলিত সুরের শুদ্ধ রূপ সম্বন্ধেও নানা মত রয়েচে। একজন ওস্তাদ অন্য ওস্তাদের সুরকে শুদ্ধ বলতে রাজি নন। ফলে তিন-চার রকমের 'শুদ্ধ' টোড়ী, চার-পাঁচ রকমের 'শুদ্ধ' মল্লার, 'শুদ্ধ' কল্যাণ শুনতে পাওয়া যায়। কারুর মতে 'শুদ্ধ' একটি নতুন সুর, কিন্তু সে সুর কীভাবে গাইতে হবে কেউ দেখিয়ে দেন না। দু' রকমের দেশকার, দু' রকমের বিভাস শুনেছি, এক ভূপালি ঠাটে, অন্যটি ভৈরোঁ ঠাটে। প্রত্যেকেই শপথ করতে রাজি যে তাঁর সুরই শাস্ত্রসঙ্গত। সকলেই নিজের মত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। বড় ওস্তাদদের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক— ছোটখাট ওস্তাদরা বেশির ভাগ সময় প্রচলিত রূপ থেকে সুরকে ভ্রষ্ট করে ফেলেন। দেড় শ' দুই শ' ধ্রুপদ শিখেও একের অধিক সঙ্গীত-শিক্ষককে ইমনকল্যাণে কোমল নিখাদ লাগাতে শুনেছি, আবার সেই কোমল নিখাদ নিয়ে তর্কও হয়েছে।

ভ্রষ্ট সুর মাত্রেই শ্রুতিকটু বলছি না। বরঞ্চ এ কথা বলা যায় যে, স্বরের অভিনব মিশ্রণ ও যোগাযোগেই সুরের যা কিছু নতুন রূপ তৈরি হয়েছে। তবে নতুন সুর তৈরি করা আর ওস্তাদী গান গাইতে বসে ভুল গাওয়া এক জিনিস নয়। নিজের খেয়ালের বশে সুর ভাঙা ও স্বরের নতুন সমাবেশ করা এমন ব্যক্তিই পারেন যিনি আসরে ওস্তাদী গান গাইতে বসে ভুল গান না— অথচ মুখস্থ বিদ্যার চাপে যাঁর সৃজনী-শক্তি এবং প্রবৃত্তি বিনিষ্ট হয়নি। এই রাসায়নিক মিশ্রণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। মৈহারের আলাউদ্দিন খাঁ অন্তত দশ-বারোটি নতুন সুর তৈরি করেছেন। সেগুলোকে পুরাতন নামের মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না, এক দিগ্‌গজ পণ্ডিতের কাছে শুনেছি। অবশ্য সবগুলিই যে মধুর রূপ পেয়েছে তাও বলা যায় না। 'আলাউদ্দিন' বাংলা দেশের সবে ধন নীলমণি।

বাংলা দেশে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারায় নতুন কিছু হচ্ছে না। গত কয়েক যুগ ধরে যা কিছু নতুন হচ্ছে তার সঙ্গে ওস্তাদদের কোনো সম্পর্ক নেই। মাদ্রাজে যেমন ত্যাগরাজা, তেমনি বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতে নতুন যুগ এনেছেন।

উত্তর ভারতের নানান ধরনের গান শুনে মনে হয় যে, সঙ্গীত-ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল ওস্তাদী সঙ্গীতে অভ্যস্ত হলেও নিজে ওস্তাদ নন, যদিও তাঁর কাছে আমি একাদিক্রমে দশখানি ভালো খেয়াল শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের পরেই অতুলপ্রসাদের স্থান। তিনি বাংলা ভাষায় ঠুংরি এনেছেন। মেটেবুরুজে ওয়াজিদ আলি শাহের বন্দীজীবনের সময় থেকেই ঠুংরির ভাবপূর্ণ মধুর তানে বাঙালি অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। সেই থেকেই অতুলপ্রসাদ বাংলার দূত হয়ে লক্ষ্ণৌএ প্রবাসী হয়েছেন। একেই ইতিহাসের প্রতিশোধ বলে। অতুলপ্রসাদের লক্ষ্ণৌবাস বাংলা দেশের সঙ্গীত ইতিহাসের একটি আধুনিক অধ্যায়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে যোগসূত্র তিনি বজায় রেখেছেন— সেই যোগসূত্রের সাহায্যে বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালের মালা গাঁথাই তাঁর মৌলিকত্ব। রবীন্দ্রনাথের মৌলিকত্ব আরো উচ্চস্তরের। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, ভাষা ও ভাবের দিক থেকে, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে তাকে উপযুক্ত নতুন সুরে মূর্ত করা আরো শক্ত। দ্বিতীয়ত, গত দশ-পনেরো বছর ধরে, রবীন্দ্রনাথ সুরে এমন একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারা এনেছেন যার সঙ্গীত হিসাবে মূল্য তানসেন-কৃত দরবারী কানাড়া, কিংবা মিয়াকী মল্লার অপেক্ষা কম নয়। রবীন্দ্রনাথের ধারাটি কিন্তু কোনো মোগলাই তারিখের তোয়াক্কা রাখে না। এক সময় অবশ্য ছিল, যখন রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সুরের ছকে গান বসাতেন। যখন থেকে দেশী সঙ্গীত, অর্থাৎ বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালের স্রোত তাঁর প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করলে তখনই তিনি নিজের সন্ধান পেলেন, স্বাধীন হলেন। এতদিন হচ্ছিল অনুকরণ, হাতে খড়ি, এখন শুরু হল সৃষ্টি। এই বোধ হয় জীবনের রীতি। দেশের সন্ধান, দরবার ও নগরের বাইরের মাটির ও গ্রামের সন্ধান, শূদ্র ও যবনের সন্ধান যখন পাওয়া যায়, তখনই মানুষ, জাতি, সভ্যতা নবজীবন লাভ করে। মাটির সন্ধান পেয়েছেন বলেই রবিবাবু সঙ্গীতকে নবজীবন দিতে পেরেছেন। সে যাইহোক গত দু' তিন বৎসর রবিবাবু যেসব গান লিখেছেন তাতে না আছে মাটির গন্ধ না আছে পেঁয়াজের। সেসব একেবারেই নতুন, তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, যার তুলনা আমাদের দেশে অন্তত নেই। অবশ্য যে কান ওস্তাদী সুরে তৈরি, সে কানে অতুলপ্রসাদের গান রবীন্দ্রনাথের গান অপেক্ষা বেশি ভালো লাগবে। তবুও অতুলপ্রসাদ ওস্তাদ নন।

ইদানীং বাংলা দেশে দিলীপকুমার গানে এক নতুন চাল এনেছেন। এই চালের বিশেষত্ব আছে স্বীকার করতেই হবে। তিনি বলেছেন যে, তাঁর কাজ বাংলা গান হিন্দুস্থানে চালে গাওয়া খুবই সম্ভব তাই দেখানো। আমার

মনে হয় যে, শুধু এই দেখানোই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এ কাজ তাঁর পূর্বে অনেকে করেছেন। যেমন ৺শরৎবাবু, ৺মন্মথ রায়, ৺বিজয় লাহিড়ী প্রভৃতি। এখনও সুরেন মজুমদার মহাশয় অনেক বাংলা গান, রবিবাবুর গান পর্যন্তও হিন্দুস্থানী ঢঙে গান। আমার বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় 'নাতনী লো তোর জন্য ভেবে ভেবে মরি', 'রসান দে লো স্যাকরাণী' প্রভৃতি অভদ্র গান পাকা সুরে শুনেছি। শ্যাম ও শ্যামা বিষয়ক চমৎকার ভাবোদ্দীপক গানও ওস্তাদরা গাইতেন। দিলীপকুমারের কৃতিত্ব এই নয় যে, তিনি গ্রাম্য ভাষার স্থলে তাঁর পিতার, কাজীর, নিরুপমা দেবীর কিংবা স্বরচিত কবিতা গান। ভাষার দিক থেকে তাঁর সঙ্গীতের বেশি দূর তারিফ করা চলে না। আমার মনে হয় যে, তিনি গানে সত্যই এক নতুন চাল প্রবর্তিত করেছেন, যার মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকলেও যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এ চাল মোটেই শুদ্ধ নয়, সম্পূর্ণ মিশ্র, যাকে জংলা বলে। খেয়াল আরম্ভ করে টপ্পা, ঠুংরি, ভজনের তান মেশানো, এমন কী কীর্তনে, ভজনে ঠুংরির খোঁচ দেওয়া— এই সব প্রথাবিগর্হিত কাজ তিনি সদাসর্বদাই করেন। তাঁর ঠুংরিও নতুন ধরনের। খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরির বেড়া ভেঙে দিয়ে তিনি সঙ্গীতকে অনেকটা মুক্ত করেছেন। তাঁর গলার মাধুর্য, তানের ক্ষমতা, ভাবপ্রকাশের শক্তি এবং রীতিমত শিক্ষার অভাব, এক কথায় তাঁর প্রতিভাই তাঁকে এই মুক্তির সাধনায় সাহায্য করেছে। মুক্তির পর সঙ্গীত একটা নতুন রূপ নিয়েছে। অজস্র তানের মধ্যে, ভাববিলাসের অন্তরালে, সাহিত্যের তাড়নায় সে রূপ আত্মগোপন করলেও যে কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি সে রূপের আভাস পেতে পারে। এই রূপসৃষ্টিই তাঁর নৈপুণ্য, তাঁর বিশেষত্ব। কিন্তু দিলীপকুমার ওস্তাদ নন, তিনি ওস্তাদের কাছে অনেক গান শিখলেও, রীতিমত ওস্তাদী পদ্ধতিতে কারুর কাছে বহু বৎসর ধরে কৃচ্ছ্রসাধন করেননি— কিংবা যা করেছেন তার চেয়ে বেশি অনেকেই করেছেন। তিনি মনে মনে যাঁকে গুরুর পদে অভিষিক্ত করেছেন, সেই সুরেনবাবুও পাকা ওস্তাদ নন।

রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও দিলীপকুমারকে একাসনে বসাতে চাই না। রুচি সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার করবার ক্ষমতা নেই। লেখবার সময় লাইন সোজা রাখতে হয়, এই কদভ্যাসের জন্যই তাঁদের নাম একসঙ্গে করছি। কিন্তু ওস্তাদী ধরনে শিক্ষার অভাব হিসাবে তাঁরা এক পঙ্‌ক্তিতে হয়তো বসতে পারেন। আর এক হিসাবেও তাঁরা সমান না হলেও এক শ্রেণীর অন্তর্গত। ওস্তাদ নন বলে ওস্তাদের কুশলতা কোথায় সম্পূর্ণভাবে না বুঝতে পারলেও তাঁরা ওস্তাদী সুরের যথার্থ প্রেমিক। পাকা গানবাজনা শুনে তাঁরা অতি সহজে

সঙ্গীতের মর্মস্থলে পৌঁছতে পারেন— অন্য রাস্তায় নিজেদের হারিয়ে ফেলেন না। সুরের প্রকৃত রূপ তাঁরা এত সহজে এবং এত দৃঢ়ভাবে ধরতে পারেন যে, আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। বিশ-পঁচিশ বছর গান শুনে লোক হয়তো সুরের নাম-ধাম, কোথায় কী পর্দা লাগছে বলতে পারেন, কোথায় তাল কাটল বুঝতে পারেন— কিন্তু সুরের মর্ম গ্রহণ করতে হয়তো তাঁদের মধ্যে সকলেই পারেন না। সুরের মর্ম গ্রহণ করবার জন্য অন্য একটি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, তার নাম artistic sense, যেটি পূর্বোক্ত তিন জনের মধ্যে কমবেশি সকলেরই আছে। একটি উদাহরণ না দিয়ে থাকতে পারছি না। অতুলপ্রসাদের একটি গান আছে— 'তুমি কবে আসিবে মোর আঙিনায় ?' অন্তরা হচ্ছে 'কত বেলী কত চামেলি যায় বৃথা যায়'। অন্তরাটি মীড়ের জন্য অতি মধুর শোনায়। সুরটি জৌনপুরী টোড়ী—তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, 'আশাবরী বোধ হয়'। বাংলা দেশের সাধারণ ওস্তাদ আশাবরী ও জৌনপুরী একই ধরনে গেয়ে থাকেন। তাই শুনে তিনি সুরটিকে আশাবরী বলেছিলেন। কিন্তু নাম-ধামের কথা ছেড়ে দিলে জোর করে বলা যায় যে, জৌনপুরী টোড়ীর এমন রূপটি খুব কম ওস্তাদই দেখাতে পারেন। কোনো ওস্তাদ রবিবাবুর মতন ভৈরবী ও মল্লারের প্রাণের সন্ধান পেয়েছেন ? অবশ্য এই ধরনের দিব্যজ্ঞান প্রতিভাসাপেক্ষ স্বীকার করি— কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার সাহায্যে সাধারণের মধ্যে এই দিব্যজ্ঞানের আংশিক উন্মেষ সম্ভব মনে হয়। প্রেমেই যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার বন্ধুদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা ওস্তাদ না হয়েও সুরের প্রেমিক ; এই সম্প্রদায়ই সঙ্গীতের ভরসাস্থল। এই সম্প্রদায়ই যথার্থ সমালোচনা করতে পারেন। এঁদের সংখ্যা বাড়ানোই সঙ্গীত শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ওস্তাদের হাতে এবং সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে শুধু ওস্তাদ তৈরি হচ্ছে—রুচি তৈরিও হচ্ছে না, মার্জিতও হচ্ছে না।

অতএব আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, গত যুগে বাংলা দেশে সঙ্গীতের যা কিছু উন্নতি হয়েছে সবই প্রায় এমেচারের দ্বারা। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, নতুন ধারাগুলিকে অক্ষুণ্ণ ও সজীব রাখতে হলে শিক্ষিত সমালোচনার প্রয়োজন। সঙ্গীত-রাজ্যেও শিক্ষিত সমালোচকের স্থান আছে। সাহিত্যে স্রষ্টা ও সমালোচকের ব্যবধান লোপ পাচ্ছে। তার একটি কারণ এই যে, সাহিত্য-সমালোচনা সাহিত্য-সৃষ্টির মতন ছাপাতে হয়। কিন্তু সঙ্গীত-সমালোচককে গেয়ে কিংবা বাজিয়ে দোষগুণ দেখাতে হয় না। আমাদের যদি স্বরলিপি থাকত তা হলে সঙ্গীত-সমালোচনা ক্ষণিক উত্তেজনা অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হতে পারত সন্দেহ নেই। সেইজন্যই বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ইতিহাস

থাকলেও, সুর-সমালোচনার ইতিহাস নেই। দেশে অনেক সমঝদার ছিলেন, এখনও আছেন— তাঁরা গানবাজনা শুনে ভালোমন্দ লেখবার প্রয়োজন আছে মনে করেননি— এখনও করেন না। বিলেতী কাগজে রেকর্ড-সমালোচনা পড়েছি —এ দেশে তা সম্ভব নয়, যে কাগজে গ্রামোফোন কোম্পানি বিজ্ঞাপন দেয় সে কাগজে রেকর্ড সমালোচনা প্রকাশিত হতেই পারে না। লোকসান হবার ভয় সকলেরই আছে। সঙ্গীত-সমালোচনার অভাবের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সঙ্গীত ভাব-রাজ্যের ব্যাপার এবং আমাদের সঙ্গীত নিতান্তই আধ্যাত্মিক বলে লোকের ধারণা। অতএব 'বাহবা' কিংবা 'ধুত্তোর' বলা ছাড়া শ্রোতার অন্য কর্তব্য যে আছে শ্রোতা নিজেই জানেন না। সাহিত্য-সমালোচনাতে ভালোমন্দের কারণ দেখাতে হয়— অন্তত দেখানো দরকার, সমালোচক তা জানেন, সাধারণ পাঠকও কারণ দেখবার দাবিদাওয়া করেন। কিন্তু একটা মীড়, কিংবা খোঁচ, একটা বি-সম কিংবা অনাঘাতে বাহবা দেওয়া হলো কেন, কারণ জিজ্ঞাসা করবার সময় ও প্রবৃত্তি হট্টগোলে একেবারেই থাকে না। হট্টমনের প্রাদুর্ভাবে 'বাহবা' কিংবা 'ধুত্তোর' আপনা হতেই নিঃসারিত হয়। লোকে বাহবা দিচ্ছে অথচ শ্রোতা একলা দিচ্ছেন না— একথা মনে হলেই শ্রোতা লজ্জিত হয়ে পড়েন। অনেক আসরে আমি অনেক ওস্তাদ সমঝদার, কদরদানকে কেন বাহবা দিচ্ছেন প্রশ্ন করেছি— কী রকম উত্তর পেয়েছি বেশ মনে আছে। ওস্তাদ বলেছেন— 'চুপ রহো বেটা, ইয়ে তুম্‌হারা কাম নেহি— শুনিয়ে বাবু সাব, ক্যা গান্ধার লাগায়া, ক্যা শ্বাস!' 'ইয়ে ঘরোয়ানা চীজ, ইয়ে বাঙ্গালীয়োঁকো কাম নেহিজী'— 'ইয়ে আপকো ইলাকা মে নেহি' ইত্যাদি। দু' একজন ওস্তাদ অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে দিতেন বটে, কিন্তু, আলাবন্দের গমক্, ফৈয়াজের তান, রাজাভাইয়ার মূর্ছনা, আল্লাদিয়ার বিকৃত তান, কালে খাঁর হলকৃতান শুনে কেন পাগল হওয়া উচিত কেউ আমাকে বুঝিয়ে দেননি। অন্যে যে বোঝাননি, বোঝাতে পারেননি এবং আমিও যে বুঝিনি তার অন্যতম কারণ এই যে, সঙ্গীত এখনও সাহিত্যের মতন সাধারণের ভোগ্য হয়নি— এখনও দরবারী চীজ হয়েই রয়েছে, এখনও পেশাদারের মধ্যে, একটি trade union-এর মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে, যেখানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রবেশ নিষেধ। সঙ্গীত এখনও একটি গোপনীয় আচার বলে গণ্য হয়। মন্ত্রগুপ্তি হাজার ভালো হলেও, সাধারণ লোক কিছুই গোপন রাখতে দেবে না। বুড়ো মুন্নে খাঁর মুখ থেকে শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জনকার মাত্র একটি বার এক উদ্ভট সুর, ইমনবেলাওল শুনে তৎক্ষণাৎ খাঁ সাহেবকে গেয়ে শোনান। তাতে খাঁ সাহেব বলেছিলেন— 'বাবুজী, আমার ওস্তাদ সাদেক আলি খাঁ আমাকে বিশ বছর সাগির্দী করবার পর এই সুর শেখান, আমার শিখতে তিন মাস লেগেছিল—

আর আপনি তিন মিনিটে মেরে দিলেন। আপনি যাদু জানেন, আপনি জিন।' কদর পিয়ার পুত্র চৌলাক্কির নবাবসাহেবও ঐ ধরনের কথা বলেন, কিন্তু তিনি তাঁর পিতার সব ঠুংরিগুলিই শ্রীকৃষ্ণকে দিয়েছেন। মুন্নে খাঁ ওস্তাদ— নবাব সাহেব নবাব। প্রকৃত শিক্ষার্থীর কাছে গোপন রাখা অন্যায় মনে হয়— আর যদি প্রকাশ করবার ক্ষমতা না থাকে তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। সমালোচনার সুবিধার জন্য গোপেশ্বরবাবুকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি স্বরলিপি ছাপিয়ে শিক্ষিত সমালোচনার পথ কতখানি যে পরিষ্কার করেছেন, বলে শেষ করা যায় না। তিনি অন্তত শিক্ষাদানে কৃপণ নন।

গড়পড়তা ধরলে, পেশাদার ওস্তাদের দ্বারা সঙ্গীত-সমালোচনা অসম্ভব মনে হয়। এ কার্যটি শিক্ষিত সম্প্রদায়কে হাতে তুলে নিতে হবে। সঙ্গীতে শিক্ষিত ব্যক্তি বলতে আমি এই গুণগুলির আধারকে বুঝি, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে অভিজ্ঞতা, **artistic sense** অর্থাৎ রূপজ্ঞান ও রসবোধ, যথার্থ বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং নতুন কিছু সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যতদূর হোক আর না হোক, মনের প্রসারতা এবং উদারতা— এক কথায় বৈদগ্ধ্য। কোন্ গুণটি কতখানি থাকলে সঙ্গীত সমালোচনার সুবিধা হয় ওজন করে বলতে পারি না— তবে সব গুণগুলিই চাই।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সকলকেই শিখতে হবে এবং ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধে। হিন্দী ও উর্দু ভাষায় এত ভালো ভালো গান আছে যে, বেছে নেওয়া ভারি শক্ত কাজ। শুধু কাব্য কিংবা শুধু সুর ও তাল হিসেবে ভালো গানের কথা বলছি না— কথা ও সুর মিশিয়ে যে রচনা তার কথাই বলছি, যেমন পূরিয়ার 'জরদ অঙ্গিয়া'। ওস্তাদরা শেখাবার সময় সাধারণত সুরের দিকেই নজর দেন, শিক্ষার্থীরা সাধারণত নজর দেন কথার দিকে। খুব কম ওস্তাদের কাছে ভালো চালের গান পাওয়া যায়। সাধারণত মুসলমানী ওস্তাদের খেয়াল, ঠুংরি, গোয়ালিয়র, রামপুর এবং গোঁসাইজীর ঘরের ধ্রুপদ, রমজানী টপ্পা, আলাবন্দে, জাকরুদ্দীনের আলাপ ও মারহাট্টা গায়কের ধামার ও তেলানার চালই মধুর মনে হয়। অবশ্য এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে ও থাকতে বাধ্য। আমার মনে হয় খেয়াল ঠুংরিতে মুসলমানী ঢঙ-এর মতন ঢঙ আর নেই, হদ্দু খাঁ ও তানরাজ খাঁর ঘরোয়ানা ভারি কঠিন। হিন্দু গায়কদের মধ্যে বেনারস, গোয়ালিয়র (শঙ্কর পণ্ডিতের ঘর), গয়া ও বেথিয়ার চালই ভালো মনে হয়। বাঙালি ওস্তাদরা অনেক সময় সুর বজায় রেখে গানের চাল বিকৃত করেন। তাঁদের কাছে ভালো রচনা খুব কম পাওয়া যায়, যা পাওয়া যায় তার বাণী অশুদ্ধ। মোট কথা এই, ভালো ওস্তাদ খুজে তাঁর কাছে পাখি পড়ার মতন গান মুখস্থ করতে হবে। অন্ততপক্ষে পঁচিশখানি সুরের খান পঞ্চাশেক গান নির্ভুল করে

গাইতে না পারলে শিক্ষিত সমালোচক হওয়া যায় না। তারপর ওস্তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। বেশি দিন ওস্তাদের কবলে থাকলে বুদ্ধিভ্রংশ হয়, প্রাণ নিয়ে পালানো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এমন গুরু খুব কমই আছেন যিনি শিষ্যকে চিরকালের জন্য নাবালক ভাবেন না। ওস্তাদের দল এই কথা শুনে যেন দুঃখিত না হন। পূর্বোক্ত মন্তব্য অধ্যাপকের দল সম্বন্ধেও খাটে। অধ্যয়নের সুবিধা এই যে, তার কাল নির্ধারিত, অধ্যাপকের সুবিধা এই যে, তাঁর বেতন নিয়মিত। নিয়মিত সময়ের অতিরিক্তকাল শিক্ষা দেওয়ায় অধ্যাপকের কোনো স্বার্থ নেই। সে যাই হোক, ওস্তাদের হাতে আমাদেরকে কয়েক বৎসরের জন্য থাকতেই হবে, না হলে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মহিমা বোধগম্য হবে না এবং মৌলিকত্বের মূল্য দিতেও পারব না। বাংলা দেশের গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রভাব অনেকখানি— সে প্রভাব দূর করা যাবে না, দূর করা উচিত নয়। বাউল কিংবা কীর্তন হাজার মধুর হলেও তার এমন ক্ষমতা নেই যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে তাড়িয়ে দেয়। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের স্বপক্ষে। রবিবাবু কিংবা অতুলপ্রসাদ কিংবা দিলীপকুমার কখনও বলেন না যে, তাঁদেরই গান সব সময় গাইতে হবে, অথবা তাঁদের গান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে গুণ্ডার মতন বাংলার বাইরে নির্বাসিত করবে— তাঁরা নিজেরাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভক্ত— নিজেরাই অনেক সময় হিন্দুস্থানী কিংবা উর্দু গান গেয়ে থাকেন। কেবল রবিবাবু কিংবা অতুলপ্রসাদের গান শিখে শিক্ষিত সমালোচক হওয়া যায় না। শিক্ষার জন্য হিন্দুস্থানী পদ্ধতিকে আয়ত্ত করতে হবে।

শিক্ষিত ব্যক্তির **artistic sense** থাকা চাই। শিক্ষিত ব্যক্তি কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা ভালো নয় অতি সহজে বুঝতে পারেন— যিনি বুঝতে পারেন না তিনি শিক্ষিত নন। শিক্ষিত ব্যক্তি অনেক সময় নির্বাচন করতে পারলেও শিক্ষার ভার যখন বেড়ে যায়, তখন চার ধারে চোখ রেখে, সব মূল্যকে ওজন করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তিনি সচারচর পারেন না দেখেছি। তখন শিক্ষিত ব্যক্তি পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। সিদ্ধান্তে আসতে সময় লাগে, অথচ সিদ্ধান্ত চাই— না হলে মানুষ স্থাণু জড়ভরত হয়ে পড়ে। কীট্‌সের একখানা চিঠিতে আছে যে, শেক্‌সপীয়রের মস্ত গুণ ছিল এই যে তিনি রায় মুলতবী রাখতে পারেন— **He had a capacity for suspending judgement.** এখানে **judgement** বলতে যদি নৈতিক ভালোমন্দর কথা নির্দিষ্ট হয়, তা হলে অবশ্য নাট্যকারের বহির্মুখীনতার জন্য মতামত গোপন রাখা, সিদ্ধান্তে না পৌঁছানোই লেখকের বাহাদুরি মানতে হবে। কিন্তু যে বিচারশক্তির প্রসঙ্গে

যথাযথ ঘটনা ও তাহার সমাবেশ এবং প্রকাশ সম্ভব হয়, যে শক্তি রোধ করলে আর্ট সংক্রান্ত কোনো কাজই করা যায় না— না করা যায় রচনা, না করা যায় সমালোচনা। অবশ্য রায় লেখা ও জাহির করার মধ্যে সংযম চাই। অনেকে বলেন, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আর্টিস্টের তফাত এই যে, শেষ কথা বলবার অধিকার বৈজ্ঞানিকের নেই। কিন্তু যিনি কোনো বৈজ্ঞানিকের মনের সঙ্গে পরিচিত তিনিই বলবেন যে মূল্য নির্বাচন ও নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে আত্মপ্রকাশ করা নিয়ে বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আর্টিস্ট ও আর্ট-সমালোচকের কোনো আন্তরিক পার্থক্য নেই। যোগের দ্বারা যেমন ইন্দ্রিয়গুলি এত সুমার্জিত হয় যে, তাদের সেই পুরাতন ইন্দ্রিয় বলে চিনতেই পারা যায় না, তেমনি শিক্ষার পর মনে হয় যেন একটি নতুন ইন্দ্রিয় ফুটে উঠেছে— চোখ খুলেছে, বুদ্ধি খুলেছে। এই নতুন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দিব্যজ্ঞানের নাম sense of values, মূল্যজ্ঞান। আলাদা করে দেখলে এই দিব্যজ্ঞানের তিনটি দিক আছে, এর মধ্যে বুদ্ধির কাজ বিচার, ভাবের কাজ ভালো লাগা না-লাগা এবং ইচ্ছাশক্তির কাজ সিদ্ধান্তে আসা। কিন্তু নব্য মনোবিজ্ঞানে মানসিক ঘটনাকে ভাগ করা উঠে গেছে, যদিও সম্পূর্ণভাবে ওঠেনি— যতদিন মনোবিজ্ঞান অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, ততদিন উঠবে না— আপাতত সম্পূর্ণভাবে উঠে যাবার দরকারও নেই। আপাতত একটি নতুন সংজ্ঞার দরকার হয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রে ও পদার্থ বিজ্ঞানে যেমন space time কে একটি concept করা হয়েছে, তেমনি মনোবিজ্ঞানে বিচার-বুদ্ধি, ভাব এবং ইচ্ছাশক্তিকে একটি concept-এ গ্রথিত করবার সময় এসেছে। এই তিনটি মিলিয়ে একটি psychosis করে বুঝলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মূল্যজ্ঞান একটি অখণ্ড মনোভাব (psychosis)— এর মধ্যে cognitive, affective এবং conative elements সব বজায় আছে। অবশ্য সাধারণত সব চিন্তাতেই এই ইচ্ছাময়ী কিংবা কার্যকরী শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

আর্টের ক্ষেত্রে দর যাচাই করার সঙ্গে বাজারে আলু-পটলের দর যাচাই করার পার্থক্য এই যে, আর্টে ব্যবহারিক শক্তির ক্রিয়া এবং প্রভাব কম। একেবারে নেই বলতে পারি না— না হলে প্রকাশ ও সৃষ্টি অসম্ভব হয়, না হলে মূক ও মুখর কবির, সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ্ ও করিতকর্মা ওস্তাদের মধ্যে তফাত থাকে না। আর্টে মূল্যজ্ঞান সম্বন্ধে যা ভেবেছি তাই লিখছি। নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি শুধু যে সুর-সৃষ্টি কিংবা সুর-সমালোচনা সম্বন্ধেই খাটে তা নয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে, প্রায় সব মহারথীরাই আজকাল সৌন্দর্যানুভূতিকে অন্য অনুভূতি থেকে একটু পৃথকভাবে দেখছেন। সকলেরই প্রায় ধারণা যে, রূপ বেছে নেবার কিংবা সৃষ্টি করবার সময়ে, ইচ্ছাশক্তির কাজ ক্ষণিকের জন্য বন্ধ থাকে,

'conation is relatively at least in suspense and therefore also judgement and belief.' অবশ্য এই ক্ষণিক বোধের অবস্থা নাইট্রোগ্লিসারিনের মতন নিতান্ত অস্থায়ী। কিন্তু তাই যদি হয়, কোন্ শক্তিতে মানুষ তুলি নিয়ে বসে, কলম নিয়ে বসতে যায়, সেতার হাতে তোলে? এটা বেশ বুঝি যে রূপ-সৃষ্টির বিশেষত্ব আছে— কিন্তু তাই বলে ক্রোচের মতন conation-কেই expression বলতে এবং সেই সঙ্গে intuition-কে তাদের সঙ্গে equate করতে মন নারাজ হয়।

(১) যদি সময় ও পর্যায়ের দিক থেকে মূল্যজ্ঞানের উদয় শিক্ষার পর, তবুও কার্যত এই জ্ঞানকে পূর্বতন সংস্কার বলেই মনে হয়। গান কানে শোনা ও ভালো গান বলে চেনার সম্বন্ধটি কেবলাত্মক, স্বপ্রকাশিত, অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধিত বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধের যেন কোনো ইতিহাস নেই, এ সম্বন্ধ যেন সময়ের অতিরিক্ত। এ সম্বন্ধ নিয়ে কোনো প্রশ্নই তখন ওঠে না— এর যেন কোনো প্রমাণের কারণ দেখাবার প্রয়োজন নেই। Abercombie একেই face-value, Self-evident worth whileness বলেছেন। মূল্য-নির্ধারণের বিশ্লেষণ করতে মন চায় না বলে এই জ্ঞানকে synthetic এবং a priori বলা যেতে পারে। তার মানে নয় যে বিশ্লেষণ করা যায় না, কিংবা বিশ্লেষণ করা মহাপাপ।

(২) এই জ্ঞানে এমন একটি আনন্দ ও তৃপ্তি আছে যার জন্য মানুষের সমগ্র মনোবাঞ্ছার পূরণ হয়, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং ভাবের বৈলক্ষণ্যে যে অশান্তি ওঠে তার সহজ নিরাকরণ হয়। আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না— 'ঘরে বাইরে'র মাস্টারমশাই, 'গোরা'র পরেশবাবু, 'Brothers Karamazov'-এর Alyosha, এমন কী Abbe Coignard-এর চরিত্রে যে শান্তি সব পাঠকই লক্ষ করেছেন তার উৎস এই আনন্দ। অরবিন্দের মুখে কবি এই শান্তির ছাপ দেখেছেন। বিদেশী সভ্যতার আঘাতে এই মূল্যজ্ঞান ও আনন্দ লোপ পাচ্ছে। ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মূল্যজ্ঞানের অভাবে কোনো তৃপ্তি ও শান্তির চিহ্ন পাই না, সেখানে অনেক সময় গান কী সাহিত্য সম্বন্ধে যে রুচির পরিচয় পাই, তাকে ভদ্রজনোচিত বললে ভদ্রতার অর্থ ভিন্ন করে করে লিখতে হয়।

(৩) এই জ্ঞানের ন্যায্যতা, উপযোগিতা কোনো বাহ্য উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে না। যখন গান সত্যই ভালো লাগে তখন কোনো বাইরের মতলবে যে ভালো লাগে তা নয়। সাধারণত যে যে কারণে গান ভালো লাগে, সে কারণগুলি মতাকারের ভালো লাগার পক্ষে অবান্তর। সুন্দরী স্ত্রীলোকের হাতের অখাদ্য রান্না খেয়ে তারিফ করা যা, আর সুন্দরী স্ত্রীলোকের মুখে অশ্রাব্য গান

আর হাতের অশ্রাব্য এসরাজ শুনে তারিফ করাও তাই। দু' কাজেই যথার্থ মূল্যজ্ঞানের অভাব প্রমাণিত হচ্ছে। কেশরঞ্জন তেলে আলু ভাজলে, মুড়িতে শাম্পেন মেশালে আলু ও মুড়ি অখাদ্য হয়ে পড়ে। বাইরের আদর্শকে সত্য, শিব, সুন্দর প্রভৃতি হিন্দু-ভোলানো যত বড় বড় সংস্কৃত নাম দেওয়া হোক না কেন, মূল্যজ্ঞানের সঙ্গে তার কোনো নাড়ীর সম্পর্ক নেই। আর্টের ধর্ম নিষ্কাম। রূপসমাবেশ এবং রস-রচনা ছাড়া আর্টিস্টের অন্য কোনো কামনা থাকতে পারে না। এই ধরনের 'কামনা' বড় যোগীরও থাকে— পরমহংসদেব নিজে স্বীকার করেছেন। আর কামের কথা। ফ্রয়েড সব বোঝেন হয়তো, কিন্তু আর্ট তিনি বোঝেন না— বাজারে-আর্টকে আর্ট মনে করলে সেই আর্টের মধ্যে কাম কেন বাকি পাঁচটি রিপুর সব কয়টিকেই পাওয়া অতি সহজ।

(৪) সময় এবং ইতিহাস যখন মানবমনেরই সৃষ্টি, তখন মানুষের প্রাপ্তি হিসেবে, মূল্যজ্ঞানের ইতিহাস, অর্থাৎ গতিরও দিক আছে। ঐতিহাসিকভাবে কোনো জ্ঞান কিংবা অনুভূতিকে বুঝতে ভয় হয়, কারণ ঐতিহাসিক আদিত্বকেই বর্তমানের মূল্য বলে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু যখন সবই বদলায় তখন ইতিহাসকে বাদ দেওয়া যায় না। সেইজন্য ইতিহাসকে আদিবৃত্ত না ধরে ইতিবৃত্ত হিসেবে বুঝলে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। গোমুখীর সৌন্দর্য ভোগ করতে গোমুখী যাবার দরকার নেই, যদিও মুঙ্গেরের গঙ্গা গোমুখী থেকেই উঠেছে। পথে কিন্তু কত নদ-নদীই না মিশে গঙ্গাকে ভরিয়ে দিয়েছে। কষ্টহারিণী ঘাটের সৌন্দর্য নির্ভর করছে গঙ্গার বিশালতার ওপর, সে বিশালতা ঐতিহাসিক, গোমুখী বিশাল নয়, তার ইতিহাস নেই। ইতিহাসকে accumulative-ভাবে বুঝতে হবে। এইভাবে, মূল্যজ্ঞান আদিতে প্রবৃত্তিমূলক, অন্তে বোধ হয় মূল্যজ্ঞানের সঙ্গে আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, কিন্তু মধ্যে মূল্যজ্ঞান বুদ্ধি, ভাব ও ইচ্ছাশক্তিকে জড়িয়ে কাজ করে। অতএব মূল্যজ্ঞানকে ঠিক 'জ্ঞান' বলা যায় না— অনুভূতি বললে ক্রোচের খপ্পরে পড়তে হয়। দিব্যজ্ঞান বললেও থিয়সফির-গর্তে পড়তে হয়। ভাষা নেই বলে একে জ্ঞান বলছি— এ একটা psychosis।

(৫) মূল্যজ্ঞান emergent বলে মনে হয়। এ জ্ঞান অনেকগুলি খণ্ডজ্ঞানের সমষ্টি নয়। এটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি বিশেষ। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কী বলছি বোঝা যাবে। এক-একজন ওস্তাদ রাগিণীর প্রকৃত রূপের পরিচয় না দিয়েই তান ছাড়তে আরম্ভ করেন। তান শুনে শ্রোতৃবৃন্দ হকচকিয়ে গেলেন— শতমুখে প্রশংসা আরম্ভ হলো। কিন্তু মূল্যজ্ঞান (sense of values) থাকলে কোনো ওস্তাদ বনেদ না গেঁথে ইমারত তোলেন না। শিক্ষিত সমালোচকও কখনও ভাবেন না অনেকগুলি তানের ছক পর পর বুনে গেলেই সুরের জামিয়ার তৈরি

হলো। অনেক ওস্তাদের গানে এই দোষ আছে। এ যেন রেখা টানবার আগেই রং চড়ানো। মোট কথা এই যে, রূপ কিংবা রস ছকগুলির যোগ-বিয়োগ নয়। মূল্যজ্ঞান পাটিগণিতের নিয়ম অতিক্রম করে, দুই আর দুই-এ পাঁচ গোছের। তা বলে গান গাইবার সময় টেকনিকের নিয়ম মানতেই হবে বলা বাহুল্য।

এই গেল মূল্যজ্ঞানের কথা। সঙ্গীত-সম্বন্ধে শিক্ষিত সমালোচনার জন্য অন্যান্য জ্ঞানের প্রসার হওয়ার দরকার। বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সঙ্গে রূপ ও রস-স্রষ্টার আন্তরিক বিরোধ নেই পূর্বে লিখেছি। সঙ্গীত-সমালোচকের জন্যও স্বর ও সুরের বৈজ্ঞানিক আলোচনার দরকার। আমি বৈজ্ঞানিক সমালোচনার কথা বলছি না। যত সাহিত্যিক বোকামি দেখেছি তার মধ্যে মূলটনের Scientific criticism-ই চূড়ান্ত বোকামি মনে হয়। আমি বলছি experimental psychology-র কথা। শিক্ষিত সমালোচনার জন্যে বিদেশের ল্যাবরেটরিতে স্বর ও তাল নিয়ে যেসব পরীক্ষা হচ্ছে এবং হয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় নিতান্তই আবশ্যক। সেসব পড়ে শুনে সায়েন্স কলেজের ড. রমণ ও নরেন সেনগুপ্তের কাছ যেতে হবে, বলতে হবে, 'আপনারা ঐ ধরনের পরীক্ষা করুন, ভালো ওস্তাদ ডাকুন, রাস্তা থেকে লোক ধরে তাঁদের ওস্তাদী গান শোনান ; দেখুন— সুর, স্বর ও তালের প্রকৃতি কী। পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের দ্বারাই সমালোচনা সম্ভব। নচেৎ নিজের গুরুর চালই শ্রেষ্ঠ বলা অর্থাৎ গুরুভক্তি দেখানোই সমালোচকের একমাত্র কর্তব্য হয়ে উঠবে। আমি আর্টকে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করতে বলছি না, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে, অন্তত সমালোচকের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলে শীঘ্রই পরিগণিত হবে। অনেকে ভয় করেন যে বিজ্ঞানের পরশে সব আনন্দ মরে যাবে।

ভয় হওয়াই স্বাভাবিক, তবে আগে থেকে খুব সাবধানী হওয়া যায় না যে তা নয়। ধরাই যাক যে, বিজ্ঞান রস-বিচারে অকৃতকার্য হবে। অ-বৈজ্ঞানিক উপায়েও যে রসভোগ বেশি হচ্ছে তাও নয়। সাবধানে পরীক্ষার পর যখন রস উপভোগ করতে পারব না, তখনই না হয় সঙ্গীতের ভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যা সমালোচক করবেন। নারদ ঠাকুর, হনুমন্ত, ভরতের ঘাড়ে সঙ্গীত সমালোচনার ভার সম্পূর্ণ না চাপিয়ে, বর্তমান ওস্তাদ, বৈজ্ঞানিক এবং সাধারণ লোকের উপর সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব আবিষ্কারের ভার দিলে লাভ বৈ ক্ষতি নেই। পরীক্ষার জন্য অবশ্য খুব সাবধানী হতে হবে, সেজন্য কিছু খাটতেও হবে। বাঙালির পক্ষে দার্শনিক সঙ্গীত-সমালোচনার মতন সোজা কাজ অল্প বয়সে সংসার পাতার পর আর কিছুই নেই।

সোজা কথা সমালোচক যেন empirical হন। কোনো সমালোচক শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বর্তমান সঙ্গীতপদ্ধতিকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। শিক্ষিত সমালোচনার ভিত্তি একমাত্র বর্তমানে যে ভাবে গাওয়া হয় তা-ই হতে বাধ্য—শাস্ত্রানুসারে কী গাওয়া উচিত তা দেখলে চলবে না। সঙ্গীত-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হবার জন্য যিনি যত ইচ্ছা শাস্ত্র পড়ুন না কেন— সঙ্গীত-রসে রসিক হবার জন্য সমগ্র সঙ্গীত-শাস্ত্র আয়ত্ত করবার প্রয়োজন নেই। সঙ্গীত-আলোচনা আর যাই হোক সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনা নয়। এর মানে নয়-যে, সঙ্গীত-শাস্ত্রের কোনো মূল্য নেই। তার অন্য হিসাবে যথেষ্ট মূল্য আছে, পরে লিখছি। আপাতত রসানুভূতি ও রুচির কথাই সূচিত হচ্ছে। খুব কমই সঙ্গীত-শাস্ত্র আলোচনা করেছি, যা করেছি তাইতে মনে হয় যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের শক্তি বাড়াবার জন্য এবং ওস্তাদকে জব্দ করার জন্য পুঁথি পড়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, জোর করে বলতে পারি না, যে কাব্যালোচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের অলংকার-শাস্ত্র যতদূর এগিয়েছে, সুরের সৌন্দর্য-তত্ত্বালোচনা ততদূর এগোয়নি। সুরের অলংকার সম্বন্ধে অনেক চুলচেরা তর্ক আছে বটে, একা মূর্ছনা মানে কি সেই সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত জাহির করেছেন, অনাহত ধ্বনির আজগুবি ব্যাখ্যাও আছে ঢের, কিন্তু কোথায় মূর্ছনা, কোথায় মীড়, কোথায় গমক দিতে হবে—কোনো শাস্ত্রে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে না। সঙ্গীত-শাস্ত্রে রুচিজ্ঞানের কথা পড়িনি। কাব্যালোচনায় যেমন অতিশয়োক্তির নিষেধ আছে, সঙ্গীত-শাস্ত্রে সে রকম অজস্র তান-বর্ষণের কোনো নিষেধ আছে কি? সঙ্গীতে রুচিজ্ঞান ওস্তাদের ওপর ন্যস্ত, শাস্ত্রে তার কোনো নিয়মকানুন নেই। অতএব সঙ্গীতে রস ও রুচি সম্বন্ধে আলোচনা করতে সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? শুধু তাই নয়, ওস্তাদের মুখে রাগ-রাগিণী শাস্ত্রে বর্ণিত রাগ-রাগিণী থেকে অনেক তফাত হয়ে পড়েছে। আবার শাস্ত্রও বহুবিধ; এক শাস্ত্র-মতের সঙ্গে অন্য শাস্ত্র-মতের মিল কম। ব্রজেন্দ্রবাবু একা ভৈরোঁ রাগের যত পরিচয় দিয়েছেন তাই থেকে বোঝা যায় মিল কত কম। কোন্ মতকে প্রাধান্য দেবো? বাংলা দেশে এক মত প্রচলিত বলেই সেই মতকে গ্রহণ করব কেন? অবশ্য ভিন্ন ওস্তাদের মুখে একই রাগিণীর ভিন্ন রূপ শুনেছি, দুর্গা রাগিণীর মতো অপ্রচলিত সুরের দুই ঠাট শুনেছি— এক খাম্বাজ ঠাটে, অন্যটি গান্ধার ও নিখাদ বিবাদী করে। কল্যাণ অন্তত তিন প্রকার, বেহাগ তিন প্রকার, বাগেশ্রীও দুই প্রকার শুনেছি। এ ক্ষেত্রে সমালোচকের কি কর্তব্য? একধারে শাস্ত্রের গরমিল, অন্যধারে ওস্তাদের গরমিল। যে কালে রস গ্রহণের সময় ব্রজেন্দ্রবাবু ও ভাতখণ্ডেজীর মতন পণ্ডিত ব্যক্তিরাও নিজেদের বিদ্যাকে দাবিয়ে রাখেন, সেকালে ওস্তাদের গরমিল শাস্ত্রের গরমিল

অপেক্ষা অনেক কম, যেকালে কল্পিতকর্মা ব্যক্তির সব খুন মাপ, তখন ওস্তাদের মুখের সুরকেই শাস্ত্রলিখিত সুরের বদলে গ্রহণ করতে হবে। যেখানে দুই-এর মিল হলো সেখানে কোনো কথাই নেই। সুরের রূপ হিসাবে ওস্তাদের মতই গ্রাহ্য —শাস্ত্র বড় জোর কাঠামো দেখাতে পারে।

অন্য ধারে কিন্তু শাস্ত্রের একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। শিক্ষিত সমালোচককে প্রথমে সঙ্গীতের ইতিহাস জানতে হবে। তারই সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতির বৈদগ্ধ্যের ইতিহাস আয়ত্ত করতে হবে। এ ইতিহাস শ্রুতিসাপেক্ষ হলে চলবে না। ঠিক যেমনটি করে দেশের পণ্ডিতবর্গ পুঁথি, ইট-পাথর ঘেঁটে ভারতের পুরাতন ইতিহাস ধীরে ধীরে গড়ে তুলছেন, সেইভাবেই সঙ্গীতের ইতিহাস গড়ে তুলতে হবে। ঐতিহাসিক আলোচনার বিপদ এই যে, উৎপত্তিই বর্তমানের মূল্য হয়ে ওঠে, নিজের দেশের জিনিসটাই সবচেয়ে ভালো মনে হয়, অন্য দেশের জিনিসকে হেয় মনে হয়। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বর্তমানকে শ্রদ্ধা করতে হবে— অতীতকে উপায় ছাড়া অন্য কিছু মনে করলে চলবে না। শ্রদ্ধা করার এক উপায় প্রচলিত সুরকে আলোচনার ভিত্তি করা, অন্য উপায় তুলনামূলক বিচার। তুলনামূলক বিচার **experimental pyschology** দ্বারা সম্ভব হয়েছে। এই ধরনের বিচারে মনের উদারতা আসে, অন্য দেশের গান বাজনা কুকুর-বেড়ালের ডাক মনে হয় না। তুলনামূলক বিচারের সঙ্গে অবশ্য মূল্যজ্ঞান থাকা চাই। দুই মিলিয়ে যখন মানুষ কাজ করে, তখনই মানুষ ভদ্র হয়, তখন আর নিজের মত পরের ওপর চালাবার রুচি থাকে না, তখন দাম্ভিকতা সরে যায়, দৃঢ়তা আসে। যখন মানুষের মতামত ভদ্র হয়, তখন ভারতবর্ষের সঙ্গীত ভালো না বিলেতী সঙ্গীত ভালো, ঠুংরি ভালো না খেয়াল ভালো— না ধ্রুপদ সবচেয়ে ভালো, এ ধরনের প্রশ্নই ওঠে না। মূল্যজ্ঞান যখন তুলনামূলক বিচারে ওতপ্রোত থাকে তখন ভারতীয় সঙ্গীত ছাড়া অন্য সঙ্গীতে যথেষ্ট আধ্যাত্মিকতা যথেষ্ট সূক্ষ্ম কারুকার্য, যথেষ্ট সুর ও তালের কেরামতি লক্ষ করা যায়। ভারতের এমন সময় এসেছে যে, পৃথিবীর কোনো ভালো জিনিসকে বাদ দিলে চলবে না। সঙ্গীত যখন বৈদগ্ধ্যের উত্তমাঙ্গ, তখন বিদেশী সঙ্গীতকে উত্তমরূপে বুঝতে হবে। **experimental psychology** এবং **comparative study** দ্বারা তখন হয়তো বোঝা যাবে যে, সঙ্গীত-পিয়াসী মানুষের স্বভাব ভিন্ন নয়— স্বভাবে যা কিছু ভেদ আছে সবই অভ্যাসের বশে ঘটেছে, এবং সে অভ্যাসের বাধা দূর করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে অসম্ভব নয়।

সঙ্গীত-সমালোচকের ঘাড়ে বোধ হয় সমগ্র রস-সমালোচনার ভার চাপিয়েছি। সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আর্টের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি

আছে। সেই পদ্ধতি অনুসারে শিল্পীর মানসিক রীতিনীতি বোধ হয় কবির মানসিক রীতিনীতি থেকে পৃথক। তবুও কিন্তু আনন্দলিপ্সা কিংবা রসসৃষ্টির দিক থেকেই হোক আর যে জন্যেই হোক— ঠিক জানি না— সব রস-পিপাসু এবং রসস্রষ্টার মনের মধ্যে একটা যেন কোথায় মিল আছে। বৈষ্ণব-দর্শনের সাহায্যে মিলের কারণ অতি সহজে পাওয়া যায়। তর্কের মধ্যে আর কেষ্ট ঠাকুরকে এনে কাজ নেই— কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। এক কথায় বলতে গেলে সমালোচক বিদগ্ধ পুরুষ। ক্লাইভ বেল তাঁর নতুন বইতে লিখছেন যে, সৃষ্টির চেয়ে সমালোচনাই বৈদগ্ধ্যের সেরা নিদর্শন। এ মতে সায় দেওয়া না গেলেও সমালোচক যে ভদ্র ও উদার হবেন, একথা সকলেই জানেন। ঔদার্য মানে যদি নতুন রূপ-উপভোগের ক্ষমতা হয়, এবং রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ যদি সঙ্গীতে নতুন রূপ সৃষ্টি করে থাকেন, তা হলে যিনি রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদের প্রবর্তিত সুরকে সমালোচনার বিষয়বস্তু পর্যন্ত বিবেচনা না করেন, তিনি উদার নন, 'ভদ্র' নন, সমালোচক পদবাচ্য নন। কাব্য-রুচি ও সাহিত্য-রুচি সম্বন্ধে যেমন রবীন্দ্রনাথ, ভদ্রতা-অভদ্রতার কষ্টিপাথর হয়েছেন, সঙ্গীত সম্বন্ধেও তিনি তেমনি — একথা বলবার সময় এসেছে। তবে রবিবাবুর গান যার-তার মুখে শুনলে এ কথা বলা যায় না— তাঁর নিজের গান তাঁর চেয়ে অন্যে আজকাল ভালো গাইছেন। অতুলপ্রসাদের গান তিনিই সবচেয়ে ভালো গান। অবশ্য যদি কেউ বলেন যে, এই দুইজন ছাড়া আর কেউ সঙ্গীতে নতুন রূপ দিতে পারে না বা পারবে না, তা হলে তাঁকেও ভদ্র সমালোচক বলতে কুণ্ঠিত হব। আমার আদর্শ সঙ্গীত-সমালোচক— রসিক পুরুষ, ভদ্র ও শান্ত, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, শাস্ত্রবিদ্, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং উদার। স্রষ্টা কিংবা ওস্তাদ হবার তাঁর কোনো বিশেষ প্রয়োজন নেই। তিনি **specialist** হবেন না। বিদ্যাকে যন্ত্র, তন্ত্র, মন্ত্র ভেবে, সৃষ্টির শেষ কথা অর্থাৎ রস ও রূপ উপভোগের দিকে তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ থাকবে। আমার আদর্শ সঙ্গীত-সমালোচক গম্ভীর হবেন, কিন্তু তাঁর হাসবার ক্ষমতা থাকবে, নিজের গাম্ভীর্য নিয়ে ঠাট্টা করবার শক্তিও থাকবে। সঙ্গীত-সমালোচনায় বীরবলী মনোভাবের পরশ নিতান্তই বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছে।

১৩৩৫

অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা

সমবেত সাহিত্য-সেবীদের আমি অভিবাদন করি। ফরিদপুর সাহিত্য-পরিষদের সক্রিয় দীর্ঘজীবন কামনা করি। অভ্যর্থনা-সমিতি এবং অন্যান্য কর্মিবৃন্দের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার মনে হয় যে আপনারা ইচ্ছা করেই কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিককে সভাপতিত্বে বরণ করেননি। আপনাদের ইচ্ছাকে বিচার করা আমার কর্তব্য নয়। তবে যে উদ্দেশ্যে ও মনোভাবে আপনারা আমাকে মনোনীত করেছেন সেটা বোধ হয় আমার অপরিচিত নয়। সাহিত্য-সৃষ্টি সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু বুদ্ধি ও প্রাণ দিয়ে সাহিত্য আলোচনা ও উপভোগ সাধারণের করায়ত্ত। অন্তত, হওয়া উচিত, নচেৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিরর্থক ও অ-সামাজিক অপব্যয়। শিক্ষিত সমাজের কাছে জনসাধারণ বুদ্ধি ও তার প্রয়োগ প্রত্যাশা করে। প্রতিভাশালী ব্যক্তি এবং বিকৃত মস্তিষ্কের কথা বাদ দিলে সাধারণের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য কেবল শিক্ষার সুবিধার তারতম্যেই ঘটে। প্রাণশক্তির মাত্রাও সর্বক্ষেত্রে সমান হয় না দেখতে পাই, কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই প্রাণশক্তি প্রবাহিত। অতএব যে সব অস্তুত সামাজিক বাধার দরুন শিক্ষার সুবিধায় অসমতা, এবং প্রাণশক্তির বিভাগ ও প্রকাশে বৈষম্য ঘটে সেই সব বাধা অতিক্রমে সকলকে সহায়তা করা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য। এই আমার বিশ্বাস, আপনাদের মনোভাবও বোধ হয় খানিকটা ঐ ধরনের। বুদ্ধির দ্বারা জনসাধারণের বুদ্ধি ও প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ, মার্জিত, বর্ধিত এবং সংস্কৃত করা যায়। কতটা করা সম্ভব পরে দেখা যাবে, কেননা শুনেছি অ-সম বণ্টনই না কী প্রকৃতির গূঢ় উদ্দেশ্য ও লীলা। তাই যদি হয়, তা হলে আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও তাই দাঁড়াবে। ইতিমধ্যে, বর্তমানের সমাজ-ঘটিত বৈষম্যের সঙ্গে সেই গূঢ় ও প্রাকৃতিক বৈষম্যের কোনো সম্বন্ধ খুঁজে পাচ্ছি না। আপাতত আমাদের কাজের কাজ হলো এই— আমাদের মানসিক দুর্ভিক্ষের সামাজিক কারণগুলি জানা এবং জেনে সরিয়ে দেওয়া। এ কাজ একার নয়, সকলের। আমি এই সমবেত চেষ্টায় যোগ দেব। আমাদের সকলের স্থির বিশ্বাস যে, শিক্ষালব্ধ মার্জিত বুদ্ধির সাহায্যে উপভোগের বর্তমান মাত্রার অর্থাৎ সমালোচনার বর্তমান অবস্থার উন্নতি সম্ভব।

অধিকতর লোকের বুদ্ধির চাষ ও প্রাণের বহতা বাড়লে সাহিত্যের মঙ্গল। তাগিদ ও চাহিদা বেশি হলে যোগান আপনা হতে বাড়ে। আমাদের সমাজে প্রকৃত সাহিত্যের চাহিদা কম, অন্য দেশের তুলনায় নেই বললেই হয়। কিন্তু কারণগুলি মোটামুটি একই ধরনের, কমবেশি কেবল ভাগ্যবিপর্যয়। কারণগুলি

আমি যতদূর বুঝেছি আপনাদের বলছি। সব সমাজেই শ্রেণী-বিভাগ রয়েছে, প্রধানত অর্থের জন্য একদল প্রতিপত্তি লাভ করেছেন এবং আনন্দ পাবার সুবিধা ভোগ করেছেন। তাঁদের প্রতিপত্তি ও সুবিধা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিযুক্ত হচ্ছে অন্য শ্রেণীকে— যাঁদের আনন্দ ও শিক্ষা পাবার সুবিধা নেই— তাঁদেরকে, এই বন্দোবস্তেই সন্তুষ্ট থাকবার শিক্ষাদানে, অর্থাৎ কুশিক্ষা ও অশিক্ষায়। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিপক্ষে কূটতম আপত্তি ওঠে সবচেয়ে বেশি এই প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর কাছ থেকেই। সোজাসুজি বাধাবিপত্তি তোলার কথা ছেড়ে দিচ্ছি। তাঁদের মনোবাঞ্ছা আমরা মুখরিত করি পণ্ডিতী ভাষায়, প্রকৃতিদেবীর গূঢ় অভিসন্ধি— মানুষের মধ্যে শক্তির অ-সম বিভাগ, এই তথ্যটি উদ্ঘাটিত করে। আমাদের যুক্তির অভাব নেই। দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এখন মজা হলো এই যে, এক হিসাবে সুবিধা হতে বঞ্চিতের সংখ্যা মধ্যস্বত্বোপভোগী প্রতিপত্তিশালীর সংখ্যার অপেক্ষা বাংলা দেশে পাঁচ গুণ বেশি। আমার বক্তব্য হলো এই যে, সংখ্যার তারতম্যে সাহিত্যের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। সংখ্যা বস্তুটি কেবল গণনকার্যের যন্ত্র নয়, সংখ্যার অনুপাত পরিবর্তন গুণবাচক। পরিমাণ যে গুণে পরিণত হয় তার প্রমাণ রসায়ন-বিদ্যার প্রতি পাতায় আছে। তাই বলি, সর্বসাধারণের মধ্যে বুদ্ধি ও প্রাণশক্তির প্রসার সৎসাহিত্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এই সোজা কথাটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের চেয়ে সাধারণ পাঠকই বেশি বোঝে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সৃষ্ট সাহিত্যিক হয়তো মনে ভাবেন যে, সাধারণ লোকে কখনই ভালো জিনিস উপভোগ করতে পারবে না। তাঁরা যে 'সাধারণ রুচি' কল্পনা করে থাকেন সে রুচি তাঁদের সমশ্রেণী ও সমধর্মী খবরের কাগজওয়ালা ও তাঁদেরই আশ্রিত পণ্ডিতবর্গের রচিত সাধারণের রুচি। সাধারণের অস্তিত্ব নেই। আমি যে সাধারণ জনসমাজের উল্লেখ করছি তারও অস্তিত্ব নেই, তাকে সাহায্য করতে হবে রচিত হতে। প্রথমটি হলো অলীক, এবং অলীক বলেই একটি শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির উপায়, দ্বিতীয়টি মাত্র অপ্রসূত সম্ভাবনা; এবং সম্ভাবনা বলেই আপনাদের ও আমার অতি যত্নের সামগ্রী, আদরের বস্তু। মিথ্যাকে সত্যে অন্তত সম্ভাব্য সত্যে পরিণত করতে হবে। যে শক্তির সাহায্যে এই পরিবর্তন সম্ভব সেই শক্তি একার নয়, সমাজের, যদিও সমাজের মধ্যে সেটি এখনও গুপ্ত রয়েছে। সেই শক্তিকে আমরা জানতে চাই। তারই পরিণতির প্রতীক্ষায় আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। সাহিত্য-বিচার ও উপভোগ অ-সামাজিক প্রক্রিয়া নয়, সামাজিক ব্যবহারের প্রতিবেশেই সাহিত্য বুঝতে হয়, এই আমার ধারণা।

পূর্বোক্ত সামাজিক শক্তির পরিণতি কখন ও কীভাবে হবে তার সঠিক খবর কেউ দিতে পারে না। তবে আমাদের বড়ই সজাগ থাকতে হবে নিশ্চয়। আর একটি কথা জোর করেই বলা চলে: যে শক্তির প্রকাশে অন্য দেশের সমাজের পুরাতন শৃঙ্খল ভেঙে যাচ্ছে, এবং ভেঙে যাবার জন্যই সেই সব দেশের সাহিত্যের রূপ-পরিবর্তন ঘটছে, সে শক্তির আধার তরুণ সম্প্রদায়। চিরকালেই সমাজে তরুণ ছিল— কিন্তু তরুণের আন্দোলন ছিল না। আন্দোলনের অর্থ কোনো মধ্যস্থিত ব্যাস থেকে সরে যাওয়া। মধ্যস্থিত ব্যাস হলো সামাজিক শৃঙ্খলা— উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থের শৃঙ্খলা আর সামাজিক সত্তার মধ্যে যে প্রভেদ থাকতে পারে তরুণরা পূর্বে বোঝেননি, তাই তাঁদের আন্দোলন আদর্শ থেকে বিচ্যুতি বলেই পরিগণিত হয়ে এসেছে। আজ তাঁরা বুঝেছেন যে, শ্রেণীর স্বার্থ সমাজের প্রকৃত শৃঙ্খলাও নয়, মেরুদণ্ডও নয়। শৃঙ্খলাটি কি, ব্যাসটি কোথায়, তাঁরা বোঝেন না, আন্দাজী তার একটা নাম দিয়েছেন সমাজ-সত্তা। হয়তো নামকরণও সব দেশে এখনও হয়নি। আজ যে সমগ্র বিশ্বে তরুণ আন্দোলন চলছে তার মূল কথা এই সমাজ-সত্তাকে অনুসন্ধান করা, আবিষ্কার করা, সৃষ্টি করা। তাঁদের কর্মে ও বক্তব্যে হয়তো মূল তথ্যটি ঠিক পরিস্ফুট হয়নি, একে তাঁরা তরুণ, তায় দেশের অবস্থা ভিন্ন। কিন্তু একথা ঠিক যে, যুদ্ধের পর যুবক-যুবতীরা নানা বিষয়ে নানা মতামত প্রকাশ করেছেন। শ্রদ্ধাভক্তি তাঁদের কমছে। তাঁরা বলেছেন যে, তাঁদের দেশের বৃদ্ধেরা এতদিন ধরে বড় বড় গালভরা কথা দিয়ে দেশকে, অর্থাৎ দেশের অন্য শ্রেণীকে বঞ্চিত রেখে নিজেদের সম্পত্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এসেছেন; আজ তাই যুবকদের কাছে আদর্শবাদ বড়ই কটু ঠেকছে। আজ তাঁরা নিজেরাই নতুন আদর্শ গড়ে তুলতে ব্যগ্র, যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁদের সমগ্র ও প্রকৃত সামাজিক সত্তার ওপর। সে আদর্শ শ্রেণীগত স্বার্থের শৃঙ্খলার দ্বারা গ্রথিত নয়। যন্ত্রপ্রধান সভ্যতায় সামাজিক সত্তার বর্তমান রূপ হলো শ্রেণী-বিভাগ। দুঃখ এই যে, সমাজ-সত্তার প্রকৃত রূপের পরিচয় পেতে হলে এই শ্রেণী-বিভাগের বিপক্ষে বিরোধ বেধে যায়। একেই শ্রেণী-বিভাগের সম্বন্ধ বিরোধের, তার ওপর সেই বিভাগের আবরণ ভেদ করতেও বিরোধ, তাই আজ বিরোধই সর্বত্র প্রকট হয়েছে। তরুণরা এই বিরোধের শক্তিকে স্বীকার করে তাকেই কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়েছে। একটি প্রধান সামাজিক কাজ সাহিত্য-সৃষ্টি, সাহিত্যে সেইজন্য এত ঝাঁজ, এত উগ্রতা। তরুণের অনুচ্চারিত বক্তব্য হলো এই— সমাজ-সত্তাকে স্বীকার করো, নচেৎ কোনো কাজই করা যাবে না। আমি তরুণ না হলেও একই কথা বলি, আমাদের দেশের অবস্থায় ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানে কিছু পার্থক্য থাকলেও অন্তরের বিরোধে

আমরা বোধ হয় এক। আমাদের তরুণ সাহিত্য যদি বাস্তবিকই নবযুগের সাহিত্য হতে চায়, সত্যিকারের রিয়ালিস্টিক হতে চায়, তা হলে তরুণ সাহিত্যিককে আমাদের প্রকৃত সমাজ-সত্তা কী, বুঝতে হবে ; তার রূপ পরিবর্তনের শক্তিকে স্বীকার, গ্রহণ ও নিয়োগ করতে শিখতে হবে। নচেৎ তরুণ সাহিত্য তরুণ তো হবেই না, সাহিত্যও হবে না, কর্তাদের ভাববিলাসের উপকরণ ও অযোগ্য অনুকরণ হবে।

আমাদের সমাজের সত্তা কী বোঝাতে পারব না। জোর করে বলতেও পারি না আমাদের সমাজে অন্য দেশের মতো শ্রেণী তৈরি হচ্ছে কিনা। এই-বারকার আদমশুমারিতে লেখা আছে, নতুন গণনা-পদ্ধতির জন্য তুলনায় ভুলচুক বাদ দিয়েও চাষী-অধিকারী এবং প্রজা-চাষীর সংখ্যা ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে শতকরা ৩৫ কমেছে ; আর কেবল চাষী-মজুরের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৫০ জন, ৩,৯০,৫৬২ থেকে ৬,৩৩,৪৩৪ পর্যন্ত। বাংলা দেশে সবসুদ্ধ শতকরা একশ জন জমিদার ও অনুচরবর্গের তুলনায় ১২৯৭ চাষী-মজুর আছে, যদিও গড়পড়তা গোমস্তার দল কিছু হ্রাস পেয়েছে। ফরিদপুরে চাষী-মজুরদের সংখ্যা কিছু কম, শতকরা ৯৬৬ জন। ব্যবসাবৃত্তিধারীর সংখ্যা কিছু কমলেও মধ্যবিত্ত চাকুরে ও উকিল ডাক্তার প্রভৃতির সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সবচেয়ে বেড়েছে জমি-স্বত্বোপভোগী ভিন্ন নিজের ব্যক্তিগত আয়ভোগীর এবং চাকরবাকরদের দল, প্রথমটি ১৩,৬৪৬ থেকে ২৫,২৬১ এবং দ্বিতীয়টি ৪,৫৫,২৪৬ থেকে ৮,০৯,৭১৫। আদমশুমারির সংজ্ঞা ও হিসেবেই যাঁরা জমি থেকে ধন উৎপাদন কার্যে ব্যাপৃত নন তাঁদের তুলনায় নিতান্ত ভূমি-নির্ভরশীলের সংখ্যা গড়পড়তায় ষোলগুণ বেশি। সমগ্র বৃত্তি ধরলে লোকসংখ্যার ত্রিশ ভাগের এক ভাগ সামাজিক ধন বৃদ্ধি করেছেন। এই অনুপাত ১৯০১ সাল থেকে ক্রমেই বেড়ে আসছে। আমি কল-কারখানার শ্রমজীবীর কথা তুলছি না, এখানে এবং এই দেশে সেটা অপ্রাসঙ্গিক হবে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যোগ বাংলা সমাজের, সে সমাজের মেরুদণ্ড জমিস্বত্ব। জমির অধিকার পরিবর্তনেই সমাজের সত্যকার শ্রেণী তৈরি হতে পারে। চাকুরে ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যও যে শ্রেণী তৈরি হতে পারে না তা বলছি না। কিন্তু চাষবৃত্তি-ধারীর সংখ্যা এদের চেয়ে পঁচিশগুণ বেশি। অতএব সন্দেহ হয় যে গোপনে শ্রেণী তৈরি হতে আরম্ভ হয়েছে। তবে বিরোধও এখনও প্রকট হয়নি নিশ্চয়। হওয়া ভালো কী মন্দ জানি না, তবে মনে হয় বিরোধও বাদ যাবে না। তবে তার ভীষণতা চেষ্টা করলে কমানো যায়, বিশেষত কৃষিপ্রধান দেশে, যেখানে অধিকার চাওয়ার অপেক্ষা দাবিপূরণই সামাজিক অবস্থান নিরূপিত ক'রে

মজ্জাগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অন্য দেশের ইতিহাসের সব ধাপই পরপর অতিক্রম করতে হবে তাও নয়। এমন কী ভীষণ বিরোধ বাদ দিয়েও শ্রেণীর অবসান ও সমাজ-সত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমাদের দেশের দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও আয়ের বিভাগে অন্য উন্নত দেশের তুলনায় আপেক্ষিক কম। বৈষম্য, অশিক্ষিতের সংখ্যা, আমাদের রোম্যান্টিক গণ-আন্দোলন, মহাপুরুষে ভক্তি এবং আমাদের কংগ্রেস-নীতি বিচার করলে সন্দেহ হয় যে, জনমত জাগ্রত হয়ে ফ্যাসিজ্‌মের কোনো-না-কোনো রূপ বরণ করবে। যে সামাজিক বিপ্লব অহিংস সত্যাগ্রহের দ্বারা সাধিত হয় তাও এ দেশে সম্ভব কী না জানি না— যদি হয়, তখনও বিরোধ উহ্য থাকবে। এ সব বিষয়ে কেউ ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারে না। কেবল বলা চলে, বিরোধকে স্বীকার করেই হোক আর অন্য কোনো শক্তিকে গ্রহণ করেই হোক সাহিত্যে সমাজ-সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যদি বিরোধের ফলে সত্তার প্রতি আমাদের স্থিরদৃষ্টি ভ্রষ্ট হয় তা হলে আমাদের সাবধান হতে হবে। যদি অন্য উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেই উপায় গ্রহণ করতে হবে। তবে যাঁদের জন্য সমাজের অতএব সাহিত্যের এই দুর্দশা তাঁরা কী ছেড়ে কথা কইবেন? কইবেন না; তখন ন্যায়ত ধর্মত বিরোধ আনার গুরুদায়িত্ব তাঁদের ওপরই পড়া উচিত। কর্তার দল এ ভার গ্রহণ করতে রাজি হবেন না, তাঁরা বলবেন, নিম্নশ্রেণীরাই বিরোধ বাধিয়েছে। আমার বিশ্বাস শ্রেণী-বিরোধ তাঁদেরই সৃষ্টি, এমন কী কথাটির দুষ্ট ব্যবহারটি পর্যন্ত। নচেৎ "বিরোধ" সংজ্ঞাটির মধ্যে দোষ-গুণ কিছুই নেই। যে আগে ব্যবহার করতে পারে তারই জিত। সে যাই হোক, মোদ্দা কথা এই যে, সমাজের নতুন গঠন না বুঝে লেখার জন্যই সাহিত্য সর্বত্রই অবাস্তব হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে রিয়ালিস্টিক সাহিত্য।

পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি যে পুরাতন আদর্শবাদের মোহ আজ কেটে যাচ্ছে, কিন্তু আদর্শবাদকে ত্যাগ করা চলে না, তরুণে ত্যাগ করতে পারে না। আমরা অনেকেই বুঝেছি যে অন্যায় দূর করা উচিত এবং সমাজকে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে। পুরাতন সমাজের মূলে ছিল সম্পত্তি-বিভাগে বৈষম্য। সে বৈষম্য রক্ষা করার দরুনই বড় বড় মিষ্টি গালভরা কথার প্রয়োজন ছিল; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, আর্টের জন্য আর্ট, অভিজাত সম্প্রদায় ও বিদগ্ধ পুরুষের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি ইত্যাদি। সে মূলে আজ ঘা পড়েছে, তাই বড় কথা ভুয়ো ঠেকছে। আজ মনে হচ্ছে ভগবান, ধর্ম, ব্যক্তিত্ব, আর্ট, স্বরাজ, স্বদেশপ্রেম— এসব বাইরের এনামেল, ভেতরের লোহা হলো সমাজ, দুর্ভাগ্যবশত সমাজের পতিত ও বঞ্চিত শ্রেণী, তাদের দেহ ও মনের ক্ষুধা মেটাবার অসুবিধা, অবকাশহীনতা। সর্বপ্রকার স্ফূর্তির আকাঙ্ক্ষায় তরুণরা আজ অত্র-

প্রাণিত। এ দেশে সে আকাঙ্ক্ষার তেজ নানা কারণে কম, তবে যতটুকু আছে তাকে চেষ্টা করলে বাড়ানো যায়। আমার ক্ষুধা আছে, ক্ষুন্নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা আছে, আপনাদেরই মতন। তবে আমি জানি, আপনারাও বোধ হয় জানেন যে, যতদিন আকাঙ্ক্ষা না জোরাল হয়, না মেটে, ততদিন আমার বাঁচা হবে ক্রিমির মতন বাঁচা। ক্রিমির জীবন আমার আদর্শ নয়, আমি আরও ভালো করে বাঁচতে চাই, সেজন্য ভালো সাহিত্য আমাকে পেতেই হবে, কেননা সাহিত্যিক হলেন সমাজকর্তা, তাঁর কাছে আমি অনেক প্রত্যাশা করি। আমরা সকলেই বাঁচতে চাই, ভালো করে, আরও ভালো করে, নতুন নতুন উপায়ে। সাহিত্য ভালো করে বাঁচবার সহায়তা করে। (রবীন্দ্রনাথের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন উন্নত হয়েছে)। সাহিত্য আমাদের আদর্শ নিরূপিত করে কিনা জানি না তবে যে শক্তির দ্বারা আদর্শ সৃষ্টি হয়, সেই শক্তির দ্বারাই সাহিত্যের আদর্শ ব্যক্তিগত জীবনেও প্রতিভাত হয় নিশ্চয়। সে শক্তি সমাজের, সামাজিক পরিবর্তনের গতিতে তার উৎপত্তি। কেননা এই আদর্শ স্থির নয়, চিরন্তন নয়, একটি বিশেষ শ্রেণীর নয়; এ আদর্শ গতিশীল, চলিষ্ণু, পরিবর্তনশীল, সর্বসাধারণের। সমাজও তাই; যে সমাজে অত্যাচার নেই, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি ভালো করে বাঁচতে পারে, সেই সমাজের দিকে অগ্রগতিই আমার ও আপনাদের আদর্শ ঠিক করে দিচ্ছে। সেই সমাজেই যে সাহিত্য হবে তাতে কাঁটা থাকবে না। সকলেই নিজের নিজের প্রকৃত ক্ষমতা অনুসারে সে সাহিত্য উপভোগ করতে পারবে। এখন সকলে আনন্দ পায় না; কেননা এ আর্থিক বৈষম্যের জন্য তারা আনন্দ উপভোগ করতে শেখেনি। আজ সৎ-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা কম, অর্ধশিক্ষিত, এবং সমাজ-সত্তা সম্বন্ধে অচেতন বলে সৎ-সাহিত্যের চাহিদা কম, নতুন সমাজে চাহিদা বাড়বে, চাহিদা বাড়লে যোগান অন্তত খানিকটা বাড়বে আমি বিশ্বাস করি। এটুকু আপনারাও নিশ্চয় স্বীকার করেন।

'স্বীকার' কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আমরা সমাজকেই সবচেয়ে কঠিন সত্য মনে করি, মুখে অন্তত আমরা সকলেই সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করি, তার বেশি কিছু জানি না। তাকে বদলাতে হবে আমরা বুঝি, কিন্তু কী করে করব আমরা জানি না। আমরা কেউই ভবিষ্যদ্‌বক্তা নই, নেতা নই, এবং সন্দেহ করি সমাজে জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যবহারকে। মনে হয়, যেসব ঘটনার দ্বারা সমাজের ভবিষ্যৎ রূপ প্রবর্তিত হয়, তাদের অঙ্কাধীন করা তো দূরের কথা করায়ত্ত করাও শক্ত। তবে আমরা সকলেই এই সব বিষয়ে জানতে চাই, সচেতন হতে চাই, ভবিষ্যৎকে মুঠোর মধ্যে আনতে চাই। আমাদের জানবার প্রবৃত্তি আছে এবং

কাজ করবার প্রবৃত্তিও আছে। এক কথায় আমরা ইতিহাসের মর্মকথা বুঝতে চাই। বোঝাটা কাজ করা থেকে পৃথক ব্যবহার নয়। বুঝে কাজ করলে, কিংবা কাজ করে বুঝলে ব্যাপারটা সহজ হবে নিশ্চয়। ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা তখনই শক্ত যখন ইতিহাস মানে নিয়তি। এতদিন ইতিহাসকে অতিপ্রাকৃতের অত্যাচার বলে গণ্য করে এসেছি, তাকে অন্ধ শক্তি কিংবা নিয়তির নাম দিয়েছি, ইতিহাস বলতে পুরাতন পাঁজি-পুঁথি ঘাঁটা এবং প্রমাণ-তর্কের ব্যবহার-ক্ষেত্রই ভেবে এসেছি, তাই আমাদের ইতিহাসকে কেবল মানতেই হয়েছে, মুখস্থই করতে হয়েছে। ঐতিহাসিক দার্শনিকের মতনই সমাজকে ব্যাখ্যাই করে এসেছেন, সমাজকে গড়ে তোলেননি। যা হচ্ছে তাই ভালো, কেননা তাই বুদ্ধির নিয়মানুযায়ী, অতএব পুরাতনের চিন্তা করা ছাড়া অন্য কর্তব্য আমাদের নেই, আমরা এতদিন এই ভেবে এসেছি। কিন্তু ইতিহাস সমাজেরই ইতিহাস এবং সমাজ মানুষেরই সমাজ, একথা মনে পড়েনি। আমরা বিশ্বাস করিনি যে, মানসিক প্রক্রিয়ার অনেক মিল থাকে, সেই মিলের ওপরই সমাজের ভিত্তি এবং সেই ভিত্তির ওপরই ইতিহাসের ইমারত খাড়া করা হয়েছে। অতএব সেই ইতিহাসের কোথাও না কোথাও মূলগত ঐক্য থাকবেই থাকবে অর্থাৎ নিয়ম থাকবে। আজ আমাদের অজানিতে আমরা সকলেই ইতিহাসের নিয়ম আবিষ্কার করতে ব্যগ্র হয়েছি, আমাদের কর্মপ্রবৃত্তি শান্তি দিচ্ছে না। সেজন্য নতুনতর সমাজের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত না হলেও তার ঐকান্তিক প্রয়োজন স্বীকার করি, এবং ইতিহাসের নিয়ম আবিষ্কার করে অন্তত আংশিকভাবে অতিপ্রাকৃত, প্রাকৃতিক ও তথাকথিত সামাজিক নিয়তির কবল থেকে মুক্ত হতে চাই। আমরা অন্ধকারে থাকতে ভালবাসি না, নিষ্কর্মা হয়ে পুরাতন মহিমায় ডুবে থাকতেও চাই না। এই প্রকার অক্ষমতা, এবং কাজ ও চিন্তার সাহায্যে ক্ষমতা-অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই আমাদের যোগসূত্র। এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা মেটাবার ইচ্ছার অর্থ হলো 'স্বীকার', সমাজ-সত্তাকে স্বীকার।

পূর্বোক্ত মনোভাব নিয়ে আমি সাহিত্যসভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছি। অতএব সাহিত্য-সম্বন্ধে আমার মতামত— যাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের কোনোও সম্বন্ধ স্বীকার করতে চান না, কিংবা সাহিত্যিকের জন্যই সাহিত্য বিবেচনা করেন, কিংবা যাঁরা পুরাতন সমাজকে বাঁচিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে চান— তাঁদের মনঃপূত হবে না। সাহিত্য-সম্বন্ধে এতদিন যা ভাবছি, অল্প কথায় আপনাদের তাই বলব— বিস্তারিতভাবে বলবার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই। বর্তমান যুগের সর্বদেশের সাহিত্যই ভারি লঘু ঠেকে; ঠুনকো মনে হয়, বুনন তার ঠাস নয়, বিশেষ করে আমাদের সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

আমার মন্তব্যের বাইরে। আমার ধারণা এই যে, বর্তমান সাহিত্যিক সাহিত্য-বস্তুর সত্তা স্বীকার করতে পারেননি, স্বীকার করতে ভয় পান। সাহিত্য-বস্তু হলো মানুষ এবং মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ। মানুষ সামাজিক জীব এবং মানুষের সম্বন্ধই হলো সমাজ ; সমাজ বদলাচ্ছে মূলত আর্থিক কারণে, ও কলকব্জা, যন্ত্র আবিষ্কার অর্থাৎ বিজ্ঞানের দৌলতে। বিজ্ঞান অর্থে কেবল নৈসর্গিক প্রকৃতিকে বশে আনা নয়, বাইরের সমাজ ও অন্তঃপ্রকৃতিকেও বশে আনা। জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় নৈসর্গিক প্রকৃতিকে জয় করা মানুষের সম্বন্ধ ও স্বভাবকে জয় করা অপেক্ষা সহজ। কিন্তু তাই বলে সমাজ ও অন্তর আমাদের শক্তির বহির্ভূত নয়। সামাজিক ব্যবহার ও অন্তর্গত দৈহিক ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রমেই আমাদের বিশদ হচ্ছে। সেই জ্ঞানবৃদ্ধির পদ্ধতি এক ভিন্ন দুই নয়। এই দুই প্রকার জ্ঞান এবং একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে আমরা বুঝেছি যে, উৎপাদন-শক্তির রূপপরিবর্তন হলে সমাজের রূপপরিবর্তন হয়। অতএব সাহিত্যবস্তুর পরিবর্তন অস্বীকার করেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবিশ্বাসী হই। বিজ্ঞানের ফলাফল গ্রহণ না করে যে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় তার মূল্য অকালের ফুল-ফলের মতনই। নতুন উৎপাদন-শক্তির তাগিদে সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক সত্তার গঠন-পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনের ফলে মানুষের আচার-ব্যবহারের প্রভেদ ও সংঘাতই হলো সাহিত্যের প্রকৃত সত্তা। আমার বিশ্বাস পুনরায় বলছি— বর্তমান সাহিত্যের লঘুত্ব, এই প্রভেদ ও সংঘাতকে না মানার জন্য। এ দেশে আমরা সকলে সমাজ-সত্তাকে পাশ কাটিয়ে আসছি, তাই আমাদের সাহিত্যে আমাদের সমশ্রেণীর প্রাণেই কেবল নাড়া দেয়, জনসাধারণের কাছে তার কোনোও আবেদন ও মূল্য নেই। অথচ সাহিত্য এক তরফা ডিক্রি নয়ই নয়, কোনোও আর্টই নয়। সাড়া না পেলে সাড়া দেওয়া যায় না। সাড়া না দিতে জানলে সাড়া পাওয়া যায় না। এতদিন সর্বত্র, অন্তত গত কয়েক শতাব্দী ধরে, সাহিত্য ছিল ধনী ব্যক্তির শখের সামগ্রী, সৃষ্টির নামে ধনী শ্রেণীর আত্মপ্রসাদ, এবং উপভোগের নামে নির্ধনের ও অশিক্ষিতের আত্মপ্রবঞ্চনা। এখন বিজ্ঞানের আশীর্বাদে কল ও যন্ত্র এসেছে। টান পড়েছে তার গ্রামে গ্রামে, কেবল আমাদের মগজেরই টনক নড়ছে না। সমাজ গেল ভেঙে, মানুষের ব্যবহার গেল বদলে, অথচ সাহিত্যিক খরগোশের মতন ভাবছেন, চোখ বুজলেই বিপদ কেটে যাবে। **তা হয় না, তা হয় না, তা হয় না।** এখন চোখ খুলে দাঁড়াতে হবে, সমাজ ভাঙার ও গড়ার শক্তিকে, তাকে বিজ্ঞানই বলুন বা শ্রেণী-বিরোধ বলুন— কী দুইই বলুন, আমার তাতে আপত্তি নেই, ব্যবহার করতে হবে। তবেই হবে সৎ-সাহিত্য, নাটকের মতো নাটক, নভেলের মতো নভেল, গল্পের মতো গল্প— তবেই হবে সতেজ সাহিত্য

যা আমাদের নেই। কেবল নেই নেই বলে আপসোস করলে চলবে না। সামাজিক বিবর্তনের শক্তির দ্বারা আমরা নব্য সাহিত্য সৃষ্টি করব। জীবনকে অগ্রাহ্য করছি অথচ সকলকে আনন্দ দেব, এ কি হয়? সামাজিক সত্তা, সমস্যা ও তার স্বীকার, নিরাকরণ বাদ দিলে সাহিত্য হয় একদেশদর্শী, প্রাণহীন, ছোট, হালকা, ঠুনকো, বেলোয়ারী। সাহিত্যিক নিশ্চয়ই সমাজকে স্বীকার করবে, কেননা সমাজ হলো মানুষের সম্বন্ধ, তবে যে শ্রেণীর হাতে সমাজ পড়েছে সে সমাজকে নয়। সাহিত্যিক সেই সামাজিক সমস্যার সমাধান করবে, কেননা সে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও নেতৃত্ব করবার শক্তি ও বাসনা তার আছে, তবে সে সমস্যা ঐ ওপরকার শ্রেণীর চিন্তাবিলাস— সে সমস্যা নয়, ভাঙাগড়ার সমস্যা। এ যুগে বেড়ার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে মজা দেখা কাপুরুষতা। এ সময়, অপক্ষপাতিতা, ঔদাসীন্য, মধ্যস্থতা করা সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও শঠতা। বিজ্ঞানে শুনেছি রায় না দিলেও চলে, যদিও আমি তা বিশ্বাস করি না, কিন্তু সাহিত্যে নিজেকে বাদী-প্রতিবাদী হতেই হবে, এ যে মানুষের জীবন নিয়ে কারবার, কেবল মায়ার খেলা নয়। চাকরিস্থলে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' প্রণালীটা উপকারী, কিন্তু সাহিত্যে অচল। সাহিত্যিককে দলে নামতেই হবে, দলের হয়ে তাকে লড়তেই হবে, দল অর্থে, ছোট্ট গণ্ডি নির্দেশ করছি না, হাট-বাজারের কোলাহল তাকে শুনতেই হবে, জীবন নিয়ে তাকে পরীক্ষা করতেই হবে। চিরন্তন মূল্যের দোহাই দিয়ে নিজেকে কূপের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে, চিরকাল ধরে ভোগস্বত্ব উপভোগ করবার বাসনা পোষণের জন্য তাকে দায়ী হতে হবে, জবাবদিহি পর্যন্ত করতে হবে। আমার সিদ্ধান্তগুলি যে সহানুভূতির নামান্তর নয় প্রমাণ করবার জন্য, তাদের গোড়াকার বিচার-বাক্যগুলিকে একত্রে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। একটি অন্যের সঙ্গে যুক্তির গাঁটছড়ায় বাঁধা।

(১) সাহিত্য মনের ক্রিয়া; মন মানুষের। মানুষের মন জীবনযাত্রার একটি উপায়, জীবনের কাজ অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন, প্রকৃতির সঙ্গেও। প্রথমটির নাম সমাজ-গঠন, দ্বিতীয়টির নাম বিজ্ঞান। এর একটি অন্যটিকে নিয়ন্ত্রিত করে। দু'টোই ক্রিয়াবাচক। অতএব সমাজে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা থেকে মানুষের মনের কোনো ক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, করলে মানসিক ক্রিয়াকলাপ অন্যের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে, যেমন সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতে হয়েছে। বিচ্ছিন্ন করলে চিন্তা হয়ে ওঠে কাজের চেয়ে ঢের বেশি দরকারী জিনিস, অতএব সত্তার বিচার হয় সেই চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত সঙ্গতি দিয়ে, যেমন দর্শনের মতো আর্টেও হওয়া উচিত বলা হচ্ছে। কিন্তু সত্য কথা অন্য ধরনের। জ্ঞান ও কর্ম পৃথক নয়, কর্মের জন্য জ্ঞানের উদয়। সেই জ্ঞানের সাহায্যে কর্মের সুবিধা ও-

সুব্যবস্থা, আবার তারই ফলে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান। কাজের সেরা কাজ জীবনযাত্রা, আরো ভালো করে, নতুনভাবে, তীব্রতর উপায়ে, ব্যাপকভাবে, সমগ্র শক্তিকে পুরোদমে খাটিয়ে নতুন শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। সাহিত্যই জীবনের শেষ নয়, যেমন জীবনের শেষ নয় দর্শন, বিজ্ঞান কিংবা অন্য যে কোনো আর্ট; ভালো করে জীবন চালানোই সাহিত্যের শেষ, যা-তা করে, যেমনভাবে জীবন চলে আসছে তেমন-ভাবে নয়। অবশ্য জীবনের অর্থ বদলে গেলে আমার বক্তব্যও বদলে যাবে। আপাতত জ্ঞান উপায় ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অতএব বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ যুগের সাহিত্যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের জীবন যে কেবল প্রতিফলিত হবে তাই নয়, তখনকার সমাজ-গঠন ও জীবনযাত্রার রীতিনীতির ইঙ্গিতও সেখানে থাকা চাই। এই হলো সাহিত্যের যথার্থ ঋণ-পরিশোধ, এইখানেই তার নেতৃত্ব ও যথার্থ প্রতিপত্তি।

(২) সমগ্র ইতিহাসই সমসাময়িক ইতিহাস, অর্থাৎ ইতিহাসের মর্ম-উদ্‌ঘাটনের সময় এখনই, প্রত্যেক মুহূর্তেই। যাঁরা মর্ম-উদ্‌ঘাটন করে ভবিষ্যৎ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত দিতে পারেন, সাহিত্যিক সেই দলেরই একজন। তিনিও অন্যের মতন ইতিহাসের নিয়ম-আবিষ্কারক, তবে তিনি ইতিহাসের নিয়মাবলীকে বিচার-বাক্যে পরিণত করেন না, মানবচরিত্রের সংঘাতে, ব্যবহারের পরিবর্তনে পরিস্ফুট করেন। দার্শনিকের আবিষ্কৃত নিয়ম নিরালম্ব, আবেগশূন্য, সাহিত্যিকের নিয়ম ব্যক্তির সম্পর্কিত, আবেগময়, চরিত্রের আশ্রয়ে প্রকাশিত। তাই সাহিত্যিকের আবিষ্কৃত নিয়ম আমরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করি। আবার সেইজন্যই এই 'স-গুণ' নিয়মের আবিষ্কারকদের অন্যের চেয়ে বেশি খাতির করি। মানুষের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের ধারা কীভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সাহিত্যিক জানেন বলেই সাহিত্যিক কালের অধীন নন। নিয়তির নিয়ম জানেন বলেই সাহিত্যিক স্বাধীন, অতএব কালাতীত। সাহিত্যে চিরন্তন মূল্যের অর্থই হলো এই। যে সাহিত্যিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের ইতিহাসের সামাজিক পরিবর্তনের গূঢ় কথা বোঝাতে পেরেছেন তিনিই বিশ্ব-সাহিত্যিক, তিনিই দেশের প্রকৃত নেতা। আজকালকার সাহিত্যিক, পরিবর্তনের কিংবা ইতিহাসের তোয়াক্কা রাখেন না, তাই নেতৃবৃন্দের প্রকোপ। সাহিত্যিকের কাছে সমাজ অনেক বেশি প্রত্যাশা করে, সাহিত্যিকের দায়িত্ব অন্যের অপেক্ষা অনেক বেশি। তাঁরা কেবল 'আর্টিস্ট' হয়ে সমশ্রেণীর আনন্দবিধান করলে সমাজের আশা মেটে না, সমাজের সাথে সম্বন্ধকে (কর্তব্যের কথা নাই তুললাম) অস্বীকার করার জন্য তাঁদের ক্ষতি হয়, অতএব আমাদের প্রত্যেকের ক্ষতি হয়।

অতএব আর্টের জন্য আর্ট বিশ্বাস করি না, কারণ তা হলে টাকার জন্যই

টাকা রোজগার, মন্দর জন্যই মন্দ, ভালোর জন্যই ভালো কাজ করায় বিশ্বাস করতে হয়, আর মানতে হয় কেবল বসবাসের জন্যই বসতবাড়ি, আরামের জন্য নয়, ভালো করে থাকবার জন্যে নয়। ঐ বাক্যের তাৎপর্য এইটুকু— আর্টিস্ট যেন নিজের কাজে ফাঁকি না দেন, সস্তায় নাম কেনার জন্য কিংবা বড়লোক হবার জন্য তিনি যেন সততার পথ থেকে বিচ্যুত না হন। আর্টের জন্য আর্ট মানার অর্থ হলো, কর্ম থেকে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করা, আর্টের বিষয়বস্তু, সমাজ-সত্তাকে পরিত্যাগ করা, ইতিহাস না বোঝা, এবং জীবনকে দূরে সরিয়ে রাখা, উপায়কে উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন বিবেচনা করা। 'আর্টের জন্য আর্টের' যুক্তিগত সঙ্গতি হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু সে যুক্তি জীবন ও পরিবর্তনের যুক্তি থেকে বিযুক্ত। কোন্ যুক্তি মানবো? কেতাবে-পড়া সত্তার সঙ্গে অসম্পর্কিত যুক্তি, না জীবনের, পরিবর্তনের, ইতিহাসের দুর্বোধ্য অথচ দুর্নিবার যুক্তি? কর্ম থেকে চিন্তাকে বৃন্তচ্যুত করবার জন্যই, (যাঁরা করেছেন তাঁদের কৃপাতেই) একটি অন্যটির বিপরীতধর্মী হয়ে উঠেছে। যাঁরা যুক্তির অন্তর্নিহিত সঙ্গতির ওপরই যুক্তির সার্থকতা নির্ভর করছে প্রমাণ করতে ব্যগ্র তাঁরাই সামাজিক জীবনের, ইতিহাসের, পরিবর্তনের প্রতিকূলে পাল তুলে অ-জানার উদ্দেশ্যে ভেসে চলেন। আমরা কিন্তু নিজ হাতে গড়তে চাই, আমরা ভাসতে চাই না, কূল-কিনারা আমরা জানতে চাই, দিশেহারার অবস্থা আমাদের ভালো লাগে না। ভেসে বেড়াবার বিলাস আমাদের বরদাস্ত হয় না। আর্টের জন্য আর্ট হলো অনেক ক্ষেত্রেই একটি শ্রেণীর জনসাধারণের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের ভদ্র ভাষা, অর্থাৎ পরিভাষা, নিজেদের প্রতিপত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধির নামান্তর, নিঃশেষিত হবার পূর্বনিঃশ্বাস, এবং জনসাধারণের রসোপভোগের অন্তরায় সৃজন, অতএব রসসৃষ্টির একটি প্রধান বিপত্তি।

(৩) সাহিত্য হলো মানুষের মনের ক্রিয়া, সমাজের বাইরে মানুষ নেই, কেননা, মানুষের সম্বন্ধই হলো সমাজের প্রাণ। সমাজের বাইরে আছেন যোগী-ঋষি, কিংবা বাঘিনী-প্রতিপালিত মানবশিশু। শেষ জীবটির সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ কম, প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ এখনও আছে। অবশ্য যোগী-ঋষির সাহিত্যিক সৃষ্টি ও মতামতের মূল্য সমাজের কাছে কম, শিশুর কাছেই বেশি। যতদিন না সমগ্র সমাজ শিশু হচ্ছে ততদিন মহাপুরুষদের কথা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। সাহিত্য একপ্রকার সামাজিক প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য থাকা চাই, প্রক্রিয়াটি ঠিক খেলা নয়; খেলারও উদ্দেশ্য ছিল আদিমযুগে, এখনও অন্য রূপে আছে, পরেও থাকবে, অন্য রূপে। এমন কী যোগেরও একটা উদ্দেশ্য আছে, আনন্দ কিংবা শান্তি, কিংবা স্বরাট্ হওয়া। নিষ্কাম প্রক্রিয়া কাঁটালের আমসত্ত্বের মতন কথার কথা। প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য থাকলে

সে উদ্দেশ্যের মূল্য থাকা চাই। উদ্দেশ্য বাইরের কোনো ভাব হলে একজনের হওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু উদ্দেশ্য ভিতরের, কাজ থেকেই তার উৎপত্তি, অতএব উদ্দেশ্য একাধিক ব্যক্তির। উদ্দেশ্যর মূল্যও একজনের দান নয়, উদ্দেশ্যর মূল্য সম্বন্ধে জনকয়েকের মতামতে মিল থাকা চাই, নচেৎ সাহিত্য ডাকটিকিট-সংগ্রহের চেয়েও নীচুস্তরের খামখেয়াল হতো। যাঁদের শিক্ষাদীক্ষার, আনন্দ পাওয়ার ও সৃষ্টির সুবিধা ছিল এতদিন তাঁরাই ছিলেন জনকয়েক। সেই ওপর-তলার বাসিন্দার মতামতে মিল থাকলেই যে কোনো উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের বলে গৃহীত হতো, সর্বসাধারণকে গ্রহণ করানো হতো, বিচার করবার সুযোগ না দিয়ে, নানাপ্রকারে। এখন জনকয়েক আর কয়েকজন মাত্র নয়, তার অর্থ আরও ব্যাপক হয়ে উঠেছে। কী আশ্চর্য! যখন সাহিত্য ছিল একটি মাত্র শ্রেণীর প্রক্রিয়া, তখন সে প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতামতের প্রচারকে প্রোপাগ্যাণ্ডা বলা হতো না, তখন সাহিত্য হতো সাহিত্যের জন্য। তার মধ্যে চিরন্তন মূল্যের আভাস পাওয়া যেত, আর এখন ঢের বেশি সংখ্যক লোকের মধ্যে মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মতের ঐক্যকে প্রোপাগ্যাণ্ডা বলেই সাহিত্যকে জাতিচ্যুত করা হচ্ছে। আমার বক্তব্য, অধিকসংখ্যক লোকের মতামতকে সংখ্যাধিক্যের জন্য, কিংবা বিপরীত মতামত-পোষণ ও উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই প্রোপাগ্যাণ্ডা বলা অন্যায়। যাঁদের উদ্দেশ্যর সঙ্গে, স্বার্থের সঙ্গে বিরোধ বেধেছে তাঁরা অবশ্য তাই বলবেন। তাতে এসে যায় না, তাঁরাই প্রথম পথ দেখিয়েছেন। সাহিত্য—অন্তত নবযুগের সাহিত্য প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট হতে বাধ্য। রামায়ণে, মহাভারতে আর্যধর্ম, ক্ষাত্রধর্মের তরফদারি আছে; রবীন্দ্রনাথেও আছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার; পুরাতন সমাজের বিপক্ষে এবং এখনকার নতুন সমাজের তরফে কিছু বলতে গিয়েও ব্যাস বাল্মিকী রবীন্দ্রনাথকেও প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট হতে হয়েছে। জনকয়েক যখন সর্বসাধারণের সঙ্গে মিশে যায়, কিংবা জনসাধারণে কোনো কারণে, বুঝে, না বুঝে, নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন না হওয়ার দরুন একটি শ্রেণীকে স্বীকার করে নেয়, তখন সাহিত্যের প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট হয়ে ওঠেন প্রফেট্। প্রোপাগ্যাণ্ডা হলো জীবনস্রোতের এই ঘাটার ঢেউ।

(৪) সাহিত্য হলো মানুষের মনের ক্রিয়া, মানুষ সমাজেই জন্মায়, সমাজের মধ্যে লালিতপালিত হয়, সমাজেই তাঁর প্রতিপত্তি, মৃত্যুর পর সমাজই তার বার্ষিকী, শতবার্ষিকী উৎসব করে। সাহিত্যিকও মানুষ। সাধারণ মানুষের চেয়ে তার ক্ষমতা বেশি কিন্তু তিনি মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নন। মানুষ একপ্রকার জীব। যতক্ষণ মানুষ জীব ততক্ষণ সাহিত্যিককে প্রতিবেশের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হবে, নচেৎ তার বাঁচা অসম্ভব। জীবজগতের এই অভিযোজন-

কর্মের কর্তা হলো জীবের সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি। গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার, সাধারণ মানব-সমাজে কীভাবে একটি গাছ, একটি জন্তু, একটি মানুষ বাঁচবে, নিজের নিজের সমাজ ঠিক করে দেয়। কোথাও যে ব্যতিক্রম হয় না বলছি না, কিন্তু ব্যতিক্রম সাধারণ নিয়ম নয়, এবং জীববিজ্ঞানই বলছে— ব্যতিক্রমের বাঁচবার সম্ভবনা কম। অর্থাৎ জীবজগতে বিধান দেয়, সমাজে জীবকে এই বিধানের আনুকূল্য করতে হয়। এখন, অভিযোজন-কার্যের অতিরিক্ত কোনো কর্ম মানসিক ক্রিয়াতে প্রতিভাত হয় স্বীকার করলেও, আমি এ কথা মানতে প্রস্তুত নই যে, মনোময় কী চিন্ময় জগতের আইনকানুন জীবজগতের রীতিনীতির প্রতিকূল। অতিরিক্ত কর্ম কিংবা ক্রিয়ার প্রভেদ থাকলেও সাধারণ মানসিক ক্রিয়া থেকেই সেই প্রভেদ। কতটুকু প্রভেদ জানতে হলে কিসের থেকে প্রভেদ জানাটাই প্রথমে দরকার। প্রকৃতির নির্বাচনই সামাজিক নির্বাচনের মূলে আছে, তাদের মধ্যে অন্যপ্রকার যত প্রভেদ থাকুক না কেন। যতদূর জানা যায় ততদূর বলা চলে যে, এই মনোময় জগতে এমন কোনো আগন্তুক অসাধারণ গুণ আবির্ভূত হয় না, যার সম্বন্ধে জীবজগতের ধাপ থেকেই দৈবব্যাখ্যার অপেক্ষা বুদ্ধির পক্ষে বেশি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা চলে না। জীববিজ্ঞান সম্পূর্ণতার দিকে আরো অগ্রসর হলে আত্মা, প্রতিভা প্রভৃতি যে কোনো আগন্তুক ও আকস্মিক গুণের আবিষ্কারের কারণ বের করা সম্ভব হয়। তখন হয়তো টের পাওয়া যায়, আত্মা কী প্রতিভা মানে মানুষের সব শক্তির পরিণত অবস্থায় সামঞ্জস্যের 'আদুরে' নাম। মোদ্দা কথা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়েই মনের কাজকে যাচাই করতে হবে, এমন কী, সাহিত্যিকেরও মনকে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল তথ্য যুক্তির সাতত্য, ঐক্য নয়। অজীব, সজীব, অতিজীব, মানবাত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে প্রমাণ করতে গেলে সমাজের তৈরি যুক্তির মালা ছিঁড়ে যায়। সে মালা নতুন করে সাজানো যায়, কিন্তু ছেঁড়ে না। আমি অন্তত ছেঁড়া মালা পরতে রাজি নই। রসায়নে ইয়ুরিয়া বলে একটা জিনিস আছে, হেনরি সাহেবের কাছে তার ব্যবহার আজব গোছের মনে হয়, ভোলার সাহেব তাকে ভেঙে যখন গড়লেন তখন তার আজবত্ব রইল না, কেননা কোনো কালেই ছিল না। অজ্ঞানতাই আজবত্ব সৃষ্টি করেছিল। আগে মনে হতো, শুভ্র জাতির, বড়লোকের ছেলেদের একটা নতুন শক্তি আছে, তারা বিবর্তন-সোপানের উচ্চস্তরের বলেই তারা জগজ্জয়ী, বেশি বুদ্ধিমান ইত্যাদি। এখন দেখা যাচ্ছে যে, শেখবার পদ্ধতি এক, কুকুর-বাঁদর থেকে আরম্ভ করে নর্ডিক ও কোটিপতির ছেলেদের পর্যন্ত। বিজ্ঞান আমাদের বড়ই সাধারণ করে দিয়েছে, কারণ অনেক বিজ্ঞানই এখনও সমাজ থেকে বৃন্তচ্যুত হয়নি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ক্রমেই কিন্তু সমাজ থেকে সরে আসছে, দার্শনিক

ও অঙ্কশাস্ত্রবিদের টানের জোরে। না সরিয়ে নিলে যে তাঁদের কর্মের অবসান হয়, অন্ন মারা যায়। বর্তমান সমাজের আবিষ্কৃত জীবনযাত্রা চালাবার শ্রেষ্ঠ যন্ত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আজকাল নিষ্কামধর্মে পরিণত করবার চেষ্টা চলেছে। যাঁরা চেষ্টা করছেন তাঁদেরই সমশ্রেণীর সাহিত্যিক স্বীকার করেছেন যে, বিজ্ঞান এক প্রকার গুহ্য ধর্ম, সাহিত্যেরই মতো, অতএব সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। এই চক্রান্তের ফাঁদে অনেকেই পড়েছেন। ফল কী হয়েছে আমরা জানি, বিজ্ঞান একেবারেই অবোধ্য, যেমন সাহিত্য একেবারেই দুর্বোধ্য। এই দুইদল ও তাঁদের পরিপোষক ধনী-সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রে সমাজ এখন মানুষের বাইরের জিনিস, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থেকে জীবন বহিষ্কৃত, সাহিত্যকলা সমাজ থেকে দূরীভূত, চিন্তা থেকে কর্ম, কর্ম থেকে চিন্তা, জীবন থেকে আর্ট ও বিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সব হয়ে পড়ল নিষ্কাম। যেমন নিষ্কামভাবে ধনীশ্রেণী অর্থ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে এসেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবিশ্বাসের অর্থ সমাজকে অস্বীকার করা, সমাজের পরিবর্তন না মানা, এবং সেই পরিবর্তনকে বুদ্ধির দ্বারা মানুষের অধীনে আনাতে আলস্য। সাহিত্যিককে সমাজসত্তা মানতেই হবে, অতএব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তাঁকে মানতেই হবে, নচেৎ তাঁর সাহিত্য হবে একটি স্বার্থপোযোগী ভাববিলাস। বর্তমান সাহিত্যের এত গলদ, সে সাহিত্য উপভোগে এত বিপত্তি, সাহিত্যে আভিজাত্য-অনুভব— এসব দোষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অ-প্রত্যয়ের দরুন অর্থাৎ জীবনের প্রতি আস্থা কম থাকার দরুন, সমাজ-'সত্তার' গ্রহণ করলে স্বার্থে ঘা পড়বে এই ভয়ের দরুন। যুক্তির সাতত্য রাখতে আমি শঙ্কিত হই না, কারণ যুক্তি হলো সামাজিক আদান-প্রদানের রীতিনীতি এবং পুরানো সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ গড়লেও পুরাতন দর্শনের ভাষায় সমাজ-'সত্তা'র অস্তিত্ব অটুট থাকে। আমি প্রাণবাদীর দৈবব্যাখ্যা মানি না। আত্মার বিশিষ্টতা স্বীকার করি না, বুদ্ধিতে বিশ্বাস করি, মেকানিস্টিক ব্যাখ্যায় আপাতত সন্তুষ্ট, সর্বক্ষেত্রেই সেই পদ্ধতি খাটাতে তৎপর, খাটাতে না পারলে অপেক্ষা করি, অধীরভাবে দৈবশক্তির কাছে ব্যাখ্যা ভিক্ষা করি না, প্রতীক্ষা করি সেইদিনের জন্য যেদিন বৈজ্ঞানিক সাহসভরে সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ, চিন্তার সঙ্গে কর্মের যোগ মেনে নিয়ে, সামাজিক কল্যাণরূপ সর্বসাধারণের উদ্দেশ্য স্বীকার করে, শ্রেণীর স্বার্থ ভুলে গিয়ে তার মার্জিত পদ্ধতি সামাজিক সমস্যার মীমাংসা-কার্যে নিযুক্ত করবে। তখন হয়তো এই যুক্তির নাম হবে অন্য, তা হোক। আমি বিশ্বাস করি যে, সাহিত্য-সৃষ্টি কাজটাও সাহিত্যিক নামক জীবেরই এক ধরনের কাজ। সাহিত্যিক নামক জীবটির মনের উৎকর্ষসাধন হয়েছে, তাই বলে সে অতিজীব নয়, তাই বলে তার মনোভাব প্রকাশ করা এবং লোকের দ্বারা সে

মতামত আলোচিত ও গৃহীত হওয়ার গুরু দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত নয়, অর্থাৎ সে কথনই অতি-সামাজিক নয়। প্রকাশ তাকে করতেই হবে, লোককে তাকে বোঝাতেই হবে, এবং ভাষারই দ্বারা, যে ভাষা তার একার সৃষ্টি নয়। এমন কী নতুন ভাষা সৃষ্টি করলেও তাই। নচেৎ ব্যর্থতার অসাধারণত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম্ সাহিত্যিকের মন্ত্র নয়। অতএব, জীব ও মননবিশিষ্ট জীব বলেই সমাজের সঙ্গে তার সম্বন্ধ তাকে বজায় রাখতে হবে। যার সঙ্গে লেনদেন তাকে বুঝতে হয়, নচেৎ ব্যবসা চলে না, বাঁচা চলে না, ঘরের মাল ঘরেই পচে। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যিক নামক মনবিশিষ্ট জীবের সংবিধান হলো সাহিত্যিকের সাহিত্য-জীবন। সাহিত্যিকের মন যদি শক্তিশালী হয় তা হলে সেই মনই হবে রাজা, অন্য জীব তখন প্রজার মতন তারই কথা শুনবে। কিন্তু তখনও সেই অসাধারণ মনের সঙ্গে সাধারণ জীবের মনের সম্বন্ধে ছেদ পড়বে না। এ যেন পুরুষ-প্রকৃতি, কোন্‌টা পুরুষ কোন্‌টি প্রকৃতি বোঝা গেল না, কে কাকে চালাচ্ছে তাও জানা গেল না। কিন্তু বোঝা গেল, দুইএর সম্বন্ধেই জীবনের উৎপত্তি। আশা করি সাহিত্যিক নিজেকে জীবন্ত জীবই ভাবেন।

(৫) রূপ ও বস্তুসত্তার মধ্যে পার্থক্য মধ্যযুগের আবিষ্কৃত স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে পার্থক্যের মতনই জীবনের সঙ্গে অনাবশ্যক, অবাস্তব এবং অপকারী। মঠের মধ্যে, পুস্তকাগারে কী পরীক্ষাগারে আবদ্ধ থাকলে এই প্রকার বিভাগ স্বাভাবিক মনে হয়। সুবিধার জন্য বিভাগ করতেই হয়। কিন্তু নিজের সুবিধা যদি বাস্তবজীবনের স্কন্ধে আরোপ করা যায়, তা হলে দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়, এবং জনকয়েকের সুবিধার জন্য আমরা যাই মারা। অসভ্যজাতি কেন, গ্রীক-হিন্দুরাও গাছপালা, নদী-পাহাড়ের মধ্যে আত্মবিসর্জন করতেন, তাঁরা রূপ ও বস্তুকে একই জিনিসের ভিন্ন দিক ভাবতেন, তাই বস্তুর প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল প্রকৃত বিনয়ের। বাইরের বস্তুকে আবার জয় করবার প্রয়োজন হলো, তাকে বুদ্ধির কাঠামোর মধ্যে আনা হলো, পাখি গেল উড়ে, হাতে রইল তার পালক, তখন পালকই হলো পাখির প্রতিভূ, শেষে প্রমাণিত হলো, হাতে যেটা সেইটাই আদত জিনিস ; রূপই আসল, বস্তুসত্তা হলো নকল। কিন্তু এইভাবে জীবন চালানো যায় না, কোনো আর্টই সম্ভব হয় না— **বিনয় চাই। আবার গরবও চাই।** বিনয়ের জন্য রামায়ণ, যেখানে বানর হয়ে ওঠে মহাবীর, গাছ হয়ে ওঠে মহীরুহ, যেখানে পাথর হয়ে ওঠে দেবতা, পাহাড় হয়ে ওঠে গন্ধমাদন, পাখি, লতাপাতা রামের শোকে কাঁদে। আর দাম্ভিকতার জন্য গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হয়, ওয়ার্ডসওয়ার্থের হাতে পড়ে প্রকৃতি মহাপ্রাণী ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে মহাপ্রাণ নির্গত করে, ম্রিয়মাণ তৈরি হয়, চিত্র হয় জ্যামিতি, সুর হয় অঙ্ক, স্থাপত্য হয় কল-

কারখানার নকল। অতি-বিনয়ও ভালো নয়, দাম্ভিকতাও ধাতে বসে না। যে ব্যক্তি সত্তাকে হৃদয়ঙ্গম করেছে সে-ই স্বাভাবিক পুরুষ। সেই স্বাভাবিক পুরুষ রূপ ও সত্তার মধ্যে আন্তরিকতা স্বীকার করে, বিলাসীর মতন আপেলের রং উপভোগ করবার জন্য খোলা কেটে টেবিল সাজায় না, আপেলই রাখে। মূর্তিগড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে বর্ণের ছটা বিচ্ছুরিত হয় সেই বর্ণ ই পাকা, নচেৎ বিসর্জনের সময় যে হরতেল ধুয়ে যায় তাকে কাঁচা রঙই বলতে হবে। রূপ ভিন্ন সত্তাসম্ভব নয়। রূপ ও সত্তার পার্থক্য মানলে সত্তার প্রতি, রূপের প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় না। দ্বিখণ্ডিত করবার পর আবার যদি খণ্ড-গুলি জোড়াও যায় তা হলেও সেই আদিম, অকৃত্রিম সত্তায় ফিরে আসা যায় না। অথচ আর্টিস্টকে সেই আদিম অকৃত্রিম অখণ্ডিত সত্তায় ফিরে আসতেই হবে। 'শান্তিতে স্মরণ করলে' যে কবিতা হয় তার মধ্যে আর্টের চেয়ে পরমাত্মার সন্ধানই বেশি পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, 'রূপ ও সত্তা দু'টি ভিন্ন বস্তু,'—এই দার্শনিক মতামত সম্ভব হয় সেই সময় যখন সমাজে শ্রেণী-বিরোধ ঘটে, তারই ফলে মনের ঐক্য বহুধা-বিভক্ত হয়ে যায়। সেইজন্য চিন্তার ক্ষেত্রেও বিভাগটি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। উন-বিংশতি শতাব্দীর শেষভাগের সমাজতাত্ত্বিকেরা প্রায় সকলেই সমাজের রূপ ও সত্তা নিয়ে চুলচেরা তর্ক তুলেছিলেন। এই সময় যে শ্রেণী-বিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছিল কে না জানে? সমাজের মধ্যে যতদিন ঐক্য থাকে, এমন কী শ্রেণী বিরোধ শুরু হয়েছে না বোঝা পর্যন্ত, রূপ ও সত্তা সাধারণের কাছে পৃথক মনে হয় না। আমার সন্দেহের আর একটি সমর্থন দিচ্ছি। যুদ্ধের পূর্বে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মুখে শুনতাম—সাহিত্যের বিষয় রূপ, বিজ্ঞানের বিষয় বস্তুসত্তা। আমাদের দেশেই বস্তাপচা মালের কাটতি সম্ভব, তাই আজকাল অনেক যুবকদের মুখেই ঐ মতের পাণ্ডুর পুনরাবৃত্তি শুনতে পাই। কিন্তু সত্য কথা এই, আর্ট ও বিজ্ঞানের মিল গরমিলের চেয়ে আন্তরিক—পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময়ে উভয়েরই উপকার হয়। বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে যে সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে পূর্বে বলেছি। বৈজ্ঞানিকও যদি আর্টিস্টের কাছে শিক্ষানবিসী করেন তা হলে বিজ্ঞানেরই উপকার হয়। বৈজ্ঞানিক ও আর্টিস্ট দু'জনকেই সততার পথে চলতে হয়, ফাঁকি দিলে কারুরই চলে না— যে রঙিন কাঁচের টাইল করে তারও নয়, আবার যে স্ফটিকের গঠন-প্রণালী নিয়ে পরীক্ষা করে তারও চলে না। বিজ্ঞানেরও ইতিহাস আছে, যার জন্য আইনস্টাইনের অঙ্ক বোঝা যায় না সাইবোলসন্ মরলি, মিন্‌কাউস্কীর কাজের সঙ্গে পরিচিত না হলে; আবার আর্টেরও ইতিহাস আছে, যার জন্যে অবনী ঠাকুরের ছবি বোঝা যায় না অজন্তার

ছবির সঙ্গে পরিচিত না হলে। দু'য়েরই ইতিহাস সমাজ নির্ণয় করে, সমাজের সঙ্গে দু'য়েরই সম্বন্ধ স্থির ও নিশ্চিত। দুইই এক প্রকারের সংযম, এবং দু'য়েতেই বাদ দিতে হয় অবান্তরকে, কিন্তু দু'য়েতেই আসল জিনিস বাদ পড়লে সবটাই নিরর্থক হয়ে পড়ে, অনর্থ ঘটায়, যেমন হচ্ছে— বিজ্ঞান পড়ছে 'ভুয়ো' দর্শনের গর্তে আর আর্ট পড়েছে জ্যামিতির প্যাঁচে কিংবা হাজির হয়েছে বড়লোকের বৈঠকখানায়। প্রকৃত সাহিত্যিক সত্তা নিয়েই ব্যস্ত, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গঠন-প্রণালীও দেখেন। গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ কেবল রূপকার নন, তাঁরা সমাজ ভেঙেছেন সমাজ গড়েছেন, আবার রাদারফোর্ড, নীল বর্ পরমাণুর মডেল তৈরি করেই বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন করেছিলেন। জীবতত্ত্বে বীজ নিয়ে পরীক্ষা হয়, আবার সেই বীজের সজ্জাপ্রণালী নিয়েও কল্পনা করার একান্ত প্রয়োজন কাছে। আজকাল কেউ কেউ আর্ট ও বিজ্ঞানের পরস্পরের সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন, কারণ তাঁরা বুঝেছেন যে, সমাজে ঐক্য আনার একান্ত প্রয়োজন। আজকালই লোকে বুঝেছে যে, কারুশিল্প ও সাধারণ শিল্পের মূল এক ভিন্ন দুই নয়। কিন্তু আমরা তাঁদের কথা জানি না, জানলেও বুঝি না, কেননা যে সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ধরনের কথা মানুষের মুখ থেকে আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ে, সে পরিবর্তন আমাদের সমাজে হয়তো আসেনি, অন্তত অমনভাবে প্রকট হয়নি।

(৬) আর একটি মাত্র বিচার-বাক্য আপনাদের দরবারে পেশ করব। ভাষা নিয়েই সাহিত্য। ভাষা প্রধানত মানুষের মুখের। তলিয়ে দেখতে গেলে, বাকৃতত্ত্বে, ঐ মুখের অধিকারীভেদ নেই। শিশুর কচি মুখ, শ্রীমুখ, পাগলের মুখ-- যাই হোক না কেন, মুখ-নিঃসৃত ভাষার প্রকৃতি হলো এই যে, সেটি নিতান্ত দৈহিক ক্রিয়ার অনুকল্প প্রক্রিয়া। ভাষা দৈহিক প্রক্রিয়ার প্রতিভূ। কাজের বদলি কথা, কিন্তু কাজেই কথার উৎপত্তি। এক একটি কথা মূলত এক একটি দৈহিক প্রক্রিয়ার প্রতিরূপ সংজ্ঞা। কথার পিছনে যে চিন্তা থাকে তার প্রকৃতিই হলো কার্যের পূর্বাববোধ। একেবারে অশরীরী চিন্তা নেই, শারীরিক কাজের সঙ্গে চিন্তার সম্বন্ধ সাক্ষাৎ কিংবা অপ্রত্যক্ষ। যত অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ততই ভাষার পরিণতি —সুরের দিকে। তবুও দৈহিক প্রক্রিয়ায় হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। সূক্ষ্মতম অ-বাস্তব চিন্তার পরিণতিও দৈহিক প্রক্রিয়ায়, প্রত্যেক চিন্তার বেগ প্রশমিত হয় দৈহিক অবস্থার পরিবর্তনে। যে কবি ও আর্টিস্ট সত্য কথা কন, তিনিই ঐ কথা স্বীকার করেন। ভালো গান শুনলে আমার গাল কণ্টকিত হয়ে উঠতো, আবার দাড়ি কামাতে ইচ্ছা হতো বললে লোকে হেসেছেন। সেদিন একজন বড় কবি বলেছেন, 'কবিতা ভালো কী মন্দ পরীক্ষা করা যায় না, তবে যে কবিতা পড়লে

পা শিউরে ওঠে—পায়ে কাঁটা দেয় তাকেই ভালো কবিতা বলি।' ক্ষুরের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। আর একজন সাহিত্যিক যিনি একাধারে বড় কবি ও শ্রেষ্ঠ সমালোচক, তিনিও কবিতা লেখার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, কবিতা লেখবার পূর্বে দেহের যে টান টান ভাব থাকে কবিতা লেখবার পর তার অবসান হয়, এবং তাইতেই যা কিছু সাহিত্য-সৃষ্টির আনন্দ। এখন মানস-বিজ্ঞানে বলছে যে, এই পূর্বাববোধের অবস্থায় মানসিক ব্যবহারগুলি স্থিরীকৃত হয় সামাজিক ব্যবহারের আদান-প্রদানের দ্বারাই। এই সামাজিক আদান-প্রদানেই বৈজ্ঞানিকে যাকে মন বলে তার উৎপত্তি, তারপর মন দেহে আশ্রয় করে, এবং আমরা বলি, একটি বিশেষ দেহের বিশিষ্ট মন। কিন্তু মনের বিশেষত্ব বাস্তবিক পক্ষে 'অতি সামাজিক' একেবারেই নয়। যদি আমরা অন্যের সঙ্গে কথা না কইতাম, তারা যদি আমাদের সঙ্গে কথা না কইতো, যদি কারুর সঙ্গে কারুর বাক্ বিনিময় না হতো, তা হলে আমরা নিজেদের সঙ্গেও কথাবার্তা কইতে পারতাম না। আধুনিক সাহিত্যিকের মতে সাহিত্য হলো নিজের সঙ্গে কিংবা নিজের ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে কথা কওয়া। কিন্তু বাকের প্রকৃতি ঐ হলে কি করে তা সম্ভব? বাক্ হয় স্পষ্ট, না হয় গুপ্ত ব্যবহারের প্রতিভূ, ব্যবহারের পূর্বাববোধ ও প্রত্যক্ষতার সঙ্গে তার যোগ। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে সমাজের সঙ্গে বাকের ও বাক্যের সম্বন্ধ রয়েছে— কিন্তু ঐ সম্বন্ধবিষয়ে আমরা সব সময়ে সচেতন নই। ব্যাপারটাকে বিশদ করা যাক। মানসিক ব্যবহারকে সুবিধার জন্য দু'ভাগে বিভক্ত করা চলে: (১) যে ব্যবহার বাইরের নৈসর্গিক প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে কোনো উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সজ্জিত, এবং (২) যে ব্যবহার ভেতরকার প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহারের ভাষা খামখেয়ালির, বিকৃত মস্তিষ্কের, সিজো-ফ্রেনয়েডের আবোল-তাবোল। এ প্রকার বাক্যের সঙ্গতি নেই বলা চলে না, সঙ্গতিটুকু কোনো বিশেষ কথা, ঘটনা কিংবা ব্যক্তির অনুষঙ্গে প্রকাশিত হয় মাত্র। মনে হয় যেন সে বাক্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই, যদিও বক্তার কাছে হয়তো আছে। আধুনিক লেখকেরা বলেন, তাঁদের নিজেদের ও দলের কাছে নিশ্চয় আছে। কেন তবু অসঙ্গত মনে হয় বিচার করলেই বোঝা যাবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, উদ্দীপক ও উদ্দীপনার সম্বন্ধে কোনো ভাষার সঙ্গে এই আবোল-তাবোল ভাষার পদ্ধতিতে পার্থক্য নেই— আছে পার্থক্য কেবল সমাজের গ্রহণশীলতায়। যে-সব উদ্দীপনায় পাগলের মুখ থেকে বাক্য বেরুচ্ছে তাদেরকে সমাজ উপযুক্ত ভাবছে না। অর্থাৎ অনুষঙ্গে কোনো দোষ নেই; তবু অসঙ্গত মনে হয় এইজন্য যে, সমাজ অর্থসঙ্গতিটুকু স্বীকার করছে না। এইখানে

অন্তত সমাজ কর্তা। অর্থ-সঙ্গতির শেষ আপীলও রুজু করতে হবে সাধারণের এজলাসে। যদি জনসমাজ সে আপীল গ্রাহ্য করে তবেই আধুনিক লেখকদের গুপ্তমন্ত্র সাহিত্য-পদবাচ্য হবে। খানিকটা মতের ঐক্য হওয়া চাই, নচেৎ প্রকাশের কোনো মূল্য থাকে না, সাহিত্যিক মনের সংবাদেরও মূল্য থাকে না। বাক্যের মধ্যে সঙ্গতি বা যুক্তির অংশটুকু বক্তার নিজের সৃষ্টি নয়। অন্তত এই-খানে শুদ্ধ ব্যক্তিতন্ত্রবাদ আর টেকে না। তা হলে কথা দাঁড়ায় এই যে, কী বাক্ কী বাক্যে, সামাজিক সত্তা ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। সাহিত্যিকের চোখে আঙুল দিয়ে সামাজিক সত্তা স্বপ্রকাশ করছে না বলে স্বীকার করা চলে না যে, সামাজিক সত্তার সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ নেই, কিংবা কম। হাওয়া যখন স্থির তখন মানুষে হাওয়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ না করলেও তার চলে, কিন্তু যুদ্ধের সময় জার্মানীতে যখন বারুদ তৈরির জন্য সোরা পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন হাওয়া আনার প্রয়োজন হয়েছিল। জলের ওপর নৌকা-জাহাজ চালাবার সময় হাওয়া মানতে হয় কি না হয় সারেঙ্গসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেই টের পাওয়া যায়। আজ আকাশে ঘনঘটা, ঝড় উঠেছে, তাই বলছি সব সাহিত্যিককে— আবহাওয়ার মতন এই সমাজ-সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করুন, নচেৎ মাঝদরিয়া পর্যন্তও পশ্চিমী সাহিত্যের মতন যেতে হবে না, কিনারার কাছে ভরাডুবি হবে। তখন সেলুনে বসে নাচগান ও ককটেল টানলে, ফষ্টিনষ্টি করলে, ঝড় লজ্জায় ইয়োলাসের থলের ভেতর আত্মগোপন করবে না। সমাজ-সত্তাকে অবহেলা করেই সব সাহিত্য হয়ে উঠেছে বেলোয়ারী চুড়ির ব্যবসা— বড়ই ঠুনকো, বড়ই হালকা, বড়ই ফাঁকা, যদিও রঙবাহার।

এই বিপদ আমাদের আরও বেশি, কারণ পুরানো কালে যে সমাজ মানুষের প্রত্যেক কর্মে বুঝিয়ে দিত যে সে আছে, সে সমাজ আজ ভেঙে গিয়েছে, সে সামাজিক সত্তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সমাজ ভেঙে গিয়েছে, পড়ে রয়েছে তার টুকরো, তার মধ্যে একটি বলছে আমিই সব, অন্য টুকরো শুনতে পাচ্ছে না এই দাবি, যারা পাচ্ছে তারা মানছে না। সমাজ যখন নেই, অথচ একটিমাত্র শ্রেণী রয়েছে, তখন সেই সত্তাকে সমগ্র সমাজ-সত্তা বলে ভুল করা স্বাভাবিক। কিন্তু এ তো চিরকাল থাকবে না, অন্য শ্রেণী মাথা তুলবে, তখন বাধবে বিরোধ! সে বিরোধের অবস্থা কারুর কারুর কাছে অবশ্যম্ভাবী মনে হলেও বিরোধ কিছু চিরন্তন নয়। শ্রেণী-বিরোধ ইতিমধ্যের ইতিহাস। শ্রেণীর সত্তা ভাঙছে, গড়ছে— তার-শেষ নতুন সমাজে। শ্রেণী-সত্তাকে আশ্রয় করে বড় সাহিত্য হতেই পারে না। কোনো ব্যক্তি এই শ্রেণীর আবহাওয়াতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না, কোনো সাহিত্যিক এই অবস্থায় বড় কিছু লিখতেই পারে না।

খণ্ড সত্তায় যাদের আশ মেটে তাদের কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু বড় আর্টিস্ট এক একটি বৃকোদর, তাই রবীন্দ্রনাথ ছোটেন অন্য দেশে, রাশিয়ায়, ক্ষুধা মেটাতে, নতুন সমাজ দেখতে। যেদিন একটিমাত্র শ্রেণী স্ব-ইচ্ছায় সমাজের মধ্যে আত্মবিসর্জন করবে সেদিন শুভদিন— কিন্তু ইতিমধ্যে কী করা যায়? আমি প্রথমেই বলেছি বাংলা দেশে যেন নতুন শ্রেণী তৈরি হচ্ছে মনে হয়; যা প্রমাণ দিয়েছি তা ছাড়া অন্য প্রমাণও পেয়েছি। এই শ্রেণীর উত্থান ও পুরাতন শ্রেণীর পতনের মূলে যে সমাজশক্তি আছে তাকেই সাহিত্যের কাজে লাগাতে হবে। সে শক্তির নাম বিজ্ঞান, অর্থাৎ নিয়তিকে বশে আনা; তার আর একটি নাম আর্থিক বৈষম্য অবসানের ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা, বাঁচবার জন্য, ভালো করে করে বাঁচবার জন্য। 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'।

এখন সাহিত্যে সামাজিক সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন কাঁরা? যাঁরা ঐ একমাত্র শ্রেণীর চেয়ে অন্ততঃপক্ষে ষোলগুণ সংখ্যায় বেশি, যাঁরা উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, চাকুরে নন। যাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন, ইতিহাসের নিয়ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা আবিষ্কার করে নিয়তির হাত থেকে মুক্ত হতে চান, সমাজের ভবিষ্যৎকে করায়ত্ত করতে চান। যাঁরা তরুণ অথচ জ্ঞানে বৈজ্ঞানিক। বিশেষ করে যাঁরা জমির সংস্রব ছাড়েননি; কেন না জমিই হলো আমাদের সমাজ-সত্তার প্রকৃত সত্ত্ব। আমি শুনেছি পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে যাঁরা জমি চাষ করেন তাঁদের বেশির ভাগ মুসলমান। ভালো কথা, অতএব মুসলমান সাহিত্যিকের দায়িত্বই এ ক্ষেত্রে বেশি। তাঁরা যদি কেবল আরবী ফারসী উর্দু জবান আমদানি করে বাংলা সাহিত্য বড় করতে চান, তা হলে তাঁদের চেষ্টা সফল না-ও হতে পারে, কেন না হিন্দুরা আপত্তি করবে। কিন্তু তাঁরা যদি নতুন শ্রেণী-গঠনের ভার নিয়ে সমাজ-সত্তাকে সগৌরবে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তা হলে সত্যই সাহিত্যের উপকার হবে। তখন সে সাহিত্য হবে সকলের, হিন্দুরাও আর আপত্তি করবে না, আনন্দে গ্রহণ করবে, আরো বড় করতে সাহায্য করবে। কারণ হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এক, সমাজ এক, দুই নয়, ভালো করে বাঁচাবার ব্যগ্রতায় তারা এক, তাদের গোষ্ঠীজীবন এক, অধিকারের চেয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধে তারা এক। তাদের চিন্তাধারা একই প্রণালীতে বয়। কিন্তু মানসিক সংস্কারে যদি কিছু পার্থক্য থাকে, তাদের মূল কারণ এই মাটির সংস্রবে ও গ্রামে থাকার দরুন তাঁরা হিন্দুদের মতন অবাস্তব হয়ে পড়েননি, এখনও সত্তার সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, জমির সঙ্গে তাঁদের যোগ আছে। সেই জন্য তাঁদের ভাষায় অত প্যাঁচ নেই। লাঠির মতোই তাঁদের ভাষা সোজা আসে। তাঁদের ঐতিহ্যে ধনিকতন্ত্র ফুটে উঠতে পারে নি, তাঁদের

মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ কম, জাতি-বিভাগ কম, তাঁদের ধর্মে সামাজিক সাম্য খুব জোরেই ঘোষিত হয়েছে। আজ পূর্ববঙ্গে তাঁরা অধিকাংশই গরীব। চাকরিও তাঁরা কম করেন, শহরে তাঁরা বাস করতেও চান না। এত সুবিধা তাঁদেরই। অতএব তাঁদের কাছেই আমার প্রত্যাশা বেশি। তাঁরা ইচ্ছে করলে সমাজকে ও সাহিত্যকে গড়ে তুলতে পারেন। নতুন সমাজ তৈরি না হলে তাঁদের ক্ষতিই বেশি। সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা হিন্দু তাঁরাও এই কাজ গ্রহণ করুন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নতুন সমাজে থাকবে না, ক্ষুধার চোটে সমস্যা মিটবে বললে এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হলো না। নতুন সমাজ-সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত হলে হিন্দু-মুসলমানের যে প্রকৃত মিলন ঘটবে, তারই ফলে হবে সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। বড় কাজ একত্রে না করতে পেরেই আমাদের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ, যেমন নতুন কাজ না পেয়েই পুরাতন শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্যবোধ হয়েছিল। ইতিহাসের পটভূমিকায় নটের অভিনয়-অংশ সম্বন্ধে সচেতন না হলে কি করে চলবে? সাহিত্যে যে সমাজ-সত্তাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই সে সম্বন্ধে ঐতিহাস চেতনার প্রয়োজন। যে সেই সমাজ গড়বে, সে-ই বড় সাহিত্য-সৃষ্টির সহায়তা করবে। এইটুকুই আমার বক্তব্য।

সমাজ-সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার পর, তার সঙ্গে যুক্ত হবার পর সাহিত্যের মাত্রা ঠিক করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। আমি যা বলতে চেষ্টা করলাম সেটি হলো কাব্য-জিজ্ঞাসার মুখবন্ধ। 'অথ' কথাটির অর্থ পরিষ্কার না হলে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যেমন কচি ছেলের আবদার মনে হয়, তেমনি সাহিত্যের বস্তু না বুঝলে কিংবা তার সঙ্গে বিযুক্ত হলে কাব্য-জিজ্ঞাসা ও সাহিত্যের মাত্রা নিরূপণ নিতান্তই নিরালম্ব বিচার হয়ে ওঠে। 'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা'। কাব্য জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে আমার বলবার বেশি কথা নেই, কেননা আমি কবিও নই, আর্টিস্ট নই। আমি আনন্দ পেতে চাই, মিলে মিশে। নমস্কার, ধন্যবাদ।

১৩৪১

*

নতুন ও পুরাতন

সাহিত্যিক তর্কের অবসান হলো যুবক-বন্ধুর একটি প্রশ্নে— 'সত্য কথা বলুন মুখুয্যেমশাই— ভালো সন্দেশ কলকাতা শহরে আর পান? আমাদের সময় আধা-ছানার মণ্ডা দ্বিতীয় শ্রেণীর মিষ্টির মধ্যে গণ্য হতো, এখন যে-কোনো বড় দোকানের কাঁচের বাক্সে মাথা খুঁড়লেও পাবেন না, অর্ডার দিলে পরের দিন মিলতে পারে, তাও কেবল চিনির ডেলা।'

এই মন্তব্যে আপত্তি জানালাম— 'কেন, আজকাল খাবার কত সুবিধা, টেলিফোনে দোকানে অর্ডার দিন, আধ ঘণ্টার মধ্যে মোটরে পৌঁছে দেবে— সিঙ্গাড়া গরম, দই ঠাণ্ডা, রেফ্রিজারেটারে রাখা, টাইফয়েড-কলেরার ভয় নেই। অবশ্য দাম একটু চড়া।'

'ব্যস, ঐ পর্যন্ত। কিন্তু সিঙ্গাড়া আমাদের কালে খাবারের মধ্যে অন্ত্যজ ছিল। হাঁ, দইটা অবশ্য— কিন্তু কোয়ালিটি দেখুন, দইএর কাছে আপনি কী প্রত্যাশা করেন? সুগন্ধ, সুস্বাদ, না দইএর দধিত্ব, সেটা মোল্লারচকেই পাওয়া যেত।'

'খানিকটা মানি। আমার পৈতে ও বিয়েতে কর্তারা পেনেটির গুপো, নাটোরের মণ্ডা, তমলুকের দই খাইয়েছিলেন।'

'তেমনি ধরুন চাল। বাঁশমতি বাজারে পান? কোন্‌টার উন্নতি হয়েছে বলুন?'

'তা হলে আপনার মতে রবীন্দ্রনাথই দায়ী?'

'এক হিসেবে তাই বৈ কী! তঁার সদ্‌গুণ কেউ নিলে না, শেষের কবিতার ভাববিলাসটাই নিলে। ফলে বুদ্ধদেব বসু। এই অবনতির গতি থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছেন দু'জন কবি— বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্র দত্ত। তাঁদের সামাজিক সার্থকতার জন্য তাঁরা সিগ্‌নিফিক্যান্ট।'

'দেখুন, আমার মনে হয়, প্রমথবাবু, দেবেন সেন প্রভৃতি লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আত্মনিবেদন করেন নি। তাঁদের ধরছেন না কেন?'

'প্রমথবাবুর সমাজবোধ ছিল না, তিনি ছিলেন কেবল যাকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বলা হতো তাই।'

'সুধীন্দ্র ও বিষ্ণু ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল নয়? তাঁরা কী খুব সামাজিক? দু'জন কী একই ধরনের?'

'ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যা-ই হোন না কেন, তাঁদের প্রচেষ্টার একটা সামাজিক কৃতিত্ব আছে। বিষ্ণুবাবু ও সুধীন্দ্রবাবুর মধ্যে পার্থক্য আছে— একজন ছুরি

চালান, অন্যের হাতে হাতিয়ার মুদ্গর।'

আমার যুবক-বন্ধুর সঙ্গে যা কথোপকথন হয়েছিল তারই শেষাংশ যথাযথ লিপিবদ্ধ করলাম। কারণ এই যে, তাঁর মন্তব্যগুলি বিচারের উপযোগী। তিনি যাবার পর আমার অস্বস্তি এসেছে, কলম ধরে শান্তির আরাধনা করছি। বন্ধুর মতামত ঠিক অপ্রত্যাশিত কিংবা অপূর্ব নয়। কিছুকাল থেকে অনেকটা ঐ ধরনের মতামতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি বটে, কিন্তু ঐ রকম স্পষ্ট ভাষায় তার প্রকাশ পাইনি। যখন পেলাম তখন বন্ধুর বয়সের সঙ্গে তাঁর আপসোসের বিরোধ উপলব্ধি করে নীরব থাকা অনুচিত।

তাঁর সঙ্গে আমার একটা কোথায় যেন পার্থক্য রয়েছে। সেটা কী মাত্র বয়সের? না, আরো প্রাথমিক, দৃষ্টিভঙ্গির? আমাদের যুবা বয়সে এমন কী ছিল যা এখন নেই, একালে এমন কী আছে যা আমাদের ছিল না? সত্যকারের পার্থক্য আছে কি? কীভাবে আমরা জগতকে দেখতাম? কীভাবেই বা এরা দেখেন? যদি কিছু পার্থক্য থাকে তবে তার মূল্য কতটুকু?

'আমাদের' বলতে অবশ্য আমার ও আমাদের দলকে বোঝাই স্বাভাবিক। আমি কী ছিলাম? আমি রুশোর মতন আত্মজীবনী লিখতে বসিনি বটে, কিন্তু তাই বলে এখনকার মনোভাব ও আদর্শ তখনকার ওপর আরোপ না করার মতন সংযম আমার আছে। ছিলাম এক কথায় 'ফাজিল' ছেলে— অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক পড়তাম না, বাজে বই পড়তাম, যা পড়তাম তার চেয়ে বেশি কিনতাম, তারও বেশি ঘাটতাম, ও আরো বেশি 'চাল' দিতাম। টাকার ভাবনা এক হিসেবে ছিল না, কেবল বাবা ও মা চা-চপ্-কাটলেট, দর্জি ও বইএর দোকানের বিল শোধ দেবার সময় রাগারাগি করতেন, এইটুকু ছাড়া। চাকরিবাকরির কথা মনে উঠতো না, পড়াশুনার সঙ্গে চাকরির সম্বন্ধ আমার অজ্ঞাত ছিল। ভালো ছেলের সঙ্গে যেমন মিশেছি, বখা ছেলের সঙ্গে তেমনই, বোধ হয় একটু বেশি প্রাণ খুলে। একটা গোঁড়ামি ছিল চরিত্র সম্বন্ধে। গান শিখতাম ও ভালবাসতাম, তবে ধ্রুপদ— তার নীচুতে নামিনি। থিয়েটার, খেলাধুলোর শখ ছিল। মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি, তবে আগ্রহ ছিল না, লোভ তো নয়ই। বন্ধুত্ব করেছি প্রাণভরে— সমবয়সীর সঙ্গে। যা কিছু রোমান্স প্রধানত ওদেরই সঙ্গে। অন্যসব ছুটকো-ছাটকা— দু'এক বছরের বেশি তাদের জান্ ছিল না। কল্পনা-বিলাসী ছিলাম না, তবে কল্পনা ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রতি কোনো প্রকার আসক্তি ছিল না। 'বাংলা বই' বলতাম বাংলা সাহিত্য বলতাম না। স্বদেশী যুগে 'বন্দেমাতরম্' গেয়েছি বটে, কিন্তু যেন মনে ধরেনি। লাঠি খেলা, সাঁতার দেওয়া, গাছে চড়া, স্বেচ্ছাসেবক হওয়া, বন্যা-

প্রপীড়িতের উদ্ধার, গ্রাম-উদ্ধার, নাইট-স্কুল, ইংরেজীতে বক্তৃতা— কিছু বাদ দিইনি বটে, কিন্তু হুজুকে পড়ে। মোদ্দা কথা পলিটিক্যাল জীব ছিলাম না।

চিন্তার দিক থেকে কোনো একটা বিশেষত্ব ছিল না। শেষ যে নামজাদা লেখকের বই পড়তাম তারই মত উদ্‌গীরণ করতাম। সেটা মস্তিষ্কের পরিচায়ক নয়, স্মৃতিশক্তির। একাধিক কলেজ ঘুরেছি কিন্তু প্রধানত রিপন কলেজেরই ছাত্র আমি। যখন নতুন বাড়িতে কলেজ এল, তখন বিস্তর আধুনিক বই কেনা শুরু হয়। বিকেলবেলা ত্রিবেদীমহাশয়ের ঘরে অধ্যাপকবৃন্দের আড্ডা জমতো কৃষ্ণকমলবাবুকে ঘিরে। সেখানে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা, পুরাতন ইতিহাসের আলোচনা হতো, আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুনতাম। এমন আলোচনা আর কোথাও আমি অন্তত শুনিনি। তার দু'টি প্রধান গুণ ছিল— গাম্ভীর্য ও বিদ্যা। ক্ষেত্রবাবু রসিকতা করতেন, কিন্তু সে-রসিকতার অন্তরে, পিছনে ও চারপাশে যে গুরুত্ব ছিল তা স্মরণ করলে এখনও মাথা নীচু হয়। এই আসরের প্রভাব আমার জীবনে ওতপ্রোত হয়ে আছে। বিশেষত একটা দিক থেকে। আমার বি. এ. ক্লাসে ছিল কেমিষ্ট্রি ও অঙ্ক— বিজ্ঞানে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করি। ত্রিবেদীমহাশয়, গঙ্গাধরবাবু, সুরেনবাবু, জানকীবাবু, বাজপেয়ী মহাশয় কেমিষ্ট্রি পড়াতেন। ত্রিবেদীমহাশয়ের শরীর তখন ভাঙতে শুরু হয়েছে। সপ্তাহে তিনি মাত্র দু'দিন পড়াতেন। যেদিন ক্লাসে প্রথম এলেন সেদিন আমাকে একটি প্রশ্ন করেন, **Charles' Law, Avogadro's Hypothesis** পড়েছ? গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেলাম। একটু হেসে বললেন, **Law** ও **Hypothesis**-এর পার্থক্য কি? **Logic** পড়েছ? ওটা না পড়লে বিজ্ঞান বোঝা যাবে না। তারপর পুরো দু'তিন মাস বিজ্ঞানের তর্কনীতির ব্যাখ্যা চলল— সেগুলি 'জগৎ কথা'য় প্রকাশিত হয়। সেই থেকে 'বিজ্ঞানে'র অর্থ আমার কাছে **M. Sc. D. Sc.**-র কাছে বিজ্ঞানের অর্থ থেকে পৃথক রয়েই গেল।

এই সময় আমার সঙ্গে ৺সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্ক শুরু হয়। তিনি তখন ম্যাণ্ডাল থেকে দেশে ফিরেছেন। জনকয়েক বন্ধু মিলে আমরা তাঁর ছাত্র হই। প্রধানত বিজ্ঞান ও অঙ্কের, কিন্তু মুখ্যত চরিত্রের। যুবা বয়সের দোষগুণ তখন আমার স্বভাবে ফুটে উঠছে। একটা ভাবের ঘুরপাকে জীবনটা তখন পড়েছিল। তাঁর আদর্শবাদ আমাকে উদ্ধার করলে। আমার জীবনে আমার পিতার ও সতীশবাবুর আদর্শবাদের ছাপ সুস্পষ্ট। পরে অনেক অশান্তি এসেছে তাঁদের প্রভাবে; কিন্তু আমার পরিশ্রম করবার শক্তিও তাঁদের কৃপায়। দু'জনেই ধার্মিক ছিলেন, পিতা জ্ঞানমার্গের পথিক, সতীশবাবু ভক্তিমার্গের।

সতীশবাবুর ভগবানে বিশ্বাস ছিল সুদৃঢ়, কিন্তু সে-বিশ্বাসের ছোঁয়াচ আমায় লাগেনি। বরঞ্চ আমার পিতার জ্ঞানপন্থাই আমাকে সাহিত্যের ও সঙ্গীতের ভাবপ্রবণতা থেকে রক্ষা করেছে। একটা কথা লিখতে ভুলেছি। ছেলেবেলা ছোট শহরে কাটিয়েছি ; সেখানে গ্রাম ও শহর, দু'য়েরই ভালোমন্দের সাক্ষাৎ পাই। তারপর থেকে শহরবাসী। গ্রামের প্রতি যুবা বয়সে কোনো মোহ ছিল না— একেবারে শহুরে হয়ে যাই। এই তো গেল আমার মানসিক আবহাওয়া।

আমাদের দলের কথা লেখা শক্ত। পূর্বেই লিখছি, আমার দল ছিল প্রকাণ্ড — তাতে বখা ছেলে, কুস্তিগির-খেলোয়াড়, গাইয়ে-বাজিয়ে থেকে সাহিত্যিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন সবাই আসতো। অতএব আমাদের দলের একটা মানসিক ল. সা. গু. আবিষ্কার করা শক্ত। অবশ্য, সত্য কথা বলতে গেলে, নচেৎ যাঁরা এখন বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের ধরে অনেক কিছুই বড় বড় কথা লেখা যায়। তবে এটা ঠিক— ১৯।২০ বছর থেকে ২৫।৩০ বছরের আমার পরিচিত যুবকবৃন্দ প্রমথ চৌধুরীর চারপাশে দল তৈরি করে। 'কমলালয়ে' নানাপ্রকৃতির ছেলে আসতো। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বন্ধু ছিল অবশ্য, কিন্তু সবুজপত্রের দলেরই তখন 'মন' ছিল বলা যায়। অন্তত সেই দলের প্রত্যেকে তাঁর দৌলতে মন তৈরি করার সুযোগ পায়। অতএব 'আমাদের দল' বলতে সবুজপত্রের দল বলা অন্যায় নয়। এই দলের গোটা কয়েক সাধারণ মানসিক ধারার উল্লেখ করছি। বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এই দু'টোই প্রধান।

বলা বাহুল্য, বুদ্ধিবাদ মানে বুদ্ধিমত্তা নয়, যদিও প্রমথবাবুর কাছে নির্বুদ্ধিতা অভদ্রতারই নামান্তর। বুদ্ধিবাদ অর্থে (১) চরিত্র-শক্তি, ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য-স্বীকার, (২) বুদ্ধির পরিচয় তর্কে, (৩) যে-তর্কের গোটাকয়েক রীতিনীতি আছে, এবং (৪) যার সাধারণ অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার কবল থেকে, সাময়িকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পূর্বোক্ত অঙ্গীকারের উপসিদ্ধান্ত হলো বুদ্ধির স্বাধীনতা, কারণ যেটা সাধারণ অর্থাৎ অবিশেষ (সাধারণের বুদ্ধি আছে সবুজপত্রের দল স্বীকার করেনি কখনও), সেটা মুক্ত। এই স্বাধীনতা থেকে আমরা অনুমান করেছিলাম যে, লেখক কর্মজীবনে কারুর দাসত্ব করবে না, সাহিত্যিক-জীবনে সর্বদাই সমালোচনা করবে। সমালোচনার বিষয় অবশ্য নির্দিষ্ট ছিল না, তবে সমাজই ছিল প্রধান। পলিটিক্স-এ আমাদের আগ্রহ ছিল না, তার বদলে পলিটিক্যাল গোঁড়ামি, ধর্মের গোঁড়ামি, এমন কী বিজ্ঞানের, দর্শনের। মোদ্দা কথা কিছুই বাদ পড়েনি। ফলে লেখায় এসেছিল ফুর্তি, এবং সাহিত্যে এল প্রবন্ধ, সর্ববিষয়ে জানবার

আগ্রহ। তবে নিশ্চয় মানবো যে তার বিপদও ছিল যথেষ্ট, হালকা বেহায়াপনা তার মধ্যে সবচেয়ে কম। সবচেয়ে বেশি ছিল জীবন থেকে, বিশেষত সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুতি। বুদ্ধির চর্চায় আমরা বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ি। বুদ্ধিবাদের সর্বনাশ ঐ করেই ঘটে, আমরাও বাদ পড়িনি।

বুদ্ধি সমাজের নেই, মানুষেরই আছে, এবং একজন মানুষেরই আছে, একটা মস্তিষ্ক দু'টো স্কন্ধে যেকালে থাকতে পারে না। তার ওপর আমাদের বাস শহরে, ভদ্র মধ্যবিত্তের সন্তান, হীরের টুকরো ছেলে, অর্থাৎ বাপমায়ের গৌরব, অথচ তাঁদের সঙ্গে বনিবনাও নেই। তার ওপর বুদ্ধিবাদের জের। অবরোহী যুক্তির ধরনই এমন যে তার সাহায্যে একমাত্র ব্যক্তিবাদেই পৌছানো যায়। যেই অবিশেষ চিরন্তন নিয়ম কিংবা অধিকার স্বীকৃত হলো অমনি সেই নিয়ম ও অধিকারের জাগতিক প্রয়োগে কর্মক্ষেত্রে সমর্থন পাওয়া যায় না; তখন প্রত্যেক বিশেষ মাথা উঁচু করে থাকে; বাধ্য হয়ে বিশেষকেই অ-বিশেষ বলতে হয়। ব্যক্তিবাদের মূল কথা ব্যক্তির বিশেষত্ব স্বীকার করা নয়, তার সাধারণত্বের ঘোষণা করা। আমাদের দল এইসব কারণে স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলাম। অতএব আমাদের সঙ্গে বর্তমান যুবকের একটা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে বাধ্য। সেটা ঠিক বয়সের জন্য হোক আর না হোক— কালের জন্য। য়ুরোপে মহাযুদ্ধই কালকে ভাগ করেছে। আমাদের মনের ওপর যুদ্ধের ছাপ স্পষ্ট ছিল না। ইংরেজ আমাদের পরাধীন করেছে, সেই ইংরেজ জার্মানের হাতে জব্দ হোক এই ছিল আমাদের ইচ্ছা। সিগারেট ও বই-এর দাম বেড়েছিল— ঐটুকু দুঃখ। যুদ্ধের সময় আমরা ভূগোল শিখি— ইতিহাস না জেনে। বিস্তর জার্মান ও ইংরেজের লেখা বই-এর চলন হয় এই সময়— তার মধ্যে নীট্‌শে ও চেম্বারলেনের বই-এর প্রভাবই যৎসামান্য স্থায়ী হয়। সবুজপত্রের দলই বোধ হয় ফরাসীর জয় কামনা করতো। প্রমথবাবুর ঐ সম্বন্ধে লেখার ওপর ইংলণ্ডের 'টাইমস' প্রকাণ্ড টিপ্পনী লেখে। বিলেতে যুদ্ধের ফলে যে হতাশা কিংবা দুরাশা আনে সে-রকম কিছু হয়নি এখানে। মাত্র আমাদের জানবার আগ্রহ বেড়ে যায়।

সূক্ষ্মভাবে ধরতে গেলে আমাদের মানসিক ধারার দু'টি গোপন ধারার উৎস খোলে ঐ সময়। (অন্তত আমার তো বটেই)। ক্রপট্‌কিন ও নিকোলের জীবতত্ত্বের আলোচনা, তার ওপর স্যামুয়েল বাট্‌লার ও বের্গসঁর রচনা পড়ে অভিব্যক্তিবাদের ওপর আমাদের যেন একটু সন্দেহ আসে কিন্তু অচিরেই তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। জার্মানীর সহানুভূতিতে বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায়— তবে সে-বিজ্ঞান মানে কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্স। সে যাই হোক, আমরা এই যুদ্ধের সময় বৈজ্ঞানিক হয়ে পড়ি।

দ্বিতীয় গোপন ধারাটি এই: ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে য়ুরোপের যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিপদে ও সর্বনাশে। সত্য কথা এই— যুদ্ধ আমাদের পরনির্ভরশীলতা শেখায়, তবে ইংরেজের দয়ার ওপর নয়, খানিকটা তার প্রতিজ্ঞার ওপর— যে প্রতিজ্ঞা সে বিপদে পড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই অন্ধ বিশ্বাস চিত্তরঞ্জনের ছিল। এখনও আছে, তবে আজকাল ইংলণ্ডের বদলে ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ বলা হয়। এই দু'টোর পার্থক্য আমরা জানতাম না, কারণ ঐতিহাসিক নিয়ম আমাদের অজ্ঞাত ছিল।

এই জ্ঞান রুশিয়ার দান। য়ুরোপের যুবক-মনে যুদ্ধের প্রভাব যতটা, ততটা প্রভাবই রুশিয়ান বিপ্লবের আমাদের দলের মনের ওপর। তার চেয়ে বেশি বললে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য এখানে ১৯১৭ সালের পূর্বেকার রুশিয়া ও তার পরবর্তী রুশিয়ার পার্থক্য মনে রাখতে হবে। বাঙালির রুশিয়ার সঙ্গে ১৯১০ সালের পর থেকে একটা যোগ হচ্ছিল। অনেকগুলি মিল আমরা লক্ষ করেছিলাম।

(১) রুশিয়ার নিহিলিজ্‌ম্ ও বাংলার terrorism।

(২) রুশিয়ার কৃষক ও আমাদের কৃষক— উভয়ের অশিক্ষা, নির্যাতন, দুরবস্থা।

(৩) রুশিয়ার গ্রাম-সভা ও আমাদের পঞ্চায়েৎ।

(৪) রুশিয়ার আমলাতন্ত্র ও আমাদের আমলাতন্ত্র।

(৫) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজের সঙ্গে উভয়ের যোগহীনতা।

(৬) সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ইন্টেলকচুয়ালদের বাক্যবল, নিষ্ফলতা, চা, সিগারেট কর্মের প্রতি মোহ অথচ কর্মক্ষেত্রে নেমে দ্বিধা, চরিত্রের আন্তরিক দ্বন্দ্ব, এক কথায় হ্যামলেটিপনায় উনবিংশ শতাব্দীর রুশিয়ানদের সঙ্গে আমরা সমগোত্রের ছিলাম।

(৭) মানসিক প্রবৃত্তিতে উভয়ের আত্মকেন্দ্রিকতা। ফলে বাঙালি ও রুশিয়ান যুবকের self-pity।

(৮) যুবতীদের কাছ থেকে যুবকদের অত্যধিক প্রত্যাশা। স্ত্রী-জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চধারণার মূলে একই রকমের আত্মবিশ্বাসের অভাব।

(৯) তার ওপর ও-দেশে যেমন স্ল্যাভোফিলিজ্‌ম্ ও কস্‌মপলিট্যানিজ্‌ম্— এদেশেও তাই। আমাদের আর্যামি ও সায়েবিয়ানা ও শেষে রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিকতা।

১৯১০ সাল উল্লেখ করেছি, কারণ এই সময় সেন ব্রাদার্স ছোট্ট দোকান খোলেন বহুবাজার ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। প্রমথ সেন ও ৺ভোলানাথ সেন

এই সময় থেকে আমাদের বিদেশী, বিশেষত রুশিয়ান, সুইডিস, নরুইজীয়ান, ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যের খোরাক যোগাতে শুরু করেন। বাংলা সাহিত্য, বাঙালি শিক্ষিত-সম্প্রদায় এই সেন ব্রাদার্সের বই-এর দোকানের কাছে চিরকাল ঋণী থাকবে।

কিন্তু ১৯১৭ সালের পূর্বে বাঙালির সঙ্গে রুশিয়ার সম্পর্ক রোম্যান্টিক। তারপর ও-দেশে গোলমাল বাধল। কানাঘুষো অনেক কিছু আমরা শুনলাম, প্রথমে কিছুই বুঝিনি। একটা কিছু ভীষণ কাণ্ড ঘটছে সন্দেহ হয়েছিল।

১৯১৭ কিংবা '১৮ সালে আমার হাতে Kropotkin-এর *French Revolution* আসে। সেই পড়ে বিপ্লব সম্বন্ধে আমার অনেক ধারণা একেবারে উল্টে যায়। ১৭৮৯ সালেই যে বিপ্লবী শক্তির প্রকৃত উৎস, অর্থাৎ কৃষির চাহিদা নষ্ট হয়, এই তথ্যটি আমার মনকে ভিন্নগামী করে। তারপরই, ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়ি, যেন নতুন জীবন সঞ্চারিত হলো। ১৯২২ সালে কার্ল্‌ মার্ক্‌সের 'ক্যাপিটাল' শুরু করি। এর আগে হেগেলের *Philosophy of History*, Buckle, Guizot প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় ছিল। বেশ মনে আছে নন্‌-কোঅপারেশন আন্দোলনের গলদ দেখাতে গিয়ে, স্বরাজ-পার্টিকে মধ্যবিত্তের চক্রান্ত বলে, চম্পারণের ইতিহাস পঞ্চাশ বছর পূর্ব হতে টানার ফলে একটি ছোট্ট সভায় আমি ভীষণ অপদস্থ হই। তারপর সরকার বাহাদুর মীরাট মোকদ্দমা চালালেন। যুবক-সম্প্রদায় সব রুশিয়ার ভক্ত হলো। কেউ কেউ তাঁদের মধ্যে মার্ক্‌স, এঙ্গেলস্‌, লেনিন, স্ট্যালিন, বুখারিন, প্লেখানভ পড়েননি তা নয়, তবে বেশির ভাগ বাঙালি যুবক নতুনত্বের মোহে প্রথম প্রথম কমিউনিজ্‌মে বিশ্বাসী হন।

অবশ্য পড়া না-পড়ায় কিছু আসে যায় না। যুদ্ধের সময় চোখের সামনে অনেক গরীব বড়লোক হয়ে যায়— রাতারাতি। ১৯১৯ সাল থেকে সেই টাকা কলকারখানায় প্রযুক্ত হলো। শেয়ার পিছু শতকরা ১০০০ টাকা মুনাফা কোনো কোনো কোম্পানি সে সময় দিয়েছে। মজুরদের মজুরি কিছু বেড়েছিল, কিন্তু নিতান্ত অসম অনুপাতে। ফলে ধর্মঘট শুরু হলো, তারপর ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠল। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে চমক লাগে। এই পনের বছরের মধ্যে ভারতের ইতিহাস চৌধুনের লয়ে এগিয়েছে। আত্মরক্ষার সমিতি থেকে শুরু করে, জাতীয় সংগ্রামে যোগদানের মধ্য দিয়ে এসে আজ শ্রমিক-সংঘ আপনার ঐতিহাসিক নিয়তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। এমন চাহিদাও শুনেছি যে মজুর-সভা ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করবে। সে যাই

হোক— ঐ পনের বছর শ্রমিক-আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলন পাশাপাশি চলতে থাকে। দু'টির মধ্যে আদান-প্রদান চলে। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল যে আশানুগত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। অনুসন্ধানের ফলে চোখে পড়ল একটি মজার ঘটনা। ধনিকশ্রেণী বোম্বাই ও কলকাতা, নাগপুর ও দিল্লীতে কংগ্রেসকে গ্রেপ্তার করেছে। বাংলা দেশের প্রত্যেকেই ছোট্টখাট্ট জমিদার ও সেইসঙ্গে কেরানি। বাংলায় কংগ্রেস জোর পায়নি— জনসাধারণ, অর্থাৎ কিষাণ-মজুরদের কাছ থেকে। অল্পদিনের মধ্যে কংগ্রেস-আন্দোলনে ভাঁটা পড়ল। দু'টি সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স আন্দোলনই ব্যর্থ হলো। দুর্বলতা আবিষ্কারের চিহ্ন গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট।

ঠিক এই সময় দেশের মানসিক আবহাওয়া পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যায়। পূর্বোক্ত দুর্বলতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়ল। জওহরলালজী এই বিশ্লেষণে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু একটু ভাসা ভাসা ভাবে। তিনি সোশিয়ালিজ্মের প্রধান মন্তব্যগুলি তাঁর অনবদ্য ভাষায় জাহির করলেন। কিন্তু তাঁর রচনায় ভেতরের কারণটি ধরা পড়ল না। কংগ্রেস যে স্বদেশী ধনিকতন্ত্রের হাতে আত্মদান করেছে, এবং সেইজন্য যে Civil Disobedience অসার্থক হলো— একথা তিনি বলতে সাহস পাননি। সেটা তাঁর ভদ্রতা ও ব্যক্তিগত লয়ালটি। কিন্তু সত্য কথা গোপন রইল না ছেলেদের কাছে। করাচি কংগ্রেস থেকে একাধিক যুবকের কাছে ব্যাপারটি পরিষ্কার হলো। তাঁরাই এখনকার বামমার্গী, এবং তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক। এঁদেরই সঙ্গে পুরাতনের ঝগড়া। এঁরাই, অনেকের মতে, দেশের মজ্জাগত গুরুভক্তি, শ্রদ্ধা সব কিছুই ভাঙতে বসেছেন।

আমি এই আধুনিকদের জানি। বয়সে তাঁরা অনেকেই ছোট। সেটা কিন্তু বড় কথা নয়। বড় কথা হল 'সময়', তার চেয়েও 'কাল'। অবশ্য কালের দর্শন এঁরা জানেন না— সেটা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু সেই কালের একটা গুণ অর্থাৎ গতি, যাকে ইতিহাস বলা হয় সেইটাকে তাঁরা আঁকড়ে ধরেছেন। আমাদের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য এইখানে— আমরা কালাতিপাত করতাম, এঁরা কালের নিয়তি সম্বন্ধে সচেতন। সচেতন অর্থে বুদ্ধির খেলা নয়, মোটেই নয়, জীবনের অনুভব। জীবনের প্রধান বিকাশ কর্মে, তাই কর্মজীবনে যে অনুভূতি সম্ভব তারই সাহায্যে এঁরা সচেতন। আমরা চেতনা অর্থে মস্তিষ্কের ক্রীড়া বুঝতাম, এঁরা চেতনা অর্থে কর্মান্তে যে প্রতীতি জমে ওঠে তাই বোঝেন। এটা মূলগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য।

তারপর উপসিদ্ধান্তগুলি সহজে এসে যায়। বুদ্ধির প্রাধান্য, তার স্বাধীন

অস্তিত্ব, তার সর্বকালীন আইনকানুন, সেই সঙ্গে বুদ্ধিমানের বিশেষ অধিকার— কোনো কিছুই আর মানা চলে না। তার বদলে স্বীকার করতে হয় ইচ্ছাশক্তিকে, কর্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যকে, ঘটনার বিশেষত্বকে, তার পারম্পর্যের দুর্নিবারতাকে, বস্তুজগতের অস্তিত্বকে, তার প্রাথমিকতাকে ; মোটামুটি এই অঙ্গীকারগুলিই আজকালকার যুবকদের মানসিক প্রতিজ্ঞা। বলা বাহুল্য— আমরা এসব বুঝি না। আমাদের মধ্যে যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা বুদ্ধির কূটতর্ক তুলি— দর্শনের গলদ দেখাই। তাতে এঁদের কি-ই বা আসে যায়। আমরা আপসোস করেই যাব, এঁরা কাজ করেই যাবেন।

কাজ করতে হলে একলা হয় না। আমরা ভেবেছি একলাই কাজ করা সম্ভব, অবশ্য বড় বড় কাজ। এই সেদিন রবীন্দ্রনাথ আমাদেরই মনের কথা বললেন, 'আর্টিস্ট ভীষণ একাকী'। আর্টিস্ট যেকালে মানুষের মধ্যে দেবতা, তখন সাধারণ বুদ্ধিমানও ভীষণ নিঃসঙ্গ। কোনো আধুনিক একাকিত্বের সম্মান দিতে পারেন না। তিনি বলেন মাতৃগর্ভেও জীব একলা নয়, মৃত্যুর পরেও মহাত্মাদের সঙ্গ। ইতিমধ্যে মানুষ সামাজিক। কিন্তু সমাজ এক ধাতুর নয়, স্থাণু নয়। সমাজ চলে হোঁচট খেতে খেতে খিদের তাগিদে, সে-তাগিদ মেটাবার প্রক্রিয়ায়। সমাজ এই প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গ, যার হাতে ক্রিয়া-পদ্ধতি ন্যস্ত সেই হলো নেতা। অতএব সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্কুলের ভালো ছেলে আর মাস্টারের মতন নয়। তাই সমাজের প্রতি কর্তব্য হচ্ছে তাকে নতুন করে গড়ে তোলা। এই সৃষ্টিকার্যে যতটা জ্ঞানের প্রয়োজন ততটা নব্যতান্ত্রিক স্বীকার করেন। তারপর ? দেখা যাবে। আমাদের সমাজ ছিল যেন একটা বন্ধ দরজা, যার বিপক্ষে আমরা মাথা খুঁড়তাম। আমাদের বিরোধ ছিল প্রতিরোধ। দরজা খুললেই আমরা স্বর্গরাজ্য পাব, তারপর কী মজা ! যা কিছু কষ্ট এই ঠেলাঠেলিতে। আজকালকার ছেলেরা বিরোধ অর্থে versus বোঝেন না, ক্রমবর্ধমান পরিক্রমায় বিরোধের পরিধি ও গুণ বেড়ে চলেছে। তাই এঁদের মুখে চোখে, মনে কাজে শান্তি নেই। ভাববিলাসের সময় নেই এঁদের, গরীব দুঃখী খেতে পাচ্ছে না বলে নয়, (আমিও গায়ের শাল এক খোঁড়াকে দিয়েছি,) বিরোধের অবসান নেই এই জ্ঞানে। বাড়িতে বাপমা, স্কুলে মাস্টারমশাই, কলেজে অধ্যক্ষ, বাইরে বণিক, জমিদার, গভর্নমেন্ট, সমাজে পণ্ডিতমশাই ও বৃদ্ধের দল। শান্তি কোথায় ? তাই এঁরা বলেন শান্তি স্বার্থান্ধের আবিষ্কার।

এই মনোভঙ্গিতে যে যুক্তি আছে সেটা প্লেটোর নয়, অ্যারিস্টটলের নয়। নীচে থেকে এই যুক্তি ওপরে ওঠে প্রতিপদে ঘটনাকে শ্রদ্ধা জানাতে জানাতে। চোখ খুললেই দেখা যাচ্ছে— সব মানুষ সমান অবস্থার নয়, কারুর সুবিধা আছে,

কারুর নেই, কেউ বাপের কিংবা শ্বশুরের জোরে খায়, কেউ নিজের জোরেও দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না। কেবল চাকরির সুযোগ নয়, খিদে মেটাবার সাধারণ অধিকার এক শ্রেণীর আছে, অন্য শ্রেণীর নেই। এসব প্রত্যক্ষ ঘটনা, যাদের দেখে চোখ ফেরানো অন্ধের চিহ্ন। আমরা কিন্তু এদের রাজপথে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতন দেখতাম। এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির ওপরে যুবকদের যুক্তি গড়ে ওঠে। এইটাই মুখ্য, মানসিক বিচার গৌণ। আমাদের ছিল বিপরীত। অবরোহী যুক্তিতে প্রত্যক্ষটা ব্যতিরেক বড় জোর।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের যা ছিল তা এঁদের নেই। কারণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিই পৃথক। অতএব অভাব-আপসোসের কথা ওঠেই না। অতএব পার্থক্যটা সত্যই আছে। এখন প্রশ্ন তার মূল্য কতটুকু।

মূল্যবিচারে নিজেকে সামলাতে হয় অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। একেবারে বাদ দিলেই ভালো হয়, তবে সেটা একপ্রায় অসম্ভব। মূল্যবিচারের তত্ত্ব নিয়ে আমি ২।৩ বছর নষ্ট করেছি, কোনো কূল-কিনারা পাইনি। পণ্ডিতের মতামত সব ভুলে যেটুকু থিতিয়েছে সেটা কিম্ভূতকিমাকারের। তার মোদ্দা কথা এই : চিরন্তন মূল্য নেই, সেটা ঘুরতে ঘুরতে ওপরে ওঠে কিংবা নীচে নামে। উন্নতি-অবনতি আদর্শ অনুসারে, আদর্শও স্থির নয়। তবে গতির একটা মোটামুটি নিয়ম আছে, সঙ্গে সঙ্গে আদর্শেরও। যে-ঘটনা গতিরোধ করে, যে-গতি প্রধান গতিপথের বাধা সৃষ্টি করে সে-ঘটনা ও সে-গতির মূল্য কম। অতএব আপেক্ষিকতার দিক থেকে পার্থক্যের মূল্যবিচার করতে হবে। বুদ্ধির বিচারে আধুনিক কর্মবাদ প্রভৃতি টুকরো টুকরো করে দেওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিবাদী নন তাঁদের কি ক্ষতি? মহা মহা অর্থশাস্ত্রবিদ্ যাঁদের মতামত না জানলে আধুনিক পণ্ডিত হওয়া যায় না, তাঁরা তর্ক করে বলে দিয়েছেন planning, collective economy হয় না, কারণ দামের হিসেবে বাধে। এ-ধারে হয়ে-গেল প্ল্যানিং, সব কিছু। অতএব যাঁরা বুদ্ধিমান না হয়েও বুদ্ধিমান তাঁদের তরফ থেকেই তাঁদের ও আমাদের পার্থক্যের মূল্যবিচার করতে হবে।

এধারে প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে গেল। তাই তাড়াতাড়ি শেষ করি। পার্থক্যের মূল্য খুবই বেশি। কারণ এর জন্য আমরা বাধা সৃষ্টি করছি ও তাঁরাই বাধা বোধ করছেন। দু'টি মাত্র উপায় আছে— এক, আমাদের আত্মহত্যা, আরেক তাঁদের আরো অগ্রসর হওয়া। তাঁদের অসম্পূর্ণতা যেদিন ঘুচবে সেদিনই আমরা হব অবান্তর। কল্পনা খাটিয়ে কীভাবে তাঁরা অগ্রসর হতে পারেন বাতলাতে পারি। নিশ্চয় ঠিক হবে না, হতে পারে না। বন্ধু আশা করি প্রবন্ধের এই অংশটুকু পড়বেন না। প্রয়োজন নেই, কারণ আমার সমালোচনা

তাঁর সম্বন্ধে খাটে না। ধারাবাহিকভাবে আমার কর্তব্য সাজাচ্ছি।

(১) ধরা যাক বুদ্ধিটা সর্বস্ব নয়, কিন্তু ঘটনার বিশ্লেষণের জন্য অন্য কোনো শক্তি অমন কার্যকারী নয়। ইতিহাস তৈরি করবার জন্য ব্রজেন্দ্র শীল না হলেও চলে, আবার নব্য নৈয়ায়িকও অবান্তর, কিন্তু ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্, ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্, ফিউড্যালিজ্‌ম্ প্রভৃতি ধরতাই বুলিতে কি মাথা ঘুলিয়ে যায় না? ওগুলো প্রায় 'হিং টিং ছট্'-এর মতন হয়ে উঠেছে। ঐগুলোর কি প্রকৃতি এক? ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ধনতন্ত্র কি একপ্রকার সমাজ তৈরি করে? মধ্য-য়ুরোপের ফিউড্যালিজ্‌ম্ আর রুশিয়া ও ভারতের ফিউড্যালিজ্‌মের মধ্যে তফাৎ কি ও কতটুকু? রোমের সাম্রাজ্যবাদ আর এখনকার সাম্রাজ্যবাদ কি এক ধাতুর? মোটামুটি এক জানি। সে হিসেবে আমরা সবাই জানোয়ার। একটু কোথায় গরমিল আছে, সেটার জন্য সমাজগঠনও এক ছাঁচের হয় না। কতকটা জোর দিয়ে এই বিশেষত্বকে ইতিহাসের নিয়মে ফেলা যায় এ-জ্ঞানটুকু না থাকলে যুবকরাই বিপদে পড়বেন— তাঁদের কাজেরই অসুবিধা হবে। যদি তাঁরা আরো একটু বেশি বিশ্লেষণ করেন তবে তাঁরা বুদ্ধিসর্বস্ব হয়ে পড়বেন না নিশ্চয়, আরোহী যুক্তি সর্বাঙ্গসুন্দর হবে। আমার সন্দেহ হয়েছে যতটা inductive, history-minded ও বৈজ্ঞানিক নতুনত্ব তাঁদের কাছে দাবি করে ততটা তাঁরা মেটাতে পারছেন না। এটা ইচ্ছা করলেই পারা যায় কিন্তু। আমরা পারিনি, আমাদের দৃষ্টি ওধারে যায়নি, এঁরা পারছেন না, দৃষ্টিভঙ্গি আছে, কিন্তু তীক্ষ্ণ নয়। চোখ ভালো হলে যে চরিত্রহানি হয় তা বোধ হয় ঠিক নয়।

(২) স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার মনে হয় যুবকদের ধারণা এখনও অস্পষ্ট। স্বাধীনতা বলতে আমরা ডাইসী সাহেবের পুস্তকে যা লেখা আছে তাই বুঝতাম— অর্থাৎ নড়ে চড়ে বেড়াবার, যা-তা কথা কইবার, যার-তার সঙ্গে মেশবার, যা-ইচ্ছে বেচা-কেনার স্বাধীনতার যোগফল। আমার সন্দেহ হয়েছে যে এর বড় বেশি ধারনা এখনও জন্মায়নি। মোদ্দা কথা এই— স্বাধীনতা সাম্যবাদের জুড় তখনও ছিল এখনও আছে। মৈত্রীর ভাবটা এখনও সুদৃঢ় হয়নি। হলে স্বাধীনতার বনাম ভাবটা কেটে যাবে। সেজন্য সভা সমিতি ধর্মঘট অনেক সব হচ্ছে, কিন্তু সেই মেকানিক্যাল ধরনে। নচেৎ এখনও প্রেমের কবিতা কাগজে বেরোয়। নভেল নায়ক ভিনজাতের মেয়েকে বিবাহ করতে ক্ষেপে ওঠে! গলায় দড়ি! অবশ্য আমরা যা করতাম তার চেয়ে এঁরা শতগুণে পুরুষ। এঁরা বাঁচবার স্বাধীনতাও চান। দুঃখ এই, বলে যান যে ওঁরা না বাঁচলে আমরা বাঁচি না। বিশ্বাসটা মজ্জায় প্রবেশ করেনি— তাই এই রসগোল্লা মার্কা সাহিত্য। তাই বাধ্য হয়ে বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্র দত্ত কড়াপাকের কবিতা

লেখে। সুধীন্দ্র জানে যে তার নিজের বাঁচা-মরা চেকোশ্লোভাকিয়ার ইতিহাসের ওপরও নির্ভর করে। বিষ্ণু অতটা জানে না, যতটুকু জানে তাতেই সে সংকুচিত হয়ে নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে আঘাত করে, অভিমানীর মতন। দু'জনেই পরাধীন তাই মৈত্রী-বন্ধনে স্বাধীন হতে চায়। অবশ্য স্বাধীন হতে পারলে না কেউই। তবে সুধীন্দ্র পথটা জানে। আমাদের সময় এই প্রকার দাম্ভিক কবিতা অসম্ভব ছিল। প্রসারের দম্ভ আমরা জানতাম না। কিন্তু সুধীন্দ্রের পর? মৈত্রী কোথায়? মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে!

ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। মেয়েরা যেমন বলেন, 'বেশ তোমরা খুব ভালো, আমরা খুব খারাপ, এই তো! আচ্ছা, দেখা যাবে!' এই বলেই প্রবন্ধ শেষ করি।

১৩৪৫

নির্ঘণ্ট

চিন্তয়সি ও বক্তব্য

চিন্তয়সি

বক্তব্য

অগ্রন্থিত প্রবন্ধ

দাদার ডায়েরি।

দাদাকে আমার এক খেয়ালেই মাটি করে দেয়। তিনি মোটে ৫ বৎসর ওকালতি করেন— তার মধ্যে আদালতে গিয়েছিলেন জোর ত্রিশ দিন; তাও উপরি উপরি নয়। এক বন্ধু এসে বললেন, "দেখ কিশোরী (তাঁর এই মেয়েলী নামের জন্যে তাঁকে কতই না ঠাট্টা সহ্য করতে হয়েছিল!), এই কেসটায় তুমি একবার দাঁড়াও, তাহলেই হবে— আর কিছু করতে হবে না।" দাদা উত্তর দিলেন, "ওটা আজ মুলতবী রইল; এখন বল দেখি তুমি বিকেলে Chess Competition-এর Final দেখতে এখানে আসছ কিনা?"

দাদার গলা ছিল ভারি মিষ্টি, কিন্তু কখনও গান শিখলেন না; ওস্তাদের কাছে দু'দিন ঘুরে এসে বললেন, "নাঃ হলনা, ও 'সাধনা' আমার কর্ম নয়।" দাদার ঘরে এত বই ছিল, কিন্তু তার মধ্যে খুব অল্পই তিনি শেষ পাতা পর্যন্ত পড়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, "মানুষে বই পড়ে কি শেষ করবার জন্যে?" যাক, এইরকম কোনো কাজেই তাঁর মতিস্থির ছিল না, আর সেই জন্যেই কখনও সুখ্যাতির জন্য লালায়িত ছিলেন না। কতবার যে তাঁকে কাগজে লেখবার জন্যে অনুরোধ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। একবার মনে পড়ে তাঁকে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখতে বিশেষ করে বলি, তার উত্তর এই দিলেন, "আমার উত্তর কে নেবে— আমি না জানি লিখতে, না জানি ভাবতে,— এমন কি মিষ্টি করে বাজে বকতেও জানি নে; তোরা বোধহয় ভাবিস আমি একটা ছোটখাটো prophet। হয়ত ঠিকই ভাবিস, কেননা আমি তাদেরই মতো সত্যাসত্যের বাইরে, তাদেরই মতো আমার একটি কথাও মেলে না,— সত্যি ঘটনার সঙ্গে।" আমি বললুম, "সে হচ্ছে না— এই মনে কর তুমি German-দের মোটেই ভালোবাসনা, ফরাসীদের মহা সুখ্যাতি কর; এই সুখ্যাতিটাই যদি বেশ ফেনিয়ে লেখ, তাহলেই খবরের কাগজওয়ালারা তোমার লেখা লুফে নেয়।" দাদা বললেন, "আমার Frenchদের ভালো লাগে বলেই ভালোবাসি, —কোনো কারণ নির্দেশ করতে পারিনে, এবং সেই জন্যেই চাইনে।

*

সেদিন দাদার টেবিল খুঁজতে খুঁজতে এই ছেঁড়া কতকগুলো কাগজ বেরিয়ে

পড়ল। দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলুম। বৌদিদিকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, রাত্রে বসে মাঝে মাঝে কী লিখতেন; আমায় ত কিছু দেখাতেন না— কী করে জানব বল ভাই"— বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। বললুম "ছাপাব?" তিনি কাতর হয়ে পড়লেন।

*

২রা বৈশাখ। Woodrow Wilson-এর New Freedom বইখানা পড়লুম,—বেশ ভালো লাগল,—বিশেষত এই কথাটা, "Be unlike your Fathers, for they are not in touch with the new processes of life".

বাপ মাকে ভক্তি করা আর তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া, দুটো এক কথা নয় বলেই যে, তাঁদের আন্তরিক অশ্রদ্ধা করা এবং বাইরে একমত হওয়া যে আলাদা কথা, তা নয়। কেউ স্বীকার করুক আর নাই করুক, এটা ঠিক যে, বয়েস হলে কেউ আর বাপ মায়ের চোখ দিয়ে পৃথিবী দেখে না। বাপে ছেলেতে যে মনান্তর হয়, সেটা নতুনে পুরোনোয় মামুলী বিবাদ। যাহোক, আমার বইটা পড়ে পর্যন্ত মনে একটা খট্‌কা লেগেছে। সাহিত্যের সনাতন ঝগড়াটাও হয়ত এই নতুন-পুরোনোর শাশুড়ী-বউয়ের ঝগড়া। এই বীরবলী ভাষা নিয়ে বিসম্বাদটা আমার মনে হয় কেবলমাত্র নূতনের উপর পুরাতন দলের মিছে আক্রোশ— হিংসে বললেও চলে। কিছুদিন আগে একটি যক্ষ্মা-রোগীকে দেখতে যাই,— সে আমায় দেখে মুখ ফেরালে। আমি যখন তাকে 'কেমন আছ' জিজ্ঞেস করলুম, সে তখন আমার দিকে ফিরে বিরক্তভাবে চেয়ে আমার আঙুলটা ধরে মট্‌কে দিলে। আমার ভবিষ্যতের অস্তিত্ব বোধহয় তার চোখের সামনে অতি বিসদৃশভাবে ফুটে উঠেছিল— তাই সে সহ্য করতে পারেনি। তার পরদিন তার বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি একটা খ্যাট তৈরি, আর জনকতক ভট্‌চায্যি মিলে বাড়ির সামনে নস্যি নিতে নিতে হা'হুতাশ করছে। চলে এলুম। হিংসে ছাড়া কি সংসার চলে না?

১৭ই বৈশাখ। আজকের সভা বেশ বড়-গোছের হয়েছিল। বিষয় ছিল East & West; সকলে বললে বক্তৃতাটাও মন্দ হয়নি, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বক্তা বেশ চাবুক মেরেছেন। আমাদের অতীতের এরকম দার্শনিক আর সগৌরব বিবরণ শুনে খুব চমক লাগল। একজন বক্তা উঠে বললেন, "তা নয়, তবে এ-দেশেও ভালো আছে, ও-দেশেও ভালো আছে—সামঞ্জস্য দরকার।" সভাপতি মহাশয় ইতিহাসের অধ্যাপক। তিনি এই বলে সভা সাঙ্গ করলেন, — "তা থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের উন্নতি করতে হবে, সেইজন্যই মেনে

নিতে হবে যে. আমাদের দেশে সবই ভালো। এই দৃঢ় বিশ্বাসই আমাদের সামনে ঠেলে দেবে। অতীতের উপর আস্থা না থাকলে ভবিষ্যতের উন্নতির আরাধনা করা যায় না।" খুব হাততালি পড়ল।

এই অতীত কথাটার মানে আমার কাছে বেশ একটু গোলমেলে ঠেকে। আচ্ছা, সব দেশেরই ত অতীত আছে,— ইংরেজরা বলে আমরা পৃথিবীকে Shakespeare এবং Darwin দিয়েছি, Parliament-এরও আমাদের দেশের মাটিতেই জন্ম। আবার ফরাসীরাও বলে, আমাদের দেশেই স্বাধীনতার প্রথম উন্মেষ হয়েছে,—Hugo, Descartes ত ফরাসী। আবার জার্মানরাও বলে, Goethe, Beethoven, Helmholtz ত এদেশেরই লোক। তাহলে কোন দেশটাকে বড় বলে মানব? এর এক উত্তর এই যে,— কাউকে মানতে হবে না। স্বদেশভক্তি হচ্ছে হৃদয়ের জিনিস, বিচারের বস্তু নয়; আদত কথা ভালোবাসা। Toussaintকে কোন অতীতের কাছ থেকে স্বদেশ-প্রেম ধার করতে যেতে হয়নি।

তাহলে কথা এই দাঁড়াল যে, এগোতে হলে সকল সময়ই মানুষের পিছনে অতীতের ধাক্কা চাইনে; তবে পেলে ভালো। আমার মনে হয় যে, পূর্বকালের ইতিহাস বলে জিনিসটা আমাদেরই এখনকার কালের হাতে গড়া পদার্থ; যা হয়ে গেছে তার নিজের কোনো ইতিহাস নেই— কিংবা যদি থাকে, তা গ্রাহ্য নয়। তবে যা আছে, তা হচ্ছে আমরা যতটুকু সত্য বলে মেনে নিই, তাই। মনুসংহিতায় যদি কোনো কুৎসিত কথা থাকে, তাহলে বলি 'later interpolation 'আর যদি এমন কোনো চিত্র থাকে, যা আমাদের প্রত্যেকের মনগড়া-বৈদিকযুগের সভ্যতার ছবির সঙ্গে মিলে যায়,— তাহলে অমনি বলি, "এই হচ্ছে প্রাচীন ভারতের প্রকৃত চিত্র।"

২২শে বৈশাখ। এই বাইশে তারিখটা আমাকে বড় জ্বালায়। মাসের শেষাশেষি কী এক অজানা নেশার আমেজে আমাকে অকর্মণ্য করে দেয়,— তখন কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারি নে যে এটা নেশা। দেহ, মন, বুদ্ধির কেমন একটা গুমোট বেধে যায়,— কবিতা পড়ে, গান শুনে, এমন কি কলকাতার বাইরে ম্যালেরিয়ার দেশে গিয়েও এ গুমোট কাটাতে পারিনে। তাই এবার গঙ্গার ধারে হালিসহরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে এক পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোকটি বেশ সংস্কৃতজ্ঞ। কথায় কথায় উঠল, হিন্দু জাতির অবনতির কারণ কি? তিনি বললেন, "আমাদের দেশে ধর্মবিশ্বাসের অভাবই হচ্ছে এই অবনতির কারণ"।

"তাহলে অবনতি হয়েছে স্বীকার করেন ?"

"নিশ্চয়ই।"

"অথচ বলেন যে ভারত Europeকে ধর্ম শেখাবে।"

"এখনও যা আছে, তা মরাহাতি লাখ টাকা— তবে আর্য ঋষিদের সময়ে যা ছিল, তার সিকির সিকিও নেই।"

"তাহলে ভারতের অবস্থা Europe-এর অবস্থার চেয়ে এখনও ঢের ভালো ?"

"নিশ্চয়ই।"

"তাহলে স্বদেশী করেন কেন ?"

"আমাদের মন ও বুদ্ধিতে ইংরেজী শিক্ষার ছাপ পড়েছিল— সেই ছাপ মুছে ফেলবার জন্ম।"

"ছাপ পড়াতে দোষ কি ? খাঁটি সোনা ত ঠিক রইল।"

"তা থাকে না।"

"না থাকার কারণ আপনার মতে আমাদের ধর্মে অবিশ্বাস, কিন্তু স্বদেশীর প্রসাদে সে বিশ্বাস ফিরে আসা দূরে থাক, বরং অবিশ্বাস অর্থাৎ বিজ্ঞানের মাত্রা বেড়ে চলেছে, কেমন ?"

"হঁা, অনেকটা তাই বটে।"

পণ্ডিতমশায় আদত জায়গায় ঘা দিয়েছিলেন। আমাদের অবনতির কারণ আমাদের বিশ্বাস নেই। ধর্মে নয়,— নিজের উপর আমরা বিশ্বাস হারিয়েছি, অর্থাৎ আমাদের দাম্ভিকতা নেই। দাম্ভিকতা লোকের বেলায় পাপ, কিন্তু জাতের বেলা তাকে বলে স্বদেশপ্রেম, কেননা তখন আর তাকে দাম্ভিকতা বলতে কেউ সাহস করে না।

২০

২রা জ্যৈষ্ঠ। তাই ত' এত তাড়াতাড়ি যে কাল-বৈশাখী কেটে যাবে স্বপ্নেও ভাবিনি ; সন্ধ্যে না হতে হতেই দখিনে-হাওয়া দিলখুলে বয়ে যাচ্ছে। বন্ধুবর গান ধরলেন "বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে"। পূরবী সুরটা হয়েছিল বাঁশির জন্যে— চেরা গলায় তার চিকারা ছাড়লে ঔদাসীন্ঠ ঠিক উল্টো ভাবটা মনের ভিতর এনে দেয়। তাই বিভোর হওয়া দূরে থাকুক আমি বিরক্ত হয়ে গান ধরলুম "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।" বন্ধু চটে বললেন "তর্ক করব"।

"বেশ কোনো আপত্তি নেই, 'ঘরেবাইরে' বইখানা কেমন লাগল সত্যি কথা বলো ত ভাই।"

"না, পুরো সত্যি কথা বলা হবে না, তা হলে তর্ক হবেই না।"

"তর্ক নাই বা হলো এমন দিনে মিছে কথা বলো না।"

"তা হলে বলি বেশ লেগেছে, তবে রবিবাবুর লেখাটা উচিত হয় নি।"

"তা হলে দেখছি তোমার অনুচিতঃ কাজগুলোই ভাল লাগে, যেমন রুগীর আচারে ঝোঁক।"

"ঠিক সেই জন্যেই আমার চলবার অধিকার আছে; সংসারে চলতে গেলে যা ভালো লাগে তা করলে চলবে না, কেননা অনেক সময়ে মন্দটাই করতে ইচ্ছে হয়।"

"তোমার মতে প্রতিকারটা কি?"

"এই মাত্র— তোমার যা ইচ্ছে হয় তাই করতে পার তবে দেখ যেন তাতে অন্যের ঐ রকম সহজ ইচ্ছানুযায়ী কাজের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে।"

"অর্থাৎ তুমি বলছ যাতে অন্যের অপকার না হয়।"

"আমি ঐ কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলতে চাই যাতে অন্যের উপকার হয়।"

"দেখ, ভাই তোমার কথাটা Kant-এর Categorical imperative-এর মত ঠেকছে।"

"রবিবাবুর বইখানি সম্বন্ধে আমার আরও দুটি কথা আছে— প্রথমত এটি আমাদের সমাজচিত্র নয়— দ্বিতীয়ত এতে চরিত্রের বিশ্লেষণ অতি চমৎকার হলেও, তার কোনো অভিব্যক্তি নেই। আজকালের সাহিত্য বড্ড aristocratic ব্যাপার হয়ে উঠেছে। সেটা ভালো লক্ষণ নয়, কেননা সেই সাহিত্যই সত্যিকারের সাহিত্য যেটা দেশের বুকের উপর গড়ে ওঠে। এই দেখনা Bernard Shaw ইংরেজী সামাজিক সমস্যা নিয়ে নাটক লিখলেন— আর সেই সমস্যাগুলো সর্বসাধারণের মনে বড় গোল বাধিয়ে দিলে বলেই না, তিনি সাহিত্যের আসরে এত খাতির পাচ্ছেন। কিন্তু রবিবাবু যে 'ঘরে বাইরে' লিখলেন কি প্রমথবাবু যে 'চারইয়ারী কথা' লিখলেন কই তাঁরা ত আমাদের সমাজচিত্র দেখালেন না;— আর যা দেখালেন তা অন্তত Park street-এর এ-ধারকার পাড়ার সমাজ নয়— তা হলে কি করে তাঁদের লেখার কদর করি।"

"এদেশে কেউ বার্নাড শ'র মতো নাটক লিখলে তিনি যে ভেড়ার গোয়ালে আগুন দিতেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তার জন্য সকলে যে তাঁকে ধন্য ধন্য করত সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

"তারপর 'ঘরে বাইরে'তে চরিত্রের কোনো অভিব্যক্তি নেই, প্রত্যেকেই এক একটা type— 'গোরা'র পরেশবাবু যে শেষ কালে মাস্টারি করবেন তা স্বপ্নেও ভাবিনি— তাঁর ত বেশ পয়সাকড়ি ছিল। ললিতা বিয়ে হওয়ার পর নিজের নাম মক্ষিরাণী রাখলেন কেন? যখনই শুনেছি গোরাচাঁদ Irishman-এর ছেলে তখনই বুঝেছি লোকটা বিষম গোলমাল বাধাবে। নিখিলেশ জেনে শুনেও গোরাকে বাড়িতে ঢুকতে দিলে কেন। আর সন্দীপও ত বিনয়ের মাকে মা বলত— তার ভাজকে কেনই বা সে compromised করলে?"

"হেঁয়ালী রাখ— তুমি কি বলতে চাও সব এক type গোরা আর সন্দীপ, ললিতা মক্ষি এক?"

"তুমি ত খুব ধাঁ ধাঁ করে বুঝে ফেল তবে এত ফেল কর কেন?"

"ঐ বেশী ও শিগগির বোঝার জন্যে। তোমার কথাই যদি ঠিক হয় অর্থাৎ গোরা প্রভৃতি যদি নূতন অবস্থায় পড়ে সন্দীপ ইত্যাদি হয়ে থাকে তাহলে ত তাদের অভিব্যক্তিই হয়েছে।"

"থাকৃগে ও সব বাজে কথা রেখে দেও, আমি বই খানার ভিতর এই বর্তমান যুদ্ধের কারণের একটা সন্ধান পেয়েছি— আর বইয়ের ভাষার কী জোর। কী সৌন্দর্য! বলতে পারো যে রবিবাবুর ভাষাটা যদি মূর্তিমতি হয়ে দাঁড়াত তা হলে অর্জুন মহারাজ চিত্রাঙ্গদার দিকে ফিরেও চাইতেন না।"—

"এই দুটো কারণে ভালো লেগেছে?"

"হাঁ।"

*

বন্ধুর কথাগুলো একেবারে ফেলবার মতো নয়। একে তিনি বিদ্বান তারপর না ভেবে তিনি কোনো মতামত প্রকাশ করেন না। কিন্তু আমার মনে হয় যে তাঁর সমালোচনাবুদ্ধির গায়ে গোটাদুই বিলেতী পরগাছা জন্মেছে যেমন— Categorical imperative, the greatest good of the greatest number, আর সেই পরগাছার বাড়ের দরুণ মূলের ধর্মটা বেশ একটু বিগড়ে গেছে। অবিশ্যি বন্ধু তাঁর নিজের উপর ঐ সব বিদেশী ভাবের প্রভাব যে আছে সে কথা মানতে বড় সংকোচ বোধ করেন আর সেই জন্যেই বলেন "দেখ আমরা ভারতবাসী আমাদের ধর্মের দিকটা বড় তেজাল সেই জন্যে Art-এর সৌন্দর্য মাপি তার আধ্যাত্মিক উপকারিতা দিয়ে।" রোমান Catholic-রা গির্জেতে বাতি দেয় মোক্ষলাভের আশায়, এখন যদি কোনো Catholic জ্যোৎস্না থেকে ক'টা গির্জের বাতি তৈরি হয়, সেই হিসেব থেকে চাঁদনী রাতের

সৌন্দর্য মাপে— তা হলে তাকে কি সৌন্দর্যের উপাসক বলব? তাকে জোর ধার্মিক বলতে পারি, religious বলতে পারি কিন্তু spiritual বলতে পারিনে, কর্মী বলতে পারি কিন্তু কবি বলতে পারি নে, কেননা আদত ধর্মে আছে কর্মের সঙ্গে কবিত্বের মিলন। সে মিলনটুকু আমাদের দেশের ধর্মে আছে— অনেক পরিমাণেই আছে—খ্রীস্ট ধর্মেও আছে কিন্তু আমরা হালে যেটাকে ধর্ম বলে বড়াই করি (অর্থাৎ হিন্দু-ধর্ম আর খ্রীস্ট-ধর্মের খিচুড়ি) তাতে মোটেই নেই। এই দুটোর মিশ্রণে আমাদের মনে যা বিশেষ করে ফুটে উঠেছে তার নাম আধ্যাত্মিকতা নয় শুচিবাতিক, ইংরাজীতে যাকে বলে puritanism। Puri an হয়ে আমাদের অন্য কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হোক আর নাই হোক আমাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা খুব কমে আসছে। এটা আমার কাছে বড় আশ্চর্য ঠেকে যে যে দেশে ব্রহ্ম কী বস্তু তাই নিয়ে লাখ লাখ বই লেখা হয়েছিল সেই দেশের লোকেরাই শুদ্ধ মঙ্গল, কি শুদ্ধ সত্য, কি শুদ্ধ সৌন্দর্যের অনুভূতি করতে এত অক্ষম। মুখে যখন সত্য শিব সুন্দর বলি তখন ভাবি আংশিক সত্য সামাজিক মঙ্গল আর আটপৌরে ঘরোয়া সৌন্দর্য। শুধু তাই নয় যখন কোনো জিনিস সত্য কি শিব কি সুন্দর বিচার করতে বসি তখন সত্যকে মাপি সামাজিক মঙ্গল দিয়ে, মঙ্গলকে মাপি খণ্ড সত্য দিয়ে, আর সুন্দরকে 'অতি বড় সুন্দরী না পায় বর' ভেবেই বিদায় দিই। এটা বুদ্ধি হ্রাসের চিহ্ন নয়! সত্যকে শুদ্ধ সত্যেরই কষ্টি পাথরে ঘসতে হবে, শিবকেও তাই সুন্দরকেও তাই। আমার বন্ধু যখন বললেন রবিবাবুর বইখানা লেখা উচিত হয়নি, তখন Kant আর Mill-এর বড় বড় কথাগুলো তাঁর মাথায় ঘা দিচ্ছিল তার ফলে এই দাঁড়াল যে তিনি Art অর্থাৎ সুন্দরকে বিচার করলেন সামাজিক আচারের কষ্টিপাথর নিয়ে। শুধু যদি এইখানে গলদ হতো তা হলেও বাঁচতুম। Mill বলে গেলেন তাঁর কথা রাজ্যতন্ত্র নিয়ে, আমরা সেই কথাটা কা হিসেবে সাহিত্যের সমালোচনায় খাটাই? Kant বলে গেলেন সমাজ-ধর্ম নিয়ে, তাঁর কথাটা যদিই সত্য আর খাঁটি বলে মেনে নিই, তাহলেও কী বলে সেটাকে কলাবিদ্যার গায়িত্রী বলে জপ করি? বিশেষত স্বয়ং Kant-ই যখন সুন্দরের বিচার করতে বসে তাঁর পূর্ব রায় একেবারে উল্টে দিলেন। Kant-এর Critique of Æsthetic Judgment যদি কলেজে পড়ানো হতো তাহলে সুন্দর বেচারাও শিক্ষিত সমাজে দাঁড়াবার একটু জায়গা পেত। কিন্তু সে বই অবশ্য পড়ানো হবে না; কেননা তা-এত ছোট যে তার আর নোট দেওয়া চলে না।

যাই হোক বন্ধুর যুক্তিটি হচ্ছে এই যে, শিল্পীকে সমাজের Categorical

imperative-এর গণ্ডীর ভিতর ঘরকন্না করতে হবে— যদি এক পা বেরোন তা হলে রাবণ রাজা ঝুলির ভেতর পুরে নিয়ে যাবেন। আমার উত্তর এই যে আদত শিল্পীকে সব সময়ে কুণো হয়ে থাকতে হয় না। কালিদাস লিখলেন মেঘদূত, কুমারসম্ভব, জয়দেব লিখলেন পদাবলী, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এঁরাও কবিতা লিখে গেছেন, আর সে কবিতাগুলিও যে অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় এ কথাটাও আজকাল সর্ববাদীসম্মত। এঁদের লেখার ভিতর আধ্যাত্মিকতা আছে যথেষ্ট পরিমাণে,—এ কথা শুনেছি। কিন্তু আমি বন্ধুবরকে জিজ্ঞেস করি যে তাঁর কাছে জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন, প্রকৃতি পুরুষের বিবাহটা বেশী মনোহারী না ঐ সব কবিদের সৌন্দর্য অনুভূতিটা, আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে তিনি বলবেন না তাঁদের পূজাই ভালো লাগে, আরতিই মিঠে ঠেকে, ধূপ ধুনোই মাতিয়ে তোলে অথচ এ কথাটা সকলকেই মানতে হবে যে ঐ সব কবিরা যেমন spiritual হয়েছেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মঙ্গলকে উপেক্ষাই করেছেন। তাঁদের সহজিয়া ভাবটার তারিফ করতে হলে পৃথিবীর আর কোনো রস-সাহিত্যকে নিন্দে করা চলে না। আর একালে কাব্যের ভিতর অন্য কোনো দোষ থাকলেও যে, সে কালের কবিতার মতো অত কোনও খোলাখুলি কথাবার্তা নেই, এ কথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। আমার বিশ্বাস একালের উঁচুদরের সাহিত্য সকলের কাছে যে তেমন মুখোরোচক হয় না, তার কারণ তাতে রস ছাড়া আরও কিছু থাকে— আর তা বেশী মাত্রাতেই থাকে— যাকে Mathew Arnold বলেন, Criticism of life.

*

আজ আর পারি না, এমন পাগলকরা হাওয়া বচ্ছে, লিখতে ভাল লাগছে না। কতো পুরানো কথা মনে পড়ছে, এধারে বাতি ফুরিয়ে এল, লেখাটা পরের কথা, প্রাণ খোলাটা আগের। সময় যদি পাই আর লেখায় যদি আবার মন বসে তাহলে বন্ধুর আর কথার উত্তর দেব।

৫ই জ্যৈষ্ঠ। এক একটা গানের সুর যেমন একবার মাথায় ঢুকলে আর কিছুতেই বেরতে চায় না, 'ঘরে বাইরে' সম্বন্ধে আমার বন্ধুর বেসুরো কথাগুলো তেমনি এই কদিন ধরে সকাল বিকাল আমার মাথায় ঘুরছে। তাদের বিচার না করলে দেখছি তারা বিদায় হবে না।

বিদ্যাসাগর মশায় তাঁর উপক্রমণিকায় বলছেন, "যে-কয়েক পদে সমাস করা যায়, সেই কয়েক পদের যে অর্থ তাহা না বুঝাইয়া যদি অন্য বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝায় তবে তাহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে" যথা বৃক্ষে আরূঢ়ঃ যঃ সঃ ইতি বৃক্ষারূঢ়ঃ অর্থাৎ বাঁদর। মানসিক জগতেও ঐ রকম সমাস হয়, তবে সেটা বাক্যের, পদের নয়। সমাস আবার সময় সময় ইংরেজী বচনেরও হয় তবে তফাত এইটুকু "না বুঝাইয়া"র বদলে "না বুঝিয়া"। যেমন "Art holds the mirror to Life" এবং "Life comes from the soil" এই দুটি বাক্যের বহুব্রীহি সমাসে দাঁড়াল এই যে Art এর soil-এর সঙ্গে একটা নাড়ীর যোগ আছে। অতএব ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে ঠিক হল যে, কলাবিদ্যা দেশের মাটি অর্থাৎ বুকের উপর গড়ে ওঠা চাই। এই সিদ্ধান্তের এই উপসিদ্ধান্তও সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পন্ন হল যে, কলাবিৎ মশায় শতকরা ৯৯ জন লোকের একজন হওয়া চাই, যদি তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ বক্রী ভদ্রলোকটি হন তা হলে তাঁর কালোয়াতী যে শুধু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তাই নয়, সমাজদারেরা তাঁর হুঁকো নাপিতও বন্ধ করবেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে রবিবাবু অবশ্য কলাবিৎ নন— কেননা তিনি একশ'র মধ্যে নয়, লাখের মধ্যে একজন। তাঁর অপরাধ তাঁর লেখায় সমাজচিত্র নেই।

আমিও বলি তা নেই, তবে আমি আরও একটি কথা বলি—"সেটার দরকারও নেই।" পাঠকেরা যদি নিজের দেশের খাঁটি সমাজ-চিত্র দেখতে চান, তাহলে টাকা খরচ করে বই কেনার চেয়ে তার জলজ্যান্ত চিত্র দেখবার আর একটি প্রশস্ত ও শাস্ত্রসঙ্গত উপায় অবলম্বন করা ভালো, যাতে টাকা আসে এমন কি ভবিষ্যৎ নরক থেকেও উদ্ধার পাওয়া যায়। আর পাঠিকাদের কথা আলাদা— ১৩ বৎসর পার হতে না হতেই ত তাঁদের সমাজের অন্ধিসন্ধি জানতে বাকী থাকে না।

তারপর আমার প্রায়ই এই একটি কথা মনে হয় যে, কোন Artist নিজের চারপাশের ছবি তোলেন না। আর যদিও বা তোলেন সে অন্য কোনো চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। ফটোগ্রাফীতে হাজার লাভ থাকলেও সেটা তাঁর ব্যবসা হতে পারে না, negative platesগুলো কেবল তাঁর হাতের কাঁচামাল হতে পারে। যেমন বঙ্কিমবাবুর হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো একটা বড় ব্যাপারের ভিতর এত চাপা পড়ে গেছে যে দূরবীন না কষলে চোখে পড়ে না। যদি গা-ঘেঁসা জিনিসের হুবহু নকল করাটাই লিখিয়ে কি আঁকিয়ের কারিগরীর চরম হতো, তা হলে হেমবাবুর "বাঙালীর মেয়ে" এই দেশের সব চেয়ে সুন্দরী কবিতা হয়ে উঠত।

তবে আর এক কথা উঠতে পারে যে— সাহিত্যে যে চরিত্র বা ঘটনাবলীর সমাবেশ করতে হবে সেগুলির ছাঁচ দেশী হওয়া চাই। আমি ছাঁচ মানে কি তা ঠিক বুঝি নে— তবে তার মানে যদি "সাধারণ মানুষের চালচলন কি তাদের মনের ভাবভঙ্গী হয়" তা হলে জিজ্ঞেস করি ইংরেজী ভাষায় King Lear-এর স্থান কোথায়? আর ফরাসী ভাষায় Old Goriot কি Andre Cornelis লেখা হলই বা কেন আর রুশ-সাহিত্যে Lear of the Steppes কি Virgin Soil-এর এত বড় মান কেন? তা হলে ত কাব্যে আর Hamlet-এর জাত থাকে না। আর Hamlet-এর জাত বাদ দিলে কাব্যের থাকে কি? আর যদি ছাঁচের মানে হয় সেই চরিত্র যেটা হওয়া উচিত, তাহলে নী।তপাঠের সুবোধ বালককেই সাহিত্যের অতুলনীয় সৃষ্টি বলে ধরতে হবে আবার ছাঁচ বলতে যদি এমন একটি সনাতন পাত্র বোঝায় যার অন্তরে নিজের মনকে ঢালাই করাই শিল্পীর কর্তব্য, তা হলে শিল্পের কোনো দরকারই নেই, কেননা Art-এর প্রাণ হচ্ছে পার্থক্যের অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর আমার বন্ধুর মতে সেই স্বাতন্ত্র্যের আবার অভিব্যক্তিও হওয়া চাই। যাই হোক আমি বলি সেই চরিত্র typical যেটা তোমার আমার মতো খানিকটা, আবার একজন পরদেশী এসেও বলবে "আমার মতনও খানিকটা"; অথচ প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে সেই চরিত্রের আরও কিছু আছে যা আমাদের মধ্যে নেই এবং সেই কিছুটাই কবিকল্পিত চরিত্রের যা-কিছু। রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে "স্বদেশী" কথাটার খুব সার্থকতা থাকতে পারে কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে সেটার মানে যে কী এখনও বুঝতে পারি নি।

পূর্বোক্ত ইংরাজী বাক্যের বহুব্রীহি সমাস করে আর একটি অপূর্ব জিনিস হালে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটা এই যে "কালোয়াৎ aristocrat হলে চলবে না।" কিন্তু আমার মনে হয় যে এ সব ক্ষেত্রে aristocrat আর demos-এর তফাত এই মাত্র যে, কারুর অন্য কাজ করে মাথা ঘামাবার সময় আছে, আর কারুর বা তা নেই। সাহিত্য গড়ে ওঠে দেশের মাটির উপর নয়, তার মাথার উপর, আর মাথার সেই জায়গাটায় যেখানে সাংসারিক ভাবনা থাকে না। কলাবিদ্যার আলোচনায়— কি সাহিত্য চর্চা, কি গান বাজনা, কি ছবি আঁকা যাই বলোনা কেন, অধিকার আছে শুধু সেই সব বেপরোয়া লোকের যাদের মনের ঘরে প্রাণ খুলে আড্ডা দেবার সাহস আছে, যাদের অন্নের চিন্তা নেই, কি থাকলেও থাকে না, যারা সময়ের মূল্য বোঝা উচিত হলেও বোঝে না, যারা খেয়ালের ডানায় চড়ে পরীর রাজ্যে গিয়ে তাদের আসর উড়িয়ে আনতে

পারে। আর্টিস্টরা সব রূপলোকের অধিবাসী অর্থলোকের নয় সুতরাং সে দেশে বৈশ্য শূদ্র নেই সবাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়। এঁদের aristocrat নাম দেওয়া হয় তো হোক, তাতে তাঁদের লজ্জা পাবার কিছু নেই। একথা খুব ঠিক যে যিনি আদত শিল্পী, শিল্প কখনও তাঁর পেশা হতে পারে না। সব দেশেই এমন সাহিত্যিকের অভাব নেই যাঁদের পক্ষে সাহিত্যের সেবা হচ্ছে একটা জীবিকা মাত্র। আমি এটা জোর করে বলতে পারি যে তাঁদের দ্বারা সাহিত্যের কোনও অসাধারণ উপকার সাধিত হয় নি। যাঁরা পৃথিবীর অন্য কর্তব্য সম্পাদন করে কিংবা উপেক্ষা করে মর্জিমাফিক সাহিত্যচর্চা করেন তাঁরাই কিছু স্থায়ী রেখে যেতে পারেন।

তবে কেউ কেউ বলেন aristocratic মানেই অস্বাভাবিক (artificial)। তাঁরা স্বভাবের অর্থ বোঝেন প্রকৃতি (nature)। এবং তাঁদের মতে Nature-এ সাধারণের রাজত্ব। অথচ তাঁরা অভিব্যক্তিবাদেও বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁদের এটা জানা উচিত যে ঐ মতে Democracy-র দাবিটে উড়িয়ে দিয়েছে। এই সোজা কথাটা না বোঝার জন্যে তাঁরা প্রকৃতিদেবীর লোহার সিন্দুকে সমস্ত শিল্পের শুধু মালমসলা নয় একেবারে গড়া জিনিস খুঁজে বার করতে চান, যা হবে শিল্পের আদর্শ। দর্শনের দর্পণে না দেখেও এই সত্যের দর্শনলাভ হতে পারে, যে প্রকৃতি, সুন্দরীর আদর্শ হওয়া দূরে থাকুক তাঁর কোনো সৌন্দর্যই নেই। আছে শুধু খান কতক হাড় ও খানিকটা মাংস। কথাতেই আছে সওদাগর পুত্র প্রথম প্রহরে হাড় যোগাড় করেন, সেনাপতির পুত্র দ্বিতীয় প্রহরে মাংস জুড়ে দেন, তৃতীয় প্রহরে মন্ত্রীর পুত্র মূর্তি গড়েন কিন্তু চতুর্থ প্রহরে প্রাণ দিতে পারেন রাজপুত্ত্বুর এবং একমাত্র তিনিই। সত্যি কথা এই যদি এ পৃথিবীতে আর্টের রাজপুত্ররা না জন্মাতেন তা হলে প্রকৃতিকে চিরকাল ঐ অস্থিচর্মসার আদ্যিকালের বুড়ি হয়েই থাকতে হতো। প্রত্যেক কলাবিৎই প্রকৃতিকে নিজের মনের ঐশ্বর্যে প্রণয়িণীর মতো সাজিয়ে দেন। আমরা স্বভাবসৌন্দর্য দেখে যখন আত্মহারা হই তখন সেই সাজানোর ভঙ্গিই দেখি— প্রকৃতির নিজের সাজাবার ভঙ্গি দেখি নে। আর যে দৃশ্যের নিন্দে করি সেটার দুর্ভাগ্য এই যে তার ভাগ্যে কোনো artist-এর কৃপাদৃষ্টি পড়ে নি। এই যদি হয় তা হলে একজনের তুলনায় আর এক জনের সাজানোটা স্বতন্ত্র হয়ে কি পড়বে না? আসল ঘটনা এই যে আর্ট-রাজ্যের রাজপুত্রদের স্বভাব থেকে যা জন্মলাভ করে তাই হচ্ছে যথার্থ স্বাভাবিক। বাজে লোকে যোড়াতাড়া দিয়ে যা গড়ে তাই অস্বাভাবিক অর্থাৎ mechanical, আমরা সাধারণ লোক,

আমরা প্রকৃতিরই সামিল. আমাদের অস্তিত্ব নেই বললেই হয়, যতক্ষণ আর কোনো বড় অস্তিত্ব আমাদের প্রাণ না ধার দেয়, সেই ধার পাই বলেই আমাদের বেঁচে সুখ। অনবরত Shakespeare পড়ে আমরা তাঁরই প্রতিভায় অনুপ্রাণিত হই, আর সেই জন্যেই তাঁর প্রতি ভক্তি আসে, ভালোবাসা আসে, তাঁকে একেবারে আপনার করে ফেলি, অর্থাৎ তিনিই আমাদের তাঁর আপনার করে তোলেন। যিনি নেহাত আপনার, তিনি আমার বুকের ধন, মাথার মাণিক, নিজের সম্পত্তি, অতএব তিনি artificial মোটেই হতে পারেন না। আর সেই ভক্তি সেই ভালোবাসার হিসাবে Shakespeare যেমন আমাদের কাছে দেবতা হয়ে ওঠেন, ঠিক সেই হিসাবে আর একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তিও হন। সচরাচর লোকের মানসিক অবস্থা এমনই শোচনীয় যে নিজের দেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে গেলেই, সেই সঙ্গে আর অপর দেবতার গায়ে ঢিল ছুঁড়তে হয়— নচেত ভক্তির মাত্রা পুরো দেখান হয় না। আর লিখতে ভালো লাগছে না, মনটা এমনি এলিয়ে পড়ছে যে এর পরে যদি কলম চালাই তাহলে কাগজের উপরে শুধু ভাবের হিজিবিজি কাটব। এর অর্থ নয়, যে এতক্ষণ বসে বসে যা লিখলুম তা একটা আঁটসাট প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে। আমি বাক্যের সঙ্গে বাক্য জুড়ে হয়ত এমন একটা প্রকাণ্ড সমাজ গড়ে তুলেছি যে তাতে করে —যা বোঝাতে যাচ্ছি তার উল্টো জিনিস বোঝাবে।

সবুজপত্র, অষ্টম, নবম, একাদশ সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ১৩২৩।

ধরতাই বুলি

এ কথাটা বাংলার সর্বত্র প্রচলিত না থাকলেও, কথাটায় যা বোঝায় তা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত আছে ; এবং মানুষে ধরতাই বুলির উপর যে বিশ্বাস খরচ করে, সেটা যদি নিজের জন্যে জমিয়ে রাখত তা হলে পৃথিবীতে এত দুঃখ কষ্ট থাকত না। সত্ব, রজ, তম, সোঽহং প্রভৃতি বচনগুলি যে ছাত্রসমাজে, বৃদ্ধের দলে, মাসিক পত্রিকায় স্বদেশী বক্তৃতায় কতবার আওড়ান হয় তার আর ইয়ত্তা নেই। আবার ইংরেজী শিক্ষিতের দলে ত ধরতাই বুলি ছাড়া কথাই নেই। রাজভাষার এমনি মজা যে ওর বুকনি শিখলেই সে ভাষায় ব্যুৎপত্তির যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া যায়— শুধু তাই নয় বাঁধিগৎ-এর বন্ধনে ভাবের গলায় যে দড়ি পড়ে তাও সম্পূর্ণভাবে ঢাকা যায়। এ সত্যের প্রমাণ খুঁজতে প্রয়াস পেতে হয় না, দৃষ্টান্তেরও অন্ত নেই। যে সব উচ্চ-শিক্ষিত যুবকেরা বাংলা লিখতে অনুরোধ করলে উত্তর দেন "বাংলা আমি জানিনে" তাঁদের ভিতর শতকরা ৯৯ জন ভদ্রলোক সেই সঙ্গে মনে মনে বলেন "ইংরেজীটা জানি, তাই ধরেই আমার মনের কথাগুলো হুড়হুড় করে বেরুবে, মানুষে এক-সঙ্গে ক'টা ভাষা শিখতে পারে।" তাঁরা যখন বিদেশী ভাষায় কোনো প্রবন্ধ লেখেন তখন মনে হয় "বেশ হল" কিন্তু যখন ঐ প্রবন্ধটা বাংলায় তর্জমা করে পড়ি তখন মনে হয় সাহিত্যের অরন্ধন ভক্ষণ হচ্ছে। বাংলা দলের পক্ষেও ঐ কথাটা খাটে। মাসিকপত্রে সচরাচর যে সব প্রবন্ধ বেরোয় তাদের তর্জমা করলে মনে হয় "Census report-এর কথাগুলো খাঁটি, দেশে বাস্তবিকই অনেক সন্তান জন্মায়, কিন্তু তাদের মধ্যে শতকরা এক আধজন বাঁচে।"

যাই হোক মোদ্দা কথাটা এই যে আমরা বুলিগুলো না বুঝে, না বাজিয়ে, মনের উপর তাদের কী রকম প্রভাব তা না জেনে, সেগুলো চালাতে চাই। সাধারণ লোকের হাতে বনমানুষের হাড় যেমন শুধু হাড়ই থেকে যায় তা দিয়ে কোনো খেলা দেখান যায় না, তেমনি আমাদের হাতে ইংরেজী সংস্কৃত বুলি-গুলো, শুধু বুলিই থেকেই যায়— তা নিয়ে জীবনের কোনো খেলাই খেলা যায় না। এই যেমন Evolution ; যখন Politics আলোচনা করি (অবশ্য অন্য দেশের) তখন বলি এই প্রজার পরোক্ষভাবে রাজ্য শাসন করবার প্রথাটা

হঠাৎ আসে নি, এর একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে; যখন সমাজ সংস্করণের কথা ওঠে তখনও বলি "আচার কি আর ব্যাঙের ছাতা, যে রাতারাতি ভুঁই ফুড়ে উঠেছে, এরও একটা ক্রমবিকাশ আছে" এই রকম বিবাহের, এমন কি ভগবানেরও নাকি Evolution আছে শোনা যায়।

আছে জানি, কিন্তু কী আছে নেড়ে চেড়ে দেখা যাক। Evolution শব্দের মানে হচ্ছে কর্মফল, যদিও ওর প্রতিশব্দ হচ্ছে অভিব্যক্তি। ধার্মিকের কাছে "কর্মফল" শব্দটা উচ্চারিত হলেই যেমন তাঁর বুদ্ধির আয়নায় ঘাম মুছে যায়, তেমনি ইংরেজী পড়া লোকেদের কাছে এই কথাটার মন্ত্রশক্তিতে সকল তর্কের মীমাংসা হয়ে যায়। ঐ একটি কথার জোরে সকল সমস্যার বাইরে চলে যাওয়া যায়। আমি আমার একজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করি "ও কথাটার মানে কি বুঝিয়ে দিতে পার ?" তিনি বললেন, "ভালো করে বুঝতে গেলে অনেক কাঠ খড় চাই— তা তুমি যোগাতে পারবে না, তবে এই দুটো কথা শিখে রাখ survival of the Fittest আর Struggle for Existence"—তাহলেই ওর মোদ্দা কথা শেখা হবে।

"এ, ত কেবল নিয়মগুলো।"

"ওই হল, আর কিছু বোঝবার দরকার নেই, বাস্তবিক পক্ষে Evolution বুঝতে আমরা তার নিয়মই বুঝি, কিন্তু আদত জিনিসটা সম্বন্ধে আমার খুব সাফ ধারণা নেই— বোধ হয় ক্রমবিকাশ বললে ভুল হবে না।"

"না আমি প্রতিশব্দ চাই না, কথার মানে অভিধানেই দেওয়া আছে, কিসের ক্রমবিকাশ বুঝিয়ে দিতে পার ?"

"এই ধর মানুষ, বাঁদরের।"

"এইরকম করে কতদূর পিছু হটতে পার ?"

"Cells পর্যন্ত।"

"অর্থাৎ যতদূর অনুবীক্ষণে দেখা যায়; তার বেশী না ?"

"এক পা'ও নয়।"

"আর, কতদূর এগোতে পার ?"

"মানুষ পর্যন্ত; তার বেশী এক পা'ও নয়, সব জ্ঞানই ত সীমাবদ্ধ, তার উপর আবার বিজ্ঞান, তবে এই মাত্র কথা, অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করতে গেলেই মেনে নিতে হবে যে এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু পূর্ণ বিকাশের লোভে মন্থর গতিতে এগোচ্ছে— অর্থাৎ উন্নতি করছে।"

"ওটা তোমার নিজের কথা—বুকনির বাইরের কথা। কোনো একটা ভাব

বুঝতে গেলে তার অভাবের স্বভাব বুঝতে হবে। যেমন 'প্রকাশের ব্যাখ্যা' বললেই 'অপ্রকাশের আনন্দ' ভাব মনে জাগে। কিন্তু বিজ্ঞানে 'নেতি'র দিক হচ্ছে উত্তরায়ণ, সে ধারে কোনো কাজ হয় না। শুধু কাজ হয় না তাই নয় ও ধারটা যে আছে তাও তোমরা মানতে রাজী নও, এই বলে উড়িয়ে দিতে চাও যে Struggle হচ্ছে অবিকাশের বিপক্ষে। কিন্তু এ সত্য ভুলে যাও যে, পৃথিবীতে জীবনের বিকাশের বাধার নিয়মাবলীকেও ইভলিউসানের নিয়ম বলা যেতে পারে। আর Involution বলে যে একটা process আছে এও মানতে হবে। তোমরা বল মানি, কিন্তু বাস্তবকি পক্ষে মান না। আবার আর এক কথা, ওই অভিব্যক্তি আর অনভিব্যক্তির মাঝামাঝি একটা অবস্থা আছে যার নাম হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকা, নিশ্চলতা। চীন সভ্যতা ৪০০০ বছর আগেও যা ছিল এখন তা আছে, এ ক্ষেত্রে তোমার ক্রমবিকাশের নিয়মাবলী কী করে খাটাচ্ছ?"

"কি জান, আমার মাথায় এ বিষয়ের এদিক ওদিকের ভাবগুলি তেমন সাজান নেই।"

"তা বেশ জানি, তবে আমার মাথাও ঐ বিষয়ে যে বেশী পরিষ্কার তা নয় —যাই হোক আমি এই অস্পষ্টতার কারণ দেখাতে পারি।"

"দেখিয়ে কোনো লাভ নেই, যদি অভিব্যক্তিবাদের অস্পষ্ট কথাগুলো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে পারতে তা হলে কিছু positive জ্ঞান লাভ হতো। negative-criticism করা যেমন সোজা, করাও তেমনি বৃথা।"

"এও আর একটা বুলি। আমি কারণ দেখাচ্ছি, আমার মাথা ও তোমার মাথায় যে পরগাছা জন্মেছে তার উচ্ছেদ সাধনের জন্যে— ফুলগাছের তোয়াজ মানে তার গায়ে কাগজের ফুল গেঁথে দেওয়া নয়— তার মাথা মাঝে মাঝে ছেঁটে দেওয়া হয় আর তার গোড়ার মাটি ঢিলে করে দেওয়া। মনের দেশেও ভাবের ফুল ফোটাবার ঐ একই পদ্ধতি।

"হয়েছে, কী বলবার আছে বল দেখি।"

"আমার প্রথম আপত্তি— ইংরেজী কথার দাসত্ব জিনিসটেতে। এক একটি বচন যেন জালের কাঠ, জ্ঞানের বন্ধনের অপেক্ষাও এর বাঁধন শক্ত।

দ্বিতীয় কথা এই : Darwin-এর মত সম্বন্ধে কতক ভুল ধারণাই তাঁর মত বলে চলে যাচ্ছে। তাঁর প্রথম ও শেষ কথা এই যে, জীবদেহে অদ্যাবধি যে বদল ঘটেছে, তারই ইতিহাসের নাম ইভলিউসান। সেটা কখনও Moral thesis হতে পারে না যাতে করে আমরা তার রীতিকে নীতি হিসেবে গণ্য

করে মানবজীবনের প্রত্যেক ঘটনার ইতিহাস দাঁড় করাতে পারি; অভি-ব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করলে মনে অনেক দুরূহ প্রশ্ন সম্বন্ধে শান্তি আসে বটে কিন্তু তাই বলে যে সে মতের উপর নির্ভর করে কোনও চেতন পদার্থের বিকাশের সাহায্য হতে পারে এটা বিশ্বাস করি না। তুমি কি মনে কর যে Darwinism সংক্রান্ত কোনই বই পড়িয়ে আমাদের মতো নির্জীব জাতিকে সজীব করতে পারা যায় ?

"হাঁ এক হিসেবে পারা যায়, অনবরত "Struggle-এর কথা শুনতে শুনতে যদি মন নড়ে ওঠে।"

"কতকটা সত্যি বটে, কিন্তু Darwinism বুঝতে শুধু Struggle for Existence-ই বুঝি কেন ? ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পরস্পরের সাহায্য করবার ইচ্ছা তার কত বড় পাতা অধিকার করে রয়েছে তা স্বয়ং Darwin কি Wallace স্বীকার করলেও আমরা স্বীকার করি নে। এঁদের মধ্যে একজন এক জায়গায় বলছেন, "Those commities which included the greatest number of the most sympathetic members would flourish best" এই একটা লাইন দেখলেই মনে হয় যে Darwin হচ্ছেন বিজ্ঞান ধর্মের যীশুখ্রীস্ট, অর্থাৎ তার মতের তিনিই শেষ মতাবলম্বী। পুরো সত্যের ইতিহাস হচ্ছে মানুষের জীবন, আর খণ্ড সত্যের ইতিহাস Inquisition, Thirty Years' War আর বর্তমান যুদ্ধ; এ যুদ্ধ ইভলিউসানের ফল নয় ইভলিউসনবাদের ফল। ধরতাই বুলি খণ্ড সত্য, তাই তার গল্পের পাতা রক্ত দিয়ে লেখা; Balance of Power কি Liberty-র গল্প কি জান না ?"

"আরও কিছু বলবার আছে না কি ?"

"আরও একটি আছে— সেটা বড় শ্রুতিকটু। বাঁধা বুলির প্রধান সহায় হচ্ছে আমাদের বোকামি। আমরা বড় বুদ্ধিমান বলে বড়াই করি— কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বেশ বোঝা যায় যে আমরা চালাক হলেও বুদ্ধিমান নই। বুদ্ধিমত্তার রাজচিহ্ন হচ্ছে সূক্ষ্মভাব ধারণের সক্ষমতা। আমরা কিন্তু দা-কাটা Facts ছাড়া আর কিছু নিয়ে মনের কারবার করতে পারি নে।

"সে কি ! আমাদের দেশে যে উপনিষদ লেখা হয়েছে, আমাদের জীবনই ত একটা abstraction."

"হাঁ লেখা হয়েছে বটে কিন্তু সংস্কৃত ভাষায়, কেবল তাই নয় উপনিষদ পড়ে কজন লোক খাঁটি ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে ? একথা আমি খুব বড় গলা করে

বলতে পারি যে যদিও আমরা বেদান্ত বেদান্ত করে মরি তবু আমরা সকলেই কৃষ্ণভক্ত? এমন কি কৃষ্ণজ্ঞানও নই। বৈষ্ণব গ্রন্থের এত আদর কিন্তু বৈদান্তিক গ্রন্থের আদর নেই কেন? এত সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক হচ্ছে কিন্তু দার্শনিক কৈ? যখনই রবিবাবুর কবিতা নিয়ে আলোচনা হয় তখন তিনি ঋষি কি না এই নিয়ে ওঠে তর্ক— তাঁর কবিত্বের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য যে কোথায় সে-কথা কারুর মুখেই শুনি নে; তার কারণ কি জান? রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসেবে বিচার করবার ক্ষমতা আমাদের নেই, তাই তাঁকে আমরা মানুষ হিসেবে বিচার করতে বসি। উপর উপর দেখতে মনে হয় সমালোচকের স্থান গ্রন্থকারের অনেক নীচে, কিন্তু আসলে তা নয়।

"হাঁ একটা কথাই আছে Bad authors turn critics."

"ও বচনটাও ধরতাই বুলি আর সেইজন্যেই খণ্ডসত্য; বাস্তবিক পক্ষে সমালোচকের কাজও মনের কাজ, এবং সে কাজেরও যথেষ্ট মর্যাদা আছে। তাঁকে যুক্তির সূক্ষ্ম পথের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়, Ideas নিয়ে লোফালুফি করতে হয়।"

"আর সেইজন্যেই বোধ হয় সাহিত্যের আসরে সমালোচককে Clown কি বিদূষকের মতন দেখায়।"

"কিন্তু তুমি কি জাননা সার্কাসের Clownরাই হচ্ছে পাকা ওস্তাদ।"

"সব কথা ত শুনলুম এখন বলতে চাও কি?"

"এতক্ষণে যদি না বুঝতে পেরে থাক তা হলে আমার বকাই বৃথা হয়েছে, একটু নিজে ভেবে দেখ— আমাদের মাস্টার মশায় বলতেন 'ওহে একটু মনের গা ঘামিয়ো তা হলে কপালের ঘাম পায়ে পড়বে না।' আমরা যাকে বোকামি বলি তা মনের আল্‌সেমি ছাড়া আর কিছু নয়।

"কিন্তু উপদেশটি হচ্ছে নিশ্চয়ই কোনো অধার্মিকের, আমাদের ধর্মে, সর্বদা মনকে শান্ত করতে বলে আর সেইজন্যে—

"শান্তিতে শুধু থাকিবারে চাই
একটি নিভৃত কোণে।"

"তোমার শান্তির মানে জানি। মনের কুঁড়েমিকে অন্য নাম ধরে ডেক না, তাহলে সে উত্তর দেবে না। কিংবা বুলিগুলোকে অত যখের মতন মনের প্রহরী করে রেখো না; যখের ধন কেউ নিতে পারে না বটে, কিন্তু সুদে বাড়ে না।"

"তোমার মতে ত ইভলিউশানও একটা লিবু। কিন্তু এটা কি জানো না

যে একালে ইভলিউসান বাদ দিয়ে আমরা চিন্তাই করতে পারি নে।"

"তা জানি, সেইজন্যেই ভবিষ্যতে আমাদের ইভলিউসানের বাইরেই চিন্তা করতে হবে, নচেৎ পৃথিবীর ছোটবড় অনেক সত্য, আমাদের মনের বাইরে থেকে যাবে।"

সবুজপত্র, ২য় সংখ্যা, ৪র্থ বর্ষ, ১৩২৪।

ডিমোক্রাসি

১·

আজকের দিনে লোকের সঙ্গে কথাই কও আর খবরের কাগজই পড়ো, কানে আসবে ও চোখে পড়বে শুধু একই কথা— ডিমোক্রাসি। এই কথাটা আমাদের মনকে এমনি পেয়ে বসেছে যে সেখানে অন্য কোনও ভাবনা চিন্তার আর স্থান নেই— অবশ্য এক পেটের ভাবনা ছাড়া। অথচ দেখতে পাই ও-কথাটার অর্থ প্রায় কেউ বোঝেন না। আমাদের নীরব জনসাধারণ ও আমাদের পলিটিকাল বাক্যবাগীশেরা এ বিষয়ে সমান অজ্ঞ। এ অবস্থায় কথাটা যে-দেশ থেকে এসেছে সে-দেশের দু'চারখানা বই একটু নাড়াচাড়া করা গেল—কথাটার যথার্থ মানে বোঝবার জন্যে। এই রাজনৈতিক সাহিত্যালোচনার ফল এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করছি। বলা বাহুল্য যা লিখছি তার ঠিক নাম হচ্ছে "নোট"।

২·

প্রথমত মর্লি সাহেবের Compromise-খানা আবার পড়লুম। আমাদের দেশে একদল লোক আছেন যাঁরা সাংসারিক অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে বুদ্ধির গোড়ায় কলম চালান। কর্মের পথ সরল নয়, অতএব বুদ্ধি খুঁড়িয়ে চলুক— এই তাঁদের উপদেশ। সম্ভবনীয়তার রাশ মেনে চলতেই হবে, তা না হলে অতিবুদ্ধি গলায় এবং পায়ে দড়ি জড়িয়ে খানায় পড়বে— খানায়-পড়া অবস্থা যখন সর্ববাদী নিন্দনীয় তখন গোড়া থেকে বুদ্ধিকে ধীর কদমে চালানই শ্রেয়। কিন্তু তাড়ির মাদকতা ময়দার মত নির্জীব এবং নিরেট পদার্থের পক্ষে রুটিতে পরিণত হবার জন্য যেমন দরকারী, তেমনই ভাবরাজ্যে বুদ্ধির সাহসিকতা, উত্তেজনা এবং স্ফূর্তি নিরেট ঘটনাবলীকে সজীব করবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন— অন্তত এই ত ইতিহাসের শিক্ষা। ভল্টেয়ার, রুশো, ডিডেরোকে বাদ দিয়ে ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস-চর্চা যা, হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয় করাও তাই। ভাব এবং কর্মের ঘটকালিতে মর্লি সাহেবের বিধান নেওয়াই বিধেয়, কেননা তিনি নিজে একজন কর্মবীর। তাঁর মত এই যে,

বুদ্ধির বন্ধুর পথে সাহসে ভর করে চলাই উচিত, কর্মক্ষেত্রের স্বাভাবিক জড়তার ফলে ভাবের দুর্দমনীয়তা সহজেই মন্থরগতিতে দাঁড়াবে। ভাব যদি প্রথম থেকেই সম্ভবের কাছে মাথা নীচু করে তাহলে না-হয় বুদ্ধির বিকাশ, না-হয় ভাবের প্রকাশ।

এখন স্মার্তের কথা যদি সত্য হয় তাহলে মানতে হবে যে, বর্তমান ভারতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকের কাঁধে একটা বিশেষ রকমের দায়িত্ব এসেছে—বিশেষত বাঙালীর, সে হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিকে খাটানোর দায়। তবে বাঙালীর নামে আগে থেকেই বদনাম রয়েছে যে, তারা কুছকাম্‌কা নেহি। আমি বলি এ নিন্দা অনর্থক, কেননা আমার বিশ্বাস যে পৃথিবীতে কাজের লোকের অভাব নেই, অভাব আছে শুধু মাথা ঘামাবার লোকেরই আর সেই অভাব যখন বাংলাদেশ প্রায় সব ক্ষেত্রেই পূরণ করেছে তখন রাজনীতির ক্ষেত্রেও করবে। আমার দুঃখ এই যে আমরা পূর্বে ঐ অভাব পূরণ করেছি কোন দায়িত্ব বোধে নয়। কি সাহিত্যে, কি ধর্মে, কি বিজ্ঞানে দায়িত্ব-জ্ঞান নয়, প্রকৃতির তাড়নাই আমাদের ভাবের গতি নিরূপণ করে দিয়ে থাকে। এক রাজনীতির ক্ষেত্রেই আমরা মনের খেয়াল অপেক্ষা নিজেদের কর্মক্ষমতা, চরিত্রবল, একাগ্রতা প্রভৃতি গুণের উপর বেশি নির্ভর করি, কেননা কি সাহিত্য কি ধর্ম স্বীয় চেষ্টায় তত গড়ে তোলা যায় না, যত যায় রাজনীতি ও সমাজনীতি। এই হচ্ছে জগতের নিয়ম। কিন্তু সব বিষয়েই আমরা সৃষ্টি-ছাড়া, তা না হলে একই গলায় একই ক্ষেত্রে ডিমোক্রাসি এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি-নির্বাচনের জন্য আবেদন করতুম না। Mill এবং Comte সমাজ-সংস্কারে সাধারণ মানুষের বুদ্ধির জড়তা দেখে ভগ্নমনোরথ হয়েছিলেন, সেই জন্য লোকের জড়বুদ্ধির মূলে তাঁরা কুঠারাঘাত করলেন— নব্যন্যায় লিখে। আমাদের দেশে দেখছি যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের পথ মুক্ত রাখতে কেউ ব্যস্ত নন, তাই বীরবলের কথা হচ্ছে 'এখন ভিক্ষের ঝুলি টাঙিয়ে রেখে বুদ্ধি চালনা করা যাক। আগে পথ-বিচার করা হোক, না-হলে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাব।'

৩.

ধরা যাক ডিমোক্রাসি কথাটা। আমাদের ধারণা ও-একটা ধর্ম, ন্যূনকল্পে একটা মহৎ-আদর্শ। কল্পনার যাদুতে যাই ভাবা যাক না কেন, ওটা আসলে অনেক রকম শাসন-প্রণালীর মধ্যে একটা বিশেষ প্রণালী মাত্র। আমাদের

দেশ-নায়কেরা কিন্তু এ কথাটি না বুঝে ও-বস্তুকে ধর্ম হিসেবে ধরে নিয়েছেন, তাই তাঁদের প্রত্যেক বক্তৃতায় ভিক্ষার চাল কাঁড়া কি আ-কাঁড়া, ঠিক করা হয় ঐ আদর্শের চালুনী দিয়ে। আমরা যদি ডিমোক্রাসিকে শাসন-প্রণালী হিসেবেই ধরি তাহলে দুইটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হবে। প্রথমত ডিমোক্রাসি আমাদের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় কি না? দ্বিতীয়ত আমাদের ভিক্ষা-পত্রের দফাগুলির সঙ্গে ডিমোক্রাসির ষোল আনা মিল আছে কি না?

৪.

স্বরাজের কোন জীবন্ত ধারা বর্তমান না থাকলেও স্বায়ত্তশাসন আমাদের দেশে নতুন নয়। তারপর এই যুদ্ধের কৃপায়, ইংরাজ-শাসন এবং শিক্ষার ফলে, পৃথিবীর রাজকীয় সমস্যার সঙ্গে আমরা এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছি যে আমাদের চলতে গেলেই বিশ্বমানবের সাথে এক পথেই সমান পা-ফেলে হাঁটতে হবে, অতএব প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, "হ্যাঁ, ডিমোক্রাসি আমাদের চাই"। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

সাধারণতন্ত্র যে জনসাধারণের এত প্রিয় হয়ে উঠেছে, তার কারণ এই যে পূর্বতন শাসন-প্রণালীর ভিত্তি অপেক্ষা এর ভিত্তি ঢের বেশি পাকা। পুরাকালে রাজ্যের ভিত্তি ছিল রাজার গুণ, এখনকার ভিত্তি লোকের সংখ্যা। রাজ্যতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করলে, বোঝা যায় যে, এক Federation ছাড়া Aristotle এ বিষয়ে তত্ত্ব যে নিরূপণ করে গেছেন তা সনাতন। তাঁর মতে প্রথমে থাকে একের রাজত্ব, সেই এক রাজা যখন স্বার্থ-সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে প্রজার হিত-সাধনে কুণ্ঠিত হন, তখন তাঁর সভাস্থ সম্ভ্রান্ত পাত্রমিত্রের দল নিজেদের হাতে রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করেন তখন হয় অনেকের প্রভুত্ব। সেই বহু আবার যখন এক গোষ্ঠিতে আবদ্ধ হয়ে গণ-হিত ভুলে গিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব রক্ষণে তৎপর হয়ে ওঠেন তখন একজন শক্তিশালী পুরুষ জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে নিজে tyrant হয়ে বসেন। তাঁরও পরোপকার বৃত্তি যখন বংশপরম্পরার কাছে হার মানে তখন জনসাধারণ তাদের লুপ্ত ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। কিন্তু কিছুকাল পরেই যখন দেখা যায় যে সাধারণের বুদ্ধি কোন অ-সাধারণ সমস্যার সুচারুরূপে সমাধান করতে পারে না, তখন একজন মূল-গায়েন এই গোলে-হরিবোল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ান বীরগর্বে। আবার একের প্রভুত্ব শুরু হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে বীরের আসর নেই, মূল-গায়েন

আর বংশপরম্পরায় অবতীর্ণ হতে পারেন না। তাই সভ্যজগৎ আজকাল বহুর উপর আস্থা স্থাপন করেই নিশ্চিন্ত হয়েছে। তবে রাজ্য-শাসনের জন্ত বিশেষ দরকার বলে কাজের ভার একদল বিশেষজ্ঞের উপর ন্যস্ত হয়েছে যারা সাধারণের কাছে নিজেদের কার্য্যাবলীর জন্ত জবাবদিহি করতে বাধ্য। এরি নাম গণতন্ত্র।

৫.

অতঃপর দাঁড়াল এই যে ডিমোক্রাসি একটি শাসন প্রণালী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এ ব্যাপার সংখ্যামূলক। জনসাধারণের ভিতর অবশ্য ভালো মন্দ সব প্রকৃতিরই লোক আছে, তবুও সাধারণ লোকের বুদ্ধির সমষ্টি জনকয়েকের অসাধারণ বুদ্ধির অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে বেশি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু যেকালে রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞের আবশ্যক আছে তখন তাদের পরিচয় জন্মের দলিলের বদলে কর্মের দলিল হতেই নেওয়া শ্রেয়। এদের কার্যকারিতার বিচারক হবে অবশ্য জনসাধারণ।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই শাসন-প্রণালীর উদ্দেশ্য কি অন্য শাসন-প্রণালীর উদ্দেশ্য হতে বিভিন্ন? সকলেরই উদ্দেশ্য ত প্রজার মঙ্গল। তবে মঙ্গল কথাটার মানে এক্ষেত্রে একটু স্বতন্ত্র। আগে ছিল যাঁদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার তাঁরা যখন বেশি বোঝেন তখন তাঁদের মতে যা মঙ্গল তাই মঙ্গল। এখন এর মানে হচ্ছে প্রজার নিজের মতে যা মঙ্গল তাই মঙ্গল। য়ুরোপে যেদিন থেকে পোপ আর জার্মান-সম্রাটের ঝগড়া বাধল সেই দিন থেকেই লোক-বাসুকী মাথা নাড়া দিয়ে নিজের সজীবতার পরিচয় দিলে— কুলীনতন্ত্রের আসন টলল। Humanism-এর শিক্ষা যখন Erasmus, Colet, Abelard প্রভৃতি দেশময় ছড়িয়ে দিলেন, যখন renaissance-এর প্রসাদে মানুষের আত্মপূজার আরতি বেজে উঠল, যখন Martin Luther ধর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করলেন, অবশেষে যখন বিজ্ঞানের শিক্ষা লোকায়ত্ত হল তখন মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখলে। এই শুভ মুহূর্তে ফরাসী-বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হল— সেই বিপ্লবের তন্ত্রধারকেরা দেখিয়ে দিলেন যে এক গণতন্ত্রেই মানুষ ব্যক্তিগত হিসাবে নিজের আনন্দে নিজের প্রকৃতির সব কলিগুলো ফোটাতে পারে, যা পূর্ব-শাসনতন্ত্রে একেবারে অসম্ভব ছিল।

কিন্তু গোষ্ঠী-ধর্ম পুরাতন বলেই যে বাতিল হয়ে গেল তা নয়। তাই নতুন অবস্থায় পড়ে গোষ্ঠী-ভাব জাতীয়-ভাবে পরিণত হল। Idea of Democracy রাজ্যতন্ত্রে রূপান্তর ঘটালে। কিন্তু রূপান্তরিত জাতীয়-ভাবের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য হল একটি ভূতপূর্ব উপায়ে। চিরকালই রাজা তাঁর সভাসদ আমীর-ওমরাওদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন— কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে শুধু বিপদ্‌কালেহ্যুপস্থিতে। সম্ভ্রান্তবৃন্দের পক্ষে রাজার প্রসাদ প্রজাহিতের চেয়ে বেশি ফলদায়ী, তাই তাঁদের দ্বারা জাতির যা মঙ্গল-সাধন হত তা কেবল পেটের দায়ে। ইউরোপের কোন কোন রাজ্যে একটি ব্যবস্থাপক সভা ছিল যেখানে রাজার আত্মীয়স্বজন পার্শ্বচর অনুচরবর্গ ছাড়া একটি জমিদারের দল, একটি পুরোহিতের দল এবং রাজকর্মচারী দ্বারা নির্বাচিত সাধারণ-দলের প্রতিনিধিরা আহূত হতেন রাজাকে সৎ পরামর্শ দেবার জন্য। ইংলণ্ডে প্রথম তিন দল একত্র হয়ে এক সভায় সেই দিন থেকে বসতে আরম্ভ করলেন যেদিন John-এর দুর্বুদ্ধিতার ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে Normandy-র যোগসূত্র ছিন্ন হল। আর সাধারণ দল বসলেন অন্যত্র কিন্তু দুই দলের মধ্যে একটা যোগাযোগ রইল। ইংলণ্ডে এইরূপে এক জাতীয়তা এবং সেই জাতীয়তার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সামঞ্জস্য রক্ষা হল। ফরাসী দেশে তিন দল আলাদা represented হত। কিন্তু চতুর্দশ লুই এবং পঞ্চদশ লুই এই সভার উপদেশ উপেক্ষা করে নিজেরাই শাসন কার্য সমাধা করতেন। কিন্তু ষোড়শ লুই-এর রাজকোষ শূন্য হলে তিনি আবার এই ব্যবস্থাপক সভা ডাকতে বাধ্য হলেন প্রজার কাছ থেকে পয়সা আদায় করবার জন্য। প্রশ্ন উঠল এই যে, তিন দল আলাদা আলাদা না একত্রে ভোট দেবে। রাজার মতলব আলাদা, প্রজার মতলব একত্রে, ফলে ঘটল ফরাসী-বিপ্লব। সেই বিপ্লবে জমিদারের দল কেউ বা দেশ ছেড়ে চলে গেলেন, কেউ বা বাণিজ্যে মন দিলেন। সেই থেকে Separate representation of class-interests-এর পরমায়ু শেষ হল। বর্তমান কালে ইটালীর রাষ্ট্রীয় জীবনের ধারা ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের নকল বললে অত্যুক্তি হয় না।

১৮৫০ সাল থেকে প্রুসিয়া, সেক্সনি এবং অন্যান্য জার্মান Municipality-তে ভোটারগণ তাদের টেক্স দেবার ক্ষমতা অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হত। অষ্ট্রিয়াতে কিছুদিন আগে পর্যন্তও লোক সমাজকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হত —জমিদার, শহরবাসী ব্যবসায়ী, গ্রাম-সঙ্ঘ এবং জনসাধারণ। হাঙ্গ্রি দেশে Table of magnates-এ শুধু বড় লোকেরাই বসতে পেতেন। কিন্তু গত যুদ্ধের ধাক্কায় এই রাজ্যগুলো ধূলিসাৎ হয়েছে, নতুন শাসন-প্রণালী যা

অবলম্বিত হল তার বিশেষত্ব এই যে সমগ্র জাতিই হচ্ছে একটি সম্প্রদায়। বীরবলের মতে গত যুদ্ধে ব্যক্তিতন্ত্রের অগ্নি পরীক্ষা হয়েছে এবং তিনি ১৯১৪ সালে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন তা ফলেছে। ডিমোক্রাটিক জাতিরাই জয়যুক্ত হয়েছে, আর পরাজিত জাতিরা ডিমোক্রাসি অবলম্বন করেছে। তাঁর কথা যেকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তখন তাঁরই মতানুসারে যে সব জাতির জীবন ব্যক্তিতন্ত্রের উপর গঠিত তাদের ইতিহাস হতে রাজনীতির মূলতত্ত্বের সন্ধান নেওয়া উচিত— বিশেষত যখন বাকী য়ুরোপের জীবন তাদেরই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। তাহলে দেখা গেল যে, কি ইংলণ্ড কি ফ্রান্স কি ইটালী এমন কি জার্মাণী, অষ্ট্রিয়াতেও (রুশিয়ার কথা ছেড়ে দিয়ে) যেকালে এ রকম ঘরের ভিতর ঘর সৃষ্টি করা বোকামীর পরিচয় এবং জাতীয়তার সর্বনাশ-সাধক বলে পরিগণিত হয়েছে তখন বর্তমান ভারতে স্বায়ত্তশাসনের সূত্রপাতেই আমরা যে নির্বিবাদে Communal representation-এর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি এই প্রমাণ যে আমাদের মনে আজও দেশাত্মবোধের ঘোরতর অভাব রয়েছে। আমাদের দেশনায়কেরা দু'দলে একমত হয়ে আজ যে বিষবৃক্ষ রোপণ করলেন তাঁদের উত্তরাধিকারীদের তার মারাত্মক ফল ভোগ করতে অবশ্যই হবে।

৬.

তাহলে আমাদের এখন কি কর্তব্য? ভাগ্যক্রমে ভোটের ব্যবস্থা স্থির করে প্রাদেশিক লাট-সাহেবদের মত নিয়ে নতুন ধরনে সভা বসাতে এখনও এক বৎসর। ইতিমধ্যে দেশের দলপতিরা এই সত্য প্রচার করুন যে, মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে য়ুরোপ যখন Separate Communal representation জাতীয় ঐক্যের বিরোধী বলে ছেড়ে দিয়েছে তখন আমাদের দেশে য়ুরোপ এবং আমেরিকা যে-উপায়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে স্বদেশীয়তা রক্ষা করেছে সেই উপায়ই অবলম্বন করা সঙ্গত। য়ুরোপের সত্য আমাদের দেশে খাটবে বিশেষত যখন দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যবশতই হোক য়ুরোপের রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু ইংলণ্ডের শিষ্য হয়েই আমরাও রাজনীতির শিক্ষানবিশী করছি।

রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতির তিনটি বিভাগ আছে। প্রথমত যারা ভোট দেবে তারা এক দল। দ্বিতীয়ত যারা ব্যবস্থাপক সভার কার্য চালাবে তারা এক দল এবং যারা ভারী-দলের আনুকূল্যে সাধারণের মত লক্ষ্য করে রাজ্য—

শাসন করবেন অর্থাৎ Executive, তাঁরা হচ্ছেন তৃতীয় দল। কে কী রকম ভাবে ভোট দেবে, কী রকম ভাবে ব্যবস্থাপক সভা গড়া হচ্ছে এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যবস্থাপক সভার সম্বন্ধ কী হবে এই তিন বিষয়ের তথ্যের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ programme নিয়মিত এবং নিরূপিত হওয়া কর্তব্য।

প্রথমেই ভোটের কথা ধরা যাক। ভোট দেবার অধিকার সম্পত্তি-মূলক কিংবা মনুষ্যত্ব-মূলক, যে মূলকই হোক না ভোট দেবার রীতি সাধারণত দুই রকমের। প্রথমত প্রত্যেক জেলায় প্রতিনিধি স্থানীয় ভোটের দ্বারাই নির্বাচিত হবে— একেই বলে Scrutin d' arron dissement, ভাষান্তরে district system. দ্বিতীয়, প্রতিনিধি ঠিক করা হবে একটা সমগ্র প্রদেশের ভোট একত্র নিয়ে, এই প্রদেশের ভিতর অবশ্য অনেক জেলা আছে। যদি দশ জন প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা হয়, তাহলে প্রত্যেক ভোটারের হাতে একটা লিষ্ট থাকবে সেই লিষ্টে অন্তত দশ জনের নাম থাকবে, ভোটার তখন বিচার করে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমে গুণানুসারে প্রতিনিধি নির্বাচন করে দেবে। যিনি সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যা ভোট পাবেন তিনিই প্রথমে নির্বাচিত হবেন, এই রকমে পর পর দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি। একে বলে Scrutin de liste, ভাষান্তরে General ticket system. এই দু-পদ্ধতিরই দোষ-গুণ আছে এবং দুই পক্ষেই বড় বড় কৌন্সিলী দাঁড়িয়েছেন। ফরাসী দেশে Montesquieu, Mirabeau থেকে আরম্ভ করে Duguit পর্যন্ত; ইংলণ্ডে Lord Brougham থেকে Sidgwick, Balfour; জার্মাণীতে Bluntschli— এঁরা সকলেই বলেন যে জাতীয়-জীবনের সমস্ত প্রবাহগুলির অবাধ গতির পক্ষে district system ভালো, আবার Robespierre থেকে M. Goblet পর্যন্ত সকলেই Scrutin de liste-এর পক্ষপাতী। দু'দলেই যখন মহা মহারথী রয়েছেন তখন নিজেরাই আলোচনা করে দেখা যাক আমাদের পক্ষে কোন্‌টি ভাল। District method-এর বিপক্ষে এই যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, প্রথমত নির্বাচনের গণ্ডী ছোট হলে অনেক সময় অযোগ্য লোককে ভোট দিতে হয়। দেখা গেছে যে, যে-সব শহরে ward অনুসারে alderman বাছাই হয় সেখানে ঘুষের জোরে যোগ্যতা থই পায় না।

দ্বিতীয়ত এই সব অযোগ্য লোকেরা নিজেদের ছোট গণ্ডীর অতিরিক্ত কোন জাতীয় ভাবের ধারণা মনে পোষণ করতে অপারগ। ফ্রান্স এবং ইটালীর ইতিহাসে এই সত্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে— ইটালী বুঝে সুঝে district method ছেড়ে দিয়েছে। এই রীতিতে যে-সব Deputy পাঠান হয় তাঁরা

নিজেদের কেবলমাত্র জেলার প্রতিনিধি হিসেবেই দেখেন, সমগ্র দেশেরও যে তাঁরা প্রতিনিধি এ কথা তাঁরা মনে ভাবতেই পারেন না— সেইজন্য তাঁরা নিজের ভোটারদের খুশী করতে এত ব্যস্ত থাকেন যে দেশের রাজকার্য চালাবার কথা তাঁদের মনে থাকে না। Daudet তাঁর Numa Roumestan বইয়ে এঁদের দুর্দশার কথা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেছেন— কোথায় একটা বাজার বসাতে হবে, কোথায় কার ছেলের চাকরী করে দিতে হবে এই সব কাজ করতে করতে তিনি ভোটারদের বাজার-সরকারে পরিণত হন। District system-এ যে পরিমাণে তোষামুদী এবং ঘুষের প্রশ্রয় পায় তার তুলনা কুত্রাপি নেই।

তৃতীয়ত এই উপায়ে শাসকের দল ভোট অনুসারে যে স্থানের যত সংখ্যক প্রতিনিধি হওয়া উচিত তা অপেক্ষা নিজেদের মনোমত বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি হস্তগত করবার জন্য জেলাকে খেয়াল অনুসারে বিভাগ করেন।

এসব গেল বিপক্ষের কথা। স্বপক্ষের কথা হচ্ছে district system-য়ে প্রথমত ভোট দেওয়া সহজ হয়, প্রতিনিধি ভোটারদের পরিচিতের মধ্যে একজন এবং সেই পরিচয়ের জোরেই তিনি জেলার অভাব দূরীকরণে বেশি তৎপর থাকেন। দ্বিতীয়ত এ উপায়ে যাঁদের দল সংখ্যায় কম তাঁদের মতেরও যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া হয়। সাধারণতন্ত্রের দোষই এই যে মতের গুরুত্ব অনুসারে দলের ভারীত্ব নির্ধারিত হয় না। General ticket stystem অনুসারে যে-কোনও দল চালাকী করে সব প্রতিনিধিগুলিকেই হস্তগত করতে পারেন— সেইজন্য আমেরিকা ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই পদ্ধতি ত্যাগ করে district method গ্রহণ করেছেন। চতুর্থত Bradford সাহেবের মতে যে-কালে অশিক্ষিত ভোটারের পক্ষে সূক্ষ্মভাবে ভোটপ্রার্থীদের গুণ বিচার করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা অসম্ভব, জনসাধারণকে সেকালে party-guide-এর হাতে পড়তেই হবে; অতএব স্বাবলম্বনই শ্রেয়।

মোটামুটি এইত গেল যুক্তির কথা, দৃষ্টান্তের কথা তারপর। ফ্রান্স ১৭৯১ সালে Scrutin d' liste আরম্ভ করেন,ফলে দেশের তিনদল একমত হয়ে রাজার অত্যাচারের বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল, তারপর নেপোলিয়নের যুগে সব ওলট-পালট হয়ে গেল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তৃতীয় নেপোলিয়ন আবার এই ভোটের কৃপায় ফ্রান্সের সম্রাট হয়ে বসলেন কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ দেখে ফ্রান্স মনস্থির করলে যে Dictator-এর যুগ চলে গেছে, তাই ১৮৭৬ সাল থেকে রাজবংশের পুনরাগমন বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে Scrutin d' arrondissement পুনঃপ্রতিষ্ঠ

হল। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে, ফ্রান্সের ব্যবস্থাপক সভায় কী দেশাত্ম-জ্ঞান, কী ধর্ম-জ্ঞান সবই লোপ পাচ্ছে, তাই ছোট দলগুলিকে এক করে একটি স্থায়ী Republican দল গড়বার প্রয়াসে Scrutin d' liste-এর আশ্রয় পুনরায় গ্রহণ করা হল। কিন্তু Boulanger আবার যখন নূতন নেপোলিয়ন হতে চাইলেন তখন ১৮৮৯ সালে district method ফিরে এল। ফলে ফরাসী দেশের ব্যবস্থাপক সভার দুর্দশার কথা সকলেই অবগত, বিস্তর ছোট দলের উপদ্রবে বড় দলের স্থায়ীত্ব নেই, মন্ত্রীদলের পরমায়ু গড়পরতা ৮।।০ মাস এবং কোন কার্যেই তাঁরা নিজেদের দলের উপর নির্ভর করতে পারেন না—ব্যবস্থাপক সভা সে দেশে হয়ে উঠেছে একটা Debating club. ফ্রান্স নিজের দুরবস্থার কথা বোঝে কিন্তু পাছে আবার কেউ ভোটারদের ঠকিয়ে নেপোলিয়ন হয়ে বসে এই ভয় তার এখনও ঘোচে নি—শুধু তাই নয় ফ্রান্স বহুকাল থেকেই সুস্পষ্টভাবে জেলায় জেলায় বিভক্ত এবং জেলার শাসন-প্রণালী রাজ্যে সাধারণতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও অতিশয় centralised. তার উপর সে দেশে আছে—ল্যাটিন বুদ্ধির চিরন্তন symmetry-প্রিয়তা, এই সব কারণে এখনও ফ্রান্স district method-কে আঁকড়ে ধরে থাকতে বাধ্য। বর্তমান কালে ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ছাড়া ইটালী, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, পর্টুগাল, স্পেন, কোবে, জাপান, অনেক Swiss Cantons, আইসল্যাণ্ড, টেস্‌মেনিয়া, কুইন্সল্যাণ্ড ব্যতীত সমগ্র অষ্ট্রেলিয়া এই Scrutin d' liste মেনে নিয়েছে। সাধারণতন্ত্রের অনিবার্য দোষ এই যে, যে-সম্প্রদায় সংখ্যায় কম সে-সম্প্রদায় নিজের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন না। কিন্তু General ticket system অবলম্বন করার জন্য পূর্বোক্ত সব দেশেই তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

এখন যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দুই-ই দেখান গেল। আমার কথা এই যে district system-এর যে দোষগুলি য়ুরোপে দেশাত্মবোধ অত সুগভীর থাকা সত্ত্বেও প্রকট হয়েছে—যথা ছোট ছোট দলের মধ্যে জাতীয়তার অভাব, গণ্ডীর বাইরে যাবার অক্ষমতা—এগুলি ত ভারতবর্ষের সনাতন দোষ—তার উপর য়ুরোপ আমেরিকা যা পরিত্যাগ করেছে অর্থাৎ—communal representation, তাই আমরা যেচে নিলুম। কাজেই আমার মতে আমাদের general ticket system অবলম্বন করলে খানিকটা বাঁচাও, নচেত আমাদের ব্যবস্থাপক সভা একটা দলাদলীর আড্ডা হবে।

সবুজ পত্র, নবম সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ, ১৩২৬।

পত্র

সবুজ পত্র সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনি সবুজ পত্র আবার প্রকাশ করছেন শুনে সুখী হলুম। সবুজ পত্রের কাছে যুবক সম্প্রদায় সকলেই ঋণী, বিশেষ করে এই আমাদের ত্রিশ বছরের দল। যখন প্রথম সবুজ পত্র বের হল, তখন আমরা কলেজে প্রবেশ করছি, জ্ঞানের ভিখারী, বইয়ের পর বই পড়ি। কিন্তু সে সব বই ইংরেজী ভাষায় লিখিত হলেও এক নতুন ভাবে অনুপ্রাণিত। কোন-কিছুর তোয়াক্কা না রাখাই সে সব বইয়ের ভঙ্গী। আবার বয়সের ধর্মে আমাদের ভাবনাগুলিও তখন পাহাড়ের ঝরনার মতন প্রচলিত সংস্কারগুলিকে ডিঙ্গিয়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের ভাবধারার আদিতে যে শক্তিই থাক না কেন, তার শিরে ছিল ঘন কুয়াসা। সে কুয়াসা ভেদ করার শক্তি আমাদের ছিল না বলেই আমরা প্রত্যেকেই সেই ভাবধারার পাদদেশে এক কুসুমকানন রচনা করেছিলাম। আপনার দলের লেখা সে কুয়াসা নষ্ট করে দেয়, তাই সবুজ পত্রের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কুয়াসা দূর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখি যে, কুসুমকাননও নষ্ট হয়ে গেছে। প্রথমে এ অপচয়ে আমরা দুঃখিত হলুম। তারপর যখন বুঝলুম যে, ঝরনা নদীতে আশ্রয় নিয়েছে, আর সে নদী দেশের মাটিকে উর্বর করেছে, তখন এই বুঝে আর আনন্দের সীমা রইল না যে, স্বাধীনতার বেগ নিষ্কাম এবং উদ্দেশ্যবিহীন হলেও পরোক্ষভাবে উদ্দেশ্যপূর্ণ। রবি বাবু আমাদের সমাজকে অচলায়তন বলেছেন — সেটি বোধহয় অন্নের গড়া, তাই কি তাকে অসংস্কৃত মনের বেষ্টনও বলা যেতে পারে। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা মার্জিত বুদ্ধিরও একটা আবেষ্টন আছে— তাঁর বাঁধন আরো শক্ত, আরো অজানিতভাবে নিবিড়। আপনি এবং আপনার দল কোন উপদেশ না দিয়ে আমাদের ঐ কথাটি জানিয়ে দিয়েছেন বলে আমরা আজ খানিকটা মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে সমর্থ হয়েছি। বর্তমানে দেখছি যুবকদের মনে সমাজ-বন্ধন ও ইংরেজী বুলির দাসত্ববন্ধন ছাড়া রাজনৈতিক ভাবপ্রবণতার এক নূতন বন্ধন এসে পড়েছে। সমাজ-বন্ধন জীবনযাত্রার পক্ষে দরকারী, মনের কাছে নয়; ইংরেজী বুলির দাস হলে হয়ত নেতা হওয়া যায়, কিন্তু

মন স্বাধীন হয় না। ভাবপ্রবণতার সাহায্যে দেশকে নাড়া দেওয়া যায় শুনেছি। নাড়া দেওয়া এবং নড়ে যাওয়া, দুটি মানুষের পক্ষে চরম কথা নয়। গন্ধমাদনের জীবজন্তুরা হনুমানের কাঁধে নাড়া খেয়ে জেগে উঠে যে মানুষ হয়ে উঠেছিল, এ কথা রামায়ণে প্রকাশ নেই। স্বরাজ, ত্যাগ-ধর্ম, অহিংসা, অসহযোগ, দাস মনোভাব প্রভৃতি ধরতাই বুলির সাহায্যে মন কখনও মুক্ত হবে না। অতএব প্রায় ১৫ বছর আগে যে সমস্যা আমাদের ছিল, তা এখনও রয়েছে, বরং তার গুরুত্ব আরো বেড়ে গিয়েছে। সবুজ পত্র তখন সে সমস্যা-সমাধানে তৎপর হয়েছিল, এবং অন্তত জনকয়েকের পক্ষে সমাধান করেও ছিল— স্বাধীনতার অমৃত বণ্টন করে। আমরা আশা করছি সবুজ পত্র এখনও যুবকবৃন্দের মন থেকে কথার নেশা আবার ঘুচিয়ে দেবে।

আশাও করছি, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হচ্ছে যদি সবুজ পত্র "ভূর্জি" পত্রে পরিণত হয়ে থাকে। সেই জন্য আমরা প্রথম সংখ্যা পড়বার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছি। আপনাকে গোড়ায় বলে রাখা ভাল যে, নিম্নোক্ত লক্ষণ দুটি সবুজ পত্রে প্রকাশ পেলে, আমরা আপনাদের পত্রখানিকে অন্যান্য বাজে পত্রিকার সঙ্গে ওজন-দরে বাজারে ছেড়ে দেব।

(১) কী কাজ করতে হবে, তার প্রোগ্রাম তৈরিকরণ।

(২) সমাজ-মন, জাতীয়-মন, দলের মন বলে একটি নতুন পদার্থে বিশ্বাস করা এবং তাকে প্রশ্রয় দেওয়া।

কাজ আমরা না করে থাকতেই পারি না, কিন্তু কাজের চেয়ে কি মনোভাবে কাজ করি, সেইটেই আসল কথা— এই অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করেছি। অর্থাৎ মন তৈরি আগে দরকার। মন তৈরি হওয়ার মানে মনের ধর্ম বোঝা। সে ধর্ম হচ্ছে স্বাধীনতা। মনের ধর্ম বোঝার অর্থাৎ স্বাধীন হওয়ার গোড়ার কথা এবং উপায় হচ্ছে আলোচনা, বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্য। প্রবৃত্তিগুলি বুদ্ধিছাড়া নয়, যখনই জোর করে বুদ্ধিকে প্রবৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করি, তখনই আলোচনা abstraction-এ পরিণত হয়। বুদ্ধির সাথে প্রবৃত্তির সম্বন্ধ মানলেই আলোচনা কার্যকরী হয়। তথাকথিত শব্দ-বুদ্ধির সাহায্যে জোর প্রোগ্রাম তৈরি হয়, কাজ হয় না। মন শুধু তা'তে স্বপন্থা হারায় কথার কুয়াসার ভিতর। কথা এবং কার্যের অসহযোগ হয় তখনই, যখন পণ্ডিতী বুদ্ধির সাহায্যে কথা কর্মচ্যুত এবং কার্য বুদ্ধিচ্যুত হয়ে পড়ে। সেই জন্য সম্পাদক মহাশয়, আপনি দয়া করে পণ্ডিতী তর্কের প্রশ্রয় দেবেন না, এবং প্রোগ্রামসমূহকে দূরে পরিহার করবেন— এই আমাদের অনুরোধ। বছর

চারেক মাস্টারী করে দেখেছি যে, পণ্ডিতমূর্খ'ই ভারতের সব চেয়ে অপকারী জীব, এবং প্রোগ্রাম তৈরি করাই সব চেয়ে বৃথা কাজ। কারণ সেটা কাজও নয়, কথাও নয়। মুখে আমরা যাই বলি না কেন, এই মাস্টারদের এবং সমাজ-সংস্কারকদের ধারণা এই যে, দেশোন্নতি করা একটি ইমারৎ গড়ারই মতন কাজ, অর্থাৎ ইটের ওপর ইট সাজিয়ে যাওয়া, mechanics-এর নিয়ম অনুসারে। নিউটন সাহেব অনেক খাঁটি কথা বলে গিয়েছেন, সত্য। সভ্যতা যদি মনোরাজ্যের বস্তু হয়, তাহলে অবশ্য নিউটনের নিয়মগুলিকে খাটাবার চেষ্টা বৃথা। আমরা একটি মনের ওপর আর একটি মনের ভাব কী তা জানি নে, উন্নতি এবং অবনতি কী পদার্থ তা জানি নে, তবে তাদের লক্ষণগুলিকে চিনতে শিখেছি। যদিও আজকালকার মনোস্তত্ত্ব-বিদেরা সে লক্ষণগুলিকে অঙ্কের নিয়মে ফেলতে তৎপর হয়েছেন, তথাপি Behaviourism সম্বন্ধে যে কেউ পড়েছেন, তিনিই জানেন সে চেষ্টা কতদূর ফলবতী হয়েছে। অঙ্কের হাত থেকে সমাজতত্ত্ব উদ্ধার করা একটি মহৎ কাজ, এই আমার বিশ্বাস,— কেননা সব সময়ে হিসেব করা দরকারী কাজ হলেও, সেটি বেণে বুদ্ধির পরিচায়ক। সম্পাদক মশাই, শুনেছি আপনি বেণে বুদ্ধির বিরোধী, তাই আপনাকে প্রোগ্রাম না বাঁধতে অনুরোধ করছি।

আমার দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে, নতুন সবুজ পত্রের কোন ছত্রে যেন সমাজ-মন, জাতীয়-মন ইত্যাদি কথা না থাকে, এবং একমাত্র ব্যক্তিগত মন ছাড়া আর কোন মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস প্রকাশ না পায়। যখনই দেখেছি কি শুনেছি State কিংবা নেতারা লোকদিগকে উৎসাহিত করেছেন অতিমানুষিক মনের দোহাই দিয়ে, তখনই তার ফলে সাধারণ লোকেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে, হয় অন্য লোকের সঙ্গে, নয় নিজেদের দেশের ভিন্ন মতাবলম্বীর সঙ্গে। কোন সমষ্টির মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাসের পূর্বোক্ত কারণ ছাড়া আরো অন্য কারণ আছে। ও পদার্থ হয় যোগ নয় বিয়োগে তৈরি। মনের যোগবিয়োগ হয় না, জড় পদার্থেরই হয়। কেউ কেউ বলেন, একত্র থাকার ফলে একটি মন ও আর একটি মনের সংমিশ্রণে নতুন একটি মনের সৃষ্টি হয়। নতুন মনটিকে কিন্তু শাসকের দল ছাড়া আর কেউ চিনতে পারে না। পরের কাছে আত্ম-সমর্পণ করা মনের ধর্ম নয়, তবে জোর করে আত্মসমর্পণ করান শাসক-ধর্ম বটে। একত্র বাসে মন যে এক হয়ে যায় না, এ প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তিই জানেন। হয় যা, তার নাম একটি tradition। সেটি বাইরের জিনিস, তার ক্ষমতা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার মতনই কার্যকরী। এবং তার ফল নির্ভর

করে তার নিজের শক্তির উপর নয়, ব্যক্তির তা ব্যবহার করবার ইচ্ছা এবং ক্ষমতার উপর। সমাজ-মন বলে কোন পদার্থ নেই, যা আছে সেটি ব্যক্তির মনের মধ্যে একটি বিশ্বাসমাত্র। সে বিশ্বাস mechanical নিয়ম অনুসারে সৃষ্ট একটি analogy মাত্র। Analogy-কে সত্যের রূপ দিলে সত্যের অপমান করা হয়। সত্য হচ্ছে ব্যক্তি। আমি ইংরেজী ব্যক্তিতন্ত্রতার কথা বলছি না। সামাজিক মনের উপকারিতা মূর্খ ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু কেবল মূর্খরাই সমাজ-মনের অস্তিত্ব মানে। সমাজকে কেটে বেরুতে হবে ব্যক্তির, এই হচ্ছে আদত কথা।

সম্পাদক মশাই, পূর্বোক্ত কথাগুলি আপনারই পুরাতন সবুজ পত্রের কথা। আপনাকে আপনার কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তবে সাধারণে হয়ত সন্দেহ করতে পারে যে, পুরাতন সবুজ পত্রের সঙ্গে নতুন সবুজ পত্রের কোন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ নেই। যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মন্ত্র আপনাকে অসহযোগ আন্দোলনের বাইরে দাঁড় করিয়েছিল, সে মূলমন্ত্র আশা করি আজও সবুজ পত্রের শক্তি সঞ্চার করবে।

সবুজ পত্র, ভাদ্র, ১৩৩২

ডায়েরির পাতা

গত বৎসর বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে একটি শুভ দিন বোলে মনে হয়। রবিবাবুর প্রবাহিণী, পূরবী, শরৎবাবুর পথের দাবী, পরশুরামের গড্ডলিকা, নিয়ে সুরেশচন্দ্রের ঐন্দ্রজালিক, কেদারবাবুর চীনযাত্রী এবং শৈলজানন্দের অতসী যে কোন সাহিত্যের পসরা ওজনে ভারী হয়ে উঠতে পারে। এক বৎসরে এতগুলি ভাল বই বাহির হওয়াতে [?] আমার মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, বঙ্গ-সাহিত্যের ধারা রাজকীয় এবং সামাজিক আন্দোলনের চাপে লুপ্তপ্রায় হতে পারেনি। কিছু দিন পূর্বে একজন চীন-পরিব্রাজক ছাত্র সঙ্ঘের তরফ থেকে এদেশে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল। আমরা এত পলিটিক্‌স্ করছি দেখে শুনে আমাদের সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি বড় উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। আমরা অনেকেই তাঁর মত শুনে তাঁকে সন্দেহের চক্ষে দেখি। কিন্তু তিনি যেন আমাদের মনের ভাব বুঝেই যাবার সময় আমাদের বোলে গিয়েছিলেন। "বন্ধুগণ আমি কোন দলের গুপ্তচর নহি, আমি সভ্যতার অনুচর মাত্র। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টায় যেন সভ্যতা খুইয়ে বোসোনা, যেমন রুশিয়াতে বলশেভিকরা খুইয়েছে। অবশ্য, সভ্যতা সম্ভব হয়ে ওঠে একমাত্র স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে, তবে সে স্বাধীনতা মনের। অন্য কিছুর স্বাধীনতা হতে পারে না।" বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ করে গোষ্ঠী, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সঙ্গেই মানুষ যোগ-সূত্রে আবদ্ধ রয়েছে। এর মধ্যে আবার গোষ্ঠীর সম্বন্ধ সমাজ-বন্ধন অপেক্ষা এবং সমাজ-বন্ধন রাষ্ট্র-শাসন অপেক্ষা নিবিড়। সাহিত্য সর্বদেশেই স্বাধীনতার বাণী বহন কোরে আনে। সেইজন্য পিতা মাতা এবং অন্যান্য অভিভাবকের অমতে কাজ করা সব সাহিত্যের নবযুগের চিহ্ন বোলেই পরিলক্ষিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও ব্যক্তির বিরোধের কথা আসে। বাপ, মা, খুড়ী, পিসী-মাসীর মতের এবং সামাজিক আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই এ-যুগের মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে। যেমন, জীবনের সর্বপ্রধান বন্ধন বিবাহ, তেমনি সাহিত্যের প্রধান গ্রন্থী হচ্ছে অবৈধ প্রেম, কিম্বা নিজের মতে বিবাহ করা। সেই জন্য এ যুগের সাহিত্য অবৈধ প্রেমের কথায় ভরপুর। সব সাহিত্যিকের এক ডাক 'সমাজ ভেঙ্গে ফেল, ভেঙ্গে ফেলবার পর কি হবে আমরা জানিনা তবে এ সমাজে স্বাধীনতা

নেই।' স্বাধীনতা না থাকলে সাহিত্য হয় না, অথচ সাহিত্যে চাই। ভাঙবার পর ব্যক্তি স্বাধীন হবে। তখন সত্যকারের সাহিত্যের উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে— এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ বিচিত্র, যেমন এ সম্বন্ধ একঘেয়ে।

রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধের কথা সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যের বিষয় নয়, সে বিরোধ খবরের কাগজের খোরাক। স্পেন্সার সাহেব বোলেছেন তাও নাকি নয়। তবে খবরের কাগজে লেখা যে সাহিত্য-সৃষ্টি নয় সে কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এক জায়গায় রাষ্ট্র-বিরোধ সাহিত্যে স্থান পেতে পারে যেমন বিশেষ করে ম্যাক্সিম গর্কীর কম্‌রেড্ [মাদার] উপন্যাসে এবং সাধারণভাবে সমগ্র রুশ-সাহিত্যে। কিন্তু ঐ নভেলেও জেলে যাওয়া কিম্বা রাজকীয় আন্দোলন একটি প্রচ্ছদপট মাত্র, যার অন্তরালে নাটকের অভিনয় হচ্ছে সে অভিনয়ের বিষয় ব্যক্তিগত মনের ঘাত-প্রতিঘাত। যখন কমরেডের ভাল মানুষ মাটি পয়লা মের অত্যাচারে জাগ্রত হয়ে উঠলেন, তখন রক্ত আমাদের ধমনীতে নেচে উঠল, অমনি আমি কালি কলম নিয়ে বসে গেলাম, বাংলা দেশে বিপ্লব-কাহিনী লিখতে। আমাদের দেশের বিপ্লববাদীরা ত অনেকেই আত্ম-চরিত লিখেছেন, কই এক উপেনবাবু ছাড়া আর কেউ ত সাহিত্য-সৃষ্টি কোরতে পারলেন না! আর তিনিও যা উন-পঞ্চাশী প্রভৃতি কেতাব লিখেছেন, তাতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের চেয়ে নিজের দেশের লোকদের উপরই বেশী ঝালটা ঝেড়েছেন। অবশ্য এর মানে নয় যে, রাষ্ট্র কিম্বা সমাজ সাহিত্যের উপাদান নয়। গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র সবই মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে আসে— এইটিই দুঃখের কথা— সুখের কথা হচ্ছে গড়া, কিন্তু গড়বার পূর্বে ভাঙা চাই। প্রাণ প্রাণকে নষ্ট কোরতে পারে না, প্রাণের কাজ সৃষ্টি করা। প্রাণ জড়কেই নষ্ট করে। প্রাণ জড়কে প্রাণবন্তও কোরতে পারে না, শুধু আচ্ছন্নই কোরতে পারে। জড় অনুকূলও হতে পারে প্রতিকূলও হতে পারে। যেখানে প্রাণ আছে সেখানে সব জড়ই শেষে অনুকূল হতে বাধ্য, যেখানে প্রাণ নেই সেখানে কেবলই জড়। তবে প্রাণ নেই এমন সমাজ নেই। এইজন্য আমাদের সমাজেও বিরোধ আছে। সমাজ ও রাষ্ট্র জড়ের মতন। ব্যক্তি যেমন, সমাজ ও রাষ্ট্র তেমনি। ব্যক্তি প্রাণবান হলে সমাজ রাষ্ট্রকে ভেঙে চুরে অনুকূল কোরে নেবেই নেবে। তবে প্রাণের গঠন এবং সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য, ভাঙা গৌণ কার্য মাত্র। রাষ্ট্র সমাজ থেকে উদ্ভূত, নয় প্রত্যক্ষ ভাবে যেমন অন্য দেশে, নয় পরোক্ষ ভাবে যেমন আমাদের দেশে। আমাদের

দেশের যতদিন সমাজ প্রাণবন্ত ছিল, অর্থাৎ যখন আমাদের দেশের মানুষেরা মানুষ ছিলেন, যখন আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন সবই কিছু কিছু ছিল, তখন রাষ্ট্র নিয়ে মাথা ঘামাবার কারুর দরকার হয় নি। এখন আমাদের সমাজ পড়ে গিয়েছে, তাই রাষ্ট্রও বিদেশী হয়েছে। সমাজ ভেঙেছে বোলেই আমাদের দেশে পলিটিক্স শুধু বিরোধ-পন্থী এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই বোলেই সাহিত্য কেবল মাত্র সমাজ-বিদ্বেষী। সমাজ ভাঙলেই রাষ্ট্র ভাঙতে বাধ্য হবে, এই আশাই হচ্ছে সাহিত্যের সঙ্গে পলিটিক্সের সম্বন্ধ।

সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের ঠিক সম্বন্ধ যে কী তা এখনও পর্যন্ত কোন প্রবন্ধ-লেখক ঠাওর কোরে উঠতে পারেন নি। তবে অনেক সাহিত্যিক অজানিত ভাবে কোরেছেন— যেমন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঘরে-বাইরেতে। এ সম্বন্ধের, শুধু এ সমন্ধের কেন, অন্য কোন গভীর তথ্যের নিরূপণ ও সমাধান কোরতে হলে অজানিত ভাবে, অর্থাৎ সে দিকে নজর না দিয়েই কোরতে হয়। একমাত্র আর্টিষ্টই সকল সত্যের সন্ধান দিতে পারেন। তরুণ লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দই এ কার্যে কৃতিত্ব লাভ কোরেছেন, অন্য লেখকেরা হয়, সমাজ সংস্কার না হয় গভীর তথ্যের [?] সমাধান নিয়ে ব্যস্ত। শৈলজা বাবুর একমাত্র এবং ঐকান্তিক কার্য শুধু নক্সা কেটে যাওয়া। খুব গরীব কেরাণী জীবনের সুখ দুঃখ, কুলী, মুটে-মজুরদের জীবন-কাহিনী, না হয় বাঁকুড়া বীরভূম জেলার সমাজ-চিত্র তাঁর গল্পের যোগান দেয়। অবশ্য আমাদের সমাজের নিম্ন স্তরের জীবদের বিশেষ সংস্কার আবশ্যক, সে জন্য বড় বড় সমিতি মাথা ঘামাচ্ছেন, কিন্তু শৈলজাবাবু তাঁদের সংস্কারের দিকে কোন দৃষ্টি দেন নি। শুধু এক গভীর সহানুভূতি দ্বারা তিনি তাঁদের সজীব কোরে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর **ষোল আনা** গল্পের ষোল আনা মানে বীরভূম, বাঁকুড়া অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র পল্লীর সঙ্কীর্ণ, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাপন্ন ব্রাহ্মণ সমাজ। গল্পের আরম্ভে রুক্মিণীর কথা। রুক্মিণী শ্রীকান্তের দিদির মতন বিধবা অবস্থায় একজন পরপুরুষের সঙ্গে বসবাস কোরতে লাগল। গ্রামের হরি পণ্ডিত প্রায়শ্চিত্তের জন্য রুক্মিণীর কাছ থেকে একটি কচি পাঁঠা নিয়ে এলেন 'পলোয়া' খাবার জন্য। পয়সার অভাবে পলোয়া খিচুড়ীতে পরিণত হল। ভৈরবতলায় এক শীতের জ্যোৎস্নায় পংক্তিভোজন হল— সঙ্গে সঙ্গে রুক্মিণীর দোষক্ষালন এবং গল্প থেকে রুক্মিণীর মহাপ্রস্থান। যখন পাঁঠা সিদ্ধ হচ্ছে তখন জীবন চাটুয্যেকে 'ষোল আনা', অর্থাৎ গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ এক কথায় পতিত কোরে দিলেন। ঠিক সেই সময়ে জীবন চাটুয্যের ছোট ভাইঝি একটি থালা

হাতে কোরে এসে হাজির, তাকে কেউ ভাগ দিতে রাজি নয় দেখে জনার্দন নামে একটি নিষ্কর্মা ছেলে সকলের অলক্ষ্যে সেই মেয়েটিকে খানিকটা মাংস এবং খানিকটা খিচুড়ী দিয়ে সরিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে গল্পের নায়ক— ইহাকে নায়ক বোল্লে বেশী বলা হয়, গল্পের নায়ক হচ্ছে 'ষোল-আনা', অর্থাৎ গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজটি,—নিতাই ডাক্তার তাঁর টাট্টু ঘোড়াটিকে দূরে বেঁধে এসে পংক্তিতে বসে গিয়েছেন। আলুর চাট্‌নী এসেছে, এমন সময় সেই ঘোড়াটির পাশে একটি নোলক-পরা রেশমী র‍্যাপার জড়ানো মেয়ে এসে দাঁড়াল এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরলে। সকলে প্রশ্ন করল রাণী থালা এনেছে কি না। সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। জনার্দন তাকে প্রশ্ন করে টের পেলে যে তার মাতু পিসীর ভারী অসুখ, ডাক্তারকে এখুনি যেতে হবে—সেই সঙ্গে হরি পণ্ডিতকেও। এতদূর পর্যন্ত পড়ে আমাদের সন্দেহ হল যে, মাতুপিসী তার ভাইঝির হিল্লা করবার জন্য ডাকছে পাড়ার মাতব্বরদের। মাতব্বররা রাণীর বিবাহ দেবেন এক বুড়োর সঙ্গে, কিন্তু জনার্দন শেষকালে বিংশ শতাব্দীতেও নামের মহিমা প্রচার কোরবে। গল্পে কিন্তু অন্য রকম হয়ে গেল। অসুখ-বিসুখ কিছুই না, এ গুপ্ত অভিসন্ধি অবশ্য রাণীর বিবাহের জন্যই। তবে মাতুপিসী, বর এবং ঘটক দুই-ই নিজে হতে স্থির কোরেছেন—শুধু দিন স্থির করবার জন্য এই ডাকা। বর হচ্ছেন নিতাই ডাক্তার এবং ঘটক হচ্ছেন হরি পণ্ডিত। জনার্দন রাণীর সঙ্গে প্রেমে পড়ে তাকে নিয়ে কোথাও উধাও হল না দেখে আমার সমাজ-সংস্কারক অংশটি বড়ই হতাশ হয়ে পড়ল। এ-ধারে নিতাইয়ের ঘরে লক্ষ্মী বৌ ছেলেপুলে সমেত বিরাজমানা, কিন্তু কি হল নিতাই যে বড় কুলীন।

হরি পণ্ডিতকে দক্ষিণা দেওয়া হবে খানিকটা জমি এবং নিতাইকে পণ দেওয়া হবে পাঁচ কুড়ি টাকা। সব ঠিক হয়ে গেল। নিতাই ডাক্তার বোকা বৌটিকে ঠকিয়ে একদিন বিকেলে রোগী দেখার ছুতো করে রাণীকে বিবাহ কোরে এলেন। কিন্তু মাতুপিসী বোল্লেন, 'আগে রাণীকে পাটরাণী করা হোক্ তবে সব টাকা দেবো।' এই পণের টাকা দেওয়া হল না বলেই ষোল আনার সঙ্গে এত ঝগড়া। ভৈরবতলায় ঠিক হয়ে গেল যে 'কুশ পাথোল, কোরে রাণীকে ত্যাগ কোরতে হবে— রাণীর চারিত্রে দোষ দিলেই চলবে। এধারে মাতুপিসী কৈলাসী ঠাকুরণকে ঠিক্ কোরেছেন তুক্-তাক্ কোরতে। এই ঠাকুরণ ভূতসিদ্ধ। জনার্দনের এঁর ওপর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু কৈলাসী ঠাকুরণ পাঁচ কুড়ি টাকা চান ভূত নামাতে। এধারে হরিপণ্ডিত জীবন্ত স্ত্রীর

শ্রাদ্ধের জন্ম অনেক টাকা হেঁকেছেন নিতাই ডাক্তারের কাছে। নিতাই তাই ইতস্তত কোরছেন। মাতুপিসী ভেবে দেখলেন কৈলাসী ঠাকুরণকে টাকা দেওয়ার চেয়ে বেটী জামাইকে দেওয়াই ভাল। জনার্দন নিতাইকে ডেকে আনলে। মাতুপিসী তাড়াতাড়ি কৈলাসী ঠাকুরণের দেওয়া একটি হলুদ-মাখা স্তাকড়া রাণীর খোঁপায় গুঁজে দিল। এই স্তাকড়ার গুণ অনেক—কনে-বৌ-এর কাছে থাকলে জামাইকে ঘরে আসতে হয়।

এই ত গল্প। এর প্রত্যেক নায়ক-নায়িকাকে আমি চিনি, তবে তাঁদের বাড়ী কেবল বীরভূম নয়, বাংলা দেশের প্রত্যেক গ্রামে। গ্রামে যেমন মন নেই, দু-এক জনের চরিত্র আছে তেমনি এই পল্লী-চিত্রে নায়ক-নায়িকা সবই সংস্কারাবদ্ধ জীব। জনার্দন ব্যক্তিত্বের দোহাই দিয়ে রাণীকে নিয়ে পালাচ্ছে না— লক্ষ্মী-বৌ শুধু এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছিলো মাত্র, লক্ষ্মীকান্তের বৌ একবার না কি ঠাকুরের মানৎ কোরে ছেলের মা হতে আপত্তি কোরেছিল। জনার্দনের অগাধ বিশ্বাস কৈলাসী ঠাকুরাণের কেরামতীতে। একমাত্র স্বাধীন মানুষ রুক্মিণী। তাই সমস্ত বইখানির ভিতর মাত্র এক জায়গায় এই ধরণের অবান্তর কথা লিখে শৈলজাবাবু গল্পের মূল তথ্যটির উদ্‌ঘাটন কোরে দিচ্ছেন—"বেচারি জীবন ভট্‌চাজ মজলিসে যোগ দিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাকে পতিত করিবার কথাটা যে সম্প্রতি এই চাপে বন্ধ রহিল ইহা জানিয়া সানন্দে সে ভিন্ন গ্রামে পেটের ধান্দায় বাহির হইয়া গেছে। রুক্মিণীর সে সব ভয় ভাবনা কিছুই নাই— মজলিস্ ডাকিয়া গ্রামের জনসাধারণ তার মঙ্গলবিধান করিবার পূর্বেই নিজের অন্তর্নিগূঢ় সত্যের কল্যাণে সে সাধারণের নাগালের বাহিরে অসাধারণ মতই নিশ্চিত নির্ভাবনায় চুপ করিয়া বসিয়াছিল।" এই লাইন কয়টি ছাড়া আর কোন জায়গায় শৈলজাবাবু সমাজ সংস্কার সাধন করতে রাজী হন নি। এমন একটি প্রবল ইচ্ছার দমন করা বাহাদুরীর কথ নিশ্চয় কিন্তু আর্টিষ্টের পক্ষে এ সংযম শক্ত নয়, কেন না সমাজ-সংস্কারের প্রবৃত্তি সত্যকারের আর্টিষ্টের পক্ষে একটি অবান্তর কথা মাত্র। শৈলজাবাবুর গল্পটি উদ্দেশ্য বিহীন রূপ-সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এতই উদাসীন যে, লক্ষ্মী-বৌ অর্থাৎ নিতাই-এর প্রথম স্ত্রীকে ভাল মানুষ কোরে রাণীর সুখের পথ নিষ্কণ্টক কোরেছেন— অতএব রুক্মিণীর পন্থা যে বেশী সুখদায়ক তা বলবার অবকাশ পর্যন্ত আমাদের দেন নি। শৈলজাবাবুর সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে উদাসীনতা তাঁহাকে সাহিত্য হতে বিচ্যুত না কোরে, রূপ-সৃষ্টির জন্ম সংযম এবং সাধনশক্তি দিয়ে সাহায্য কোরেছে বোলতেই হবে।

গল্পটির শেষে মিলন বোলেই ইহা মিলনাত্মক নয়। গল্পটি সত্যকারের ট্রাজেডি। সকলেই ষোল আনাকে মেনে নিচ্ছে, ষোল আনার নিষ্ঠুর রূপ কারুর কাছে ধরা পড়ল না, রুক্মিণীও যে সে রূপ টের পেয়েছিল তা নয়, সে শুধু ষোল আনাকে নীরবে অগ্রাহ্য কোরেছিল। জনার্দন পর্যন্ত ষোল আনার অ-মানুষিকতা উপলব্ধি কোরতে পারেনি অথচ তার হৃদয় ছিল। (শৈলজা বাবুর বাহাদুরী এই খানেই যে, তিনি ষোল আনাকে অব্যয় কোরে তোলেন নি, যদিও ষোল আনা অর্থাৎ একটি সমষ্টি গল্পের নায়ক। এ সমষ্টির প্রত্যেক ব্যক্তিটি জীবন্ত এবং এক একটি মানুষ। সাহিত্যের বিষয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না। সমাজ যদি সাহিত্যের বিষয় হয় তাহলে সে সমাজ সমাজ-তত্ত্ববিদের নতুন সমষ্টি হবে না, কেবল মাত্র ব্যক্তির সমষ্টি হবে। অর্থাৎ সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ শুধু সেইখানে যেখানে সমাজ মানে জন কয়েক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ মাত্র।

চীন যাত্রী—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। আমরা তখন কলেজে পড়ি যখন 'কাশ্মীর কিঞ্চিৎ' বের হল। আমরা সব সন্দেহ করলুম বইখানি ললিতবাবুর লেখা। কিন্তু ললিতবাবু 'ভারত-বর্ষে' নিজেই যখন ঐ বইখানির সুখ্যাতি কোরলেন, তখন সব হতাশ হয়ে পড়লুম। এমন সময় কাশী থেকে এক বন্ধু চিঠি লিখলেন 'এখানে সাহিত্যাকাশে একটি নতুন তারা উঠেছে, তারাটি নিজের আনন্দে বেশ জ্বল জ্বল করে, আবার পরের দুঃখে মিটি মিটি চায়, কিন্তু সর্বদাই উজ্জ্বল। সে উজ্জ্বলতা কারোর ধার-করা নয়, আবার নিজের তেজে প্রখর নয়, তার আলো শান্ত, স্নিগ্ধ, করুণ, হাস্য-মধুর সরস। এক-কথায় এ তারার আলো বুড়ো দাদা মহাশয়ের ঘরের প্রদীপের মতন— যার তলায় নাতি নাতিনীদের বৈঠক বসে, উপকথার সৃষ্টি হয়, যার আভায় আবার সমবয়স্ক বৃদ্ধদের স্মৃতি মুখর হয়ে ওঠে।' আমি বন্ধুকে লিখে পাঠালুম, 'এ তারার নাম কি?' তিনি লিখলেন 'কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

কেদারবাবু সেই থেকে অলকা, ভারতবর্ষ, এবং উত্তরার পাতার মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে পরিচিত। সেদিন কানপুরে তাঁকে স্বচক্ষে দেখলাম। তাঁকে দেখে অনেকগুলি কথা মনে হল; সেই কথাগুলিই তাঁর পুস্তকের সমালোচনা। সাধারণত মানুষ দেখে তাঁর বইএর সমালোচনা করা আচার-বিগর্হিত বটে কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়।

দুই রকমের লেখক আছেন, এক ধরণের লেখকদের লেখা পড়লে মনে হয়

যেন এঁদের লেখা এঁদের জীবনের চেয়ে বড়। যেমন অস্কার ওয়াইল্‌ড, কিম্বা মাইকেল। আমি বড় মানে মহৎ বলছি না। আবার একদল আছেন যাঁদের লেখা পড়লেই মনে হয় যেন তাঁদের জীবন তাঁদের লেখার চেয়ে বড়, এই যেমন রামমোহন রায়, ব্যালজাক্, ভূদেববাবু প্রভৃতি। আর একদল আছেন যাঁদের লেখা এবং জীবন যেন এক হয়ে গেছে, যেমন শেলী, চণ্ডীদাস, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ। প্রথম দলের মূলমন্ত্র হচ্ছে প্রকাশেই আর্টের চরম সার্থকতা—তা যা-কিছুর প্রকাশই হোক্ না কেন, দ্বিতীয় দলের কথা হচ্ছে প্রকাশের বস্তু নিয়ে, তা যে রকম উপায়ই হোক্ না কেন। তৃতীয় দলেই কেবল মাত্র রূপ এবং সত্তার অঙ্গাঙ্গী মিলন দেখা যায়।

কেদারবাবুর লেখা ঐ দ্বিতীয় ধরণের। তিনি একবার চীনে গিয়েছিলেন মাত্র, সাহেবের তাড়ায়, এক সাহিত্যিক বন্ধু তাঁকে ধরে বোসলেন "এক ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে হবে।" তিনি নারাজ, কিন্তু বন্ধুও নাছোড়বান্দা, তাই তাঁকে লিখতে হল যা তা, অর্থাৎ সমুদ্রের বর্ণনা নয়, চীন দেশের সমাজতত্ত্ব নয়, দার্শনিক প্রবন্ধ নয়, যুদ্ধের বিবরণ নয়, বিদেশে কেরাণী জীবনের বিরহের কথা নয়, কেবল মাত্র জাহাজে যা মজলিস বসেছিল তারই একটি নিরাভরণ, অলঙ্কারশূন্য বিবরণ। কিন্তু লাভের মধ্যে হয়ে গেল সাহিত্য-রচনা। সেই জন্য এই বইখানি এত সরল এবং সুপাঠ্য হয়েছে, সমস্ত বইখানির ভেতর কোন প্রয়াসের আভাষ নেই। কৌতুকের মধ্যে কোন চমকপ্রদ ঠাট্টা নেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত এক রবি বাবুর বিচিত্রা ছাড়া, বীরবলের লাইব্রেরী ছাড়া কিম্বা অমৃতলালের স্কুলের বৈঠক ছাড়া অন্য কোন বৈঠকে স্বতঃস্ফূর্ত ইয়ারকি শুনি নি— যা বরাবর সাহিত্যের পাতায় উঠতে পারে। বইখানি সেই চীনাভিমুখী জাহাজের মতন একটি বৈঠক্ মাত্র।

এই বৈঠকে একজন বড় বাবু, একজন রসিক বাঁড়ুয্যে, একজন খেয়ালী মজুমদার এবং একজন Fool— যিনি ভাবেন গান জানি কিন্তু গান গাইতে পারেন না, যিনি ভাবেন নিজে ধূর্ত কিন্তু কথায় কথায় বোকামী ধরা পড়ে, যিনি একটি ঘোরতর স্ত্রৈণ এবং আশুরোষ। গড্ডলিকার রায় বাহাদুরের বংশীলোচনের আড্ডায় এর বেশী ছিল না। পরশুরামের লম্বকর্ণ এবং উদো মিশিয়ে কেদারবাবুর চাটুয্যে তৈরী হয়েছে। এ বৈঠকে কবিতা পাঠ হয়—"একটু হট্‌কে বৈঠো হরি" ধরণের, এখানকার গল্পগুলি হয়ত গুরুদাস বাবুর ভাল লাগত না, কিন্তু মর্ত্যের মানুষদের ভাল লাগে। এই সাধারণ মজা, ঠাট্টা আমাদের খুব পরিচিত। পরিচিতের আস্বাদ ভোগ করান শ্রেষ্ঠ রূপস্রষ্টা

না হতে পারে, কিন্তু সেটি বড়ই উপভোগ্য। বিলেতে বসে মোচার ঘণ্ট খাওয়ারই মতন। সেই জন্যে কেদারবাবুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর লেখার কদর বেশী করতে শিখেছি বোল্লে হয়ত ঘুস খেয়েছি স্বীকার করা হবে না, কেন না তাঁর লেখা পড়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল হয়ে ছিল, যেমন চাটুয্যে, মজুমদার এবং বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা এখনও বলবতী রয়েছে।

আর একটি কারণে চীনযাত্রীকে আমার বড় ভাল লেগেছে। সমুদ্র ভ্রমণের কথা উঠলেই আমরা কনরাড্ পিয়ারে লোটি এবং রবি বাবুর কথা মনে করি। সমুদ্রের সংস্পর্শে মানুষের দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, প্রমাণ রবি বাবুর পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী এবং জাপান যাত্রীর পত্র। আবার কাহারও মনে হয় মানুষের মহত্ত্বের কথা, শক্তির কথা, প্রকৃতির সঙ্গে তার লড়াইয়ের কথা, প্রমাণ কনরাডের সব বইগুলিতেই আছে। আবার লোটির বই পড়লে মনে হয় এই ভীষণ প্রকৃতির কাছে মানুষ কত ক্ষুদ্র। সেই জন্য লোটির নায়ক নায়িকা অত সাদাসিধা। পঞ্চভূতের মিলন স্পর্শে মনস্তত্ত্ব ঋজু হয়ে যায়। সহরে মন আকাশ, বাতাস, ঝড়, আলোর মধ্যে কূল হারিয়ে ফেলে। সেই জন্য জাহাজের নাবিক এত সরল হয়। কিন্তু ডাঙ্গায় মানুষের বিপদ এইখানে, সে তার পুঁটলির মধ্যে 'হাতে মাটির' মতনই ক্ষুদ্রতা, দৈনন্দিন জীবনের জীবনের নিরাপদ, নির্বিঘ্ন আশ্বাস এবং নিশ্চয়তা নিয়ে জাহাজে ওঠে। প্রকৃতির গম্ভীর আহ্বান তার কানে পৌঁছায় না, সেই জন্য ডাঙ্গার মানুষ সমুদ্রের মাঝে এত হাস্যজনক। কিন্তু এ হাসি হাসে অন্য লোকে, যিনি জাহাজের পিছনে দাঁড়িয়ে টাইফুন দেখেন, আকাশে বাতাসে আলোর খেলা দেখেন এবং প্রকৃতির মহান্ ভাব এবং মানুষের কূপমণ্ডুকত্বের মধ্যে বিরোধ উপলব্ধি কোরতে সক্ষম হন। এই লোকটি বৈঠকে থেকেও বৈঠকী নন্, ডাঙ্গার মানুষ হয়েও ক্ষুদ্র নন্ এবং চাকুরী করেও চাকর নন্। সেই জন্য এঁর লেখাটি অ-সাধারণ না হয়েও সাহিত্য হয়েছে।

ইঙ্গিত—শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী

পাঠকের সংখ্যা দেশে অধিক হলে সাহিত্যে দোষ-গুণ দুইই বর্তায়। দোষের মধ্যে এই যে সাহিত্যিক দেশের জন্য সূক্ষ্মতাকে বর্জন করতে বাধ্য হন, আবার গুণের মধ্যে এই যে, অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি গুনগ্রাহী পাঠকের সহানুভূতি পাবার সম্ভাবনা রূপকারের পক্ষে বেশি খাটে। জাপানে নাকি এককালে এই রকম রসগ্রাহী পাঠকের সংখ্যা অধিক

ছিল, সেইজন্য বোধ হয় অষ্টাদশ অক্ষরের হকবু কবিতায় এত অধিক আদর ছিল। ছোট কবিতা, ছোট গল্প, ছোট ছবি ভাল করে সৃষ্টি করতে হলে যেমন সেই সমস্ত ছোট আধারগুলি রসে ভরাট করে দিতে হয়, তেমনি সেই সব ছোট রূপসৃষ্টিকে উপভোগ করতে হলে এমন সংযম দরকার সেটি ডিমোক্রেসীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। সেইজন্য ইঙ্গিত আভাষ হচ্ছে—লাগলে তুক্, না লাগলে তাক্। কৃষ্ণদাস বাবুর পুস্তিকাখানি আমাদের তুক্ করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে গোটা কয়েক রচনা আমাদের কাছে বার বার পড়েও ভাল ঠেকল না— সেগুলিতে ভাব পুরাতন, বর্ণনা সনাতন বটে, কিন্তু রচনা মামুলী। ঘট পুরাতন, সমুদ্রের জল সনাতন, কিন্তু ঘটের মধ্যে দরিয়ার জল পুরতে হলে যাদুর সাহায্য নিতে হয়। বনমানুষের হাড় সব সময়েই ধাঁধা লাগাতে পারে না বটে, কিন্তু খবর পাওয়া গেল যে কৃষ্ণদাস বাবুর কাছে বনমানুষের হাড় আছে, এই যথেষ্ট।

উত্তরা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

বর্ত্তমান গদ্য সাহিত্যে তিনখানি ভাল বই

সম্পাদক মহাশয়,

কল্লোলের জন্য এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি পাঠিয়ে আমার ভয় হচ্ছে পাছে আপনারা আমাকে ভুল বোঝেন। সেইজন্য গোড়াতেই আপনাকে বোলে দিচ্ছি যে, আপনার পত্রিকার লেখকদের শক্তিকে আমি সত্যই শ্রদ্ধা করি। এবং যখন আপনাদের উপর কটূক্তি বর্ষণ হয়, তখন দুঃখিত না হয়ে থাকতে পারি না। এই প্রবন্ধে আমি কল্লোলের দল বোলতে কালি-কলমের লেখকদেরও ধরেছি—কেননা বাহ্যতঃ পত্রিকাদ্বয় ভিন্ন হলেও অন্তরে এক বোলেই বিশ্বাস করি, কারণ কল্লোলেরই জনকয়েক পূর্ব্বতন লেখক ওতে লিখ্‌ছেন। অবশ্য আমি এ কথা জানি যে, শৈলজা বাবু, প্রেমেন বাবু, যুবনাশ্ব প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের প্রতিভা এখনো শতদলের মতন বিকশিত হয়ে উঠে নি। তাঁরা ইতিমধ্যে যা লিখেছেন কেবলমাত্র তাই নিয়ে আমি সমালোচনা করেছি। তাঁদের আপাত-স্পষ্ট সাহিত্যকে আমি উচ্চদরের সাহিত্য বোলে মনে করি না। আপনাদের সাহস, দরদী প্রাণকে অন্য হিসাবে ভক্তি শ্রদ্ধা কোরলেও আপনাদের লেখাতে দরিদ্র-নারায়ণ-নামরূপী দেবতার দোহাই দিয়ে ব্যক্তিত্বের অবমাননা করা হচ্ছে বোলেই মনে করি। আমি শ্রদ্ধা সহকারে যা মনে করি তাই লিখেছি। আশা করি যে, আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আমার বক্তব্যটিকে ভাষায় দৈন্যের মধ্য দিয়েও ফুটিয়ে তুলবে এবং আমার ভরসা এই, যে-কালে আপনাদের সকল প্রকার দৈন্যের ওপর কৃপা এবং সহানুভূতি আছে, আমার ভাষার দৈন্যের সহিত সেটি নিশ্চয় থাকবে। ইতি

লক্ষ্ণৌ

২৮শে জুলাই, ১৯২৬ শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(১) ঐন্দ্রজালিক—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বর্ত্তমান সাহিত্য কথাটি নূতন-পঞ্জিকার মতনই একটি মাত্র যুগের জন্য বর্ত্তমান এবং ঠিক পরবর্ত্তী যুগের কাছে পুরাতন। বর্ত্তমানের অর্থ, ভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন। যারা ব্যবহারিক জগতে আইনষ্টাইনের মতকে পাগলামী বোলে অগ্রাহ্য করেন— অর্থাৎ যাবতীয় সাধারণ লোকে

বর্তমানের অর্থ কিন্তু পাঁজী এবং ঘড়ি ধরেই ঠিক করেন। এবং সকলে সাহিত্যের সঠিক সংজ্ঞা না দিতে সমর্থ হলেও আমাদের মধ্যে অনেকেরই তার নানারূপের সঙ্গে পরিচয় আছে, এবং কেউ কেউ কোন্‌টি সাহিত্য এবং কোন্‌টি নয় তাও স্পষ্ট কিম্বা অস্পষ্টভাবে আভাষ দিতে পারে না। কিন্তু বর্তমান এবং সাহিত্য এ দুইটি নিরীহ কথার সংযোগে এমন একটি গোলমেলে ভাবের সৃজন হয়েছে যা নিয়ে আমাদের মধ্যে পদে পদে মতদ্বৈধ হতে পারে। আমরা জানি ইদানীন্তন বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি এবং মণি বাবুর 'মুক্তার মুক্তি' ছাড়া অন্য কোন পাঠোপযোগী নাটক লিখিত হয় নি। কিন্তু অনেকে অনেক কারণে রবীন্দ্রনাথকে বর্তমানের পংক্তিতে স্থান দিতে গররাজী। প্রথমেই শান্তি-নিকেতনের ছাত্র এবং অধ্যক্ষ-বৃন্দকেই দোষী কোরতে হয়। এঁরা প্রতিবৎসর কবির জন্মতিথি-পূজা কোরে সাধারণের সম্মুখে তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান বয়সের অনাবশ্যক এবং হতাশপূর্ণ সন্ধানটি এনে উপস্থিত করেন। অতএব যাঁরা শান্তিনিকেতনের উৎসবগুলির মধ্য দিয়েই কবির সহিত পরিচিত তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। আর একদল সমালোচক আছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কবিতার এত ভক্ত যে, তাঁর নাটকগুলিকে রূপক আখ্যা দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁরা বলেন যে, অত বড় 'লিরিক' কবির পক্ষে নাট্যকারের আত্মবিস্মৃতি অসম্ভব। যেন কবিতা লিখতেও নিজের খানিকটা জোর কোরে বাদ দিতে হয় না, যেন নাটক লিখতে নিজের সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে হয়, যেন 'গৃহ-প্রবেশ', 'নটীর পূজা' শুধুই রূপক। যেন যা-কিছু বুঝতে হলে মাথা ঘামাতে হয় তাই নাটক নয় এবং যা-কিছু দেখ্‌লে কিম্বা পড়লে বুঝতেই হয় না, তাই শ্রেষ্ঠ নাটক! সে কথা যাক্‌। কিন্তু এই দুই দলের মত মানতে হলে বোলতে হবে যে, বর্তমান সাহিত্যে নাট্যের স্থান শূন্য। কিন্তু যিনি নটীর পূজা কিম্বা গৃহপ্রবেশ স্বচক্ষে পড়ে দেখেছেন তিনি এ কথা স্বীকার কোরবেন না— তা রবিবাবুর বয়স যতই হোক না। তবে বয়স সম্বন্ধে আপত্তি কালের এজলাসে যৌবনই পেশ করে। সে আপত্তি না শুনে উপায় নেই, কেননা যৌবন বড় না-ছোড়বান্দা এবং শুনেছি যে, বয়সে তাজার মধ্যে কাঁচা মনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কাঁচা মনের দ্বারাই নূতন কিছু সম্ভবে। নব নব রূপ-সৃষ্টির অদম্য তাড়নায় যদি কোন নবীন লেখক নিজ নিজ পন্থা কেটে যৌবন ভরে চলে যায় তখন সর্ব প্রথমে অতীতের লেখকরাই নিজেদের ধন্য বিবেচনা কোরবেন। অতীত বর্তমানের কাছে কৃতজ্ঞতার ভিখারী নয়। এবং বর্তমান কখনও কৃতঘ্ন হতে

পারে না! তবে মধ্যে মধ্যে দুই একজন প্রকাশ্যভাবে অতীতকে 'কলা দেখান' কিম্বা "আলমারীতে বন্ধ" কোরে রাখবার ভয় দেখান।

তবে ভরসা এই যে, তাঁরা সমাজ-সংস্কারক সাহিত্যিক্ নন্। অবশ্য ছদ্মবেশী সংস্কারকের সংখ্যা সাহিত্যিকদের ভিতর খুবই বেড়ে যাচ্ছে। ইঁহারা সব বয়সে নবীন, মনে এবং জ্ঞানে প্রবীণ। ইঁহাদের দেখে সন্দেহ হয়, বুঝি বা নবীনত্বের একমাত্র চিহ্ন মনের প্রাচীনত্ব। যুদ্ধের সময় বিষাক্ত গ্যাস শুঁকে অনেকের মাথা পাকবার আগে মুখ না হয় পাকতে পারে— কিন্তু বাংলা দেশে ত যুদ্ধ হয় নি, এখানে হিন্দু-মুসলমানেই মারামারি হয়। এবং সে মারামারির ফলে অন্তত যে একটি সাহিত্য রচনা হয়েছে সেখানে 'পল্টু' নামক একটি যুবক বৃদ্ধ গোঁসাইকে অভয় দান কোরছে, নিজের হাতে কর্তব্যটি সম্পন্ন কোরে। তবে যেমন আমাদের ঝগড়া ধার করা, তেমনি আমাদের মধ্যে নৈরাশ্য এবং হতাশ্বাসও নিজের নয়। যারা নিজের মূলধন না থাকা সত্ত্বেও সেন ব্রাদার্স এবং বুক কোম্পানীর মারফৎ বিদেশী এবং বিশেষ কোরে রুশ সাহিত্যের তর্জমা থেকে সাহিত্যিক উদ্দীপনা কর্জ কোরেই কারবার চালাতে ইচ্ছুক, তাঁদের কলম থেকে নিরাশ অবিশ্বাসের উচ্ছ্বাস ছাড়া অন্য কিছুই বাহির হবে না, কেননা নৈরাশ্য এবং অবিশ্বাসের মধ্যে একটি গা-ঢালা ভাব আছে যার জন্য কোন প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন কোরতেই হয় না এবং সহজেই ভাবপ্রবণ যুবক যুবতীর মধ্যে পসার করা যায়। কিম্বা যারা অ-সহযোগ আন্দোলনের সময় জীবিত থেকেই জীবনের সব শক্তি নিঃশেষ কোরে ফেলেছেন, তাঁরাও যে হা হতোস্মি ছাড়া আর কি লিখবেন ভেবে পাই না। জীবনে একটি জিনিষ প্রায়ই লক্ষ্য কোরেছি যে তাদের সত্যই প্রাণ ছিল, যারা সুস্থ অবস্থায় অত্যন্ত সতেজ ছিলেন তাঁরা প্রাণান্তেও, এমন কি যক্ষ্মা-রোগের মুমূর্ষ অবস্থাতেও প্রাণের আশা পরিত্যাগ করেন না, এবং কেবল দুর্বল প্রাণহীন ব্যক্তিরাই সহজে আত্মসমর্পণ করে। অনুকরণপ্রিয় দুর্বল লোকের সাহিত্যে অকালবার্দ্ধক্যের ছাপ থাকাই স্বাভাবিক। নূতনত্বের দাবীতে তাঁরা পুরাতন পদ্ধতিকে জীর্ণ বস্ত্রের মতনই পরিত্যাগ কোরেছেন কিন্তু মনের জড়তার জন্য পুরাতন সংস্কারগুলিকে এখনও মনের নিভৃত কন্দরে আঁকরে ধরে আছেন। দু'-চারটি সংস্কারের নাম করছি, যথা—সমাজ ঠিক কলের মতন অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে চলবে, সাধারণ মানবের জগৎ মিথ্যা বোলে অবতারের কিম্বা অতিমানবের জগৎ সত্য হবে, এবং আগামী গণ-তন্ত্রের গে সব মানুষ সমান দরেই মূল্যবান হবে। মনের সহিত মুখের কিম্বা

কলমের বৈষম্যকে সত্য বোলে চালাবার চেষ্টা করলে মুখে এবং মনে হতাশ হতেই হবে। অবশ্য আজকাল মুক্তি এবং স্বাধীনতার নামে অনেক পুরাতন আদর্শের মোহকে দূর করবার ভীষণ চেষ্টা যে হচ্ছে না তা নয়—কিন্তু চেষ্টা কোরছেন সেই সাহিত্যের ছদ্মবেশী সমাজ-সংস্কারক এবং অধ্যাপকের দল। তাঁরা আমাদের তাঁদের মনোমত সত্য এবং স্বাধীনতা দান কোরবেনই কোরবেন।

এই দানের পন্থাগুলি সব নূতন হতেই হবে— তা না হলে তাঁদের দানের কোন মূল্যই থাকে না। দানের মর্যাদা রক্ষা কোরতে গিয়ে সত্যের অঙ্গহানি প্রায়ই ঘটে। ব্যবহারিক জগতে হয় ত এরূপ ভাঙ্গা-চোরা সত্য নিয়ে কাজ চালান যায়। কিন্তু সুন্দরের জগতে নূতনত্বের কোন দাবীই রসভঙ্গ কিম্বা রূপভঙ্গের দোষ খণ্ডাতে পারে না!

অতএব বর্তমান বোলতে শুধু বয়স কিম্বা নতুনত্ব বোঝায় না! ধরতে গেলে বর্তমান একটি মনোভাব মাত্র। কাল-হিসাবে বর্তমান হচ্ছে সেই সময়, যার গর্ভে চির-নূতনের বীজ রোপিত হয়েছে কিম্বা অঙ্কুরিত হচ্ছে। মনোরম জগতে স্ত্রী-পুরুষের কার্য জীবজগতের কার্যের ঠিক উল্টো। সেই জন্য আমরা বর্তমানের প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে পুরুষ এবং অতীতকে স্ত্রী বোলে কল্পনা কোরলে বোধ হয় ভুল হবে না। উপমা ছেড়ে দিয়ে সোজা কথায় বলা যেতে পারে যে অতীতের পরিণতি এবং ভবিষ্যতের সৃজনী শক্তি আশা, ভরসা এবং রূপ নিয়ে যে সাহিত্য গড়ে উঠছে তার নাম বর্তমান সাহিত্য। অঙ্কের সাহায্যে বর্তমান নামক এক মুহূর্তকে কালস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কোরতে পারা যায়। কিন্তু বস্তুত কাল একটি অবিচ্ছিন্ন গতি, যেটি জ্যামিতির অন্য দুইটি সংজ্ঞার মতই যাবতীয় পরিবর্তনশীল বস্তুর আভ্যন্তরিক এবং পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধ নিরূপণ করে। ঠিক এই জন্যই আমরা বর্তমানে পুরাতনের প্রভাব লক্ষ্য করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে পুরাতনের প্রধান কাজ ভবিষ্যতের আশা বীজকে অঙ্কুরিত হবার সুযোগ দেওয়া। পুরাতন জীবনের কিম্বা জীবরূপের গতানুগতিকতা বজায় রাখা ছাড়া যদি বর্তমানের অন্য কিছু কৃতিত্ব থাকে তবেই বর্তমানের বিশেষ সার্থকতা· নচেৎ বর্তমান অতীতের শেষ মুহূর্ত ব্যতীত আর কিছু নয়, নচেৎ বর্তমান গণিতের সৃষ্ট একটি মুহূর্ত মাত্র প্রাণের আসরে অ-বাস্তব, অ-বাস্তর এবং নিরর্থক।

কিছুদিন পূর্বে আমি সুরেশচন্দ্রের 'ঐন্দ্রজালিক' পরশুরামের 'গড্ডালিকা' এবং শৈলজানন্দের 'অতসী' পড়ি। এইগুলি পড়ে আমার এই ধারণা হয়েছে

যে, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। বইগুলির প্রত্যেক খানিতে অতীতের ধারা লেখকের একটি না একটি বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলছে। সুরেশচন্দ্রের লেখার মধ্যে অরবিন্দ, রবীন্দ্র এবং প্রমথবাবুর চিন্তা ধারা বয়ে যাচ্ছে। আত্মাকে জীবনের কেন্দ্রস্থ করা যদি হিন্দুদর্শনের শ্রেষ্ঠ দান হয়, তা হলে সুরেশচন্দ্রকে হিন্দুমতে দার্শনিক বোলতেই হবে। কিন্তু সুরেশবাবু সাহিত্যিক, নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের মতন দার্শনিক কিম্বা মুখ্য জ্ঞানী নন। সেজন্য তিনি দর্শন কোরেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি তাঁর পাঠকের সম্মুখে প্রাণ এবং আত্মার গূঢ় সম্বন্ধ প্রকাশ কোরেছেন। শুনেছি বৈদান্তিক আত্মার কোন সম্বন্ধ মানে না— কিন্তু সুরেশবাবু বেদান্ত বিরোধী। তিনি শুষ্ক বৈরাগ্যের চিরশত্রু; তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলেন, "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" তিনি এক অদম্য ভোগী, 'মোহন বাঁশী বাজায় না বলে, 'গোকুলের' হিসাব-খাতার ভুল হয়। অন্তরে কোন্ দিব্য বস্তুর আবির্ভাবে কুৎসিতা ভিখারিণী ধীরে ধীরে বাহিরে অনিন্দ্য হয়ে উঠেছিল।' কিন্তু তাঁর ভোগ তামসিক নয়।

রাখাল বালক যুবরাজ হল সে পৃথিবী জয় করবে, তার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হবে, সে সব ছেড়ে রাখাল বালক কোথায় চলে গেল, কে জানে? রাজা কোপান্বিত হলেন, জ্যোতিষী তখন উত্তর দিলেন, 'রাজকন্যা ও রাজ-সিংহাসনে যার মন বাঁধল না সে প্রকৃতই পৃথিবী জয় কোরেছে'। বিরাট রাজকুমারীর মনোহরণ কোরতে পারলে না কাঞ্চীপতি, অযোধ্যাপতি, কোশলপতি, সক্ষম হল এক তরুণ যে 'মৌন কথায় বাসুক ভাল গোপনে' যাকে 'নেহারি যেন নেহারি তারে স্বপনে'। সুরেশবাবুর ভোগ ঐশ্বর্যকে ছাপিয়ে যায়, মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করে, তার সুন্দররূপ পূজা করে, তাকে মহাজীবনের মুক্তিপথ বোলে গ্রহণ করে, তাকেই মুক্তি মনে কোরে গতির আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। সুরেশবাবুর মুক্তিও জীবনকে লঙ্ঘন কোরে নয়, তাকে নিয়ে; গান্ধার রাজকুমারী পুরুষের জীবনকে তাচ্ছিল্য কোরে শাস্ত্র এবং শাস্ত্রালোচনায় মন বসালেন, স্বয়ম্বর সভায় রাজকুমারদের প্রত্যাখ্যান কোরলেন, নারী-জীবনের সার্থকতা উপলব্ধির জন্য, তারপর মা হতে চাইলেন, আবার স্বয়ম্বর সভা ডাক হল, কিন্তু এবার রাজকুমারবৃন্দ তাঁকেই প্রত্যাখ্যান কোরলেন। রাজ-কুমারী বিধাতা পুরুষকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, 'তবে কি নারীর স্বাধীনতা কি মুক্তি নেই?' বিধাতা পুরুষ বোল্লেন, 'কি কোরে থাকবে? আমিও বাঁধা।' সুরেশবাবুর প্রাণময় সাহিত্যে ঐকান্তিক মুক্তি

অসম্ভব, একের সহিত অন্য গ্রথিত। 'লাল চিঠি নীল চিঠি' দুইই, বিধাতার হস্তাক্ষর, এ দুয়েরই পূজা কোরতে হবে। এই দুয়ের মিলনই কল্যাণ।' এ মিলনের ঘটক প্রাণের অপ্রতিহত শক্তি, যে শক্তি বাহুবলের শক্তি নয়, আত্মবলের শক্তি, যে শক্তির সাহায্যে ব্রাহ্মণের শৃঙ্খল ফুলের মালায় পরিণত হয়েছিল, সে শক্তি জড়ের নয়, জড়ের শক্তিকে জয় করার নামই পরম আত্মহত্যা।' সে শক্তির আত্মার, এবং সে আত্ম শক্তির নাম মৃত সঞ্জীবনী। এ সব দর্শনের কথা বোলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সুরেশবাবুর সাহিত্য জ্ঞান লক্ষ্য কোরলে ভ্রম আপনা হতেই চলে যায়। আমাদের মনে সাধারণত এই ধারণা থাকে যে, দর্শনের কাজ মৃত্যু নিয়ে, মৃত্যু-ভয় থেকে মানুষকে রক্ষা কোরতে পারলেই সে কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল, এবং সাহিত্যের কাজ প্রাণ এবং জড় নিয়ে, প্রাণের সৃজনী শক্তিকে ভাষার সাহায্যে রূপ দেওয়া হলেই সাহিত্যের সার্থকতা হল। মোটামুটি হিসাবে এ ধারণা হয় ত ভুল নয়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে বলা যায় যে, আত্মার সঙ্গে প্রাণের এবং মনের সম্বন্ধ ঠিক ভাবে না ধরতে পারলে সাহিত্যিকের সকল চেষ্টা নিষ্ফল। 'বীরবল' সাহিত্যকে অ-কেজো বোলেই মনে করেন—কিন্তু প্রমথবাবুর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রচনা 'প্রাণের কথা'। কিন্তু সাধারণতঃ প্রমথবাবু মনোময় ক্ষেত্রেই বিরাজ করেন, তাঁর শ্রেষ্ঠদান আত্মার সঙ্গে মন এবং বুদ্ধির সম্বন্ধ স্থির করা। তাঁর বাণী এই যে, আত্ম-জ্ঞানী না হলে বুদ্ধির স্বাধীনতা লাভ হয় না। সুরেশবাবু কিন্তু মনোময় জগৎকে পরিহার কোরে চলেন—তাঁর খেলা প্রাণ নিয়ে; সেই জন্য তাঁর রচনার প্রধান গুণ গতিশীলতা, উচ্ছলতা। প্রাণ যেমন ভিন্ন ভিন্ন জড় প্রকৃতির মধ্য দিয়ে অত্যন্ত দুর্নিবার ভাবে ব'য়ে যায়, ঘুরে ফিরে আত্মার দিকে অগ্রসর হয়, বিচিত্র রূপ-সৃষ্টি কোরেও লহরীর মতন, মধ্যে মধ্যে শান্তরূপে দেখা দেখা দেয়, তেমনি সুরেশচন্দ্রের ভাষা উদ্দাম-রূপ তরঙ্গ তুলে দিলীপকুমারের কথায় 'আত্মীয়ীর মতন আত্মস্থ হয়'। বর্তমান সাহিত্যে এ ভাষার তুলনা নেই। সাহিত্য এবং দর্শনের অঙ্গাঙ্গী মিলনকে মূর্ত করা বড় শক্ত কাজ। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের পর সে কাজটি অত সুচারু-রূপে আমাদের সাহিত্যে আর কেউ সম্পন্ন কোরতে পারেন নি। সুরেশবাবু রূপ-জ্ঞান অ-সাধারণ, সেই জ্ঞানের দ্বারাই তিনি দর্শনকে রূপকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। দার্শনিকের কাছে হয় জগৎ আছে, না হয় নেই, সুরেশবাবুর কাছে জগৎ আছে, তবে আত্মার প্রাণময় রূপে, সেই রূপের একটি নাম রূপক।

(২) গড্ডালিকা

পরশুরামের 'গড্ডালিকা' সাহিত্যের গড্ডালিকা নয়। এখানেও অতীত নিজের কাজ কোরছে, তবে অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে। পরশুরামের লেখাতে তাঁর নিজত্বই অতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে বোলেই এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সাহিত্যে যথাস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। এত মধুর ঠাট্টা আমাদের সাহিত্যে এক রবীন্দ্রনাথ এবং অমৃতলাল ছাড়া আর কেউ করেন নি। সেইজন্যই বলি, লেখকের পরশুরাম ছদ্মনামটি উপযুক্ত হয় নি— তাঁর হাতে কুঠার কই? বিংশ শতাব্দীর পরশুরাম আদিম যুগের মানুষটির মতন জগৎকে নিঃক্ষত্রিয় করবার দুরাশা পোষণ করেন না। এক কথায়, এ যুগের পরশুরামের কোন গোঁড়ামী নেই এবং তিনি সমাজ-সংস্কারক মোটেই নন। এমন কি তিনি বোধ হয়, মানবের উন্নতি চান না— তাই তিনি যে রকম মানুষগুলি দেখেছেন ঠিক তাই এঁকেছেন। আমার বিশ্বাস যে, তিনি এই দোষেগুণে জড়িত মানুষদের অত্যন্ত স্নেহ করেন। লেখক এটর্ণী হলে ব্রহ্মচারী কিম্বা গাণ্ডেরীর বিপক্ষে হয় ত আদালতে সাক্ষ্য দিতেন না, তাঁর বাড়ীতে 'উদোর অসুখে কবিরাজ, নেপাল ডাক্তার, হাকিমকে এনে জড় কোরতেন, শিবুর জন্য হয় ত তিনি লুকিয়ে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত কোরতে রাজী আছেন। পরশুরামের পূর্ববর্তী হাস্য রসিক লেখকদের মধ্যে এক দীনবন্ধু ব্যতীত আর কেউ বোধ হয় এ সব কিছুই কোরতে রাজী হতেন না। চরিত্রের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি না থাকলে চরিত্রাঙ্কন নিখুঁত হয় না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই ঠিক, তার বেশী হলে, অর্থাৎ চরিত্রের সঙ্গে এক হয়ে গেলে হাস্য রসের অবতারণা করা অসম্ভব, বিশেষ কোরে যখন চরিত্রগুলি ভদ্ররূপী জুয়াচোর হয়। সত্যকারের শিল্পী ব্যতীত সাধারণ লোকের কাছে সামাজিক ধর্মজ্ঞান শিল্পজ্ঞানকে চেপে রাখে। ধর্মজ্ঞানী জুয়াচোরের মুখোষ খুলে দিতে শিল্পীকে আজ্ঞা করে, শিল্পী বাধা দিয়ে বলে 'ওটা মুখোষ নয়, ওটা স্বভাবেরই অঙ্গ।' নিমচাঁদের সঙ্গে বাস্তবজীবনে কোন পিতা তাঁর ছেলেকে মিশতে দিতে রাজী হতেন না, জগদম্বাকে আমরা হয় ত জলধরকে পরিত্যাগ করে কাশী-বাসিনী হতে উপদেশ দিতুম, আফিংখোর কমলাকান্তের সহিত প্রসন্ন গোয়ালিনীর সম্পর্ক নিয়ে সমাজে ঘোঁট বাধাতে কসুর করতুম না, নিতাইকে ব্রাহ্ম-সমাজ নিশ্চয়ই পরিত্যাগ কোরতেন, হলহলানন্দ স্বামীকে আমরা কেউ ঘরে ঢুকতেই দিতাম না— কিন্তু আমার বিশ্বাস, দীনবন্ধু নিমচাঁদ এবং জলধরকে, বঙ্কিম কমলাকান্ত কিম্বা বিদ্যাদিগ্‌গজকে, অমৃত বাবু নিতাই এবং

হলহলানন্দকে ব্যক্তিহিসাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা কোরতেন বোলেই সামাজিক ধর্মের অনুরোধ সত্ত্বেও তাদের ঘৃণা কোরতে পারতেন না। শিল্পীর এই ব্যক্তির উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা পরশুরামের যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, সেই জন্যই তিনি সাহসভরে তাঁর বৈঠকখানায় ব্রহ্মচারী, গাণ্ডেরীলাল, ডাক্তার কবিরাজ, হাকিমকে নিমন্ত্রণ কোরে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ কোরে আমরা অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছি। জুয়াচোর এবং ঠকের দল, এমন কি ভূত পেত্নী সম্প্রদায় যে এত বৈঠকী লোক হতে পারেন তা ধারণাই ছিল না। *'রসিক-দা' এদের পেলে 'চন্দ্রবাবুকে' বোলে 'চিরকুমার* সভা'য় ভর্তি কোরে দিতেন। আমরা শপথ কোরে বোলতে পারি, এবং চন্দ্রবাবু মারা গেলেই শিবুকে ভূষণ্ডীর মাঠ ত্যাগ কোরে উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ কোরতে হত। যাই হোক্, কিন্তু সব চেয়ে আনন্দ পেয়েছি বৈঠকখানায় গৃহ-কর্তার সঙ্গে আলাপ কোরে। 'খাসদখলে' 'লোকেন' বড় নিরীহ লোক, কিন্তু তিনি তথাকথিত শিক্ষিত মহিলার স্বামীত্বের প্রতীক মাত্র; এক অক্ষয় ইয়ার লোক, কিন্তু গোপনে তাঁকে আমরা ভয় করি, তাঁর ঠাট্টার হাত থেকে তাঁর শাশুড়ী পর্যন্ত পার পান না, স্ত্রী এবং শ্যালিকাদ্বয়ের কথা দূরে থাকুক, রসিক-দাই এক তার সঙ্গে যুঝতে পারেন, আর পূর্ণ, বিপিন প্রভৃতি সভ্যগণ কুলীন সন্তানদের মতনই তাঁর হাতে ক্রীড়া পুত্তলি। তিনি সকলকে নাচাচ্ছেন, বিপদে ফেলছেন, বাঁচাচ্ছেন; মাত্র একবার তিনি তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লেখায় ফুরসৎ পান নি। কিন্তু তাঁর মতন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে পত্র লেখার সময় বার করা অসম্ভব ছিল বোলে মনে হয় না। আর রসিকদাকে এক শীতের রাত্রে রাস্তায় বার করা ছাড়া বিপদে ফেলবার ক্ষমতা কার আছে? কিন্তু রায় বাহাদুর বংশীলোচন কিম্বা নন্দবাবু অত্যন্ত সাধাসিধে মানুষ, ইহারা সকলেরই কাছে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। তাতে অবশ্য ইহারা ক্ষুব্ধ নন; পৃথিবীতে বাস কোরতে গেলেই দু'চার বার ঠক্‌তে হবে এই বিশ্বাসে তাঁরা জীবনযাত্রা অতি সুচারুভাবেই নির্বাহ করেন। সংসারের মধ্যে পাঁকাল মাছ হয়ে থাকতে পরমহংসদেব উপদেশ দিতেন। পরশুরাম আমাদের বোলেছেন, যদি ফুর্তি চাও তা হলে এই নন্দবাবু, বংশীবাবুর মতন বিপদে পড়, সংসারী হয়েও বৈঠকী হও। নন্দবাবুর বাড়ীতে আড্ডা ভাঙল লেডী ডাক্তারের সঙ্গে বিবাহের পর, এবং বংশীবাবু লম্বকর্ণের জন্য বাইরের ঘরে রাত্রিযাপন করেছিলেন।

নন্দবাবু কিম্বা বংশীলোচনের চোখ দিয়ে সংসারকে দেখলেই বোধ হয়,

স্নিগ্ধহাস্য মধুর শান্তি পাওয়া যায়—তা না হলে 'মহাবিদ্যা' নামক নক্সাটি জমে নি কেন? মানুষের বদলে সামাজিক দোষগুণের প্রতীক অবলম্বন কোরলে সাহিত্যরস অত্যন্ত উগ্র হয়ে ওঠে, মতামত বড় অনুদার হয় এবং গল্প জমে না, এই যেমন আজকালের দারিদ্রনারায়ণের সাহিত্যিক পুরোহিতদের লেখাতে প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁদের লেখার হাসি নেই, কেননা তাঁদের মতের ঔদার্য নেই, তাঁরা সকলেই সমাজ সংস্কারক। আমার বিশ্বাস যে প্রেমেন মিত্র এবং যুবনাশ্ব ও তাঁদের সমপন্থী লেখকদের মতন গোঁড়া ধর্ম-পরায়ণ জীব ব্রাহ্মণ সভার বাহিরে আর নেই। তাঁরা হয় ত উত্তর দেবেন, এ পাপের এবং অন্যায়ের জগতে হাসির স্থান কোথায়? আমি বলি আছে বটে, তবে পাপ কিম্বা অন্যায়ের মধ্যে নয়, পাপী অন্যায়কারী এমন কি প্রপীড়িতদের মধ্যেই আছে। ভিকৃটর হুগো এক জায়গায় বোলেছেন, মঙ্গলময় কখনও হাসতে জানেন না। কিন্তু মানুষে জানে ত? তবে ধর্ম-গোঁড়ারা নয়! কারণ, তাঁরা মানুষ নন তাঁরা দেবতা। এবং দেবতা শাস্ত্র ছাড়া সাহিত্য লেখেন না।

(৩) শৈলজানন্দের অতসী

যেমন সুরেশ বাবু এবং পরশুরামের লেখার মধ্যে তাঁদের নিজস্বটুকু অতীতের দানের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, তেমনি শৈলজানন্দ বাবুর অতসী নামক ছোট গল্পের বই-এ শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র, চারুচন্দ্র-এর প্রভাব ব্যতীত এমন একটি বস্তু আছে যেটি বাস্তবিকই উপাদেয়। রচনা-পদ্ধতি বাদ দিলেও শৈলজা বাবুর গল্প তাঁর পূর্ববর্তী লেখকের গল্প হতে ভিন্ন! রবিবাবু প্রভাতবাবু প্রভৃতির নায়ক নায়িকা সবই অবস্থাপন্ন, শরৎবাবুর বৈরাগী সম্প্রদায়ও ক্ষুধাতুর নয়। শৈলজাবাবুর পাত্রপাত্রী অত্যন্ত গরীব গৃহস্থ, 'মেস্'-শাবকের দল, কুলী, মুটেমজুর, বস্তীর অধিবাসী কিম্বা বাঁকুড়া বীরভূম জেলার গ্রামবাসী। এই বিষয় সম্বন্ধীয় পার্থক্যের কারণ অনেকে এই ঠিক করেন যে, শৈলজাবাবুর মতন তাঁরা কেউ সংসারের দুঃখ দৈন্যের সহিত চাক্ষুষ ভাবে পরিচিত নন। অবশ্য এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না যে, পরিচয়ের অভাবে কিম্বা আত্ম-মর্যাদাবশতঃ তাঁরা কোন অবস্থার কল্পনা কোরতে পারেন না। কিম্বা কল্পনার সাহায্যে কোন ভিখারী লিখিত রচনা অপেক্ষা ভিখারী কিম্বা বুভুক্ষুদের নিয়ে উচ্চদরের সাহিত্য রচনা কোরতে পারেন না। তা যদি না পারেন তা হলে তাঁরা অত বড় সাহিত্যিক হতেই পারতেন না। এখানে লেখকের চরিত্রগত ঝোঁক কি তিনি আদর্শবাদী কিম্বা বস্তুতান্ত্রিক, এ রকম প্রশ্ন উঠতেই পারে

না। বস্তুতঃ মানুষকে মুসলমান কিম্বা অমুসলমানের মতনই বস্তুতান্ত্রিক কিম্বা আদর্শবাদীর খোপরে রাখা যায় না। এবং এক চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের কিম্বা ঘটনাবলীর ঘাত প্রতিঘাতকেও ও-রকম ভাবে ভাগ করা যায় না। তাই যদি করা যেত তা হলে ইয়ুং-এর 'সাইকলিজিকাল টাইপস' বইখানি সাহিত্য জগতের অতুলনীয় কীর্তি বোলে পরিগণিত হত। ভাগ করা হচ্ছে মনোবিজ্ঞানের কথা সাহিত্যের কথা মন নিয়ে। এখন আমার বিশ্বাস যে রবিবাবু, শরৎবাবু কিম্বা প্রভাতবাবু দারিদ্র্যের ছবি আঁকেন নি এবং কল্লোলের দল যে তাই আঁকতে ব্যস্ত হয়েছেন এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, রবিবাবু, শরৎবাবু এবং প্রভাতবাবু গল্পে মানুষই এঁকেছেন এবং মানুষ-চরিত্র ফোটাতে গিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যেমন দারিদ্র্য কিম্বা অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি যেমন কামের তাড়নাকে যতটুকু প্রাধান্য দেওয়া দরকার তাই দিয়েছেন। সাহিত্যে এমন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই যে একটি সমগ্র মানুষকে রূপ দিতে গেলে তাকে দারিদ্র্য কিম্বা কামের ভিতর দিয়েই দেখাতে হবে। এখানে হয়ত আপত্তি উঠতে পারে যে, মানুষের স্বভাব আমরা অ-স্বাভাবিক অবস্থায় কিম্বা ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার মধ্য দিয়েই বেশী উপলব্ধি করি। কথাটা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান কিম্বা সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুবিধার কথা, কেন না ব্যক্তির এবং সমাজের স্বভাব কিম্বা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা একেবারে অমনোযোগী অজ্ঞ এবং সেই জন্য আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হতে পারে। আমরা দুঃখ কিম্বা রোগের কথাই মনে রাখি। স্বভাব একপ্রকার আবহাওয়ারই মতন। কিন্তু বিজ্ঞানে যে কথা খাটে, সাহিত্যে তা খাটে না। কেননা বিজ্ঞান এই মাত্র বোলতে পারে যে, একটি মানুষ টুকরো টুকরো মানসিক অবস্থার সমষ্টিমাত্র। এমন কি মানবের ব্যক্তিত্বও মনোবিজ্ঞানের মতে এক নয়—বহু। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তির আভাষ দেওয়া হয়, তা হলে দুঃখ দারিদ্র্যরূপ যে-কোন অবস্থার বর্ণনাতেই সাহিত্য সৃষ্টি হবে না। তবে যদি দারিদ্র্য কিম্বা অন্য কোন রিপুর তাড়নায় মানুষ কি রকম ব্যবহার করে দেখানই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয় তা হলে ব্যক্তির কোন ধার না রাখলেও চলে। কেননা রিপু কিম্বা প্রবৃত্তিগুলি বড় সরল এবং সাধারণ উপায়ে কাজ করে। তাদের ব্যবহারের বিভিন্নতা, পারিপার্শ্বিক এবং সামাজিক অবস্থাভেদেই হয়। যদি ধরা যায় যে, সাহিত্যের বিষয় দুই-ই, তা হলেও স্বীকার কোরতে হবে যে, বর্ণনাচাতুর্য অপেক্ষা ব্যক্তি-চরিত্র সৃজন উচ্চতর দক্ষতা। অবস্থার বর্ণনা কিম্বা প্রবৃত্তির বাহ্যিক ব্যবহারের বর্ণনা কোরতে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান

কিম্বা সামাজিক ইতিহাস এবং নূতন ধরণের ভূগোল বৃত্তান্ত জানলেই হয়। কিন্তু এ সব অন্তত কিছু কিছু জেনেও যে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয় না তা আমি নিজের লেখা দেখেই টের পেয়েছি। কল্লোলের অনেক লেখকদেরও বোধ হয় ঐ এক দোষ, তবে তাঁরা হ্যাভ্‌লক এলিস, এলেন কাই এর পুস্তকে যা পড়েছেন কিম্বা স্বচক্ষে প্রবৃত্তির আচার ব্যবহার যা লক্ষ্য করেছেন তা বেশ সাহস ভরে প্রকাশ কোরতে পারেন। তাঁদের অনেকেরই লেখার ক্ষমতা আছে, তাঁদের শক্তি এবং সাহসকে তারিফ না করে থাকা যায় না।

ব্যাপারখানা একটু বিশদ কোরে বলা যাক্। সাধারণ ওস্তাদদের গান গাহিবার পদ্ধতি, ধরা যাক সাহানা দেবীর পদ্ধতি, অর্থাৎ রবিবাবুর এবং দিলীপকুমারের পদ্ধতি হতে ভিন্ন। ওস্তাদের গান আমাদের ভাল লাগে না, সাহানা দেবীর গান আমাদের ভাল লাগে। এর কারণ কি? প্রধান কারণ আমার এই বোলে মনে হয় যে, সঙ্গীত ওস্তাদের গলার এমন অবস্থায় এসে উপস্থিত হয় যখন আর সেটি গান থাকে না। যদি ওস্তাদ কি উপায়ে গলা তৈরী কোরেছেন কি রকম কঠোর ব্রত অবলম্বন কোরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মীড় নাদ গমক সেধে অত বড় অতুলনীয় কলাবিৎ হয়েছেন দেখাতেই ব্যস্ত হন তখন আমাদের ধৈর্যচ্যুতি হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা আমরা কলাবিদের কাছে কলাভ্যাসের ইতিহাস চাই না। রূপ-সৃষ্টিরূপ একমাত্র উদ্দেশ্য সাধনই তাঁর কাছে আশা করি। সে সাধনের প্রক্রিয়া তাঁরই গোপনীয় জিনিষ, গুপ্ত ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করা আর্টিষ্টের কাজ নয়। তেমনি আজকাল অনেক ছবি দেখা যায়, যেখানে তুলির প্রথম আঁচড় থেকে শেষ পর্যন্ত সব দৈহিক প্রক্রিয়াই চোখের সামনে ফুটে ওঠে। অথচ ভাল ছবি কখনও কোন গল্পের ও তুলির বর্ণনা হবে না এ কথাই সত্য বোলে অনেকে মনে করেন। তেমনি যদি একটি বৃহৎ অট্টালিকার গায়ে ভিত্তি স্থাপকের মাহাত্ম্য কীর্তন লেখা থাকে, কিম্বা কোন্ পাথরের কত দাম, কোথায় পাওয়া যায় প্রভৃতি ইতিহাস ভূগোল লেখা থাকে তা হলে ইটালীতে গিয়ে মার্ক টোয়েনের এবং তাজমহল দেখে আলডুস হাক্সলী সাহেবের মত দুর্দশা আমাদের হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব রূপকারের কাছে আমরা একটি সমগ্র অখণ্ড সম্পূর্ণ বস্তু কিম্বা তারই আভাষ চাই এবং আর্ট হিসাবে সেই সমগ্রতা এবং পূর্ণতাকে আভাষে দেবার ক্ষমতাকেই মূল্য দিই। কিন্তু সমালোচনার জন্য নিজে বোঝবার কিম্বা পরকে বোঝবার জন্য সেই সমগ্রতার জন্মকোষ্ঠী খুঁজি।

পূর্বেই বলেছি যে, লেখকের চরিত্রগত ঝোঁক তাঁর লেখাকে বস্তুতন্ত্র কিম্বা

আদর্শের দিকে নিয়ে যাবে এ রকম প্রশ্ন সাহিত্যের প্রশ্ন নয়, মনোবিজ্ঞান কিম্বা ইতিহাসের প্রশ্ন। কিন্তু অনেকেই সাহিত্যে এই প্রশ্ন তোলেন—সাহিত্যের ভিত্তি কতখানি অভিজ্ঞতা, কতখানি কল্পনা? পূর্বে আমি কল্পনার ওপরই জোর দিয়েছি। এখন ধরা যাক যে, সাহিত্য শুধু অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর কোরছে অতএব নানা উপায়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বর্ণনাই সাহিত্য। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে, আর্টিষ্টের অভিজ্ঞতা সাধারণের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা অধিক নির্বাচিত গভীর অথচ বিচিত্র ইত্যাদি। অবশ্য এ ছাড়া প্রকাশের পার্থক্য ত আছেই। যখন অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিত্তি বোলে মেনে নিয়েছি তখন মনোবিজ্ঞানকে আনতে হবে। মনোবিজ্ঞানের মতে অভিজ্ঞতা স্বরূপ এক, ভিন্ন নয়। অভিজ্ঞতা একটি মাত্র প্রবৃত্তির আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হয় না, এক প্রবৃত্তি অন্য প্রবৃত্তির সাথে মিলিত হয়ে কাজ করে। কখনও কখনও একটি প্রবৃত্তি অন্যকে সাহায্য করে, কখনও বা চেপে রেখে দেয়, কখনও বা বদলে দেয়, কখনও খণ্ডন করে। প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি অত্যন্ত সাধারণ। কিন্তু প্রবৃত্তির কার্য চিরন্তন ভাবে সত্য নয়। একের অধিক কিম্বা একটি প্রবৃত্তির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তি যুক্ত হয়ে একটি অনুভূতি সৃষ্ট হয়। একটি অনুভূতির সঙ্গে অন্য অনুভূতির সংমিশ্রণে এক একটি প্যাটার্ণ কিম্বা ছক তৈরী হয়, যে ছক অভিজ্ঞতার মানসিক ভিত্তি। অতএব অভিজ্ঞতার আদিতে জীব-প্রবৃত্তি, তার ওপর হৃদয় বৃত্তি এবং চারিধারে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় একটি বিশেষ গণ্ডী। এই সব মিলিয়ে যে ছক তৈরী হয় তার ঐক্যই প্রথমে আমরা অনুভব করি, বিশ্লেষণ করি পরে। পরে সেই ছকটি অন্য ছকের সহিত মিলে মিশে কিম্বা দ্বন্দ্ব কোরেই কাজ করে। শিল্পী যখন সৃজন করে তখন কোন্ ছকটির অধীনে সে কাজ করবে তাই নির্বাচন কোরতে হবে, তাকেই মূল্য দিতে হয়। এই তুলনাই শক্ত কাজ! এখন প্রত্যেক ছকটি একান্ত নয়, কিন্তু এক একটি জীব-প্রবৃত্তি কিম্বা হৃদয়-বৃত্তি অপেক্ষা কম একদেশদর্শী এবং বেশী স্থায়ী। যেমন পুস্তকের ষোলখানি ভিন্ন পাতা নিয়ে নিয়ে মাত্র এক ফর্মা তৈরী হল। কিন্তু বিজ্ঞানের দৌড় ঐ পর্যন্ত, ঐ সমস্ত খণ্ড অথচ অপেক্ষাকৃত সমগ্র ছকগুলি একসূত্রে গ্রথিত করে কোন্ শক্তি? বার্গসনের ভাষায় তার নাম অবোধ্য জীবনীশক্তি। সমালোচকের কাছে অবোধ্য জিনিষটি দুর্বোধ্য এবং সমালোচনা বুদ্ধির অবমাননা ছাড়া আর কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এ শক্তির নাম ব্যক্তিত্ব (ইংরাজী ভাষায় যার নাম পারসনালিটি), অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির সূক্ষ্মপুরুষ, সূক্ষ্ম পুরুষের

আত্ম-বিকাশের প্রয়াস, অর্থাৎ পরম-পুরুষে নিমজ্জিত হবার কিম্বা তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টাই অভিজ্ঞতাকে একসূত্রে গ্রথিত কোরছে। এই বিশেষ এবং চরম পুরুষই আর্টের আদি এবং অন্তলীলা—মধ্যলীলা হচ্ছে অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। আমার মনে হয় যে শ্রীযুক্ত প্রেমেন মিত্র, যুবনাশ্ব, এবং তাঁদের সমপন্থী লেখকগণ এই মধ্যলীলার মোহে কালাতিপাত কোরে নিজের এবং তাঁদের নায়ক নায়িকার চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে অগ্রাহ্য কোরছেন। তাঁরা ব্যক্তিকে সাহিত্যের বিষয় বোলে মনে করেন না। প্রমাণ এই যে, তাঁদের লেখার মধ্যে হাসি নেই—থাকবে কেমন করে? একমাত্র ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা উপলব্ধি কোরে অ-পূর্ণতাকে রূপ দিলেই যে প্রকৃত হাস্য-রসের অবতারণা করা যায়। অন্য প্রমাণ এই যে, ইঁহাদের বর্ণিত দৃশ্যাবলী সব ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির মতন খাপছাড়া। ইঁহাদের চোখ ঐ প্রকার লণ্ঠনের চোখের মতনই বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয়। শ্রীকান্ত বইখানিতেও দৃশ্যগুলি পরম্পরায় চোখের সামনে এসে পড়ছে কিন্তু সে ছবিগুলির মূলসূত্র হচ্ছে এক অপূর্ব ব্যক্তি—শ্রীকান্ত।

শৈলজাবাবুর গল্পের বই অতসীর গুণ গাইতে প্রেমেনবাবু প্রভৃতি লেখকদের দোষ-সম্ভাবনা আলোচনা করা ঠিক 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' কিম্বা 'উদোর ঘাড়ে বুদোর চাপ' হল না! কেননা শৈলজাবাবুর লেখাতে তাঁর সমপন্থী লেখকদের দোষ আছে। তিনি মহাযুদ্ধের ইতিহাসে নিজেকে বন্ধুর হাতে সমর্পণ কোরেছেন বোলে মনে হয়। শৈলজানন্দবাবু এবং প্রেমেন বাবুর লেখাতে যথেষ্ট তফাৎ আছে, কিন্তু মিলও যে যথেষ্ট তাও অস্বীকার করা যায় না! কিন্তু কেবল অতসী বইখানি পড়লে শৈলজা বাবুকে অতখানি দোষী করা যায় না, যদিও 'ধ্বংস পথের যাত্রী' একটি চলচ্চিত্র বোলেই মনে হয়। অতসী বইখানিতে গোটা মানুষের সন্ধান মিলেছে বোলেই আমি অতসীকে বর্তমান গল্প-সাহিত্যে উচ্চস্থান দিই। ব্যানার্জী, নারাণী, আস্ত মানুষ। শৈলজাবাবুর অভিজ্ঞতার প্রেতমূর্তি নয়। আদরিণী ভাদুরাণীর গল্পটি হয় ত জ্যামিতির চিত্রের মতন সৌষ্ঠবশালী নয়, এবং ধ্বংসপথের যাত্রী হয় ত গল্পই নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওগুলি উচ্চদরের সাহিত্য-রচনা। কারণ এই যে সমগ্রতা উপলব্ধির আনন্দ তা' গল্পগুলি পড়লেই পাওয়া যায়।

আমি সাহিত্যে জ্যামিতির প্রভাবকে ক্ষতিকর বোলেই মনে করি এবং প্রবৃত্তিগুলি জ্যামিতিক সরলরেখার মতনই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে নিরাশ করে। আমি সাহিত্যিকের কাজে ইতিহাস প্রত্যাশা করি না, কিন্তু আজকালকার কথিত বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য, জ্যামিতির রেখা যেমন বিন্দুর সমাবেশ পরম্পরা

মাত্র তেমনি মানসিক অবস্থা কিম্বা দৈহিক অবস্থার বিবরণ কিম্বা অভিজ্ঞতা ছাড়া বড় কিছু নয়। আমি অভিজ্ঞতার চলচ্চিত্রকে সাহিত্য বোলে মনে করি না, কেন না ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য অভিজ্ঞতা কেবল মাত্র মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা। কল্লোলের সাহিত্যিক বৃন্দ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে গ্রাহ্য করেন না—কেন না তাঁদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে প্রবৃত্তিমূলক, এবং প্রবৃত্তির ধর্ম বড়ই একঘেয়ে। তাঁরা অবশ্য দরিদ্র নারায়ণের সেবক বোলে আমাদের মধ্যে অনেকের কাছে প্রিয় হয়ে উঠছেন কেন না, দরদী প্রাণ দরদ বুঝে বেড়ায়। কিন্তু সত্যকারের আর্টিষ্টের কাছে একমাত্র দেবতা নর-নারায়ণ। অন্যের কাছে, দরিদ্র নারায়ণ, পীড়িত, ব্যথিত এমন কি কামাতুর নারায়ণ থাকুক আপত্তি নেই, তেত্রিশ কোটীর ওপর না হয় আর এক কোটী বাড়বে কিন্তু সেই সকলের দোহাই দিয়ে শিল্পীর একমাত্র দেবতা নর-নারায়ণকে অগ্রাহ্য করা সাহিত্য যশঃপ্রার্থীর উচিত নয় বোলে মনে হয়। দরিদ্র নারায়ণের ক্রন্দনে হৃদয় যত পারে আন্দোলিত হোক, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে সে আন্দোলন আমাদের দেশে অন্য আন্দোলনের ন্যায় বাস্তবের দোহাই দিয়ে অ-বাস্তবের অত্যাচার হলেই দুঃখ। সত্য কথা এই যে, পূর্ণতা অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব অ-পূর্ণতার অর্থাৎ অভিজ্ঞতার সমষ্টি নয়। যে তিনখানি বইএর কথা লিখেছি সেগুলি বস্তুতঃই এক একটি অখণ্ড সৃষ্টি, তা রূপকই হোক আর নক্সাই হোক।

কল্লোল, ভাদ্র ১৩৩৩।

সমাজ ও সন্ন্যাস-গ্রহণ

দিলীপকুমারের পণ্ডিচারী গমন সমাজের দিক থেকে একটি অর্থসূচক ও গুরুত্ববিশিষ্ট ঘটনা মনে হয়। যৌবনোদ্‌গমের সঙ্গে তার প্রাণে ধর্মভাব আসে — তার ইতিহাস সে নিজেই কোনদিন ব্যক্ত কোরবে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কোন লোকের ধর্মজীবন আলোচনা করা নয়। দিলীপকুমার শুধু আমার বক্তব্যে দৃষ্টান্তস্থল। শনিবারের চিঠির আক্রমণ তাকে দেশছাড়া কোরলে বিশ্বাস করি না। দিলীপকুমার নিজের ক্ষতি করেও দেশের কাজ কোরছিল। সঙ্গীত-প্রচারের জন্য সে নিজেকে উৎসর্গ কোরেছিল। এই কালা বাংলাকে সে গান শুনিয়েছিল, সাধারণ ভদ্রঘরে গান তারই জন্য সমাদৃত হয়েছিল, সুমিষ্ট গলা ওস্তাদের কাছে আশা করা অন্যায় নয় তারই জন্য আমরা বুঝেছিলাম। জাতি জাগ্রত হ'লে জাতীয় প্রতিভা সর্বতোমুখী হয়— দিলীপকুমার সেই প্রতিভার একটি মুখ। এই মুখ নীরব হ'ল কেন আমাদের জানবার অধিকার আছে। সুভাষবাবু মাত্র এই দাবীটুকু কোরেছিলেন। কারণগুলি জানলে লাভ বই ক্ষতি নেই। আমি দেশ-নায়ক নই— আমি যুবকদের সাবধান করতে পারি না। আমি বলি— সন্ন্যাসগ্রহণ কিংবা আশ্রমবাস যদি কোন সামাজিক রোগের চিহ্ন হয়, তাহ'লে তার প্রতিকার করা উচিত— আর যদি স্বাস্থ্যের লক্ষণ হয়, তা হ'লে যত লোকে সন্ন্যাসগ্রহণের সুযোগ পায়, তার চেষ্টা করা বিধেয়।

বুঝে-সুঝেই স্বাস্থ্যের তুলনা দিচ্ছি। এক রকম নৈতিক মনোভাব আছে যার বশবর্তী হ'য়ে লোকে ঘটনাকে ভালমন্দর শ্রেণীতে ভাগ করে। এ যেন বিচারের পূর্বেই রায় দেওয়া। বিচারকের সংস্কার প্রকাশ ছাড়া এই প্রকার বিচারের কোন মূল্য নেই। নিরপেক্ষভাবে দেখতে গেলে আমাদের বর্তমান সমাজের গোটা কয়েক মূলকথা জেনে তার ওপর রায় দেওয়াই ভাল। নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি বোধ হয় অনেকেই গ্রহণ কোরবেন :—

আমাদের সমাজ জীবন্মৃত হ'য়ে ঝরে পড়েছে।

সেজন্য আমাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক পরাধীনতা অনেকটা দায়ী।

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে সামাজিক স্বাধীনতা লাভের আশা করা যায় না।

যে কারণেই হোক রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর অনেকের— বিশেষতঃ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস এবং তারই ফলে সাধারণের মনে একটা নৈরাশ্য এসেছে। সমাজ-মনের দিক থেকে বলা যেতে পারে, যে আমরা বড়ই একান্ত-বাদী। আপোষ করা আমাদের ধাতে সয় না। মারি ত হাতি লুটি ত ভাণ্ডার। ধর্ম বলতে একেবারে মোক্ষধর্ম, ধার্মিক বলতে একেবারে সন্ন্যাসী বুঝি; আনন্দ বলতে একেবারে ব্রহ্মানন্দ, জীবন মানে মৃত্যুর অর্থাৎ শেষদিনের জন্য প্রস্তুত হওয়া। চতুবর্গের সেরা যখন মোক্ষ, তখন সন্ন্যাস-গ্রহণই মানবত্বের পরাকাষ্ঠা। অতএব ধর্ম, অর্থ, কামবর্গের যত কাজ সন্ন্যাসী করতে পারেন, অন্যে তা পারে না। স্বদেশী যুগের প্রবর্তকরা এখন অন্য কথা বললেও ১৯০৫-৬ সালে এই কথাই ভেবেছিলেন।

তাহ'লে দাঁড়াল এই, যে মানুষ বা জাতি নিজের অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে নিরাশ হয়েছে, সেই মানুষ বা জাতি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে, আশ্রমকেই সমগ্র সমাজের কেন্দ্র মনে করে। যার সম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে আছে কিংবা সম্পত্তিজ্ঞান নেই, সেই আশ্রমবাসী হয়।

এ সব ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির ও জাতির একটি বিশিষ্ট প্রেরণার ইতিহাস থাকে। প্রেরণার মানে কোন অতিপ্রাকৃত, নিগূঢ় রহস্যময় শক্তি নয়। প্রেরণার পিছনে কোন দেবতা নেই, শুধু দৈব আছে। প্রেরণা বলতে গোটা কয়েক অতীত ঘটনার অনুক্রম বা পর্যায় বুঝি। এই পর্যায়কে মানুষ বুদ্ধির ধর্মানুযায়ী রীতি ও নীতিসাপেক্ষ করে তোলে। তার মানে নয় যে ঘটনাবলীর মধ্যে কোন রীতি নীতি গুপ্ত আছে যাকে আবিষ্কার করলে তবেই তাদের প্রকৃত অর্থ নিরূপিত হয়। যদি কোন মানুষ অল্প বয়সে ভগবদ্‌ভক্ত পরিবারে পালিত হয়, কোন ধর্মপ্রাণ মানুষের সঙ্গলাভ করে, মোক্ষ-শাস্ত্র পড়তে থাকে, কিম্বা যে কোন কারণে ভগ্ন-মনোরথ হয়— তাহ'লে সেই মানুষের পক্ষে ভগবদ্‌ভক্ত ও ধর্মপ্রাণ হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে পূর্বাভ্যাসই প্রেরণা। সারাদিন হেয় কার্যে ব্যাপৃত হ'য়ে যত লোক সৌভাগ্যশালী হন্— তাঁদের মধ্যে অনেকেই শুধু অভ্যাসের বশে (কিংবা লোভের বশে— অর্থাৎ লোভের আশায়) ধার্মিক হন এবং আয়ের যৎকিঞ্চিৎ আশ্রমের (এবং পিঞ্জরাপোলের) জন্য দান করেন। আর্থিক হিসাবে সার্থক জীবনেই ধর্মপ্রেরণা বেশী খুঁজে পাওয়া যায়। মন্ত্র নেবার পর থেকে— কিম্বা আশ্রমে গৃহী-সভ্য হবার পর থেকে সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় সকলেই জানেন। সাম্রাজ্য-বৃদ্ধি ও জাতীয় প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য শস্ত্রের অপেক্ষা শাস্ত্র কম দায়ী নয়।

অন্য এক রকমের প্রেরণা আছে— যার নাম প্রবৃত্তি। জাতির অভিজ্ঞতা ঐতিহ্য বা প্রেরণা যখন একটি মানুষের ভেতর থেকে কাজ করে তখনই তাকে প্রবৃত্তি বলি। যদিও কোন প্রবৃত্তি অ-সংস্পৃষ্টভাবে কাজ করে না, অন্য প্রবৃত্তির সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করে, তবুও, সুবিধার জন্য, কোন ব্যবহারের পিছনে একটি বিশেষ প্রবৃত্তি আছে মনে করতে পারি। সন্ন্যাসের অন্তরালে instinct of submissiveness রয়েছে। একেই আমরা গুরুগম্ভীর নীতির ভাষায় ত্যাগ বলি। সংসারে বিরক্ত হবার পূর্বেও ত্যাগের স্পৃহা আসতে পারে। অনেকে ত্যাগী হ'য়েই জন্মায়— তারা পরের জন্য বেঁচে থাকে। পরে, জন্মগত প্রবৃত্তিকে rationalise করে বলে যে গুরুর পায়ে আত্মসমর্পণ করলেই, নিজেকে বিলিয়ে দিলেই, ভগবানে অচলা ভক্তি স্থাপন করলেই নিজেকে পাওয়া যায়। গুরুর পায়ে আত্ম-সমর্পণ করলেই গুরুর আশ্রমের শুভার্থে, অর্থাৎ তার প্রতিপত্তির জন্য নিজের শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। কেননা আশ্রম হচ্ছে ইউটোপীয়া, আদর্শ সমাজ। সেখানে সংসারের বিরোধ, বিবাদ, বিসম্বাদ, ঘাত-প্রতিঘাত কিছুই নেই। আশ্রমের পুরুষ এক— গুরু, যিনি গ্রহণ করেন; বাকী সব ত্যাগী পুরুষ— নারীর দল। প্রত্যেক আশ্রম যেন একটি রোমান পরিবার— যেখানেএকমাত্র পিতারই অধিকার আছে— অন্যের ভক্তি-অর্ঘ্য দান করা ছাড়া অন্য অধিকার নেই। এটি শুধু তুলনা নয়। কথাটি কতখানি সত্য যিনি নব্য মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি জানেন তিনিই বুঝবেন।

অতএব একধারে নৈরাশ্য ও অসহায়তা, অন্যধারে ঐতিহ্য ও ইতিহাস, একধারে অবচেতনার গুপ্ত ইচ্ছার প্রকাশ, অন্যধারে আধিভৌতিক প্রতিপত্তি লাভ ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আধিদৈবিক ও তথাকথিত আধ্যাত্মিক অর্থাৎ অতি-প্রাকৃত যন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ, একাধারে জন্মগত ত্যাগের প্রবৃত্তি ও পিতৃ-ভক্তির প্রসারণ, অন্যধারে আত্মশক্তি স্ফুরণের সুযোগের অভাব এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের গোলমাল— এই হ'ল বর্তমানে সন্ন্যাসগ্রহণের সামাজিক ব্যাখ্যা। সন্ন্যাসগ্রহণের সাধারণ ব্যাখ্যা হচ্ছে এই— সংসার দুঃখময়, এই সংসারে দুঃখ নিরাকরণের উপায় নেই— একজন দুঃখত্রাতা চাই যার হাতে কিংবা পায়ে আত্মসমর্পণ করা সহজ এবং কোরলে ব্যক্তিগত দুঃখ ও দায়িত্বের লাঘব হয়— এবং একটি সুখের সংসার প্রয়োজন যেখানে বাস কোরলে শান্তি পাওয়া যাবে।

অনেকে এই আপত্তি কোরবেন যে সন্ন্যাস ধর্মের মর্ম বুদ্ধির অগোচর— সে মর্ম গ্রহণের জন্য বুদ্ধির অতীত কোন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। 'অতীত' কথাটি

দ্ব্যর্থবোধক। হরিদ্বার কাশীর অতীত বোল্লে দুটি জিনিষ বুঝি— প্রথমতঃ হরিদ্বার যেতে হ'লে কাশী হয়ে যেতেই হবে— দ্বিতীয়তঃ হরিদ্বার কাশীর চেয়ে দূর হলেও সেখানে যাবার জন্য কাশী হ'য়ে যাবার দরকার নেই। অতীতের দ্বিতীয় সংজ্ঞায় অন্তঃস্থিতের বালাই নেই। বুদ্ধির দ্বারা ধর্মের কিংবা ধর্মানুষ্ঠানের ধর্ম গ্রহণ করা যাক্ আর নাই যাক্, যদি কোন ধার্মিক ব্যক্তি বা আশ্রমবাসী আচার ব্যবহারে, চিন্তায়, বুদ্ধির নিম্নজগতে আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে বিচরণ করেন, তা হ'লে বুদ্ধির দ্বারাই তাঁর আচার ব্যবহার এবং চিন্তাকে বিচার করতে বাধ্য হব। যতদিন এই জগতে আছি ততদিন বিচার বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোন মন্ত্র বা মাপকাঠি আমাদের নেই। বুদ্ধির অনেক দোষ আছে জানি কিন্তু এর একটি মহৎ গুণ এই যে বুদ্ধির দ্বারাই anti-intellectualist হওয়া যায়। যোগ নেবার পর, সন্ন্যাস গ্রহণের পর, এমন কি ব্রহ্মজ্ঞানের পরও যদি কোন ব্যক্তি বোকা হ'য়ে যান, তাহ'লে সমগ্র মানব জাতির চেষ্টা— অর্থাৎ সভ্যতা, বিফল হয়েছে স্বীকার কোরতে হবে। অবশ্য তর্কের খাতিরে বলা যায়— বিফল হ'লে ক্ষতি কি? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর কি দেওয়া যায় না? ঐ হিসাবে ব্রহ্মজ্ঞান ও সন্ন্যাসগ্রহণও বিফল হয়েছে। কেননা যাজ্ঞবল্ক্য থেকে বুদ্ধ, যীশু, প্লাটইনস্, মহম্মদ, শঙ্কর, রামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত অনেকেই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন— এখনও মানস সরোবরের ধারে এবং ভারতবর্ষের নানা আশ্রমে অনেক ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী আছেন, প্রত্যেকেই এক একটি দল তৈরী কোরেছেন, এবং প্রত্যেকের ধারণা ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে সব জ্ঞানই মুঠোর ভেতরে এসে যায়— তা সত্বেও অনেক সজ্জন সভ্যতার জন্য প্রাণ দিচ্ছে, বিজ্ঞানের অনুশীলন কোরছে, মানবের মঙ্গল কামনা কোরছে। মোদ্দা কথা এই যে যেমন বুদ্ধির সঙ্গে বোধির সম্বন্ধ না থাকতে পারে, তেমনি বুদ্ধ হলেও বুদ্ধিমান নাও হ'তে পারেন। ব্রহ্মজ্ঞান বুদ্ধকে বাতিল করতে এখনও পারেনি। সভ্যতার ভিত্তি বুদ্ধি, চূড়া যাই হোক না কেন। যদি ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী ইচ্ছা কোরলে Einsteinকে নতুন কথা না শোনাতে পারেন, তা হ'লে তাঁর নির্বিকল্প সমাধি সভ্যতার পক্ষে অবান্তর। এই কথাই আমার এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু তাঁর অমার্জিত বৈজ্ঞানিক-ভাষায় বলতেন 'একজন ব্রহ্মজ্ঞানীকে খুব high voltage এর shock দিতে ইচ্ছা করে, দেখি তিনি কি করেন।' আমার বন্ধু জানতেন না যে সন্ন্যাসী হ'লে আর shock লাগে না, আশ্রমের গণ্ডীর মতন insulation নেই। Shocked হই আমরা, যাঁরা মাটিতে দাঁড়াই কোন কাঠের tripod এর ওপর উঠি না।

প্রত্যেক মানুষের হাতে দুটি কাজ আছে—নিজের উন্নতি এবং সভ্যতার

সমৃদ্ধি সাধন করা। দুই কাজের মধ্যে বিরোধ নেই এবং একটি অপরটির ওপর নির্ভর কোরছে বোল্লে যথেষ্ট বলা হ'ল না। সভ্যতাকে বাতিল কোরে যখন মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হচ্ছে এবং নিজে মানুষের মতন মানুষ না হ'য়ে, আত্মশক্তি না বাড়িয়ে লোক যখন দেশ-নায়ক হচ্ছে তখন নিজের উন্নতির সঙ্গে সভ্যতার উন্নতির বিরোধ রয়েছে স্বীকার কোরতেই হবে। দৃষ্টান্তের অবধি নেই—এত ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে যে বহু সমাজতত্ত্ববিদের ধারণা যে বিরোধই সমাজের একমাত্র নিয়ম। ধনিসম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও মৌলবীর দল, Bureaucrat, aristocrat এর দল স্বার্থের তাড়নাতেই কাজ করতে উদ্যত হয়েছিল, প্রথম প্রথম সভ্যতার উপকারও হয়েছিল— আজকাল নানা কারণে তাদের দ্বারা উপকার হচ্ছে না সভ্যতার অপকারই হচ্ছে।

দোষ কার? দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। এখন ধরা যাক, একজন প্রতিভাশালী যুবক সত্যের সন্ধানে সন্ন্যাস গ্রহণ কোরল। সাধারণতঃ, এ সত্য তার নিজের স্বার্থ। যতক্ষণ না সে চরম সত্য উপলব্ধি কোরছে, ততক্ষণ তার উন্নতির ক্রমবিকাশের প্রত্যেক স্তরে স্বার্থের সঙ্গে সাধারণ মঙ্গলের বিবাদ বাধবেই বাধবে। পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে দেখলে নীচু জায়গা সমতল বলে মনে হয়, কিন্তু উঠতে উঠতে যখন পথিক বিশ্রাম নেয়, আত্মতৃপ্ত হয়, তখনই উপত্যকার অসমানত্ব বেশী কোরে চোখে ঠেকে। বুদ্ধির জগত থেকে অন্য জগত মিথ্যা মনে হয়, প্রাণময় জগত থেকে মনোময় জগতকে বাতিল করা স্বাভাবিক— যেমন বের্গসঁ কোরেছেন। আবার আত্মার জগতে প্রাণময় মনোময় জগত মরীচিকার মতন। কারণ মানুষের উন্নতির ধারা অব্যাহত, অবিশ্রান্ত কিংবা অবিচ্ছিন্ন নয়। Cataract of Lodor এর ছন্দে জীবন চলে—pe Saltum লাফিয়ে লাফিয়ে কখনও বা মন্থর গতিতে। সমাজেরও দোষ এই যে তার গঠন সকলকে নিয়ে—সেই জন্য জনসাধারণকে সে ভয় করে— তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। ভয়ের পিছনে একটি স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যসূচক প্রবৃত্তি আছে— তার নাম আত্মরক্ষা। একধারে ব্যক্তিগত উন্নতির তাড়না— বিপরীত দিকে সমাজের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। কার জোর বেশী প্রমাণ হবে কিসে? প্রমাণ যখন পরে পাওয়া যায়, তখন ঐ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া এখন সম্ভব নয়। সেই জন্য বলি, সভ্যতার অপকারের জন্য সমাজের চেয়ে, ব্যক্তিই দায়ী। যে ব্যক্তি যত প্রতিভাশালী, তার দায় তত বেশী। এই দায় খালাসের এক উপায় আছে— মানুষ যদি আশ্রমকে স্বার্থ অর্থাৎ সত্যসন্ধানের শুধু উপায় মনে করে। সমাজের নিজে

হ'তে কাজ করার উপায় নেই। এই সামাজিক সভ্যতার জন্য মানুষের প্রাণ শক্তিমান হ'ল, বুদ্ধি ক্ষুরধার হ'ল, হৃদয়বৃত্তি প্রসারিত হ'ল, কিন্তু সেই মানুষ যখন কোন রহস্যময় স্বার্থের জন্য, নৈরাশ্যের বশে, কিংবা কোন অতি সাধারণ অথচ গুপ্ত প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রায় কোন অপরিতৃপ্ত বাসনার ক্ষতিপূরণ কোরতে আশ্রমে প্রবেশ কোরল তখন তাকে সভ্যতার অকৃতজ্ঞ সন্তান নাম দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু যদি দেখি যে সন্ন্যাসগ্রহণের পর সন্ন্যাসীর বুদ্ধি সূক্ষ্মতর হয়েছে, আনন্দ উপভোগ করবার ক্ষমতা বেড়েছে, প্রাণে নূতন শক্তি জন্মেছে, শুধু তাই নয়, যদি দেখি আশ্রমে জ্ঞানবৃদ্ধি হচ্ছে, রসসৃষ্টি, বিজ্ঞানালোচনা চলছে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান পরিপুষ্ট হচ্ছে, যদি দেখি আশ্রমে সাংসারিক সর্বপ্রকার বিরোধের অবসান এবং সমস্যার সমাধান হচ্ছে এবং জাতের মঙ্গল সাধনার জল্পনা-কল্পনা চলছে, যদি দেখি আশ্রম থেকে সন্ন্যাসীর দল বেরিয়ে এসে গৃহী হ'য়েছেন— সমাজের ও সভ্যতার হিতসাধন কোরছেন, সাধারণের মধ্যে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রভাব বিস্তার কোরছেন— তখনই আশ্রমকে সমাজের কেন্দ্রস্থল ও বীজক্ষেত্র বোলব। শিক্ষাকেন্দ্র যেমন সমাজের আদিও নয়, অন্তও নয়, চিরজীবন কলেজে পড়লে (কিংবা পড়ালে) ছাত্র (অধ্যাপকও) যেমন মূর্খ'ই থেকে যায়, তেমনি আশ্রম সমাজের আদিও নয়, অন্তও নয়, এবং আজন্ম ও আমরণ, সন্ন্যাসী, সমাজ ও সভ্যতার ভীষণ শত্রু। হিন্দুসভ্যতার আদিতে আশ্রম ছিল না এবং আশ্রমেই সে সভ্যতা শেষ হবে না। আশ্রমের পূর্বে সমাজ ছিল, সে সমাজ রোগদুষ্ট হবার পরই আশ্রম তৈরী হয়েছিল (তাও আবার বর্ণাশ্রম)। যীশুকে জেরুসালেমে ফিরতে হ'য়েছিল, বুদ্ধকে সারনাথে যেতে হ'য়েছিল, মহম্মদকেও মক্কায় আস্‌তে হ'য়েছিল। বীজক্ষেত্র থেকে নূতন বীজ বপন করা হোক— কিন্তু বীজক্ষেত্রই পৃথিবীর সমগ্র ভূমি নয় এই কথা আশ্রমবাসী মনে রাখলে আশ্রম ও সমাজের বিরোধ-সমস্যা মিটবে।

বর্তমান ভারতের কয়টি আশ্রম শিক্ষাকেন্দ্র বোলে পরিগণিত হতে পারে? যতদূর জানি ও শুনেছি, কোন আশ্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার নামে ভূতুড়ে বিদ্যার আলোচনা হয়, কোন আশ্রমে চরকার ঘরঘরানি বীণাধ্বনি অপেক্ষা মধুর মনে হয়, কোন আশ্রম থেকে অপাঠ্য কবিতা বেরুচ্ছে, কোন আশ্রমে প্রবেশ কোরলেই মনে হয় প্রত্যেক আশ্রমবাসীর মুখে ত্যাগের আত্মাভিমান ফুটে উঠেছে— আবার প্রায় সকল আশ্রমই দ্বেষ হিংসা সঙ্কীর্ণতায় পরিপূর্ণ। কয়টি আশ্রমে নূতন সভ্যতার বীজ তৈরী হচ্ছে? কয়টি আশ্রমে ভবিষ্যৎ সমাজের উপযুক্ত গৃহী শিক্ষিত হচ্ছেন?

বিচিত্রা, শ্রাবণ, ১৩৩৬।

একখানি পত্র

(শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে)

১.

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

তোমার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। নানা কারণে উত্তরার পূজার সংখ্যার জন্য প্রবন্ধ লিখতে পারলাম না। কারণগুলি নির্দেশ কোরলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা কোরবে।

কখন লিখি? মাত্র রবিবার দিন ছুটি পাই। সেদিন সকালে একটু দেরী কোরেই উঠি। গত ছয়দিনের ক্লান্তি কি সহজে দূর হয়? তাই মুখ ধুয়ে, চা পান কোরেই, আবার বিছানায় শুয়ে পড়ি। তখন অবশ্য ঘুমুই না। গত সপ্তাহের অপঠিত খবরের কাগজ, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি নিয়ে তখন নাড়াচাড়া করি। তাই শেষ করতে বারটা বেজে যায়। আলস্যের বিপক্ষে অনেক মন্তব্য শোনবার পর স্নানাহার করতেই হয়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্নানাহার সুচারুরূপে সম্পন্ন করে একটু বিছানায় গড়াই, গড়াতে গড়াতে ঘুম আসে। সাড়ে তিনটার সময় বেহারা চা নিয়ে আসে— ঘুম আপনা হতেই ভেঙ্গে যায়— পেয়ালার আওয়াজে। চা পান করে একটু ছেলের সঙ্গে গল্প-গুজব করে বেলা পাঁচটা নাগাৎ সামাজিকতার দাবী পূরণ করতে বন্ধুদের বাড়ী যেতে হয়। প্রায় সাড়ে আটটার সময় যৎসামান্য উদরস্থ করে, নলটি মুখে দিয়ে, মাসিক পত্রিকা ও চিঠিগুলি হাতে নিয়ে বিছানায় বসি। বসে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হয়। শরীর ও মন আপনা হতেই ক্লান্ত হয়ে আসে। সোমবার দিন উপরি উপরি চার ঘণ্টা লেক্‌চার দেবার ভয়ে ত্রস্ত হয়ে নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হই। ঘুমাবার আগে দুটি কাজ করি— আত্মীয় স্বজনদের এ সপ্তাহেও চিঠি লিখতে পারলুম না বলে ভগবানের কাছে মাপ চাই— আর আমার বংশে কেউ যেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার না হয়ে জন্মায়, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। এই গেল আমার রবিবারের কার্য-তালিকা। এর মধ্যে ফুরসৎ নেই, নিজেই দেখতে পাচ্ছ। প্রবন্ধ লিখি কখন?

অবশ্য, এক যদি রবিবার ভোর বেলা— ৮টার পূর্বে উঠি। তারপর চা পান না করেই, খবরের কাগজ না পড়েই, কাগজ কলম খুঁজে নিয়ে বরাবর

টেবিলে গিয়ে বসি— তা হলে সাহিত্য সাধনা সম্ভব হতে পারে বটে, কিন্তু আমাকে জান ত ? কলম নিলেই লেখা আসে না, সেইজন্য আমাকে দুপুর-বেলা ও রাত্রিবেলাও লিখতে হয়। অর্থাৎ মধ্যাহ্ন ভোজন, দিবা-নিদ্রা, চা-পান, খবরের কাগজ-পড়া সামাজিকতা রক্ষা এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা পর্যন্ত সব ত্যাগ করতে হয়। তোমার জন্য কি আমি সর্বত্যাগী ও সর্বস্বান্ত হব ?

তুমি অন্ততঃ আমাকে চা ও সিগারেট ছাড়তে বোলতে পার না। আমার অন্ত কোন প্রকার নেশা নেই। তুমি ওকাকুরার বই ও জে, এম ব্যারির কথা নিশ্চয়ই পড়েছ। অতএব কেমন, নীরব হলে ত। বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রিকা পড়ার বিপক্ষেও তোমার কোন কথা বলবার নেই। তোমার কাগজ এ-অঞ্চলের বর্তমান যুগের মুখপত্র। যুগের সব মানুষের যোগ-সূত্র এই সংবাদ-পত্রগুলি। আমাকে এই বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এক তালে, এক কলমে চলতে হয়, তা হলে মাসিক-পত্রিকাগুলি পড়তেই হবে, কিন্তু এই অভ্যাসের বিপদও যথেষ্ট। অনেক সময় কাগজগুলি হুজুগেই ভরপুর থাকে। উঠে-বসে পড়লে মনোযোগী হতে হয়। হুজুগ এক প্রকার ছোঁয়াচে রোগ। ছোঁয়াচে রোগ থেকে আত্মরক্ষা করার একমাত্র উপায় বিছানায় শুয়ে থাকা। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা কর। তাও যদি না বিশ্বাস হয়, তা হলে বলি, পদ্মার ভীষণ স্রোতে মাঝি কখনও আরোহীকে নৌকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয় না, পাছে ভারসাম্য অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে। ভারতবর্ষে যে-সব আন্দোলন চলছে, সেগুলি নিতান্তই সংক্রামক— আমিও অত্যন্ত রোগ-প্রবণ। সভ্যতার স্রোত ক্রমেই আমার কাছে নিতান্ত দ্রুত ঠেকছে— আমি অতি শীঘ্র টলায়মান হই বুঝতে পেরেছি। তাই বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়ি।

তুমি যদি দিবানিদ্রায়, সামাজিকতা রক্ষায় এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করায় বাধা দাও, তা হলে তোমার ভারতবর্ষে জন্মানই ভুল হয়েছে— বিলেত কিংবা আমেরিকায় জন্মালেই ভাল করতে। ভারতবর্ষে যত গোল হচ্ছে তার গোড়ায় আছে এই বিদেশী রাজ্যের দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত দেবার প্রয়াস। সমাজ— হিন্দু-সমাজ এই সনাতন হিন্দু-সমাজ লোপ পেতে বসেছে —তুমি আমি না রাখলে কে রাখবে ভাই ? আর ভগবানের কাছে আত্ম-সমর্পণ কর—দেখবে মনে কি শান্তি এসেছে! কি ঘুমই পাচ্ছে! এ দেশে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া অন্য সাধনা নাস্তি—এই একটা ভবিষ্যৎ-বাণী করলাম—যাবার পূর্বে শেষ কথা বলে গেলাম। অতএব আমাকে প্রবন্ধ

লিখতে বলে জাতের সর্বনাশ কোর না।

নতুন বই কি পড়েছি জিজ্ঞাসা কোরেছ। এ মাসে তিনখানি বাংলা কবিতার বই দেখেছি। নরেন দেবের মেঘদূত, কান্তি ঘোষের ওমর খৈয়মের রাজকীয় সংস্করণ এবং কান্তি ঘোষেরই সনেট। নরেন-দার ভূমিকাটি ভারী চমৎকার হয়েছে— পড়ে দেখো ভাল লাগবে। গুরুদাস কোম্পানী এত টাকা খরচ করলে— কিন্তু ফল কি এই হল! নরেন-দার মেঘদূত বাংলা কাব্যের তাজমহল— অর্থাৎ চোখে আঙুল দিয়ে ছবি ও ছাপা দেখিয়ে দিচ্ছে; ত্মাখ কত টাকাই না খরচ হয়েছে আমার জন্য।— যেমন তাজমহলের গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত guide-রা দেখিয়ে দেয়। ওমর খৈয়মের রাজ-সংস্করণের সম্বন্ধেও ও-কথা খাটে। দুখানি বইতেই খানকয়েক ভাল ভাল ছবির সর্বনাশ করা হয়েছে। আমাদের দেশের ছাপাতে taste আসতে এখনও দেরী আছে বোলতে চাই না তবে আমাদের book illustration অত্যন্ত নীচুস্তরের। গড্ডালিকা ও কজ্জলীর কথা বাদ দাও— যতীন সেন এ-বিষয়ে genius। তোমাকে চিঠি লিখছি, প্রবন্ধ লিখছি না— কেননা আমার নিশ্বাস নেবার ও ফেলবার সময় নেই— যদি সময় থাকত তা হলে প্রত্যেক পাতা খুলে দেখাতুম যে কোথায় ছাপা দৃষ্টিকটু হয়েছে। দৃষ্টিকটু হোক আর না হোক দেশে এই করেই ছাপার standard বাড়বে। হঠাৎ বড়লোক হলে অযোগ্য ব্যক্তি কি রকম মোটা হয়ে যায়, দেখেছ? এই বই দুখানির ছাপা তাই একটু মোটা ধরণের হয়েছে। আমি কিন্তু ভাবছি যে, বোধ হয় শেষে দেশের উপকারই হবে। লোকে চারু রায়ের ও মনীষীদের ছবি আঁকার পদ্ধতি ত দেখতে পাবে এই যথেষ্ট।

নরেন-দার তর্জমা সম্বন্ধে আমি তোমাকে একটি কথা শুধু বলতে চাই। মন্দাক্রান্তা ছন্দের গাম্ভীর্য এখানে সর্বদা রক্ষিত হয় নি। নরেন-দা ভূমিকাতে লিখেছেন যে তিনি ছন্দে বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছেন। এই variety show-এর জগতে তাঁর প্রয়াস প্রশংসাই [?]। কিন্তু মেঘদূত চিরদিনের নয় কি? কালিদাসের মেঘদূত যখন পড়ি, তখন আমার ত মোটেই একঘেয়ে ঠেকেনি। বরঞ্চ মন্দাক্রান্তা ছন্দের একটানা লালিত্য নববর্ষার একটানা বারিধারার মতনই আমার মনকে অভিভূত করেছিল। ভেবে ত্মাখ, কালিদাস পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির ভয়ে ছন্দে বৈচিত্র্য আনছেন! তা হলে কবিতাটি কত cheap, sentimental হয়ে পড়ত! কবি ভাব-প্রবণতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন, এই ভরা জোয়ারের মতন একটানা মন্দাক্রান্তার হাতে সেই সনাতন একটানা

বিরহ-ব্যথাকে সমর্পণ কোরে। কেমন চমৎকার বিরহের গাম্ভীর্য রক্ষিত হল বলত? নব-বর্ষার ঝর ঝর বারিধারার সুরের সঙ্গে, বিরহ-ব্যথা ও মন্দাক্রান্তার কেমন ঐক্যতান হল বল ত? নরেন-দা দেখছি এক সঙ্গে বিরহকে ভয় পান ও সাধারণকে অবিশ্বাস করেন। ভাগ্যিস নরেনদা literal translation করেন নি! শাই রক্ষে! রবিবাবু ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন কবির মেঘদূত তর্জমা কোরতে যাওয়া অন্যায়। আমি কবিত্ব হিসাবে এ-কথা লিখছি। নচেৎ, তর্জমা ভালই হয়েছে। তুমি বলতে পার এবং আমিও বলি— এই যে পূজার ছুটি আসছে, কত লোক বাড়ী যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে— কতদিন প্রিয়ার মুখ দেখিনি— তারা না হয় বিরহী যক্ষের মতন মন্দাক্রান্তায় চিঠি লিখতে পারে না— তাই বলে কি তারা নরেন-দার কবিতা পর্যন্ত পড়তে পাবে না! তারা নিশ্চয়ই পাবে— হাজার বার পাবে। সর্বসাধারণের মনে আনন্দ উপভোগ করবার শক্তি বাড়িয়ে দেবার জন্য নরেনদাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু তবুও বলি যে, নরেন-দার মেঘদূত কালিদাসের নয়।

কিন্তু কান্তি ঘোষের ওমর খৈয়ম Fitzgerald-এর সুরে বাধা। Fitzgerald-কে তর্জমা করতে কান্তি তালফেরতা কিম্বা বাঁটোয়ারার কাজ করেনি। তুমি শুধু গান শুনতেই ভালবাস অর্থাৎ গান জান না— যদি জানতে তা হলে আমি যে তুলনাটি পরে দিচ্ছি তার সার্থকতা বুঝতে পারতে। ধ্রুপদে বাঁটোয়ারার কাজ হয়, জান বোধ হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধু, শ্রোতা যাতে ক্ষিপ্ত না হয়ে যান— একেই ত মানুষ ধ্রুপদ শুনতে চায় না। উদ্দেশ্য সাধু হলেও সাধনে অসাধু হয়ে যায়। বাঁটোয়ারার চোটে যোগী-ঋষিরাও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তোমার সহরে হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মশাই বাস করেন। তাঁর ধ্রুপদ একবার শুনো। 'বাহুচালিয়া' নেই— ধীর মন্থর গতিতে সুর চলেছে— মেঘদূতের ছন্দে। এই হল ধ্রুপদ—এই চালের dignity, economy বয়স না হলে বুঝতে পারবে না।

তুমি হয়ত বলবে যে কান্তি ঘোষের ওমর খৈয়মকে ধ্রুপদ বলা অন্যায়— কেননা কান্তির ছন্দের গতি লঘু, গুরু-গম্ভীর নয়— তার সঙ্গে সঙ্গত হবে তবলার, সারেঙ্গীর, মৃদঙ্গ কিম্বা তানপুরার নয়। কান্তির কবিতাকে যদি খেয়াল, ঠুংরী ও গজলও বলো— তবুও তার মধ্যে আড়ম্বর নেই। শ্রেষ্ঠ খেয়ালে —যেমন আবুল করিম কিম্বা আলি-বক্সের শিষ্য বামাচরণ বাবুর গানে, শ্রেষ্ঠ ঠুংরী যেমন মুন্না খাঁ, মৈজুদ্দিন গানে, শ্রেষ্ঠ গজলে যেমন আচ্ছান বাই-এর গানে কত সংযম আছে শুনলে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে। সে সব গানে সুরের

প্রাধান্য বজায় রাখা হয়— সে-সব সুরে তালের চটাপট ধ্বনি নেই— সে-সব গান শুনলে মনে শান্তি আসে কেন জান ? ভাল গানই বল, আর lyric কবিতাই বল— সব ভাল ছোট রচনাই একটা mood-এর চেহারা। তার মধ্যে অন্য খেয়াল আনতে গেলে খুব সাবধানী হতে হয়— না হলে মূল সুর— themeটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, সুর ভ্রষ্ট হয়। কান্তি নিজের ক্ষমতার সীমা জানে— তাই সে ভারী চমৎকার একটা গতি, lilt-এর সন্ধান পেয়েছে। নরেন-দা বোধ হয় এ সন্ধান পায় নি। আমার ভুল হতে পারে। তোমার মত কি জানাবে। কবিতা সম্বন্ধে তোমার রুচি মার্জিত এ কথা জজ সাহেবও মাথা পেতে নেবে।

তুমি কান্তির সনেট পড়েছ ? পোড়ো— বল ত' কিনে পাঠাব। ছাপা ও বাঁধান সনেটের মতনই। প্রমথ বাবুর সনেট যখন কবির প্রশংসা অর্জন কোরেছে তখন সে সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা। নেহাৎ আজকাল যাঁরা সনেট লেখেন— তাঁদের মধ্যে হাত আছে দু'জনের— এক কান্তির, আর বুদ্ধদেবের। হিংসুক ও ধর্মগোঁড়া ভিন্ন এমন লোক দেখি নি যে মনে মনে স্বীকার করে যে বুদ্ধদেবের সনেটগুলি উচ্চ শ্রেণীর। কান্তি ঘোষের সনেট সম্বন্ধে সাহিত্যিকদের মধ্যে দুটি মত আছে। আমার ধারণা যে, কান্তি ঘোষ খুব ভাল সনেট লেখে। কান্তির সনেটে কাঠিন্য আছে— সংযম আছে— বাঁধন আছে। যেন এক একটি crystal— স্ফটিকের মতনই স্বচ্ছ, ঝরঝরে। সেই crystal-এর মত ভেতর থেকে কেমন একটি রং ফুটে ওঠে! সে রং সূর্যেরই আলো— স্ফটিকের গঠন মেনে চলতে হয় বোলে সাদা আলো ভেঙে গিয়ে ভিন্ন রং হয়। সনেটের উপর কান্তি ঘোষের মনের সাদা আলো পড়েছে — সে আলো বিষয়-বস্তুর ওপর প্রতিফলিত হয়ে ভাব-সম্পদে রঙীন হয়ে উঠেছে। কান্তির মনের গঠন মোটেই sentimental কিম্বা Victorian নয়। চল্লিশ বছরে যে বিয়ে করে নি সে কি রকম চালাক ছেলে বুঝতে পারছ। প্রেম সম্বন্ধে কবিতা লিখেছে অবশ্য— কিন্তু সে প্রেমে মোটেই আত্মদান নেই। কান্তি কখনও নিজেকে হারিয়ে ফেলে না— সে নিজের ব্যক্তিত্ব— নিজত্বকে এত ভালবাসে যে, তার প্রেমাস্পদ যদি তাকে স্বার্থপর বোলত তা হলে আমি কেন— সে নিজেও আশ্চর্যান্বিত হত না। কান্তি মস্তিষ্ক দিয়ে ভালবাসে— সেই জন্য তার সনেট এত স্বচ্ছ ও শুভ্র। কিন্তু অতিরিক্ত শুভ্রতাই কান্তির লেখার দোষ। বেশী শুভ্র হলে নানা রকমের, নানা রং-এর প্রতিবিম্ব গড়ে না। কান্তির সনেটে রং আছে— কিন্তু সে রং primary colours— ভিন্ন রং-এর সংমিশ্রণে কোন অপূর্ব রং সে তৈরী করেনি। মস্তিষ্ক-প্রসূত ভাবের

দোষই এই। সমস্ত প্রাণ দিয়ে যদি সে কবিতা লিখত, তার কবিতার উৎস যদি তার হৃদয় হত—তা হলে রং-এর মীড় দেখতে ও শুনতে পেতাম। তা হলে কিন্তু কান্তি ঘোষ অন্য ব্যক্তি হত। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' নয় কি? সে চেষ্টা করলেও rich poetry লিখতে পারবে না— কিন্তু সে crystal-pure কবিতা লিখতে পারবে। কান্তি যে অল্প লেখে— সেজন্য তাকে আমি বরাবরই ধন্যবাদ দিই।

চিঠি বড় লম্বা হয়ে গেল। রবিবারে যদি কখনও কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি পাই. তা হলে 'উত্তরা'র জন্য প্রবন্ধ পাঠাব। তোমার বইখানি পড়ে মতামত জানাব। না পড়ে মতামত জানাবার মতন মহা-সমালোচক এখনও হইনি। তবে তুমি যে ধরণের চিঠি লিখতে আরম্ভ কোরেছ— তাতে আমি শীঘ্রই সমালোচক-প্রবর হয়ে উঠব। তুমি কেমন আছ? আমার শরীর হিন্দুশাস্ত্রের শ্লোক মেনে চলে— আমি যখন কালাপাহাড় নই— তখন এই ব্যাধিমন্দিরকে জোড়াতোড়া দিয়েই রাখি। দিনে পাঁচবার ওষুধ খাচ্ছি।

ইতি

ধূর্জটী

—রবিবার

লক্ষ্ণৌ

উত্তরা আশ্বিন, ১৩৩৬

২.

ভাই সুরেশ,

'উত্তরা' পেয়েছি। আমার চিঠিখানির অনেক অংশ বাদ দিলে ভাল কোরতে। তোমাকে চিঠি লেখা আমার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াল দেখছি। পূর্ব্বের চিঠিখানি বিছানায় শুয়ে লেখা, এ চিঠিখানি লিখছি চেয়ারে বোসে. কোট পাণ্টালুন পরে'। আশা করি, যদি এ চিঠিখানি প্রকাশিত হয়, তা হলে ভাল কোরে সম্পাদিত হয়েই বেরুবে। ভুলো না কিন্তু যে এটি প্রবন্ধ নয়। একে causerie বোলতে পার।

'উত্তরা' পেয়েছি বোল্লে ভুল বলা হবে। এক মাসের মধ্যে তিন সংখ্যা 'উত্তরা' এলে তাকে পাওয়া বলা চলে না। পূজার ছুটিতে যদি নিতান্ত আপনজনও স্বাস্থ্যের সন্ধানে কিম্বা মুসলমানী স্থাপত্য-শিল্প পরিদর্শনে এক-মাসের মধ্যে ত্রিধারায় তোমার বাড়ীতে অতিথি হন, তাহলে তাকে ভগবানের দান বোলবে— না আক্রমণ বোলবে? তুলনার সার্থকতা প্রত্যেক বাঙ্গালী

বুঝতে পারবেন! বিশেষতঃ 'পঞ্চপুষ্পে' কেদারবাবুর গল্পটি পড়ে। সব চেয়ে বুঝবে তুমি, কেননা তোমার কুটুম্ব ও বন্ধুবর্গ বসুধা-বিস্তৃত। ভাল কথা, কেদারবাবুর গল্পটি পড়েছ? এমন চমৎকার গল্প অনেকদিন পড়িনি।' কোলকাতার বাবু কাশীবাসী বন্ধুকে বাড়ী খুঁজতে বোলেছেন— বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে তাঁর ওপর কী নিষ্ঠুর অত্যাচারই না চলেছে! ভাল মটন্ আনা থেকে, বাজার করা পর্যন্ত সব কার্যই তাঁর দ্বারা করান চাই! ভদ্রলোকটির জ্বর হল, তবুও রক্ষা নেই। 'গরম গরম লুচি খেলেই সেরে যাবে— অভ্যেস আছে ত?' শেষকালে বন্ধুর শ্যালকটি, ব্যাপার বুঝে, কোলকাতার বাবুকে insomnia নামে একটি ভীষণ সংক্রামক রোগে বন্ধুর স্ত্রী ভুগছেন বোলে ভয় পাইয়ে দিলে। তারপর থেকে 'একেবারে cut'। বাবুটি তাঁর স্ত্রীকে বারণ কোরে দিলেন বন্ধুটির হাতে বাজারের পয়সা পর্যন্ত দিতে। তার পর দশাশ্বমেধ ঘাটে বাবুটি চাল ছাড়ছেন—'গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে সেই মোটা থামওয়ালা বাড়ী, চোখ এড়িয়ে যাবার জো নেই, মশাই', তারপর পিসীর অভ্যুদয়, পতন ও মূর্চ্ছা, বাবুটির অস্বীকার, দর্শকবৃন্দের করুণা ও ব্যঙ্গোক্তি। এই ধরণের গল্প লিখতে কেদারবাবু ওস্তাদ। ছোট ছোট বাক্যগুলি ঘটাং ঘটাং কোরতে কোরতে, পঞ্জাব মেলের মতন, গন্তব্যস্থলে চলেছে। লেখার প্রত্যেক লাইনটি চেঁচিয়ে পড় বন্ধুবান্ধবদের সামনে, বুঝবে লেখার মধ্যে কত irony। কেদারবাবুর বাক্যগুলি সব বচন— প্রত্যেকটি রস ও ভাবে ভরপুর। এই ধরণের মাইফেলী কিম্বা বৈঠকী-সাহিত্য আমাদের দেশে বড়ই বিরল। বাংলা-সাহিত্যে অনেক রস-রচনা খুঁজে পাওয়া যায় সেগুলি সুলিখিত হলেও, পড়ে শুনিয়ে আড্ডা জমান চলে না। অথচ এক ধরণের অন্ততঃ রসিকতা আছে সেটি উপভোগ করবার জন্য দলবদ্ধ হওয়া চাই। অবশ্য দলের মধ্যে থাকলে নিতান্ত তৃতীয় শ্রেণীর রসিকতা সর্বোচ্চ শ্রেণীর রসিকতা বোলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তুমি ত অনেক আড্ডায় মিশেছ— যাকে brilliant set বলে তার মধ্যেও তোমার অবাধ গতিবিধি আছে। বাড়ী এসে তোমার কি মনে হয় না সে সব রসিকতা অত্যন্ত ঠুনকো, ঝুটো, বেলোয়ারী? তুমি হয়ত বোলবে— 'সেই চোখের ইঙ্গিত, সেই ঠোঁটের বাঁকা হাসি, সেই চিন্তার ধারা, সেই সিগারেটের ধোঁয়া, সেই কাম-কটাক্ষ, এক কথায় সেই জমাট-ভাবের পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়— সেই জক্ষ টেট ডায়মণ্ড সাঁচ্চা হীরে মনে হয়। তার ওপর মুখ দিয়ে যে রসিকতা উচ্চারিত হয়েছে তার ধর্ম লেখা রসিকতার ধর্ম হতে ভিন্ন।'

তোমার কথাটি অনেকটা ঠিক— যদিও কোন্ জিনিষের কোন্ ধর্ম এখনও বুঝতে পারি না। আমি শুধু জানি যে আনাতোল ফ্রাঁস, ল্যাম্ব, কি ব্যারির বই বন্ধুবর্গ এলেই বন্ধ করি, মার্ক টোয়েন, অমৃতলাল, কেদারবাবুর বই বন্ধুদের পড়ে শোনাই। এঁদের প্রত্যেকের রস আলাদা, তবুও আমার মনে তাঁদের রচনা যে ধরণের প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে তার মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ কোরলাম। তুমি বোধহয় শুনলে আশ্চর্য হবে যে আমি আজকাল রবিবাবু ও বীরবলের রস-রচনা দরজা বন্ধ কোরে উপভোগ করি। ভারী ঠকেছি হে। একটি উপদেশ তোমাকে দিই। রবিবাবুর লেখা কাউকে পড়িয়ে শুনিয়ো না। কার কতটুকু culture, কখন কে কোন্ মেজাজে আছে বোঝা যায় না। কেদারবাবুর লেখা সকলকে পড়িয়ে শোনাতে পার— যখন তাঁর irony গরীব ভদ্র গৃহস্থ ছাড়া বড়লোক বুঝতে পারবে না, তখন তাঁর ভাব-প্রবণতার আবেদন সেই ক্ষতিপূরণ কোরবে। পিসীমার অশ্রুবর্ষণের সঙ্গে বড়লোকেরও অশ্রুবর্ষণ হবে— হয় দেখেছি। কেদারবাবু যদি আরো বেশী cynical হতেন তা হলে আমার বেশী ভাল লাগত। আমার কথা ছেড়ে দাও— সকলে মিলে যে আনন্দ উপভোগ করা যায় তার একটা মস্ত সামাজিক মূল্য আছে— সেইটাই কিন্তু একমাত্র কিম্বা চরম মূল্য নয়। নীরবতার মধ্যে যে যোগ সম্ভব, জনগণের সংখ্যায় তার বৃদ্ধি হয় না, বিয়োগই হয়। কেদারবাবুর সাধনা সরব। সেই জন্য তাঁর irony থাকলেও তিনি অনেক সময় ভাবের বেগ সহ্য কোরতে পারেন না।

* * *

এ মাসে কালীপ্রসন্ন বাবুর 'মধ্যযুগে বাঙ্গলা'— ডাক্তার বিমলাচরণ লাহার 'বৌদ্ধ রমণী', রবিবাবুর 'যাত্রী' ও 'শেষের কবিতা' আবার পড়লাম। তোমার 'মধুপ'খানিও পড়েছি। যুবা বয়স থেকেই সাহিত্যের— খুড়ী সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে এসে ভাষার ওপর তোমার দখল এসেছে। ভাষার সরলতা একদমে আমাকে গল্পের শেষে নিয়ে গেল। এর খানিকটা 'বিজলী'তে বেরিয়েছিল না? তোমার গল্পটি পড়ে আমার কেবল Rudolph Valentinoর কথা মনে হচ্ছিল। আজকাল কেউ কেউ ঐ ধরণের চরিত্র আঁকছেন। জীবনে দু' একটি মধুপ দেখিনি তা নয়। এক শ্রেণীর মধুপ নিতান্ত হাল্কা, ফুরফুরে প্রকৃতির এঁরা নিতান্তই superficial এবং optimistic। কোন একটা অনুপার্জিত গুণ এবং স্বোপার্জিত pose নিয়ে ব্যবসা চালান এঁরা। হয় চেহারা, না হয় পৈতৃক সম্পত্তি, হয় গল্প করার কি লেখার, না হয় গান

করার সামান্য ক্ষমতা এঁদের মূলধন। এঁদের পুরুষত্ব নারীর বৈপরীত্য মাত্র। এঁদের personality— কবি যাকে স্বরূপ বোলেছেন— তা মোটেই নেই কিম্বা সেটি গোটা কয়েক pose-এর অসংলগ্ন গুচ্ছ মাত্র। এঁরা ভীষণ কাপুরুষ, আত্মসম্মান-জ্ঞান রহিত। অন্য শ্রেণীর মধুপকে cynic বলা যেতে পারে। কোন এক ধাক্কা খেয়ে এঁদের দুর্বল প্রকৃতি এবং নিতান্ত জোলো আদর্শবাদ চুরমার হয়ে গিয়েছে। তাতে পৃথিবীর বড় বেশী লাভ ক্ষতি হয় না— তাঁদের মতন ভাবপ্রবণ গোটা কয়েক মেয়েদের জীবন বিগড়ে যাওয়া ছাড়া। এঁদের আত্ম-সম্মান জ্ঞান মানে শিশুসুলভ self-consciousness। শিশুকালের কুশিক্ষা ও অশিক্ষাজনিত introversionকে এবং অন্যান্য অভ্যাসের স্থিতিশীলতাকে রক্ষা করার জন্য এঁরা সর্বদাই একটা মুখোষ পরে থাকেন। এঁরা সর্বদা পৃথিবীর যাবতীয় ভদ্র ও শিক্ষিত লোক— বিশেষ কোন দুর্বল স্ত্রীলোকদের প্রতি প্রতিশোধ নিতে ব্যগ্র। এঁরা স্ত্রীলোকদের হৃদয় পদদলিত কোরে, সিগারেট টানতে টানতে দেশভ্রমণে যান। দুই দলই সমানরূপে incorrigible sentimentalist। মধুপদলের এই মিথ্যাটুকু তুমি ধরিয়ে দাও নি। স্ত্রী-চরিত্রগুলি বুঝতে পারি নি। কেই বা পেরেছে বল?

আমাকে ভুল বুঝো না। মধুপ আঁকবে না কেন নিশ্চয়ই আঁকবে। তবে তোমরা গল্পে ঘটনাকে তাচ্ছিল্য কর, তোমাদের মন নিয়ে কারবার— অতএব মানসিক বিশ্লেষণে তোমাদের ভুল থাকা অন্যায়। Ethics মান আর নাই মান— সে তোমার অভিরুচি— কিন্তু pshychologist হয়ে ভুল বিশ্লেষণ কোরলে তোমার নিজের কার্যে গাফিলতী দেখান হয় না কি? শৈলজানন্দ বাবু 'দিক্‌ভুলে' এই ভুলটি কোরেছেন। সে গল্পের নায়কটি ধর একজন ভাল মানুষ। সব মেয়েরাই ধর তাকে ঠকিয়েছে। তার প্রতিক্রিয়াতেই ধর সে বিবাহিত (?) স্ত্রীকে ষ্টেসনে ফেলে চলে গেল। কিন্তু এই চরম ঘটনাতেই কি নায়কের চরিত্রের চরম স্বরূপ বর্ণনা হল! প্রত্যেক cynic যে মূলতঃ দুর্বল ব্যক্তি ও introvert— কুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত poseur, সেটি কি দেখান হল। শৈলজাবাবু তাঁর নায়ককে object of creation হিসাবে শ্রদ্ধা করেন নি। একটা মানুষ শুধু bundle of sensations কিম্বা poses নয়— যদি তাই ভাব তা হলে মানুষকে চেন নি। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'বেদে' পড় আর Hamsun এর Wanderers পড় বুঝবে সত্য বলছি না মিথ্যা বলছি। সৃষ্টির গোড়ায় প্রেম থাক আর নাই থাক শ্রদ্ধা থাকা চাই। মনোবিজ্ঞানে

conditioned reflex চলতে পারে। কিন্তু সাহিত্যে গোড়া থেকে একটা গোটা মানুষ ধরে নিতে হয়।

* * *

কালীপ্রসন্ন বাবুর বইতে ঐতিহাসিক অংশটুকু ধোপে টেকে কিনা জানি না। বাংলা দেশের মধ্যযুগ সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। বোধ হয় টেঁকে। রাখাল বাবুকে জিজ্ঞাসা কোরো। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটন কোরতে কোরতে এমন মধুর হাস্যরসের অবতারণা করা যায় জানতুম না। ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী ইতিহাস পড়ে পড়ে আমাদের ধারণা এই হয়েছে যে নিজেকে বিদ্বান প্রমাণিত কোরতে গেলে হাসলে চলবে না। বিদ্যার সঙ্গে হাসির সম্বন্ধ নেই আমাদের বিশ্বাস হয়েছে। এত বড় ভুল ধারণা আর দুটি নেই। যে লোক বিদ্যার চাপে মারা যায় তারই হাসি বন্ধ হয়। যে লোক একটা সিদ্ধান্তকে fetish কোরেছে, তাঁরই ঠোঁট বন্ধ। কালীপ্রসন্ন বাবুর strong common sense তাঁর স্বদেশপ্রীতি এমন কি ধর্ম বিশ্বাসেরও উপরে। তিনি অল্পদিন হল মারা গিয়েছেন— দেশের কয়জন সে খবর রাখে? সামান্য একটি জেলাস্কুলের মাষ্টারি করতে করতে অমন research করা যায় ভাবতে পার? বি, এ, এম, এ ক্লাসের ছেলে ঠেঙাতেই প্রাণপাখী উড্ডীয়মান হয়, ত স্কুলমাষ্টারি দূরের কথা! ভদ্রলোকটি সত্য সত্যই সদ্‌ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ বড় বেগে ব'নে গিয়েছি।

* * *

একটি বিবাহিতা মেয়ে মহাভারত পড়েছিলেন। পড়বার পর তাঁর মুখরা ননদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'পড়ে কি শিখলি বৌ?'

বৌটি উত্তর দিয়েছিলেন, 'পাঁচটি পর্যন্ত চলে।'

ননদের হস্তে মুখাগ্নির পর বৌটি ধীরে ধীরে উত্তর দিয়েছিলেন— 'তবু ত শ্বাশুড়ী ঠাকরুণকে অমান্য করেছি— দেবতাদের ধরিনি।'

বিমলাচরণ লাহার 'বৌদ্ধরমণী' পড়ে আমি ঐ ধরণের গোটাকয়েক অনৈতিহাসিক সার কথা শিখেছি।

(১) বুদ্ধদেব স্ত্রীলোকদের সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। শ্রীমতিরা প্রবেশ কোরলেই সঙ্ঘের সর্বনাশ হবে এই তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী ছিল। আনন্দের পাল্লায় এবং তাঁর ধাইমার অনুরোধে তিনি শেষে অনুমতি দিয়েছিলেন বটে— কিন্তু আটটি অনুশাসন এবং গোটা পঞ্চাশেক কঠিন আজ্ঞা প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতি নেবার পর। বুদ্ধদেব জ্ঞানী ছিলেন

পরে প্রমাণিত হয়— আনন্দই দেখছি first champion of womankind— সাধে কি আর নাম আনন্দ হয়েছিল ? দুটি অনুশাসনের উল্লেখ করছি— 'ভিক্ষুণীর বয়স যদি একশত বৎসরও হয় তাহা হইলেও তাকে একজন তরুণ ভিক্ষুর আরাধনা করিতে হইবে।' 'কোন ভিক্ষুণী কোন ভিক্ষুর সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিবে না, কিন্তু ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারিবে।' …(১০৭—১০৮) আমি ভাই আর একটি অংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ কোরতে পারছি না— মনোযোগ দিয়ে পোড়ো।

'হে আনন্দ, রমণীরা যদি গৃহস্থাশ্রম ধর্ম ত্যাগ করিয়া তথাগতের নিয়ম ও অনুশাসন অনুসারে সন্ন্যাগ্রহণের অনুমতি লাভ না করিত, তবে এই ধর্ম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত, এই উৎকৃষ্ট অনুশাসনগুলি, হাজার বৎসর পর্যন্ত টিকিয়া থাকিত। কিন্তু আনন্দ, যেহেতু রমণীরা এই অনুমতি লাভ করিয়াছে সেই হেতু পবিত্র ধর্ম দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইবে না এবং এই উৎকৃষ্ট অনুশাসনগুলিও পাঁচশত বৎসর মাত্র চলিবে। হে আনন্দ, যে গৃহে বহু নারী বাস করে সে গৃহ যেমন দস্যুতস্করের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়, ঠিক সেইরূপ যে ধর্ম অনুশাসন অনুসারে নারী সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের সুবিধা পায় সে ধর্মও দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। হে আনন্দ, উৎকৃষ্ট ধান্যক্ষেত্রও চিতি ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইলে সে ক্ষেত্রও যেমন দীর্ঘকাল ভাল অবস্থায় থাকে না, ঠিক সেইরূপ যে ধর্ম ও অনুশাসন অনুসারে নারী গৃহধর্ম পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণের সুযোগ পায় সে ধর্মও দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারে না। হে আনন্দ, কোন কোন উৎকৃষ্ট ইক্ষু ক্ষেত্রে ক্ষয়রোগ স্পর্শ করিলে সে ইক্ষুক্ষেত্র যেমন টিকিতে পারে না, ঠিক সেইরূপ যে ধর্ম ও অনুশাসন অনুসারে নারী সংসার ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস-গ্রহণের সুযোগ পায় সে ধর্মও দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারে না।' বিমলাবাবু বিনয় পিটক ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩২৫-২৬ থেকে তর্জমা কোরেছেন।

(২) বৌদ্ধ রমণীদেরও রীতিমত পর্দা ছিল। বেচারী মুসলমানদের শুধু দোষ দিলে চলবে কেন ? শুধু তাই নয়, অনেক গল্পে মেয়েদের সতীত্ব বজায় রাখবার পরীক্ষা করবার জন্য কেল্লার মতন প্রাসাদে আবদ্ধ রাখা হত— চারধারে প্রহরী রাখাও হত, তবুও মেয়েরা ইচ্ছা কোরলে কুপথগামিনী হতে হতে পারতেন।

(৩) রাজপুত্রী ও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের চোরের সঙ্গে প্রেমে পড়বার দৃষ্টান্ত আছে। আধুনিক সাহিত্যিকদের 'নারীচরিত্র' ও 'বৌদ্ধযুগে নর্তকী ও বারবণিতা' বিশেষ কোরে প্রথম প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করি। তাঁদের

সেই একঘেয়ে ভাব ও তৃতীয় শ্রেণীর বিদেশী সাহিত্যে অনুকরণ দোষ খানিকটা লঘু হতে পারে। যদি sunily stories লোকে চায় তা হলে জাতক পড়লেই যথেষ্ট হয়।

বিমলাবাবু যদি উপক্রমণিকাতে একটু textul criticism কোরতেন তা হলে আমাদের মত অজ্ঞদের অনেক সুবিধা হত— এই যেমন কোন জাতক কতটা বিশ্বাস করব— কোন্‌টি কোন্‌ সময়ের লেখা— কোন্‌ অংশ প্রক্ষিপ্ত। এই ধরণের কোন পরিচ্ছেদ না থাকার জন্য আমার ভারী অসুবিধা হয়েছে।

* * *

হঠাৎ একটা কথা মনে হল। বিবেকানন্দ বাইরে থেকে হিন্দু হলেও, হিন্দুসমাজে জন্মালেও, তিনি সত্যকারের বৌদ্ধ ছিলেন। আমি শুধু ভিক্ষু হওয়া সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠান, দেশভ্রমণ কিম্বা missionary spirit এর কথা বলছি না। সেখানে মিল ত আছেই। আমি বলছি করুণার কথা, মানব-প্রেম; humanism যাই বল, করুণা বোল্লেই ভাল হয়। বৈজ্ঞানিক-যুগের আদিতে লোক-সংখ্যা— বিশেষতঃ অগ্নি-উপাসক আচার্যদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল বলা যায়। তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে, গ্রামে গ্রামে নিজেদের cult প্রচার করছেন শোনা যায় না। তাঁদের সঙ্গে রাজা-রাজোয়াড়াদের কারবারই বেশী ছিল মনে করা অসঙ্গত নয়। রাজারা অনার্য হলেও অসভ্য ছিলেন না। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার সভ্যতা শুধু বর্বর সভ্যতা নয়। বিদেশী উপাসকদের প্রথম শিষ্য রাজা-রাজোয়াড়ার দল। সাধারণ মানুষদের প্রতি আর্যদের প্রীতি ইংরেজদের মতনই খানিকটা ছিল। সে সময় মনুষ্যত্বের মূল্য দেওয়া হত— নিজেদের মধ্যে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানাদি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার ক্ষমতার ওপর,— বিদেশী অর্থাৎ ভারতবাসীর পক্ষে, আর্যধর্ম গ্রহণের তৎপরতার ওপর। অবশ্য আর একদল মানুষও উপকারী জীব বলে গন্য হতেন— তাঁরা ব্রাহ্মণ-পোষক, সেবারত ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দল। বলা বাহুল্য আমি সব গোড়াকার কথা বলছি। পরে অবশ্য ঋষি-সমাজে বিজ্ঞানকেই সব চেয়ে বেশী মূল্য দেওয়া হত। কিন্তু এতে সমাজের বেশী লাভ হল না। আর্যেরা ধর্ম-প্রসারের দিকে তত লক্ষ্য না দিয়ে অল্প পরিসরে ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছিলেন। পরে এই ছোট নজর বড় হতে বাধ্য হল। কয়েক শতাব্দী পরে, মানুষের সংখ্যা বাড়ল, সভ্যতার অন্যান্য মুখ খুলল, দ্রাবিড় ও অন্যান্য জাতি বৈদিকধর্মে প্রভাবান্বিত হল, আর্যধর্ম ও আদিম সভ্যতা থেকে অনেকাংশ গ্রহণ করল। ভাষার পরিবর্তন হল, ভৌগোলিক জ্ঞান বাড়ল।

দেশে tribal rule এখন আর্য-সভ্যতার কেন্দ্রের বাইরে জোর চলছে— গ্রীসে, রোমে, জার্মাণীতে যেমন পরে চলেছিল! বুদ্ধদেব জন্মালেন ভারতে এমন এক পার্বত্য প্রদেশে যেখানে মোটামুটি tribal government-ই চলছে বলা যায়। বিলাসে বুদ্ধের মন ভিজল না, ক্ষাত্রধর্ম তাঁকে বশ করতে পারল না। তিনি গেলেন নিজের মতে নিজের ও জগতের দুঃখ পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে। তাঁর সমস্যা সত্যিকারের সমস্যা— অর্থাৎ সেটি ঘনিষ্ঠ ভাবে জীবনের সঙ্গে জোড়া অত্যন্ত practical— যাগ-যজ্ঞের সমস্যা নয়, যাগ-যজ্ঞ দ্বারা সে সমস্যার পূরণও হত না। তাঁর সমস্যা মানুষের সমস্যা— আনুষ্ঠানিক নয়, স্মৃতির নয়, ন্যায়ের নয়। তখন স্মৃতি বা ন্যায় ছিলই বা কতটুকু? পূর্বের বর্ণনার মূল কথা যদি মান, তাহলে বুঝবে যে বুদ্ধের পক্ষে আনুষ্ঠানিক কিম্বা বৈদিক ধর্ম থেকে সরে যাওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল। যে নিজে চোখ মেলে চলে, সে কি কখনও চোখ বুজতে পারে, কিম্বা কোন গুহ্য-ধর্মে বিশ্বাস করতে পারে? বুদ্ধ ছিলেন একটি গোটা মানুষ— সেই জন্য তিনি humanist হতে পেরেছিলেন। তিনিই জগতের আদি humanist— তাঁর হৃদয়ে অত করুণা, তাই তিনি সত্যকারের প্রথম প্রচারক, তাই তাঁর ধর্ম সর্বসাধারণের, তাঁর ভাষা অত সোজা, তাঁর উপদেশ তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম গ্রন্থ প্রচলিত ভাষায় রচিত। বুদ্ধই মানুষকে মানুষ বলে প্রথমে গণ্য করেছিলেন। তারপর কয় শতাব্দীর পর সব গেল বিগড়ে— প্রথমতঃ এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং আনন্দের জন্য।

বিবেকানন্দকে বুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করছি না। প্রমাণ করছি বিবেকানন্দ বৌদ্ধ ছিলেন। বুদ্ধের মতন বিবেকানন্দ অ-ব্রাহ্মণ বংশে জন্মান— নিজে চোখ খুলে সংসার দেখেছিলেন। বুদ্ধের জন্ম tribal democracy-র যুগে— বিবেকানন্দের জন্ম political democracy-র যুগে। বুদ্ধ সত্যের সন্ধানে দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন— বিবেকানন্দও একরকম শাস্ত্র অমান্য করে একবার পওহারী বাবা, একবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কত সাধু সন্ন্যাসীর কাছে যাতায়াত করতে লাগলেন— মুখে এক প্রশ্ন— স্বচক্ষে অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেউ ভগবান দেখেছেন কি না? শেষকালে যাঁর শিষ্য হলেন তিনিও রীতিমত হিন্দু-শাস্ত্রানুযায়ীযোগী [?] নন। এখন দুটি কথা মনেরেখো। পওহারী বাবার শিষ্য না হওয়া মানে কি? যদিও পওহারী বাবা সাধারণ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকতেন, যদিও তাঁর হৃদয় করুণায় ভরপুর ছিল, তবুও তাঁর শিষ্যত্ব-গ্রহণকোরলে বিবেকানন্দের কর্ম-জীবন সম্পূর্ণ হত না। সে জন্য আত্মশক্তি অর্জনের প্রয়োজন ছিল। পরমহংসদেব বিবেকানন্দকে সব সাধনাই শিখিয়েছিলেন— নিজের

সংস্কার অনুযায়ী বিবেকানন্দ নিজের পথ বেছে নিলেন। তিনি চিরকাল বুড়ী ছুঁয়েই থাকতে চান নি— বুড়ী ছোঁবার পরই তাঁর কর্মে স্বাধীনতা এসেছিল। এ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে তুমি জান। এক কথায় বিবেকানন্দের ব্রহ্মজ্ঞান flash-এ আসত— যখন কর্মের আবর্তে পড়তেন ধুত্তোর বোলে আবার যোগে বসতেন— আত্মস্থ হতে। কেন বিবেকানন্দ নির্বিকল্প সমাধির লোভ ত্যাগ করলেন? কেন তিনি পওহারী বাবার শিষ্য হয়ে রইলেন না? একমাত্র কারণ এই যে তাঁর হৃদয় করুণায় ভরপুর ছিল— এ করুণা sentimentality of a social reformer নয়। এ চোখ-খোলা করুণা, একে শ্রদ্ধাও বলতে পার। কিন্তু এক চোখো শ্রদ্ধায় বড় বেশী কাজ হল না। মানুষের যেমন দুটি চোখ আছে, তার একটি মাত্র থাকলে যেমন হয় বদলোক, নয় দৈত্য হয়— স্বাভাবিক মানুষ হয় না, তেমনি সংসারের মধ্যে থেকে আশ্রম স্থাপন কোরব, সঙ্ঘ স্থাপন কোরব— অথচ কামিনী-কাঞ্চন ছোঁব না— অর্থাৎ স্বাভাবিক বৃত্তিকে অশ্রদ্ধা কোরব— তা হলে সঙ্ঘ ও আশ্রম ভেঙ্গে যেতে বাধ্য। পরিত্যক্ত স্বাভাবিক বৃত্তি অস্বাভাবিক সঙ্ঘের ওপর প্রতিশোধ নেবেই নেবে। একেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ। বুদ্ধের ধর্মের ওপর স্বভাবের আক্রোশ ছিল, বিবেকানন্দের পরবর্তী আশ্রমবাসীদের ওপর স্বভাব সেই ধরণের আক্রোশ ফলাচ্ছে। সেইজন্য বলছিলাম দোষে গুণে বিবেকানন্দ ছিলেন বৌদ্ধ। হিন্দু-সমাজে মানুষের স্থান আগেভাগেই ঠিক করা। এ-সমাজে মানুষের মানুষ হিসাবে খাতির নেই। হিন্দু-সমাজ শুধু নিশানা ঠিক করে। হিন্দুসমাজ যদি কিছু একবার গ্রহণ কোরল ত' আর রক্ষা নেই— অনন্তকাল ধরে তাই চলল। বৌদ্ধধর্মের সর্বনাশ হল হিন্দু সমাজের খপ্পরে পড়ে। ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে হজম করে ফেলেছে, আছে শুধু গাজনদার, নেড়া-নেড়ীর দল, নাথ-সম্প্রদায়, পুরাতন স্তূপ আর গুহা। চৈতন্য মহাপ্রভু একবার মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্য কোরতে গিয়েছিলেন। খালের জলে জমির সারাংশ ভেসে যায়, তেমনি মহাপ্রভুর কান্নার স্রোতে সব গেল ভেসে— রইল শুধু alkaline deposits। বর্তমানে যা কিছু মানব-প্রীতি বা শ্রদ্ধা দেখছ সব রাজা রাম-মোহনের কৃপায়। ভাগ্যিস্ ব্রাহ্ম-সমাজ ভেঙে যায় তাই রাজা রামমোহনের মর্যাদা দিতে আমরা শিখি। আজকাল শুধু বড়লোক এবং জ্ঞানমার্গের পথিক [নিয়ে] ব্রাহ্মসমাজ তৈরী নয়। প্রত্যেক শিক্ষিত পুরুষ নারী culturaly ব্রাহ্ম হয়েছেন। তুমি বলবে এখানে হিন্দুসমাজ ব্রাহ্ম-ধর্মকে হজম করেছে। আমি ঠিক উল্টো কথা বিশ্বাস করি। সমগ্র হিন্দু সমাজকে ব্রাহ্মধর্ম টেনে তুলেছে।

যাই বলি, যাই করি, এই হিন্দু সমাজকে বাহবা না দিয়ে থাকা যায় না। যেন রেকৃতার গাঁথুনি! যেন জার্মান organisation! নচেৎ জাভা কি বালি দ্বীপে কি এখনও হিন্দু সভ্যতা টিম্ টিম্ করত? 'যাত্রী' পড়ে দেখ বুঝবে, হিন্দু সভ্যতার কামড় একেবারে কচ্ছপের কামড়। মুসলমান এল, ওলন্দাজ এল, তবুও এই দ্বীপবাসীরা হিন্দু রইল। 'যাত্রী'খানা ভাল করে পোড়ো এবং 'শেষের কবিতা' ত পড়েইছ। এ বই দু'খানা সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কবি একজন train sociologist এর চেয়েও বেশী দেখেন। আশ্চর্য হবার না— কেননা কবি এবং আর্টিষ্টই একমাত্র সম্পূর্ণ জীব বাকী আমরা সব অসম্পূর্ণ বক্তি।

এক রবিবার

ধূর্জটী

উত্তরা, কার্তিক, ১৩৩৬

৩

ভাই সুরেশ,

তোমার চিঠি ও উত্তর পেয়েছি। দিলীপকুমারের লেখাটি আমার খুব ভাল লেগেছে। তার মতের সঙ্গে আমার মতের কোন মিল না থাকলেও, তার সততা এবং পরিশ্রমকে শ্রদ্ধা করি। বিচিত্রার কার্তিক সংখ্যায় আমি ঠিক উল্টো কথাই লিখেছি হয়ত তোমাদের মনে হবে। অনেকের ধারণাও তাই। তা নয়, ঠিক বিপরীত কথা লেখা বা বলা অতি সহজ— বিচিত্রার প্রবন্ধটি আমি আরাম-কেদারায় শুয়ে লিখিনি, তোমাকে চুপি চুপি বলছি। তোমাকে এই চিঠিখানি যেমন করে লিখছি সেইভাবে লিখলেও কষ্টের অনেক লাঘব হত। আমার ভাষা এবারও আড়ষ্ট হয়েছে, লিখেছ। বিষয় অনুসারে ভাষাও শক্ত হতে বাধ্য। আমি যদি ইচ্ছা করে শক্ত করতাম, তা হলে আমার লজ্জার কারণ ছিল। তোমার উপদেশ আমি মনে রাখব। যদি আমাদের মতন সামান্য পরাধীনের জন্মগ্রহণে স্ত্রীজাতির অতি কষ্ট হয়ে থাকে, তা হলে স্বাধীন চিন্তার প্রসব বেদনায় তার চেয়ে কত বেশী কষ্ট হবে, অনুমান কর দেখি? চিন্তার জগতে আমরা নিতান্তই পরাধীন অবশ্য। আমি চেষ্টা করি স্বাধীন ভাবে ভাবতে— কোথা থেকে শ্রুতি, স্মৃতি আমাকে মুহূর্তে কোলে তোলে। তার ওপর অধ্যাপক-সুলভ নাস্তিকতাও আছে। আমি

বলি, যাঁরা অধ্যাপক নন, যাঁদের পড়া ও পড়ান ছাড়া চিন্তা করবার অবসর আছে, তাঁরা অত বিদেশীভাব উদ্ধৃত কোরে নিজেদের ক্ষমতাকে খর্ব ও অবসরকে অমান্য করেন কেন? দিলীপকুমার Whitehead, Russell, Eddington-এর বচন উদ্ধৃত কোরে প্রবন্ধের ভার বাড়িয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশ পড়ে অনেক অধ্যাপকের ও ছাত্রের দল অভিভূত হতে পারে, হবেও। কিন্তু দিলীপকুমার যোগ দিয়েছেন—তাঁর কাছে Whitehead-ই বা কি, আর Eddington-ই বা কি? তাঁর মোহ না থাকাই উচিত। আমার কাছে ঐ সব সাহেবদের মতের মূল্য আছে, কেননা আমি সাহেবের নুন খাই, এবং আমার কর্তব্য সাহেবী মতের পক্ষপাতী, এবং আবার বিজ্ঞে-বুদ্ধির দৌড় ঐ পর্যন্ত। আমার সামান্য বুদ্ধি দিয়েই বুঝেছি যে, Whitehead ও Eddington বিজ্ঞানের চরম কথা বলেন নি এবং দর্শনের গোড়ার কথাও বলেন নি। দুজনেরই, Russell-কেও ধরতে পার, বিদ্যা অঙ্কশাস্ত্র পর্যন্ত—এক Whitehead ছাড়া বাকী দুজনের একজনও ইতিহাস জানেন না—অন্যান্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানে কি হচ্ছে তার সম্বন্ধে পরিচয়ের ছাপ তাদের লেখায় পড়েনি। Eddington-এর দুখানা বইই একটু মন দিয়ে পড়লুম। সব বুঝি নি—তবু এইটুকু বুঝেছি যে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতার ভাষা বদলে তিনি বোলছেন 'এই ধর্মেই জন্ম যেন, এই ধর্মেই মরি।' ধর্মটি হচ্ছে Quake-rism বনাম Society of Friends। ধর্ম সম্বন্ধে এই সব বৈজ্ঞানিকের দ্বারস্থ হওয়ার মতন পাপ আর নেই। যতটুকু এঁরা অঙ্ক কিম্বা পদার্থ-বিদ্যার সমালোচনা কোরছেন ততটুকু এঁদের কথা প্রণিধান-যোগ্য। এ ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্বন্ধে এঁরা বলতে পারেন না—এই কথাটি আমার মতন দাসমনোভাবাপন্ন—রাসেল-ভূতগ্রস্ত লোকের জানবার বাধা থাকলেও, অন্য কারুর বাধা থাকা উচিত নয়।

তর্ক ছেড়ে দাও। একটু আনন্দ করা যাক্। মাসিক বসুমতীর আশ্বিন সংখ্যায় তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাতে প্রমথ চৌধুরীর সহযাত্রী বলে একটি গল্প বেরিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এই রকম গল্প খুব কম আছে। পড়ে আমি যে কি আনন্দ পেয়েছি তা বোলতে পারি না। তুমি ত অনেক গল্প পড়, অনেক লিখেছ। তোমার কি মনে হয় না যে, এই গল্পটি বাংলা ছোট গল্পের অংশ! এর গল্পাংশ, এর কৃতিত্ব, এর technical affection, এর সংযম, এর রস, এর গতি, এর intensity, activity, এর রসিকতা, এর ভাষা

একেবারে অনন্ত। যেন একটি ফিরোজা— নীল, নীরেট, নিটুর, নিষ্কাম। পাথর কাটলে দাম অনেক কমে যায়— তবুও বিশ্লেষণ করার লোভ সামলাতে পারছি না। যদি আমার বিশ্লেষণ ও বিচার ঠিক হয়, তা হলে তোমার উপকার হবে। আমার অনুরোধ, তুমি এবং তোমার সাহিত্যিক বন্ধুরা যেন এই গল্পটি মন দিয়ে পড়। Classic পড়ার মতন শিক্ষা আর নেই— বিশেষতঃ, তাদের— যাদের গল্প লেখায় হাত আছে। এক এক সময় মনে হয় যে, আমাদের ভাষার শক্তিশালী লেখকদের জাতক, কথাসরিৎসাগর, মহাভারতের গল্প, গ্রীক ও ফরাসী ড্রামা, হাইনের গল্প ও তুর্গেনিভ এবং চেহভের গল্প মুখস্থ কোরতে অনুরোধ করি। প্রত্যেক বইয়ের প্রত্যেক গল্পের technique বুঝতে না পারলে সব পণ্ডশ্রম। নতুন technique-এর যথেষ্ট মূল্য আছে। যে সব জাতির ঐতিহ্য নেই, সে জাতীয় সাহিত্যে অনেক নতুন পরীক্ষা করা চলে। আমাদেরও পুরাতন রূপ নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। কিন্তু এখন দেখি, লেখকের মনে কিম্বা লেখায় discipline-এর আলোই নেই, তখন আমি বাধ্য হযে technician হয়ে পড়ি। তুমি কি ভাব যে, Proust কিম্বা তাঁর শিষ্য Joyce-এর লেখা সবই এলোমেলো ?

সৃষ্টি করা অত সোজা নয়। আর্টিষ্টের তিনটি বস্তু চাই,— এক অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয়তঃ সেই অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা এবং চরম কথা প্রকাশের রূপ। আমি আর্ট-এর অর্থ কি জানি না, টলষ্টয় ও অস্কার ওয়াইল্‌ড্‌ কি ক্লাইভ বেলের উক্তি আমার কাছে বেদ-বাক্য নয়। যখন দেখি, আর্টিষ্ট শুধু অভিজ্ঞতা নিয়ে কারবার চালাচ্ছেন, তখন শুধু সেই অভিজ্ঞতার অভিনবত্ব, প্রাচুর্য প্রভৃতি গুণ দিয়ে সেই কারবারের bona fide যাচাই করি। যখন দেখি, শুধু প্রকাশই আছে বাকী দুটো নেই, তখন হঠাৎ বড়লোকের বৈঠকখানা যেমন দেখতে ইচ্ছা হয় অথচ ভাল লাগে না, তেমনি ভাষার কেরামতি উপভোগ কোরতে ইচ্ছা হয়, অথচ বেশীক্ষণ পারি না। তুমি ক্রোচের নজীর দেখাবে ? তাঁর মত যদি সত্য হয় তা হলে দু চারটে ফুটকি দিয়ে, কিম্বা 'হুঁ হুঁ বাবা' লিখেই অনেক গূঢ় ভাব ব্যক্ত করা যেত, তা হলে কোন ব্রাহ্মের বাড়ীতে বাঁধান ছবির ছবি খুলে গিয়ে যদি শুধু ফ্রেমটি থাকত, সেইটাই হত নিরাকার ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ ছবি। কিন্তু যেখানে অভিজ্ঞতা প্রকাশের নীতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে রূপ নিয়েছে সেইখানেই রস উপভোগ করি। এই আমার মোটা বুদ্ধিতে আসে। প্রমথবাবুর সহযাত্রীতে আমি সত্যকারের রস পেয়েছি।

দেখা যাক, লেখকের কি অভিজ্ঞতা ছিল ?

লেখক আত্মীয়ের অসুখ শুনে একটি slow passenger ট্রেনে যাচ্ছেন— সারারাত ঘুম হয় নি, শরীর ক্লান্ত, মন উদ্বিগ্ন, গাড়ী থেকে নেমে চা খেতে গিয়েছেন, ফিরে এসে দেখেন একটি অদ্ভুত পোষাক পরা, ইংরেজী আদব-কায়দা দুরন্ত শিকারী-সন্ন্যাসী গাড়ীতে বোসে এক সাহেব গোড়ার সঙ্গে বন্দুক-সমালোচনায় ব্যস্ত। সাহেবরা যাবার পর এই অস্থির প্রকৃতির সন্ন্যাসী লেখককে debonnaire ভাবে তাঁর জীবন-কাহিনী বললেন। জীবন-কাহিনী আর কিছুই নয়, একজন অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোক প্রতিহিংসা নেবার জন্য বন্দুক-হাতে ট্রেনে ঘুরে বেড়ান। অভিজ্ঞতার মূল কথা এই। গোড়াতে আছে স্বপ্ন কি সত্য এই প্রশ্ন, শেষেও তাই। এই প্রশ্নে গল্পের tension কেটে গিয়েছে। নচেৎ গল্পটি নেহাৎ melodramatic হয়ে যেত এবং পাঠক-পাঠিকার মনে গল্পাংশের সত্য-মিথ্যা নিয়ে তর্ক উঠত। একেই বলে— মুখবন্ধ অর্থাৎ পাঠকের মুখবন্ধ করা। অভিজ্ঞতাটি সত্যও হতে পারে কাল্পনিকও হতে পারে। আমাদের কিছু আসে-যায় না। আসে-যায় কি জানো অভিজ্ঞতার প্রতি কিম্বা সম্পর্কে লেখকের মনে কি ভাব হয়েছিল— সেভাব, ফুটে উঠেছে কি না এবং ভাল করে ফুটেছে কি না ?

ভাব দুটি— terror ও pity— আশঙ্কা কিম্বা আতঙ্ক এবং অনুকম্পা। বড়ই পুরাতন ভাব, সেই পুরাতন নিয়তির কথা মনে হয়, সেই গ্রীক নাট্য-কারদের লেখা স্মরণ হয়, Aristotle-এর নিয়ম মনে পড়ে। বলা বাহুল্য, আতঙ্ক কিম্বা ভাবটির রূপ দেওয়া ভারী শক্ত কাজ। যদি পুরোপুরি ভাব বর্ণনা করা হয়, তা হলে জোর ভূত, কিম্বা ডিটেক্‌টিভের গল্প হতে পারে, না হলে পো'র হতে চাই। তবেই রক্ষা হয়। পো কি করে রক্ষা করেছেন জানই ত ? Strangeness-এর উপর জোর দিয়ে। এই ধরণের গল্পে একটু strangeness এবং surprise-element আনতে হয়। প্রমথবাবু তাই কোরেছেন। প্রমথবাবু আর একটি ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন, যেটি পো সাহেবের ছিল না, প্রমথবাবুর আছে, অর্থাৎ wit। রবিবাবুর কঙ্কাল গল্পটি পড়লেই বুঝবে যে কি কোরে সাধারণ জীবনে অপরিচিতের পরিচয় ঘটিয়ে পাঠককে বিস্ময়ে অভিভূত কোরে দেওয়া যায়। রবিবাবুর ক্ষুধিত পাষাণ, প্রমথবাবুর আহুতি, আর ধর বিভূতি বন্দ্যোর সেই পদ্মার গল্প এক ধরণের। সহযাত্রী কিন্তু সে ধরণের নয়। এ গল্পে শঙ্কার উদ্রেক হয়— কিন্তু ঠিক আতঙ্ক হয় না। মনে হয়, এই প্রতিহিংসা-পরায়ণ শিকারী সন্ন্যাসীর শিকার বুঝি আ

ধরা পড়ল, পড়ল। অন্য লাইনে ট্রেন ছুটে চলল, বন্দুকের আওয়াজ হল, হল, কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর নিজেই টোটা সরিয়ে রেখেছেন— dramatic irony-টা দেখলে? দ্বিতীয় ভাবটি অনুকম্পা। কোনও একটি ছত্রে লেখকের সহানুভূতি ফেনিয়ে ওঠে নি— অথচ সব গল্পটি পড়লে মনে হয় যে সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুরকে প্রমথবাবু শ্রদ্ধা করেন, তাঁর আভিজাত্য, তাঁর প্রতিহিংসা, তাঁর তেজ, তাঁর আচার-ব্যবহারে, কথা-বার্তায় খানদানী ছাপ, এবং সবচেয়ে তাঁর realism-এর জন্য। যে লোক অমন মজা করে নিজের জীবন-কাহিনী ব্যক্ত কোরতে পারে, যে লোক সন্ন্যাস গ্রহণের এবং বৈরাগ্যের ঐ রকম আধিভৌতিক ব্যাখ্যা কোরতে পারে, যে লোকের প্রত্যেক ব্যবহার বুদ্ধিমানের মতন, শুধু প্রতিহিংসা সাধনের জন্য বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ান ছাড়া, তাকে realist বলব না ত কি বলব? এই realism খাঁটি জিনিষ, এর মধ্যে ভাবপ্রবণতার ভেজাল নেই শুনেছি, এক-আধ জন এই রকম monomaniac থাকে, তাদের প্রত্যেক কাজ সাধারণ, একটি বিষয় ছাড়া— এ জন্য বোধ হয় প্রমথবাবু সন্দেহ জাগিয়ে দিয়েছেন যে, সিতিকণ্ঠ এত দিনে পাগলা-গারদে। সে হয়ত গাড়ীর মধ্যে যেমন নেকড়ে বাঘের মতন পায়চারী করছিল, জানলা দিয়ে উঁকি মারছিল, এখনও পাগলা-গারদের মধ্যে হয়ত তাই কোরছে, আর 'এই গাড়ী, এই গাড়ী!' বলে চেঁচাচ্ছে। আমার কল্পনা এইখানে ক্ষান্ত হয় না— মনে হয়, প্রমথবাবু সন্ধান পেয়ে, সেই পাগলা গারদে সিতিকণ্ঠ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা কোরতে গিয়েছেন— জমিদারী চালান থেকে অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীন ভারতে জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ, কাশ্মীরী শাল, দামী পাথর, ম্যার হস্তী ও অশ্ব-চিকিৎসা প্রভৃতি আলোচনা হল। সিংহ ঠাকুর খুব জোরের সঙ্গে নিজেকে ব্যক্ত কোরলেন। প্রমথবাবু ফেরবার সময় যেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা কোরলেন। সাহেব বোল্লেন, He is an aristocrat— is n't he? Any relation Lord Singha and Rabindranath? প্রমথ বাবু— O no, a blue blood none the less. I shall see you a turkey to-night বোলে ক্লাবে ফিরলেন।

গল্পের গতিটা লক্ষ্য কোরেছ, সুরেশ? আমার মনে হয়, আজকাল সকলে গল্প লেখেন না— লেখেন শুধু চিন্তার ইতিহাস। চিন্তা যদি গজগতিতে চলে, তা হলে রচনার গতিও মন্থর হবে। জাতি যখন কাঁচা-ঘুমে ওঠে, তখন কচি ছেলের মতন নিজের কথাই ভাবে। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকাই সবুজত্বের লক্ষণ কিন্তু সবুজ সাহিত্য ঠিক সাহিত্য নয়, যদি সবুজ সাহিত্য বলে কিছু

থাকে, তাহলে প্রথমে সেটা সাহিত্য পদবাচ্য হওয়া উচিত, তারপরে আর সবুজ কি হলদের কথাই ওঠে না। কেন না, সত্যকারের সাহিত্যই বল, আর যে কোন আর্টই বল, তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন, তাজা ভাব থাকতে বাধ্য। মরণ নিয়ে প্রত্নতত্ত্ব necrology হয়, আর্ট হয় না। সেই মতন আমরা, অর্থাৎ তরুণরা যে কোন বয়ঃস্থ সাহিত্যিকের কাছে এই স্পন্দন, এই তাজা জোরাল ভাবটি, এই সবুজত্ব, এই প্রাণের প্রত্যাশা কোরতে পারি— তার বেশী চাওয়া আমাদের অধিকার নেই। তেমনি বয়োবৃদ্ধ সাহিত্যিকরা তরুণ সাহিত্যিকের কাছে সাহিত্য প্রত্যাশাই কোরতে পারেন— ধর্ম বজায় থাকছে কি না, সমাজ অটুট রয়েছে কি না, ভাষা ও সনাতন রূপ ভাঙছে কি না, এই প্রশ্ন করবার অধিকার তাঁদের নেই। আমাদের দাবী প্রাণ— তাঁদের দাবী সাহিত্য। লেন-দেনটি পছন্দ হল? দাবী এই রকম fair হলে বিবাহের অত গোলমাল থাকত না। বাজে কথা ছেড়ে দাও। প্রমথবাবুর গল্পটির মধ্যে গল্পাংশটুকুও আমার ভাল লেগেছে। তিনি প্রবন্ধে নিজের মত কত ফলাও করে লেখেন জানত? সেটি প্রবন্ধে চলে, লোকে ভুল করে তাঁর স্বমত প্রকাশকে দাম্ভিকতা বলে থাকে। Cultured mind-এর মতামতের মূল্য হাজার বই পড়ার চেয়ে বেশী মূল্যবান। সে কথা না হয় ছেড়ে দাও। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা কোরলেই, যেমন গল্প লেখবার সময়, নেহাৎ নিজের মতামতকে, নিজের কথায়, নিজের চিন্তাধারা, এক কথায়, ছোট নিজকে বাতিল কোরতে পারে, তার আমিত্ব তোমার আমার আমিত্ব নয়, স্বীকার কোরতে হবে। যে শক্তিশালী, সে শক্তি দেখাতেও পারে, আবার গোপন রাখতেও পারে। ন্যাংটোকে জামা-কাপড় প'রে থাকলে গো-বেচারা ভাল মানুষটিই মনে হত। ৺মহারাজ নাটোর হেঁটে বেড়াতেন, হেঁটে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছেন দেখেছি— পরকে মোটর দিয়ে। তাই বোলে আমি সাইকেল চড়ে অতুল সেনের বাড়ী গান শুনতে যেতে পারি কি? জোর কলেজ যাওয়া চলতে পারে। তুমি হয়ত বলবে, প্রমথবাবু এবারও সেই আমি-আমি ছাড়তে পারেন নি। আমার উত্তর এই যে, তা হলে তুমি গল্পটি ছাই বুঝেছ। গল্পটিতে তার রূপ প্রধান, কোন্ চরিত্রে আলোক-সম্পাত বেশী হয়েছে? গল্পের লেখকের ত মাত্র একটি point of view। ছবি আঁকবার সময় এক জায়গা থেকে আরম্ভ কোরতে হবেই হবে, composition-এর একটা necessity স্বীকার করতেই হয়। এই ধর, মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর প্রিয়ভ্রাণ-পরা যুবতী মেয়ের drawing-টি। একটু চোখ খুলে দেখ, দেখতে পাবে,

মেয়েটির বুকের কাছে একটি ছেলেও আছে, আবার পিছনে,- শিরস্ত্রাণের পিছনে একজন বৃদ্ধও আছেন। তুমি কি ভাব, এ ছবিখানি শুধু জীবনের symbol মাত্র? ছবিটির composition হচ্ছে একটি ত্রিকোণ, তার মাথা হচ্ছে শিরস্ত্রাণের চূড়া, আর pase হচ্ছে যুবতীর দেহের প্রসার! ছবিটা অবশ্য যুবতীরই, অন্য কারু নয়। কিন্তু শুধু যদি মেয়েটিকেই আঁকা হত— তা হলে নীচে বাম পাশের কোন্ এবং উঁচুতে ডান ধারের ক্যান্‌ভাস্ খালি থাকত। ছবিটা ন্যাড়া-ন্যাড়া হত, অসম্পূর্ণ হত। খালি জারগা পূরণ করতে হবে— এই হল সমস্যা— এমন করে পূরণ করা চাই যে ভারসাম্য বজায় থাকে। সেইজন্য কোলের কাছে ছোট শিশু, মাথার কাছে বুড়ো। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পরিতৃপ্ত হলুম— কি চমৎকার symbol— সেক্সপীয়রের সাতটি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর তিনটি!!! কিন্তু 'আহা' দেওয়া উচিত ঐ খালি জায়গা পূরণ করবার দক্ষতাকে— ছবিটার balance-কে এবং আর্টিষ্টের সেই চালাকিকে যাতে তুমি আমিও খুসী হই, আবার চক্ষুষ্মান্ লোকও খুসী হন, —পোপকে পোপও খুসী হন, আর সেই সময়ের connoisseur-রাও খুসী হন। যা লিখলাম তাই যদি সত্য হয়, তা হলে গাড়ীর প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারটিই composition-এর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। লেখকও একজন যাত্রী। অন্য একজন প্যাসেঞ্জার— সাহেব তন্ত্র পড়েন— চোখ বুজে বোলে দিলেন যে, আত্মীয়টি সেরে গিয়েছেন। এই ঠাট্টাটুকু গল্পের relief। শুধু তাই নয়, লেখকের উদ্বিগ্নতা, ট্রেনের ঘড়ঘড়ানির মতনই পরের ঘটনার পূর্বাভাষ। দ্বিতীয় প্যাসেঞ্জাটির দ্বারা লেখক সিতিকণ্ঠের culture দেখাচ্ছেন, শিকারপ্রিয়তা প্রভৃতি অন্যান্য অভ্যাস ইঙ্গিত কোরছেন। এই সাহেবের দ্বারা সবচেয়ে বড় কাজ করান হল কি জান? নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে বন্দুক থেকে গুলি বার করান। সকলের পিছনে আছেন লেখক। নায়কের ওপর তাঁর সহানুভূতি আছে— তাই বলে তিনি নিজের সহানুভূতি কোন ছত্রে খোলাখুলি লেখেন নি। পিছন থেকে আর্টিষ্ট পুতুল-নাচ নাচান— তুমি ইটালিয়ান পুতুল-নাচ দেখেছ? যে পুতুল নাচায় সে নিজেকে খানিকটা পুতুলের সঙ্গে মিশিয়ে ও হারিয়ে ফেলে— পুরোপুরি হারালে কিন্তু চলে না। তা বলে কি সে egoist? আমি শুধু একটা কথা লিখতে চাই। লেখার ক'টা আমি আছে, কিম্বা নায়কের অভ্যাস কি সংস্কারের সঙ্গে লেখকের ক'টা অভ্যাস কি সংস্কারের মিল আছে, গুণে দাম্ভিকতার বিচার কোর না কিম্বা লেখককে পরিচিত ব্যক্তি বলে সনাক্ত কোর না। এমন লেখা আছে যার মধ্যে 'আমি' কথাটি একেবারেই

নেই— অথচ ভাবপ্রবণতার 'আমি'র লঘুতার ছত্রে ছত্রে লক্ষ্য করেছি। ভাবপ্রবণতা— sickly sentimentality-ই হচ্ছে সবচেয়ে ছোট ক্লাসের আত্মম্ভরিতা। আমিটা আর্টিষ্টের পক্ষে কি জান? Pole-vaulting-এর pole, high-diving-এর spring-board মাত্র। প্রমথবাবু গল্প এত সাবধানে লেখেন যে, তাঁর চরিত্রাঙ্কণে কোন প্রকার ভাবালুতার লেশ পাওয়া যায় না। ফলে, তাঁর সব নায়ক-নায়িকা নয় পাগল, নয় চোর, নয় ভূত, নয় নিষ্ঠুর। সবই hard— যেন বাটালি দিয়ে খোঁদা-কাটা। একটি সাদা গল্প, আহুতি, চার ইয়ারীর সব গল্প মনে ক'রে ছ্যাখ। সহযাত্রীর সিংহ ঠাকুরও তাই। সেইজন্য চরিত্রটি মূর্তির মতন অমন নিষ্ঠুরভাবে প্রকট হয়েছে। গল্পটি পড়ে পর্যন্ত এই পাঠানী পাগড়ী ও আলখাল্লা-পরা কেউটে সাপের চোখ আমাকে haunt করছে। গল্পটি সত্যই ভয়ঙ্কর।

গতির কথা বলছিলাম। কি করে গল্পটি শেষ হবার সময় তার gravity accelerate করছে দেখাচ্ছি। ঠিক, যেন অঙ্কের মতন— দয়া করে ভুল বুঝো না। অঙ্কের সঙ্গে ভাল গান, কি ছবি, কি ছোট গল্পের তুলনা করা রীতিমত চলে। প্রথম কথা, গল্পটি অত্যন্ত ছোট— সাড়ে চার পাতা মাত্র। মাত্র তিনটি section— প্রথম দুটিতে মুখবন্ধ ও চরিত্রাঙ্কণ করা হয়েছে, বাইরের দিক থেকে। তৃতীয় পর্যায়ে সিতিকণ্ঠ নিজের জীবনী বলছেন। এই শেষাংশে চারটি মোড আছে।

(১) তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর জলে ডুবে যাওয়া সন্দেহ কোরে অমলাকে দূর কোরে দেওয়া;

(২) কেউটের ল্যাজে পা দিলে যেমন ফোঁস কোরে ছোবল দিতে ছোটে, তেমনি প্রতিহিংসার ইচ্ছা-বৈরাগ্যের বশে সন্ন্যাস-গ্রহণ নয়;

(৩) ' একটি থার্ড ক্লাসে সেই স্ত্রী ও অমলার সাক্ষাৎ।

(৪) গল্প বলতে বলতে পুনরায় সাক্ষাৎ।

প্রথমটির জন্য বেশী সময় দেওয়া হয়েছে। ক্রমেই নয় দ্রুত হচ্ছে— দ্বিতীয়টি জন্য কিছু কম— তৃতীয়টির জন্য আরো কম— চতুর্থটির জন্য যেন এক সেকেণ্ড। তারপর সিংহ-ঠাকুর লাফিয়ে পড়ল, click, click শব্দ হল— আওয়াজ হল না— অন্য গাড়ীটি চলে গেল। এক নিমেষে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। লেখক এবং পাঠকের মনে মাত্র সন্দেহটুকু রইল যে, লোকটা পাগল না কি, তার গল্পটি স্বপ্ন, না সত্য, না সবই ট্রেনের ভেতর বেলাকার স্বপ্ন— যেমন যতীন সেন, 'মরুশিখা'তে চমৎকার বর্ণনা কোরেছেন। এই রকম

সন্দেহ রেখে সয়ে পড়া আর্টিস্টের কাজ। ভাল ওস্তাদের মুখে গান শুনে আমার মন সন্দেহে দোলে যে, এটি স্বপ্ন, না সত্য। সেইজন্য বোধ হয় পেটার সাহেব বলেছেন— না থাক। সেইজন্য বোধ হয় Keats— না থাক্। আর নামে কাজ নেই। মোদ্দা কথা এই, ছোট গল্প ভাল গানের মতন আনন্দ দেয় এবং সে আনন্দে ভালমন্দ বিচার স্থগিত রাখতে হয়। তা বলে বিচার-শক্তি ঘুমিয়েও পড়ে না, কিম্বা অব্যবহারে লোপও পায় না।

সুরেশ, এ দেখ্‌ছি technique-এর ওপর এক প্রশ্ন হল। কি করা যায়! ভাল কথা, বিভূতি বন্দ্যোর 'পথের পাঁচালী' পড়েছ? আমি ভাই মুগ্ধ হয়েছি। আজ যদি আমি এই বই সম্বন্ধে কিছু লিখি তা হলে সে লেখা উচ্ছ্বাসপূর্ণই হবে। কিন্তু বইখানি আমি অন্ততঃ দু'বার পড়লাম। এখনো আমার মতামত সংযত করতে পারলুম না। আমার স্থির বিশ্বাস যে, 'পথের পাঁচালী' বাংলা সাহিত্যের অভিনব গ্রন্থ এবং বাংলা সাহিত্যের গৌরবস্থল। এমন ভাষা, এমন গাম্ভীর্য, এমন nature study, এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি, এমন চরিত্রাংশ, এমন পবিত্রতা আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ। তুমি যেন প্রত্যেককে পড়তে অনুরোধ কোর—আমিও করছি, আমি আসছে মাসে বইখানির দীর্ঘ সমালোচনা কোরব। আশা করি ভালই আছ। ইতি

তোমাদেরই

এক রবিবার ধূর্জটী

উত্তরা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

৪

ভাই সুরেশ,

গত মাসের চিঠিতে 'পথের পাঁচালী' নিয়ে এক গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ লিখব প্রতিজ্ঞা করি। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোরতে পারছি না। প্রবন্ধ লেখবার জন্য যে সংযম, একাগ্রতা এবং অন্যান্য গুণের আবশ্যক, তার একটিকেও আমার বর্ত্তমান অবস্থায় সাধ্য-সাধনা কোরেও আনতে পারছি না। ফরাসী ও জার্মান শ্রমিক কি কোরে দলবদ্ধ হয়েছিল, প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক অভিব্যক্তির কতটুকু সম্বন্ধ, ছাত্রদের পড়াতে গেলে সাহিত্যচর্চা হয় না। তাই তোমাকে চিঠির আকারে আমার বক্তব্য লিখছি। চিঠিতে যে স্বাধীনতা আছে তার আবহাওয়ায় আমার বক্তব্য আশা করি ফুটে

উঠবে। আমার শুধু ভয় হচ্ছে যে হয়ত বিভূতিবাবুকে এই পত্রের ভিতর দিয়ে আমার মনের সমগ্র শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ কোরতে পারব না। কেদার বাবুর 'কোষ্ঠীর ফলাফল' খানিও পড়লাম। একই চিঠিতে দুইখানি বইএর সমালোচনা কোরলে সুবিধা হবে না। কিন্তু আর প্রতিজ্ঞা কোরতে ইচ্ছা হয় না। তুমি শুধু কেদারবাবুকে বোলো যে, তার 'কোষ্ঠীর ফলাফল' আমার সত্যই ভাল লেগেছে।

'পথের পাঁচালী' ৪২৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে প্রকাশকেরা পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি আশঙ্কা করে, ছোট বই ছাপিয়ে, পাঠককে অপমান করেন। কিন্তু আজকাল আবার বিলেতেও বড় বইএর প্রচলন হচ্ছে। সেখানে পড়বার সময় ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হচ্ছে— তবুও ৫০০।৬০০ পাতার নভেল, ৩।৪ খণ্ডের নভেল লেখা বন্ধ হয় নি। এদেশে পড়বার সময় এখনও ফুরিয়ে যায় নি। শুধু পাঠকের সংখ্যা কম এবং ভাল বইএর সংখ্যা আরো কম। তাই বলে যে আমাদের সাহিত্যে বড় বই লেখা হতেই পারে না, বড় বই চলবেই না এমন কোন কথা নেই। সৃষ্টির দিক দিয়ে ধারণা শক্তি একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। প্রাচুর্যও ফেলবার জিনিষ নয়। দেশে মহাকাব্য লেখা হবে কি না জানি না, তবে বৃহৎ আকারের নভেল লেখা সম্ভব, অন্ততঃ এখনও অসম্ভব হয় নি প্রমাণ কোরে বিভূতিবাবু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। চার পাঁচ-শ পাতা ধরে পাঠকের মন নিবদ্ধ রাখা কম কথা নয়, বিশেষতঃ যখন বইখানিতে গল্পাংশ নিতান্তই স্বল্প।

প্লট না থাকা সত্ত্বেও বড় ও ভাল নভেল লেখা যেতে পারে আমি মানি। অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। ধর, Jovce-এর Ulysses, কিম্বা Proust-এর Swaan's Way এবং একটু নীচুস্তরের Aldous Huxleyর Point and Countér Point.। আমাদের সাহিত্যে 'গোরা'র আকর্ষণ কম নয় এবং গল্পাংশই 'গোরা'র প্রধান আকর্ষণ কিন্তু আবেদন নয়। কি করে রবীন্দ্রনাথ, Joyce, Proust পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে দেন নি, ভাল কোরে দেখলেই ব্যাপারখানি বুঝতে পারবে। আমার যা মনে হয় তোমাকে লিখছি। আগে নভেল নাটকের দাস ছিল— অর্থাৎ সর্বপ্রথমে নাটকের নিয়মাবলী ঠিক হয়ে গিয়েছিল বলে নভেল সেই নিয়মাবলী মেনে চলত। সব লেখকই যে নাটকের নিয়ম মেনে চলতেন, তা বলছি না— তবে মোটামুটি এই হোত বলা যায়। ক্রমে dramatic unities-এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা চলল। সেই চেষ্টার শেষ অবস্থা Swaan's Way, Ulysses এবং গোরা। Unities

ত গেল, তার বদলে এল কি? অভিব্যক্তি, ইতিহাস। (আমাদের অর্থশাস্ত্রে ও সমাজনীতিতেও এই ধরণের পরিণতি খানিকটা লক্ষ্য করেছি। এর জন্ত ডারুইন কতটা দায়ী, জানি না)। নভেলের নায়ক শুধু যুবাই রইলেন না। নায়কের শৈশবকাল থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সব সময়টুকুই নভেলের বিষয় হয়ে উঠল। Romain Rolland-এর Jean Christophe, এবং গলস্‌ওয়ার্দির Forsyte Saga-র কথা মনে কর। অনেকে আবার একটি ব্যক্তিকে নায়ক না কোরে একটি পরিবার, গোষ্ঠী কিম্বা পল্লীবাসীর সুখ দুঃখের ইতিহাস বর্ণনা কোরে চললেন। এখানেও দৃষ্টান্তের অভাব নেই— Raymont-Peasants পড়েছ? একটি ব্যক্তির বদলে একটি group নায়ক হল— শুধু তাই নয়, সেই group যে region-এ থাকে, সেই region-টুকুও নভেলের নায়ক হয়ে উঠেছে দেখেছি। পারিপার্শ্বিক ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে কি করে চরিত্রের অভিব্যক্তি হয় সেটি দেখানও কম বাহাদুরীর কথা নয়। লেখা ত হোল এই কোরে— কিন্তু পাঠককে পড়ান যায় কি কোরে? আগে ছিল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, এখন হোল চরিত্রের মানসিক অভিব্যক্তি ও ইতিহাস। রেঁালা একজন অসাধারণ ব্যক্তির জীবনের অভিব্যক্তি লিখে আমাদের interest বজায় রেখেছেন— Raymont-এর বাহাদুরী বেশী। Proust এবং তাঁর শিষ্য Joyce মনের অভিজ্ঞতা এঁকে চলেছেন— চেতনা, অবচেতনা কিছুই বাদ দেন নি— অবচেতনার দিকেই তাদের ঝোঁক বেশী। কারণও স্পষ্ট— অবচেতনা চেতনার অপেক্ষা ঢের বেশী ব্যাপক ও গভীর। রবীন্দ্রনাথের বিষয় ও মানসিক অভিজ্ঞতা— সে অভিজ্ঞতা চেতনা-রাজ্যের, অবচেতনার নয়। তাঁর canvas তিনি ইচ্ছা করেই সঙ্কীর্ণ কোরেছেন— অবচেতনার কোন্ প্রবৃত্তি যে কার্য কোরেছে তা মোটেই দেখান নি। সেইজন্ত তাঁর কার্য আরো শক্ত হয়েছে, এবং সেই শক্ত কার্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে বলেই তিনি Proust, Joyce ও Aldous Huxley-র চেয়ে বড় আর্টিষ্ট। সেইজন্ত রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' শিক্ষিত ও মার্জিত পাঠকের এত প্রিয় বস্তু। 'গোরা'তে চেতনা রাজ্যের সব অভিজ্ঞতার বিকাশ ও আলোচনা আছে— সেই আলোচনার সাহায্যে 'গোরা'র প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। যে পাঠক ধর্ম, সমাজ, আর্টের তোয়াক্কা রাখেন না, তাঁর তাঁর পক্ষে 'গোরা' অপাঠ্য— কিন্তু যে পাঠকের মন আছে এবং সে মন যদি শিক্ষিত ও মার্জিত হয়, তা হলে 'গোরা' বইখানি আর একঘেয়ে ঠেকে না। অরূপের মধ্যে রূপের সন্ধান কবি এই উপায়ে আমাদের দিয়েছেন।

এইটাই একমাত্র উপায় নয়। অন্য উপায় আছে। তবে সে উপায় অবগত হবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন হয়। যে পাঠক Psycho-analysis-এর মোট কথা জানেন না তিনি কি করে Proust কিম্বা Joyce আদ্যোপান্ত পড়বেন বুঝি না। যিনি মধ্য য়ুরোপের চাষীদের অবস্থা জানেন না তিনি কি করে Peasants বুঝবেন। তেমনি Hardy, Shirla Kaye Smith-এর সমগ্র রস উপভোগ করতে ইংলণ্ডের local geography, ethnology জানা চাই। বলা বাহুল্য যে শুধু ভূগোল কিম্বা নব্য মনোবিজ্ঞান কিম্বা সমাজতত্ত্ব জানলেই চলে না। নভেলের গোড়ার কথা মানুষ, আজকালকার নভেলেরও গোড়ার কথা মানুষেরই অভিব্যক্তি— তবে extended over a stretch of time, place and folk এই মাত্র। ক্রমেই সাহিত্য অ-সাহিত্যিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর কোরছে। নভেলিষ্ট ক্রমেই বিদ্বান হচ্ছেন— সেই বিদ্যার সাহায্যে তিনি পাঠকের মন আকর্ষণ কোরছেন। যে পাঠক সে বিদ্যায় বিদ্বান নন, তাঁর উপায় কি হবে জিজ্ঞাসা কোরতে পার? উপায় এই যে, ক্রমেই নভেলের ব্যক্তিকে বিশ্বজনীন করে তোলা। Local colour-কে যে লেখক তাঁর নায়কের অভিব্যক্তি বর্ণনার সাহায্যে অতিক্রম কোরতে পেরেছেন— তিনিই একমাত্র বড় লেখক। এক কথায় দাঁড়াল এই যে, colour of the region বর্ণনা কোরতে হবে— সেই local colour-এর সাহায্যে নায়ককে পরিণত-চরিত্র কোরতে হবে। একধারে regional অন্যধারে Universal-এর বিকাশ— বিষয় হোল ব্যক্তির অভিব্যক্তি। এই হোল ভাল বড় নভেলের একটি technique। এই ধরণের কৌশল অবলম্বন কোরলে ঘটনাবলী যতই intermittent হোক না কেন, নায়ক-নায়িকার চরিত্রাঙ্কন persistent হলেই চলে যায়। এতদূর পর্যন্তও বলা যেতে পারে যে, ছোটখাট ঘটনার সমাবেশেই, কোন crisis-এর অবতারণা না কোরেও চরিত্রের persistence দেখান যেতে পারে। জীবন যখন ছোটখাট ঘটনার সমষ্টি হয়ে উঠছে, অর্থের তাড়নায় রোমান্স যখন লোপ পেতে বসেছে, তখন এই পদ্ধতি মোটেই অস্বাভাবিক কিম্বা খাপছাড়া ঠেকে না। তার মানে হয় যে লেখক নির্বাচন করবেন না— ছোট ঘটনাও significant হওয়া চাই—নচেৎ নভেল আদমশুমারীর রিপোর্ট হয়ে ওঠে।

আমি পূর্বে তোমাকে যা সব কথা লিখলাম সব কথাই 'পথের পাঁচালী' পড়ে মনে হয়েছে। বইখানি সত্যই খুব উচ্চশ্রেণীর বই। যদিও বিভূতিবাবুর লিখন ভঙ্গীতে Romain Rolland-এর apostrophising, high

falutin এবং অন্যান্য mannerism-এর সাক্ষাৎ পেয়েছি তবুও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কোরতে হয় যে, এমন ভাষা দুর্লভ। পাতায় পাতায় দৃষ্টান্ত পাবে— শুধু দুর্গার মৃত্যুর পূর্বে ঝড়বৃষ্টির বর্ণনা পড়ে দেখ। ওটা একটু গুরু-গম্ভীর মনে হয় ত, অপুর সাহিত্য-চর্চার বর্ণনা পড়ে দেখ। বিভূতিবাবুর কাছে, বাংলা হিসাবে নবীন লেখকদের সকলেরই মাথা নীচু করা উচিত। শুধু ভাষা কেন, লোকে যাকে realism বলে, সে হিসাবেও বিভূতিবাবু নবীনের গুরু স্থানীয়। Sex বাদ দিয়েও realism হতে পারে এই কথাটি বিভূতিবাবুর বই পড়ে আমি ভাল করে বুঝেছি। এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পল্লীজীবনের বর্ণনা, এত নিগূঢ়ভাবে পল্লীপ্রকৃতির পরিচয়, এমন সূক্ষ্মভাবে শিশু ও বাল্যজীবনের স্নেহ, মমতা, সুখ, দুঃখ, আশা, ভরসা, দুরাশা, নিরাশা আমি একত্রে কোন বাংলা বই-এ পড়েছি— মনে হয় না। আমি কোন্ ঘটনা, কোন্ লাইন উদ্ধৃত কোরব? সব স্থানেই ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাবে। এ ত গেল বর্ণনার কথা— যে বর্ণনা বিভূতিবাবু এক হাতে অনুবীক্ষণ, অন্য হাতে কলম নিয়ে করেছেন। হয়ত বিভূতিবাবুর যন্ত্রটিতে অত্যন্ত powerful lens ছিল, হয়ত প্রকৃতি বর্ণনা একটু সংযত হলে ভাল হত, হয়ত সে বর্ণনায় সব সময় বৈচিত্র্য রক্ষিত হয়নি— তবুও সে বর্ণনা অনুপম। এইখানেই বলতে ইচ্ছা হয়— অধিকন্তু ন দোষায়। ঘটনার অবতারণা ও বর্ণনাতেও বিভূতিবাবুর দক্ষতা অপূর্ব। আমি একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করছি— অপু, দুর্গা মরে যাবার পরে এবং দেশত্যাগ করার পূর্বে, দুর্গার দ্বারা অপহৃত সোনার কৌটটি পেয়েছে— পেয়ে, কাউকে না জানিয়ে গভীর বাঁশবনের মধ্যে ফেলে দিলে। এই রকম pathos দেশে এক শরৎবাবুই আঁকতে পারেন। আবার মনে কর, হরিহর স্কুলের ম্যাগাজিনে লেখা ছাপাবার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে অপুকে টাকা দিচ্ছে— এই-খানে ক্ষান্ত হই— নচেৎ চিঠি বড় যাচ্ছে।

বর্ণনা-পদ্ধতির কথা লিখলাম। চরিত্রাঙ্কনের কথা না লিখলে আমার বক্তব্য নেহাৎ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 'পথের পাঁচালী'তে প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি ভারী পরিস্ফুট হয়েছে। হরিহর, সর্বজয়া, দুর্গা, অপু প্রত্যেক চরিত্র পাঠক-পাঠিকার মনে গভীর রেখাপাত কোরবেই কোরবে। যে সর্বজয়া অল্প-বয়সে ইন্দিরা ঠাকরুণকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, সেই সর্বজয়া দুঃখের আগুনে পুড়ে আর এক সর্বজয়া হয়ে উঠল। এক বড় লোক রাজার বৃদ্ধা গৃহিনীকে দেখে তার মনে সেই কবেকার ইন্দিরা ঠাকুরুণের স্মৃতি জেগে ওঠে এবং তার হৃদয় অনুতপ্ত হয়। বিভূতিবাবুর

নায়ক অবশ্য অপু। অপুর অভিব্যক্তিতে বিভূতিবাবু প্রকৃত মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম খণ্ডে আমার মনে হয় যে বিভূতিবাবু ঠিক করতে পারেন নি, তাঁর নভেলের প্রধান চরিত্র দুর্গা হবে, না অপু হবে— অনেক স্থানে অপুর চেয়ে দুর্গার চরিত্রের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড থেকে লেখকের মনে সে সংশয়ের চিহ্ন নাই। সেইজন্য মাত্র দ্বিতীয় খণ্ডে অপু কি করে বড় হচ্ছে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে তার ইঙ্গিত দিয়ে আমার চিঠি শেষ করছি। বিভূতিবাবু অপুর মনোবৃত্তির ও হৃদয়বৃত্তির, দুই প্রকার বৃত্তিরই প্রকাশ দেখিয়েছেন। মনোবৃত্তির প্রকাশ পেয়েছে নিম্ন-লিখিত উপায়ে—

(১) অপুর পাঠশালা গমনের ভিতর দিয়ে— পাঠশালাতে পড়াশুনা যত-দূর হোক আর না হোক, অপু পাঠশালাতে বোসে গল্প শোনে, তার রোয়াকে বসে পল্লী-প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করে, বাড়ী থেকে আসতে যেতে সে সৌন্দর্যে বিভোর— আত্মহারা হ'য়ে যায়।

(২) পল্লী-প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে—

প্রকৃতির বুকে লালিত হয়েই অপু প্রকৃত শিক্ষালাভ করে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দিদির সঙ্গে আম কুড়ায়। এই প্রকৃতি-বর্ণনা সত্যই অদ্ভুত। এর মধ্যে কোন দর্শন নেই এ শুধু objective description মাত্র। কিন্তু এই পল্লী-প্রকৃতিই অপুর প্রকৃত আবহাওয়া, অপুর মনের খোরাক, হৃদয়ের খোরাক। কাশীতে গিয়ে এই প্রকৃতির জন্য অপুর মন কেমন কেমন কোরত। এরই টানে সে আবার দেশে ফিরে এসেছিল।

(৩) অপুর সাহিত্য-চর্চা দিয়ে—

পাঠশালাতে অন্য পড়া হোক আর না হোক, এই পাঠশালাতেই অপুর প্রথম মনোরাজ্যের দরজা খুলেছিল। শ্রুতিলিখনের দোহাই দিয়ে সে অজানা-রাজ্যে প্রবেশাধিকার পায়— সে লুকিয়ে রাজু-রায়ের গল্প শোনে— বাবার পুরানো দাশুরায়ের পাঁচালী, মহাভারত লুকিয়ে পড়ে, পুরাতন বঙ্গবাসী ও বিলেত-যাত্রীর পত্রের সাহায্যে সে তার গ্রামের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে। দেশের পুরানো গল্পে অপুর মন ডুবে থাকে। বিভূতিবাবু এইখানে অপুর জন্মগত সংস্কারের ইঙ্গিত কোরেছেন।

অপুর হৃদয়-বৃত্তি পরিপুষ্ট হয় দুর্গার মতন দিদির সঙ্গে বনে বনে বেড়িয়ে, তার মতন পল্লী-কন্যার সঙ্গলাভ করে, তার কোমল অ-শিক্ষিত হৃদয়ের স্পর্শ-লাভ করে, ইন্দ্র ঠাকুরুণের অভাব অনুভব কোরে, বোষ্টম দাদার মুখে গল্প

শুনে। অপুর জীবনে অমলার আগমন, রানুর স্নেহ, পিসুবাড়ীর আদর-অভ্যর্থনা যেমন প্রয়োজনীয় ঘটনা, তেমনি আতুরী বুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, ভাল খাওয়া দাওয়া, মার সঙ্গে মান-অভিমান সবই উপযোগী হয়েছে। এই অভিব্যক্তির সঙ্গে পাঠকের মনকে বিভূতিবাবু কি কৌশলে সংযুক্ত রেখেছেন সেটি বইখানি ভাল কোরে পড়ে দেখলেই বুঝবে। কুঠির মাঠে নীলকণ্ঠ পাখী দেখা, prismকে হীরে বলে ভ্রম করা, রেলের লাইন দেখা প্রভৃতি ছোট ছোট ঘটনাতে পাঠকদের interest বজায় রাখা হয়েছে। বিশালাক্ষী ঠাকরুণকে স্বপ্ন দেখার বর্ণনায় এই খণ্ডে অপুর চরিত্রের পরিণতি বেশ বোঝা যায়।

'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে বেশী লিখতে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সব মাসিকেই বইখানির সুখ্যাতি হয়েছে। যেদিন বিভূতিবাবু Romain Rolland যে তাঁর আদর্শ এই কথাটি ভুলে যাবেন সেই দিন বাংলা সাহিত্যের শুভ দিন। বিভূতিবাবুর লেখাতে Percy Lubbock ও Hudson-এর ছায়া পেয়েছি— কিন্তু সে ঋণকে ঋণ বলাই উচিত নয়। বাংলা দেশে বড় নভেলের সামগ্রী আছে। বড় নভেল লেখবার মতন শক্তি আছে, বিদেশী-সাহিত্যের মহৎ আদর্শকে নিজের কোরে নেবার মত ক্ষমতা আছে দেখে সত্যই আনন্দ হয়। Rolland-এর mannerismও এক কালে ভাল লাগত— আজকাল তত ভাল লাগে না— তাই এই চিঠিতে একটি মাত্র বিবাদী স্বর লাগিয়ে ক্ষান্ত হই। বিভূতিবাবুর নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে— তাই এই কথাটির উল্লেখ করলুম। নচেৎ করতাম না। আশা করি ভাল আছ।

ইতি

লক্ষ্ণৌ-রবিবার ধূর্জটী

উত্তরা, মাঘ, ১৩৩৬।

বৈঠকখানা ও সমাজ

দেশের আবহাওয়া, জমির গঠন, কাঠ কাঠ্‌রা প্রভৃতির সঙ্গে বাড়ী, ঘর, মন্দির মসজিদ ইমারতের সম্পর্ক খুব নিবিড়। এ সম্বন্ধে আজকালকার নব্য-ভূগোল বৃত্তান্তে অনেক কথা বলা হচ্ছে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাসেও সম্বন্ধটি খুব পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পায়। বাংলা দেশে বৃষ্টি বেশী হয়, আরব দেশে বৃষ্টির বালাই নেই, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রৌদ্র প্রখর, আল্পস্ পর্বতশ্রেণীর উত্তরাংশে ঝটিকার উৎপাত, সূর্যের মুখ দেখাই যায় না— অতএব গভীর স্থলে বাড়ী ঘর ভিন্ন উদ্দেশ্যে, ভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী হবে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? খাল, বিল, হ্রদের ধারে বাড়ী এক রকম, পাহাড়ের গায়ে বাড়ী অন্য রকম। এঁটেল মাটি কিম্বা পাথরের ওপর পঞ্চাশ তোলা ইমারৎ তোলা সহজ, পলিমাটির ওপর একতলার বেশী উঁচু বাড়ী তোলা শক্ত। যে দেশে ভূমিকম্প হয়, সেখানে বাড়ী ঘর ঠুনকো হবে, যে দেশে ঠাণ্ডা কি গরম হাওয়া জোরে বয়, সে দেশে দোর-জানলা একটু কম হবে। যে দেশে বাঁশ পাওয়া যায় সে দেশের স্থাপত্যের রেখা ভাল হয় না। পাথরে জায়গায় স্থাপত্যের রেখা সাধারণতঃ ভাল হয়। আবার পাথরের আঁশের ওপরও স্থাপত্যের গতি নির্ভর করে। এ সব কথা সকলেই জানেন।

বাড়ীঘর বলতে দু' রকমের বাড়ী বুঝি। এক [···] মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্রাসাদ, হর্ম্য প্রভৃতি; [···] বাড়ী, গৃহ। দুইই সম্মিলনের স্থান— প্রথমটি সাধারণের, দ্বিতীয়টি একটি বংশের, কি গোষ্ঠীর নিবাস হয়। সম্মিলন ও নিবাসের মধ্যে যা পার্থক্য, ইমারতের সঙ্গে গৃহের তাই পার্থক্য। তবুও মিল রয়েছে অনেকখানি। [···] প্রাসাদ, ফতেপুর সিক্রী, চিতোর স্তম্ভের সঙ্গে জাতির অনেক আশা, ভরসা, স্মৃতি, ভয়-ভাবনা জড়িত রয়েছে। আবার যে গৃহে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ হয় নি, সে গৃহ গৃহই নয়, মেসের বাড়ী হতে পারে। এক কথায় মিল রয়েছে মানুষের সংস্কারে। যে দেশে ধর্মের সংস্কার দৃঢ় সে দেশের রান্নাঘরের মাথাতেও চূড়া কি গম্বুজ থাকে— আবার যে দেশের লোকের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের সংস্কার জোরাল, সে দেশের পথে ঘাটে জয়স্তম্ভ, শোবার ঘরেও জয়-পতাকা।

আমার বক্তব্য গৃহের একটি ঘর মাত্র। সমাজতত্ত্বে সাধনার একটি প্রত্যঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার রীতি আছে। আমি সেই সনাতন রীতিতেই প্রবন্ধটি লিখছি। আমার মনে হয় যে, সমগ্র সভ্যতার মাপকাঠি এই বৈঠক-খানা সাজান, তার আকার-প্রকার এবং অন্তঃপুর থেকে দূরত্বের ওপর নির্ভর কোরছে। আমাদের মনের সংস্কার বদলাচ্ছে— সেই পরিবর্তনের ফলে ও সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকখানার চেহারাও বদলাচ্ছে। এই দুটি পরিবর্তনের সম্বন্ধটি ইঙ্গিত করা আমার উদ্দেশ্য। আমার অভিজ্ঞতা স্বল্প। যাঁর অভিজ্ঞতা বেশী তিনি আমার মূল সিদ্ধান্তটি সমর্থন কোরবেন।

আমি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক— সেইজন্য নিজের সম্প্রদায়ের কথাই প্রথমে লিখ্‌ছি। কলকাতা সহরে ভদ্রলোকের বৈঠকখানা নেই বললেই চলে। যাঁদের পুরানো বসত বাড়ী আছে, তাঁদের অবশ্য বৈঠকখানাও আছে। বৈঠকখানাওয়ালা বাড়ীর ভাড়া কিছুতেই মাসে একশ' টাকার কম নয়— খুব কম গৃহস্থই মাসে মাসে এত টাকা যোগাতে পারে। সেইজন্য বরাবর লক্ষ্য করেছি যে বাসাড়ে বাড়ীর ছেলেদের আড্ডা হয় চা-এর দোকানে— না হয় গড়ের মাঠে। বসত বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে বাসাড়ে বাড়ীর ছেলেরা আলাপ জমাতে ভারী ব্যগ্র হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বসত বাড়ীর কর্তারা ভারী কড়া, পয়সা-কড়ি ও খরচের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। সেইজন্য তাঁদের ছেলেপুলেরাও বহির্মুখী হয়ে পড়েছে। বৈঠকে আড্ডা বসে— সেখানে বয়স্কেরই প্রতিপত্তি। যদি তাঁরা বড় কেরাণী হন, তা হলে তাঁদের তাস-পাসা কিম্বা খোসগল্পের মজলিসে এক শালা-বাবু, মামা বাবু কি 'উদো' ছাড়া অন্য যুবকের গতিবিধি নিষেধ। যদি কর্তারা উকীল, ডাক্তার, ব্যবসাদার, মুচ্ছুদ্দী হন, তা হলে সেখানে মক্কেল, রোগী, ব্রোকার না হয় কীর্তন গাই-এর ভিড় হয়। যৌবনোদ্‌গমের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভাব বিশেষতঃ বৈষ্ণবভাবের উদ্রেক হলেও, পিতার পসারে লোভ থাকলেও ছেলে-ছোকরারা সন্ধ্যাবেলাতে গড়ের মাঠে নির্মল বায়ু সেবন, চায়ের দোকানে প্রোফেসারের বিদ্যাবুদ্ধি ও স্ত্রীর বয়স, তরুণ সাহিত্য কিম্বা সেনগুপ্ত ও সুভাষ বোসের আপেক্ষিক ও তুলনামূলক বিচার কোরে একটু নির্মল আনন্দ উপভোগ কোরতে ভালবাসে। একে প্রকৃতির আহ্বান বলা যেতে পারে। বেটি ব্রাইদ, মে মারে, প্রভা, নীরদা, কি সীতা দেবীর আলোচনা কিছু পিতৃবন্ধুর সঙ্গে চলতে পারে না— এ বিষয়ে মতের পার্থক্য থাকতে পারে। বৃদ্ধেরা মোটেই সহিষ্ণু হতে পারেন না।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়েদের বৈঠকখানা ছাদ, সিঁড়ির ধারের কিম্বা শোবার ঘরের জানলা। এই স্থান থেকেই অন্য বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। পরস্পরের সঙ্গে সখীত্ব স্থাপন, গোলাপ কি বেয়ান পাতান, সুখদুঃখের কথা, পুত্র সম্ভাবনার তারিখ, ননদের কাহিনী প্রভৃতি আন্তরিক কথাবার্তা এই ঘুলঘুলি কিম্বা ছাদের ধারে, বেলফুলের টবের পাশ থেকেই সুরু হয়, বোধ হয় শেষও হয়। গহনার প্যাটার্ণ স্থির হয় এইখান থেকেই— বাড়ীর বৌমার রূপগুণ স্থির হয় এইখান থেকেই। তরুণ সাহিত্যের যে অংশ খোলার বাড়ীতে না পুষ্ট হয়, সেটুকুর জন্মস্থান ও অধিষ্ঠান এইখানে। এইখানেই নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ হয়, এইখানেই খুকখুকে কাসি কাসতে তরুণী সন্ধ্যা-বেলায় আসেন, অন্য বাড়ীর ছাদে অমনি কাসির সুরেই সুর মিলিয়ে ম্যানের ম্যাজিক মাউন্‌টেন্‌ হাতে নিয়ে তরুণ আসেন হাওয়া খেতে। সঙ্গে সুরেশ, নরেশ, প্রদীপ, প্রতুল, দীপকের দল আসে সাহিত্যালোচনা কোরতে। বেঁধে গেল সুতো! অতএব একধারে চায়ের দোকান— চপ, কাটলেট, পচা সরবৎ— তার ফলে সহরে মহামারী ও উচ্চ মৃত্যুহারের জন্য, অন্য ধারে তরুণ-সাহিত্যের প্রভাবে সমাজ-বন্ধনে শৈথিল্যের জন্য দায়ী বৈঠকখানার অভাব।

এই অভাবের ফল ব্যক্তিগত জীবনেও লক্ষ্য কোরেছি। গোড়াতে কিন্তু একটি সুফলের কথা না বলা অন্যায়। বৈঠকখানা না থাকার জন্য বন্ধু বন্ধুনী (না বান্ধবী?) আসতে পারে না বলে গৃহে শান্তি থাকে— অথচ পরকীয়া প্রেমের নভেলও বিক্রী হয়। কিন্তু কুফলের ওজন বেশী। স্ত্রী জাতিকে সদা-সর্বদা নিজ মূর্তিতে দেখলে, মণীন্দ্রলালের নভেল পড়া থাকলেও, তাঁদের ওপর ভক্তি অচলা রাখা শক্ত হয়। স্ত্রীজাতি নিতান্তই আদর ও যত্নের বস্তু। অনাবৃত ও অনন্ন রক্ষিত দেহলতার সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, সে জ্ঞানের উন্মেষ অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সাহায্যে অসম্ভব। স্ত্রীজাতিকে কোন দোষ দিচ্ছি না— দোষ আমাদের, সমাজের, অবস্থার, প্রকৃতির, বয়সের— বাকী সকলের, শুধু তাঁদের নয়। আজকাল অবশ্য হেমেন মজুমদার এবং তাঁর শিশুবৃন্দ আমাদের সৌন্দর্য জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা করছেন। সকলে কিন্তু তাঁদের মডেলের মতন চিরযৌবনা নন— কিম্বা সকলে কিছু বেণারসী শাড়ী পরে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন না। সকলের স্নানের ঘরই নেই। মোদ্দা কথা এই যে, বৈঠকখানা স্নানের ঘর এবং রান্না ঘর থেকে দূরে থাকলে স্ত্রীজাতির প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, আমাদের সৌন্দর্য জ্ঞান ও সেই সঙ্গে হেমেন মজুমদারের আর্টের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা সবই

অক্ষুন্ন থাকে। চিত্রবিদ্যা ও সাহিত্য এইখানেই স্থাপত্যের ওপর নির্ভর করে।

বৈঠকখানা না থাকার আর একটি দোষ দেখাচ্ছি। একান্নবর্তী পরিবার — কলকাতার ভাড়াটে কিম্বা পৈতৃক বসত বাটিতে ভিন্ন রাখবার জায়গা নেই— ছোট্ট বৈঠকখানাতে পর্যন্ত আত্মীয়-স্বজন শুতে বাধ্য হন। একজন কর্তা অফিস থেকে এসে সরাসর শোবার ঘরে ঢুকলেন। একটি প্রকাণ্ড মশারির ভেতর তিনটি ছেলেমেয়ে— একটির ঘুংড়ি কাসি, অন্যটির দাঁত উঠছে, তৃতীয়টির হাতে ধারাপাত। গৃহিণী অম্লশূলে ছটফট কোরছেন— কোণে হাতরুটি আর সকালের শিঙ্গী মাছের ঝোল ঢাকা রয়েছে— নলের মুখে গামছা, গাড়ু ও ডাবর ঢাকা। কর্তা খেতে খেতে আফিসে [···] কথা বলছেন। স্ত্রী হতভাগিনী নিশ্বাস পরিত্যাগ করে পাশ ফিরলেন। গল্প শেষ হল, কর্তার ঠিক ঘুমটি আসছে এমন সময় গিন্নী আরম্ভ কোরলেন— ছোট জায়ের বাপের বাড়ীর ঝি এসে তাঁকে কি অপমানটাই না কোরে গিয়েছে — তার হৃদয় বিদারক বর্ণনা। হিন্দু জাতির সনাতন একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে বিষবৃক্ষ রোপিত হল। বঙ্কিমবাবুর যুগে প্রথা ছিল অন্য— দেশ ছিল লোকের পাড়াগাঁয়ে, ভাই আত্মীয় স্বজন সব বৈঠকখানাতেই গল্পগুজোব কোরতেন। রাত একটার আগে কর্তারা ঘরে যেতেন না। সব স্ত্রীরাই যে তার আগে ঘুমিয়ে পড়তেন বলছি না— কোন স্ত্রীই যে স্বামীকে অপমানের বৃত্তান্ত শোনাতে জেগে থাকতেন না তাও বলছি না। তবুও একথা ঠিক যে স্বামী-স্ত্রীর আলাপের সুবিধা ও সময় তখন অল্প ছিল— বৈঠকখানার জন্য। এখন সুবিধা ও সময় বেশী— সেই বৈঠকখানার অভাবের জন্য। স্বামী-স্ত্রীর সর্বক্ষণ আলাপ পরিচয়ে সুফল কুফল দুইই আছে। একটি কুফল এই— প্রেম ও অভিমানের অশ্রুতে বিষবৃক্ষ যত শীঘ্র বেড়ে উঠে অত আর কিছুতে বাড়ে না। বৈঠকখানা থাকলে বস্তুতঃ অপেক্ষা কোরে কোরে মেয়েদের চোখে ঘুম নামত। সনাতন অনুষ্ঠান বজায় রাখবার জন্য মেয়েদের চোখে তাড়াতাড়ি ঘুম আনান উচিত। তা না হলে হিন্দুজাতির অধঃপতন হবে। ব্রাহ্মণ-সভা থেকে পয়সা দিয়ে গৃহস্থের বাড়ী বৈঠকখানা কোরে দেওয়া উচিত। দোক্তার বদলে আফিমের কথাও বলা যেতে পারে— কিন্তু এই মন্তব্যে আমার আপত্তি আছে। সকলেরই থাকা উচিত।

পূর্বে পল্লীগ্রামে গৃহস্থের গৃহ ছিল, সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকখানাও ছিল। এখনও আছে। রোয়াক, বারাণ্ডা, দাওয়াতে সকাল সন্ধ্যায় আড্ডা বসে। নীচু জাতের যেমন বটতলা, উঁচু জাতের তেমনি রোয়াক, বারাণ্ডা। আজকাল

শিবতলা, চণ্ডীতলায় লোক বসে না— দরকারও নেই। তার বদলে লাইব্রেরী ও সখের দলের আখড়া হয়েছে। স্ত্রী-সমাজের মোটা মোটা সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ হয় এইখানে। কিন্তু লাইব্রেরী কি আখড়ায় সমালোচনা যাই হোক না কেন, সে সমালোচনার কোন মূল্যই থাকে না, যদি না চক্রবর্তী মশাই-এর বৈঠকখানায় চায়ের মজলিসের সিদ্ধান্ত তার পিছনে থাকে।

সহরে বড় লোকের বাড়ীতে বৈঠকখানা আছে— একটি ত আছেই— পয়সা অনুসারে আবার দুটি তিনটি। অন্দর মহল থেকে স্ত্রীজাতির ক্ষীণ স্বর, ছেলে মেয়েকে দুধ খাওয়ানর মৃদু তাড়না, ঝির কোলাহল, বাসন-মাজার শব্দ, রান্নাঘরের ধোঁয়া সেখানে আসে না। বড় লোকের মধ্যে যাঁরা উচ্চশিক্ষিত ও সাহেবী ভাবাপন্ন, তাঁদের Drawing-room থাকে। এখানে স্ত্রীদের গতিবিধি— অন্ততঃ সন্ধ্যাবেলায়, যখন ও যেখানে শরৎবাবু সরোজিনী চরিত্রাঙ্কনের জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। এই ঘরের মধ্যখানে পিয়ানো রাখা হয় ভাল ছিটের কাপড় মুড়ে। যখন মোড়ক খোলা হয়, তখন এই যন্ত্রের সাহায্যে সুরে ও বেসুরে দেশী ও বিদেশী গান গাওয়া হয়। দেশী গান বলতে রবিবাবু, অতুলপ্রসাদের না হয় কাজী নজরুলের গান, আর বিদেশী বলতে বিশ বছর পূর্বের পরিচিত ও সুপ্রচলিত উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম-সঙ্গীত। অনেকের মতে দেশী বিলাতীর, পূর্ব-পশ্চিমের মিলন সাধন এই উপায়েই প্রকৃষ্টরূপে সাধিত হবে। এই পূর্ব-পশ্চিমের পুণ্য মিলনক্ষেত্রে নন্দলাল ও মার্কাস ষ্টোনের পাশাপাশি ছবির তলায় বিলেতী স্যুট পরা নব্য সিভিলিয়ান তরুণ কুমার মাদ্রাজী শাড়ী পরিহিতা কুমারী ইলা শীলার গ্রীবা, গহনার সঙ্গে প্রেমে পড়েন। সে যাই বলুন না কেন— বর্তমান যুগের ধর্ম-অনুসারে সব বাড়ী থেকেই বৈঠকখানা উঠে গিয়েছে। ধর্ম যেকালে মেয়েদের জন্য তৈরী হয় ও রক্ষা পায়, তখন বৈঠকখানার রূপ পরিবর্তনের জন্য আশ্চর্যান্বিত হবার কিম্বা দুঃখ করবার কোন কারণ নেই। শুধু এইটুকু দেখলেই চলবে যে শিক্ষিতা মহিলার হাতে পড়ে Drawing-room-এর রূপ সুন্দর হচ্ছে কি না। সৌন্দর্যের মাপকাঠি কি জানি না— সেইজন্য গোটা কয়েক অন্য অভিজ্ঞতা লিখে পরিবর্তনের ইঙ্গিত জানাচ্ছি।

মেয়েরা এতদিনে পুরুষদের বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত কোরতে পেরেছেন। ফলে মেয়েদের গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ হয়েছে, সত্ত্ব-জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, সমালোচনার স্বাধীনতা এসেছে, পুরুষদের অত্যাচারের বিপক্ষে তাঁরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখছেন। মানুষ অর্থাৎ পুরুষে কত দিন আর নীরব থাকতে পারে?

পয়সাওয়ালা লোকে সব club-এ যাচ্ছেন। ক্লাবের সভ্য হওয়া যে কত ভাল জিনিষ তা বোলে শেষ করা যায় না। প্রথমতঃ— এর জন্য গৃহে শান্তি থাকে — বেশী মদ না খেলে ও বেশী ব্রিজ খেলে বাজী না হারলেই হল। দ্বিতীয়তঃ — আমাদের un-clubbable বলে একটা বদনাম আছে— সে বদনাম সহজেই দূর করা যায়। তৃতীয়তঃ— ক্লাবে সাহেব মেম এবং বন্ধুর উচ্চ শিক্ষিতা স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় লাভ হয়— এতে মনের উন্নতি হয়, পৃথিবীতে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা স্থাপনের উপায় পাওয়া যায়। চতুর্থতঃ— রুষিয়া, তুর্কী ও নিজেদের গভর্ণমেণ্টের অনেক গূঢ় কথা শুনে অন্যকে অর্থাৎ যিনি ও যাঁরা ক্লাবের সভ্য নন, তাঁদেরকে বলা যায়। এই ব্যস্ততার যুগে কিছু সব বিষয়ে বই পড়ে মত ঠিক করা যায় না— অনেকটা অন্য বিশেষজ্ঞের ওপর নির্ভর কোরতেই হয়। ক্লাবে প্রত্যেক বিষয়েরই বিশেষজ্ঞকে পাওয়া যায়। আমি আইনষ্টাইনের নতুন মত এই ক্লাবেই শুনেছি ও বুঝেছি একজন দালালের কাছে। পঞ্চমতঃ— এই ক্লাবের জন্যই একটি ক্লাব-সাহিত্য গড়ে উঠছে। 'চারইয়ারী কথা' থেকে চার হাজার ইয়ারকীর জন্ম হয়েছে সকলেই জানেন। অনেক গল্প 'বয়, পেগ লেয়াও' বলেই সুরু করা হয়। যাঁদের পেগে আপত্তি থাকে তাঁরা তামাক আনতে হুকুম দেন। কিন্তু তামাকে আজকাল আর গল্প জমে না। পরশুরাম ও কেদারবাবু জমাতে চেষ্টা কোরছেন চা তামাক দিয়ে— কিন্তু তাঁরা সাহিত্যের losing battle লড়াই কোরছেন। বৈঠকখানা আজকাল ভাঙা হাটের সামিল। এ হাটে ব্যবসা চলে না। আমার একান্ত অনুরোধ যেন তাঁরা কোন সভ্য ক্লাবে অতি শীঘ্র ভর্তি হয়ে পড়েন। 'রায় বাহাদুরের গৃহিণী' ও 'বেয়ান ঠাকরুণ' আমার মন্তব্য সমর্থন করবেন শপথ কোরতে পারি।

চারুকলার সঙ্গে বৈঠকখানার সম্বন্ধ পূর্বে ইঙ্গিত কোরেছি। সেই সম্বন্ধটিই বিশদভাবে প্রকাশ কোরছি। আমার বিশ্বাস, কলকাতা শহরে বৈঠকখানা-ওয়ালা বাড়ী পাওয়া দুর্লভ বলে থিয়েটারী সঙ্গীত, কন্‌সার্ট বাজনা, গ্রামোফোন ও রেডিও সঙ্গীতের আবির্ভাব হয়েছে। সহরের ভাড়াটে বাড়ীর নীচের তলার ঘর ছোট, অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। সেখানে গাইয়ে বাজিয়েদের আসতে বলা যায় না। সেখানে বীণা, তানপুরা, পাখোয়াজ রাখা যায় না। জোর রাখা যায়— হারমোনিয়ম ও তবলা কিম্বা এস্‌রাজ, এসব যন্ত্রগুলি ছোট, ওপরের ঘরেও রাখা যায়। শ্রান্ত কেরাণী অবসর পেলে কোলে তুলে নিতে পারেন। এবং বাড়ীর বিবাহ-যোগ্যা মেয়েও 'অন্ধকারের অন্তরেতে' কিম্বা 'যে বিদেশী' গেয়ে পাড়াকে সঙ্গীতসুধায় ডুবিয়ে দিতে পারেন।

বড় লোকের বাড়ীর কথা বিভিন্ন হতে বাধ্য। সেখানে বৈঠকখানার বদলে Drawing-room আছে। অতএব সঙ্গীতের রূপ ও প্রকৃতি বিভিন্ন হবেই হবে। খুব বড় লোকের বাড়ীতে পিয়ানো থাকে, মাঝামাঝি বড় লোকের বাড়ীতে থাকে জাপানী অর্গ্যান ও এস্‌রাজ। এই সব যন্ত্রের ঘেরা টোপ, বোসে বাজাবার আসন এবং আশপাশের স্থানগুলি মনোরম ভাবে সজ্জিত থাকে। পিয়ানোর মাথায় বেটহফেনের মর্মর মূর্তিও দেখেছি। তানপুরাও থাকে না, তা নয়। তবে দেখতে তত সুশ্রী নয়, আওয়াজগুলো বেড়ালের মতন, তার বাঁধতে ছিঁড়ে যায় বলে ঘেরাটোপের মধ্যেই থাকে। পিয়ানো সারাতে ভারী হাঙ্গামা, সেইজন্য ডোয়ার্কিনের আদর সর্বত্র। অল্প বয়সী মেয়েরা এস্‌রাজ বাজাতে বসলে ভারী সুন্দর দেখায়, বাঁ হাতের হীরের আংটি জ্বল জ্বল ক'রে ওঠে, এস্‌রাজের সুরটাও করুণ ও নাকী। বাঙ্গালী মেয়েদের প্রাণের কথা (শুধু বাঙ্গালী কেন ? সমগ্র বাংলা জাতির মর্মবাণী) এস্‌রাজ যেমন আত্মপ্রকাশ করে অমন আর কিছুতে হয় না। মৃদুস্বরে, ঈষৎ নাকী সুরে, আধ আধ ভাষায় যে বেদনা কবিতায় রূপায়িত হয়, সেই কবিতাই Drawing-room-এ গাওয়া সম্ভব। পয়সাওয়ালা লোক ও বিলেত ফেরতের ধারণা যে অতুলপ্রসাদ ও রবিবাবুর গান গাইতে কোমলকণ্ঠি হওয়া চাই, সে কণ্ঠে মুক্তার শেলী দোলা চাই। চেহারা ভাল হওয়া চাই অবশ্য, কিন্তু ওটা পয়সা দিয়ে কেনা যায় না— বিলেত ঘুরে এলেও মেলে না।

গ্রামের জমীদার বাড়ীর বৈঠকখানায় এখনও সুরবাহার, তানপুরা, পাখোয়াজ দেখতে পাওয়া যায়। জমীদার মশাই-এর ছোট ছেলে সাধারণতঃ ব্যবহার করেন হাতির দাঁত বসান ছোট্ট হারমোনিয়ম, চাবি টিপলেই scale বদলান যায় আবার। কিন্তু বাইরে থেকে ওস্তাদ এলে যন্ত্রগুলো সাফ করা হয়। বৈঠকখানা হয় খুব দূরে— সেখান থেকে পাখোয়াজ ও ধ্রুপদ গানের বিকট আওয়াজ অন্দর মহলে প্রবেশ করে না বলে গ্রামের বৈঠকখানার গানের আওয়াজ খুব চড়া ও গম্ভীর হওয়া সম্ভব হয়। সর্বত্রই ধনীরা আর্টের পরিপোষক। তবে পরিপোষণের মাত্রা ও প্রকৃতি নির্ভর করে ঘর বাড়ীর ওপর। গ্রামের সঙ্গীতজ্ঞ জমীদার সম্প্রদায় চড়া ও জোর গলা ভালবাসেন— তাইতেই তাঁরা অভ্যস্ত হয়েছেন। কি করে তাঁরা মৃদু গলায় নাকী সুরের Drawing-room music পছন্দ কোরবেন ? Drawing-room-এ পূর্বোক্ত কারণে অতুলপ্রসাদ ও রবিবাবুর, বিশেষতঃ রবিবাবুর গান গাওয়া হয়। সেইজন্য দেশের সঙ্গীতজ্ঞ জমীদার সম্প্রদায় রবিবাবুর গান ভালবাসেন না।

যদি জমীদারের দলকে কলকাতায় ছোট ভাড়াটে বাড়ী কিম্বা বালিগঞ্জের সাহেব পাড়ায় থাকতে হত, তা হলে রবিবাবুর গানই রামপ্রসাদী, নিধুবাবুর টপ্পা ও রজনী সেনের গানের চেয়ে ভাল লাগত। অতএব সঙ্গীতে মত পার্থক্যের কারণ সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় কোন গূঢ় তত্ত্ব নয়— কারণ বৈঠকখানার রূপ ও অন্দরমহল থেকে দূরত্ব।

এই দূরত্বের ওপর সাজ-সরঞ্জামের ও খেলাধুলার রুচি নির্ভর করে। বৈঠকখানা পরিষ্কার করে চাকর-বাকরে, Drawing-room পরিষ্কার করেন বাড়ীর মেয়েরা। প্রথমটি সাজান হয় পুরুষের রুচিতে, দ্বিতীয়টি সাজান হয় মেয়েদের রুচিতে। একটু তফাৎ হতে বাধ্য। মেয়েরা দামী গহনা ভালবাসেন, সেইজন্য Drawing-room-এর শ্রী একটু দ্রাবিড়ী ধরণের। পুরুষরা ভালবাসেন খোলা জায়গা, সেইজন্য বৈঠকখানাতে বেশী জঞ্জাল থাকে না। ময়লা থাকে দু'জায়গাতেই— মেয়েরা কিছু রোজ ম্যাটিং তুলে ঝাঁট দিতে পারেন না, ঘেরাটোপ খুলে ঝাড়-পোঁচ করতে পারেন না, আর বৈঠকখানা পুরাতন ভৃত্যের হাতে ন্যস্ত থাকে বলে চাদর ও তাকিয়ার গেলাপ ময়লাই থেকে যায়— কোণে তামাকের গুল বেড়েই চলে। বৈঠকখানায় খেলা হয় তাস, সতরঞ্চ, Drawing-room-এ খেলা হয় Bridge। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে পড়ছে। আমি সমাজতত্ত্ববিদের কাছে— বিশেষতঃ Environmentalist-দের কাছে সামাজিক পরিবর্তনের একটি অসম্পূর্ণ কাহিনী বিবৃত কোরছি। আশা করি, কোন অধ্যাপক আরো নতুন তথ্য সংগ্রহ করে সভ্যতার সঙ্গে বৈঠকখানা ও অন্দরমহলের সম্বন্ধে লম্বা থিসিস্ লিখবেন— তবেই আমি ধন্য হব। সম্বন্ধের সূত্রটুকু আমি ধরিয়ে দিলাম। সূত্রটি হচ্ছে স্ত্রীলোকের হাতে। অর্থাৎ স্ত্রীজাতির শিক্ষা, সাধনা ও সুবিধার ওপর সভ্যতার ভাগ্য নির্ভর কোরছে। আজকালের মেয়েরা নিজেদের জন্য কিছু টাকা এবং একটি নিরিবিলি ঘর চাচ্ছেন। তাঁদের চাওয়াটা খুবই ন্যায্য মনে হয়। প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীকে মাসে মাসে হাতখরচ দেওয়া— তার হিসেব না নেওয়া এবং একটি আলাদা ঘর দেওয়া। কোলকাতা সহরে আলাদা ঘর পাওয়া দুষ্কর। এসব কথা লিখতে সাহস হয় না আমাদের দেশে। অমনি এম এ'র দল মেয়েদের বাপের কাছে এমন পণ চেয়ে বোসবে যার সুদে স্ত্রীর হাত খরচ দেওয়া চলে, নিজের হাত খরচও চলে এবং বৈঠকখানা কিম্বা boudoir-ওয়ালা বাড়ীর ভাড়াও দেওয়া যায়। তা ছাড়া সাজাবার খরচ ও বিলেত যাওয়ার খরচও আছে। সেইজন্য সমস্যাটুকু উল্লেখ করেই অতি সন্তর্পণে প্রবন্ধ শেষ করলাম।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ ও পুস্তক-পত্রিকা পরিচয়

(শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা)

একখানি পত্র

১.

তুমি আমাকে মাঝে মাঝে বড় বিপদে ফেল। তোমার স্নেহশীল হৃদয়ের অনেক পরিচয় পেয়েছি, তাই স্মরণ কোরে তোমার স্নেহের অত্যাচারকে আমার ক্ষমা করা উচিত। কিন্তু পারছি না। সদা সর্বদা নিজেকে কৃতজ্ঞতার উঁচুসুরে বেঁধে রাখা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কৃতজ্ঞতার চেয়ে বড় কর্তব্য রয়েছে নিজের ওপর। না যদি থাকত তা হলে রাজকীয় আন্দোলনের কোন সার্থকতাই ছিল না।

তুমি আমাকে রাধারাণী দেবীর **সীঁথিমৌর** দিলে কেন? আমার কবিতা বুঝতে দেরী লাগে, তার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে ভয় হয়। আমার বিশ্বাস কবিতা বোঝা এবং বুঝে সমালোচনা করার মতন কঠিন কাজ আর দুটি নেই। আমরা বিংশ শতাব্দীর লোক, পদ্যকে ধীরে ধীরে, তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবার মতন সাধনা আমাদের নেই, সময় নেই, প্রবৃত্তি নেই। নেহাৎই রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন, তাই কখনও কখনও ভুলে যাই যে বিংশ শতাব্দীর সময় ঘণ্টায় ষাট মিনিট বেগে ধেয়ে চলে। তাঁর কবিতায় যন্ত্র-যুগের গতিশীলতা নিরুদ্ধ। বিরামের ভোগ তিনিই বণ্টন করেন। সেই ভোগের নেশায় ও আশায় অন্য কবির লেখা পড়ি। শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর লেখাও পড়েছি, ভালও লেগেছে, তোমাকে বলেওছি। তুমি যদি তাই স্মরণ করে তাঁর এই সনেটগুলি আমাকে পড়তে দিয়ে থাক তা হলে তোমাকে দোষ দিই না। কিন্তু না দিলেই ভাল করতে। আমি এক ঘণ্টায় বইখানি শেষ করলাম। মনে আমার কোন দাগ পড়ল না। এমন কি বই-এর ঐ রকম বহুমূল্য মলাট ও ছাপাটাও না। কি মনে পড়ল জান? যেন বিবাহ-বাসরের সালঙ্কৃতা কন্যা সম্প্রদানের জন্য সজ্জিতা হয়ে আড়ষ্টভাবে বসে আছেন। বিবাহ-অনুষ্ঠানটি উচ্চাঙ্গের, সজ্জাও তাই। অবশ্য সাজটি বেনারসী চেলীর জোড়ের নয়, বাংলা দেশেরই কারুশিল্প খচিত, তবু যেন কোথায় পিত্রালয়ের আটপৌরে শাড়ীর স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অনটন রয়ে গিয়েছে। আদত ব্যাপার কি জান? কোন বিশেষ ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখব মনে করে

সত্যকারের কবিতা লেখা যায় না। দু একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি হয়ত পেরেছেন, কিন্তু সাধারণ কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা পারেন না। রাজ-দরবারের জন্য, কিংবা প্রীতি-উপহারের জন্য লেখা ক'ট। ভাল কবিতা পড়েছ? কারণ বোধ হয় এই, সত্তার স্থানটি যখন প্রতীক অধিকার করে, তখন প্রেরণা সৎ হয় না, অসৎ হতে বাধ্য। অসৎ অর্থে আংশিক। প্রেরণার আংশিকতা গোপন করতে সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়, ভাষার আড়ম্বর বৃদ্ধি পায়। যদি সনেট রূপটি নির্বাচিত হয়ে থাকে, তাহলে আরো বিপদ। সনেটের লাইন কটিতে অত ভার সয় না। যে সনেট দীর্ঘ কবিতায় উপচে পড় পড়, তাকে সনেট বলা যায় না। সনেট একটি সম্পূর্ণ 'চক্র', তাকে gestalt বলতে পার। রাধারাণী দেবীর এই লেখায় অনেক ছেঁড়া সুতো রয়েছে। তাই বলি, এ বই কোন বিশেষ ঘটনার উপযুক্ত হলেও, লেখিকার যোগ্য নয়। এক কথায় **সীঁথিমৌর** নরেনদার স্ত্রীর লেখা— বৌদির লেখা— রাধারাণী দেবীর লেখা নয়! সনেটের সংযম এ বইটিতে নেই। যদি চিঠির বদলে সমালোচনা করতাম, আর হাতে বিস্তর সময় থাকত, এবং সে সময়ের প্রত্যেক ফাঁককে ভারী জিনিষ দিয়ে ভরে দেবার মতন খেয়াল আমার আসত, তাহলে আশা করি দেখাতে পারতাম অসংযম কোথায় এবং কতটুকু।

প্রবোধ সান্যালের **নিশিপদ্মটি** পড়লাম। প্রবোধ প্রত্যেক গল্পের গোড়ায় সংক্ষিপ্ত সার ছাপিয়ে বুদ্ধিমান পাঠক ও বুদ্ধিমতী পাঠিকাকে অপমান করেছেন মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বড় সুবিধা হয়েছে। সূচনাটি চোখের সামনে থাকাতে গল্পগুলির কৌশল কতটা সার্থক হয়েছে বুঝতে দেরী হয় নি। এ যেন জ্যামিতির কোন পাঠ। শেষে Q. E. D. লিখলেই চলে। এটা খুব দোষের কথা নয়। কিন্তু-এর পরেই আমার একটি সন্দেহ উঠেছে। প্রবোধকে গল্প-লেখক বলব, না রেখা-চিত্রকর বলব? গত কয়েক বৎসর ধরে বিদেশী কথা-সাহিত্যে একটি নতুন ধারা চলছে লক্ষ্য করছি। কথা-সাহিত্যের বস্তু আর শুধু গল্প হচ্ছে না। যা হচ্ছে তার দুটি দিক—একটি সমাজ-তত্ত্বের, অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা-পূরণের, অন্য দিক হল ছোট্ট খাট্ট কোন ঘটনার বিবৃতির সাহায্যে জীবন-সম্বন্ধে কোন বিশেষ মনোভাবকে বিকাশ করার। প্রথম ধরণের গল্পে ও উপন্যাসে, এমন কি কবিতায় লেখকের সামাজিক সহানুভূতিকে সংযত করার তাগিদ নেই, কিন্তু একটি মাত্র incident-কে অর্থপূর্ণ ক'রে তুলতে হলে ভাবাবেগকে নির্বাসিত করতে হয়, না হলে মানসিক সংস্থিতি ঘটনার

সমাবেশকে সঞ্চারিত ও অনুপ্রাণিত করতে পারে না। এই attitude-টি শুধু ভাবাবেগ নয়, এটি conviction। স্থির-বিশ্বাস ও সংস্থিতি উচ্ছ্বাসের বিপরীত ধর্মাবলম্বী। এখন, প্রবোধের লেখা নতুন ধরণের মানতেই হবে। সে এক একটি significant incident-কে নির্বাচন করেছে যখন, তখন তার লেখার বিচারে পুরাতন মানদণ্ড খাটবে না নিশ্চয়। তার বেলা দেখতে হবে ঘটনা-নির্বাচন-শক্তি কতটুকু। সে শক্তি তাঁর আছে। তারপর দেখতে হবে সে ঘটনাকে কতটুকু রূপ দিতে পেরেছে। তার লেখার রূপ আছে, যদিও সেটি গল্পের রূপ নয়। শেষে দেখতে হবে তার রূপের মূল্য কত? এই প্রকার রূপের মূল্য সাধারণতঃ নির্ভর করে জীবনের প্রতি একটি স্থির মনোভাবের ওপর। নয় কি? প্রবোধের attitude আছে, কিন্তু সেটা তার নিজস্ব নয়, সেটা তার দলের, এবং সেটা বিংশ শতাব্দীর অতিপরিচিত উদারপন্থার, এক কথায় দু'দিক থেকেই সামাজিক। এইখানেই প্রবোধ দুই নৌকায় পা দিয়েছেন। খানিকটা সামাজিক, খানিকটা incidental, খানিকটা ভাব-প্রবণতার আমেজ, খানিকটা সংযমের রুক্ষতা। ফলে প্রবোধের ব্যক্তিগত এবং বিশেষ attitude-টি ফুটে উঠল না।

ফলে আরো একটু দোষ হয়েছে। এই ধরণের লেখা অনেকটা রেখা-চিত্রের মতন। বুদ্ধদেব বোস এই কথাটি বুঝেছিলেন ব'লেই তাঁর **রেখাচিত্র** বইটা অমন উৎরে গিয়েছে। রেখা-চিত্রের সার্থকতা নির্ভর করে সূক্ষ্মতুলির চেয়ে চিত্রকরের বিশেষ একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। বুদ্ধদেবের তুলি প্রবোধের তুলির চেয়ে সরু এবং টান ও সূক্ষ্মতর। কিন্তু সেইটুকু বললে চলবে না। বুদ্ধদেবের একটা নিজস্ব দেখার ভঙ্গী আছে, সেটি প্রবোধের নেই আমার সন্দেহ হয়েছে। এখানে নৈর্ব্যক্তিকতার কথা ওঠেই না, প্রবোধ হয়ত দুদিন পরে পৃথিবীকে নিজের মতন ক'রে ভাবতে শিখবে। কিন্তু বুদ্ধদেবের লেখার অন্য দোষ আছে কোথায় জান। সে দোষ তার প্রায় সব লেখারই মধ্যে, অতএব মানতে হয় যে সে দোষ তার লেখার যে মালিক, সেই ব্যক্তিত্বে। বুদ্ধদেবের তুলি সরু, দৃষ্টিশক্তি ধারাল, তার একটা মনোভাব বা attitude-ও আছে। কিন্তু সে মনোভাবটি significant নয়, নঙর্থক, সদর্থক নয়। তার বিলেতী নাম cynicism। লোকে বলে cynicism is significant of this age. কথাটা ঐতিহাসিক অর্থে ভুল নয়, ভুল হল শব্দের অযথা দ্ব্যর্থ প্রয়োগে। Significance আর symptomatic এক বস্তু নয়। তোমার নিশ্চয় অলডস্ হাকসলীর কথা মনে পড়বে। তাঁর cynicism হল আদর্শবাদীর আক্ষেপ—

Brave new World বইটা অন্তত: পড়লে আমি সত্যি বলছি কি মিথ্যা বলছি বুঝবে। তাঁর প্রত্যেক লেখায় এমন গোটাকয়েক values এর খোঁজ পাওয়া যায় (যদিও অ-পরিস্ফুটভাবে, কেন না তাঁর রাগের চোটে কোন চরিত্রগুলিই রক্তমাংসের হয় না, সব যেন ঝলসে যায়, কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ে) যেগুলি অলক্ষ্যে তাঁকে নোওয়েল কাউয়ার্ড, মাইকেল আর্লেন প্রভৃতি লেখকের শ্রেণীতে নেমে পড়া থেকে রক্ষা করে। তাঁর শুদ্ধচিন্তা, বৈজ্ঞানিক মনোভাব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস যদি না থাকত তা হলে তাঁকে সুপণ্ডিত এবং চমকদার লেখক বলেই লোকে ছেড়ে দিত। তা দেয় না। কিন্তু অন্য দুজনকে লোকে ছেড়ে দেয়। লোকে বরাবরই সন্দেহ করে এসেছে যে অলডসের লেখায় অনেক উলটো কথা থাকলেও সেগুলি একটা বড় আদর্শেরই inversion। বুদ্ধদেবের কোন গদ্য লেখায় এ-ধরণের বড় values-এর সন্ধান পাইনি, কিন্তু পদ্যে মনে হয় পেয়েছি। বলা বলা বাহুল্য, আদর্শ বলতে আদর্শবাদীর আদর্শবাদ বলছি না, a significant attitude towards life বলছি। মোদ্দা কথা, বুদ্ধদেবের fundamentals নেই। এর বেশী চিঠিতে বোঝান যায় না। তাই মনে হয়, বুদ্ধদেবের cynicism হল একটা pose মাত্র। প্রমাণ চাই? এই **রডডেনড্রেন গুচ্ছে** বিস্তর banter রয়েছে। (আচ্ছা banter-কে চিপ্‌টিনী কাটা বলা যায় কি?) কিন্তু irony নেই। Irony-র জন্য একটা বড় কিছু চাই। এই ধর আনাতোল ফ্রান্স, ঠাট্টার রাজা, কিন্তু তাঁর লেখার নিষ্ঠুরতম ছত্রেও আছে করুণা, অনুকম্পা, piety glowing in the light of reason। এত sweetness ও toleration যীশুর উপযুক্ত বল্লে অত্যুক্তি হয় না। জুডিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা ভাব। গল্পটা পড়তে পড়তে পাগল হয়ে যাই হে! সে যা হোক, বুদ্ধদেবের লেখা খুব ঝরঝরে, কিন্তু sweetness ও toleration তাঁর নেই। না থাকলেই যে বড় লেখক হয় না তা নয়। কিন্তু এ ধরণের অসহিষ্ণুতাতে হয় না, বরঞ্চ কার্লাইলের মতন, ওল্ড টেষ্টামেন্টের মতন, ওল্ড টেষ্টামেন্টের প্রফেটদের মতন রাগলে হয়। বুদ্ধদেবের অসহিষ্ণুতা অনেকটা দুষ্ট ছেলের আব্দারের মতন লাগে, সেটার মধ্যে ঘৃণার তেজ, সাহস ও রাগ নেই, আছে আরো না পাওয়ার জন্য অভিমান। পৃথিবীর বর্তমান values-কে তিনি মোটেই অগ্রাহ্য করেন না, গ্রহণই করেন, তবে গ্রহণের ভাষা দুষ্ট ছেলের ভাষার মতন মিষ্টি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উল্টোপাল্টা। তাঁর disillusionment-ই হয় নি, সত্যকারের cynic হবেন তিনি কি করে! বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে সেই ঠাট্টা প্রয়োগ করা চলে variety.

to the point of dissipation, memory to the point of emptiness। বুঝতেই পারছ আমার আপত্তি কি ও কোথায়? আফশোষ বল্লেই ঠিক হত। কেন বুদ্ধদেবের লেখা পড়তে চমক লাগে, চমক ভাঙে, বাংলা দেশের যুবক সম্প্রদায়ের লেখকদের মধ্যে তার মতন equipments খুব কম লোকেরই আছে, নেই বোধ হয়। কিন্তু অমন ছেলে তৃতীয় শ্রেণী, কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদেশী লেখকদের অনুকরণ ক'রে নিজের প্রতি অন্যায় করে কেন? তবে একটা আশা আছে, যে সে নিয়তই পরীক্ষা করছে, তার মনের দরজা খোলা। সে নিজের ওপর সন্তুষ্ট নয়, সে ইচ্ছা করলে নিজেই নিজের সমালোচক হতে পারে। যে লোকের পরীক্ষা করবার সাহস আছে, যে নিজের লেখা-সম্বন্ধে অন্ধ নয়, সে কোন দিন না কোন দিন পৌঁছবেই পৌঁছুবে। তবে ইতিমধ্যে values নির্বাচন করা চাই। আর চাই না অর্থকষ্ট, এবং তার চেয়ে ভয়ঙ্কর, অর্থের প্রাচুর্য। যেমন বুদ্ধদেবের সব বই কিনে পড়া উচিত, তেমনি উচিত তার বইকে তৃতীয় সংস্করণে যেতে না দেওয়া। আর একটা কথা রডডেনড্রেন গুচ্ছে শেষের কবিতা ছাড়া অন্য একটি বিদেশী নভেলের ছায়াপাত হয় নি কি? তা হোক্‌গে! বুদ্ধদেব এখনও নিঃশেষিত হয় নি। সে অদ্ভুতভাবে বাইরের জিনিষ হজম করছে; এ কাজটা একটি আধটি জিনিষ ভাল লিখে খতম হয়ে যাওয়ার চেয়ে ভাল। গদ্য যদি ছেড়েও দাও, পদ্যে বুদ্ধদেব কিছুকাল বাঁচবে। পদ্যে অন্ততঃ তার পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। গদ্যে কবে বেরোবে জানি না। ওধারে বিভূতি বন্দ্যো, প্রেমেন যে ওপর ক্লাসে উঠবে উঠবে করছে!

আর না, রাত গভীর হল। Dogs bark in the hollow distance লাইনটা মনে পড়ছে— হয়ত বুদ্ধদেব, প্রবোধ ও রাধারাণী দেবীরও মনে পড়ছে। হোর সাহেবের উক্তি মনে আছে? ইতি চিঠি, অর্থাৎ ধান ভানতে শিবের গীত। একটি শৈব সঙ্গীত পাঠালাম। নাম ষ্টোভ। ভাল লাগলে সেটি ছাপিও। উত্তর দিও, বই পাঠিও, পড়বার জন্য, সমালোচনার জন্য নয়। ভালবাসা জেনো।

২.

এবার আমাকে যে সব বই পড়তে অনুরোধ করেছ তার প্রায় প্রত্যেকটাই ভাল লেগেছে। বিষ্ণু দে'র উর্বশী ও আর্টেমিস, কেদারবাবুর দুঃখের দেওয়ালী, প্রবোধকুমারের মহাপ্রস্থানের পথে, অবনী রায়ের অনুচ্চারিত, বুদ্ধদেবের সানন্দা, আমার বন্ধু, যেদিন ফুটল কমল, এবং প্রেমেন মিত্রের উপনায়ন বিশেষ করে এইগুলো পড়ে আনন্দ পেয়েছি। একই ধরণের আনন্দ নয়, গোড়াতেই বলে রাখছি। লেখাও এক শ্রেণীর নয়, প্রত্যেক লেখকেরই দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক, রচনার গুণের তারতম্যও রয়েছে। আমার দিক থেকেও বলে রাখছি যে এই মনোভাবের বশবর্তী হবে পর পর বইগুলো পড়িনি। নিয়মমাফিক পড়েছি। অথচ তুমি দীর্ঘপত্রে আমার মতামত জানতে চেয়েছ। এতে একটা ভীষণ অবিচার করা হয় জানি— কিন্তু 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' মহাবাক্যটি স্মরণ করে একটু সান্ত্বনা পাচ্ছি। তুমি মাসিক সাহিত্যের কাবুলীওয়ালা, তোমার হাত থেকে কেউ কখনো নিষ্কৃতি কেউ পাবে না। তোমার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিচ্ছি সনাতন উপায়ে, অন্যের প্রতি অবিচার ক'রে। বড় সাহেব বললেন, 'বাবু, তুমি একটি fool'—বাড়ি এসে বাবু স্ত্রীকে বললেন, 'মেয়ে মানুষ জাতটাই ইডিয়ট।'

প্রথমে যে বইটা ভাল লাগে নি তার সম্বন্ধে লিখি। মহেন্দ্র রায়ের কিশলয় তরুণ-তরুণীদের খোসামোদ ক'রে রাখে। কৈশোর অবস্থাহিসাবে শৈশবের চেয়ে ভাল নয়, প্রৌঢ়ত্বের চেয়েও নয়। কৈশোরের চেয়ে শৈশবেই ভবিষ্যতের [আশা] বেশী থাকে। কিশোর কিশোরী ভাল কাজও করেন, খারাপ কাজও করেন। য়ুরোপ যুদ্ধের পর যৌবন যৌবন কোরে [নেচে] উঠেছিল, কিন্তু এই যুবক-যুবতীর দলই ফ্যাশিষ্ট হল, নাৎসী হয়ে ইহুদীদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করছে। চায়না এবং রাশিয়াতে তারাই আবার নিঃস্বার্থভাবে দেশের কাজ করছে। চোদ্দ পনের বছরের বাঙ্গালী ছেলেরা একজন খেলোয়াড়কে খেলার মাঠে সাহেব বলেই মেরেছে। আমার বিশ্বাস যে কৈশোর অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা, সমাজের দিক থেকে, কেন না সব কিশোরই হবু — ফ্যাশিষ্ট। একধারে সর্দারী করবার প্রবৃত্তি, অন্য ধারে না বুঝে সুঝে ভুল আদর্শের নামে সর্দারের হাতে আত্ম সমর্পণ—এই বিরোধের ঘুর্ণীতে হাল্কা নৌকো বানচাল হয়। মহেন্দ্রবাবুর মত শিক্ষিত ব্যক্তির কাজ হল বন্যার ওপর লালবাতি দেওয়া। তা না ক'রে তিনি সত্যকারের বিপদগুলিকে কাব্যের আকার দিয়ে মধুর ক'রে তুলেছেন। ছেলেমেয়েরা এ বইটা খুব কিনবে, এবং

হবে আদর্শবাদী! আর একটা কথা, কৈশোরে মন ব'লে কোন বালাই থাকে না, যেটুকু থাকে তার নাম মন নয়, সে মন একটা ইন্দ্রিয় মাত্র, কিংবা ইন্দ্রিয়ের দাস। তখনকার মানসিক কার্যাবলী অন্য অবস্থার মানসিক কার্যাবলীর অপেক্ষা ভাবচালিত। মন বাতিল করে ইন্দ্রিয়ভোগ ও ভাববিলাস কারুর কাম্য হতে পারে কি? কৈশোরের potentiality আছে, তাকে উন্মুক্ত করা প্রয়োজন, কিন্তু ঐ প্রকার উচ্ছ্বাস পূর্ণ চিঠির দ্বারা হবে না। হবে না কেন? সে মুক্তি কাম্য নয়। উন্মুক্ত করতে হবে মনের দ্বারা। আমাদের তরুণ-তরুণীদের কি চাই জান? Obstinate Rigour—কঠোর সংযম—এ উপদেশ দেবার ভাষায় মাধুর্যের সঙ্গে কাঠিন্য থাকবে। মহেন্দ্রবাবুর ভাষা চমৎকার, কিন্তু একটু বেশী ভাল, মধুর, বেশী মধুর, মোলায়েম, চিনি নয় কেবল স্যাকারিণ, সেইজন্য একটু তেতো লাগল। এই ভাষার উপযুক্ত বিষয় অন্য, ভাষা ও বিষয়ের লাগড়াট শুনতে চাও, ত' সুরেশ চক্রবর্তীর, তোমার নয় পণ্ডিচেরীর সুরেশের ঐন্দ্রজালিক পড়। যদি পড়ে থাক, আবার পড়। মহেন্দ্রবাবু মরমী কবির ভক্ত— মরমীর দরদী ভাষা!— মেটারলিঙ্কের ভাষা কি এই ধরণের ফেনিল? সে ভাষা অতিশয় সংযত, নেহাৎ যতটুকু না হলে চলে না, তাই। কিশোরীর দেহের মতনই economical, যদিও অতটা ল্যাঙপেঙে নয়। কিশোর-কিশোরীর শিক্ষা সম্বন্ধেও মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমি একমত নই। জোর এই কথা বলা চলে—শিক্ষার একটি ছন্দ থাকা চাই, যেমন জীবনের এই ছন্দকে কখনও মেলাতে হবে, কখনও বৈপরীত্যের দ্বারা ভারসাম্য ঘটাতে হবে। যখন আসবে উচ্ছ্বাসের যুগ তখন বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারা তাকে উৎসাহিত করতে হবে, ছন্দের গতিকে সংহত করতে হবে, কণ্টকেনৈক কণ্টকম্। এ না করলে আজ না হক দুদিন পরে এই কিশোর-কিশোরীর দল বন্ধুর বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়াবে, অকৃতজ্ঞ হবে, সর্বনাশ হবে তখন।

বিষ্ণুর কবিতা নিয়ে পূর্বাশায় একটা লম্বা প্রবন্ধ দিলাম, পড়ে দেখো। লেখাটা একটু এক পেশে হয়েছে, তবু সেখানে আমি বিষ্ণুর কবিতার দোষ-গুণ বিচার করবার চেষ্টা করেছি। তার কবিতার তিনটি গুণ লক্ষ্য করেছি— সে ছোট কবিতা লেখে, গ্যাজগ্যাজানি নেই, ভাব-বিলাস নেই। বাংলা দেশের পক্ষে মস্ত গুণ। সে আধুনিক ইংরেজী ও আমেরিকান কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত, এবং বেমালুম তাদের নতুন ছন্দ-রূপ গ্রহণ করেছে। গ্রহণ, অনুকরণ নয়, কেননা তার ভাববস্তু অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সেই সব ছন্দে রূপায়িত হয়েছে, কোন পরীক্ষার প্রচেষ্টা নেই। এবং গোটা কয়েক কবিতা সার্থক

হয়েছে— যেমন ধর উর্বশী। দোষ এই যে সে এমন গোটা কয়েক উল্লেখ ইঙ্গিত করেছে, এলিউশন্ দিয়েছে, এমন দু'চারটি কথা প্রয়োগ করেছে যার শেকড় আমাদের মনের ভেতর নেই ও প্রবেশ করেনি, সহজে প্রবেশ করবেও মনে হয় না। দু একজন আমাকে বলেছেন, এসব pedantry, পাণ্ডিত্য দেখান। হতে পারে হয় ত, কিন্তু আমার মনে হয় ডানার বদলে আর্টেমিস কথার ব্যবহারে একটা সুরগত সার্থকতা আছে। আর একটা দোষ এই যে সে অভিনব রূপ গ্রহণ করলেও যাকে আধুনিক বলি তা হতে পারে নি। আধুনিকত্বের মূল কথা cerebration is substituted for emotionalism। বিষ্ণু ভাবুক কবি নয়, মরমী নয়, কিন্তু তাই ব'লে এলিয়টের মতন সে জ্ঞান-রাজ্যের মহারথী নয়। বিষ্ণুর যুক্তশব্দগুলি বেশ সুরেলা। নানা দোষ থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে বিষ্ণুর কবিতা উপভোগ করতে হলে আরাম কেদারা থেকে উঠে বসতে হয়।

বুদ্ধদেবের সানন্দা neat ও ঝকমকে। সে যেখানে শেষ করেছে সেখানেই গল্পের স্বাভাবিক পরিণতি। গোড়ার দিকে একটু ফেনান আছে, তখন বোধ হয় বুদ্ধদেব চিন্তা করেনি গল্প কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। বীরেনকে আঁকতে গিয়ে সাহিত্যিকভক্তদের ওপর অতটা গালাগালি করা বাড়াবাড়ি হয়েছে— ওটুকু বাদ দিলে স্বীকার করতে হবে যে বীরেন একটি সুপরিচিত টাইপ, যার পেশা হল 'সিংহ শীকার'। সানন্দাও জীবন্ত হয়েছে। তার ধরণের মেয়ে বাঙ্গালী সমাজের একটি স্তরে হয়ত দুর্লভ নয়, যদিও আমি এই শ্রেণীর সঙ্গে পরিচিত নই। Sensation mongering-এর ভেতর একটা নিরর্থকতা থাকে যার ফলে জীবনটাই বিশ্বাস মনে হয়, তারই প্রতিক্রিয়ায় মানুষে নিতান্ত ভাব-প্রবণ হয়ে পড়ে, যে কোন একজন ব্যক্তিকে আশ্রয় করতে চায়, প্রথমে সন্ধ্যা, পরে মৃণ্ময়, পরে অবনী, এই চলল। প্রত্যেক সম্বন্ধটিই মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, মৃণ্ময়কে না চিনেও সানন্দা বলত সে তার পুরাতন বন্ধু। সানন্দা বরাবর নিজেকে ঠকায় ক্ষণিকের জন্য। ডার্লিঙ জীবনের প্রত্যেক অধ্যায়কেই অনন্ত জীবন ভাবত, দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করত, তাই সে প্রকৃতই ডার্লিঙ, সানন্দার টাইপ, poor ineffectual girl মাত্র। কিন্তু তাকে poor বলতেই হবে। বুদ্ধদেবের নিষ্ঠুরতার অন্তরালে এই গুপ্ত সহানুভূতির সন্ধান পেয়ে আশান্বিত হলাম।

বুদ্ধদেবের বইখানির ১৪, ২৬, ২৭, ৬২, ৬৩ পাতাগুলো পোড়ো, বুঝবে ওর লিখবার ক্ষমতা। কিন্তু ১৫ পাতার প্রথম লাইনটা পড়লে বুদ্ধদেবের দুর্বলতা কোথায় তা বুঝবে। সে লিখছে, বীরেন সম্বন্ধে, 'একটু দেখলেই ভদ্র

লোককে দু' কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেবার প্রবল একটা লোভ হয়।' এ লাইনটায় বিদ্রূপ নেই, ক্রোধ হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে। বুদ্ধদেব একটু নিরাসক্ত হয়ে ঠাট্টা করে যাচ্ছেন হঠাৎ নিজের ওপর সংযম হারালেন। ক্রোধের এ রকম আকস্মিক উৎপাত এরেলুনে নেই, আছে Brave New World এ। তবে সত্য কথা কি জান? আমারও ঐ রকম ঝাঁকুনী দিতে ইচ্ছে করে, তোমাকে, তবে আমি বুদ্ধদেব নয় আমাকে যা সাজে তাকে তা সাজে না, আর তুমিও বীরেন নও, তুমি bore নও, bully। Bore এর ছবি এত সুখপাঠ্য হতে পারে বাঙ্গালী পাঠক বাংলা সাহিত্য পড়ে ভাবতে পারে নি। আবার বলি, সানন্দা খেয়ালের মাথায় লেখা, তাই অমন neat হয়েছে। কিন্তু neat হলেও slight।

বুদ্ধদেবের আরো দুটো বই পড়লাম। 'আমার বন্ধু' বইটা সানন্দার চেয়ে ভাল। ভবভূতিও 'ভক্ত', কিন্তু সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও বন্ধুবাৎসল্যের জোরে বুদ্ধদেব তার প্রতি পাঠকের অনুকম্পা সৃষ্টি করিয়েছেন। যে দৃশ্যে ভবভূতি বুঝলে যে তার বন্ধু তাকে প্রবঞ্চনা করে আসছেন সে দৃশ্যটি ভারী করুণ। কিন্তু এই dramatic moment-টিকে বুদ্ধদেব খুব সদ্ব্যবহার করেননি মনে হয়। যে ভবভূতিকে এতক্ষণ ধরে comic ভেবে আসছি তাকে tragic করে তুলতে হলে হয় প্রথম impressionকে ভোঁতা করতে হবে, না হয় বিরোধটা আরো তীক্ষ্ণ করতে হবে। বুদ্ধদেব এ দু'এর এক কাজও করল না। শেষরাত্রি (মাসীমা) গল্পের প্রবঞ্চনার ট্রাজেডীটা বিশ্লেষণ করলেই বুঝবে। একটা ভারী মজার কথা মনে হচ্ছে, আচ্ছা ভব-ভূতিকে নায়কের artistic conscience করলে মন্দ হত কি? যেমন আলান পো করেছেন— জন উইলসন (?) গল্পে? টেকনিকটা মনে আছে?

বুদ্ধদেবের দ্বন্দ্ব ঘুচেছে তার 'যেদিন ফুটল কমল' বইখানিতে। কমলের কুঁড়ি ধরেছে, আর পঙ্কও নেই, জলও নেই। বইটা সত্যই ভাল, নিশ্চয়ই পড়বে আমার অনুরোধ। ভাল লেগেছে তার ভাষার উন্নতির জন্য, তার দোষ মোচনের জন্য এবং তার এই চরিত্রের প্রতি সত্যকারের দরদের জন্য। বইটায় শেষের কবিতার অনেক ছাপ আছে, কিন্তু তা বুদ্ধদেবেরই লেখা বেশ বোঝা যায়। বুদ্ধদেবের লেখার কোন কোন গুণ এতে বাদ যায়নি, দোষ বাদ গিয়েছে, নতুন গুণ আশ্রয় করেছে। 'মা, ছেলে এই কবিতা' অধ্যায়টি পোড়ো atmosphere চমৎকার ফুটেছে। শ্রীলতার বৌদি একটি snob, বুদ্ধদেব তবু তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেনি। 'মা'টি খুব ভাল আঁকা হয়নি সন্দেহ হয়।

তাছাড়া বইটার কোন খুঁত নেই ? মা ঠিক রক্তমাংসের নয়, তবে ও জগতে মা-এর প্রভাব দেখানই বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল। অমৃত-বাজারের পূজা-সংখ্যায় একটা ইংরাজীতে সমালোচনা দিলাম।

প্রেমেনের উপনায়ন শেষ করলাম। নামটির অর্থ শুনলাম উপনয়নের causative, অর্থাৎ initiation। বুদ্ধদেবের যেদিন ফুট্‌ল কমল ও প্রেমেনের এই বইটার পৃথক সমালোচনা করা উচিত— না করলে তাদের প্রতি অবিচার করা হয়। যে কারণে একত্রে করেছি তা পূর্বেই লিখেছি। প্রেমেনের বইটা পড়ে আমার মনের যে ভাবগুলির উদয় হয়েছে তারই একটা অসংলগ্ন বিবরণ দিচ্ছি। যদি কখনও সুবিধে হয় গুছিয়ে লিখব। বলা বাহুল্য, প্রেমেন intellectual নয়, তার লেখা পড়লে বুদ্ধি চন্‌মন করে ওঠে না, কেবল হৃদয়টা ফুলে ওঠে, চোখের কোনে জল আসে, সমস্ত প্রাণ সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। প্রেমেন দুঃখের দেওয়ালী সাজায় না, সে দুঃখের প্রদীপ জ্বালায়, বাংলা দেশের কুটিরে কুটিরে যে প্রদীপ জ্বলে। তার মূলধন হল হৃদয়, যেমন বুদ্ধদেবের হল বুদ্ধি। অবশ্য ঐ কথা থেকে মনে কোরোনা যে প্রেমেন শুধুই কাঁদছে আর কাঁদাচ্ছে। দুঃখের মধ্যেও সে মাধুর্যের সন্ধান পেয়েছে, কালী, দেবু, দেবুর মা, এমন কি তার মাতাল বাবা, কে নয় ? এমন কি ইন্‌স্‌পেকটার সাহেব, নকুড় দাস তার স্ত্রী, শেষে সন্ন্যাসী পর্যন্ত। এরা প্রত্যেকেই ভাল। বইটার মধ্যে অ-মধুর হল কেবল স্কুলের মাষ্টার, ড্রাইভার ও বাড়িওয়ালা অক্ষয় ? অক্ষয় হয়ত মন্দ লোক ছিল না, ড্রাইভারকে বাদ দেওয়া যায়— বাকি থাকে মাষ্টার। মাষ্টারটি অস্বাভাবিক হয়েছে, প্রেমেন ঐ ধরণের চরিত্র হয়ত দেখেছেন— তাতে আসে যায় না। বুদ্ধদেবও মাষ্টার জাতকে ঘৃণা করে, সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতিকে সে ঘৃণা করে, কিন্তু standardisation ও মূর্খতার জন্য, তাদের অমানুষিকতার জন্য নয়। অ-মানুষিকতা— প্রেমেনের হৃদয় খুব বড় বলেই সে human, বোধ হয় all too human হয়েছে। বিনুর বাবার মাৎলামী, জুয়োখেলা, চুরি করার মধ্যেও তার অনুশোচনা, আশাপ্রবণতা, ভাল হবার ঐকান্তিক ইচ্ছা, স্ফূর্তি ফুটে উঠেছে, সেইজন্য ভদ্রলোকের ওপর রাগ হয় না, সে যে মানুষ সেই কথাই বারবার মনে ওঠে। নকুড় দাস, তার স্ত্রী, প্রত্যেকের বেলাই তাই, কেবল মাষ্টার মশাইদের বেলা তাই নয়। আমি মাষ্টার বলেই আমার খারাপ লেগেছে তা ভেবো না। এ প্রকার নিষ্ঠুরতা প্রেমেনের করুণ সাহানায় বিবাদী সুর। গুরুচণ্ডালী দোষ হয়েছে ; তবু ক্ষমা করা যায়। বুদ্ধদেব লিখলে রাগই করতাম।

আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করবার জিনিষ। দারিদ্র্যের প্রতি বুদ্ধদেব, প্রেমেন ও শৈলজানন্দের মনোভাব ও তার প্রকাশ সমাজতত্ত্বের দিক থেকে ভাববার কথা। পার্থপ্রতিম দারিদ্র্যকে ঘৃণা করে, কারণ দারিদ্র্য সে যা হতে চায় তাই পাওয়ার পথে অন্তরায়। সে চায় কবি হতে, অর্থাৎ অবসর। দারিদ্র্যের মধ্যে অবসর নেই, আছে কাজের ভিড়, সে কাজ আবার অনটনতা দূর করারই জন্ত, মনের মতো কাজ নয়, কবিতা-লেখার জন্ত যে প্রচেষ্টা তা নয়। প্রেমেনের বই-এ বিনুর দারিদ্র্য বিনুকে গরবী কি অভিমানী করছে না, সে দেবুর বাড়ি গিয়েও অস্বস্তি ভোগ করছে না, দেবুর মাকে সে আপন করে নিচ্ছে, কেবল ড্রাইভারের অপমান সহ্য করতে সে নারাজ, সেজন্ত ড্রাইভারকে ছাড়িয়ে দিলেই চলে। বুদ্ধদেবের পার্থপ্রতিম ছেলে বয়স থেকেই অত্যন্ত সচেতন শিশু ছিল শপথ করে বলা চলে। বিনু মোটেই আত্মচেতন নয়, প্রেমেন লিখছে যে বিনু 'অ-স্বাভাবিক' ছিল— সে অ-স্বাভাবিক ছিল না, তার চেতনার ক্ষেত্রটি উর্বর ছিলই না, নচেৎ অত সহজে কালিদের বাড়ি, দেবুদের বাড়ি কিংবা নকুড় দাসের বাড়িতে খাপ খেয়ে যেতে পারে? জোর করে বলতে পারি, বিনুর যে আশ্রমে যাবার আভাস দেওয়া হয়েছে সেখানেও বিনু মিশে যাবে। আত্ম-চেতনা নেই বলে বিনুর চরিত্রে বিরোধ নেই, সেইজন্ত তার জীবন প্রণালী নিজের নয় সন্দেহ হয়। বিনু বাঙ্গালীঘরের লক্ষ্মীছেলে, সাধারণ ও স্বাভাবিক। তার ঐটুকু জীবনের ওপর অত প্রকারের উপর্যুপরি ভীষণ আঘাত এলে কি হয়? সত্য কথা বোধ হয় এই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মানুষের চরিত্র পরিবর্তিত হয় না প্রেমেনের বিশ্বাস, নচেৎ যে বিনু সে বিনুই রইল কেন? শুধু পট পরিবর্তন হল মাত্র। বিনুর চরিত্রে পরিণতি নেই, পরিবর্তন আছে— তার দাম সিনেমার টিকিটের, অবশ্য উচ্চশ্রেণীর,— entertainment tax এর জন্ত আরো কিছু ধরে দেওয়া চলতে পারে। দাঁড়াল এই, humanityকে প্রেমেন এতটাই গ্রহণ করেও স্বীকার করে, যে তার পরে দারিদ্র্যের নিজস্ব স্থান থাকে না। ভাল কথা; কেন থাকা উচিত কি উচিত নয়, এসব মতামত। প্রেমেন বলছেন নেই, মেনে নিলাম এবং মেনে নিয়ে উপভোগ করলাম। তবে সেই সঙ্গে বলব, যে প্রেমে রিয়ালিষ্ট নয় এবং কোন সোশিয়ালিষ্ট পাঠক প্রেমেনের এই মনোভাব গ্রাহ্য করবে না। আমি জানতাম – বুদ্ধদেব প্রেমেন Realist school-এর। তা মোটেই নয়, মোটেই নয়, মোটেই নয়, বুদ্ধদেব হলেন পুরোপুরি individualist। তার রিয়ালিজম্ হল বিষয়ের বিস্তার মাত্র, আর

প্রেমেন হলেন humanist— পুরোপুরি রকমের। তাঁর রিয়ালিজম তাই, অভিজ্ঞতার একটি স্তরমাত্র। সত্যকার realist হবেন কি জান? তার পদ্ধতি হবে বৈজ্ঞানিক ও তাঁর বিষয়ে অটল থাকবে প্রকৃতির ওপর, অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির [...] প্রকৃতিকে একদম বদল করবার ক্ষমতার ওপর। Zola তার বিখ্যাত প্রবন্ধে কেবল fidelity to nature এর ওপরই জোর দিয়েছিলেন, এখন নতুন রিয়ালিজমের [...] মত হবে enviromentalism— যেটি সোশিয়ালিজমের মূলসূত্র। A Realist must needs be a Socialist. পছন্দ না হয় রিয়ালিজমের বই পড়োনা, কিন্তু যা বলার তার মধ্যে ন্যায়ের ফাঁকি পাবে না। ভেবেছিলাম বুঝি Realism এল, ভুল ভেবেছিলাম। এঁরা Sentimental। প্রেমেন এক এক সময় নিজের সত্তা হারায়—১০০ পৃঃ থেকে পড়। এ দৃশ্যটি melodrama। দেবু মারা যাবার খবর শোনার পরই বাবাকে ঘরে নিয়ে গেল। ১০৮-১০৯ এর পাতায় বার পাঁচেক 'লীলা'র কথা আছে ভাল লাগ্‌ল না।

ভাল লাগল ১৩৫ পাতা থেকে। অতিশয় ভাল লাগল, যেদিন বিনু নকুড় দাসের পরিচিত হল সেদিন আমার পক্ষে শুভদিন। প্রেমেন স্থির সন্ধানী হয়েছে, তার লক্ষ্য [অন্য] হয়েছে, কলম তার আর ভাবের বেগে কাঁপছে না। একই বই শেষ হল, last sprint এর মতন। যে ঘোড়া এ রকম ছুটতে পারে last lap-এ, তাকে আমি back করি, এর ওপর heavy bet ধরতে পারি। প্রেমেনের উপনায়ন ভাল বই। প্রেমেন সম্বন্ধে আরো লেখা উচিত, এইটুকু লিখে আমি সন্তুষ্ট হলাম না।

* * *

প্রেমেনের লেখার পর কেদারবাবুর লেখা পড়া রাগমালা শোনার মতন। কেদারবাবুও হৃদয়বান ও humanist। কেদারবাবুর দুঃখের দেওয়ালীর অনেকাংশই আমার পরিচিত। হাসিমুখের চোখে যে অশ্রুকণা ভাসে তাকে মুক্তায় পরিণত করবার যাদুমন্ত্র কেদারবাবু জানেন। কিন্তু কি তুমি জান? স্মিতহাস্য নয়, একেবারে বৈঠকী হাসি, guffaw, মজলিসী হাসি, খাঁটি আড্ডাধারীর মজলিস, তাতে টিটকিরী নেই, চিপটিনী কাটা নেই, আছে toleration which is the consummation of practical wisdom and wide experience, বুঝেছ? তোমার আমার আড্ডায় হয় ঠাট্টা, পরনিন্দা, কিন্তু কেদারবাবুর বইএ যে আড্ডার সন্ধান পাওয়া যায় তাতে ঠেস দিয়ে কথাবার্তা ছিল না। কেদারবাবুর একটা মধুর philosophy of life আছে— তিনি,

সন্ন্যাসী ঠাকুর, দেবতা, পূজা অর্চনা মানেন না, তিনি মানেন গোটাকয়েক human values—এই যেমন স্বার্থত্যাগ, ঔদার্য, মনুষ্যত্ব, বীর্য প্রভৃতি। এরই পটভূমিতে তিনি নানারকমের ছোট ছোট বিশেষত মধ্যবিত্ত সংসারের ঘটনার মৌখিক (লিখিত নয়) বর্ণনা করেন। একধারে ছোট্ট ঘটনা, অন্যধারে তাঁর মতে চিরন্তন human and ethical values— এই foilটি একটু মোটা, সেইজন্য তাঁর রসিকতাও broad হতে বাধ্য। ও ধরণের contrast-এ সূক্ষ্ম intellectual witticisms সম্ভব হয় না। না হোক্ গে, মাঝে মাঝে প্রথম ভাগের উপদেশ স্মরণ করার বড় প্রয়োজন হয়। সেই mood-এ যদি কেদারবাবু কোন লেখা পাই বড় ভাল লাগে। কেদারবাবু সব সহ্য করতে করতে পারেন, শুধু পারেন না cant আর hypocrisy-কে তা বড় বড় নাম নিয়েই তারা আসুক না, ধর্মেরই হোক আর রিসার্চেরই হোক। কেদারবাবুর হৃদয়টা খুবই বড় এবং লোকটি [ভারি] সাঁচ্চা তাঁর লেখা পড়ে তাই মনে হয়। তোমার মুখে শুনেছি, নিজেও দেখেছি তাই। অতএব তাঁর লেখা Sincere হবে না কেন ? তাঁর One drop of tear can wash away all my intellectual opposition। আর একটা জিনিষ, তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় যে লোকটি প্রকৃতই উদাসী। কি করে ঐ রকম নিষ্কাম হওয়া যায় তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানাতে পার ? না, আর লিখব না, চিঠি লম্বা হচ্ছে।

প্রবোধকুমারের মহাপ্রস্থানের পথে সত্যই একটা নতুন ধরণের ভ্রমণ কাহিনী। প্রবোধের উদ্দেশ্য ছিল পুণ্যসঞ্চয় নয়, জীবনের প্রকৃতরূপটি দেখা। সে জন্য সে বেরিয়ে পড়ল ছুটে, মহাপ্রস্থানের পথে, যে পথে সভ্য-মানুষের ভিড় নেই, যে পথ বেয়ে ক্লান্ত মানুষ ছুটেছে শান্তির সন্ধানে। কিন্তু প্রবোধকুমার সে দলের একজন হয়েও তার বৈশিষ্ট্য হারাল না। তার সংস্কার-মুক্ত মন এই ধূলিবিবর্জিত পাহাড়ী হাওয়া বল-সঞ্চয় করলে। দলের লোকে কেউ তাকে বললে নাস্তিক, কেউ বা সন্দেহ করলে, যাত্রীদের অভ্যাসই তাই, কারণ তীর্থপর্যটনের পূর্বে তাদের সংস্কারকে তারা চাবিবন্ধ করে আসে না ঠাকুর ঘরে। প্রবোধ কিন্তু সত্যের সন্ধানে ছুটেছে, তার আত্মার শুভ্রতা তাই তার সকল কষ্ট সার্থক করে দিলে। এই বইখানির মধ্যে এমন একটি সুনির্মলতা ও সততা আছে যার স্পর্শে আমাদের হৃদয় পবিত্র হয়। আমি ইতিপূর্বে একটা ইংরেজী সমালোচনা প্রকাশ করেছি, পড়ে দেখতে পার। সেইজন্য বেশী কিছু লিখলাম না। খবরের কাগজে যা সুখ্যাতি দেখছ তার একবর্ণও মিথ্যা নয়।

অবনী রায়ের অনুচ্চারিত ছোট গল্পের বই— সাদাসিদে, কোন ঘোর প্যাঁচ নেই ভাষার কিংবা গল্পাংশের, সুখপাঠ্য। একটা ভদ্রতা ও ভব্যতার ছাপ রয়েছে সর্বত্র। কিন্তু মনকে আঘাত দিল না, অবনীবাবুর উদ্দেশ্যও ছিল না বোধ হয়। বইটা কি ধরণের জান ? পুরাতন বন্ধুর মতন, এলে দাঁড়িয়ে উঠতে হয় না, বেহারা খবর দিলে যার আগমনে তাড়াতাড়ি জামা পরতে হয় না, কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়েই যাকে অভ্যর্থনা করা যায়। ভালই লাগে তাকে, অথচ 'তুই' বলতে সঙ্কোচ হয়, তার সঙ্গে তর্ক তুলে সরগরম করতে অনিচ্ছা হয়। কোথায় বিষ্ণু দে, আর কোথায় অবনী রায়! বিষ্ণুর কবিতা সোফায় শুয়ে পড়া যায় না, অবনীর লেখা সোফায় শুয়েই পড়তে হয়। সেই জন্যই ত' লিখেছি গোড়াতে, আনন্দ নানা রকমের, কেন না মানুষ ভারী খামখেয়ালী, বিশেষতঃ

তোমার অত্যাচারে জর্জরিত
ধূর্জটি দা

উত্তরা, আশ্বিন, ১৩৪০

পুঃ— মহেন্দ্রবাবুর কিশলয় বইটার ভাল সমালোচনা উত্তরাতেই ছাপালে আমি সত্যই আনন্দিত হব। হয়ত আমি ভুল বুঝেছি তাঁকে— ঠিক জানি না, এই আমার মনের কথা। স্তুতিনী বইটা মাত্র অর্দ্ধেকটা পড়েছি, এখন পাচ্ছি না উদ্ধার ক'র পড়ব তারপর জানাব। পরে তোমাকে আরো ২।৪ খানি বইএর খবর দেবো বিশেষ করে অচিন্ত্যর নতুন বইগুলির। ধূঃ

"সাধারণত হিন্দুস্থানী গায়কে যে-সব স্বরবর্ণকে আশ্রয় ক'রে, কিংবা যে-সব স্বরবর্ণের অবসর বুঝে তান ছাড়েন তাদের মধ্যে আ ও ঈ প্রধান। এ এবং উ-র ওপরও তান শুনেছি— কিন্তু, ঐ, ও, ঔ-এর ওপরও তান শুনেছি মনে পড়ে না। অ-এর ওপর তান অপ্রচলিত।

গোটাকয়েক কথা এখানে মনে রাখতে হবে। গানের স্বরবর্ণ ভাষা ও সাহিত্যের স্বরবর্ণ নয়। যখন 'খল' কথাটি ভাষায় উচ্চারণ করি তখন মধ্যের ও অন্তের স্বর— অ-কার— অ-কারই থাকে; কিন্তু গানের অ-কারে গলা স্থায়ী রাখা চলে না, অর্থাৎ রাখলে শ্রুতিকটু হয়, অতএব ওস্তাদবৃন্দ খ— অ— ও-ল উচ্চারণ করেন। এই সব ক্ষেত্রে অ-কার, উ কিংবা ও-র দিকে ঝুকে পড়ে— তাতে গমক ও মীড়, আশ ও ছোট তান প্রয়োগের সুবিধা হয়— অলঙ্কারের সাহায্যে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। সুরেনবাবু গলায় বীণের কাজ দেখাতেন— সেইজন্য তাঁর অ-তান, ও কি উ-র মধ্য দিয়ে ম-এ গিয়ে স্থিত হ'ত। তা ছাড়া গানের আ-কারও ভাষার আ-কার নয়। ভাষাতে ওজন ও অর্থের তারতম্যে আকার হ্রস্বদীর্ঘ হয় সকলেই জানি। গান আরো কিছু নতুন হয়। গানের আকার ঠিক আ— নয়, অ ও আ-র মধ্যের স্বর— একটু অ-ঘেঁষা এই মাত্র। হিন্দুস্থানী গায়ক আ-র দিকে বেশী ঝোঁক দেন মাত্র। হিন্দুস্থানী ওস্তাদ সরস্বতী কথাটি গাইবার সময় সা, রা সো আ তী উচ্চারণ করেন শুনেছি। বিনোদিনীর রেকর্ড আমার কাছে নেই। তবে অনেকবার শুনেছি, সেইজন্য বোধহয় মনে আছে। ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। তিনি ধীরে কর— কথা ব্যবহার করবার সময় ক এবং র-এর মাঝে তান দিতেন। সে তান নিতান্ত ছোট— জোর তিনবার গিটকারী— তার বেশী নয়। সে গিটকিরীর মধ্যে মীড়ের মাধুর্যও মিশ্রিত ছিল মনে পড়ছে।

এখন ক ও র-এর মধ্যকার স্বল্প অবসরকে ভরিয়ে দেওয়াকে তান অবশ্য বলা যায়। গিরিজাপতি যখন আমাকে প্রশ্ন করেন 'অ-এর ওপর তান বিনোদিনী দিয়েছিলেন কি না' তখন আমি বলেছিলাম— 'সে তান নিতান্ত ছোট; এবং মীড়-মিশ্রিত, তাকে আশ বলাও চলে।' আশ বলতে কম্পিত ছোট মীড়ই বুঝি।

কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে বিনোদিনী বাংলা গান হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে গাইছিলেন— এবং সে গান উৎকৃষ্টই হয়েছিল। অমন ভাল রেকর্ড বাংলা ভাষায় দুর্লভ— প্রমাণ— His Master's Voice আর চাহিদা নাই ব'লে ছাপেন না। বাংলার উচ্চারণ পদ্ধতি বজায় রেখে হিন্দুস্থানী ঢংএ পিলু বারোয়া গাওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য সফল করতে গেলে অ, ঐ-কার সম্বলিত বাংলা কথাকে পরিত্যাগ করা চলত না, এবং আ ও ঈ-র ওপর তান তাঁকে দিতেই হ'ত। এবং তাই তিনি করেছেন। তবে দুই-প্রকার তান—অবসর ভর্তি করবার জন্য ছোট তান ও আশের সাহায্যে — এবং যেখানে গলার কেরামতি ও স্বরের স্বাধীনতা দেখাবার স্থবিধা ও ফূর্তি পেয়েছে সেখানে বড তানের সাহায্যে। শেষোক্ত তানকেই সাধারণতঃ লোকে তান বলে— কারণ এইখানেই গলার আপেক্ষিক বেশি স্বাধীনতা। প্রমাণ বিনোদিনী সাঁতার কথাটির দীর্ঘ আকারের ওপরই 'কর' কথার অ-কারের ওপর তানের কিংবা মিড়-সম্বলিত আশের চেয়ে দীর্ঘতর তান দিয়েছেন। তা ছাড়া— কর কথাটিতে দীর্ঘ তানের প্রয়োজন ছিল কম— তার পূর্বে তরী এবং ধীরে কথা দুটিতে দীর্ঘ ঈ-কার ছিল, যদি মন, বন থাকত তাহলে অ-কারের বেড়ী ভাঙবার জন্য তানে এ-কিংবা ই-কারের সাহায্য তাঁকে নিতেই হ'ত। একটা কথা মানতেই হবে— তানের প্রয়োজনে গলার স্বর স্বভাবতই দীর্ঘ হয়েই যায়। কিন্তু স্বভাবকে পরিবর্তন নিশ্চয়ই করা চলে। আর্টিষ্টের খেয়ালে অ-স্বাভাবিকও শ্রুতিমধুর হতে পারে— সেজন্য অবশ্য পূর্ব হতেই আর্টিষ্টের ওপর শ্রদ্ধা থাকা চাই। ইংরেজীতে একটা রসিকতা আছে— It requires two to make one great— one, the great man himself and the other to publish his greatness, রসিকতার মধ্যে যে সত্যটুকু নিহিত আছে তার সমর্থন বিজ্ঞানে পাই। Experimental Psychology-তে প্রমাণিত হয়েছে যে, শ্রুতিকটু অ-সম তালের বিভাগ পুনরুক্তি ও অভ্যাসের দ্বারা শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। আজ যদি দিলীপকুমার প্রমাণ করেন যে অ-কারের ওপর তান খুবই চলে তা হলেই গিরিজাপতির প্রভুসম্মত বাণীর যথার্থ উত্তর হয়। গিরিজাপতি হয়ত কোন natural law of rythm মানেন যার নড়চড় নেই। আমি তা মোটেই মানি না। গলার দেহগত আইনকানুন আছে— তবে মানুষে তাকে ভেঙেই আসছে— যাঁরাই ভেঙে নতুন নিয়ম করছেন তাঁরাই আমাদের মধ্যে বড়।

আমি এই তর্কের মধ্যে কি করে এলাম নিজেই বুঝতে পারছি না। ছন্দ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। গানের তর্ক গিরিজাপতি ও দিলীপকুমারের প্রবন্ধে কেবল দৃষ্টান্ত থেকেই উঠেছে। ছন্দ সম্বন্ধে যে তর্ক চলছে তাই চলুক। উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে যতটুকু সংযম থাকা প্রত্যাশা করি ততটা পেলেই হ'ল।

উত্তরা, পৌষ, ১৩৪১

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

একখানি পত্র

(শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে)

আমার শিক্ষা-দীক্ষা ভাব-প্রবণতার প্রতিকূল। ভাব অর্থে ভাবাই বুঝেছি। আমার কাছে চিন্তার মানে বিশ্লেষণ ও সম্বন্ধ স্থাপন। ইংরেজীতে যাকে emotion বলে, তার প্রয়োজন এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করিনি— জীবনে নয় হয়ত, বিচারের ক্ষেত্রে। ভাব-প্রবণতা বর্জন করাই শ্রেয়, তার প্রভাবে বুদ্ধি মলিন হয়, সৃষ্টি-শক্তি পঙ্গু হয়, চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পুরুষত্ব যায় খর্ব হয়ে— এই ছিল আমার বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস বল্লেও তাকে চলে। বর্জন করার মধ্যে যে সংযমটুকু থাকে, তাকেই ভেবে এসেছি আত্ম-জ্ঞানের একমাত্র সাধন-পদ্ধতি।

আজ চার-অধ্যায় এবং বিশেষতঃ তার দু' একটি সমালোচনা পড়ে আমার বিশ্বাসের মূলে টান ধরেছে। আজ প্রশ্ন উঠ্‌ছে মনে— ভাব-প্রবণতাকে অত ভয় কিসের ? আজ আফ্‌শোষ হচ্ছে— কেন এতদিন নিজেকে বঞ্চিত করে এসেছি ? আজ সন্দেহ হচ্ছে জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়ায়, বিশ্লেষণের অতিরিক্ত দাবীতে, বৈরাগ্য-সাধনের ঐকান্তিক পদ্ধতিতে। বুদ্ধিবাদের স্বাভাবিক পরিণতি কি এই ? অন্ততঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই এই অবস্থায় পরিশিষ্ট হন। জীবনের কোন পরিশেষ আছে যদি মানতাম, বুদ্ধিবাদ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবস্থা যদি একই অবস্থা মনে করতাম, তা হলে নিজের মানসিক পরিবর্তনকে আত্মজ্ঞান ভেবে প্রসন্ন হওয়া যেত।

অবশ্য বিশ্বের সমগ্র রসবস্তুকে উপভোগ করা যায় না— সর্বতোমুখী রুচির অর্থ নেই— বিশেষ জ্ঞানের মূল্য আছে, নির্বাচন করতেই হয়। তবু, তবু মনে হয় অনেক ক্ষতি হয়েছে। যে আনন্দ অতি সহজেই আমার প্রাপ্য ছিল, তাকে সহজ প্রাপ্য বলে ঘৃণা করা আমার উচিত হয়নি। কীর্তনে ভাবের মাতামাতি আছে, শুনলেই চোখে জল আসত, তাই খোলের আওয়াজ ও বৈষ্ণব পদাবলীতে অবহেলা করেছি। কবিতায় প্রেম থাকেই থাকে—তা প্রত্যেক কবিতাই আমার কাছে সন্দেহজনক। কথা সাহিত্যে প্রকৃতির স্কন্ধে ভাবের বোঝা চাপিয়ে লেখক নিজের ভার লঘু করেন—তাই প্রবন্ধ, ইতিহাস,

সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানদর্শন পড়তে ভাল লাগে। সংখ্যাতত্ত্ব আমার কাছে এই প্রকার সাহিত্যের চেয়ে বেশী মনোজ্ঞ ফলে অনেক ভাল নভেল, কবিতা, গল্প পড়া হয়নি। যেখানে প্রেম ও প্রকৃতি সেখান থেকেই পলায়ন— এই প্রতিক্রিয়া বশে পায়ের মাংসপেশী দৃঢ় হয়েছে। ভাবের সূক্ষ্মত নির্দেশ বুঝতে মন সক্রিয় হয়েছে— কিন্তু তাইতেই আমার শক্তি নিঃশেষিত হল, আজ বুঝেছি। প্রভাতবাবুর গল্পের ডিটেক্‌টিভের মতনই আমার অবস্থা। নদী, জ্যোৎস্না ফুলন্ত গাছ দেখলে, কোকিলের ডাক, আজকালকার গান ও টকি এবং নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শুন্‌লে প্রাণ শিউরে ওঠে। সত্য কথা বলতে কি— এক দুর্বোধ্য কবিতা ছাড়া অন্য কবিতা পড়ি না, যদিও সেটা বুঝি, তাও বলতে পারি না কবিতার ছাঁদে লেখার মধ্যে একমাত্র সুধীন দত্তের লেখাই আমার পড়তে ভাল লাগে, 'পুনশ্চ' ও 'শেষ সপ্তক' কবির ইদানীংকার শ্রেষ্ঠ কীর্তি, এই বিশ্বাস নিশ্চয়ই কোন সুস্থ মনের চিহ্ন নয়। অধিক আর কি লিখব!

ব্যাপারটা হল এই: বর্জনেরও একটা বিলাস আছে। আমি একটি সর্বহারা সর্বত্যাগী মহিলা দেখেছি। যুক্তির দিক থেকে গলদ এই: অন্ধ বিশ্বাসের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায়— বুদ্ধি কিন্তু বুদ্ধিতে বিশ্বাসও বিশ্বাস, কারণ ভাসমান অবস্থায় থাকা যায় না। যুক্তির সেরা যুক্তি অভিজ্ঞতার, ইতিহাসের। যে যাই বলুন না কেন, কর্মবিহীনতা কল্পনা করা অসম্ভব। পাশ্চাত্য-দর্শনের কর্মবাদ না হয় ছেড়ে দিলাম— কিন্তু চিন্তাও একপ্রকার কর্ম— এবং সমগ্র মানুষই কর্ম করে। বুদ্ধি না হয় পথ দেখাল, কিন্তু পথ চলে মানুষে, গোটা মানুষে। ভাবের তাড়নায় মানুষ হাঁটে তা বলছি না, মানুষই হাঁটে তাই বলছি। এখন কোন্‌টা প্রাথমিক? পাকা রাস্তাটা, না হাঁটাটা? যে একেবারে পঙ্গু তার পক্ষে পাকা রাস্তা কাঁচা রাস্তার অর্থ নেই— যে হাঁটতে পারে তার পক্ষে কাঁচা রাস্তা বাধা-লঙ্ঘন করা কষ্টকর হলেও অসম্ভব নয়। পূর্বে রাস্তাই বেছেছি— এখন পৌঁছবার ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে যদি পঙ্গুত্ব ঘোচে, তা হলে লাভ বই ক্ষতি কোথায়, বল? জড় ভরতের অবস্থা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির আদর্শ হতে পারে না।

ঠিক আজকার মনোভাব নিযে যদি চার অধ্যায় পড় তবে রস পাবে— সেই সঙ্গে বইটা সম্বন্ধে অন্তত: একটি মন্তব্যের অসারতা ধরে ফেলবে। কেউ কেউ বলেছেন— বইটা নিতান্তই মেলো-ড্রামাটিক, আমি যখন অন্য মেজাজে ছিলাম, তখন আমারও অনেকটা তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু ভেবে দেখলাম — সেটা প্রকৃত বিচার নয়, সেটা মননই নয়, ভাব-প্রবণতা সম্বন্ধে আমার

ভয়েরই নিদর্শন। ভয় কাটবার পর বুঝলাম। সমগ্র বইটার আব্‌হাওয়া হল অস্বাভাবিক— এলার চরিত্রও সহজ-স্ফূর্ত নয়, গাঁটে ভর্তি— তোমাদের ভাষায় repressed and full of complexes. গুপ্ত অভিসন্ধিতে কখনও অভিলাষ মুক্ত হয়? ইন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক সৃজনী-শক্তি কি রকমভাবে অবদমিত হল, বল দেখি? হল বলেই ত' সে-শক্তি মাটির তলায় চলে গেল! নচেৎ লোকটা নোবেল প্রাইজ পেত নিশ্চয়। তারপর এলা— সে স্ত্রীলোক— সত্যকারের স্ত্রীলোক পৃথিবীতে আছে কি না জানি না— এ যুগের মেয়ে সে— অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কল্পিত। রবীন্দ্রনাথের নায়িকার কাজ পুরুষকে ভালবেসে বড় করা— তাই এলির চাই অতীনকে, অতীনের জন্যই— অতীনেরও চাই এলিকে, তার সম্পূর্ণতার জন্য— অথচ যে আদর্শ উভয়ে বরণ করেছে, সেই আদর্শের চাপে, তার নির্মম আজ্ঞায় এলা প্রকৃতিচ্যুতা, অন্তু স্বধর্মভ্রষ্ট। পরস্পরের এই elective affinity-র মধ্যে বাঁধা দিচ্ছে আদর্শ— ধর সেটা বড়ই— তবু আদর্শের অত্যাচার কমছে না। পরের ভয়াবহ ধর্মে তারা কক্ষচ্যুত— তাই তাদের মিলন ও সংঘর্ষণ অমন অমানুষিক। সমাজশক্তির দুর্নিবারতার কাছে তারা যেন পুতুল।

কিন্তু মানুষ marionette নয়। এলি-অন্তু উভয়ে বল্লে, 'মানুষ হই, এস।' অমন ধরণের শক্তির বিপক্ষে যখন লড়াই করে মানুষে, তখন মানুষকে একটু melodramatic দেখাবেই ত!

বইটিতে ইন্দ্রনাথই একমাত্র সংহত পুরুষ। সে-ই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পূর্বেই সংহত হয়েছে— সে-ই কথা কইবার আগে চিন্তা করেছে— এলি ও অন্তুর মতন কথা কইতে কইতে ভাবছে না, ভাবতে ভাবতে পূর্ণতা অর্জন করছে না। অতএব ইন্দ্রনাথের কোন ব্যবহারে নাটুকে ভাব নেই— তার চরিত্র গঠিত বলে ঘাত-প্রতিঘাতের সাহায্যে তার পরিণতির প্রয়োজন নেই। তবে পরিণত মানে অক্ষত নয়। ইন্দ্রনাথের চরিত্রে ক্ষত কোথায় জান? ক্ষতটা বর্জনে। ইন্দ্রনাথ নির্মমভাবে সে যাকে অপ্রয়োজনীয় ভাবে তাকে ছেঁটে ফেলতে পারে— তার সঙ্কল্প প্রধানতঃ ত্যাগের— তার কাঠিন্য বর্জন-রীতির। এইটাই হল তার চরিত্রের ট্র্যাজেডী। সে সুরু করেছিল, সৃষ্টির সঙ্কল্প নিয়ে — তার শেষ হল অস্ত্রোপচারে। এই নীতি-রীতির অবলম্বনই হল তার চরম অবনতি। অনেকে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নামোল্লেখের সার্থকতা খুঁজে পান নি। আমার মতে পূর্বাধ্যায়টাই চার-অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ সমালোচনার— অন্ততঃ সমালোচনার স্পষ্টতম ইঙ্গিত। সে যাই হোক— রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথের চরিত্র-

অঙ্কনে নিজের একটি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছেন। শুষ্ক বৈরাগ্যের অপূর্ণতা সম্বন্ধে যে ব্যক্তি আমাদের সতর্ক করে দেশের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে ইন্দ্রনাথের কল্পনা নিতান্ত স্বাভাবিক। দুঃখ এই: ইন্দ্রনাথের অবনতি কোথায় ও কি প্রকারে হল সাহিত্যের অধ্যাপকও বুঝলেন না। হয়ত ইহাই নিয়ম!

সে যাই হোক— এই প্রকার অস্বাভাবিক প্রতিবেশের সম্পর্কে দেবতারা কি করেন জানি না, তবে মানুষে একটু বদলে যায় নিশ্চয়। যেমন বুদ্ধি খোলে topic-এর চারধারে তেমনি emotion তৈরী হয় predicament-এর চারপাশে। এমন অবস্থায পড়লে সবারই মত কেন মতিগতিও বদলায়। তাই চার-অধ্যায়ের মতি সব ট্যাড়া, গতি সব বাঁকা। কেবল ট্যাড়া নয়, আড়িতে, তাই মাত্রাছাড়া মনে হয়; কেবল বাঁকা নয়, দ্রুত, হাঁফাচ্ছে যেন একদম hectic। ইন্দ্রনাথ ও কানাই ছাড়া আর সকলের মুখে বিকারের ঘোর। তাই অন্তর সেই বিখ্যাত বক্তৃতা 'এলি, আজ আমাকে কথায় পেয়েছে...' প্যারাগ্রাফটি যেন চৌদূনে চলছে— ধামারের অ-সম মাত্রা বিভাগে। কিন্তু ধামার কার্ফা নয়, কাশ্মিরী খেমটা নয়। তার গতি সাপের মতন, ভাষাও এঁকে-বেঁকে চলছে না? ঐ অধ্যায়টি পড়ে মনে হয় যে অন্ত-এলির গায়ের উত্তাপ একশ' পাঁচ ডিগ্রীর। কিন্তু উত্তাপটা রোগ নয়— রোগের চিহ্ন। রোগ হল— চরিত্রের বিকার— দুজনে মিলে পূর্ণ হতে চাইছে, পারছে না, ভুল পথের জন্য— আদর্শের চাপে।

এই হল ঘটনা-সংস্থান— এই সংস্থানই এক প্রকার বিকৃত মনোভাব তৈরী করছে। তার বাইরে 'এলি-অন্ত'র পরস্পর ভাবটি সাধারণ ও স্বাভাবিক হতে পারত— একা কারুর হত না; এলির শৈশবে স্ফূর্তি ছিল না, তাই তার স্বভাবটাই বিদ্রোহী— অন্তর শৈশব কি জানি না, তবে সে যে আজকালকার নবীনা মা,— এরা যা চান— অর্থাৎ মেয়ে-খোকা, অর্থাৎ নিতান্ত ভদ্র ও সুশীল ছিল, শপথ করে বলতে পারি। সন্দেহ হয়, সে লুকিয়ে লুকিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিটা পড়ে মুখস্থই করে ফেলেছিল। এই ছেলেটি আদর্শে পড়ল— ওটা প্রেমে পড়ারই মতন— তাই 'পড়ল' লিখলাম। যার পড়াই স্বভাব, সে কি হাড়-মুড় গুঁজে পড়বার সুযোগ ত্যাগ করতে পারে! কিন্তু এই ভদ্র ছেলেটির মা ছিলেন আধুনিকা বোধহয়— এলির মা'র মতন প্রবীণা নন্, তাই অন্তর সাহস হল না, এলিকে নিয়ে চলে যাবার। সে দু'ধার থেকে মার খেতে লাগল। প্রেম ও আদর্শের মার একটু নিষ্ঠুর গোছের। তাই অন্ত অত ভাব-প্রবণ। অতএব, ঐ প্রকার অদ্ভুত রকমের অবস্থার উপযোগী ভাবাভিশয্য

বর্ণনা করতে প্রত্যেক আর্টিষ্ট্‌ই বাধ্য।

আমি তাকেই melodramatic বলি যেটার মধ্যে ঘটনার অনুপযুক্ত ও অতিরিক্ত ভাবের সমাবেশ আছে। আসল কথা এই বোধ হয়— যেমন এলিয়ট বলেছেন, ঘটনাসংস্থান ভাবকে যথাযথভাবে ধারণ কোরছে কি না। যদি ভাব উপ্‌চে পড়ে— এলিয়টের মতে যেমন হ্যামলেটে হয়েছে— তা হলে নাটক হবে নাটুকে-পনা !

হয়ত তর্ক উঠবে 'যথাযথ' কথাটির অর্থ নিয়ে। এটা প্রশ্ন ভিক্ষা নয়। অবশ্য এলিয়টের সমালোচনায় তর্ক চলে— তিনি corelate কথা ব্যবহার ক'রে যতই পাশ কাটাতে চেষ্টা করুন না কেন। আমি একটু অন্য কথা বলছি। আমি ঘটনাকে objective আর ভাবকে sbjective— এই ধরণের কোন কৃত্রিম ভাগ করছি না। আমি emotion-এর **মৌলিক** অস্তিত্ব মানি না— আমার মত বিজ্ঞান-সম্মত— অর্থাৎ আমি ভাবকে ঘটনারই সৃষ্টি বলছি। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে— ঘটনা ও ভাবের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ যখন রয়েছে, তখন উপযোগিতা-অনুপযোগিতার সম্বন্ধ আমি উঠিয়ে দিচ্ছি না। কার্যটি নিতান্তই সামান্য হতে পারে— ফল কিন্তু অ-সামান্য। এইখানেই অতিরিক্ততা ও অ-সঙ্গতি।

ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে বলি। ঘটনা-সমাবেশই যখন ভাব-সমাবেশ সৃষ্টি করছে, তখন তোমার মনে হতে পারে যে, আমি সাহিত্য-বিচার অনাবশ্যক বিবেচনা করি। কারণ বাইরে থেকে দেখতে গেলে বলা চলে যেকালে ঐ দুটি সমাবেশের সম্বন্ধ কার্যকারণের, তখন উপযোগিতার কথাই উঠছে না, প্রত্যেক কার্যই ত' কারণের বশে ঘটছে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে তা মনে হবে না। ধর, গ্রামোফনের রেকর্ডে স্‌ঁচ বসলে— স্‌ঁচ বসানটাকে কারণ এবং সঙ্গীতকে কার্য বলতে পার নিশ্চয়। বাহ্যতঃ মনে হয়, (যেমন অসভ্য ও শিশুর মনে হয়, যে জন্য তারা কলের গান শুনলে আশ্চর্য হয়ে যায়) সঙ্গীত স্‌ঁচ-বসান ক্রিয়াটির অতিরিক্ত, (এলিয়টের excess) অর্থাৎ অনুপযোগী। কিন্তু স্‌ঁচ-বসানর পূর্বে রেকর্ড তৈরী হয়েছে, অর্থাৎ গায়ক মাইক্রফোনের সামনে গান গেয়েছেন। পূর্বে গান, পরেও গান, মধ্যে শোনবার পূর্বেকার সমগ্র ইতিহাসটাই হল সঙ্গীতকার্যের কারণ। কিন্তু শ্রোতা পুরাতন ইতিহাস জানছেন না, তিনি সমগ্র series-এর শেষ প্রক্রিয়াটুকু বেছে নিয়ে তাকেই কার্য বলছেন এবং সেই কার্যের সম্পর্কে সঙ্গীতকে কার্যের অতিরিক্ত ভাবছেন। মোদ্দা কথা এই : কারণ ও কার্যের কাল-পরিব্যাপ্তির হিসাব

চাই, তবেই উপযোগিতার বিচার হবে। তাই চার-অধ্যায়ের মানসিক প্রতিবেশ ও ইতিহাস বুঝতে হবে— বুঝলে ভাবাতিশয্যের জন্য বইটাকে খারাপ লাগবে না। এলি-অন্তুর প্রেম রেকর্ডে স্ুঁচ-বসানর মতন। তাদের কথোপকথনকে সাধারণ দুটি ব্যক্তির প্রেম-নিবেদন হিসেবে ধরো না। তাদের প্রত্যেকের ইতিহাস দেখ, তাদের অস্বভাবিক প্রতিবেশ বুঝো, তাদের আদর্শ-বাদকে সহানুভূতির চোখে দেখেও সেই আদর্শের দৌরাত্ম্য কি ভাবে তাদের চরিত্রকে বিকৃত, তাদের প্রগতিকে কক্ষচ্যুতি করেছে, চিন্তা কোরো, ভাবের মৌলিক অস্তিত্ব না মেনেও তার প্রভাবকে স্বীকার করো— স্বীকার করতে ভয় পেয়ো না, তবে চার-অধ্যায়ের সমালোচনা সুরু হবে। বিস্‌মিল্লায় নোক্তার গল্প জান ত? আমি কেবল কোথায় নোক্তা পড়েছে দেখালাম।

অল্প কথায় চার-অধ্যায় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হল এই: ঘটনা-সংস্থান অস্বাভাবিক, ভাব-সমাবেশও অস্বাভাবিক, দুটোই অ-সামান্য দুটোই এক শ্রেণীর— যদিও একটি স্রষ্টা, অন্যটি সৃষ্টি। অতএব স্রষ্টা তার উপযুক্ত কাজই করেছে। ঘটনাবলীর লজ্জিত হবার কিছু নেই— ভাব-প্রবণতার আত্মগোপনের কোন খাস্‌ তাগিদ্‌ নেই। অতএব melodramatic নয় বইটা।

আর যদি হয়ই বা তবে সঙ্কোচ কিসের? কোন্‌টা মেলো-ড্রামাটিক? Situation— না, বর্ণনা? যদি বল situation— তা হলে প্রেম-করার মতন silly ব্যাপার আর নেই— যদি থাকে, তবে সেটি গোপনে জনকয়েকে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য ভাঙ্গতে পারায় বিশ্বাস। আর যদি বর্ণনাকে বল, তা হলে শেষের কবিতাকে অনুগ্রহ করে তার একটি প্রধান কীর্তি বলো না। আর যদি form-এর কথা তোলো, তা হলে বলব, form is the gift of the second party— the hearer, the listener, the spectator.

উত্তরা, আষাঢ়, ১৩৪২

অর্থশাস্ত্রের দুর্গতি

অর্থশাস্ত্রের যে সংকটময় অবস্থা উপস্থিত হয়েছে এ কথা বলাই বাহুল্য। পূর্বে ধারণা ছিল অর্থশাস্ত্রের সাহায্যে অর্থ সমাগম হবে, তাই অর্থকামীদের মধ্যে ধন-উৎপাদন ও বণ্টনের রীতি সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ হয়। ফলে জন্মায় অর্থনীতি। অধ্যাপকবৃন্দ শিশুবিজ্ঞানটির পোষণের ভার নিলেন। মা-মরা ছেলে বুদ্ধিমান বাপের পাল্লায় পড়লে যা হয় এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র গেল ছিঁড়ে, অর্থনীতি হয়ে উঠল পুরোপুরি বিজ্ঞান। তারপর অঙ্কশাস্ত্র, সংখ্যাতত্ত্ব, নব্য-ন্যায়— সব সাঙ্গপাঙ্গ যথা নিয়মে এসে জুটল। অর্থের সঙ্গে অর্থনীতির সম্বন্ধ রইল না। থাকতে পারে না, যেমন ব্যবহারিক জীবনের নিয়মের সঙ্গে নীতির কোনো আত্মীয়তা কল্পনারও অতিরিক্ত। বিজ্ঞানের সাধনা জীবনকে এইভাবে দূরে রেখেই সম্ভব। অনেকটা ধর্ম-সাধনারই মতন মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাই আজ পৃথিবীর দুর্দিনে অর্থনীতিবিদের কাছে সমস্যাপূরণের দাবি জানালে উত্তর পাওয়া যায়— 'ও কাজ আমাদের নয়, শেঠীদের কাছে যাও।' লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবিন্স তাই আজ শোনালেন— অর্থনীতি হলো গোটাকতক বিষয়ে চিন্তা করবার পদ্ধতি মাত্র। জনসাধারণ ন্যায় পড়ে না, নচেৎ উত্তর হতো, ন্যায় তাহলে আজ কি করবে ? সে-জ্ঞান কি অঙ্কশাস্ত্রবিদের পিছনে লাগবে ?

জগৎজুড়ে আজ অর্থশাস্ত্রবিদের প্রতি অবজ্ঞা। তার নিদর্শন হলো দুটি— তাঁদের মোটা তলব এবং তাদের ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরও সংখ্যাধিক্য। তাঁদের বই বিক্রির মাত্রা যৌনতত্ত্ব এবং সোজা ভাষায় লেখা নব্য বিজ্ঞানতন্ত্রের বই বিক্রির মাত্রা অপেক্ষা কম বলে তৃতীয় নিদর্শন সম্বন্ধে নীরব রইলাম। পুরাতন সমাজে কী ছিল জানি না, কিন্তু আজকালকার সমাজে কাউকে সভ্যভাবে অশ্রদ্ধা দেখাবার একমাত্র উপায় হলো তাকে বেশি মাইনে দিয়ে ওপরতলায় পাঠিয়ে দেওয়া। স্ত্রী বড়ই বিরক্ত করছেন— তাই আদর করে তাঁকে হ্যামিলটনের দোকানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে এইটুকু বললেই চলবে যে, সে বেচারিরা যখন কলেজে ঢোকে, তখন হয় তারা অভিভাবকের পরওয়ানা নিয়ে আসে অর্থনীতি পড়বার জন্য, না হয় খবরে কাগজে আমেরিকার ঐশ্বর্যের গুজব শুনে। অভিভাবকেরা সেই যুগের

লোক যখন অর্থনীতিকে অর্থ উপার্জনের তুক্‌তাক্ কিংবা তাবিজ মনে করা হতো। তাঁদের মধ্যে আবার অনেকেরই বিশ্বাস যে, অর্থনীতির দৌলতে বাঘা বাঘা পরীক্ষায় অনেক নম্বর পাওয়া যায় এবং যে কালে তাঁদের 'অভিভূতে'রা (ward) সকলেই প্রতিভাশালী, তখন ইত্যাদি। ছাত্রীরা আসেন ফ্যাশানের জন্য। দুষ্টলোক বলে, ভিড়ের জন্যই। আমি বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা তাঁরা আসেন domestic economy ও public finance-এর মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা সম্বন্ধ আছে এই সন্দেহের বশে। কিন্তু অর্থবিজ্ঞান যে ইতিপূর্বে সূক্ষ্ম ধারাল অস্ত্র দিয়ে সে ফুল কেটে দিয়েছে তাঁরা বুঝবেন কি করে? ছেলেমানুষ বেচারিরা! যে কারণেই হোক তাঁরা আসছেন এই যথেষ্ট, অর্থাৎ যথেষ্ট প্রমাণ যে অর্থনীতি আজ শাস্ত্রের কোঠায় উঠেছে। শাস্ত্র না হলে কি আমাদের মতো ধর্মপ্রাণ যুবক-যুবতী আকৃষ্ট হতেন? আজ যদি Law of diminishing utility, Law of equimarginal returns, Law of diminishing returns প্রভৃতি শাস্ত্র-জ্ঞান না থাকত তা হলে নোট দেওয়া চলত না; ব্যাখ্যা চলত না; সে কিছুই হতো না। লাভের মধ্যে এ-যুগের জীবনযাত্রার মতো অনিয়ন্ত্রিত ব্যাপারের সংস্পর্শে এসে ছেলেমেয়েদের মাথা যেত গুলিয়ে, ভক্তির উৎস যেত শুকিয়ে, যা হচ্ছে তাই ভাল—এ বিশ্বাস আর থাকত না, ফলে বিপ্লব, বিদ্রোহ এবং বিনয়ের অভাব দেখা যেত। শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে সুন্দর-বনের চেয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানা ভালো, আবার তার চেয়ে ভালো চৌরঙ্গীর জাদুঘর। মড়া না হলে কাকে চেরা-ফোঁড়া যায় বলুন? সব বিশ্ব-বিদ্যালয়েই ইতিহাসের শ্রেণীতে ছেলে কম—বেঞ্চি খালি—যদিও কর্তৃপক্ষের চেষ্টার ত্রুটি নেই—তাঁরা গ্রীস, রোম, প্রাচীন ভারত, মিশর, ব্যাবিলন, মায় মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা—সব ইতিহাসই পড়াচ্ছেন এবং ১৯১৪ সালের পর জগতে কি হয়েছে, পাঠ্য তালিকা থেকে যথাসাধ্য গোপন রাখতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদের ভাষায় 'সবই রে বিফল রে ভোলা, সবই বিফল।' অত সহজে আমাদের ছেলেমেয়েরা ঠকে না, তারা হয় প্রাচীন ইতিহাস নেবে, না হয় নেবে অর্থশাস্ত্র।

ধনবিজ্ঞানের দুর্গতির বাইরের লক্ষণগুলিই লিখলাম। ভিতরে কোথায় পচন ধরেছে, ছাত্র-ছাত্রীরা জানবে কি করে? আমরাও জানি না, জানলেও বলি না, ভয়ে এবং স্বার্থরক্ষার জন্য। যার জোরে খাচ্ছি পরছি তার ওপর অবিশ্বাস আনি কি করে? কেবল কি তাই। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ইংরেজের কৃপায় প্রতিষ্ঠিত— শুনেছি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল কর্তাদের আদর্শ। তাই আগে পড়ান হত আদাম স্মিথ, রিকার্ডো ও মিল, সিজউইক, তারপর মার্শাল— এখনও সেই চলছে। ইংরেজ অর্থনীতিবিদের বই আমাদের একমাত্র পাঠ্য। তাই equilibrium theory না-জানাটা যেন রাজার জাতের বিপক্ষে বিদ্রোহ করারই সামিল। কি জানি, Veblen-এর কোন বই কিংবা Spann-এর Types of Economic Theory, কিংবা স্যোশিয়ালিজিমের কোন বই পড়ালে ও পড়লে যদি জেলে যেতে হয়। ভয় অবশ্য প্রকাশ করি না, একে আমরা সংযমী, তায় আবার বুদ্ধিমান। সেইজন্য ইকনমিক কন্‌ফারেন্সে কিংবা অন্য কোন মজলিসে আমরা যে-কেউ নতুন কথা বলতে চায় তাকে ঠাট্টাই করি, বলি লোকটা ইকনমিকস জানে না, জানে সমাজতত্ত্ব। ধারণাটা এই, marginal utility-র কসরত না জানলে সে লোক কিছুই জানল না। আমার মনে হয়, তাঁদের বিশ্বাস যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মার্শাল সাহেবের equilibrium theory-র উপরই প্রতিষ্ঠিত। বোধ হয় মিথ্যেও নয়। বোম্বাই অঞ্চলের পণ্ডিতবর্গ কিন্তু স্বদেশভক্ত, তাই তাঁরা থিওরির কথা তোলেন না, কেবল থিওরির সাহায্যে বোম্বাই প্রদেশের অন্তত একটি শ্রেণীর লোক ধন সমাগমের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। তাঁদেরকে বিংশ শতাব্দীর mercantiaist বলা চলে।

এখন আমার বক্তব্য এই, যতদিন মিল-মার্শাল ভক্তিতে অধ্যাপকবৃন্দ আচ্ছন্ন থাকবেন, ততদিন অর্থনীতির সঙ্গে জীবনের কোন যোগ স্থাপিত করা যাবে না। মার্শাল না পড়লেই যে জগতের সব গোলমালের কারণ আপনা থেকেই ফুটে উঠবে তা বলছি না। কিংবা মার্শাল সাহেবের principles আমার ভাল লাগে না, তাও নয়, বইখানির উপর আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। কিন্তু বইখানি ছাত্রদের পক্ষে উপযুক্ত নয়— বিশেষত যে সব ছাত্র বুঝতে চায় কেন অত কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, অত অধিক ধনোৎপাদনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর অধিকাংশ লোক খেতে পায় না, কেন মধ্যে মধ্যে ধূমকেতুর মতন সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়, কেন তার থেকে পূর্ব হতেই পরিত্রাণ পাবার উপায় আবিষ্কার করা যায় না, কেন যখন উপায় আবিষ্কৃত হয় তখন মার্শালের মতামত যায় উড়ে? আমরা সকলেই এই প্রকার সমস্যার নিরাকরণ চাই— মার্শালের বইখানিতে বড় বেশী তার সাহায্য পাওয়া যায় না। হয়ত খুঁজলে পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা হবে শঙ্কর-ভাষ্য। অর্থাৎ রামানুজ প্রভৃতির ভাষ্যেরও অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে একই সঙ্গে। তবে বিশুদ্ধ মাথা দ্বৈতীব জন্য অমন

বই পাওয়া যায় না কে না বলবে ?

এ-ক্ষেত্রে পদ্মাপারের বন্ধুরা যেমন বলেন— কি করা ? কি আর করা— ছাত্র-ছাত্রীদের সাফ বলে দেওয়া— 'আমরা মার্শাল, মিল পড়ে মানুষ, জেভনস্ পড়িনি, ক্লিফ, লেস্‌লির কেতাবও পড়িনি, সিস্‌মণ্ডি, স্মলার-এর নামই শুনেছি— আরো বলা যে, কৃষিপ্রধান দেশের আর্থিক অবস্থা আমরা কিছুই জানি না, জানি ইংলণ্ডের ইকনমিক ইতিহাস— যার সঙ্গে আমাদের যোগ আছে, কিন্তু মিল নেই ; ইংলণ্ডের "মন কৃষি-কাজ জানে না," যদিও কর্তারা বলে আসছেন, সেখানে আবাদ করলে ফলত সোনা, অবশ্য মিল না থেকেও যোগ থাকায় আমরা অভ্যস্ত, তাই বোধ হয় বরদাস্ত হয়েছে। কিন্তু হে ছাত্র-ছাত্রীরা, তোমরা আধুনিক, তোমরা মিল খোঁজ— যোগ হয়েই যাবে। থিওরিতে অরুচি ধরেছে, স্বাস্থ্য ফিরে আসবে যদি বোতলে-পোরা ওষুধের বদলে কাঁচা ফল, শাকসবজি খাও। অর্থশাস্ত্রের আইন-কানুন প্রাকৃতিক জগতের আইন নয় ; সে আইন-কানুন বিশেষ বিশেষ তথ্যসমষ্টির গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক মাত্র। দেশের অবস্থা ভিন্ন, অতএব আইনও পৃথক হতে বাধ্য। থিওরি এখন ছেড়ে চারধারে কি হচ্ছে তাই দ্যাখো, বুঝবে অর্থনীতিবিদের অমন দুরবস্থা কেন ?

সম্পাদক মশাই, এ লেখাটির ইংরেজী অনুবাদ যেন না হয়। ইংরেজীতে প্রকাশিত হলে আমার বন্ধুবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ভয় আছে। তাঁদের কোপানলে পড়তে চায় না। স্বর্গীয় পিতৃদেব তিন পারসেণ্টে বিশ্বাস করতেন— তাও সব গিয়েছে।

আধুনিক কবিতা

'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা আমাদের সামনে এল। এমন সুন্দর ছাপান ও বাঁধান কোন পত্রিকা হাতে পড়লে প্রাণটা খুশী হয়ে ওঠে। তার ওপর বিষয় হোলো কবিতা, কেবল কবিতা; হিন্দুদর্শনের চাল, অ্যাবিসীনিয়ার অসভ্য জাতির বর্ণনার ডাল এবং গল্পের আনাজ মিশিয়ে জগাখিচুড়ি নয়। কলাপাতার ওপর বাসমতী চালের ভাত কেবল, গন্ধেই খিদে আসে, জোর একটু গাওয়া ঘির প্রয়োজন হয়, না হলেও চলে। প্রথম দর্শনে মনে হয় নতুন ত্রৈমাসিকটি ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক আহার।

ইংরেজদের Poetry Review আছে। অবশ্য আমাদেরও ছিল, এবং হয়ত এখনও আছে,— গল্প লহরী ইত্যাদি যাতে গল্পই ছাপা হয়। ও দেশে সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ফলে ধরা পড়ল অধিকার ভেদ, আমাদের দেশে জন কয়েকের মধ্যে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও প্রকট হোলো সাধারণ পাঠক ও পাঠিকা। প্রথম অবস্থা কি না! তাই বোধ হয় দরকারও ছিল ঐ প্রকার সাম্যের। কিন্তু আমাদের প্রগতি গেল আটকে। তাই বড় বড নামজাদা মাসিক পত্রিকাও এখনও, ১৯৩৫ সালেও, সর্বসাধারণের তুষ্টি সাধনে হায়রান হচ্ছেন। অর্থাৎ অবসর কাটাবার সাহায্য করায় তাদের উদ্দেশ্য, চিত্তপ্রকর্ষের নয়, চিত্ত-বিনোদনের নয়। কিন্তু চিৎ বস্তুটির স্বভাব এমন যে তা ভিন্ন আর আনন্দই পাওয়া যায় না। সকলে একথা বোঝেন না, কারণ ভাববিলাসে এক প্রকার সস্তার আমোদ পাওয়া যায়। যাতে সংসার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাইতে সোয়াস্তি আসে, ভাবের ধোঁয়ার মতন Camouflage আর নেই। সামুদ্রিক একপ্রকার মাছও এ রহস্যটুকু জানে। কিন্তু যারা পালাতে চায়না তাদের পক্ষে এই চিৎকার শক্তি ছাড়া অন্য গতি নেই। যারা পালাবে এবং যারা পালাবেনা তাঁদের মধ্যে মিল থাকতে পারে না। অর্থাৎ আনন্দের অস্তিত্ব স্বীকারে। সেই জন্যই সাহিত্য কেবল দুই শ্রেণীর হতে বাধ্য— চিত্তরহিত। সোজা বাঙলায় Deliberate, cerebral, intellectual, এবং তার উল্টোটা — সেটা কি, যে কোন বাঙলা বই ও মাসিক পড়লেই বোঝা যায়। সমাজ-তত্ত্বের ভাষায় দলীয়, Clique এর, Coterie্র, এবং সার্বজনীন ইত্যাদি, প্রভৃতি। 'কবিতা' পত্রিকাটি ছোট্ট একটি দলের কাগজ তাই সাধারণে

পড়বে না। শ' দুই তিন লোক পড়লেই চলবে— অবশ্য কিনে।

সাহিত্যিক দলের উদ্দেশ্য সঠিক কি প্রশ্ন উঠতে পারে না, ডাকাতের দলের হয়ত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে পারে। উদ্দেশ্য গড়ে ওঠে এ-সব ক্ষেত্রে। হয়ত এই পত্রিকার মারফৎ কিছুই হবে না, তাতেও পাঠকবৃন্দের আসে যাবে না। কারণ কবিতাগোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ অন্য কোন কাগজে কবিতা ছাপাতে দ্বিধা করেন না এবং করবেন না। তবে বর্তমান সংখ্যার লেখক যদি কবিতা পত্রিকাতে বরাবর লেখা ছাপাতে থাকেন তবে ঠিক ঐ স্থানিক ঐক্যের বশে তাঁদের সাধারণ গুণগুলি দানা বাঁধবে, আমাদের কাছে প্রকট হবে। অধ্যাপক-বৃন্দেরও সুবিধে— তাঁরা একটা 'স্কুল' খুঁজে পাবেন।

এখন আমাদের পদ্যসাহিত্যে কি হচ্ছে ধারণা করা একটু কঠিন। মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি, অচিন্ত্য প্রেমেন বুদ্ধ— এক Unholy Unity, তারা কেবল ভাঙনের পক্ষপাতী, আর বাকী সব, মোহিতবাবু, যতীনবাবু সবাই রক্ষণশীল। পল্লী-কবির হা হুতাশ, বিদ্রোহী কবিদের গর্জনও কানে আসে। কানাঘুষোয় শোনা যায় বিষ্ণু দে নামে একজন যুবক বাঙলা কবিতায় ইংরেজী এবং পরিচয়ের সম্পাদক সুধীন্দ্র দত্ত সংস্কৃত কথা প্রয়োগ করে থাকেন। ধারণা আমাদের এই— রবীন্দ্রনাথ এখনও কবিতার রাজা, তবে সীমান্তপ্রদেশে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিয়েছে, অবশ্য কিছুই হবে না।

'কবিতা'র প্রথম সংখ্যাটি পড়ে : আমার নতুন কবিদের বাঙলা কবিতা সম্বন্ধে যা ধারণা হয়েছে তাই লিখছি। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগত সমালোচনা করছি না। প্রত্যেক কবিরই বৈশিষ্ট্য আছে, অনেক ক্ষেত্রেই তা ধরা পড়েছে — যেখানে ধরা পড়েছে সেইখানেই কবিতা সার্থক হয়েছে। এখন আমি 'কবিতা' পত্রিকার সমালোচনা করছি। অজিতকুমার, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্র দত্ত ও,হেমচন্দ্র বাগচী ছাড়া আর সকলেই অর্থাৎ বাকী সাতজন গদ্য ছন্দে লিখেছেন।* অতএব সাংখ্যিক হিসেবে বলা চলে যে এই দলটি গদ্য-ছন্দের ভবিষ্যতে আস্থাবান, অর্থাৎ কবিতা পুনশ্চের পৌনঃপুনিক। নিন্দার কথা নয় এতে, কারণ গদ্য-কবিতাও একপ্রকার কবিতা, এবং পুরানো কবিতার বন্ধন শিথিল করবার প্রয়োজন হয়েছিল। তবে গদ্য-কবিতায় একটা ছন্দ রাখতেই হবে, কেবল আভ্যন্তরিক নয় পারস্পরিকও। সেই ছন্দ হবে, পুরুষালী, মেয়েলী নয়। আর থাকা চাই স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের বিন্যাস, যার

* ধূর্জটিবাবুর গুনতিতে ভুল হয়েছে। এগারো জন লেখকের মধ্যে পাঁচজন গদ্যে লিখেছেন— অর্দ্ধেকেরও কম। সম্পাদক [কবিতা]।

সাহায্যে ভাবদ্যুতি ফুটে উঠবে চীনে-ফানুসের মতন, সন্তরণদক্ষ যুবতীর অঙ্গ থেকে স্বাস্থ্যের মতন। কবিতার প্রথম সংখ্যায় সমর সেনের রচনাই এই হিসেবে সার্থক হয়েছে। গদ্য-ছন্দের জন্য কাব্যছন্দ উঠে যাবে না। কবিতার বাঁধন মেনেও যে নতুন ধরণের ভালো কবিতা লেখা যায় তার প্রমাণ সুধীন্দ্র দত্তের 'জাগরণ'। মাত্র গদ্যছন্দের 'রাখী' ছাড়া প্রথমসংখ্যায় প্রকাশিত রচনাবলীর অন্য এমন কি সূত্র আছে যেটি স্বকীয়তা না হানি করে সমষ্টিকে এক করেছে? প্রশ্নটি তোলা খুবই ন্যায্য, এবং তারই উত্তরের ওপর 'কবিতা' পত্রিকার সাহিত্যিক সার্থকতা নির্ভর করছে। বিলেতী নতুন ধরণের পত্রিকার প্রত্যেকটিতে সাধারণ সূত্র একটি না একটি পাওয়া যায়। হয় সেটি সাহিত্যের সামাজিক মূল্যে বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসের নানা রঙ, আর না হয় ধর্মের প্রতি আস্থা। ভেতর থেকে তীব্র অনুসন্ধিৎসা, পরীক্ষা করবার প্রবৃত্তি কিংবা ঐ ধরণের একটা আবেগ বিদেশী তরুণ কবিদের দলবদ্ধ করে। আধুনিক মনোভাবের সঠিক সংজ্ঞা না দিতে পারলেও অনেক দলে তার অস্তিত্ব ওতঃ-প্রোত থাকে। আমার বক্তব্য হল এই যে দল তৈরীর জন্য বন্ধন চাই, বাইরের ভেতরের দুএর পরস্পর সাহায্য থাকলে ত' কথাই নেই। বন্ধন চোখে পড়লেই ভালো, সে জন্য হয়ত পুরাতন কবিকে কিংবা কাব্য পদ্ধতিকে ঘৃণা করারও প্রয়োজন আছে, কিন্তু অদৃশ্য থাকলেও চলে। অন্ততঃ তাই থেকে আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে নতুন দল রচিত হবে।

কবিতার সম্পাদকদ্বয় এই বিষয়ে আমাদের কিছু সাহায্য করেছেন অবশ্য— প্রেমেন মিত্র কবিতা লিখে এবং বুদ্ধদেববাবু মন্তব্য প্রকাশ করে। সুতোর একটা দিক পেলেই হোল। প্রেমেন বাবুর 'তামাসা' পড়লে অনেকটা বোঝা যায়। নব্য পদার্থ-বিজ্ঞানের গোটা কয়েক কথা কবিতায় রয়েছে, ইলেকট্রনের মরীচিকা, দেশ-কাল-জড়ান জ্যামিতিক ভগবান, ইত্যাদি— তারপর তিনি লিখছেন,—

'জানি এ-পিঠে নেইকো কোন মানে।
তবু কি হবে তলিয়ে দেখে এই তামাসা।'

কিন্তু মনোভাবটি আধুনিক নয়, মোটেই নয়, এ কেবল আধুনিক বুলি, রবিবারের ষ্টেটস্‌ম্যান পড়ে বিজ্ঞানের খবর জানলে যা হয় তাই, কিংবা তরুণ-বৃদ্ধেরা যা বলেন তাই। প্রেমেনবাবু বলছেন,

"আমার থাক
সমস্ত অঙ্কের এপিঠে

মিথ্যা মরীচিকার এই ব্যঙ্গ
নেশার রঙে টলমল
এই মুহূর্ত বুদ্বুদ,
জন্ম, মৃত্যু, প্রেম
আনন্দ, বেদনা আর নিষ্ফল এই
আত্মার আকুতি"

প্রকৃত আধুনিকদের মধ্যে কেউই নেশার রঙএ সন্তুষ্ট নন, তাঁরা মুহূর্তকে বুদ্বুদ বলেন না, নিষ্ফল বলে আত্মপ্রসন্ন হন না। আজকালকার যে সব কবি ঐ প্রকার মনোভাব প্রকাশ করেন তাঁরা এখনও মরেননি বলেই আধুনিক। প্রকৃত আধুনিক বিজ্ঞানকে positively কাজে লাগাতে তৎপর, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এবং তাদের মতে কবিতার বিষয়; অর্থাৎ রঙ বুদ্বুদ আত্মা, জোর নিষ্ফল আকুতিকে বিরুদ্ধ সংজ্ঞা হিসেবে ধরেন না। বীরের মতন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের ওপর জীবন, এবং কবির জীবন প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের স্পৃহা, পারেন না, তবু দুরাকাঙ্ক্ষা। ক্ষোভ, আফশোষ, আকুতির যুগ কেটেছে বলেই আমার বিশ্বাস। মোদ্দা কথা এই; প্রেমেন বাবুর রচনা চমৎকার হয়েছে— একটি মনোভাবের বিকাশ হিসেবে, কিন্তু মনোভাবটিকে আধুনিক ভাবলে ভুল করা হবে, এই মনোভাবের চারপাশে দানা বাঁধলে তাতে দল তৈরীও হবে, তবে সেটা আধুনিক দল হবে না। আবার বলি লেখকের সার্থকতা বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়, পত্রিকাটির সাহায্যে আধুনিক দলের ভিত্তি পরীক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য। 'তামাসা' প্রেমেন বাবুর নিজের কোন বইএ প্রকাশিত হলে তখনই তার স্বকীয়তা ও সার্থকতা নিয়ে উচ্ছ্বাস চলত। এক্ষেত্রে একটি চাল টিপে ভাত সেদ্ধ হয়েছে কিনা দেখছি।

সম্পাদকীয়টিও বিদ্রোহ ঘোষণা মাত্র। কবিতার অর্থ থাকবে না, কবিতার বিষয় নাও থাকতে পারে, এবং সেটি দুর্বোধ্য হবে। এই ধরণের কথা মোটেই নতুন নয় বিদেশে— বাঙলায় অনেকেরই কাছে নূতন, তাই প্রকাশের জরুরী প্রয়োজন আছে। কিন্তু ঘোষণা পত্রে আরো কিছু চাই। উত্তর আসতে পারে— নতুনত্ব ফুটে উঠবে পত্রিকার পৃষ্ঠায়। তাই ঠিক, ফলেন পরিচীয়তে, কিন্তু কি ফল প্রত্যাশা করতে পারি? বুদ্ধদেব বাবুর কবিতায় গদ্যছন্দের মারপ্যাঁচ ছাড়া নতুনত্ব কি আছে? পূর্বেই বলেছি ছন্দের নতুনত্ব ভিন্ন আমি আরো কিছুর ভিখারী। মাত্র রসের দিক থেকে আমি যে কোনো মতামত পেলেই সন্তুষ্ট, অবশ্য কবিতায় রূপগ্রহণ করা চাই।

Modern Temper পেলে ত' কৃতজ্ঞই থাকব। কিন্তু তাই বা কই? বিষ্ণু দের পঞ্চমুখে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু গুঞ্জন হিসেবে। আমি আরো স্পষ্ট-ভাবে শুনতে চেয়েছিলাম। এ-যুগে দিন কয়েকের জন্য গোটাকয়েক কবিতা Didactic ও parable ধরণের হলে ভাল হয়।

বাইরের দিক থেকে মনে হয় 'কবিতা'র কোন কবি সমাজের সঙ্গে, ধর্মের সঙ্গে কাব্য-রচনার সম্বন্ধ কি হতে পারে ভেবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। অথচ কবিতার রূপ পরিবর্তনের অর্থাৎ গদ্য-ছন্দের পরিণত হবার সঙ্গে সমাজ ও ধর্ম-সংক্রান্ত বিশ্বাস-পরিবর্তনের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছেই আছে। কবি অবশ্য প্রবন্ধ লিখবেন না, কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশ্বাসটি মনের কোণে থাকবেই থাকবে, এবং কবিতায় constant-এর মতন থাকবে।

অতএব আমার বক্তব্য হোল এই— 'কবিতা' পত্রিকাটি (ছন্দ ভিন্ন) আধুনিক মনোভাবের পরিচয়-জ্ঞাপক পত্রিকা হিসেবে হয়নি, কিন্তু একটি উৎকৃষ্ট কবিতা সংগ্রহ হয়েছে, যাতে প্রত্যেক নামজাদা তরুণ কবির অপ্রকাশিত কবিতা স্থান পেয়েছে। এতে এমন কয়েকটি কবিতা স্থান পেছে যার মূল্য, আমার মতে, আজকালকার যে কোন তরুণ ইংরেজ কবির রচনা অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। কাব্য-রসিকের পক্ষে এই যথেষ্ট।

বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য*

যাঁরা সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ স্বীকারের পর তার রীতি-নীতি আবিষ্কারে তৎপর হন তাঁদের পক্ষে বাঙলা সাহিত্যের নব্যরূপ বিশেষ আলাচনার বস্তু। পূর্ববর্তী সাহিত্যকে যদিও প্রতিভাশালী ব্যক্তির কৃতিত্ব ও দান হিসেবে দেখা চলে, আধুনিক সাহিত্যবিচারে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন হতে বাধ্য। প্রথমত, আমরা সকলেই জানি যে আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনন ও সৃজনীশক্তিকে অনন্যসাধারণ বলা যায়; এবং সমাজ-জীবনের পরিবর্তন ইদানীং এমন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে তার সংঘাত সাহিত্য বহন না করে থাকতেই পারে না। যখন ইংরেজের দৌলতে 'ভদ্র-শ্রেণী' তৈরী হচ্ছিল তখন তার প্রকৃতি লুকান রইল সৃষ্টির অবসরে। এখন সে-সুযোগ অপসৃত, এখন সে-শ্রেণীর অসত্য ও শূন্য-ভবিষ্যতা সচেতন মনে ছাপ পড়েছে, তারই প্রকাশ বাঙলা সাহিত্যের নব্য-পর্যায়ে।

কেবল এইটুকুই অবশ্য আধুনিক সাহিত্যের যথেষ্ট ব্যাখ্যা নয়। বাঙলা-সাহিত্যের নিজেরও একটা বেগ ছিল যার পরিণতি রবীন্দ্রনাথে। সাহিত্যকে বাঙালী মোটামুটি ব্যবহারিক জগতের বাইরেই রেখেছে। লোক-সাহিত্যে নিশ্চয় দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন ঘটেছিল, কিন্তু গত শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই তার প্রতিপত্তি এতই কমে যায় যে আজ তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গবেষণার প্রয়োজন। এই অ-ব্যবহারিকতা রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনায় অ-পার্থিব অ-স্বাভাবিকতায় যে পর্যবসিত হয়নি সেজন্য সত্য, আনন্দ, মঙ্গল, সৌন্দর্য প্রভৃতি সার্বজনীন সাধারণ মূল্যের নিরপেক্ষ অস্তিত্বে তাঁর গভীর বিশ্বাসই দায়ী। কিন্তু তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত লেখকের রচনায় এই প্রকার আন্তরিক বিশ্বাস ধরা দেয় না, এবং সেগুলির পরিবর্তে কোনো স্থির প্রতিজ্ঞারও সাক্ষাৎ মেলে না। তাই এই সব রচনায় নানা প্রকার দোষ বর্তাল। তাদের মধ্যে অর্থহীন ছন্দ-সুষমা, সংযমের ও বক্তব্যের অভাব, ও প্রগলভতাই প্রধান।

অতএব বাঙলা সাহিত্যের নতুন রূপের সন্ধান পেতে গেলে সমাজ-বিবর্তনের প্রকাশ, শ্রেণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা, রবীন্দ্র-প্রবর্তিত সাহিত্যের একটি

* অমিয় চক্রবর্তী প্রণীত— একমুঠো (ভারতী-ভবন); সমর সেন প্রণীত— গ্রহণ (কবিতা-ভবন); নিশিকান্ত প্রণীত— অলকানন্দা (কালচার পাবলিশার্স)।

পরিণতির বিপক্ষে প্রতিবাদ, এবং সাধারণ প্রতিজ্ঞায় আস্থার পরিবর্তে অনুকল্প প্রতিজ্ঞা ও তাতে আস্থার ও অনাস্থার প্রকৃতি বুঝতে হবে। সমাজের যে পংক্তির ব্যবহার বঙ্কিমী ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল আজ সেটি ভেঙ্গে বড় হয়েছে, সে-শ্রেণী আজ হতশ্রী হয়ে নিম্নস্তরে অবরোহণ করেছে, অথচ জনগণের সঙ্গে মিশতে পারেনি। যা ঘটেছে গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসরে সে কেবল সামাজিক চলিষ্ণুতার হারবৃদ্ধি, মূলশ্রেণীর অস্তিত্ব বজায় রেখে। (বাঙলাদেশের কলকারখানায় শ্রমিকদলে বাঙালীর সংখ্যা প্রায় শূন্য এবং চাকুরীর অনুপাতে প্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী— এই দুটি তথ্য সর্বজনবিদিত।) তবু এই গতিশীলতার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সচেতন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে যাঁরা লেখক তাঁদেরই রচনা নতুন ধরণের। এঁদের ভেতর যাঁরা উর্দ্ধস্তরের মনোভাব লজ্জায় বর্জন করেছেন তাঁদের লেখায় বর্জনের প্রয়াস উগ্র রকমের হলেও কখনও কখনও সংযমের চিহ্ন ও বক্তব্যের গাম্ভীর্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁরা হয়ত 'কবি' নাও হতে পারেন, কিন্তু কবিতা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা যথার্থ এবং সময়োপযোগী। অর্থাৎ ছন্দের চাতুরী ও সুষমাকে তাঁরা কবিতা বলেন না, কবি যে বিকৃত ও বিশেষ পুরুষ একথা তাঁরা মানেন না, কবিত্ব যে জীবনাতিরিক্ত কল্পলোকে পলায়নের প্রক্রিয়া কিংবা তার বর্ণনা তা স্বীকার করেন না, পরন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেন যে কবিতার উৎস কোনো ঐশী আনন্দ কি ঐ প্রকারের কোনো শক্তি নয়, এই সমাজ-জীবনের স্তরের কোনো ফাটল থেকে উৎপন্ন হয়ে সেটি বেরিয়ে এসেছে সমাজ-বুদ্ধ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে জীবনের সম্পদ-বৃদ্ধি সাধন-কল্পে। তাঁদের কাছে কবিত্ব ব্যবহারিক জীবনেরই সর্বাপেক্ষা সচেতন অঙ্গ। কতটা কারা সার্থক হতে পেরেছেন সেটা পরে বিবেচ্য, অথাতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, কিন্তু পূর্বতন কর্ম-কাণ্ড না আলোচনা করে তাঁদের কবিতা-বিচার কেবল অসম্ভব নয়, অন্যায়। অমিয় চক্রবর্তীর 'এক মুঠো' ও সমর সেনের 'গ্রহণ' এই প্রাথমিক কারণে নব্য সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। তাঁরা পুরানো কথা বিস্তর কথায় বলেননি, নিরলঙ্কারে, স্বল্প ও কাটা-কাটা ভাষায় যা নতুন মনে করেন তাই বলতে চেষ্টা করেছেন, এবং সেজন্য আঙ্গিকের যতটা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ভেবেছেন তাই আনতে সচেষ্ট হয়েছেন।

আমি কিন্তু অমিয় ও সমরের বক্তব্যর নতুনত্বটুকু ধরিয়ে দিতে অক্ষম। তবে তাঁদের ভাববৃত্তিগুলিকে (moods) যেন চিনি। বিষ্ণু দে তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য পার্থক্য না মেনে উপায় নেই। এক কথায় বলতে গেলে বিষ্ণুর রচনায় 'মেজাজ' আছে, অমিয়র নেই ; সমরের

আছে কাব্যবৃত্তির ঐক্য, যেটা চিত্তবৃত্তির ঐক্য থেকে বিভিন্ন। বিষ্ণুর রচনায় তার নিজস্বতা এতই উগ্রভাবে প্রকট যে তাকে অন্যের ভাবা শক্ত। অমিয়র কবিতায় ঐ প্রকার নিজস্বতা নেই, তাই সন্দেহ হয় তার অনুভাবন অতটা তীব্র নয় যার ফলে কবিতা হিসেবে 'বৃষ্টি' ও 'গন্তব্যে'র মতন উচ্চ শ্রেণীর রচনাও বিষ্ণুর 'ঘোড়-সওয়ারে'র মতন সম্পূর্ণ হতে পারে। আমি জানি নিজস্বতা সব সময় কবিতার পক্ষে সদ্‌গুণ নাও হতে পারে ; বিষ্ণুর একাধিক কবিতায় সেটি ভঙ্গিমায় পরিণত হয়েছে। তার উল্লেখগুলি এতই গুপ্ত, জীবন থেকে এতই বহির্ভূত ও পুস্তকাশ্রিত যে বহু চেষ্টাতেও তাদের সীম্বলের কোঠায় ওঠান যায় না। অত আত্মসচেতনতা আধুনিক কাব্যধর্মের প্রতিকূল। আরো প্রমাণ, তার বক্রোক্তি, যার প্রকৃতিই হল দ্বৈত সম্বন্ধে আত্মবোধের জয় ঘোষণা। তবু আমি বলতে বাধ্য যে বিষ্ণুর ব্যক্তিত্ব-প্রধানতা আত্মসচেতন হলেও আত্মকেন্দ্রিক নয়, বিশ্লেষণ বুদ্ধি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই তাঁর রচনায় কথনও কথনও ধ্রুপদী কাঠিন্য ও সংযমের সাক্ষাৎ পেয়েছি— যেটি অমিয় ও সমর সেনের কবিতায় বিরল। আমার মন্তব্য অনেকে হয়ত গ্রহণ করবেন না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেও introspection স্থান আছে যাঁরা জানেন তাঁরা বিষ্ণুর খেয়ালকে অনাত্মকেন্দ্রিক বলতে কুণ্ঠিত হবেন না। এই প্রকার কাব্য সাধনার জন্য কঠিন আত্মপরীক্ষার প্রয়োজন। এখনও বোধ হয় অমিয় খরদৃষ্টি ও ক্ষুরবুদ্ধির প্রয়োগকে কাব্যধর্মের অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন। এটাকে রাবীন্দ্রিক বিশ্বাস বলা চলে।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে অমিয় এখনও মুক্ত নয়। সেটা দোষের কথা নয়। বরঞ্চ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক যে সে অতটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এইটাই আশ্চর্য। কিন্তু যে কালে প্রভাব পরিত্যাগের প্রয়াস চোখে পড়ছে তখন অমিয়র আধুনিকতাই প্রথমে বিচার্য। এই হিসেবে অমিয় ও সমর দুজনেই বিষ্ণুর চেয়ে রাবীন্দ্রিক প্রতিজ্ঞা বর্জন করতে কম সমর্থ হয়েছে। তার কারণ এই : রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার অর্থ তাঁর আদর্শবাদকে অগ্রাহ্য করা নয়, কিংবা তার বদলে বস্তী ও 'বস্তুতান্ত্রিক' সাহিত্য উৎপন্ন করা নয়। গদ্য সাহিত্যে শরৎচন্দ্র থেকে 'কল্লোল', 'কালি কলমে'র দল এবং পদ্যে মোহিতবাবু থেকে সমর সেন পর্যন্ত সকলেই সে চেষ্টা করেছেন ও বিফল হয়েছেন। বিষয়বস্তু উলটে দিলেই রবীন্দ্রনাথের ভাঁড়ার খালি করা যায় না। সাধারণ প্রতিজ্ঞার সঙ্গে যুদ্ধে বিশেষ কথনও জয়ী হতে পারে না। বিশেষ থেকে কবিতার উপযুক্ত কার্য-বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য

বিশেষকে নিয়মাবদ্ধ করতে হয়, সে-নিয়মের রীতি মর্মে মর্মে বুঝতে হয়। মোট-কথা, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে গেলে অন্তরে বিশ্লেষণ-বুদ্ধি ও তার যুক্তিতে বিশ্বাসকে অধিষ্ঠিত করতে হবে। তবেই তাঁর সর্বজনবিদিত লিরিক মনোভাব, তাঁর তুলনা-উপমার প্রাচুর্যের বদলে বাক্য-ধর্মী ও গতিপ্রাণ কবিতা রচনা সম্ভব হবে। আধুনিক কোনো সাহিত্যিকের রচনায় পূর্বোক্ত সতের সন্ধান পাইনি—এক সুধীন্দ্র দত্ত ছাড়া। তবু তার প্রতিজ্ঞায়, অন্তত আমার মতে, যুক্তির গলদ আছে। যুক্তিতে বিশ্বাস ও যুক্তির সম্পূর্ণতা বিভিন্ন বস্তু, তাই সুধীন্দ্রের রচনায় আমি নিট্‌শীয় দোষগুণ খুঁজে পাই। চক্রবৎ বিঘূর্ণন যদি যুক্তিসঙ্গত হত তবে সুধীন্দ্রের কবিতায় শ্রান্তির বদলে শান্তি পেতাম, প্রতিবাদী মনোভাবের বদলে নিশ্চয়াত্মক দাঢে'র পরিচয় মিলত। সে যাই হোক— পূর্বোক্ত বিশ্বাসের ফলে আধুনিক কবি হয়ত স্মরণীয় হতেন না। তাতে দুঃখ কিসের! আধুনিক মানুষ ত' হতেন! সেটা কিছু কম কথা নয়। আধুনিক কবির অন্তত আধুনিক মানুষ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আধুনিক সাহিত্যবিচারের একটি প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা এই যে আজকালকার সাহিত্যিক তৃতীয় শ্রেণীর লেখক যাঁরা প্রাণপণে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করতে চাইছেন, অথচ যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুকরণের জন্য তৃতীয় শ্রেণীতেই রয়ে গেলেন। অর্থাত as in politics so in poetry, good government is no substitute for self government। অবশ্য আমরা তৃতীয় শ্রেণীর লেখক মানতে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত বাধা অভিমান নয়, অনুকরণের অনায়াস এবং স্বাধীনতা সাধনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অজ্ঞতা। তাই আজ অনেকেই অমিয় ও সমরের মতন আঙ্গিকের নতুনত্ব দেখিয়েছেন, বিপ্লবী কথাবার্তা কয়েছেন, তবু রবীন্দ্রোত্তর নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি।

আঙ্গিকের অভিনবত্ব সম্বন্ধে একটি কথা বলতে চাই। কি দেশী, কি বিদেশী বর্তমান সাহিত্যে সাধারণ প্রতিজ্ঞায় আস্থার পরিবর্তে অবচেতনাকে গ্রহণ করা হচ্ছে। সেজন্য অবশ্য অবচেতনাস্থিত দমিত প্রবৃত্তির স্ফূরণে সমাজ-জীবনের পরিবর্তন সম্ভব এই ধারণাই দায়ী। অবচেতনা থেকে সাহিত্যিক দুটি জিনিস প্রত্যাশা করেন, আঙ্গিকের দিক থেকে ইমেজ ও সীম্বল, এবং রচনারীতির বেলা ভাবধারার একটি নতুন সম্পর্ক। ইমেজ অনেকটা বুদ্‌বুদের মতন যার রঙের বাহার সত্যই চির নূতন ও যার সারি-গাঁথা অন্তঃশীল জীবনস্রোতের পরিচায়ক। সীম্বল আরো ঘন, আরো স্থায়ী ও এতই দানা-বাঁধা যে তার সংহতির শক্তিতে প্রতিবেশী ভাসমান ভাবগুলি তার

ছকের মধ্যে অতি সহজেই বিন্যস্ত হয়। জাতীয় সমগ্র-অবচেতনা থেকেই সীম্বল আহরণ প্রশস্ত, যেমন নিশিকান্তের কবিতায়। যে-কবির তার সঙ্গে যোগ বেশী তার সীম্বল ততই ভাবোত্তেজক। অতএব এখানেও সমাজবোধের প্রয়োজনীয়তা থেকে পরিত্রাণ নেই। কিন্তু সীম্বল-ইমেজ ব্যবহারের দ্বারা সাহিত্যিক বিপ্লব-সাধনা নাও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অবচেতনা বিপ্লবী সেনার শিবির নয়, তাকে চেতনা দিয়ে খোঁচালে তবে সে বিদ্রোহীর রসদ যোগায়। লোক-সংগ্রহ যেমন স্বভাবত পুবাতন-পন্থী, তাকে প্রগতিশীল করবার জন্য তাকে সচেতন করা ছাড়া যেমন অন্য উপায় নেই, তেমনই অবচেতনাস্থিত ইমেজ ও সীম্বলগুলির মধ্যে একটা পূর্বজানুকরণ বৃত্তি থাকে, যাকে খণ্ডন করতে এক সচেতন-বুদ্ধিই সমর্থ। সচেতন-বুদ্ধি অর্থে কেবল নির্বাচন-শক্তি বলছি না, সমাজ-বোধ উল্লেখ করছি। তার অভাবে, নিশিকান্তর কবিতায় গভীর অর্থপূর্ণ সীম্বল থাকলেও, তিনি 'আধুনিক' কবি নন। ব্যাপারটা এই: অবচেতনার প্রক্রিয়া যান্ত্রিক নিয়মে চলে, কারণ, এক একটি বৃত্তি এক একটি বিশেষ কর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট, সে কর্মধারা রুদ্ধ কিংবা অবান্তর হলেও তার প্রকৃতি পরিবর্তনে সময় লাগে, ততদিন গুদোম ঘরই রয়ে যায়। তাই দেখি যে-সব রচনায় অবচেতনা আধিপত্য বিস্তার করেছে তার মধ্যে প্রকৃত সৃষ্টির নিদর্শন কম। এই হিসেবে অমিয় ও সমরের ইমেজ বর্তমান সমাজের প্রতিবিম্ব হলেও নবজীবনের উপযোগী নয়। যদি হত তবে বলতাম যে তাঁরা রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাই আপাতত অমিয় ও সমরের কবিতা সাহিত্যাগারের মানসিক পরীক্ষাই থাকল।

পূর্বে আমি অবচেতনার সাহায্যে রচনা-রীতিতে ভাবধারার নতুন সম্পর্ক স্থাপন উল্লেখ করেছি। ভাব পুরাতন, ধারাটি ও সম্পর্কটি নতুন। তবে ভাবের মধ্যেও কারিগরী দেখান যায়, এবং ধারাও সেই চিরপরিচিত সহচারী ধারায় আটকে যেতে পারে। রচনার কৃতিত্ব সম্পর্ক-স্থাপনে। এ সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে সেটি বুদ্ধিগত যুক্তিতর্কের অতিরিক্ত। ভাবানুষঙ্গ তর্কনীতি মেনে চলে না বলেই অনেকের মতে কবিতা অর্থহীন এবং রসবস্তু। আমার মতে এই কথাটাই অর্থহীন। ভাবধারাও একটা শক্ত নিয়মে বাঁধা, তার খোঁজ য়্যারিষ্টটল না দিলেও অন্যে দিয়েছে। কথাপ্রয়োগে অর্থ নিহিত থাকতে বাধ্য, নচেৎ গান গাইলেও চলত, যদিচ গানেও অর্থ আছে রীতিমত। যার ব্যাকরণ আছে তারই অর্থ আছে। ভাল nonsense verse, limerick কেউ লিখুন

দেখি। আমরা সে ব্যাকরণের নিয়মকানুন জানি না, অর্থাৎ আমাদের ভাষায় কুলোয় না এই পর্যন্ত। তাই বলে আমাদের অজ্ঞতা ও ভাষার অক্ষমতাকে রসবস্তু প্রভৃতি গালভরা নাম দেওয়া মনের জুয়াচুরী ও সুবিধাবাদ মাত্র। সে যাই হোক, এটা মানতেই হবে যে নতুন নতুন সীম্বলের যোগস্থাপন পুরাতন রচনাপদ্ধতিতে চলে না— নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন নতুন সীম্বলের প্রকৃতিতেই বর্তমান। তাই যখন দেখি নিশিকান্ত সীম্বল-ব্যবহার সত্ত্বেও রাবীন্দ্রিক পদ্ধতিতে আশ্রয় নিচ্ছেন তখন মনে সন্দেহ ওঠে যে হয়ত তাঁর সীম্বল সেই পুরাতনেরই ভাঙ্গাগড়া, কিংবা হয়ত প্রকৃতপক্ষে তিনি রবীন্দ্রনাথেরই সাহিত্যিক অনুচর। অবশ্য আমার পুর্বোক্ত মন্তব্যের সীমা সম্বন্ধে আমি সচেতন। অধ্যাত্মজগতে সীম্বলের প্রকৃতি অন্য প্রকারের হতে পারে আমি মানি। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে মনে ভাবি, আত্মা কি রাবীন্দ্রিক ভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষায় প্রকাশ পায় না? উপনিষদ ও গীতার সাহিত্যিক রচনা-নীতিও কি রাবীন্দ্রিক?

অবশ্য রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে মুক্তিটাই একমাত্র বিচার্য নয়। যখন প্রয়াস দেখি তখনই সেটা আলোচনার সামগ্রী। যেখানে প্রয়াস নেই কিংবা কম সেখানে আধুনিকতার মানদণ্ড সমাজবোধ, কিংবা বিশ্ববোধ। দুটো পরস্পরকে সমর্থন করলে রাজযোটক, নচেৎ যা পাওয়া যায় তাইতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সমর সেনের কবিতায় মুক্তির আয়াস নেই। তার কারণ নয় যে সে মুক্ত। সমরের কাব্যাগ্রহ প্রধানত সামাজিক। যার প্রতীক এই কলকাতার জীবন-যাত্রা, সেই ব্যর্থতার প্রতিভূ হিসেবে তার কবিতার একত্ব। আমার বিশ্বাস পূর্বকথিত সামাজিক mobility-র সীমাবোধ তার কবিতায় সব চেয়ে বেশী সুন্দরভাবে ফুটেছে। কিন্তু এইখানে আমার বক্তব্য আছে। ব্যর্থতাবোধ-জনিত ভাবের ঐক্য ও সীমাবোধের ঐক্য, দুটিই অতি সহজে নতুনত্বের ও প্রাচুর্যের প্রতিকূল হয়ে ওঠে। তাই ঘটেওছে। সমরের প্রথম কবিতা পড়ে উল্লসিত হই, প্রথম কবিতা-সংগ্রহ পড়ে প্রশ্ন ওঠে এইবার কোন ধার, দ্বিতীয় পুস্তকে সে-প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। 'গ্রহণে'র দু-একটি লাইন ছাড়া এমন কোন প্রমাণ পেলাম না, বক্তৃতার প্রমাণ, উচ্ছ্বাসের প্রমাণ বলছি না, যাতে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে সমরের ব্যর্থতাবোধের অন্তরে একটা নঙর্থক সমাজবোধ থাকলেও তার পিছনে একটা কোন না কোন প্রকারের বিশ্বোপলব্ধি আছে। যেমন বিশ্ববোধ হয়ত সমাজবোধের অভাবেও স্পষ্টভাবে সুধীন্দ্র দত্তের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে তার অন্যায়ের বিপক্ষে একটা ভীষণ জাতক্রোধে— indignation-এ এবং যার একান্ত অভাবের প্রমাণ বিষ্ণুর

তিক্ততায়। সুধীন্দ্রের বিশ্ববোধ আমার নয়, সেটা তার সমাজবোধের দ্বারা সমর্থিত নয়। যে চক্রবৎ পুনরাবৃত্তিতে বিশ্বাসী সে ভিন্নধর্মী, সে বিশ্ববোধ সমাজবোধের অপূর্ণতায় উগ্র ব্যক্তিত্ববাদ, নীট্শীয় অবতারবাদ। তবু তার বিশ্ববোধ আছে, আর কারুর নেই, এই জন্য তার কবিতা আমাকে স্পর্শ করে, যদিও আমার যুক্তিধারাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে। অর্কেষ্ট্রা ও ক্রন্দসীর লেখক ব্যর্থতাকে জীবনের প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন, তিনিও সীম্বল ব্যবহারে কৃপণ নন; কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যর্থতা থেকে মুক্তির আগ্রহকে বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্ববোধে পরিণত করবার চেষ্টার দরুণ তাঁর হতাশা সার্থক। ব্যর্থতাবোধ এ-যুগে স্বাভাবিক; তাই বলে সেটা আধুনিকতার নিদর্শন হতে হবে কিংবা নঙর্থকই হতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। আধুনিক ও সদর্থক বিশ্বাসে তাকে পরিণত করবার জন্য দুটি জিনিষ সাহায্য করে, সামাজিক বিপ্লব, কেবল mobility-র গতিহার বৃদ্ধি নয়, এবং ভীষণ প্রকারের দৃঢ় শিক্ষা ও সংযম। প্রথমটি আমাদের নেই, তাই কোনো কবিকে ব্যর্থতার জন্য দোষী করি না, কিন্তু ঠিক সেই জন্যই দ্বিতীয়টির প্রয়োজন বেশী। অমিয় ও সমর এই অধিক প্রয়োজন স্বীকার করেন না। সুধীন্দ্র করেন, তাই হয়ত তার রচনা দুর্বোধ্য ঠেকে, কিন্তু সেই জন্যই তার 'প্রতিপদ', 'উটপাখী', 'জেসন' প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রোত্তর কবিতা। আজ যদি তার ব্যক্তিত্ববোধ পৌরুষে অবস্থিত না হয়ে পুরুষে পরিণত হত তবে তার রচনায় আমি অন্তত শান্তি পেতাম। এই পরিবেশে আজকালকার সব কবিতারই তাগিদ অভিমান। অবশ্য কারুর বা মেয়েলী, কারুর বা পুরুষালী। কিন্তু সব অভিমানই অ-সামাজিক। কেউ অভিমানকে বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বাসবোধে পরিণত করেন, কেউ বা তাকে মেজাজে বদলান। সর্বত্রই সেই সমাজবোধের অভাবে একটা ভীষণ অপূর্ণতার ছাপ জ্বল জ্বল করছে। সে-অভাব যতদিন না ঘুচছে ততদিন রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের সম্পদ আমার কাছে মোহন হলেও খুব মূল্যবান নয়।

পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪৭

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সাধারণের চোখে পড়ে। তাতে অনেকেই শক্তির ও নতুনত্বের আমেজ পান। ক্রমে সেটি বিকশিত হ'যে লেখকের প্রতিষ্ঠা অর্জনে সহায়তা করেছে। বাংলা দেশে তাঁর বই কী রকম বিক্রি হয় জানি না, কিন্তু এমন একাধিক অ-বাঙালী দেখেছি যাঁরা তাঁর রচনা সম্বন্ধে নিতান্ত আগ্রহশীল। অনেক দিন ধ'রে তাঁর বিশেষত্ব কি বুঝতে ও বোঝাতে উৎসুক হয়েছি, কিন্তু পারি নি। কাজটা কোন ক্ষেত্রেই সোজা নয়, মাণিকের বেলা আরো শক্ত, কারণ, প্রথমত, তিনি এখনও অপরিণত, দ্বিতীয়ত, তাঁর আঙ্গিক আমাদের কাছে অপরিচিত। সেই জন্য একটু গোড়ার কথা বলার প্রয়োজন।

দুটি চরিত্রের সংঘাত— এই হ'ল নাটকত্বের প্রাণবস্তু। তাই থেকে একটি চরিত্রকে তুলে নিয়ে প্রতিবেশী সংস্থানকে বসালে দ্বন্দ্ব থাকে বটে, কিন্তু নাটকত্ব গল্পের দিকেই ঝোঁকে। যদি পারিপার্শ্বিককে চেপে রাখা যায় তখন একটি চরিত্রের অন্তরের বিভিন্ন টুকরো মানুষের বিরোধটাই নাটকত্বের স্বরূপ নির্ণয় করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে এলিজবীথান যুগের নাট্যকার এবং ইবসেন ও পিরাণ্ডেলোর নাম উল্লেখ করা চলে। গ্রীক নাটকের গোড়ার দিকে ছিল নিয়তির বিপক্ষে বিদ্রোহ, কিন্তু নিয়তির কার্যাবলী ছিল মানবিক। ইবসেনের সময় সমাজ ঝানু হয়েছে, তাই সামাজিক বাধার শক্তি হ'ল ভীষণ, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-বোধ ও গল্পাংশ বৃদ্ধি পেল। পিরাণ্ডেলোর বেলা মানুষের মন ধাক্কা খেয়ে সংকুচিত ও বিখণ্ডিত। সমাজ-যোগ বিচ্ছিন্ন হবার জন্য এই নাটকত্ব আন্তরিক, অ-স্বাভাবিক ও সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠল। নিতান্ত সাধারণভাবে মন্তব্যলিপি লিখলাম। হাজার ব্যত্যয় থাকলেও মোটামুটি এইগুলি গ্রহণ করা যায়।

সাহিত্যের ইতিহাসে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও ইঙ্গিত আছে যে নাটকের ছায়াতেই নভেল বেড়েছে। খুবই স্বাভাবিক। সমাজবন্ধন যখন দৃঢ় হয়নি তখন পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রাধান্য নিয়ে বিরোধটাই প্রত্যাশা করা যায়; যখন হয়েছে, তখন ব্যক্তিগত বিরোধ সামাজিকতার মধ্যে বিস্তারিত; যখন আবার অত্যন্ত দৃঢ় তখন নোরা ও ক্লিটেমনেস্ট্রা স্বধর্মী। অন্য দিক থেকেও

তাই। ঘটনার দ্রুত স্রোতে পাঠকের মন ভেসে গেলেও আগ্রহ ঘনীভূত হয় সংঘাতের আশায়। যে কেউ কথকতা শুনেছেন, কিংবা বিখ্যাত ঐতিহাসিক নভেলের পৃষ্ঠা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন ও তার পরিবর্তে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে রাত কাটিয়েছেন বলতে কুণ্ঠিত নন, তিনিই স্বীকার করবেন যে সংশয়, বিচ্ছেদ, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি মনোভাব জাগ্রত না হলে গল্পের মজা পাওয়া যায় না। ছোট গল্পের বেলা ত' বটেই, নাটকত্বই তার কৃতিত্ব। এমন কি অতি-সভ্যতার চাপে মনের ওপর যখন মেউড়ি পড়েছে, সাধারণ জীবনযাত্রায় যখন উত্তেজনাই আসছে না তখনও সমস্ত খবরের কাগজের মধ্যে চোখে পড়ে চার্চহিল-হিটলার সংবাদ ও খুনী মোকদ্দমার বিবরণ। নাটকীয় বিরোধের আশীর্বাদেই নভেল, গল্প বেঁচে আছে। একে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না।

কিন্তু এও ঠিক যে জীবনে এত একঘেয়েমী আছে ও সেটা এতই বেড়েছে যে বড় রকমের সংঘাতের অবকাশ আর নেই। গত মহাযুদ্ধে ফোশ, হেগ্‌, হিণ্ডেনবর্গ, লুডেনডর্ফ প্রভৃতি সেনাধ্যক্ষের নাম মুখে মুখে ঘুরত, এখন কারুর মনেই থাকে না। শুনি এটা যান্ত্রিক যুগেরই ফল। চাষ-বাসের যুগে একঘেয়েমী ছিল, যদিও ভিন্ন ধরনের। সে যাই হোক, বর্তমানে সংঘাত কমেছে বটে কিন্তু চাপ বেড়েছে। সে-চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত, কিন্তু সক্রেটিক পদ্ধতিতে তার বিপক্ষে মাথা তুলে মুখে বিষ ঢালতে কেউ সহজে রাজি নন। প্রধানত নাটকের পরিসর সংকীর্ণ বলেই চাপ, প্রভাব প্রভৃতি সূক্ষ্ম অথচ ব্যাপক দ্বন্দ্ব ভাল খোলে না। যেটা ওতপ্রোত তার জন্য স্থান হওয়া চাই প্রশস্ত। একদম অসম্ভব বলছি না, কারণ চেখভ-এর চেরী অর্চার্ড প্রভৃতি নাটক সার্থক। সহজসাধ্য নয়ই বলছি। নভেলের কিন্তু ঐ ধরনের সীমা নেই, তাই নভেলে 'চাপ'টা দেখান যায় ভাল। এই হিসেবে হেনরী জেম্‌স্‌ বর্তমানের শ্রেষ্ঠ নভেলিস্ট। তিনি প্রভাবের আর্টিস্ট, যে-প্রভাব হাওয়ায় থাকে, অজানিতে, অথচ সুনিশ্চিতভাবে অপরের জীবনে ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়, যার ফলে ব্যক্তিগত চরিত্রের কোণ যায় খ'সে, সোজা কাঁধ যায় বেঁকে, বাঁকা কাঁধ হয় সোজা, দৃষ্টি হয় উজ্জ্বল। কিংবা ক্ষীণ স্বর হয় মিষ্টি কিংবা রুক্ষ। এই প্রকার সামান্য ও তুচ্ছ পরিবর্তনের সমষ্টিই পরিণতির পরিচয়। হেনরী জেমসের নায়ক-নায়িকার নামই মনে থাকে না, কারণ তাঁদের পরিণতি তীব্র সংঘাতের অভাবে আকস্মিক নয়। এই পদ্ধতিতে পাঠকের আগ্রহ জমে ওঠে স্রোতের অন্তে বই বন্ধ করার পর। ক্ষুদ্র ঘটনাকে বড় নক্‌সার অঙ্গ না ভাবলে জেমসীয় পদ্ধতিকে অবান্তরের ভিড় জমান ব'লে ধারণা হয়। লেখকও বুদ্ধির

সাহায্যে ঘটনা নির্বাচন করেন। রচনার দোষে যে-রূপ ফুটবে তাকে বহু পূর্বে কল্পনার অন্তর্গত করাই শক্ত, বিশেষত যখন এই পদ্ধতিতে লেখকের মনে কোন প্রকার বাঁধাধরা প্ল্যান থাকে না, তার উপর আবার তুচ্ছ ঘটনার সঙ্গে কাল্পনিক পরিপূর্ণতার যোগ স্থাপন করা— এতটা বুদ্ধি-সাধনার প্রয়োজন বোধ হয় অন্য কোন রচনা-পদ্ধতিতে নেই। প্রতি মুহূর্তে লেখক মনকে সতর্ক রাখবেন, নচেৎ সব এলোমেলো হবে— গল্প একটা সময়ের পর নিজের তাগিদে চলতে চায়, তাকে স্বাধীনতাও দিতে হবে, না হলে গতি মন্দা হবে, আবার নাগাল বেশী ছাড়লেও চলবে না, পাগলের খেয়াল হয়ে উঠবে। এই প্রকার নানা বিপদ কাটাবার জন্য একমাত্র মার্জিত সচেতনতাই সাহায্য করতে পারে। অতটা মনঃসংযোগ জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব, তাই এই সব নভেল বুদ্ধিসর্বস্ব, উঁচকপালে দুর্নাম অর্জন করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভাব-ধর্মী নভেলই বর্তমান যুগের উপযোগী।

প্রভাব-ধর্মে জাতিভেদ আছে অবশ্য। ডি. এচ. লরেন্স-এর আঙ্গিক প্রুস্ত-এর আঙ্গিক থেকে পৃথক। লরেন্স-এর মূল ছিল ব্যক্তি। দুজন মানুষ বিশেষত স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধের চাপই ছিল তাঁর প্রধান কারবার। প্রুস্তের ছিল আবহাওয়া ; বড়লোকের বাড়িতে প্রকাণ্ড হলে নাচ গান হচ্ছে, রাস্তার দু'ধারে গাছের সারি, সেই রাস্তায় দুটি পরিবার পায়চারি করে— এই প্রকার সমবেত প্রভাব কখনও কাটাকাটি হচ্ছে, কখনও বা জুড়ে যাচ্ছে— কিন্তু প্রক্রিয়ার বিরাম নেই। ফক্‌নারের আঙ্গিক সমগোত্রের না হলেও সমজাতীয় প্রাক্তনিক উত্তরাধিকার, পারিপার্শ্বিকের শত্রুতা প্রভৃতি অবাস্তব ও প্রশস্ত প্রভাব তাঁর রচনায় গ্রীক নিয়তির কাজ করে। এই সম্পর্কে স্ত্রী সাহিত্যিকের উল্লেখ একান্ত কর্তব্য। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড, ডরথি রিচার্ডসন, ডেলাফিল্ড প্রভৃতি লেখিকা প্রভাব-ধর্মী। আমার বিশ্বাস মেয়েদের পক্ষে পূর্বোক্ত আঙ্গিক গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক।

কেবল তর্কনীতির দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে আমরা প্রভাব-ধর্মের প্রসার আশা করতে পারি। এমন একঘেয়ে জীবন, নাটকীয় সংঘাতের এমন দুর্ভিক্ষ, এমন মেয়েলী স্বভাব, এমন সংকীর্ণতা, এমন অনুকরণপ্রিয়তা আর কোথায় পাব ? কিন্তু বাংলা দেশে যা আশা করা যায় তা ফলে না। প্রতিবেশী ঘটনার কিংবা চরিত্রের আবহাওয়া ওতপ্রোতভাবে নভেলের ঘটনা কিংবা চরিত্রকে ধীরে ধীরে চাপ দিচ্ছে, ও তারই জোরে পরিবর্তিত করছে এমন কোন সার্থক বাংলা দৃষ্টান্ত নজরে পড়েনি। চেষ্টা যেন একবার হয়েছিল মনে হয়

শৈলজানন্দের হাতে। কিন্তু শীঘ্রই তিনি স্বধর্ম পরিত্যাগ করলেন। তাঁর 'ষোল আনা' কিংবা 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' তখন গৃহীত হল না। বাংলা নভেলের পক্ষে এটা দুঃখের বিষয়। যে-কাজ শৈলজানন্দ পারেন নি সে কাজে আজ মাণিকলাল অপেক্ষাকৃত সফল হয়েছেন। আজকালকার বাংলা সাহিত্যে তিনিই একমাত্র প্রভাব ও চাপের লেখক। এই ভাবে দেখলে মাণিকলালের কৃতিত্ব ধরা পড়ে, তাঁর দোষেরও স্খালন হয়।

আমি মোটেই বলছি না যে মাণিকলাল পূর্বে যাঁদের নাম করেছি তাঁদের মতন একজন বড় আর্টিস্ট। তাঁর রচনায় অনেক দোষ। হাওয়াতে অনেক পকেট আর গর্ত আছে বলেই প্রভাব-বর্ণনা শিথিল হলে চলে না। লেখকের দুর্বলতা প্রভাবের দুর্বলতা একবস্তু নয়। প্রভাবটা স্ত্রীসুলভ, তাই মাণিকলালের প্রায় প্রত্যেক স্ত্রী-চরিত্রই জীবন্ত, স্ত্রীজাতির মোহটাই প্রহেলিকা, মাণিকলালের স্ত্রী-চরিত্রকে ধরা ছোঁয়া যায় না— কিন্তু সেজন্য সব স্ত্রী-চরিত্রই এক ছাঁচের হবে, এবং প্রহেলিকার বদলে তাঁরা সকলে একটু এলোমেলো, ছিটগ্রস্ত হবেন এমন কিছু কথা নেই। যদি তাই হন তবে বুঝব তাঁদের স্রষ্টার রচনাশক্তিতে না হোক চিন্তাশক্তিতে গলদ আছে।

মাণিকলালের প্রায় সব রচনাই পড়েছি। পড়ে আমার সন্দেহ হয়েছে যে তাঁর কৃতিত্ব অশিক্ষিতপটুতা। অন্য ভাষায়, তাঁর প্রতিভা স্বভাবসিদ্ধ। তাঁর অসমতা ধারণার অক্ষমতা থেকে উৎপন্ন। তিনি প্রকৃত জিনিসটা ধরেছেন, কিন্তু মুঠো তাঁর আলগা হয়ে যায় এইজন্য যে শক্ত মুঠির শিক্ষা তাঁর নেই। এ-যুগের উপযোগী রচনার জন্য অভিজ্ঞতার মূলধন কিংবা ঐশী শক্তিটাই যথেষ্ট নয়। সজ্ঞানতার প্রয়োজন এ-যুগে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। মাণিকলালের চৈতন্য মার্জিত নয়— নচেৎ 'পদ্মানদীর মাঝি', 'কুষ্ঠ রোগীর বৌ'-এর মতন লেখায় তাঁর য়ুটোপীয়া-প্রীতি সংযত হতো, বর্ণনার বুকে মন্তব্যের ভোঁতা ছুরি বসত না, যেমন বসেছে 'অহিংসা'য়। তাঁর রচনায় ধৃতি নেই। যদি আসে তবে বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য বলতে হবে। কারণ চাপের ওজন কতটা হতে পারে একমাত্র তাঁর রচনাতেই ধরা পড়ে। প্রমাণ? 'কেরানীর বৌ', 'সহরতলী', 'পুতুলনাচের ইতিবৃত্তে'র একাধিক অংশ, 'টিকটিকী', 'সিঁড়ি'।

পরিচয়, কার্তিক, ১৩৪৭

প্রমথ চৌধুরীর গল্প

ফাল্গুন-সংখ্যার প্রবাসীতে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী 'অনুকথা-সপ্তক' নামে প্রমথবাবুর আধুনিক গল্প-সঞ্চয়কে আশ্রয় করে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। তার ফলে প্রমথবাবুর অন্যান্য গল্পের বই আবার পড়লাম। আশ্চর্য হলাম তাঁর গল্প-রচনার কৃতিত্বে। তাঁর কৌশল সেই ধরণের যার আনন্দ পুনঃ-পরিচয়ে চক্রবৃদ্ধির হারে বৃদ্ধি পায়। আমার বিশ্বাস যে বাঙলা সাহিত্যে প্রমথবাবুর পদমর্যাদা ক্রমেই বেড়ে যাবে। হয়ত এমন দিন আসতে পারে যখন বাঙালী আর গল্প লিখবে না, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেন, যাঁদের আচার-ব্যবহার, ভয়-ভাবনা, আশা-ভরসা বর্তমান সাহিত্যের বিষয়বস্তু, তাঁরা লুপ্ত হবেন। কিন্তু গল্প লেখার ও পড়ার নেশা ও তাগিদ যতদিন বাঙলা দেশে থাকবে, ততদিন প্রমথবাবুর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গতি নেই মনে হয়। দূরদৃষ্টিতে তিনি লেখকের লেখক; যদিও আপাতদৃষ্টিতে তিনি সাহিত্যানুরাগী জন-সাধারণের। দূরদৃষ্টি যখন আমার নেই, তখন সাধারণের একজনের মনোভাব ব্যক্ত করাই সঙ্গত।

প্রথমেই চোখে পড়ল প্রমথবাবুর গল্পের বৈচিত্র্য। অন্যদেশের কা কথা, আমাদের দেশেরই অন্য লেখকের তুলনায় তিনি কম লিখেছেন, তবু তাঁর গল্পের সংখ্যা মোটেই অল্প নয়। এতগুলি গল্পের বিষয় যদি স্বতন্ত্র হয় তবে তাঁর দৃষ্টিক্ষেত্রের প্রসারকে তাঁর শক্তির প্রথম পরিচয় বলতে হবে। স্বল্পশক্তির নিদর্শনই হল পুনরাবৃত্তি, তার কারণ অ-লেখকও আত্মজীবনের একটি প্রধান ঘটনার অবলম্বনে অন্তত দু একটি গল্পের খোরাক যোগাতে সমর্থ। লোকে বলে বাঙালীর জীবন নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। স্বীকার করি, কিন্তু তার ফলে ভাব-প্রবণতারই জন্ম হয়, বিষয়ের পরিসর বলজাক-এর গল্পে গাধার চামড়ার মতন কমে যায় না। প্রমথবাবু ভাবালুতাকে ত্যাগ করেছেন কেবল নয়, সঙ্কীর্ণ সমাজের আকাশ-পাতালে, আনাচে-কানাচে, ঘরে-বাইরে ঘুরে অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। চার-ইয়ারী কথার প্রত্যেক ইয়ারের কাহিনী, আহুতি ও অনুকথার প্রত্যেক গল্প, নীললোহিতের হরেক কিস্‌সা অন্যটি থেকে পৃথক। ঘটনার ক্ষেত্র কখনও বড় কখনও ছোট সহরে, গ্রামে, মাঠে, ট্রেনে, ষ্টীমারে, বাঙলা দেশে, প্রবাসে, বিদেশে; চরিত্র ভূত-পেত্নী,

আসামী, নেশাখোর, ভবঘুরে, পানওয়ালী; বাইজী থেকে আমিন-আমলা, কেরানী, মধ্যবিত্ত, অধ্যাপক, প্রজা, লাঠিয়াল, বিলেত-ফেরতা, ইংরেজ গোরা, জমিদার পর্যন্ত; রসও বহু প্রকারের, হাসি, ভয়, ঠাট্টা, করুণা, সাহস, হিংসা, নিষ্ঠা ও আভিজাত্য-বোধের। এমন বিস্তারিত পটভূমিতে তাঁর লেখনী অনায়াসে বিচরণ করে। কল্‌কেতে তামাক ভরা, ডালকুত্তাকে খাওয়ান, বাইজী বাড়ির হালচাল, লাঠিয়ালের বাবরী চুলের প্রসাধন, এই সব প্রক্রিয়া যেমন তাঁর করায়ত্ত, তেমনি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের রীতি-নীতি, কালী বাড়ির ধূমধাম, শিকার-খেলা প্রভৃতি বড় মানুষী খেয়ালের বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। আসল কথা এই যে প্রমথবাবু গল্পের বিষয়-বোধে প্রবুদ্ধ। যাঁদের বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিক বলা হয় তাঁদের পরিসরও প্রশস্ত, কিন্তু এই বিষয়-বোধের অভাবে তাঁদের রচনা নিরুদ্দেশ যাত্রারই সামিল হয়। বস্তুতান্ত্রিকের বিশ্ববিজয়-বৃত্তি সাহসের নমুনা, সাহিত্যের নয়। প্রমথবাবুকে কেউ আদর্শবাদী বলবে না, কিন্তু তাঁর নির্বাচন-শক্তি প্রখর। সেইজন্য গল্প লেখার তাগিদ না এলে তিনি লেখেন না সন্দেহ হয়, ফলে তাঁর রচনা যেমন অপেক্ষাকৃত অল্প, সৌষ্ঠবে তেমনই সম্পূর্ণ। এক কথায়, তিনি গল্প লেখবার আগে ভাবেন।

বৈচিত্র্যের সঙ্গেই প্রমথবাবুর নির্বাচন-শক্তি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সাধারণত, নির্বাচনের দুটি দিক ও প্রক্রিয়া আছে। যাঁরা গল্পের শেষ পর্যন্ত গোড়ায় কল্পনা করে লেখেন, তাঁদের পক্ষে অবান্তরের পরিত্যাগ খুব কঠিন নয়, তাঁদের রীতিতে শক্ত কাজ শুরু হয় তার পর, অর্থাৎ ঘটনার যাথার্থ্য ও তাৎপর্যকে পরিষ্কার করা থেকে। এর সার্থকতা নির্ভর করে ভাষার কৃতিত্বে ও বুদ্ধিবিচারের পরিমাণের ওপর। আরেক ধরণের সাহিত্যিক আছেন যাঁদের আনন্দ গল্পের নিজের খেয়ালে অর্থাৎ গতিতে। এঁদের বেলা পরিত্যাগটা গৌণ, ভাষার দক্ষতা ও গতির মোড় ফেরাবার বুদ্ধিটাই মুখ্য। অবশ্য একজন সাহিত্যিকই দুই ধরণের গল্প লিখতে পারেন। প্রমথবাবুর গল্প একত্র পড়লে মনে হয় যে তিনি তাই পারেন। কিন্তু এখানে আমার বক্তব্য আছে। দু'ধরণের গল্পই তিনি ভেবে লেখেন, এবং সেইজন্যই দ্বিতীয় ধরণের গল্পে, যার প্রাণ হল খেয়াল, তাঁর কৃতিত্ব আরো বেশী। খেয়ালের স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা, অতর্কিত বিস্ময় থাকবে, অথচ গল্প অখণ্ড হবে, এর জন্য অতিরিক্ত সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন। গতি থাকা অগতির চেয়ে ভাল, কিন্তু পরিণতি না থাকলে কোনো খেয়ালই জমে না। দক্ষতার দিক থেকে ফরমায়েশী গল্প নীললোহিত, বীণাবাই, ঘোষালের সব কাহিনীই,

যেগুলির অর্থ ও মূল্য আদিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয় মনে হয়; যেগুলি ধাক্কা খেতে খেতে মোড় সামলাতে সামলাতে চিরনূতন রূপ নিচ্ছে, সেইগুলিই গল্পলেখকের কাছে প্রিয়তর হতে বাধ্য। প্রমথবাবু বার্গসঁর শিষ্য— ক্রিয়েটিভ এভল্যুশনের সাহিত্যিক প্রমাণ এই ঘোষাল মশাইতে দিয়েছেন। এমার্জেণ্ট এভল্যুশন লিখলাম না এই জন্য যে যদিও কোন্ খেয়ালে ঘোষাল গল্পকে কোন্ আঘাটায় পৌঁছে দেবে সেটি ঘোষালের নিজের কাছে এমন কি ঘোষালের মুরুব্বী জমিদার মশাইয়ের কাছেও অজ্ঞাত তবু সেটি ওপরকার জমিদার, অর্থাৎ গল্প-লেখক প্রমথবাবুর কাছে গুপ্ত নয়। খামখেয়ালের ওভার-লর্ড— রাজাধিরাজ — হলেন আর্টিষ্ট। ছোট গল্পে এই প্রকার মুক্তপুরুষের সৃষ্টি ভারতবর্ষে স্বাধীনচেতার সৃষ্টির চেয়েও শক্ত। বঙ্কিম পেরেছিলেন কমলকান্ত, ঘোষাল তাঁরই পাশে বসবার দাবী রাখে, আফিমের বদলে হুইস্কী খেলে কি হয়! নির্বাচন-শক্তির ওপর সম্পূর্ণ দখল না থাকলে অনিয়ন্ত্রিত ঘটনার সমাবেশ ও অ-সাধারণ চরিত্রের সৃষ্টি অসম্ভব। পাকা ওস্তাদ রাগভ্রষ্টের আশঙ্কা জাগিয়ে রাগরূপ কেবল বজায় রাখেন না, ফুটিয়ে তোলেন। আর্টিষ্ট আত্মসমাহিত বলেই ক্ষণিক বিচ্যুতি তাঁর হস্তামলকবৎ। অন্য ধরণের গল্পের প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখলাম না, কারণ যেখানে পূর্ব প্রতিভাস পরিণতির অনুকূল, যেমন বড়বাবুর বড় দিন, আহুতি প্রভৃতিতে।

অন্য ভাষায়, প্রমথবাবু সচেতন আর্টিষ্ট। কিন্তু বুদ্ধিসর্বস্ব নন। বুদ্ধি-সর্বস্বদের রচনায় প্রাথমিক সহানুভূতি থাকে না, যেমন সমারসেট মমের গল্পে নেই। কিন্তু প্রমথবাবু গল্পের সব চরিত্রকে স্নেহচক্ষে দেখেছেন, কেবল শিতিকণ্ঠ ঠাকুর ও জমিদার বাড়ির বুড়ো অকর্মণ্য আমলাকেই নয়, আন্দামান ফেরৎ অন্ধ জালিয়াত, লোটন-ঝোটনকেও। প্রগাঢ় সহানুভূতি না থাকলে বৃদ্ধ অধ্যাপকের নবীনা ছাত্রীর প্রতি ক্ষণিক দুর্বলতা হাস্যকর হত, এবং মধ্যবিত্তের বাড়ির সালঙ্করা বধু-কন্যা পাথরের মূর্তির মতন খোদাই হত না। ঘোষালকে গভীর ভাল না বাসলে সে হত এ-যুগের গোপাল-ভাঁড়। শুষ্ক বুদ্ধির মন্তব্য গুণ্ডার হাতে ছোরা, প্রমথবাবুর হাতে সেটা পাকা খেলোয়াড়ের ছুরি খেলা, অর্থাৎ আঁচড় কেটেই খাপে ঢোকে। প্রমথবাবুর ঘটনাতে, মন্তব্যে যে ব্যঙ্গ ও শ্লেষ থাকে তাতে যন্ত্রণা দেয় না, জলুনি ধরায়। অবশ্য আমরা বাঙ্গালীরা স্নেহ বলতে তেল-ঘিই বুঝি, তাই প্রমথবাবুর সংযত প্রয়োগকে নিছক বুদ্ধির না হয় আভিজাত্যের চিহ্ন ভাবি। পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন করা এ-দেশে শক্ত নয়; আমাদের নরম ধাতে যাঁর আবেদন পৌঁছেছে তাঁর

বই-ই বিক্রী হয়েছে।

কিন্তু যাঁরা নিজেকে সৎ রাখতে ব্যগ্র, পৃথক নয়, সৎ, যাঁরা সামাজিক পরিবেশ, মানুষের মনোভাব, ঘটনার পরিস্থিতিকে ভাগ্যবিধাতা না মেনে বিচার-বস্তু বিবেচনা করেন তাঁদের ভঙ্গী, তাঁদের রুচি ভিন্ন হতে বাধ্য। এটাকে বুর্জোয়া-সভ্যতার ব্যক্তিত্ববাদ বলে লাভ নেই— এটা পৌরুষ। এই পুরুষকার প্রমথবাবুর প্রতি রচনায় ব্যাপ্ত থাকে ; গল্পে প্রকাশ পায় অভিজাত-সম্প্রদায়ভুক্ত নায়কের প্রতি আন্তরিক টানে, পুরানো জমিদার-গৃহিণীর দর্পে, যারা গরীব হয়েও মাথা তুলে রেখেছে, যারা ঝড়-ঝাপটায় ভাঙবে তবু মচকাবে না। যে-মানুষ, যে-বাঙালী বিপদের মধ্যেও লড়ে যাচ্ছে সে-ব্যক্তি যে কোনোদিন প্রমথবাবুর গল্পের নায়ক হতে পারেন। এই প্রকার দৃঢ়চিত্তের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা কতখানি তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, কতটা সামাজিক তার বিচার করব না, তবে ঘাড় বাঁকা, গোঁয়ার খামখেয়ালী ইয়ারের প্রতি দুর্বলতা থাকা পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাভাবিক। এবং পরাধীনতা, কেবল পলিটিক্যাল পরাধীনতা নয়, চিন্তার, সমাজের, আর্থিক পরাধীনতা প্রমথবাবুর কাছে বিষবৎ। সে যাই হোক, এই প্রকার পৌরুষভাব প্রমথবাবুর সাহিত্যিক সৎ-বুদ্ধি ও সংযমের, নির্বাচন-শক্তি ও বৈচিত্র্য-জ্ঞানের পরিচয় দেয়। গণতন্ত্রে মানুষ যদি মনুষ্যত্ব না হারায় তবে প্রমথবাবুর গল্পের খাতির ক্ষুণ্ণ হবে না।

পূর্বোক্ত গুণাবলীর রাসায়নিক সমাবেশে যে-ভাষা তৈরী হয় বাঙালীরা তার নাম রেখেছে বীরবলী ভাষা। অর্থাৎ বীরবলী ভাষা হল প্রমথবাবুর প্রযুক্ত চৈতন্য। সে সম্বন্ধে গালাগালি হয়েছে বিস্তর, আলোচনা হয়েছে স্বল্প। তা হোক, লোকে স্বীকার করেছে সে ভাষাকে, তাই যথেষ্ট। প্রমথবাবুর গল্প পড়তে পড়তে আমার মনে হল যে বীরবলী ভাষা প্রবন্ধে উপযোগী, কিন্তু ছোট গল্পে অনিবার্য। প্রধান কারণ এই : ছোট গল্প কেবল ছোট ও গল্প হলেই সার্থক হয় না, তার ছোটাও চাই ; এবং ছোটবার জন্য কোঁচানো ধুতি পাঞ্জাবীর পরিবর্তে শর্ট ও শার্টই সুবিধার। ভাষা যদি অযথা বিশেষণে, উপসর্গ ও কৃ ধাতুর নাগপাশে আটকে যায় তবে গতি ও পরিণতি রুদ্ধ হতে বাধ্য। কি অদ্ভুত কৌশলে, অথচ কত সহজে কৃ ধাতুর ও অনাবশ্যক বিশেষণের ব্যবহার প্রমথবাবু পরিত্যাগ করেন দেখলে আশ্চর্য লাগে। প্রমথবাবুর হাতে মুখের বর্ণনা বিশেষ করে লক্ষ্য করবার জিনিষ। টানা চোখ, টিকলো নাক আর পাৎলা ঠোঁট সকলেই লিখতে পারে, কিন্তু টানা, টিকলো ও পাৎলা শব্দ বাদ দিয়ে ঐ রকম নাক, মুখ ও চোখের বর্ণনা এবং তাদের

অধিকারীর জীবন্ত স্বরূপ প্রকট করা কত শক্ত তা একবার লেখকবৃন্দ নিজেরা চেষ্টা করলেই বুঝবেন। আমার বক্তব্য এই যে বীরবলী ভাষাতেই সে বর্ণনা খানিকটা সম্ভব, পুরোটার জন্য অবশ্য প্রমথবাবুর প্রতিভার প্রয়োজন। এত কথা লেখবার উদ্দেশ্য এই যে বাঙ্গালী গল্পলেখক ঘটনাকে করায়ত্ত করতে পারেন না বলেই বিশেষণের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, সেইজন্য গল্প বর্ণনাবহুল হয়; এবং গতি সম্বন্ধে একপ্রকার অচেতন ব'লে কৃ-ধাতুর অপব্যবহারে জড়িয়ে পড়েন, ফলে কথোপকথন দীর্ঘ ও অবান্তর হয়। প্রমথবাবুর গল্পে বর্ণনা ও কথোপকথন একটুও অতিরিক্ত নয়, যতটা পরিণতির জন্য দরকার, যতটা গতিকে সাহায্য করে তার অধিক ব্যবহারে তিনি কৃপণ।

পূর্বোক্ত মন্তব্যের অর্থ এ নয় যে প্রমথবাবুর ভাষাভঙ্গী একই ধরণের। বিষয়বোধে-বুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে সেটি অসম্ভব। উদ্দেশ্য অনুসারে প্রমথবাবুর ভাষা কখনও হাল্‌কা, কাটাকাটা, যেমন চার-ইয়ারের কথোপকথনে, কখনও গাঢ়সম্বদ্ধ, যেমন আহুতিতে। যেখানে আব্‌হাওয়া তৈরী করা প্রয়োজন সেখানে বীরবলী ভাষা এক কঠিন ছন্দে বেঁধে যায়। আকাশে বাতাসে থম্‌-থমে ভাবের বর্ণনা ও গূঢ় ট্রাজেডীর ইঙ্গিত দেওয়া ভীষণ শক্ত। সমুদ্রের মুখে, পদ্মার বুকে ষ্টীমার যাত্রীর কাছে নিসর্গের বর্ণনা পডতে পড়তে শঙ্কায় পাঠকের দম বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীকান্তের প্রথম খণ্ডের শ্মশানের অতুলনীয় বর্ণনার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। শরৎবাবুর কৌশল সেখানে ভিন্ন, রাজলক্ষ্মীর প্রতীক্ষা, শ্মশানের শঙ্কাময় নিজস্ব প্রতিবেশ, এবং পরিচিত গদ্যরীতি তাঁকে সাহায্য করেছে। প্রমথবাবুর সেপ্রকার বিষয়-সহযোগ নেই, বরঞ্চ প্রতিকূল ষ্টীমার যাত্রীরা নিতান্তই সহুরে এবং র‍্যাশনলিষ্ট; অতএব প্রথম শ্রেণীর ডেক্‌ থেকে আকাশের ভ্রূণ-কম্পনটি মাত্র ছয়-সাত লাইনে, বিশেষণ-বর্জ্জিত, তথাকথিত মৌখিক ভাষায় প্রকাশ করা ও সহুরে পাঠক-পাঠিকার বুক কাঁপানো বীরবলী ভাষার চরম সার্থকতা, প্রমথবাবর আর্টের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিশেষণ ত্যাগ তখনই সম্ভব যখন বিশেষ্য যথার্থ, ক্রিয়াপদ গতিদ্যোতক, এবং বাক্য অর্থবাহী। ভাষা, বিষয় ও লেখকের সংযম ও নির্বাচন-বুদ্ধির রাজযোটকই আর্ট। যেমন প্রবন্ধে, তেমনই ছোট গল্পে প্রমথবাবু প্রকৃত আর্টিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি

ভারতবর্ষের জীবনধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এতই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁর প্রতিভা এতই সর্বতোমুখী যে রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর দান মূল্যবান হওয়াটাই স্বাভাবিক। গান, প্রবন্ধ, বক্তৃতার সাহায্যে স্বদেশী-যুগের আগে থেকেই দেশবাসীকে তিনি প্রবুদ্ধ কোরে এসেছেন। মাতৃভাষার সাধনা ও নানা উপায়ে ভারতবর্ষের মহান আদর্শকে জীবন্ত ও পরিপুষ্ট করার তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াসও আমাদের অবিদিত নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী মনোযোগ দিয়ে পড়ে আমার প্রতীতি জন্মেছে যে সাহিত্য, সঙ্গীত, অন্যান্য চারুকলা কিংবা দর্শনের গণ্ডীতে তাঁকে আবদ্ধ রাখা অন্যায়। এতে তাঁর সম্পূর্ণতাকে এবং নিজেদের বিচারবুদ্ধিকে খর্ব করা হয়। সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি কলাবহির্ভূত বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত ভারতবর্ষকে আরো স্পষ্টভাবে জানাবার সময় এসেছে। আজ নানা কারণে আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক চিন্তায় ও কর্মে সঙ্কীর্ণতা এসেছে, অথচ ভারতবর্ষে এমন কোনো ক্ষণ আসেনি যখন তার নিয়তি এতটা নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল বিশ্বের সাথে। আমাদের অন্তত: চিন্তাপ্রবাহকে যুক্ত ও পূর্ণ করার একটি সদুপায় হল রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি সম্পর্কে বক্তব্যের প্রসার। বর্তমান প্রবন্ধে আমি স্বল্প কথায় সেই বক্তব্যের মাত্র মূলসূত্রের নির্দেশ করব।

ও দেশে যাকে পলিটিক্স বলে তার পিছনে রয়েছে একটি বড় ধারণা এবং একটি সার্বিক ব্যবহার। মানুষ যেখানে মানুষ হিসেবেই গণ্য, সেখানকার রাষ্ট্রপদ্ধতি মানুষের দাবী মেনে চলতে বাধ্য। দাবীর প্রকাশ সমবেত কর্মে, তাই রাষ্ট্রিক ব্যবহার জনগণেরই সাথে। জনগণের প্রত্যেকে দাবী প্রকাশ করতে যেকালে অসমর্থ তখন প্রতিনিধিত্ব এসে পড়ে। ক্রমে প্রতিনিধিবর্গ দূরে সরে যান, স্বার্থসর্বস্ব হন, রাষ্ট্র-প্রত্যয় কল্পিত হয়। যোগটি কিন্তু কখনও একেবারে ছিন্ন হয় না তার পূর্বেই জনগণ আপন অধিকার জানিয়ে দেয়। ভারতবর্ষের অবস্থা ভিন্ন। গ্রামাতীত শাসনপদ্ধতির ওপর সমবেত মানুষের মানুষ হিসেবে সাধারণ দাবী-দাওয়া কখনও ছিল না— না হিন্দু-যুগে, না মুসলমানদের সময়। অন্য ভাষায়, 'স্টেট', আমাদের হয়নি। এল ইংরেজ, বণিক হিসেবে, পরে ইংরেজ-অধিকারের রূপ-পরিবর্তন হল, পেলাম সাক্ষাৎ

আমলাতন্ত্রের। এ-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষীয় রাজনীতির সঙ্গে হবস্, লক্, রুসো, হেগেল, গ্রীন প্রভৃতির রাজনৈতিক মতবাদের তুলনা নিরর্থক। এই জন্যই আবার ভারতীয় রাজনীতির বিচার সমাজপদ্ধতির বিচারের সঙ্গে জোড়া হতে বাধ্য। রাজনীতির আলোচনায় তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের দারিদ্র্যের, আমাদের বিড়ম্বনার জন্য আমাদের সমাজের দিকেই দৃষ্টিপাত করেছেন, তার অন্যায়কেই প্রধানত দায়ী করেছেন। তাঁর কল্পিত রাষ্ট্র সমাজেরই বিকাশ।

সমাজ বলতে তিনি মানুষের গতিশীল, জীবন্ত সম্বন্ধই বোঝেন। অনেকের মতে আমাদের সমাজের গূঢ়তত্ত্ব হল 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরোধর্ম্ম ভয়াবহ।' রবীন্দ্রনাথ এ-কথা মানেন না। মানুষ যেকালে শব নয়, চিত্তবৃত্তিও যেকালে চলিষ্ণু, তখন পরধর্মকে বরণ করার দুঃসাহসে তিনি শ্রদ্ধাবান। সম্বন্ধ অপ্রাকৃত নয়, ব্যক্তি-নির্বিশেষও নয়। সম্বন্ধ প্রধানত সমবেত; অর্থাৎ আদান-প্রদানের, দাবী-দাওয়ার, শক্তি-প্রসারের এবং অগ্রস্থিতির প্রেরণার। সমবায় যন্ত্রের আকার ধারণ করে যখন ব্যক্তিকে গ্রাস করতে উদ্যত, তিনি তীব্রভাবে তার ভিত্তি ও উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করান। এই সময় তাঁর মতামত ব্যক্তিত্ববাদের মতন শোনায়। কিন্তু এগুলি সীমার কথা। ইতিমধ্যে, তিনি সমবায়ী।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'সংস্কারক' নন। তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস এই যে সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোরই বেশী। লোকহিতের মধ্যে কৃপা আছে, লৌকিক যোগ নেই। যোগ আসে নিজের গরজে। শক্তির সঙ্গে শক্তির লেনদেন হলেই কারবারটা সত্য হয়, যেমন হয়েছে বিদেশে বণিকে-শ্রমিকে। অবশ্য লৌকিক যোগের নানা উপায়ের মধ্যে একটি হল শিক্ষা— ডিগ্রী পাওয়ার শিক্ষা নয়, মনুষ্যত্বে দাবী পেশ করবার শিক্ষা, অতএব মাতৃভাষায় শিক্ষা। দেশাত্মবোধ তাই হল লৌকিক যোগস্থাপন, সমবেত আস্তিকতার সাধনা। মাত্র পরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সাধনা নয়। নিজের ঔদাসীন্য ও নৈষ্কর্ম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রয়াস। অর্থাৎ, চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনই প্রথম, তার প্রক্রিয়াই হল স্বাধীনতার প্রথম যোগ।

রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের সঙ্গে জাতীয়তা-বাদের (ন্যাশনলিজম্) পার্থক্য অনেক। তিনি দেশমাতাকে বন্দনা করেই চরিতার্থ নন, জনগণ-মনের জাগ্রত অবস্থাই তাঁর কাম্য। এই প্রকার আত্মপ্রতিষ্ঠ সমাজের স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে। তার বিস্তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। বিশ্বের সঙ্গে শক্তিশালীর স্বেচ্ছাকৃত সম্বন্ধ স্থাপনই হল তাঁর স্বাধীনতার স্বভাব, অর্থাৎ পরিণতি। ভিক্ষাপাত্রের ঝুলি খদ্দরের হলেও তাঁর কাছে সম্মান পায় না। খদ্দরে

আত্মসম্মান জ্ঞান এনেছে, ভয় ভেঙেছে, মনের নাস্তিকতা দূর হয়েছে, তাই খদ্দরধারী তাঁর নমস্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে ডোমিনিয়ন স্টেটাস কিংবা ওয়েস্টমিনিস্টার স্ট্যাটুটের কোনো অর্থই নেই।

ইংরেজের কাছে ভারতের ঋণ স্বীকার করতে তাই বলে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। ইংরেজ শাসনকে কিংবা ইংলণ্ড-ভারতবর্ষের সম্বন্ধকে ভগবানের আশীর্বাদ অথবা তাঁর গূঢ় ইচ্ছার পূরণ হিসেবে তিনি অবশ্য ভাবেন না। ভারতে ইংরেজ এসেছিল য়ুরোপের চিত্তদূত রূপে, তার মনুষ্যত্ব ও বিজ্ঞান-বোধ নিয়ে। য়ুরোপীয় সত্যসন্ধানের সততায় ও ন্যায় আদর্শের সর্বভূমিনতায় ইংরেজী সভ্যতা হল বড়। তাই তার প্রভাব ভারতবর্ষের অন্য অতিথিদের প্রভাব অপেক্ষা ব্যাপক ও গ্রাহ্য। কিন্তু দেখা গেল ভারতে ইংরেজ শাসন, তার 'ল' ও অর্ডার' য়ুরোপীয় সভ্যতাকে খর্ব করলে, যে মশাল আলো দিয়েছিল সে আগুনও জ্বালালে, বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের সামঞ্জস্যে বাধা দিলে। এই উদ্ধত, বর্বর, লোভী, অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদকে 'বিনিপাত' বলে রবীন্দ্রনাথ যখন অভিসম্পাত দেন তখন হিব্রু প্রফেটদের কথাই স্মরণ হয়। "যে দুঃখী, যে অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহ গর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেই দিনই বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠ সম্পদকে শেষকড়া পর্যন্ত হারিয়ে দেউলে হোলো। তারপর আসুক কল্পান্ত।" সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে তাঁর প্রধান আপত্তি মনুষ্যত্ব সম্পর্কে। যে-আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের প্রাণবস্তু হল জাতির সক্রিয় আত্মসম্মান তারও হন্তা এই সাম্রাজ্যপ্রসার।

কিন্তু জাতিরও দায়িত্ব প্রবল। প্রত্যেক সভ্যতার পরিণত দায়িত্ব সমগ্র মানবের প্রতি। তার বিস্মরণ অমার্জনীয়। সে-দায়িত্ব ভুলে, আজ যদি ভারতবর্ষ তালই ঠোকে, বুকই ফোলায় তবে নির্মমভাবে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দেন এই মিথ্যার আড়ম্বরটুকু। মহাত্মাজী তাঁকে Sentinel on the Watchtower বলেছেন। বর্ণনাটি নঙর্থক। সদর্থের দিক হল আন্তরিক সাধনার, আত্মশক্তি উদ্বোধনের, চিত্তশুদ্ধির আবশ্যিকতার উপদেশ, সমবেত প্রচেষ্টার সাহায্যে লৌকিক যোগসূত্র স্থাপনের বাণী। গজদন্তের চোরা কুটরী থেকে যে সাবধান আসে সেটা বিলাস মাত্র; জাতীয় উদ্যমে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন প্রাণবত্তা ও আত্মপরীক্ষা। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরে তিনি এই কথাই বুঝিয়ে আসছেন যে অধিকার থেকে রক্ষিত হবার দুঃখভার ভারতবাসীর পক্ষে তেমন বোঝা নয় যেমন বোঝা নিজের হাতে চাপান, মুঠোয় ধরা আবেদন

আর নিবেদনের থালার। বলা বাহুল্য, আজ যদি সত্যের পূর্ণতর আহ্বানে সে থালা ছুঁড়ে ফেলে দিতে যায় তবে সে-ব্যগ্রতার মূলে থাকবেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেই সঙ্গে বোঝা নামাবার সময় যদি সে আত্মবিস্মৃত হয়, ক্ষণিক উন্মাদনায় সংযম, প্রত্যয়, প্রতিষ্ঠা হারায় তবে বাঙ্গালী হলেও সে তিরস্কার পায়। এবং পেয়েওছে।

পূর্ণতর আহ্বান ; অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি সংস্কৃতি-প্রধান। সংস্কৃতি মনুষ্যত্বের। সংস্কৃতির ছক্ ভারতবর্ষের, যার একটা বিশেষ রূপ তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। রূপটি বিশেষ, কিন্তু পৃথক নয়, অতএব পার্থক্যে গর্বিত নয়। বিশ্বচিত্ত উদ্বোধনের প্রভাতে জাতীয় প্রচেষ্টায় সার্বজনীন কোনো বাণী না থাকলে তাতে দীনতাই প্রকাশ পায়। "আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা"— এই হল মহাসৃষ্টির ডাক, যেটি আমাদের মরমে না পৌঁছলে সঙ্কীর্ণতা ঘুচবে না, স্বাধীন হলেও ভারতবর্ষ ঐতিহাসিক বর্বরতার পুনরাবৃত্তিই করবে। রাশিয়া ও চীন এ ডাক শুনেছে, জাপান এখন বধির। ভারতবর্ষ কি রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনবে ?

গান্ধী-স্মৃতি

আজ ঠিক ছ'মাস হোলো মহাত্মাজীর মৃত্যুর পর। খবরের কাগজে, মাসিক পত্রিকায়, খানকয়েক ছবি, গোটাকয়েক প্রবন্ধ, মধ্যে মধ্যে অন্য রচনায় উল্লেখ, এবং স্মৃতিরক্ষার চাঁদা তোলার বিবৃতি ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কেন, সাধারণ আগ্রহেরই কোনো নিদর্শন চোখে আর পড়ছে না। মধ্যে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সফর করলাম, নানা লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনো, কথাবার্তা হোলো, কিন্তু তাঁর অবর্তমানটা দেশের পক্ষে 'সদ্‌ভাবাত্মক' মনে হোলো না। তাঁর প্রভাব তাঁর অভাবে কার্যকরী হয়ে উঠেছে এমন প্রমাণ কই? ব্যাপারটা অতিশয় বিস্ময়কর, কারণ ইতিহাসে এমন ব্যাপক প্রভাবের তুলনা মেলে না। কোনো মহাজনের মৃত্যুসম্বাদে মানুষ মরেছে বলে ত' জানি না। দেশে এখনও বহু কংগ্রেসকর্মী বিদ্যমান, এবং তাঁদের অনেকেরই জীবন বলতে যা কিছু বোঝায় সবই প্রায় মহাত্মাজীর আশীর্বাদে। অস্থি-নিমজ্জনের দৃশ্য যে দেখেছে সে কখনও ভাবতে পারেনি যে অত শীঘ্র মহাত্মাজী আমাদের চেতনা থেকে অবসর নেবেন। কেন এমন হল?

একটা উত্তর: এমনই হয়, এই জীবনের রীতি। সূর্য ওঠে, ডোবে, আত্মীয় মরে, নতুন আত্মীয় জন্মায়। মহাত্মাজীই নিজে লিখেছেন তাঁর পিতার এক ঘরে মৃত্যুর সময় একই বাড়ির অন্য ঘরে তিনি কি অবস্থায় ছিলেন। মানুষ মৃত্যুকে ভুলতে চায়, এবং যদিও তার মনে হয় ভোলা বুঝি কখনও যাবে না; তবু সে ভোলে। জীবনই মৃত্যুকে মারে, এই স্বাভাবিক।

তবু এই উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারি না। কারণ, সব আত্মীয়ের মৃত্যুই একটা দাগা দিয়ে যায়। আমাদের অজানিতে বেদনা জেগে ওঠে। যখন মন অশান্ত, শান্তির ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে না, তখন হয়ত মৃত ব্যক্তির একটি ছোট্ট কথা ভেসে ওঠে, চোখে জল ভরে যায়, লজ্জায় জল মুছে ফেলে, খানিকটা শুদ্ধ হয়ে, মানুষ আবার উঠে বসে। হয়ত বহু অপরিচিত ভারতবাসীর অবস্থা এই রকমই হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু? কিন্তু দুঃখটা হয়েছিল সমগ্র দেশের, সাধারণের, জনগণের এবং ধনীর, নেতার, সরকারী কর্মচারী অর্থাৎ সকলের। সকলের মনে কি আজ মহাত্মাজীর স্মৃতি ভেসে উঠেছে? তাই যদি হত তবে ধনিকতন্ত্র অমন নিরঙ্কুশ চিত্তে আপন কাজ চালাতে পারত

না। স্বাধীন ভারতের সরকার বাহাদুর অমন নিশ্চিন্ত মনে পরাধীন ভারতের শাসন পদ্ধতি অনুকরণ করতেন না, বড় বড় কর্মচারী বেশী কর্মঠ হতেন, ঘুষ কমত, বেইমানী যেতো। তা ঘটেনি যখন, তখন কি সন্দেহ করা অন্যায় হবে যে দেশের মানসপটে এমন কোনো দাগ পড়েনি যার বেদনাময় স্মৃতি আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ করেছে? হয়ত, পরে, আরো পরে, আমরা তাঁর অভাব মর্মে মর্মে বুঝব। কিন্তু কবে? যে ক্রান্তির ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষ যাচ্ছে তার চেয়ে বড ক্রান্তি আর কি হতে পারে?

অবশ্য মারপিট বন্ধ হয়েছে। সেটা খানিকটা আপনা থেকেই হত। দাঙ্গা-হাঙ্গামার একটা লয় থাকে, ঢেউয়ের মত ওঠে পড়ে, আসে যায়। বাইরে একটা শান্তি নিশ্চয়ই এসেছে। হিন্দু মুসলমান খানিকটা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে। অনেক হিন্দু লাহোর থেকে ফিরে এসেছে। ঢাকায় হিন্দুরা রাত্রে বেড়ায় শুনলাম। এ অঞ্চলে অন্ততঃ মুসলমানরা অনেক দিন থেকেই নিরাপদ। লক্ষ্ণৌয়ে একদিনের জন্যও কোনো পক্ষের আশঙ্কার কারণ ঘটেনি। ট্রেনে চড়তেও লোক ভয় পাচ্ছে না আজকাল। এগুলো শুভ লক্ষণ নিশ্চয়; এবং সেজন্য দায়ীও মহাত্মাজী।

কিন্তু, দায়ী মহাত্মাজী, না মহাত্মাজীর মৃত্যু? তাও কেবল মৃত্যু কি, না ঐ ধরণের হিন্দুর হাতে মৃত্যু, এবং সেইজন্য লজ্জা, এবং লজ্জার জড়তায় নিষ্ক্রিয়তা? আমার প্রথমে মনে হত যে এটা এক রকমের শক্-থেরাপী হলো, এখন যেন সন্দেহ হয় যে তা নয়; বরঞ্চ যেটা হলো সেটা লজ্জা, এক রকমের পাপবোধ, ইংরেজীতে যাকে সেন্স্ অব্ গীল্ট্ বলে। ঠিক খৃষ্টানী পাপ নয়, আরো আদিম, ঈডিপাস্-এর পাপ। অবশ্য ঈডিপাস্ দুঃখে নিজের চোখ উপড়ে ফেলেছিল, এবং আমরা তা করিনি। কিন্তু ফল যেন একই হচ্ছে—অন্ধত্ব। থিবীস্-এর অরাজকতা এসেছে দেশে। তা ছাড়াও প্রশ্ন ওঠে সত্যিই কি ঘৃণা কমেছে? ঘৃণার পরিমাণ দণ্ড নেই জানি তবু যেন মনে হয় কমেনি। বিষটা এখন ঘুমুচ্ছে, না হয় অন্য দিকে কাজ করছে।

এই ঘৃণার দিকপরিবর্তন ভারি মজার ব্যাপার। নাৎসী জার্মানীতে, ঘৃণা শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল উৎকৃষ্ট। তার সমাচার অনেকেই জানেন। ইংলণ্ডেও "হেট্ দি হুন্" সাময়িক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল আজকাল জানা গেছে। রাশিয়াতেও ঘৃণাশিক্ষার আয়োজন ছিল যথেষ্ট। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে বস্তুটি মোটেই ছিল না বলব না। অসুর, পাষণ্ড, নেড়ে, ম্লেচ্ছ, যবন ইতর প্রভৃতি কথার ইতিহাসই তার সাক্ষ্য। নালন্দার প্রস্তরমূর্তিতে হিন্দু-বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক

ঘৃণার সক্রিয় নিদর্শন মেলে। তবে বেশী সক্রিয় হতে পারেনি নিশ্চয়, যদিও এই স্বল্প ঘৃণাকে সমভাব নাম দিতে আমি অন্ততঃ নারাজ। হিন্দুরা সেদিন পর্যন্ত পতিত জাতি ও মুসলমানকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছে। কৃপার সঙ্গে অবজ্ঞা বরাবরই খাপ মেশে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই অবজ্ঞা অন্য ধারে রইল। আমরা বলতে সুরু করলাম, ইংরেজ তথা য়ুরোপীয়ান জাতি ঘোর জড়বাদী, তারা সেদিন পর্যন্ত অসভ্য ছিল, তারা মদ্য মাংস লোভী, বিলাসী, তাদের মেয়েরা অসচ্চরিত্র, আরো কত কি। আমার বেশ মনে আছে যে গোলদীঘির বক্তা শ্বেতজাতিকে ধবল-কুষ্ঠ রোগী আখ্যা দিয়ে হাততালি পেতেন। আমাদের সন্ত্রাসবাদীরা দেশাত্মবোধের মধ্যে বেশ খানিকটা ব্যক্তিগত ঘৃণার সঞ্চার করেছিলেন। এই ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় কিন্তু ইংরেজ নিজ হাতে লিখলেন। তাঁরা ঘৃণার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন অন্তরের দিকে। তাঁদের মুসলমানপ্রীতি সুরু হোলো, মুসলমানের কৃষ্টির প্রতি নজর পড়ল, তাদের চাকরী বেশী দেওয়া হোলো, পৃথক ব্যবস্থা সর্বত্র, ভোটেই প্রধানতঃ। কিন্তু ওস্তাদের মার শেষের দিকে। ১৯৪২ সালে যখন দেশবাসী অত্যাচারের বিপক্ষে ক্ষেপে উঠেছিল তখন ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে বন্ধুত্ব রাখা হয়ে উঠেছিল শক্ত। ভালো ইংরেজ মুখ তুলে কথা কইতে পারত না আমাদের বৈঠকখানায়; আমরাও লজ্জিত হয়ে বলতাম, আমাদের রাগ ব্যক্তিগত নয়, অনুষ্ঠানের ওপর। কিন্তু এই অনুষ্ঠানই 'স্বাধীনতা' দিয়ে আমাদের জনপ্রিয় হয়ে উঠল। বি, বি, সি'র দিল্লী করেসপণ্ডেন্ট কতবার বলেছেন, ইংরেজের খাতির এখন খুব বেশী। যেই পঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড সুরু হোলো অমনই আমরা ইংরেজের ভক্ত না হই দরদী হয়ে উঠলাম। ষ্টার্লিঙ ব্যালান্সের নতুন বন্দোবস্ত, হাভানার বন্দোবস্ত, লাটসাহেব নির্বাচন, তাঁর জনপ্রিয়তা, ইংরেজের নতুন চাকরী,— এসব মনে করলে সত্যই ইংরেজকে বাহাদুরী দিতে হয়। সেই সঙ্গে মনে হয়, সম্ভবতঃ আমাদের ভাব-জীবন নিতান্তই পরের হাতে, ঠিক বুদ্ধিজীবনেরই মতন; আমরা কেবল মনে দাস নই ভাবেও দাস। আরো মনে হয়, বোধ হয় বা মানুষের ঘৃণার শক্তি পরিমিত। মধ্যবিত্ত সংসারের গৃহিণী যেমন স্বল্প ব্যয়ে খাড়া বড়ি খোড়ের পরিবর্তে খোড় বড়ি খাড়ার সরঞ্জাম করেন, আমরাও বোধ হয় ঘৃণা, ভালোবাসা প্রভৃতি ভাবের বণ্টন করি নিতান্ত কৃপণের মতন, সীমার মধ্যে। তার প্রমাণ এই; হিন্দু মুসলমানের ঘৃণা যেই কমছে অমনিই কম্যুনিজমের প্রতি ঘৃণার মাত্রা বাড়ছে। অর্থাৎ ঘৃণাটা চাই-ই আমাদের; পরন্ত ছিল ইংরেজের বিপক্ষে;

কাল হোলো মুসলমানের বিপক্ষে ; আর আজ ছুটছে কম্যুনিষ্ট পার্টির বিপক্ষে। আমরা সত্যই মিতব্যয়ী। স্বল্প মূলধনের দোষই এই ; বুদ্ধির দাসত্বের, ভাবের দাসত্বের এই প্রথা।

এইখানেই আসে মহাত্মাজীর স্মৃতি। একদিক থেকে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল এই ; ঘৃণায় শক্তির অপচয় হয়, তাই মন থেকে ঘৃণা দূর করলে শক্তি বৃদ্ধি পায় ; ফলে সমবেত সৃষ্টির সুযোগ ও ক্ষমতা বেড়ে চলে। তাঁর ধর্ম ছিল এই ধরণের মর‍্যাল ইকনমি। জীবনের শেষ দিকে জাতীয় শক্তি অপচয়ের বিপক্ষেই মাথা তুলেছিলেন। দাঙ্গাহাঙ্গামায়, অশান্তিতে, রক্তপাতে জাগ্রত শক্তি ক্ষয় পাচ্ছে দেখে তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়েছিল। গত দুই মাসে সেই ক্ষয়ের পরিমাণ মোটামুটি বেড়েই চলেছে, প্রপাত ধারায় না হলেও, আরো সূক্ষ্মভাবে, এবং বহু ধারায়। বিষফোড়ার মুখ ছোট হয়েছে, কিন্তু মুখের সংখ্যা বেড়েছে। সেটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নিশ্চয় নয়। এই এক বছরের ওপর আমি বহু শ্রমিক বহু মালিকের সঙ্গে কথা কয়েছি— পরস্পরের সম্বন্ধে এমন তিক্ত মনোভাব কখনও দেখিনি। কংগ্রেস সরকারের বিপক্ষে যা মন্তব্য শুনেছি তা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। একাধিক অত্যন্ত ভদ্র, সাধুপ্রকৃতির কংগ্রেসকর্মীরা পর্যন্ত বলেছেন যে "সাধারণ কংগ্রেসম্যান দুর্গন্ধ ছড়ায়"। কংগ্রেস সরকার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে নিতান্ত অবজ্ঞার চোখে দেখেন—এ কথাটি নিদারুণ সত্য। সাধারণ কম্যুনিষ্ট নিজের দল ছাড়া অন্য প্রত্যেক পার্টির সভ্যকে ঘৃণা করছে। সোশিয়ালিষ্টদেরও তাই দশা। বাঙলা দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করা হলো। কারণ কি ? কম্যুনিষ্টরা সরকারকে কাজ করতে দিচ্ছে না, সব সরকারী চেষ্টা ভেঙ্গে দিচ্ছে জোর করে। আমি বাঙলা দেশের খবর জানি না, কারণ দু বৎসর যাই নি। ধরে নিচ্ছি যে সরকারী অজুহাত ধ্রুবসত্য। শক্তির অপচয় ঘটতে দেওয়া অন্যায় নিশ্চয়। নিশ্চয় কোনো সরকার সেটা বরদাস্ত করতে পারেন না। আরো তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি যে এক একটি কম্যুনিষ্ট বিষকুম্ভ। কিন্তু সেই সঙ্গে বলি, মহাত্মাজী কি এই উপায়ে, অর্থাৎ বিষের ওষুধ বিষ দিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে জয় করতে চেয়েছিলেন ? বে-আইনী করে দেওয়ার মধ্যে একটা ইকনমি নিশ্চয় আছে— কিন্তু সেটা আর কিছু হোক মর‍্যাল ইকনমি নয়। মহাত্মাজীর উপায় ছিল অন্য। তিনিও কম্যুনিজম ও কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরোধী ছিলেন। জাতীয় শক্তির প্রকৃতি, তার বৃদ্ধির উপায় তিনি অনেকের চেয়ে বেশী বুঝতেন বলেই কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতি ব্যবহার ছিল তাঁর ভিন্ন। তিনি অন্ততপক্ষে অন্য যে

কোনো কংগ্রেস কর্মীর চেয়ে দেশকে কম ভালবাসতেন না। তাও যদি না মানা হয় তবে সুভাষ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটাই ঘুরিয়ে বলব, after all, Gandhiji was also a patriot। অন্ততঃ এটুকু স্বীকার করতে আশা করি আমাদের সরকারের বাধা হবে না। মাত্র ছ'মাস হল তিনি গত হয়েছেন।

হাঁ, অত শীঘ্র আমরা মহাত্মাজীকে ভুললাম কেন তার আরেকটি উত্তর এই হতে পারে যে আমাদের মনে প্রাণে কর্মে তাঁর প্রভাব গভীর ও ব্যাপক মোটেই ছিলনা। উত্তরটি মানতে হলে স্বীকার করতে হয় আমাদের কপটতাকে। সেটা যে মানা খুব শক্ত তাও নয়, কারণ আমরা অনেকেই তাঁর নামটাই ব্যবহার করেছি; তাঁর প্রতি ভক্তিটাকে নিজের স্বার্থে খাটিয়েছি বেশী সুদে, কারণ, আমাদের অনেকেরই ধারণা ছিল যে মহাত্মাজীর বাণী মানবের পক্ষে নয়, অতিমানবের জন্য। এই সব মনে রাখলে কপটতাকে খানিকটা বোঝা যায়। অবশ্য এটা লজ্জার বিষয়, কিন্তু অস্বাভাবিক রকমের উঁচু পর্দায় কতদিনই বা বাঁধা থাকতে পারে মানুষে! প্রকৃতি যেমন উর্দ্ধগামী তেমনই আবার অধোগামীও' বটে! তা ছাড়া, স্বার্থসিদ্ধির একটা রীতি আছে যেটা নীতির সঙ্গে এক কদমে খানিকটা চলতে পারে, তারপর নীতি পিছিয়ে পড়বেই, যদি না ও যতক্ষণ না নতুন শ্রেণী নতুন নীতির চাহিদা তোলে। এসব বোঝা যায়। তবুও খিচ্ থাকে। কেন আমরা তবে শোকে মুহ্যমান হয়েছিলাম ঐ পনের দিন? সেটা কি কেবল প্রোপাগাণ্ডার জোরে? অবশ্য প্রোপাগাণ্ডা খুব জোরেই চলেছিল। তবু একটা কোথায় তলার দিকে সত্য ছিল নিশ্চয়। আমার নিজের কথাই ধরি। আমি গান্ধীভক্ত কখনও ছিলাম না। চিরটাকাল তাঁর প্রোগ্রামের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে এসেছি; তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে বিরক্ত হয়েছি; আমি কংগ্রেসের সভ্য নয়; কখনও খদ্দর পরিনি। তাঁর মৃত্যুর তিন চার দিন পরে আমার পরিবারে একটা দুর্ঘটনা হয় যার জন্য আমার চিন্তা, ভাবনা অন্য দিকে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। আমি কোনো শোকসভায় যোগদান করিনি; কেবল ইকনমিকস্, আর শ্রমিকের মজুরী ও মালিকের মুনাফা চর্চা করেছি। এই ছিল আমার শোক দূর করবার মন্ত্র। তবু আমার পা'য় তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছিল, ব্যক্তিগত ভাবনা পিছে হটে গিয়েছিল, গভীর রাত পর্যন্ত মহাত্মাজীর রচনা, বাইবেল, গীতা, কোরাণ পড়তাম, মিলিয়ে দেখতাম। অবশ্য শান্তি পাইনি; বই পড়ে মানুষে আরাম পায়, শান্তি পায়। আমার শোকে কোনো কপটতা ছিল না আমি জানি। এমনই অনেকেরই ছিল না, যেমন ছিল না আমার বৃদ্ধ মালির,

আমার বৃদ্ধ ধোবির, এবং আমার বিশ্বাস কুম্ভমেলার অসংখ্য লোকের, যারা হাজার বছর ধরে তীর্থ করে এসেছে, যারা অশিক্ষিত, যাদের দর্শন নেই অথচ ধর্ম আছে, যাদের ব্যক্তিত্ব নেই আছে আচার, যারা খালি গায়ে খালি পায়ে হাতে লাঠি নিয়ে, গ্রামের বুড়োবুড়ি সঙ্গে করে সঙ্গমে ডুব দিতে আসে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য, যারা ভগবান কি জানে না অথচ ভগবানকে মানে, তাঁর নিয়মে চলে। এই রকম কত ধর্মভীরু, কুসংস্করাচ্ছন্ন, অশিক্ষিত, গরীব সাধারণ ভারতবাসী তীর্থযাত্রীর শোক নিশ্চয়ই ছিল অকপট, আমার শোক প্রতিক্রিয়ার ফল হলেও। এদের চেহারা মহাত্মাজীর মতন— আমি স্বচক্ষে দেখেছি এই মিল। তবে কি মহাত্মাজীর প্রভাব কেবল তাদেরই ওপর, এবং সেটা কি এই কারণে যে তিনি ছিলেন তাদেরই একজন? সন্দেহ হয় বোধহয় এই ধারণাটিই ঠিক। তীর্থযাত্রীরাই ভারতীয় সংস্কৃতির মেরুদণ্ড, এবং গান্ধীজী ছিলেন সেই মেরুদণ্ডের পরিণতি, অর্থাৎ মস্তিষ্ক। তারা ঘৃণা করে না; তাদের শক্তির অপচয় ঘটেনি। যদিও অপব্যবহারে সেটা শুকিয়ে গেছে। তারা মুসলমানকে-হিন্দুকে ভয় পায় না; তারা কম্যুনিজমকে ভয় পায় না; তাই তাদের হৃদয়ে বিদ্বেষ নেই; ওরকম কত ইজ্‌ম তাদের ওপর এসেছে গিয়েছে। বৌদ্ধধর্ম না হয় এক প্রকারের হিন্দুধর্ম ছিল, কিন্তু ইসলাম ধর্মের ঝড়েও তারা থুবড়ী খেয়ে মাটিতে লুটোয় নি। আজ ভারতের ইতিহাসে নতুন জীবন এসেছে গুজোব শুনেছি। কিন্তু নতুন জীবন মানে কি ঘৃণার বিষয়, নতুন জুজুবুড়ি? অত ঘৃণা কিসের, অত ভয় কিসের? মহাত্মাজীর হৃদয়ে ঘৃণা ছিল না, তিনি ছিলেন নির্ভীক।

শুভচিহ্ন ?

কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর আমি কলকাতায় গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে আসি। নতুন সাহিত্য, নতুন গান আর পুরাতন আগ্রহে নতুন আলোচনা পড়ে-শুনে একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়। লক্ষ্ণৌ ফিরে যাবার মুখে সেই ধারণাগুলি গুছিয়ে লেখবার তাগিদ আসে। লিখতেই হয়। কিন্তু সময়ের অভাবে আমার ধারণাগুলিকে একটা সমগ্র-চিন্তার নক্সাতে পরিণত করতে পারি না। তাছাড়া, হতাশার মোহ বাড়িয়ে তো কোন্ লাভ নেই। এই সব নানা কারণে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমার যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এবার বোশেখ মাসে দেশে ফেরবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল, ভাবলাম, বাংলা দেশ ও সাহিত্যের জড় থেকে কিছু রস আহরণ করব। অনেক সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রকরের সঙ্গে কথাবার্তা হল। সদ্য প্রকাশিত কবিতা, নভেল, প্রবন্ধ আর কিছু গুরুগম্ভীর তত্ত্বালোচনাও পড়লাম। এবার আমার মনে ধারণা জন্মেছে যে বোধ হয় বা বাংলা সংস্কৃতির অবস্থার উন্নতি হয়েছে। অন্ততপক্ষে হতাশার চেয়ে আশার চিহ্নই বেশি চোখে পড়ল। সেই শুভচিহ্নগুলির ইঙ্গিত দিচ্ছি।

কবিপক্ষ সমাপ্ত হবার পর আমি কলকাতায় আসি। তখনো রবীন্দ্রোৎসব চলছে। শুনলাম, একা কলকাতা শহরেই চার-পাঁচ শ' সভা ও বৈঠক বসেছিল। তার মধ্যে একটি সাহিত্য-আসরে উপস্থিত ছিলাম, বাকী অন্য উৎসবের রিপোর্ট খবরের কাগজে ও মাসিক পত্রিকায় পড়েছি। অনেক মাসিক পত্রিকা বিশেষ রবীন্দ্র-সংখ্যা প্রকাশ করেছে। 'দক্ষিণী'র রবীন্দ্রসঙ্গীত উৎসবে আমি তিনদিন উপস্থিত ছিলাম। রবীন্দ্র উৎসবের সর্বজনপ্রিয়তার নানা কারণ নিশ্চয়ই আছে। প্রধান কারণ আমার মনে হল এই যে, এখন এমন কোন জীবিত বাঙালী নেই যাঁকে ধরে আমাদের আত্মসম্মান বাড়তে পারে। অবশ্য, বারোয়ারি প্রবৃত্তি রয়েছে। শহরবাসী একটু হুজুগেই হবে। কিন্তু এও চোখে পড়লো যে ফিল্ম কিংবা ফুটবলের ম্যাচ দেখবার জন্য যত ভিড় হয়, রবীন্দ্রোৎসবের জন্য আগ্রহ ও ভিড় তার চেয়ে কম নয়। এই থেকে কি প্রমাণ হয় না যে দেশের মূল্যজ্ঞান এখনও লোপ পায়নি? কয়েক বৎসর পূর্বে কিন্তু আমার তাই সন্দেহ হয়েছিল।

আমি শুনলাম যে কবির মুখে কবিতা শোনবার জন্যও অজস্র লোক সমবেত হয় এবং ধৈর্য ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। লক্ষ্ণৌ, দিল্লী অঞ্চলে এইটেই স্বাভাবিক। সেখানে 'মুশায়রা' ও 'কবি সম্মেলন' এক অদ্ভুত ব্যাপার। সেখানে উপস্থিত না হলে, ফরাসের উপর পা মুড়ে পাঁচ-ছ ঘণ্টা না বসে থাকতে পারলে বোঝা যায় না রবীন্দ্রনাথ হিন্দী-উর্দু সাহিত্যে না জন্মালেও হিন্দী-উর্দু কবিতা ঐ অঞ্চলের লোকেদের কতটা সমবেত প্রাণের সামগ্রী। মুশায়রার সময় কবি এক একটি লাইন আবৃত্তি করে, শ্রোতৃমণ্ডলী তারি ধুয়ো ধরে এবং প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে কবিকে বলে : 'আবার বলো', 'আবার বলো'। ফলে সমগ্র কবিতাটিই সকলের মুখস্থ হয়ে যায়। সমষ্টিগত আবৃত্তি অত্যন্ত উৎসাহজনক। ফলে, ঐ অঞ্চলে, বিশেষত মুসলমানরা, কথায়-কথায় নিতান্ত উপযোগী কবিতা প্রয়োগ করতে পারে। বাংলা দেশে এই প্রকার ঐতিহ্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কলকাতা শহরে আমাদের সময় থেকেই। রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রায় কিংবা শান্তিনিকেতনে কবিতা পড়েছেন আর আমরা নীরবে শুনছি ; বাহবা দেবারও সাহস থাকত না, অথচ, বাঙালীর স্বভাব খুব সংযত কখনোই নয়। তবু এই রীতিই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরা কবিতা পড়িতে সঙ্কোচ বোধ করতেন এবং এখনো করেন। সমবেত উপভোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে বাংলা কবিতার ছন্দ ও ভাবধারা কতটা ব্যক্তিগত, গোপন ও গুহ্য হয়েছে সেটা ভাববার জিনিস। কবিতা পাঠের ফলে আমার বিশ্বাস বাংলা কবিতার রূপ ও বিষয় কিছু না কিছু বদলাবেই।

এই সূত্রে শুনলাম, একদল কাব্যামোদী যুবক রাস্তার মোড়ে নতুন কবিতা পড়ে শোনাতেন। এই প্রচেষ্টা কতটা সফল হয়েছিল জানি না। কিন্তু আমি জানি বিদেশে এই রকম চেষ্টা চলেছে এবং অন্তত ইংল্যাণ্ডে উচ্চ সঙ্গীতের ব্যাপারে অদ্ভুত কার্যকরী হয়েছে। রাশিয়াতে পার্ক অব কালচার ও কালেকটিভ ফার্মে এই ধরনের কবিতাপাঠ হয়। কেবল তাই নয়, শ্রোতারা তাদের মতামত স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে। বাংলা দেশে এতটা সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু চেষ্টাটি যে শুভ সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কবিতা সম্পর্কে আমি অন্তত দুটি প্রকাশকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সিগনেট প্রেস সত্যই বাংলা সাহিত্যের উপকার করছেন। তাঁদের রুচি তাঁদের প্রকাশিত বইতেই বর্তমান। নাভানাও এই বিষয়ে ক্রমে প্রথম শ্রেণীর প্রকাশক হয়ে উঠছেন। শুনলাম, তাঁরা উভয়ে কবিদের রীতিমত সম্মান-দক্ষিণা দেন। আমার মনে হয়, প্রকাশন ব্যবসায়ে বাংলা দেশ এই প্রথম পদক্ষেপ করল। আরো দু'-

একটি প্রকাশকের বই হাতে এলো। মোটামুটি এটি খুব সুখের কথা। সাহিত্যেরও একটা অর্থনৈতিক দিক আছে। এতদিন আমরা সেটা ভুলে ছিলাম, এখন যাই হোক স্মরণ করছি।

খানদশেক নতুন কবিতার বই পড়লাম। তাদের মধ্যে প্রায় অনেক কবিতাই ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় পড়েছিলাম। বই-এর আকারে পেয়ে কবিদের বিশেষত্ব একটু যেন ফুটে উঠল। বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু না বলে মোটামুটি ধারণাগুলিই বলতে চাই। অবশ্য নতুন কবিতা অর্থে নতুন কবির রচনা নয়, কারণ, এই দশ জন কবির মধ্যে ছয়-সাত জন ইতিমধ্যেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন। আঙ্গিকের উন্নতি ও সংশোধন ভিন্ন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা'র নতুন সংস্করণ ও 'সংবর্তে' তাঁর নতুন চিন্তাধারার লক্ষণ নেই, এবং তা না থাকবারই কথা। বিষ্ণু দে'র 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পদাবলী' সমন্ধেও সেই কথাই খাটে। এঁদের বিশেষত্ব অটুট রয়েছে, কেবল যেন সংযমের চিহ্ন একটু বেশি। বিশেষতঃ সুধীন্দ্রনাথের। প্রথম সংস্করণের 'অর্কেস্ট্রায়' যে সব দুর্বল লাইন ছিল সেগুলো তিনি নির্মমভাবে কেটে ছেটে দিয়েছেন। এতে তাঁর intellectual honesty প্রমাণ হয়। কবিতায় এই ধরনের technical puritanism তিনি ফরাসী কবিদের কাছ থেকে পেয়েছেন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে বহু ক্ষেত্রেই তাঁর সংশোধন কবিতার দিক থেকেও সফল হয়েছে। তবু যেন অভ্যাসের দোষেই মনে হয় যে গোটাকতক লাইন তিনি না সংশোধন করলেই পারতেন। সেগুলি আমাদের অবচেতনার মধ্যে বসবাস করছিল। 'সংবর্ত'-এর সংবর্ত নামে কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা মনে হল।

তাছাড়া অন্যান্য কবিদেরও আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতনতা সুস্পষ্ট। উচ্চাঙ্গের কবিতা হয়তো এরা তেমন লেখেন নি, কিন্তু কোন কবিতাতেই ছন্দের ত্রুটি ঘটে নি। এখন বোধ হয় অপাঠ্য কবিতা লেখা বাঙালীর পক্ষে দুঃসাধ্য— এটা কম কথা নয়। সেজন্য অবশ্য রবীন্দ্রনাথই প্রধানত দায়ী। এখনো যে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ছন্দের চর্বিতচর্বণ হচ্ছে না তা বলছি না। তবু কোথায় যেন স্বাধীনতার প্রয়াস চলছে। গীতিধর্মী কবিতার ছক রবীন্দ্রনাথ এমনই দৃঢ়ভাবে বেঁধে দিয়ে গেছেন যে তার থেকে মুক্তি পাওয়া কিংবা তার ওপরে কিছু লেখা প্রায় অসাধ্য। সেইজন্য লিরিক কবিতা লেখবার সময়ও আধুনিক কবিরা গীতাংশের মৌলিক ধারাবাহিকতা ও অপরিপূর্ণতাকে টুকরো টুকরো ইমেজ-এর সাহায্যে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছেন। একাজ অবশ্য গত বিশ বছর

ধরেই চলেছে। জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে এই কার্যে অগ্রণী ছিলেন। তাঁদের পূর্বেকার লেখায় কিন্তু ইমেজগুলি এত পৃথক ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াত যার ফলে সাধারণ পাঠকের অভিজ্ঞতায় তারা সমন্বিত হত না। ইমেজগুলির মধ্যে এত ফাঁক থাকত যে পাঠকের মন সহজে লাফাতে পারত না। কেবলমাত্র পণ্ডিত ও অতিশয় সূক্ষ্মরুচির পাঠকই সেই ফাঁক ভরাতে সক্ষম হতেন। এখন দেখছি, ফাঁকগুলি যেন ভরে উঠছে— অধীত বিদ্যার সাহায্যে নয়, ইমেজারির আপন বেগে, তারি বর্ণালিসম্পাতে। অবশ্য ইমেজগুলি এখনও 'সিম্বল'-এ পরিণত হয় নি। যেদিন হবে, সেদিন বাংলা কবিতার সুদিন।

আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় লক্ষণ মনে হল, তার সমাজ-চেতনা। মার্ক্সপন্থী সাহিত্যিকেরা বাংলা সাহিত্যে এই সমাজ-চেতনা এনেছিলেন কিছুকাল পূর্বে। পথ-প্রদর্শকের উগ্রতা স্বাভাবিক। সেই উগ্রতা এখন কমেছে, যার ফলে যাঁরা মার্ক্সপন্থী নন তাঁরাও অবলীলাক্রমে সমাজ-চেতনাকে গ্রহণ করতে পেরেছেন। তথাকথিত মার্ক্সিস্ট সাহিত্য প্রায়ই অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হত। এখনো যে ভাবপ্রবণতা নেই তা বলছি না। এখনও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুঃখ-কষ্ট, হা-হুতাশ রয়েছে, তবু যেন ভাবের দিকটা ভারী হচ্ছে। অবশ্য, এই ভাবের মধ্যে মোটামুটি যাকে দর্শন বলে, তা নেই। ভূয়োদর্শন না থাকলে আমার বিশ্বাস বড় কবি হওয়া যায় না। আমাদের আধুনিক কবিরা মহাকবি নন, সেই প্রাণশক্তির প্রসার ও ভূয়োদর্শন তাঁদের নেই। মনে হয় সেটা তৈরি করবার আকাঙ্ক্ষা থাকলে ভাল হত। আমি এমন কোন আকাঙ্ক্ষা কিন্তু নতুন কবিদের মধ্যে লক্ষ্য করি নি। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের সার্থকতা রবীন্দ্রনাথের ভূয়োদর্শন ভিন্ন অন্য ভূয়োদর্শনেতেই। মার্ক্সিস্ট সাহিত্যিকেরা একবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু কোথায় যেন মার্ক্সিজম-এর বুদ্ধি বিচার— তার rationality-র সঙ্গে গীতধর্মী কাব্যের বিরোধ রয়েছে। হয়তো আমার ধারণা ভুল এবং আমার সন্দেহ অন্যায়। তবু আমার সন্দেহটি থেকেই যায়। যদি কবিতার ছন্দ ও শৈলী গদ্যধর্মী হতে থাকে তবেই বোধ হয় এই বিরোধ অবসানের সুবিধা হবে। তার লক্ষণও কিছু দেখলাম, তবে এটা সময় ও কৃতিত্ব সাপেক্ষ। আপাতত মার্ক্সিজম্-এর rational scheme-এর পরিবর্তে জনসাধারণের সহজ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসেও খানিকটা অগ্রসর হওয়া যায়; কিন্তু সেইজন্যও আধুনিক কবিতার রূপ ও ভাব অনেকখানি বদলাতে হবে।

অবশ্য, Spontaneity of people's efforts-এর বিশ্বাসের মধ্যে বিপদ আছে। এই সম্পর্কে লেনিন ও রোজা লাক্সেমবুর্গের বাদ-প্রতিবাদ অনেকেই

জানেন। একপ্রকার অস্পষ্ট সমাজ-চেতনা এককালে আমাদের অনেক নভেলিস্টের মধ্যেই ছিল। কিন্তু সেটা তাঁদের হাতে ভাবোল্লাসের নামান্তর হয়েছিল। কল্লোলের লেখকদের কথা স্মরণ হচ্ছে। শৈলজানন্দ, প্রেমেন মিত্র ও ননী ঘটকের নভেলেতে একটা অস্পষ্ট রকমের ধারণা যে ছিল না, তা নয়। কিন্তু বিশ্লেষণের অভাবে সে ধারণা চেতনাতে পরিবর্তিত হয় নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'তেও এই পরিবর্তনের অভাব। তাঁদের সমাজ সম্পর্কে ধারণায় কোন রকম ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ছিল না, যেজন্য এখন সে সব নভেল পড়ে আর সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প পড়লাম। আমি তাঁর গল্পের ভক্ত। তৎসত্ত্বেও এবার পড়বার সময় মনে হল যে শরৎচন্দ্রের থেকে কোথাও তাঁর গল্প এগোতে পারেনি, তার কারণ শরৎবাবুরও সমাজ-চিন্তায় বিশ্লেষণের অভাব ছিল। যুদ্ধের সময় অন্য এক রকমের সমাজ-চিন্তার চেষ্টা হয়, মার্ক্সিস্ট ধরনের। তারও কোন সাহিত্যিক ফসল ফলল না। আমি তখনো বলতাম এবং এখনো বলি যে ভারতীয় মার্ক্সিস্টদের সমাজ-চেতনা পূর্বেকার সমাজবোধের চেয়ে অগ্রসর হলেও যথেষ্ট বাস্তব ছিল না। তাঁরা শ্রেণী-বিরোধের ফর্মুলা দিয়েই বুঝতে চেষ্টা করতেন, অথচ দেশের সমাজটা কী তাঁরা জানতেন না। এখন অবশ্য, অন্তত বাংলা দেশে, সমাজের নতুন পরিবর্তন সুরু হয়েছে। আমার মনে হয় বাংলা দেশের social mobility-র হার অত্যন্ত বেশি, যার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠনে একটা ভীষণ পরিবর্তন চলছে। এই দ্রুত social mobility-র জ্ঞানটা জনসাধারণের সহজ সৃষ্টিশক্তিতে বিশ্বাসের দুর্বলতাকে খানিকটা খণ্ডন করতে পারে। একাজ কেউ করছেন কিনা জানিনা, কারণ নতুন নভেল আমি বেশি পড়বার অবকাশ পাই নি।

আর একটি উপায়ে ঐ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সেটা শহর ও গ্রামের বিরোধ জ্ঞানে। প্রেমেন প্রভৃতিরা শহরের আশপাশের slum সম্বন্ধে লিখতেন। তাঁরা ভাবতেন, শহরের slumগুলিই দেশ! অবশ্য বস্তীর ভেতর দিয়ে শহর-গ্রামের বিরোধ খানিকটা দেখা যায় নিশ্চয়, কিন্তু বিরোধের কার্য-কারণের মূল সূত্রটি বস্তী ছাড়িয়ে সমগ্র সমাজেই ব্যাপ্ত থাকে। সেই ব্যাপ্তির সঙ্গে পূর্বোক্ত social mobility-র নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। যদি এই সম্বন্ধগুলিকে কোন rational উপায়ে বুঝতে চেষ্টা করা যায় তাহলে মার্ক্সিস্ট বিশ্লেষণের সাহায্য নিতে হবে। অবশ্য বর্তমান এ্যামেরিকান সাহিত্যে এই বিরোধ নিয়ে মার্ক্সিস্ট বিশ্লেষণকে আশ্রয় না করেও অনেক ভালো নভেল লেখা হচ্ছে।

আমাদের নভেলিষ্টরা যদি মার্ক্সিজমকে এড়িয়ে চলতে চান তবে এই ধরনের এ্যামেরিকান নভেলের আঙ্গিক বুঝেসুঝে দেখুন না কেন? আমার মোদ্দা কথা এই যে, বাংলা সমাজের তীব্র mboility-র অন্তরে একটা তীব্র বিরোধ রয়েছে। সেই বিরোধের চেতনা সমাজ-চেতনার একটি প্রধান অঙ্গ। অবশ্য চেতনা থাকলেই যথেষ্ট হবে না। লিখতে জানা চাই, নচেৎ আধুনিক সোভিয়েট গল্প ও নভেলের মতই সবকিছু একঘেয়ে হয়ে উঠবে। 'পরিচয়'-এর কাছ থেকে আমি এই প্রকারের আলোচনা প্রত্যাশা করেছিলাম। এখন 'পরিচয়' প্রায় অপাঠ্য। অন্যান্য ছোট ছোট মাসিক পত্রিকায় এসম্বন্ধে কিছু আলোচনা পড়েছি। কিন্তু নিতান্ত বিক্ষিপ্তভাবে সেই আলোচনা চলছে।

এইখানে একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না। ইয়োরোপীযান সাহিত্যে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সাহিত্যিকরা বামপন্থী হয়ে ওঠেন, আমরা সকলেই জানি। নানা কারণে, যার জন্যে অনেকের মতে স্ট্যালিনিজম্ দায়ী, সেই যাত্রায় বাধা ঘটে। গত যুদ্ধের প্রারম্ভে একটা বিপরীত গতির সূচনা হয়। যুদ্ধ যখন ঘোরতর হয়ে উঠল তখন ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে ও এ্যামেরিকায় একটা অন্তর্মুখিতার বেগ দেখা গেল। ইয়োরোপীয় সভ্যতা বিনষ্ট হয়েছে যতই লোকে বলুক না কেন, তার মধ্যে Christianity' ছক এখনও বর্তমান, বিশেষত রোমান ক্যাথলিসিজম্-এর জন্য। তাই একটা ধর্মপ্রাণ কবিতা ও সাহিত্যের ছক এল। সময় সময় আমার মনে প্রশ্ন ওঠে যে আমাদের দেশে ধর্মপ্রাণ কবিতা, ধর্মগত নভেল, (যেমন গ্রাহাম গ্রীন, মরিয়াক প্রভৃতির) এবং ধর্মাধীন সমাজ-চেতনায় প্রবুদ্ধ রচনা কেন হল না? অবশ্য তার একটা কারণ এই যে হিন্দুধর্মের মধ্যে এমন কোন dogma নেই যেটাকে সামনে রেখে কিংবা পেছনেও রেখে মার্ক্সিস্ট dogma-র সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়। তবু হিন্দু সমাজ বলে একটা জিনিস ধ্বংসের মধ্যেও রয়েছে। কয়জন বাঙালী কবি কিংবা নভেলিষ্ট কিংবা প্রবন্ধকার কিংবা চিন্তাশীল ব্যক্তি এই হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান জানি না। এটা বললে কি খুব ভুল বলা হবে যে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অবাস্তবতার অন্তত একটা কারণ এই ক্ষয়িষ্ণু অথচ বাস্তব হিন্দু সমাজের সঙ্গে অপরিচয়? বলা বাহুল্য, আমি হিন্দু মহাসভা কিংবা রামরাজ্য পরিষদের সভ্য নই। আমার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী একেবারেই অন্য ধরনের। তবু সমাজ-চেতনা যদি বাস্তব অবস্থাকে অবজ্ঞা করে তবে প্রগতিশীল সাহিত্য ধর্‌তাই বুলির সমষ্টি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য

এই অবাস্তবতা বাংলা সাহিত্যের পুরাতন বন্ধু, তাই আফ্‌শোষ করে আর লাভ নেই। আমি মাত্র এইটুকুন বলি যে হিন্দু দর্শন, হিন্দু ন্যায়, হিন্দু নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে বিস্তর মালমশ্‌লা আছে যাকে সাহিত্যে আনা যায়। 'হিন্দু' কথাটি আমি কোন সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করছি না, ভারতীয় সভ্যতা ও চিন্তাধারার মূল কাণ্ড হিসাবেই ধরছি। আশা করি আমার এই মন্তব্যকে কেউ ভুল বুঝবেন না। আমি অন্য সাহিত্যে কি হয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যে কি হয় নি তারই তুলনা করছি মাত্র। অচিন্ত্যকুমারের 'পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ'কে আমি ধর্মসাহিত্য তো নয়ই, এমনকি ধর্মাশ্রিত সাহিত্যও বলতে পারি না। এর মধ্যে ধর্ম আমি খুঁজে পাই নি এবং সাহিত্যাংশ নিতান্ত কম। এমিল লাড্‌ভিগ-এর অনুকরণে সাহিত্য হয় না।

গদ্য সাহিত্যের মধ্যে আমি মাত্র দু'খানি জনপ্রিয় নভেল ও তিন-চারখানি যাকে রম্যরচনা বলা হচ্ছে, তাই পড়লাম। বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম'-এর বিক্রী হচ্ছে। আমার জানিত পরিবারের একটি বিবাহে যৌতুকস্বরূপ তিন কপি এল। সামাজিক দিক থেকে এটি সত্যিই সুচিহ্ন। বইখানি পড়লাম। সামাজিক চিত্রপটটি বেশ বড় এবং মোটামুটি বইটি সুখপাঠ্য। কিন্তু তার বেশি আর কিছু পেলাম না। সামাজিক চিত্রের দিক থেকে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মপরিচয়' অনেক ভালো। অবশ্য 'সাহেব বিবি গোলাম' নভেল, সেইজন্য সামাজিক চিত্র ছাড়া চরিত্রাঙ্কণ প্রত্যাশা করাই সঙ্গত। দু'একটি চরিত্র যে ফোটেনি তা বলছিনা, কিন্তু এত আঁচড় কাটার কি দরকার ছিল? লেখকের এ বিষয়ে কোন সংযম নেই। আদত কথা, বিমল মিত্র মহাশয় আঙ্গিক সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

যে লেখক সমাজ-বিবর্তনের ধারার সাহায্যে চরিত্রের অভিব্যক্তি দেখাতে চান তাঁকে প্রধানত দুইটি বিষয়ে মনোযোগী হতে হয়। প্রথমত, কালের অতিপাত— যাকে Time Sequence বলে। এই অতিপাত রেখাগত (linear) না হলেও চলে। সময়ের টানা-পোড়েন সুচারু হলেই বুনট খাপি হয়, নচেৎ ফাঁক থেকে যায়, জট পাকিয়ে যায়। 'সাহেব বিবি গোলাম'-এ এরকম বহু জট চোখে পড়ল। জাঁ প্রক বা প্রুস্ত্‌-এর এই বিষয়ে আঙ্গিক চমৎকার। আমার সন্দেহ হয়, বিমলবাবু এই সম্বন্ধে না ভেবে-চিন্তেই লিখে গেছেন।

দ্বিতীয়টি হল : ঐ কালাতিপাতের সঙ্গে চরিত্রের অভিব্যক্তি। এ দুটিকে এক ঠাটে না হলেও অন্তত এক তালে চলতে হবে, নচেৎ তাল কেটে যাবে, চরিত্র পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। বহু স্থানে তাই হয়েছে।

অন্যান্য দোষ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু ভেবে-চিন্তে না লেখার দোষ এযুগে অমার্জনীয়। কলকাতা সমাজ সম্বন্ধে বিমলবাবু অনেক খবর জোগাড় করেছেন নিশ্চয়, কিন্তু তাছাড়াও সাহিত্যিকের অন্য কাজ আছে। এই যেমন: তাঁদেরকে সচেতন, সুচিন্তিত আঙ্গিকের সাহায্যে গ্রথিত করা।

অন্য নভেলটি একটি মহিলার রচনা। অতএব সে সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়। মোদ্দা কথা, বাংলা নভেল বাংলা কবিতার চেয়ে বিস্তর পিছনে পড়ে আছে।

যে রম্যরচনাগুলি পড়লাম তার মধ্যে কোনটাই আমার ভালো লাগল না। সৈয়দ মুজতবা আলি আজকাল যেন কাতুকুতু দিয়ে হাসাচ্ছেন। এককালে তাঁর রসিকতা অনেকখানি উৎরে যেত। এখন তা উৎরোয় না। রসিকতার চেয়ে বাচালতাই বেশি। আমি জীবনে যত কইয়ে-বলিয়ে আড্ডাবাজ লোকের সঙ্গ পেয়েছি তার মধ্যে সৈয়দকে আমি খুব উঁচু স্থানে রাখি। এতটা শ্রদ্ধা করি বলেই আমি এইটুকু বলতে সাহস পাচ্ছি। পরশুরামের 'কৃষ্ণকলি' একেবারেই জমেনি। এ বইখানি তাঁর সৃষ্টির পক্ষে অবান্তর। রানী চন্দের 'পূর্ণকুম্ভ' রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছে। তাঁর ভাষার আমি ঐকান্তিক ভক্ত। তাঁর স্ত্রী-সুলভ পর্যবেক্ষণশক্তি আমাকে মুগ্ধ করে। তবু যেন কোথায় আমার মনে অসন্তোষ রয়ে গেল। তিনি একজন গুণী চিত্রশিল্পী, তাঁর রেখাপাত চমৎকার, একত্রে দৃঢ় ও সাবলীল। 'পূর্ণকুম্ভে' কিন্তু সেই সংযমের অভাব মনে হল। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের লেখক হিসাবে বিমলাপ্রসাদের যশ তাঁর প্রাপ্য। তাঁর ভাষা স্বচ্ছল এবং দৃষ্টিভঙ্গীও রসালো। কিন্তু বর্তমান বিদেশী সাহিত্যে ঐ ধরনের ব্যক্তিগত রচনার ধাতুর পরিবর্তন হয়েছে। বিমলাপ্রসাদের রচনা এখন এমন একটি অবস্থায় এসেছে যেখানে মোড় ফেরাবার দরকার হয়েছে।

আমাদের সাহিত্যে এই কয় বৎসর যাবত রম্যরচনার একটা হুজুগ চলছে। আমার মতে এটি বাংলা সাহিত্যের পক্ষে মঙ্গলকর মোটেই নয়। এর মধ্যে সবচেয়ে দোষের কথা হল, চিন্তার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। অবশ্য বর্তমান সমাজে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা সাহিত্যিক হতে চান তাঁরা তো নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান ব্যক্তি। চিন্তা সম্পর্কে দায়িত্বহীনতা কি বুদ্ধিমানের চিহ্ন? লোকরঞ্জন করলে ঘরে টাকা আসে নিশ্চয়। কিন্তু ঠিক এই অজুহাতেই আমাদের ফিল্‌ম-এর এমন দুর্দশা। ফিল্‌ম-এতে, আমার বেশ মনে আছে, কিভাবে আমাদের রুচি নষ্ট হয়ে যায়। তারপর সেই নষ্টরুচিই জঘন্য ফিল্‌ম তৈরীর অজুহাত হল। রম্যরচনাতেও তাই হবে, আমার ভয় হয়।

এই বিষয়ে সকলের সতর্ক হওয়া উচিত।

সাহিত্য সম্পর্কে আর একটি শুভচিহ্নের উল্লেখ করছি। সেটি হল ছোট-ছোট ম্যাগাজিনের প্রসার। নিশ্চয় কারুরই বিক্রী বেশি নয়, কিন্তু প্রত্যেকটিতেই একটি না একটি প্রবন্ধ, একটি না একটি কবিতা থাকেই যা পড়ে মনে হয় যে বাংলার নতুন সাহিত্যিকরা একটা কিছু মূল্যের সন্ধানী হয়ে উঠেছেন। আমার পক্ষে মূল্য-সন্ধানের মূল্য যথেষ্ট। হয়তো খুব কম রচনাই সাহিত্যপদবাচ্য, তবু আন্তরিক সন্ধান তো বটে।

আমি জানি যে আমার বক্তব্য কত অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। ছোট গল্প, কিংবা ঐতিহাসিক কি দার্শনিক ও অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ রচনা সম্পর্ক আমি কিছু বলতে পারলাম না। তার প্রধান কারণ অবশ্য এই যে আমি অন্য কিছু পড়তে পারি না। কিন্তু সাহিত্যের বহির্ভূত একটি অদ্ভুত প্রয়াসের সঙ্গে আমার যৎসামান্য পরিচয় ঘটেছে। সেটি হল ১৯৫১ সালের ২৭ ভল্যুমের সেন্সাস। আমি মাত্র গোটা কয়েক ভল্যুমের পাতাই উল্টে গেছি। যদি কখনো দীর্ঘ অবসর পাই, তবে তার বিস্তারিত আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। প্রথম দর্শনে যা মনে হল তাই বলছি। আমার ধারণা যে এত বড় ঐ ধরনের কাজ গত পঞ্চাশ বংসরে আমাদের দেশে হয় নি এবং আগত পঞ্চাশ বৎসরে বহু গবেষণা ঐ ২৭টি ভল্যুমের আশ্রয়ে গড়ে উঠবে। বাংলার সরকার অনেক কিছু করেন নি, কিন্তু এই কাজটির জন্য পরবর্তী যুগের বহু ছাত্র ও পণ্ডিত বাংলা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। একে আমি বাংলা দেশের বিশ্বকোষ বলতে রাজী আছি। হযতো অনেক ব্যাপারে বিশ্লেষণ হয় নি কিংবা বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ রয়েছে। এও হতে পারে যে নানা বিষয়ে আরও অনেক তথ্য আমাদের সংগ্রহ করতে হবে, তবেই বাংলা দেশের পুরো ছকটি চোখে ভেসে উঠবে। কিন্তু কাজটা সত্যই monumental— বিরাট। শুনলাম যে জন আষ্টেক অখ্যাত ব্যক্তি এই কার্যে সেন্সাস কমিশনারকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে আমি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি। আমার বিশেষ আনন্দ হল এই খবর পেয়ে যে বাংলা দেশে এমন বহু লোক আছেন যাঁরা সুবিধা পেলে এই ধরনের উৎকৃষ্ট গবেষণা করতে পারেন। কিন্তু সেই সঙ্গে দুঃখও হল শুনে যে সেন্সাস অফিস উঠে গেছে এবং এমন কোন সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান নেই যার চারিধারে ঐ প্রকার অনুসন্ধিৎসু বাঙালীরা একত্রিত হতে পারেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। লোকমুখে যা শুনি তাতে ভরসা হয় না যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্সাস-এর কাজগুলিকে

চিরস্থায়ী করতে পারেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য-এর দপ্তরে আদম-সুমারীর কাজ স্থায়ী ছিল, দশ বৎসর অন্তর অন্তর হত না। উত্তর প্রদেশ সরকারের ডেভেলপ্‌মেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে-এর তরফ থেকে একটা প্রকাণ্ড Institute of Action Research খোলা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, সেই অনুষ্ঠানের সাহায্যে আমরা কিছু কাজ করতে পারব। বাংলা সরকারের কল্পনা কি এতই রিক্ত হয়েছে? শুভচিহ্নকে অনুষ্ঠানে পরিণত করা এই যুগে সরকারেরই কাজ। এই সম্পর্কে আর একটি কথা বলতে চাই। শুনলাম যে বাংলা দেশের ১৯৫১ সালের সেন্সাস-এর মতন বিরাট কীর্তি সম্পর্কে দৈনিক, সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক পত্রিকায় কোন রকম মন্তব্য বা টিকাটিপ্পনী হয়নি। যদি সত্য হয় তবে নিতান্তই লজ্জার কথা। শুনেছিলাম বাংলার প্রেস-এর intellectual আগ্রহ আছে; এখন দেখছি সেটা মিথ্যা গুজব।

সাহিত্য সম্পর্কে নতুন আগ্রহের কথা তো বেশ বুঝেছি। সঙ্গীতের বেলায়ও সেই আগ্রহ দেখলাম। প্রতিবেশীরা যে সারাদিন রেডিওতে গান শুনছেন সেটা অবশ্য আগ্রহের চিহ্ন নয়, অভদ্রতা ও সংসার থেকে অব্যাহতি পাবারই চিহ্ন। বহু লোকের কাছে শুনলাম যে শীতকালে যখন বাইরে থেকে বড় বড় সঙ্গীতশিল্পী আসেন তখন রাস্তায় তাঁদের গান শোনবার জন্য ভিড় জমে, এমনকি রাস্তার ওপর খবরের কাগজ বিছিয়ে হাজার হাজার লোকে সারারাত্রি গান শোনে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই প্রকৃত আগ্রহ আছে। কতটা সে আগ্রহ বিচারবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত জানি না। কিন্তু একথা ঠিক যে আমাদের ছেলেবয়সে, চল্লিশ বৎসর পূর্বে, কলকাতার ছাত্রের মধ্যে নিতান্ত অল্পসংখ্যক, বোধ হয় আট দশ জনের বেশি নয়, উচ্চসঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন তখন পুরিয়া-পুরবীর পার্থক্য যে বুঝতে পারত তাঁর খাতির ছিল খুব বেশি। এখন বহু শ্রোতা আছেন যাঁরা পুরিয়া— ধানশ্রী থেকে কোথায় মালিগৌরা তফাৎ বুঝতে পারেন। এইটে কম কথা নয়। কলকাতা শহরে আমার জানিত অন্তত চারটি উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের স্কুল ও কলেজ আছে। তাদের শিক্ষাপদ্ধতি বিচার করবার সুযোগ আমার হয় নি। হয়ত সেখানে ঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না, সুমিষ্ট গায়কই তৈরী হচ্ছে। লক্ষ্ণৌয়ে ঠিক উল্টো জিনিসটি হয়। সে যাই হোক ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরীর চর্চা যত হয় ততই মঙ্গল। বাঙালী সঙ্গীত-শিক্ষার্থী সাধারণত শ্রমবিমুখ; অল্প কয়েকটি রাগ শিখে তারা সভাসমিতিতে গাইতে সুরু করে; তাঁদের মধ্যে যাঁরা একটু কৃতী, তাঁরা সঙ্গীত-শিক্ষক হয়ে ওঠেন। ফলে সব ব্যাপারটাই ঢিলে হয়ে যায়। অত সস্তায় গান-

বাজনা শেখা হয়না, ওস্তাদ হওয়া তো দূরের কথা।

'দক্ষিণী'র কৃপায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হল। 'দক্ষিণী'র কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে তিনবার রবীন্দ্রসঙ্গীতের উৎসব করলেন। নানা দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও, মোটের ওপর উৎসবটি মনোজ্ঞ হয়েছিল। তবে দু একটি কথা এখানে না বলে থাকতে পারছি না। সুচিত্রা মিত্রের অভাব আমি অন্তত অনুভব করছিলাম। মাত্র একজন ছাড়া কেউই রবীন্দ্রনাথের ধ্রুবপদ্ধতির গান গাইতে পারলেন না। ধ্রুপদের জন্য কণ্ঠের যে সব গুণের প্রয়োজন তার সাক্ষাৎ পেলাম না। ধ্রুপদের মধ্যে একটি সরল মর্যাদাবোধের নিতান্ত প্রয়োজন। তারপর ধর্মসঙ্গীতও আমার পছন্দ হল না। জনকয়েক গায়িকা আমাদের সকলের মনোহরণ করেছিলেন। শ্রীরাজেশ্বরী দত্তের কণ্ঠ অপূর্ব, একসঙ্গে সুরেলা ও জোরালো। তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। শ্রীমঞ্জু গুপ্তার কণ্ঠ সুমিষ্ট, যে গানেতে একটু তান আছে সেই গানে তিনি সিদ্ধকণ্ঠ। গীতা ঘটকের গান আমি ইতিপূর্বে বহুবার শুনেছি, গত দুই তিন বৎসরে তিনি প্রভুত উন্নতি করেছেন। এরা প্রত্যেকেই গলা খুলে গান, গানের বিশেষ mood-টিকে ফুটিয়ে তোলেন আর শ্রোতার সঙ্গে অতি সহজে সম্বন্ধ স্থাপন করেন। পাকিস্তান থেকে দুটি মেয়ে চমৎকার গাইলেন। তাঁদের নিমন্ত্রণ করা খুবই সমীচীন হয়েছিল। যাঁদের নাম করতে পারলাম না তাঁরা যে ভালো গান নি তা বলছি না, তবে ঐ কজনই আমার মনে ছাপ রেখে গেছেন। রেডিওতে যে সব রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলাম সেগুলি আমার মোটেই ভালো লাগে নি, কেমন যেন কলের মত সকলে গাইছে। আমি রেডিওকে দোষ দিই না, দোষ দিই শিক্ষাপদ্ধতির। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষাপদ্ধতিতে অনেকগুলি দোষ বর্তাচ্ছে। জনসাধারণের মনেও যে এই প্রকার সন্দেহ উঠেছে তার প্রমাণ পেয়েছি। শুনলাম, দেশে একটা তর্ক উঠেছে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান্‌বিস্তার উচিত কিনা। এ তর্কটির বয়স অন্তত তিরিশ বৎসর। দিলীপকুমার রায় (আদিম ও অকৃত্রিম) একবার রবীন্দ্রনাথকে তাঁর 'সহসা ডালপালা তোর উতল কেন, ও চাঁপা ও করবী' এই বিখ্যাত বেহাগের গানটি নিজের খেয়ালে গেয়ে রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলেন। ডালপালার ওপর দিলীপকুমার এমন লম্ফ-ঝম্ফ করেছিলেন যে সে-কাজ শাখামৃগেরাই করতে পারে। যাই হোক, কবির সে রাত্রে ঘুম হয় নি। অবশ্য যদি কারো রবীন্দ্রনাথের আত্মার শান্তি ভঙ্গ করার উচ্চাশা থাকে, তবে অন্য কথা। তান প্রয়োগের চাহিদার মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি অপূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত আছে, অবশ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষত্ব সম্বন্ধে

অজ্ঞানতা কিংবা ঔদাসীন্যও এই চাহিদার মধ্যে লুকানো রয়েছে নিশ্চয়। এসব ব্যাপারের সমাধান তর্কে হয় না, কর্মে হয়।

যামিনী রায়ের বাড়ীতে তিন দিন যাই এবং তাঁর নতুন ছবিগুলি ঘরের মেজেতে শুয়ে দেখি। তিনি চ্যাটাই-মাদুরের ওপর ছবি আঁকছেন। যামিনী রায়ের চিত্রের অভিব্যক্তি এক অদ্ভুত ব্যাপার। সেটির আরম্ভ হয় পশ্চিমের ঘোলাটে মেঘ থেকে, আর পরিণতি হচ্ছে বাংলা দেশের মাটিতে। মাটি অবশ্য দেশের মাটি, তাই যামিনী রায় প্রকৃত বাঙালী চিত্রকর। প্রকৃত এইজন্যে যে এ-মাটির ওপর পশ্চিমী মেঘের জল পড়ে নি। কিন্তু তাই বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে না। মাটি সর্বদেশেই মাটি ; অবশ্য রাসায়নিক, ভূতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু নিজের বুকে মানুষের আত্মাকে আকর্ষণ করবার ক্রিয়াতে মাটি একটি সাধারণ শক্তি। এই সাধারণত্বের ওপর চিত্রিত চ্যাটাই বিছানো, চিত্রিত ঘট-পট বসানো, হাতী-ঘোড়া-মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সেইজন্য যামিনী রায়ের ছবির মধ্যে যেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করছে। তাঁর বৈষ্ণব, তাঁর নিসর্গ চিত্র— সবই খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, শিরদাঁড়া ঘাড়-মাথা খাড়া রেখে। যেখানে তিনি লঘুত্বের আভাস দেন সেখানেও মনে হয় যেন প্রকাণ্ড mass ঐ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকেই জয় করছে। ভোরের বেলা কলকাতার বহুদূরের গঙ্গাস্নানের পর যেমন দেহের ক্লান্তি দূর হয়, সব বোঝা যেমন ঝরে পড়ে— যামিনী রায়ের ছবি দেখে আমার তাই মনে হল। তাঁর ছবি উপভোগের জন্য চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। হাল্ ফ্যাশানের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে তিনি বনবাসী হন। এবার দেখলাম কলকাতা শহরে বসেই তিনি বনবাসী হয়েছেন। এটা নিশ্চয়ই শুভচিহ্ন।

একদিন গোপাল ঘোষের চিত্র প্রদর্শনী দেখতে যাই। তিনি অনেক নতুন ছবি এঁকেছেন, নানা রকমের পরীক্ষা করছেন। আগে তাঁর চিত্র রেখাপ্রধান ছিল, এবার দেখলাম রঙের দিকে তাঁর ঝোঁক বেশি হয়েছে। দু-একখানি চিত্র আমার খুব ভাল লাগল। কিন্তু এখনও তিনি পুরোপুরি সাহসভরে এগিয়ে চলতে পারছেন না। সেজন্য আমি দেশবাসীকেই দোষী করি। আমি যেদিন প্রদর্শনীতে যাই সেদিন গোপাল ঘোষ ছাড়া আর মাত্র দুজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, আমি আর আমার একটি বন্ধু। আমার মনে হয়, বাঙালীর চোখ এখনো খোলেনি।

এ বৎসর কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনয় দেখবার সুযোগ ঘটে নি। শুনেছিলাম, শিশিরবাবু আবার রঙ্গমঞ্চে নামবেন। আমার দুর্ভাগ্য

যে তিনি এখন স্থায়ীভাবেই অবসর নিয়েছেন। কিন্তু খানিকটা ক্ষতিপূরণ করলেন 'বহুরূপী' সম্প্রদায়। এঁদের সঙ্গে পুরাতন I. P. T. A.-র যখন যোগ ছিল তখন এঁদের অভিনীত দু' একটি নাটক দেখে মনে হয়েছিল যে বাংলা স্টেজে আবার একটি নতুন যুগ এল। তারপর I. P. T. A. গেল ঘুচে এবং কলকাতা শহরে বিশেষ কোন নতুন প্রয়াস দেখা গেল না। মধ্যে খবর পেয়েছিলাম যে ছোট ছোট বালক-বালিকা নিয়ে শ্রীমতী ঠাকুর তাদের উপযোগী নাটক যোজনা করছেন। খুব সুখ্যাতিও শুনলাম। আজ বোধ হয় এই বহুরূপী সম্প্রদায়ই চেরাগ জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁদের 'রক্তকরবী' দেখে খুশী হলাম। পূর্বাপর এঁদের বিষয় নির্বাচন দেখে মনে হয় যে এঁরা এমন একটা মধ্যস্থিত কেন্দ্রে পৌঁছুতে চেষ্টা করছেন যেখানে শিক্ষিত মার্জিত রুচির অবাস্তবতা থাকবে না এবং নিতান্ত বাস্তব জীবনের বিচ্ছিন্নতা আর স্থূলতাও থাকবে না, থাকবে শুধু মানুষের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে, আর সমবেত জীবনের চাহিদার সঙ্গে যোগ। চেষ্টাটা 'রক্তকরবী'র অভিনয়ে যে সর্বক্ষণ সার্থক হয়েছিল তা বলছি না। তবু, আমি 'বহুরূপী'র দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। রবীন্দ্রনাটকে, আমরা সকলেই জানি, নায়ক নায়িকারা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই কথা কয়। বলা বাহুল্য, এই ভাষা এত কাব্যময় যে তা থেকে নাটকত্ব নিঙ্‌ড়ে বার করা প্রায় দুঃসাধ্য, বিশেষত, নাটকীয় মুহূর্তে অসাধ্য। এবং সেজন্যই প্রধানত, আমরা রবীন্দ্রনাটককে 'সিম্বলিক' প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি। আমার বহুদিন থেকে এই ধারণা আছে যে রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে যথার্থ নাটকত্ব আছে। তবে যে-সে সে ফোটাতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের নিজের তত্ত্বাবধানে যেসব নাটক অভিনীত হয়েছিল সেখানে অবশ্য নানা কারণে, প্রধানত গানের জন্য, লিরিক অংশটাই বেশী ফুটে উঠত। সেই ধারাটাই আমরা মেনে নিয়েছিলুম। কিন্তু পরে দেখা গেল যে ঐ অংশটুকুই রবীন্দ্রনাটকের সর্বাংশ নয়। আমাকে অন্তত শিশিরবাবু এই কথাটি প্রথম বুঝিয়ে দেন 'রাজা ও রাণী' নাটকে। 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' অবশ্য একটু অন্য ধরনের জিনিস। বই-এর আকারে পড়লে তার নাটকত্বের চেয়ে সিম্বলিজম্‌-এর দিকেই বেশি নজর পড়ে। 'বহুরূপী'র অভিনয়ে নাটকত্ব চমৎকার ফুটে উঠেছিল, অথচ সিম্বলটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নি। এই কার্যে বাহাদুরি আছে। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের উপমাবহুল ভাষাকে, যাকে ইংরেজীতে put across করা বলে, তাইতে এবং দ্বিতীয়ত, যান্ত্রিক সভ্যতার অমানুষিকতার বিপক্ষে সুন্দর (নন্দিনী) ও সাধারণ মানুষের (ফাগুয়া) বিদ্রোহকে নির্দেশ দানে।

অনেকে হয়ত এই নির্দেশকে বলবেন প্রপ্যাগাণ্ডা, কিন্তু আজকাল তো এমন মানুষ দেখি না যে যান্ত্রিক সভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে বরণ করেছেন। অতএব আমার বিশ্বাস, ঐ নির্দেশেতে কোন প্রপ্যাগাণ্ডা ছিল না। তাছাড়া রাজা নিজেই যখন নন্দিনীর সঙ্গে একত্রিত হলেন তখন নাটকটি এবং সেই সঙ্গে অভিনয়টিও কোন অসাহিত্যিক দোষে দুষ্ট হল না। অবশ্য অন্য দিক থেকে অভিনয় সম্পর্কে আমার দু'চারটে বক্তব্য আছে। সংযোজনায় দোষ ছিল। ডান দিকের সিঁড়ি দিয়ে ওপর তলার লোক নীচে নামছিল— এটা এক হিসেবে ঠিকই হয়েছিল। কিন্তু সিঁড়িটা ছিল অত্যন্ত উঁচু, যার ফলে মঞ্চের depth নষ্ট হয়েছিল। বাঁ দিকে যে জালের মধ্যে রাজা ছিলেন তার পরিকল্পনাও ঠিক হয় নি। সেটা বড্ড সামনে এসে পড়েছিল। ফলে মধ্যেকার স্থান অতি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। ধ্বজাটা সিঁড়ির তুলনায় এতই নীচু যে সেটা অন্তত আমার চোখে পড়ে নি। বোধ হয় এসব দোষগুলি ছোট্ট স্টেজ-এর জন্যই হযেছিল। তবু মনে হয় আর একটু ভেবে-চিন্তে সাজালে স্বল্প পরিসরের মধ্যেও depth আনা যেত। সাজ-সজ্জা আমার মোটেই ভাল লাগে নি, বিশেষত সর্দারদের আচ্‌কান পরা। ওটা মোটেই খাপ খায় নি। বই-এর নির্দেশ হচ্ছে নন্দিনীর শাড়ী ধানী রঙ-এর; দেখলাম পাকা ধান-এর রঙ। পাকা ধানের রঙের সঙ্গে নন্দিনীর রক্তকরবীর সাজ এক প্রকারের অঘটন। দু-একজন অভিনেতা একটু অতিরঞ্জনের পক্ষপাতী দেখলাম। সেটা বোধ হয় ক্রমেই কমে যাবে যদি সহৃদয় দর্শকবৃন্দ তাঁদের দেখিয়ে দেন। সে যাই হোক নানা technical দোষ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাটকের নাটকত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য আমি অন্তত 'বহুরূপী'র কাছে কৃতজ্ঞ। এ অভিনয়কে আমি শুভচিহ্নই বলব।

বিস্তর শুভচিহ্ন তো দেখলাম। তবু আনন্দ হল না। তার প্রধান কারণটি মাত্র উল্লেখ করতে পারি। ভালো জিনিসের প্রতি এত আগ্রহ কোথাও দানা বাঁধছে না। সাহিত্য সভা, সঙ্গীত সভা অনেক কিছুই রয়েছে, কিন্তু মূল সূত্রের অভাবে তারা গ্রথিত হতে পারছে না, যেজন্য কোন স্থির মূল্য কিংবা মানদণ্ড তৈরী হল না। কবিতা ও সঙ্গীতের বেলা যে সামান্য মূল্যজ্ঞান দেখলাম সেটা নিতান্ত negative, নঞর্থক। বহু ছেলেমেয়ে কবিতা লিখছে, গান গাইছে— তাদের মধ্যে একটা প্রাকৃতিক নির্বাচন চলছে নিশ্চয়। কিন্তু এযুগে ঐ ধরনের অনিয়ন্ত্রিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কতদূর উন্নতি হবে জানি না। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একাডেমি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে বাংলা

দেশের কৃষ্টির বাস্তব অবস্থার যোগ নিতান্ত সামান্য, নেই বললেই হয়। যাই হোক বাংলা সরকারের উদাসীনতা ও কর্তব্যহীনতা দেখে নিতান্ত দুঃখ হল। দুঃখ হত না, যদি না আমার বিশ্বাস থাকত যে বাংলা দেশের সুচারু কলা, চিন্তা, ভাবনার প্রভৃতি দরদের একটা ইতিহাস আছে। আমার বিশ্বাস যদি ভুল হয়, তবে বাংলা দেশের অস্তিত্ব থাকবার কোন প্রয়োজন নেই, সে অন্য প্রদেশের সঙ্গে মিশে যাক, আর নয় বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাক। এত ভাল মালমশ্‌লার এমন অপব্যয়ে আমাদের বয়েসী লোকদের দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি? প্রফুল্ল রায় একে বলতেন অপব্যবহার; কিন্তু আমার মতে এটা অ-ব্যবহার, সুযোগ সুবিধার অভাবে।

বাংলা কাব্য ও সুধীন্দ্রনাথ

কিছুকাল পূর্বে 'পরিচয়ে'র এক সংখ্যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচকের বহু মন্তব্যে আমি সায় দিই না; তবু সুধীন্দ্রনাথের মতো কবির সমালোচনা আরম্ভ হোলো দেখে খুশী হলাম। এতদিন বাংলাদেশ যে তাঁকে অবহেলা করছিল তাতে আমাদের মনে একটু দুঃখ ছিল। অনেকে বলতেন যে এটা তাঁরই ব্যক্তিগত দোষ, কিন্তু আমার ধারণা একটু অন্য প্রকারের। আমরা, সাধারণ পাঠকেরা সহজের ভক্ত; আমরা কবির কাছে সরল, সুবোধ্য ভাষ্য ও ভাব প্রত্যাশা করি; কবিতাপাঠের সময় আমরা অভিধান খুলতে পরাঙ্মুখ হই। সুধীন্দ্রনাথ এই হিসেবে অ-সাধারণ কবি। তাঁর এই অ-সাধারণত্বকে অগ্রাহ্য করবার সহজ উপায় ছিল অবহেলা। অবশ্য বুদ্ধিমান সাহিত্যামোদীরা এই অগ্রহণকে অন্য ভাষায় ব্যক্ত করতেন; তারা অনেকেই বলতেন যে সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় শিল্পচাতুর্য আছে, ভাবাবেগ নেই, এবং আবেগ না থাকলে কবিতার রইল কি? তাঁরা ধরে নিতেন, আবেগ নেই। কিন্তু আবেগ বস্তুটি নিতান্তই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। তাঁরা নিশ্চয়ই সত্য কথা বলতেন, কিন্তু আমিও সত্য কথা বলছি, আমার কাছে সুধীন্দ্রনাথের "যযাতি", "উটপাখী", "সংবর্ত" প্রভৃতি কবিতা যথেষ্ট আবেগময়। সে যাই হোক, পুরস্কার পাবার পর সুধীন্দ্রনাথের কবিতার কদর কিছু বাড়ছে দেখলাম। পুরস্কারের মোহ আমাদের মজ্জাগত। অবশ্য পুরস্কার ঘোষণার পূর্বেই তাঁর সমালোচনা 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হয়েছিল। সে সমালোচনাতেও অগ্রহণের ছাপ রয়েছে, অন্যরূপে। রূপটি হোলো অভিযোগের; সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আমাদের দেশের দুর্দশা, মহাসংকট থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। অর্থাৎ তার কবিতা যে আমরা গ্রহণ করতে পারিনা, তার কারণ তিনি আমাদের গ্রহণ করেননি। এই যুক্তির পিছনে অনেক পণ্ডিতী প্রতিজ্ঞা খাড়া করা যায়, কিন্তু ব্যাপারটা ফিরে আসে ঐ পুনরুক্তিতে। Sociology of literature-এর ঐ এক বিপদ!

সে-বিপদ যে এড়ান যায়না তা নয়। এটি সত্য যে সুধীন্দ্রনাথের সমকালীন রচনায় বাংলাদেশের মহামারীর উল্লেখ নেই, তার পরিবর্তে বিশ্বের অন্য দুর্দশার উল্লেখ আছে। কেবল উল্লেখ নয়, সে-সব দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে তিনি